খুন রাঙা প্রান্তর

আমীরুল ইসলাম

فقاتلوا ائمة الكفر

খুনরাঙা প্রান্তর

[আফগানভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস]

প্রথম খণ্ড

রচনায়

আমীরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

খুনরাঙা প্রান্তর

[আফগানভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস]

[প্রেম সাগরের ঢেউ ১ম ও ২য় খণ্ডের নতুন সংস্করণ]

রচনায়

আমীরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

ডিজাইন

রোমান এন্টারপ্রাইজ

কম্পিউটার কম্পোজ

আমানত কম্পিউটার

প্রকাশনায়
নাঈমা প্রকাশনী
বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায়
ইসলাম পাবলিকেশন্স
৫০বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
যোগাযোগ-:০১৭৩৬১১৮৩৯৯,০১৮১৫৬৯৯৮৯৯

মূল্যঃ (৫০০.০০) পাঁচশত টাকা মাত্র।

এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত আফগানিস্তানের তথ্যভিত্তিক আলোচনা বাস্তব ও সত্য। এছাড়া মূল উপন্যাসের কাহিনী ও সকল চরিত্র কাল্পনিক।

উৎসর্গ

☆ আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ— শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুছাইন আহমদ মাদানী (রহ)–এর সুযোগ্য শাগরিদ হযরত মাওলানা আফতাব উদ্দীন সাহেব (রহ) এবং

☆ আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ, মারেফাত জগতের সম্রাট, অলিকুল শিরোমনি হযরত মাওলানা কারী ছিদ্দীকুর রহমান সাহেব (রহ) ও

☆ আমার পরম শ্রদ্ধেয় জান্নাতবাসী আব্বাজান, আম্মাজান, দাদা–দাদী, নানা–নানী ও মামা–মামীর রূহের মাগফিরাত কামনায়—

–আমীরুল ইসলাম

প্রকাশকের কথা

সব প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবাগণ এবং পরিবার বর্গের প্রতি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। হুজুর (সা)–এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে বিরাজ করছিল অশান্তি ও অরাজকতা।

এককথায় মনুষ্যত্ব বিরোধী এমন কোন কর্মকাণ্ড বাদ ছিল না, যা তৎকালীন সমাজে সংঘটিত হত না। মানুষ তার মূল গতিধারাকে হারিয়ে ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে জীবন যাপন করছিল উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। সে সমাজে ছিল না কোন শান্তি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ছিল না কোন শৃংখলা। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে সন্ধান করে ফিরছিল কোন মহামানবের।

এমন সময় মহান আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূলগণকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সহকারে প্রেরণ করেন, যা পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ সময়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর পর পৃথিবীর দেশে দেশে আবার সেই অরাজকতা দেখা দিয়েছে। আর মানবতার কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে হাজার হাজার মুসলিম প্রাণ দিতে হচ্ছে। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে একসময় জগতবাসী পেয়েছিল শান্তির ছায়া। ফলে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র। আজ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুসলমানদের সেই স্বাধীন রাষ্ট্র পরাধিনতায় কাতরাচ্ছে আর কিছু প্রাণ আবারো শান্তির লক্ষ্যে রক্তের সাগরে ঢেউ জাগাচ্ছে। এই হল আজকের আফগানের প্রতিদিনের চিত্র।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, "খুনরাঙা প্রান্তর" গ্রন্থে এই তিক্ত বাস্তবতাই ধরা পড়েছে। এ সময়ের প্রতিভাবান গল্পকার ও পাঠকপ্রিয় ঔপন্যাসিক মাওঃ আমীরুল ইসলামের কাছে সে সত্যটি ধরা পড়েছে।

তাই তিনি আফগানকে নিয়ে লিখেছেন এই উপন্যাস। নাম দিয়েছেন "খুনরাঙা প্রান্তর"। মাওঃ আমীরুল ইসলাম এ গ্রন্থটি ছাড়াও ছোট বড় বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন।

আর তাঁরই নির্বাচিত নাম নাঈমা প্রকাশনী–এর পক্ষ থেকে তাঁর মুল্যবান গ্রন্থাদি পর্যায়ক্রমে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

বইটি সম্পুর্ণ নিখুঁত ও নির্ভুল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরও মানুষ যেহেতু ভুল–ত্রুটির উর্ধে নয়, অজ্ঞাতসারে কোন ভুল থেকে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কোন সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে সদয় অবগতির বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে, তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই জ্ঞান সাধকের বইটি পড়ে দিশেহারা মানুষ যদি সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং পার্থিব জীবনের মোহ পরিত্যাগ করতঃ পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে তবেই আমাদের এই শ্রম ও প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

–বিনীত

এস. এম. আজীজুল হক

পেশে কালাম

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন দলিল-প্রমাণসহ, মানুষকে সরল পথ প্রদর্শন ও অপরাপর ধর্মের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য।

পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স)-এর উপর এবং তাঁর আল-আওলাদ, সাহাবায়ে কেরাম, গাজী-শুহাদা ও সমস্ত মুমিন মুসলমান নর-নারীর উপর।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা ! এ পর্যন্ত যেসব লেখক এমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর কলম ধরেছেন ও লেখা-লেখি করেছেন, তাঁদেরকে জানাই মুবারকবাদ। কেননা, পশ্চিমা সন্ত্রাসী মিডিয়ারা আফগানিস্তানের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সারা দুনিয়ায় বদনাম ছড়াতে আদা-জল খেয়ে ও উলঙ্গ হয়ে মাঠে নেমেছিল। সে সব হায়েনাদের মিথ্যার ধূম্রজাল থেকে যারা আফগানিস্তানকে রক্ষা করেছেন, তাঁরা ধন্যবাদ পাওয়ারই দাবী রাখে। আফগানিস্তানের উপর অনেক বই বাজারে আসার পরও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে আফগানিস্তানের উপর কিছু লিখতে বাধ্য হয়েছি। আফগানিস্তানে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এক ঝাঁক আল্লাহ প্রেমিক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন এবং এখনো দিচ্ছেন। তাই আমার এ বইটির নাম রেখেছিলাম "প্রেম সাগরের ঢেউ।" উপন্যাসটি আমি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করেছি। বইটি বাজারে আসলে নামের ব্যাপারে বন্ধু মহল থেকে কিছু কিছু আপত্তি উঠতে থাকে। তাই "প্রেম সাগরের ঢেউ" এর ১ম ও ২য় খণ্ডকে একত্রিত করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে "খুনরাঙ্গা প্রান্তর" নামে।

ইটিতে আমি সত্য ইতিহাস ও সত্য ঘটনাবলি উপন্যাস আকারে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছি। বইটি পাঠ করে যদি কেউ গায়রুল্লার প্রেম থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তবে আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব। বইটিতে যদি সুন্দর কিছু থাকে তার কৃতিত্ব হল আল্লাহর। আর অসুন্দর কিছু থাকলে তা এ গোনাহগারের। আয় আলাহ্ বইটিকে কবুল কর ও পরকালের নাযাতের উসিলা বানাও। আমীন।

—লেখক।

স্মরণে

যারা ও প্রেমের মদিরা পিয়ে
শানিত কৃপাণ হাতে,
ছুটে চলেছে দিক-দিগন্তে
প্রেমের মূর্ছনাতে।

দ্বীনের ঝাণ্ডা করিতে উঁচু
করিল জীবন দান,
তাদেরই একজন বঙ্গাশার্দূল
আবদুর রহ্‌মান ॥ (ফারুকী রহঃ)

তোমারই মত বীর বাহাদুর
আর পাবে না কেউ,
তাই তো দিলাম তোমার হাতে
প্রেম সাগরের ঢেউ ॥

—লেখক

দুটি কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। শত কোটি সালাম ও দরুদ তাঁর প্রিয় বান্দাহ ও রাসূল সায়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, আমীরুল মুজাহিদীন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুস্তফা (সা)-এর ওপর। অফুরন্ত শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর আহলে-আওলাদ, ছাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালেহীন, শুহাদা, গাজী ও সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনদের ওপর।

ইমারতে ইসলামিয়্যাহ, আফগানিস্তানের বিষয়ের ওপর এ পর্যন্ত অনেক সনামধন্য লেখক কলম ধরেছেন।এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা-ভাষীদের হাতে তুলে দিয়েছেন অনেক পুস্তক-পুস্তিকা। ঐ সকল লেখকদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই জন্য যে, যখন পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সাজান ইসলামী ইমারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট খবর পরিবেশন করে সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। তখন পরম সঠিক ও সত্য ঘটনাবলি প্রকাশ করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।এতগুলো পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের পরও আমার মত নগণ্য ও অধমের অন্তরে বার বারই জাগ্রত হচ্ছিল, এই মহত খেদমতে আমিও অংশ গ্রহণ করি। সত্য কথা বলতে কি, আমার এ আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করার মত কোন যোগ্যতা আমার নেই। এক দিকে মূর্খতা, অপর দিকে সময়ের স্বল্পতা, আবার পাছে লোকে কিছু বলে, এই ভিরুতা।

এতগুলো প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হওয়া নগণ্যের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। তথাপি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় প্রতিদিনই বন্ধু-বান্ধব হিতাকাংখী ও প্রিয় পাঠক-পাঠিকার পক্ষ থেকে মোবাইলে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল আফগানিস্তানের ওপর কিছু লেখার জন্য। অবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে হাত দেই। আমার বিশ্বাস, আমি যতই অযোগ্য, অক্ষম হই না কেন, আমার মাওলা অক্ষম নন। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। আমি তাঁর রহমতের দুয়ারের ভিখারী। আমাকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, যে-কোন জাতিকে জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে সে জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান। আমার এ পুস্তকটি কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তাই পুস্তকটির শুরুতে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করেছি আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি নিয়ে।

পায়েন্দা খানের অধঃস্তন বংশধরদের নাদির শাহ্-এর আমল থেকে বাবরাক কারমাল, ডঃ নজিবুল্লাহ্, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর ও আমেরিকার পদলেহী গোলাম ও পুতুল সরকার হামিদ কারযায়ীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আফগানিস্তান পৃথিবীর এমন একটি দেশ, যে দেশের জনগণ শতাব্দির পর শতাব্দি বাতেলের সাথে আপোষহীন জিহাদ চালিয়েছে, কখনো পরাজয় মানে নি। বাতেলের সামনে মাথা নত করা এ জাতির অভিধানে নেই। আফগানিস্তান এমন একটি ভূখণ্ড, এখন সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যুর হার শূন্যের কোটায়। কারণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই মুজাহিদ। এদেশের যিনিই দুনিয়া হতে অবসর নিচ্ছেন শহীদের কাতারে সামিল হচ্ছেন। শাহাদাতকে তাঁরা জীবনের চেয়ে অধিকতর ভালবাসেন। তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শাহাদাত লাভ। ইসলামের জন্য অতি উর্বর ভূমি হল আফগানিস্তান। কারণ, সে দেশের প্রতিটি বালুকণা বহুবার গোসল করেছে শহিদী রক্তে। যে দেশের পরতে পরতে রয়েছে আল্লাহ্ প্রেমিকের বুকের তাজা খুন। সে দেশের পাহাড়-পর্বত উপত্যকা থেকে নিয়ে সমতল, অসমতল, তৃণভূমি ও কঙ্করময় প্রান্তর পর্যন্ত সর্বত্র সিক্ত হয়েছে শহীদদের শোনিতধারায়। শহীদের রক্তে সিক্ত ভূমিই হল ইসলামের জন্য প্রকৃতপক্ষে উর্বর ভূমি। আজ পবিত্র মক্কা-মদীনা থেকে জুলুম-অত্যাচার সয়ে ইসলাম হিযরত করেছে আফগানের পুণ্যভূমিতে। সে দেশের কবরগুলো শহীদকে বরণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। শহীদের লাশ গ্রহণ করে কবরগুলোও যেন গর্বিত ও প্রফুল্ল হয়। আজ সে দেশে দেখা যায়, মাইলের পর মাইল মাক্বারায়ে শোহাদা অর্থাৎ শহীদদের গোরস্তান। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত নয়, এমন কেউ দেখলে বলবে, এতো আফগানিস্তান নয় এতো কবরস্তান। আফগানিস্তানে বহুবার অহুদ, বদর, খন্দক ও হুনাইনের পুনঃরাবৃত্তি ঘটেছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহ্ প্রেমিকদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

প্রেমিকদের সর্বোচ্চ চূড়া বা সোপান হল আত্মত্যাগ। সূলুকের ভাষায় যাকে বলা হয় ফানা ফিল্লাহ্। ফানাফিল্লাহ্র স্তরে উপনীত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও প্রেমাস্পদকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা। একমাত্র প্রেমই তাকে নিয়ে যেতে পারে সাফল্য স্তর ফানা ফিল্লাহ্র স্তরে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হৃদয়ে ভরে দেয়া বিশেষ এক অবস্থাকে প্রেম বলে। প্রতিটি প্রাণে প্রেম বিদ্যমান। যেমন, গাভী তার বাচ্চাকে দুধ দেয় ও চেটে চেটে সোহাগ করে। মুরগী তার বাচ্চাকে ঝড়-তুফান ও হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে নিজের পাখার নিচে লুকিয়ে রাখে। বানর তার আদরের সন্তানটি বুকের নিচে লুকিয়ে রেখে গাছে-গাছে বিচরণ করে। প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে প্রেম ঢেউ খেলতে থাকে।

প্রেমকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এশকে মাজাযী ও এশকে হাকিকী। যারা মুজাহিদার মাধ্যমে অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্র মহব্বতকে দূরীভূত করে অন্তরে একমাত্র আল্লাহকে স্থান দিয়েছেন বা যে এশকে মানুষকে আল্লাহ

পর্যন্ত পৌঁছায় তাকেই এশকে হাকিকী বলে। যে এশক বা প্রেম শুধু জাগতিক বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার অন্তরায় হয় তাকে এশকে মাজাযী বলে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর বস্তুটির জন্য এই এশ্কে মাযাযীকে এশকে হাকীকিতে রূপান্তর করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেম, রাসূলের ভালবাসা, দ্বীনের মহব্বত পয়দা হয়, সেসব অন্তরে প্রেমের ঢেউ বইতে থাকে। এভাবনায় কিভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-কে খুশী করা যায়। কিভাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিভাবে সব ধর্মের ওপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা যায়। এই ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে সে জীবনের মায়া, সন্তানাদির মায়া, ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে একমাত্র প্রেমাস্পদকে রাজি করার জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়। শাহাদত লাভ করে। তার এই আত্মভোলা বা আত্মত্যাগের পিছনে যে শক্তিটি কাজ করে সেটাই প্রেম। তাই আমার এই সিরিজ উপন্যাসের নাম রেখেছি–**'প্রেম সাগরের ঢেউ'**।

প্রেম মানুষকে করে সুন্দর, এই প্রেম আবার মানুষকে করে কলুষিত। প্রেম আত্মাকে দান করে সজীবতা, প্রেম আত্মাকে করে কতল। প্রেম মানুষকে রাজত্ব দান করে, প্রেম মানুষকে করে পথের বিখারী। প্রেম ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে দেয়। প্রেম জাগ্রত আত্মাকে ঘুম পাড়ায়। প্রেম আল্লাহ্র সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রেম মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরায়।

প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় জান্নাতের সুউচ্চ সোপানে, প্রেম মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয় জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। প্রেম মানুষকে হাসায়, প্রেম মানুষকে কাঁদায়।

প্রেম মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে। প্রেম মানুষের জীবনকে করে বিষাদময়। তাই মারেফাত সাগরের ডুবুরী, অলীকুল শিরোমণি জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) বিগলিত অন্তরে গেয়েছেন–

ঃ এশক্ কুতা বে-বাল তয়রাঁ কুনাদ"
এশক্ কুতা লামকাঁ দর লা কুনাদ ॥

অর্থাৎ- প্রেম লোমহীন ও পালকবিহীন অবস্থায় লামকান পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে। আল্লাহর প্রেমিকগণকে এশক্ নামক বোরাক লামকান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

ঃ এশ্ক কু তাজে সুলতানী দেহাদ
এশ্ক কু মুল্কে সোলাইমানী দেহাদ ॥

অর্থাৎ- প্রেম মানুষকে বাদশাহী দান করে, আর সেটা সাধারণ বাদশাহী নয়, হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর মত সারা দুনিয়ার বাদশাহী। পশু, পাখী, আগুন, পানি, বাতাস, কীট-পতঙ্গ থেকে নিয়ে জীন ও ইনসান সবাই তাকে মান্য করে।

ঃ এশ্ক কুতা চশ্মে দিল বি না কুনাদ
এশ্ক কুতা সীনা পোরছুদা কুনাদ ॥

অর্থাৎ– প্রেম অন্তরের চক্ষুকে খুলে দেয় আর প্রেম বক্ষ দেশে উন্মাদনা সৃষ্টি করে।

ঃ এশ্‌ক কুতা আকলেরা যায়েল কুনাদ
এশ্‌ক কুতা আক্‌লেরা হাছেল কুনাদ।

অর্থাৎ- প্রেম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় আর প্রেম মানুষকে আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা দান করে।

কাজেই সকল প্রেমিকের জন্যই উচিত, তাদের অন্তরে প্রেমের বীজ রোপণ করা এবং এই মহামূল্যবান প্রেমকে পবিত্র রেখে যথাযথ কাজে-ব্যবহার করা। তা হলে সে এ প্রেমের দ্বারাই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারবে। তাই আমার এ ছোট্ট পুস্তিকায় বারবার এসেছে এই প্রেমের প্রসঙ্গ, উল্লেখিত হয়েছে প্রেমের ব্যর্থতা-সাফল্য, এতে এসেছে পবিত্র জিহাদের চমকপ্রদ ও ঈমান দীপ্ত ঘটনাবলি। তাছাড়াও মানব সভ্যতার কলংক, বিশ্ব সন্ত্রাসীদের মোড়ল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের প্রাণ হরণকারী ইহুদী ও খৃষ্টানদের গডফাদার আমেরিকার মুসলিম নিধন ও ঈমান হরণকারী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন। এতে রয়েছে আমেরিকান এক সুন্দরী তরুণীর ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ ঘটনা এবং উক্ত সুন্দরী তরুণীর যবানীতে আমেরিকার অতি গোপনীয় তথ্যাবলির কথা।

এইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে দেখবেন। এতে রয়েছে আপনার অন্তরের গভীরে লুকায়িত প্রশ্নাবলির বিশদ সমাধান।

আমি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এ বইটি লিখে প্রকাশ করার জন্য বার বার উৎসাহিত হয়েছি। আমি এদের সকলের কাছে ঋণী। তাছাড়া যিনি বইটি সম্পাদনা করে এলো-মেলো আগোছালো শব্দগুলোকে ঘঁষে-মেজে পাঠকদের পড়ার উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন, তাঁর নিকটও ঋণী। পুস্তকটি পাঠ করে যদি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে জিহাদের জযবা পয়দা হয় তবেই আমার ক্ষুদ্র শ্রমটুকুকে সার্থক মনে করব।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বইটিকে নির্ভুল করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। আগামী মুদ্রণে সংশোধন করার চেষ্টা করব। এবারের মত ক্ষমা সুন্দর নজরে দেখবেন বলে আশা রাখি।

আয় আল্লাহ্‌, আমার এক্ষুদ্র শ্রমটুকুকে দ্বীনের জন্য কবুল কর। তোমার এ দীন-দাসেরে ক্ষমা কর এবং পুস্তকটিকে কবুল কর। আমীন্! ইয়া আরহামার রাহিমীন।

বিনীত-

আমীরুল ইসলাম

আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন জাতির অধঃপতনের পূর্বে শাসকগোষ্ঠী, নষ্ট বুদ্ধিজীবী ও পদলেহী আমলাদের বিবেকের পতন ঘটে। পচন ধরে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়-নিষ্ঠার। তাই ঐ সকল শাসক, আমলা, বুদ্ধিজীবীরা আমদানী করে ভিন দেশীয় বস্তাপঁচা অপঃসংস্কৃতি। ভুলে যায় নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, তাহজীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা। তারাই ইতিহাস বিকৃত করে জাতিকে নিয়ে যায় পথভ্রষ্টতার দিকে। তাছাড়া বিদেশী কূটনীতিবিদরা, গুপ্তচর ও নষ্ট সাংবাদিকরাও একটি জাতির বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন শাসকগোষ্ঠীর ভিনদেশী বা বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার আমদানী করে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় বা তত্ত্বাবধানে বহুমুখী প্রচারাভিযান চালিয়ে ছড়িয়ে দেয় জনসাধারণের ঘরে ঘরে। তারপর জোরপূর্বক মিথ্যাচার চাপিয়ে দেয় জনগণের ঘাড়ে। প্রথম উঠতে থাকে প্রতিবাদের ঝড়, তারপর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যায় আন্দোলনকারীদের কণ্ঠ। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন ঐতিহ্য প্রিয় প্রবীণরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়, তখন নতুন প্রজন্ম একেই সভ্যতা মনে করে আঁকড়িয়ে ধরে। এমনিভাবে একদিন গোটা জাতি হারিয়ে যায় অপঃসংস্কৃতির গহীন আঁধারে। তারপর নেমে আসে সমাজে ভয়ানক বিপর্যয়। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের হৃদয় বিদারক ইতিহাস বলা তো দূরের কথা তা ভাবতেও অবাক লাগে।

আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে জেনারেল দাউদ খান, নূর মোহাম্মদ তারাকি, বাবরাক কারমাল ও ডঃ নজিবুল্লাহ আফগানের জনগণ নিয়ে এমনি একটি খেলায় মেতেছিলেন। আফগানের জনগণ পাক্কা ঈমানদার ও বীরের জাতি। এ সমস্ত বেঈমান শাসকরা জনগণের সাথে এমন সর্বনাশা খেলা বেশি দিন খেলতে পারেন নি। আফগান মায়েরাও তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। এরা সবাই ছিলেন সোভিয়েত সরকারের পুতুল। সোভিয়েত সরকার যেভাবেই রিমোট টিপত, সেভাবেই এরা নাচতে থাকত। এক সময় আফগানের জনগণ জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে উৎখাত করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। সে ইতিহাসটুকু পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পৃথিবীর আঁকা-বাঁকা মানচিত্রে যে দেশটি ২ লক্ষ ৫২ হাজার বর্গ মাইল স্থান দখল করে রেখেছে তার পশ্চিমে রয়েছে ইরান ও উত্তর তুর্কমেনিস্তান, উত্তরে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান, পূর্বে চীনের সাথে মিশেছে সামান্য অংশ, পূর্ব-দক্ষিণে পাকিস্তান। উত্তর সীমান্তের কিছু অংশ জুড়ে বয়ে চলছে আমুদরিয়া। তাছাড়া আফগানের বুক চিরে আবহমান কাল থেকে কলকল রবে বয়ে যাচ্ছে ফারা রূদ, ফরিরুদ, হেলমান, লুগার ও কূনার নদী। নদীর বাঁকে বাঁকে গড়ে উঠেছে জনবসতী। রয়েছে কৃষিভূমি। হিন্দুকুস পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা সারা দেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ। দেশটির ৭৫ ভাগই হল পাহাড়ী অঞ্চল ও মরুভূমি। ১৩ / ১৪ ভাগ জমিতে শাক, সজি, তরি-তরকারী, ফল-মূল ও অন্যান্য ফসল আবাদ হয়। তরকারীর মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, করল্লা, আলু, বেগুন, টমেটো, শশা, বাংগী, তরমুজ-খরবুজা, লাউ, কুমড়া, সিম ইত্যাদি। ফলমূলের মধ্যে রয়েছে আনার, আংগুর, আপেল, আখরুট, পেস্তা, মনাক্কা, কমলালেবু, ডালিম বেদানা, নাসপাতি ইত্যাদি। আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উৎপাদন হয়, গম, গেঁউ, যব, ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি। ১০ ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে চারণভূমি বা তৃণভূমি। পশুপালনই হল তাদের প্রধান আয়ের উৎস। প্রতিটি পরিবারের রয়েছে হাজার হাজার মেষ ও দুম্বা।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। এর বড় বড় শহরগুলো হল জালালাবাদ, কান্দাহার, হেরাত ও মাজার-ই-শরীফ। আফগানিস্তান ৩০ টি প্রদেশে বিভক্ত ঃ

(১) কাবুল, (২) কান্দাহার, (৩) হিরাত, (৪) বল্খ, (৫) গজনী, (৫) ঘোর, (৭) বাদাখশান, (৮) কুনাড়, (৯) নাঙ্গাহার, (১০) কাপিসা, (১১) পরোয়ান, (১২) লাগমান, (১৩) বাঘলান, (১৪) তাখার, (১৫) কুন্দুজ, (১৬) সামানগান, (১৭) ঝাউযান, (১৮) ফারিয়াব, (১৯) বাদঘীস, (২০) ফারাহ, (২১) নিমরোজ, (২২) হিলমান্দ, (২৩) উরগুন, (২৪) বামিয়ান, (২৫) ওয়ারডাক, (২৬) লোগার, (২৭) পাক্তিয়া, (২৮) পাক্টিকা, (২৯) জাবাল, (৩০) বাদঘিস।

অন্যান্য দেশ থেকে তুলনামূলক হাট-বাজারের সংখ্যা খুবই কম। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাঁচ গুণ বড়। কিন্তু জনসংখ্যা খুবই কম। ১৯৯৫ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি ৫৬ লক্ষ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি পেরিয়ে। বাংলাদেশের তুলনায় বলা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানের এক একটি গ্রামে মাত্র চার-পাঁচটি পরিবার বসবাস করে। অর্থাৎ এক একটি পরিবার ভোগ দখল করছে চার-পাঁচ-সাত একর সম্পত্তি। এর মধ্যে কিছু চারণভূমি, কিছু আবাদী।

আফগানিস্তানে বেশ কয়টি সম্প্রদায় বসবাস করে। যেমন-পুশতুন, তাজিক, উজবিক, হাজারা, পার্সিয়ান, তুর্কমেন, আইমাক, পাঠান, ব্রাহুই, বেলূচ, নূরস্তানী ইত্যাদি।

আফগানিস্তান যেমন বহুজাতির আবাসস্থল, তেমনি ভাষার দিক দিয়েও রয়েছে বহু ভাষার প্রচলন। আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হল ফার্সি। দারি, উজবেক, পুশতুন, বেলূচ, তাজিক ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় রয়েছে মিশ্র উর্দূ।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের কিছু সংখ্যক ভিরু ও কাপুরুষ মুসলমান বলসেভিকদের তাড়া খেয়ে নিজের মাতৃভূমি ও সহায়-সম্পদ ফেলে রাতের আধাঁরে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশে এসে ডেরা ফেলে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ সকল পালিয়ে আসা উজবেক ও তাজিকদেরকে তদানীন্তন আফগানিস্তানের শাসনকর্তা নাদির শাহ উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ করে দেন।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ওরা আফগানিস্তানে এসেছে। আবার কারো কারো মতে এরা এসেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে। নাদির শাহের শাসনামলে ঐ সব এলাকা ছিল অনাবাদি ও অনুর্বর। না ছিল রাস্তা-ঘাট, না ছিল শিক্ষার সুব্যবস্থা। হিন্দুকুশ পর্বতমালা ওদেরকে আড়াল করে রাখত আলোকিত পৃথিবী থেকে। সভ্য জগতের সাথে মেলা-মেশার সুযোগ ছিল না তাদের। তাই তাদের আচার-আচরণ ছিল অনেকটা পূরণো ধাঁচের। নাদীর শাহ তাদেরকে শিক্ষার আলো দানের ব্যবস্থা করেন।

পায়েন্দা খানের অধঃস্তন বংশধরদের মধ্যে নাদির শাহ্ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তান দখল করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়-পরায়ণ শাসক। প্রজাপালন নীতিতে ছিলেন অটল ও অবিচল। তাঁর শাসনামলে প্রজারা সুখ-শান্তিতে বসবাস করেছে। তিনি অবহেলিত এলাকাগুলোর উন্নতি সাধন করতে গিয়ে গড়ে তুলেছেন হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট। উত্তরাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ্ হিন্দুকুশ পর্বতমালার বুক চিরে তৈরি করেন ১২০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ সালং ট্যানেল বা সালং পাশ গিরিপথ। সালং পাশ মহাসড়কটিই উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র স্থলপথের যোগাযোগের মাধ্যম। নাদির শাহের রাজত্বকাল ছিল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের সুযোগ্য পুত্র জহিরশাহ্ আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত সুচারু রূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। জহির শাহের শাসনামলে তাঁর পিতৃব্য জেনারেল দাউদ খান ছিলেন প্রধান সেনাপতি। দাউদ খান উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য দীর্ঘ সময় রাশিয়ায় অবস্থান করেন। তখন ছিল কমিউনিজমের যৌবন কাল। তারা এদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের ছবকও দিত

নিয়মিত। এতে তাঁর চিন্তা-চেতনায় কমিউনিজমের বীজ অংকুরিত হয় এবং কমিউনিস্ট নেতাদের সাহায্যে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জহির শাহ্কে ক্ষমতাচ্যুৎ করে আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল দাউদ খানের শাসনামলেই আফগানিস্তানে কমিউনিজম আস্তানা গেড়ে বসে।

১৯৭৮ সালের ৩০শে এপ্রিল, জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী জেনারেল দাউদ খানকে সপরিবারে হত্যা করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল দাউদ খানের হত্যার পেছনেও ছিল রাশিয়ার হাত। যারা জেনারেল দাউদ খানকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছিল আফগানিস্তানে কমিউনিজম শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য কিন্তু তিনি কুলিয়ে উঠতে না পারার অপরাধে নির্মমভাবে তাঁকে সপরিবারে নিহত হতে হল। নূর মোহাম্মদ তারাকীর সমর্থিত কমিউনিস্টদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলে তারা দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (১) সোভিয়েত সমর্থিত পারচম পার্টি, (২) চীন সমর্থিত খালক পার্টি। পারচম পার্টি ছিল কট্টর কমিউনিস্ট আর খালক পার্টি ছিল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের উপ-প্রধান মন্ত্রী হাফিজ উল্লাহ্ আমীন নূর মোহাম্মদ তারাকীকে অপসারণ করে প্রধানমন্ত্রীর আসন দখল করেন। হাফিজ উল্লাহ আমীন ছিলেন খালক পার্টির নেতা। তাই পারচম পার্টির নেতা কট্টর রুশ পন্থী বাবরাক কারমাল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর মাসে হাফিজ উল্লাহ্ আমীনকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। বাবরাক কারমাল ছিলেন সোভিয়েতের উচ্চ পর্যায়ের এজেন্ট। দীর্ঘ দিন তিনি রাশিয়ার সৈন্যদের নিকট থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রাশিয়ার পরামর্শে তিনি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। রাশিয়ার সাথে বাবরাক কারমালের ওয়াদা ছিল, তিন-চার বছরের মধ্যে আফগানিস্তানে কমিউনিজম শাসনব্যবস্থা চালু করবেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তাঁর হাতকে মজবুত করার জন্য রাশিয়ার কাছে সামরিক সাহায্য চাইলেন। রাশিয়া তাঁকে অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নূর মোহাম্মদ তারাকী রাশিয়ার সাথে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বাবরাক কারমালের সেই চুক্তির পথ ধরেই রাশিয়ান সৈন্য আফগানের ভূমিতে আসতে সহায়ক হয়।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আফগানিস্তানের দ্বীনদার পরহেজগার ও নিরীহ জনসাধারণের ওপর চলতে থাকে অকথ্য ও বর্বর নির্যাতন। নারী-শিশু থেকে বুদ্ধ কাউকে তারা রেহাই দেয় নি।

রাশিয়ান সৈন্যদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী তাজিক ও উজবিক বংশোদ্ভূত সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাবরাক কারমালকে শিখন্ডি করে কয়েকটি দেশ নিয়ে সোভিয়েত যে নীল নক্শা তৈরি

করেছিল তা হল, আফগানিস্তানে পুতুল সরকার বসিয়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়া। আফগানকে রাশিয়ান ব্লকে নিতে পারলে পাকিস্তান, হিন্দুস্তানসহ মায়ানমার পর্যন্ত রাশিয়ার অবাধ মোড়লিপনা কায়েম হয়ে যাবে। আর এটা সত্য যে, আফগানিস্তানকে নিজ দখলে নিতে পারলে বাকিগুলো নেয়া সহজতর হয়ে যাবে। এই নীল নক্‌শা বাস্তবায়নের জন্যই তাদের কড়া নজর ছিল আফগানিস্তানের ওপর।

রাশিয়ান সৈন্যের লুটতরাজ ও নির্যাতনের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে গেল, তখন আফগান জনগণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল। বিশেষ করে উলামায়ে কিরাম, পীর মাশায়েখ ও আইনজীবী-বুদ্ধিজীবীরা তাদের যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠল। যে সব জায়গায় তাদের অত্যাচার সীমাতিক্রম করেছিল ঐ সব এলাকার জনগণ একশনে নামতে বাধ্য হল। দা, লাঠি, কুঠার, শাবল, খন্তি ও সেকেলে বন্দুক দিয়ে তাদের সাথে মোকাবেলা করতে লাগল। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিরোধের সংবাদ আসতে থাকে।

মুজাহিদদের তৎপরতা বন্ধের জন্য বাবরাক কারমাল ব্যাপক অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছিলেন। রাশিয়া দেখল, বাবরাক কারমালের দ্বারা পুরাপুরি কাজ হাছিল হচ্ছে না, সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা যাচ্ছে না। তাই তারা রাশিয়ার আর এক পালিতপুত্র, কঠিন হৃদয়, দীর্ঘদিন আফগানিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ডঃ নজিবুল্লাহ-কে আফগান মসনদে বসানোর চিন্তা করল। তাই ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাবরাক কারমালকে অপসারণ করে ডঃ নজিবুল্লাহকে ক্ষমতায় বসায় এবং অসংখ্য সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করে।

ডঃ নজিবুল্লাহ্ আফগানিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে চলে যান রাশিয়ায়। সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর মেধা, প্রতিভা ও বিচক্ষণতা দেখে রাশিয়া চিন্তা করল, এর মাধ্যমে রাশিয়ার পক্ষে অনেক কিছু করানো যাবে। রাশিয়ার চরম স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা তাঁকে উচ্চতর গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান করে। রাশিয়া ভেবেছিল বাবরাক কারমালের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হাছিল না হয় তবে নজিবুল্লাহকে দাঁড় করাবে। বাস্তবে ঘটনা তা-ই ঘটে গেল। বাবরাক কারমাল মুজাহিদদের তৎপরতা বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডঃ নজিবুল্লাহকে ক্ষমতায় বসায়। ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট ও নাস্তিক।

ডঃ নজিবুল্লাহ্ ক্ষমতায় এসে কমিউনিস্টদেরকে ব্যাপক সহযোগিতা দিতে ও সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগলেন। বাবরাক কারমালের তুলনায় দেশটাকে অনেক বেশি কমিউনিজমের দিকে নিয়ে গেলেন। অল্প দিনেই রাশিয়ার সন্তুষ্টি অর্জন

করতে সক্ষম হন ডঃ নজিবুল্লাহ্। তিনি স্কুল, কলেজের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাতা প্রদান করতেন এবং প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিতেন। সরকারী খরচে এদেরকে রাশিয়া পাঠাতে লাগলেন। ওরা রাশিয়া থেকে ব্রেইন ওয়াশ করে দেশে ফিরলে তাদেরকে থানা থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত উচ্চ উচ্চ পদে বসানো হত। ডঃ নজিবুল্লাহর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন (উজবেক গোত্রীয়) সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল রশিদ দোস্তাম।

ডঃ নজিবুল্লাহ্ আলিম-উলামা, শাইখ-মাশায়েখ ও দ্বীনদার পরহেজগার মুসলমানের ওপর জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়ে জিহাদের ডাক দেন। তাদেরকে দমন করার জন্য রাশিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র আনা হয়। রাশিয়ান বাহিনী ও আফগানিস্তানের সামরিক বাহিনী যৌথভাবে আলিম-উলামা, নারীপুরুষ ও শিশুদেরকে পাইকারী হারে হত্যা, লুণ্ঠন, গুম ইত্যাদি আরম্ভ করে। বাধ্য হয়েই জনগণকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। সে জিহাদ ছিল ঈমান বাঁচানো ও স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জিহাদ। উক্ত জিহাদে শরীক হয় পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ, আরব, ফিলিপাইন, চেচনিয়া, বসনিয়া, সোমালিয়াসহ বেশ কয়টি দেশের ইসলামপ্রিয় অকুতোভয় দামাল তরুণরা। ডঃ নজিবুল্লাহ্র ইশারায় রাশিয়ানদের হাতে ১৫ লক্ষ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান পঙ্গুত্ব বরণ করেন। হাজার হাজার নারী স্বামী হারান আর লক্ষ লক্ষ শিশু পিতা হারিয়ে এতিম হয়ে যায়। মুজাহিদদের হাতে প্রাণ হারায় ১৪ হাজার উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রাশিয়ান জেনারেল ও সাধারণ ফৌজ। তারপর ১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল ডঃ নজিবুল্লাহ ক্ষমতা হারিয়ে পালিয়ে গিয়ে জাতিসংঘের আশ্রয় শিবিরে স্থান নেন। তারপর ১৯৯২ সালের ২৮ শে এপ্রিল অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দিদী। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সহানুভূতিশীল প্রফেসর বুরহান উদ্দীন রব্বানী, তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। চলতে থাকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে এতো অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় যে, সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় চরম অরাজকতা। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার বুরহানউদ্দীন রাব্বানীর বিপক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ করেন। প্রশাসন যখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। তখন ছোট ছোট মুজাহিদ গ্রুপগুলো নিজ নিজ এলাকায় ক্যাম্প বসিয়ে গাড়ী থেকে টোল আদায়, হাট-বাজার থেকে চাঁদা গ্রহণ করা শুরু করে। এমন কি সাধারণ পথিকরাও চাঁদা না দিয়ে সামনে এগুতে

পারত না এক কদমও। পকেট হাতিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সব রেখে দিত এ চাঁদাবাজরা। পয়সা না থাকলে খেতে হত রাইফেলের বাঁটের আঘাত। কোন মহিলা গহনাপত্র ও মান-ইজ্জত নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারত না। রাস্তায় সব খোয়া যেত। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ব্যাভিচার ছিল তাদের নিত্য দিনের কাজ। কওমে লুতের (আ) মত তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সুন্দর-সুশ্রী শ্মশ্রুবিহীন বালকদেরকেও বিয়ে করত। নাউযুবিল্লাহ্)

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কান্দাহারে হেযবে ইসলামী নামক সংগঠনের কথিত এক মুজাহিদ কমান্ডার চলন্ত গাড়ী থামিয়ে পিতার সম্মুখ থেকে তাঁর গর্ভবতী মেয়েকে টেনে এনে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনা পার্শ্ববর্তী এক মাদরাসার উস্তাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি তার প্রতিবিধান ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। সেই উস্তাদের নাম মোল্লা মুহাম্মদ উমর। তিনি তাঁর মাদরাসার কয়েকজন ছাত্র নিয়ে ক্ষিপ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ঐ সমস্ত অসভ্য পাপীষ্ঠদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ওরা অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। এভাবে তিনি বেশ কয়েকটি পোস্ট দখল করে সেখানে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণের ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার পর তিনি আরও কয়েকটি মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এক এক করে সবগুলো পোস্ট দখল করে জালিমদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৯৯৪ সালে পূর্ণ কান্দাহার জালিমশূন্য করেন।

এদিকে তিনি প্রফেসর বুরহানউদ্দীন রব্বানী, (প্রেসিডেন্ট) গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার (প্রধানমন্ত্রী), ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসউদ বেসামরিক প্রধান) প্রমুখের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, “আপনারা আপোসে দ্বন্দ্ব পরিহার করে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনুন। অরাজকতা ও চরম অশান্তি-অসন্তোষ বিরাজ করছে দেশময়। জনগণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাদের জান-মাল, মান-ইজ্জতের নিরাপত্তার ব্যাপারে। আপনারা পরস্পর দ্বন্দ্ব পরিহার করুন। এখন যুদ্ধে লন্ডভন্ড দেশকে গড়া ও শান্তি স্থাপন করার সময়। অনতিবিলম্বে এ কাজে অগ্রসর হোন।”

কে, কার কথা শোনে। মোল্লা মুহাম্মদ উমর তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে দেশের স্বার্থে কাবুলের দিকে ছাত্র সমাজকে নিয়ে অগ্রসর হন। লড়াই করতে করতে ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজধানী কাবুল দখল করেন। কাবুল দখলের পর প্রফেসর বুরহানউদ্দীন রব্বানী ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার কাবুল ছেড়ে পালিয়ে যান।

মোল্লা মুহাম্মদ উমর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দেশের আলিম ও বুজুর্গানে দ্বীনকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা কমিটি গঠন করেন, যার নাম মজলিসে শূরা। উক্ত মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যদের নাম ও পদবি নিম্ন রূপ ঃ

(১) মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ = আমীরুল মুমিনীন।

(২) হাজী মুহাম্মদ হাসান = কান্দাহারের প্রধান নির্বাহী।

(৩) মোল্লা আঃ রাজ্জাক = তালেবান সামরিক বিষয়ক প্রধান

(৪) উজবেক নেতা মৌলভী গিয়াসউদ্দীন = ফারিয়াযের নেতা।

(৫) মোল্লা মুহাম্মদ ফাযিল = তালেবান নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান।

(৬) মোল্লা মুহাম্মদ গাউছ = পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান।

মজলিসে শূরা গঠন করে তাঁরা আফগানিস্তানকে হুকুমতে ইসলামিয়া ঘোষণা করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথে কাবুল থেকে দশ লাখ মানুষের মধ্যে আড়াই লাখেরও অধিক বারহী ফাসিক, মুনাফিক ও বেদ্বীন ইসলামের পুণ্যভূমি আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়।

তালেবানরা ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে মুসলমানরা নামায প্রতিষ্ঠা করেন। বেহায়াপনা ও বেপর্দা উৎখাত করে নারীদের জন্য শরয়ী পর্দা চালু করেন। জিনা-ব্যাভিচারের রাজপথ সহশিক্ষা, সিনেমা ও টি. ভি. বন্ধ করে নারী নির্যাতনের দ্বার বন্ধ করে দেন। ফলে জিনা-ব্যাভিচার বন্ধ হয়ে যায়। চাকরিজীবী নারীদেরকে আলাদা কার্যক্ষেত্র তৈরির পূর্ব পর্যন্ত ছুটি দিয়ে বেতন-ভাতা চালু রাখেন। চুরির হাত কাটা, ডাকাতির মৃত্যুদন্ড, ব্যাভিচারের পাথর নিক্ষেপে হত্যা, মিথ্যার বেত্রাঘাত, সুদ-ঘুষের শাস্তিসহ পূর্ণ কুরআনের শাসন জারী করা হয়।

১৫ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী জালিম নজিবুল্লাহ সরকারকে জাতি সংঘের আশ্রয় শিবিরে মেহমানের মত আরাম-আয়েশে রাখা হয়েছিল। বুরহানউদ্দীন ও হেকমতিয়াররা এবং জাতিসংঘ ডঃ নজিবুল্লাহর বিচার না করে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছিল। চিত্ত-বিনোদনের জন্য তার রুমে টি. ভি. ভিসিয়ার চলত রীতিমত। যোগাযোগের জন্য ছিল টেলিফোনের ব্যবস্থা। সাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ছিল বড় বড় ডজন খানেক ডাক্তার। তাঁর দৈনিক খরচ ছিল ১৫ শ ডলার। ক্ষমতা হারানোর পরেও এ খুনি ব্যক্তিটির আরাম-আয়েশের অভাব ছিল না। তালেবান সরকার ক্ষমতায় এসে এ ১৫ লক্ষ নীরিহ মুসলমানের খুনী, হাজার হাজার মা-বোনের

ইজ্জত লুণ্ঠনকারী ডঃ নজিবুল্লাহ্ এবং তাঁর ভাই শাহ্পুর আহমদ জাইফকে কুক্ষাত জাতিসংঘের আশ্রয় শিবির থেকে টেনে এনে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে আরিয়ানা স্কোয়ারের ট্রাফিক লাইট পোস্টের সাথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। দর্শকদের দেখার সুবিধার্থে তিন-চার দিন পর্যন্ত লাশটি ওখানেই ঝুলিয়ে রাখা হয়। ডঃ নজিবুল্লাহ্র মৃত্যুদণ্ড হওয়ায় আফগান জনগণের অন্তরে খুশীর তুফান বইতে ছিল। ডঃ নজিবুল্লাহ্র ফাঁসিতে মৃত্যু দৃশ্য দেখে অনেক বদমাইশ হিদায়াত পেয়েছিল। অপরাধ বন্ধ হয়ে গেল।

তালেবান সরকার ৪৫ দিনের মধ্যে দাড়ি রাখার হুকুম জারী করেন। গান, বাজনা, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষসহ হাজারো অন্যায়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে ১৪ শত বছর পূর্বের মদীনার মত একটি সুন্দর নিরাপদ রাষ্ট্র কায়েম করেন। পৃথিবীর মানুষ অপলক নেত্রে আফগানিস্তানের শান্তিধারা অবলোকন করছিল। ইসলাম যখন রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সামরিক শাসনের যাঁতাকলে আর্তনাদ করতে করতে সারা দুনিয়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন ইসলাম তালেবানদের রক্ত সাগর সাঁতরিয়ে আফগানিস্তানে পুনঃপ্রবেশ করে। পবিত্র মক্কা-মদীনা থেকে শাইখ নামক শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারে অসহায় মুমিনরা আফগানিস্তানে হিজরত করে। পশ্চিমাদের পদলেহী গোলাম, ইহুদ-নাসারাদের দোসর, সৌদীর শাইখরা আমেরিকার পরামর্শ নিয়ে ইসলামকে মক্কা মদীনা থেকেও তাড়িয়ে দেয়।

ইসলাম আফগানিস্তানে হিজরত করে আফগানের পর্বতমালার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার মাজলুমানের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। দেখছিল ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, আরাকান, চেচনিয়া, বসনিয়া-হারজে গোভিনা, সোমালিয়া , জিংজিয়াং, তুরস্ক, পূর্ব তিমুর ও মিন্দানাওয়ের মুসলিম হত্যার দৃশ্যাবলি। এ সব দেশে অকাতরে মুসলমানরা জবাই হচ্ছে, নারীরা ইজ্জত হারাচ্ছে, শিশু-বৃদ্ধরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। হায়, জাতিসংঘ। সে একটি বারও তাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিম, মুনাফিক ও জালেম শাসকরা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। ওরা আমেরিকার গোলামিতে তুষ্ট। সন্ত্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে জাতিসংঘও একবার মুখ খুলল না। তাদের বয়কট করল না। ঠিক এমনি মুহূর্তে সারা বিশ্বের মুসলমানদের নেতা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে মুখ খুললেন। এদের উদ্ধার ব্যবস্থার কথা ভাবছিলেন। তখন নুয়ে পড়া ইসলাম মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল পৃথিবীর

দিকে দিকে। বিজয়ের নিশান নিয়ে আল্লাহর সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবীর দিক-দিগন্তে। তারা জুলম-অত্যাচারের মোকাবেলা করতে গিয়ে বুলেটের জবাব দিচ্ছিল বুলেট দিয়ে। ইসলামের এমন জাগরণ দেখে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের কুফরী শক্তি, ইহুদী নাসারা, পৌত্তলিক ও নাস্তিকরা চিৎকার আরম্ভ করে দিল বিশ্ব জুড়ে। প্রচার মাধ্যমও তাদের হাতে। তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মিডিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করল। মিথ্যা-বানোয়াট, উদ্ভট সংবাদ প্রচার করে বিশ্বের দরবারে আফগানিস্তানের বদনাম রটাতে লাগল। মানবাধিকার লংঘনের ভূয়া সংবাদ প্রচার করতে লাগল। যত মিথ্যা প্রচার করতে লাগল তত তালেবানদের ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়ে পৃথিবীর অন্ধকার অঞ্চলেও আলোক ছড়াচ্ছিল। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যার মুখোশ উম্মোচিত হতে লাগল। যতই দিন যেতে লাগল, ততই মুসলিম দেশগুলোর মানুষ তালেবানদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল।

এদিকে আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেনসহ আরো কয়েকটি কুফরী দেশের সাংবাদিক, কলামিস্ট ও এন. জি. ও. সংস্থাগুলো, যারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের ভিতরে কাজ করত, এদের মধ্যে সাংবাদিক, কলামিষ্ট এন. জি. ও.র নারী-পুরুষ অফিসাররা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। মুখে দাঁড়ী, গায়ে ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে তালেবানদের রাষ্ট্র পরিচালনার সুন্দর নমুনা প্রকাশ করতে লাগল। এতে আমেরিকার মিথ্যাচারের নেকাব খুলে দানবীয় চেহারা প্রকাশ পেল।

তালেবান সরকার, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ যখন বামিরানের মূর্তী ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেন, সাথে সাথে দাবানলের মত এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরোহিত পুরাকীর্তীবাদী, মানবাধিকার কর্মীরা মূর্তি রক্ষার ছুতোয় ছুটে আসেন আফগানিস্তানে। এমন কি একটি মুসলিম দেশ থেকে উলামায়ে কিরামের একটি জামায়াতও গিয়েছিলেন। মূর্তি ভাঙ্গা থেকে তালেবানকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। উলামায়ে কিরামের পরামর্শ ছিল, হাজার বছর পূর্বের মূর্তিগুলো যদি ভেঙ্গে ফেলা হয়, তবে বিশ্বব্যাপী একটি হুলুস্থুল পড়ে যাবে। যেহেতু মূর্তিগুলো কেউ পূজা করে না, সেহেতু রেখে দিলে ফেৎনা থেকে বাঁচা যাবে।

বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে আসা নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব পেশ করলেন, "হাজার বছর আগের মহামূল্যবান মূর্তি ধ্বংস না করে যথা স্থানে রেখে দেয়া হোক বা এগুলো একসাথে করে তুলে এনে যাদুঘরে রাখা হোক। তা না হলে মূর্তিগুলো আমাদের নিকট বিক্রি করা হোক। আমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আমাদের দেশে নিয়ে যাব।"

আগত উলামায়ে কিরাম ও মূর্তি পূজারী গোমরা-চোমরাদের সম্মুখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

(১) উলামায়ে কিরামকে বললেন, "হযরত! আপনারা মূর্তি না ভাঙ্গার পক্ষে দুর্বল একটি হাদীস পেশ করুন। আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে উমর! তোমার শাসনামলে তোমার দেশে বড় বড় মূর্তি ছিল এগুলো ভাঙ্গ নি কেন?' তখন আমি যেন এহাদীসের আলোকে জবাব দিতে পারি এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারি।" উক্ত প্রশ্নে উলামায়ে কিরাম নীরব হয়ে গেলেন।

(২) মূর্তি প্রেমিক নেতৃবর্গকে বললেন, "আপনারা মানব রচিত মূল্যহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তী ভাংগার সংবাদ শুনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিমান ভাড়া দিয়ে সময়ের অপচয় করে মূর্তি না ভাঙ্গার প্রস্তাব নিয়ে আসছেন; আপনাদের কর্ণ কুহরে কি প্রবেশ করে না ফিলিস্তীনের অসহায় মানুষের চিৎকার? শোনেন নি কাশ্মির, আরাকান ও বসনিয়ার হাজার হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের আহাজারি। তাকিয়ে দেখুন ইরাক, মিন্দানাও, পূর্বতিমুর আলজিরিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনার রক্তের বন্যা? নিষ্প্রাণ প্রস্তর মূর্তিকে রক্ষার জন্য আপনাদের এত মায়াকান্না। আর বনী আদমের বুকের তাজা খুনে বিশ্ব আজ প্লাবিত, তাদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত। এদের রক্ষার ব্যাপারে আপনারা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলুন।"

(৩) পৃথিবীর প্রাচীনতম বাবরী মসজিদ ইন্ডিয়ার হিন্দুরা পৃথিবীকে জানিয়ে জানিয়ে, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে দীর্ঘ দেড় বছর ধরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কষ্ট দিয়ে দিয়ে শহীদ করেছে। শহীদ করেছে সহস্র মুসলিমকে। এমন একটি তাজা ও পবিত্র মসজিদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে যেখানে রাম মন্দির কায়েম করে এখন মূর্তি পূজা চলছে। তারা পৃথিবীর দেড়শ কোটি মুসলমানের অন্তর ভেঙ্গেছে, এর বিহিত ব্যবস্থার জন্য আপনারা কি মিস্টার আদভানীর কাছে গিয়েছেন? তাকে কি আপনার মসজিদ না ভাঙ্গার পরামর্শ দিয়েছেন?

নেতাজীরা মুখ থুবড়ে বসে রইলেন। তাদের মুখ থেকে কোন বাক্য বের হল না।

(৪) তিনি আরো বললেন, "আমরা মূর্তি সংহারকারী বংশের সন্তান। আমরা আযরের মত মূর্তির ব্যাপারী নই যে, মূর্তি বিক্রি করে উপার্জন করব। আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান। আমরা ৩৬০ টি মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত। এই বলে উপস্থিত সকলের সম্মুখেই রকেট লাঞ্চারের

আঘাতে বিশালাকারের মূর্তিগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। মূর্তি রক্ষাকারীরা মলিন মুখে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল।

তালেবান পবিত্র কুরআন হাদীসের বাইরে নিজেদের কোন মত বা আদর্শকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যবহার করেন নি। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় আমেরিকা বহু অস্ত্র মুজাহিদদেরকে এ জন্যই দিয়েছিল, বিশ্বে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি রাশিয়া ধ্বংস হয়ে যাক। আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হোক। তালেবানরা ক্ষমতায় এসে বলল, "আমেরিকা আমাদের প্রভু নয়।" তারা বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করল, "আমাদের রব আল্লাহ, আমাদের পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা (সা), আমাদের সংবিধান পবিত্র কুরআন, আমাদের আদর্শ সাহাবায়ে কিরাম।" এতে আমেরিকার স্বপ্নসৌধ ধুলোয় মেশে গেল। অনেকে মনে করত যে, আমেরিকার সাহায্যে আফগানিস্তান রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আসলে এ ধারণাটা সম্পূর্ণই অমূলক বরং আমেরিকা আফগানিস্তানে অস্ত্র বিক্রি করে মোটা অংকের টাকা কামাই করে নিয়েছে এবং রাশিয়ার পতনের মধ্য দিয়ে আমেরিকা একমাত্র সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে। আমেরিকা এ সব কিছু মিলিয়ে গুণ করে করে দেখল, লাভের চেয়ে ক্ষতিই তার বেশি হয়ে গেল। তালেবানরা তাকে প্রভু হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্য দিকে তারা গণতন্ত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দাফন করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছে। যখন দেখল আমেরিকার হুমকি-ধমকি আর আস্ফালনকে তালেবানরা মোটেই ভয় করে না। তখন তারা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে শাইখ উসামা বিন লাদেনকে ১১ই সেপ্টেম্বরের টু-ইন টাওয়ারে কিয়ামত বয়ে যাওয়ার মিথ্যা দোষ চাপিয়ে তাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব পেশ করে। মোল্লা মুহাম্মদ উমর আমেরিকাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, টু-ইন টাওয়ার পেন্টাগন যদি উসামা বিন লাদেন ধ্বংস করে থাকেন তবে তার প্রমাণাদি পেশ করুন। আমরা শরয়ী আদালতে তার উপযুক্ত বিচার করব। আমেরিকা প্রমাণ পেশ করতে বার বার ব্যর্থ হল। আমেরিকা একতরফাভাবে চাপের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করার জন্য।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর চিন্তা করে দেখলেন, দেশের মানুষের জান, মাল ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। তিনি দেখলেন, মিথ্যা অজুহাত চাপিয়ে তার একজন সম্মানিত মেহমানকে বিচারের জন্য আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া শরীয়ত সমর্থন করে না। এমনকি আফগান জনগণের পক্ষ থেকেও আমেরিকাকে জানিয়ে দেয়া হল, "উসামা বিন লাদেন তো

দূরের কথা তোমরা যদি বল, ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের একটি কুকুরও তোমাদের হাতে অর্পণ করতে। তাও আফগানের জনগণ রাজী হবে না।"

এ সবের পর শাস্তির দাবী দেখিয়ে অন্যায়ভাবে এক তরফাভাবে আফগানিস্তানের ওপর অবরোধ চাপিয়ে দিল। এতে বহির্বিশ্বের সাথে স্থল পথ, জল পথ ও আকাশ-পথের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। যার ফলে ঔষধ ও খাদ্যের অভাবে আফগানিস্তানের অনেক মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অবরোধের পরও মোল্লা উমর মাথানত করেন নি বরং ঘোষণা দিলেন, "আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর যমিন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন তবু বাতিলের নিকট মাথানত করব না।" আবারও আমেরিকা নিরাশ হল।

তারপর পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফ নামক প্রাণীটিকে ও আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে হাত করে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সরাসরি যুদ্ধে নেমে গেল। তালেবানরা হাজার হাজার পদাতিক বাহিনী, মেরিন সৈন্য ও কমান্ডোকে হত্যা করতে লাগল। এতে কয়েক হাজার সৈন্য প্রাণ হারাল। সর্বশেষ নিরুপায় হয়ে হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্পেট বোমা ফেলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, খাদ্য গুদাম তেলের ডিপো, ঔষধ কারখানা ও আবাসিক এলাকায় বোমভিং করে হাজার হাজার মানুষ মারতে লাগল।

তালেবানরা নিজ নিজ এলাকায় অটল-অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে জালিমদের মোকাবেলা করতে লাগলেন। আমীরুল মুমিনীন, মোল্লা মুহাম্মদ উমর এ ধ্বংসলীলা সইতে পারলেন না। তাই মন্ত্রীবর্গ ডেকে পরামর্শ করলেন। তিনি সে রাতে স্বপ্নে দেখেন উম্মতের কান্ডারী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে। তিনি বলছেন, "হে উমর! তুমি পিছনে অবস্থান নাও। বিজয় তোমারই হবে।" পরপর কয়েকবার এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি বিভিন্ন ফ্রন্ট লাইন থেকে মুজাহিদদেরকে কান্দাহার ডেকে আনলেন। তালেবানরা শহরগুলোকে তালেবান সমর্থিত লোকদের হাতে তুলে দিয়ে পেছনে অবস্থান নিলেন। তারা তাদের অস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে হিফাজত করলেন। কোন তালেবান আত্মসমর্পণ করল না। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের যেসব সৈন্য আগে তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছিল একমাত্র তারাই যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল।

আমীরুল মুমিনীন তালেবানদেরকে ডেকে কিছু সংখ্যককে তাঁর সাথে থাকতে বলে অন্যদেরকে বলে দিলেন, “তোমরা গ্রাম-গঞ্জে নিজ-নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড় এবং পোষাক পাল্টিয়ে কারযাই পুতুল সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা কর। তালেবানরা তাই করল। তালেবানরা সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি দিলে আমেরিকার বোমাবাজী বন্ধ হল। হাজার হাজার তালেবান কারযাইর সেনা বাহিনীতে ঢুকে পড়ল। আমেরিকা ও রাশিয়া এদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিতে লাগল। এরা তাদের সামরিক প্রযুক্তি আয়ত্ত্ব করতে লাগল। ২০০২ সালের পবিত্র হজ্জ পালনের পরে তালেবানরা আবার অস্ত্র তুলে নিল এবং প্রতিদিন আমেরিকান ফৌজের ছাউনিতে, গাড়ী বহরে আক্রমণ আরম্ভ করল। আমেরিকা এখন বর্তমানে বুঝতে চেষ্টা করছে, গাড়ী বহর কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তা তালেবানরা কি করে জানে? কারজায়ীর নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই তালেবান রয়েছে। তার মাথায় হাত দিয়ে বলছে, হায়! তবে এত দিন কি আমরা তালেবানদেরকেই উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়েছি?

আমেরিকা এখন এসব কিছু বুঝতে পেরে ইরাক যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সৈন্যদের নিয়ে যেতে চাচ্ছে। মিস্টার কারজাই হাতে পায়ে ধরে ওদেরকে রাখছে। দিন যতই যাচ্ছে, আমেরিকান সৈন্য ততই হ্রাস পাচ্ছে।একদিন আমেরিকা দুনিয়ার মানচিত্র থেকে মুছে যাবে, তালেবানরা আবার আফগানিস্তান ফিরে পাবে।

[এক]

কয়েকটি বালক-বালিকা মহোল্লাসে খেলা-ধূলা করছে বিশাল চারণ ভূমিতে, হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে। চারণভূমিতে বিচরণ করেছে অসংখ্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। অপেক্ষাকৃত একটু দূরে চরে বেড়াচ্ছে কিছু ঘোড়া-গাধা ও খচ্চর। নিকটেই এক বৃদ্ধ খর্জুর বীথিকার ছায়ায় বসে তীরের ফলা নির্মাণ করছেন। বয়স ষাট এর কোটায়। নাম সুলাইমান। জাতিতে পাঠান, মাথায় ঝাঁকড়া বাবরী। কাল কাপড়ের ইয়া বড় পাগড়ী। গায়ে ও পরণে দু'টি চাদর। বলিষ্ঠ দেহ। মুখে বুক স্পর্শ দাড়ী। বাহুযুগল খুব মজবুত। চেহারায় একটি বাহাদুরীর ছাপ প্রস্ফুটিত। বার্ধক্যজনিত কারণে ললাটে ঈষৎ ভাঁজ পড়েছে। প্রচণ্ড গরমে বৃদ্ধের ললাট থেকে মুক্তোর দানার মত ঘাম টপ-টপ করে ঝরছে।

বালক-বালিকাদের মধ্যে খেলা সংক্রান্ত কোন ঝগড়া বেঁধে গেলে তারা দৌড়ে বৃদ্ধের নিকট ছুটে আসে। বৃদ্ধ ইনসাফের সাথে মিমাংসা করে দেন। পরিশ্রান্ত বালক-বালিকার ক্ষুদ্র একটি অংশ খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত বালক-বালিকাদের দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে খেলা দেখছে। আর কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে দূরে চলে যাওয়া পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিকটতম চারণভূমিতে নিয়ে আসছে। ওরা রাখালের কাজগুলো পালাক্রমেই করে যাচ্ছে। কেউ অলসতা করলে বুড়ো তাম্বি করছেন। ছেলেদের খেলার নাম মল্লযুদ্ধ, কাবাডি, গোল্লাছুট, নিশানাবাজি ও দৌড়। মেয়েদের খেলার নাম লুকোচুরী, দৌড়, নিশানাবাজি, শিলুককাটা, দড়ির নাচন ইত্যাদি। বয়স এদের অনুর্ধ দশ বছর। ৫ থেকে দশের মধ্যে হওয়াটাই সঠিক। কারণ, দশের অধিক বয়সীরা পিতামাতাকে কাজে সহায়তা করে। এদের মধ্যে দু-জন বালক-বালিকা বয়সে খুব কম। বয়সে কম হলেও তারা বড়দের সাথে টক্কর দেয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বড়রাও ছোটদের কাছে হার মানে। বুড়ো কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খেলা দেখছেন। মাঝে মধ্যে দু-একজনকে খেতাব করে দূরে চলে যাওয়া মেষপালকে তাড়িয়ে নিকটে আনার জন্য হুকুম করছেন। খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে গেলে ওদেরকে ডেকে এনে খেজুরতলায় বিশ্রাম নিতে বলেন। আর অবকাশ নেয়া ছেলে-মেয়েদের খেলার জন্য নির্দেশ করেন। তিনি যেন রাখালের বন্ধু, রাখাল রাজা বা চারণভূমির শাসক।

সব রাখালই তাকে মান্য করে। মাঝে মধ্যে বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে শোনান পুরনো দিনের যুদ্ধের কাহিনী, শোনান মুসলমানদের হারানো দিনের ইতিহাস ও বীরত্বের ঘটনাবলি। বালক-বালিকারাও বার বারই শুনতে চায়। সবাই তাকে দাদা ভাই বলে ডাকে।

খেলার এক পর্যায়ে সাত আট বছরের একটি বালক দৌড়ে এসে বুড়ো সুলাইমানের নিকট বলল, "দাদা ভাই! দাদা ভাই! রফিক আমাকে মেরেছে।" বুড়ো কর্মব্যস্ততার দরুন বালকের অভিযোগের কোন জবাব দিলেন না। এতে সহখেলোয়াড়রা খিলখিল করে হেসে উঠল। ছেলেটি অভিমান ও রাগান্বিত হয়ে বুড়োর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বালক-বালিকারা তার দিকে আর একবার তাকিয়ে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। বালকটি অভিমান সামলাতে না পেরে উচ্চস্বরে কেঁদে ফেলল। বালকটির কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন বুড়ো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, ছেলেটি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে সুধালেন, তোমার কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? বালকটি বলল, "রফিক বড্ড দুষ্টু ও আমাকে মেরেছে।" অন্যেরা আবার হেসে উঠল।

বুড়ো বলল, 'তোমার নামটা কি, খোকা?' বালকটি উত্তর দিল, 'সুফিয়ান।' বৃদ্ধ আবার বললেন, 'তোমার পিতার নাম কি?' আলীবর্দী বলল, 'সৃফিয়ান।' বৃদ্ধ বললেন, 'ও! তুমি তাহলে আলীবর্দীর বেটা। তোমরা ভাইবোন কয় জন?' 'এক ভাই এক বোন। বোনের নাম সুফিয়া' বলল সুফিয়ান। বাহ বড় সুন্দর নাম বুড়ো মন্তব্য করলেন।

এতক্ষণ সুফিয়ানের চেহারা থেকে অভিমানের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এবার সোহাগ ভরে বুড়ো জানতে চাইলেন, "তোমাকে রফিক কেন মেরেছে?" 'ও খুব শয়তান। প্রায়ই আমাকে মারে' বলল সুফিয়ান। এবারও বালক-বালিকারা শব্দ করে হেসে উঠল। বুড়ো মৃদু ধমক দিয়ে খেলোয়াড়দেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এর কথায় অমন করে হাসছ কেন?" ছোট্ট একটি বালিকা দুকদম সামনে এগিয়ে এসে বুড়োকে বলল, "দাদা ভাই! ভাইয়া বড্ড দুষ্টু ও মিথ্যা কথায় পটু। ভাইয়া নিজেই রফিক ভাইকে মেরেছে। সে বিচার দিবে মনে করে আগেই এসে আপনার নিকট বিচার দায়ের করছে।" "তুমি ওদের মারামারি দেখেছ?" বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন। বালিকা বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। আমি ওদের পার্শ্বেই ছিলাম।" সে দৌড় প্রতিযোতিগায় কয়েক বার পরাজিত হওয়ার পর আমরা সবাই মিলে হাততালি দিয়ে হাসছিলাম। তা সইতে না পেরে রফিক ভাইয়ার পেছন থেকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে শক্ত মাটির ওপর ফেলে দিয়ে একদৌড়ে আপনার নিকট চলে এসেছে। ও কিন্তু মিথ্যুক।" বুড়ো একবার সকলের প্রতি চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরাও কি দেখেছ?" সকলেই এক বাক্যে বলল, "হ্যাঁ। সুফিয়া যা বলেছে সবই সত্য।"

বুড়ো বালিকার দিকে চেয়ে বলল, "তোমার নাম সুফিয়া?" সুফিয়া বলল, "হ্যাঁ। আমি সুফিয়া বিনতে আলীবর্দী।" "তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছ?" বললেন বুড়ো। "দেব না? ও যা করে তা গোপন রাখব কেন? ভাইয়া শুধু খেলার মাঠে সাথীদের সাথে ঝগড়া করে তা নয়। আম্মু-আব্বুর সাথেও অন্যায় করে এবং মিথ্যা বলে। অন্যায় ঢাকার চেষ্টা করে। মক্তবে উস্তাদজী ভাইকে প্রতিদিন শাসন করেন, তবু ওর লজ্জা হয় না।" মেয়েটির কথা বলার ঢং ও সত্যবাদিতার পরিচয় পেয়ে সুলাইমান খুব খুশী হলেন। সুফিয়ান সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে রাগে গড়গড় করছিল। তাহলে সত্যিই তুমি অপরাধী, বললেন সুলাইমান। তারপর শাস্তি হিসেবে দশ বার বুক ডাউন লাগানোর হুকুম দিলেন।

সুফিয়ান মুখ ভার করে হুকুম তামিল করে সোজা চলে গেল মেষপালের দিকে চারণভূমিতে। অন্য সব বালক-বালিকারা পুণরায় খেলায় লিপ্ত হল। সুফিয়া তার মেষপালকে দূর থেকে তাড়িয়ে এনে একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগল। সঙ্গে তার সমবয়স্কা রফিকা, ছাদিকা, আতিকা ও মাহমুদা। পরাজিত সুফিয়ান পেছন দিক থেকে এসে সুফিয়ার গণ্ডদেশে চটাচট কয়েক ঘা মেরে বিড়বিড় করে কি যেন বকতে বকতে চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

রফিকার সাথে সুফিয়ার গলায় গলায় মিল। সুফিয়ার চোখে অশ্রু দেখে রফিকা ও মাহমুদার চোখেও অশ্রু টলমল করছিল। আতিকা সুফিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "আয়। দাদা ভাইয়ার কাছে বিচার দিই গিয়ে। চল জলদি চল, দুষ্টুটা কিন্তু পালিয়ে যাবে।" অন্যরাও দাদুর কাছে অভিযোগ করার জন্য তাকিদ করছিল। সুফিয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ভাইয়া তো আমাকে নিত্যই মারে। আম্মু-আব্বু, উস্তাদজী কতই না বিচার করেছেন কিন্তু একটু পরিবর্তন হয় নি।" ছাদিকা বলে উঠল, "ছেলেরা খুবই নিষ্ঠুর। তাদের অন্তরে একটুও দয়া নেই।" সুফিয়া আঁখিযুগলের অশ্রু মুছতে মুছতে বলল, "আমি ওর ছোট বোন। বোন হয়ে বড় ভাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়া কিছুতেই সমীচিন মনে করি না। আমি ওর জ্বালা–যন্ত্রণা ও বকুনী বরদাশত করে যাব।"

রফিক বুঝতে পেরেছিল, আজ সুফিয়ার পিঠে কিছু না কিছু পড়বে সুফিয়ানের পক্ষ থেকে। রফিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সুফিয়াকে ঘিরে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়ানো। কিছু হয়েছে বুঝতে পেরে রফিক দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে সুফিয়া? তোমাকে সুফিয়ান মেরেছে?" সুফিয়া লজ্জায় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে নতশিরে দন্ডায়মান। মাহমুদা উত্তর দিল, "হ্যাঁ ওর ভাইয়া ওকে মেরেছে।" রফিকও সুফিয়ার হাত ধরে টানাটানি করল এবং বলল, "চল দাদা ভাইয়ার কাছে নালিশ করি, তিনি তার বিচার করে দিবেন।" সুফিয়া অনড়। রফিক সুফিয়ার মনোভাব বুঝতে পেরে খেলায় লিপ্ত হল। এতক্ষণে সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। পাখপাখালিরা কিচির মিচির করে বন-জঙ্গল ও ঝোঁপঝাড়ে

আশ্রয় নিচ্ছে। একটু পরেই কিরণমালা অস্তপারে হারিয়ে যাবে। আর আধাঁরে ছেয়ে যাবে চারিদিক। সুলাইমান বালক-বালিকাদের নিজ নিজ মেষপাল নিয়ে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিলেন। বালক-বালিকারা যার যার মেষগুলো নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। সারি সারি পশুপালগুলো চলছে আপন আপন পথ ধরে।

সুফিয়ান পাহাড়ের দিকে গা ঢাকা দিয়েছে অনেকক্ষণ। সুফিয়া ভাইকে খুঁজতে গিয়ে পাহাড়ের ছোট ছোট টিলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছে। "সুফিয়ান ভাইয়া, -------------সুফিয়ান ভাইয়া! সবাই বাড়িতে চলে যাচ্ছে তুমি আস, আব্বুর কাছে বিচার দেব না। ফিরে আস। অনেক ডাকাডাকির পরও তার কোন সন্ধান না পেয়ে কাঁদো কাঁদো মন নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।" সবগুলো ছাগল-মেষ একা একা তাড়িয়ে নেয়া সুফিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া কয়েকটি ছাগল ও মেষ হারিয়ে গেছে। কার পালের সাথে মিশে কার খোয়াড়ে উঠেছে তা কে জানে?

সুফিয়াকে কাঁদতে দেখে রফিক এগিয়ে গেল এবং কান্নার কারণ জানতে চাইল। সুফিয়া কোন মতে কান্না সামলিয়ে নিয়ে বলল, "সুফিয়ান ভাইয়াকে খোঁজাখোঁজি করেও পাচ্ছি না, একা একা সব পশু তাড়িয়ে নেওয়া সম্ভবও নয়। এক একটা একেক দিকে ছুটছে। তাছাড়া পাঁচ-সাতটি পশু কার পালের সাথে গিয়েছে তাও জানি না।

রফিক সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সুফিয়া, তুই কাঁদিস না, আমি তোর সাথে মেষগুলো তোদের খোয়াড়ে নিয়ে দিয়ে আসব।" এই বলে নিজের পশুগুলো রফিকা ও আতিকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আর সুফিয়ার মেষপাল নিয়ে খোয়াড়ে তুলে দিল। তারপর সুফিয়াকে নিয়ে হারানো পশুগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালাশ করে বের করল। চারিদিকে অন্ধকার, রাতও গভীর। সুফিয়ান না আসাতে সুফিয়া বাড়ির বাইরে কেঁদে কেঁদে খুঁজছে। সুফিয়ান কোন ফাঁকে কখন জানি ওর ঘরে এসে শুয়ে আছে তা কেউ টেরও পায় নি। সুফিয়ানের আম্মা গুলজান ঘরে গিয়ে দেখেন, সুফিয়ান জায়গা মতো শুয়ে আছে। গুলজান একটু শাসিয়ে বললেন, পড়ার সময় কি এখনো হয় নি? চোরের মত এসে শুয়ে রইলি? এক্ষুণি ওঠে পড়তে বস, না হয় হাড় থাকবে না। মায়ের বকুনিতে সে ওঠে পড়তে বসল।

সুফিয়াও বই-খাতা নিয়ে ভাইয়ের রুমে গিয়ে পড়তে বসল। সুফিয়া ভাই-এর দিকে বই বাড়িয়ে দিয়ে ছবক জিজ্ঞাসা করলে সে কোন উত্তর দেয় নি। সুফিয়া নিজে নিজেই বানান করে আগামী দিনের ছবক ইয়াদ করল। কিন্তু সুফিয়ান ঘাড় ফুলিয়ে বসে রইল, একটি অক্ষরও পড়ল না। সুফিয়া নরমভাবে বলল, "ভাইয়া! তুমি যে তোমার পাঠ তৈরি কর নি কালতো উস্তাদজী তোমাকে মারবেন।" একথা বলার সাথে সাথে আবার চড়-থাপ্পড় পড়তে লাগল সুফিয়ার নাকে মুখে। এবারও ভাইয়ের খাতিরে কিছু না বলে অসহায়িনীর মত ছবর করে নিল।

রফিক, রফিকা ও আরিফ ওরা তিন ভাই-বোন। পিতা রামাল্লা মহল্লার সর্দার। নাম মোল্লা ইয়ার আফগানী। তিনি মোল্লাজী বলেই সবার কাছে পরিচিত। মোল্লা ইয়ার আফগানীর পূর্বপুরুষ ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সালেহ বিন আবদুল্লাহ ছিলেন হাজ্জাজ–বিন ইউসুফের নিয়মিত সৈনিক । সালেহ বিন আবদুল্লাহ মুহাম্মদ–বিন কাসিমের অধীনে ভারত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ বিজয় শেষে তিনি স্থায়ীভাবে আফগানিস্তানে বসবাস করতে লাগলেন। এই বংশেরই অধঃস্তন সন্তান মোল্লা আফগানী । এই বংশের ৪০ জন বীর পুরুষ বিভিন্ন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ বংশের নারী–পুরুষ সবাই অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। সবাই মুজাহিদ ও বীর পুরুষ। অন্যায়ের মোকাবেলায় এরা আপোষহীন। দেশজুড়ে এদের সুনাম–সুখ্যাতি রয়েছে। কালের পরিবর্তনে এখন আর তাদেরও তেমন সহায়-সম্পদ নেই। নেই সেই পূর্বের জাঁকজমক। আগের তুলনায় অনেকটা গরীব হলেও রয়েছে আত্ম-সম্মান এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ। শিক্ষা-দীক্ষা, আচারানুষ্ঠান, পরহেজগারী ও খোদাভীরুতার দিকে এদের অনেক খেয়াল এবং উচ্চ দৃষ্টি রয়েছে। অন্যায় করে না এবং অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেয় না, এটাই এ বংশের গৌরব। জায়গীরদারী না থাকলেও সমাজের বিচারাচার তাঁকেই করতে হয়। মোল্লা ইয়ার আফগানীকে মহল্লা শাসন করার জন্য জননেতা নির্বাচন করেন এলাকার জনগণ। প্রায় একযুগ ধরে তিনি ন্যায়–নিষ্ঠার সাথে সমাজ পরিচালনা করে আসছেন।

সুফিয়ান ও সুফিয়ার পিতা আলীবর্দী (রুস্তম) ও মাতার নাম গুলজান। জাতিতে পাঠান, সবাই রুস্তম নামেই ডাকে। আলীবর্দী লেখা-পড়া তেমন না জানলেও জরুরী মাসআলা–মাসায়েল তাঁর মুখস্থ। কাফিয়া, শরহেযামী পর্যন্ত কিতাবাদি খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। ছোটবেলায়ই আলীবর্দী পিতা–মাতার অভিভাবকত্ব ও আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হন। সে কারণে লেখাপড়ায় বেশি দূর এগুতে পারলেন না। যৌবনে তিনি বলিষ্ঠ শক্তিমান ও সুপুরুষ ছিলেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য।

কথিত আছে, ভিনদেশী মিশনারী এন. জি. ওরা আফগানিস্তানে এসে সেবার নামে খ্রিস্টধর্মের তাবলীগ করতে আরম্ভ করলে সীমান্ত এলাকার উপজাতি ও গরীব-দুঃখী মুসলমানদের মধ্যে ওরা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এতে বেশ কিছু নারী-পুরুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এ সংবাদে আলীবর্দীর অন্তর চরমভাবে আহত হয়। তাদের হটকারিতা ও তৎপরতা বন্ধের জন্য তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে খঞ্জর হাতে নগ্ন পায়ে ছুটে চললেন এন. জি. ও. অফিসে। সেখানে গিয়ে বিদেশী লাল চামড়ার শয়তানদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে জবাই করেন। ৭টি অফিস থেকে একরাত্রে জবাই করেন ১৮ জনকে। সে থেকেই তাঁকে সবাই রুস্তম উপাধি দান করেন।

[দুই]

ছুবাহী মক্তবে বালক-বালিকাদের মধ্যে হাজিরা খাতায় যে কয়েকটি নাম সাবার আগে স্থান দখল করে নিয়েছে পর্যায়ক্রমে তাদের নাম হল সুফিয়া, রফিক, সুফিয়ান, রফিকা, আরিফ, আতিকা, রহিমা ও মাহমুদা। স্কুলজীবনেও এ কয় জনের মধ্যে চলত প্রতিযোগিতা। কার আগে কে যাবে। উস্তাদ ও মুরুব্বীদের দোয়া ও ভালবাসা এ কয়জনই নিয়েছে ভাগাভাগী করে। তবে এদের মধ্যে সুফিয়ানই ছিল একটু ব্যতিক্রম। সুফিয়ানের মেধা ভাল হলেও তার আচার-ব্যবহার ও রুক্ষ স্বভাবের জন্য অনেকেই তাকে দেখতে পারত না। সে ছিল শয়তানিতে পণ্ডিত। তাই সবাই তাকে ডাকত ব্রিটিশ বলে। ব্রিটিশ বললে সবাই তাকেই বুঝত।

প্রতিদিন পড়ন্ত বিকালে পল্লীর বালক–বালিকারা হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে খেলাধুলা করত ও মেষ চরাত। আবার মাঝে মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত পাখী শিকারের। খেজুর পাকার মৌসুমে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী উড়ে আসত দূর দূরান্ত থেকে। সে সময় শিকারীদের ব্যস্ততা থাকত অনেক বেশি। বালকদের মধ্যে রফিক ও আরিফ ছিল পাক্কা শিকারী। তাদের সামনে দিয়ে কোন পাখী প্রাণ নিয়ে ওড়ে যেতে পারত না। ওদের নিশানা ছিল অব্যর্থ। সুফিয়ান থাকত আড়ালে আড়ালে। অনেক সময় ওদের তীরের আঘাতে দূরে গিয়ে পতিত পাখী সে সুযোগ বুঝে ধরে নিয়ে যেত। নিজে একটিও শিকার করতে পারত না। ভাল শিকারী হিসেবে আরিফ ও রফিকের নাম গ্রামব্যাপী প্রসিদ্ধ। সুফিয়ান সব সময়ই থাকত দুষ্টুমীর তালে। যখন যেখানে সুযোগ পেত সেখানেই দুষ্টুমীর হাত প্রসারিত করত। গালি-গালাজ ছিল তার মুখের কবিতা। ছোট-বড় নির্বিচারে সকলের ক্ষেত্রেই তার গালি-গালাজ চলত সমান তালে। তার মন ও অন্তর খুবই নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল।

দুপুরের খাঁ খাঁ রৌদ্র। চারিদিকে যেন আগুনের লেলিহান শিখা। পথিকশূন্য পথ, চারণভূমিগুলো পশুহীন। পশু-পাখি ও মানুষর জন বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। রাখালেরা মশক ভর্তি পানি নিয়ে নিজ নিজ পশুদের পান করাতে ব্যস্ত। কূপ ও ঝর্ণার ধারে ভীড়। ধাক্কা-ধাক্কি, ঠেলা-ঠেলি। যার গায়ে বেশি বল সে-ই কেবল পানি তুলে আনতে পারছে।

সুফিয়ানের পশুগুলোকে পানি পান করানোর জন্য কোন মাথা ব্যথা নেই। সে একটি বৃক্ষের আড়ালে বসে মনের আনন্দে পা ঝুলাচ্ছে। সুফিয়া বয়সে সকলের ছোট, অন্য সব বালিকাদের তুলনায় অনেকটা লাজুক। নিরুপায় হয়ে ছোট মশকটি

হাতে নিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অশ্রু ঝরাচ্ছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ে ভাই সুফিয়ানের নিকট গিয়ে বলল, "ভাইয়া! ঝর্ণায় অনেক ভীড়। আমি তো পানির কাছেও ঘেঁষতে পারছি না। আসুন না, আমাকে একটু সাহায্য করুন। মেষ ও ছাগলগুলো পিপাসায় জিভ বের করে দিচ্ছে। আসুন ভাইয়া একটু পানি তুলে দিন।"

সুফিয়ান নিরুত্তর। সে আস্তে আস্তে বৃক্ষের ডাল থেকে নিচে নেমে চটাস চটাস কয়েকটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিল সুফিয়ার গণ্ডদেশে। সুফিয়া কেঁদে ফেলল। সুফিয়ান আবার গাছের ডালে চড়ে বসল। সুফিয়া সিক্ত আঁখি নিয়ে পূর্বের স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক, আরিফ ও রফিকা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে খর্জুর গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। রফিকার অন্তরে হঠাৎ উদয় হল তার বান্ধবী সুফিয়ার কথা। সে সুফিয়াকে খুঁজতে বের হল। খুঁজতে খুঁজতে সে সুফিয়াকে ঝর্ণার কাছে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পেল, যে কিনা অপেক্ষা করছে কখন ভীড় কমবে এবং তার পশুগুলোকে পানি পান করাবে। রফিকা সুফিয়ার কাছে গিয়ে ওড়নার আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছে দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "আয় বোন, চিন্তা করিস না। রফিক ভাই, আরিফ ও আমি মিলে তোর ছাগলগুলোর জন্য পানি তুলে দিব।" রফিকার আশ্বাসবাণী শুনে সুফিয়ার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠল, যেন কালো মেঘের ফাঁকে সোনালী সূর্যের কিরণ প্রকাশ পেল। সুফিয়াকে হাত ধরে খর্জুর ছায়ায় নিয়ে বলল, "রফিক ভাইয়া! সুফিয়া পশুগুলোকে এখনও পানি পান করাতে পারে নি। সুফিয়ান গাছের ডালে বসে আরামসে পা ঝুলাচ্ছে। চলনা ওর পশুগলোকে পানি পান করিয়ে আসি।" রফিক বলল, "এখন লোকের ভীড় অনেকটা কমে এসেছে, তোমরা এখানে বিশ্রাম নাও, আমি একাই পানি পান করাতে পারব। ওর পশুর সংখ্যা তো আর বেশি নয়।" এ বলে রফিক কয়েকটা মশক নিয়ে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পানি পান করিয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে এল। সুফিয়া বলল, "রফিক ভাইয়া! তুমিতো আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ, তোমার ঋণ পরিশোধ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। দোয়া করি আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার ইহসান কোন দিন ভুলার নয়। সুফিয়ান ভাইয়া কত যে নিষ্ঠুর, তিনি আজও আমাকে মেরেছেন।" সুফিয়ার চোখ আবারও অশ্রুতে ঝলঝল করে ভিজে উঠল। এবার বালক-বালিকারা যার যার থলে থেকে ঘর থেকে নিয়ে আসা খর্জুর, রুটি ও ভুট্টার ছাতু খেতে লাগল।

রফিক ঘুরে ঘুরে এ দৃশ্য দেখছে। যারা খাবার মত কোন কিছু আনতে পারে নি তারা এক আঁজলা পানি পান করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রফিক সকলের কাছ থেকে কিছু পরিমাণে চেয়ে নিয়ে তাদের মাঝে বণ্টন করে দিল। রফিকের এই

কাজ দেখে সুফিয়া আনন্দের সাথে বলে উঠল, "রফিক ভাইয়া রাখালদের রাজা।" রফিকা হাসতে হাসতে সুফিয়াকে তামাসা করে বলে উঠল, "সে শুধু রাখালদের রাজা হবে কেন তোমারও তো!" "হ্যাঁ, তিনি তো আমারও রাজা" বলল সুফিয়া। সুফিয়া মেষ নিয়ে মাঠে আসার সময় তার মা গুলজান ছোট চারটা রুটি সুফিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "ক্ষুধা পেলে দু'জন মিলে এগুলো খেয়ে নিও।" সুফিয়া ভাইকে খুঁজতে গিয়ে দেখে বৃক্ষের নিচে, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে "ও মরেছি মরেছি" বলে চিৎকার করছে। সুফিয়া পাগলিনীর ন্যায় দৌড়ে ভাইয়ের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সুফিয়ান ভাইয়্যা! আপনার কি হয়েছে, অমন করে কাঁদছেন কেন?" সুফিয়ান ডান হাতটি ধরে বলতে লাগল, "পাখির ছানা আছে মনে করে পাখির বাসায় হাত দিয়েছিলাম, অমনি ফোঁস করে একটি সাপ কামড় দিয়েছে।" সুফিয়া বড়দের কাছে শুনেছিল, সাপ দংশন করলে ক্ষত স্থানের ওপর রশি বা অন্য কিছু দিয়ে খুব মজবুত করে বাঁধতে হয়। তাই খুব তাড়াতাড়ি নিজের ওড়না ছিঁড়ে তার কনুইয়ের উপরে মজবুত করে বাঁধল। ততক্ষণে সুফিয়ানের চিৎকারে অনেকেই এদিকে ছুটে এসেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুফিয়ান অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

সুফিয়ানের সাপে কাটার সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে। ছুটে আসল সকলে। কয়েকটি বস্তির পরে ছিল একজন নামকরা ওঝার বাড়ি। সেখানে সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে ওঝাও চলে আসলেন। নাম রজব আলী ওঝা। তিনি এসে সঙ্গে সঙ্গে তদবির করতে শুরু করলেন। বেশ কতক্ষণ ঝাড় ফুঁক দেয়ার পর বিষ নিচে নেমে আসল। তারপর হাত ও পা কেটে বিষ বের করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুফিয়ানের জ্ঞান ফিরে এল। সুফিয়ান চোখ খুলে দেখল, তার চারদিকে লোকের ভীড় এবং সুফিয়া তার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে ও কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। তারপর সুফিয়ান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে বসল। এবার সকলে যার যার কাজে চলে গেল।

আলীবর্দী ও গুলজানের নিকট সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় তারা তৎক্ষণাৎ আসতে পারেন নি। এসে দেখেন, সুফিয়ান সুস্থ হয়ে বৃক্ষের ছায়ায় একটু একটু করে হাঁটছে। আলীবর্দী সুফিয়ানকে হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গেলেন। উত্তপ্ত ধরণী অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, সন্ধার আগমনী বার্তা নিয়ে শীতল সমীরণ বইতে শুরু করেছে। পাখীরাও দল বেঁধে কিচির-মিচির শব্দ তুলে যার যার নীড়ে ছুটে চলেছে। রাখাল বালকেরা গানের সুর তুলে মেষপাল নিয়ে আপন আপন ঘরে ফিরছে। সুফিয়াও অন্যদিনের মত রফিকের সাহায্যে মেষগুলোকে নিয়ে যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছল।

শৈশবকালটি তাদের কাটছিল খুবই আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে। ওরা একে অপরের খেলার সাথী, মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলের সহপাঠী। প্রাইমারী শিক্ষার প্রাচীর মাড়িয়ে যখন মাধ্যমিক শিক্ষার তোরণ অতিক্রম করতে লাগল, তখন থেকেই তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে লাগল। কেউ কান্দাহার, কেউ কাবুল, কেউ জালালাবাদ, আবার কেউ আফগান সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লাহোর, করাচী, রাওয়ালপিন্ডি। আবার কেউ কেউ মস্কোর দিকে পাড়ি জমাতে লাগল। কেউ ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার জন্য মাদরাসায়, আবার কেউ বৈষয়িক উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে ছড়িয়ে পড়ল।

আলীবর্দী গরীব ও অল্প শিক্ষিত হলেও তিনি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সচেতন এবং যত্নবান ছিলেন। ছেলে-মেয়েকে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্খাও ছিল। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অভাব অনটনের কষাঘাত তাঁকে এ ইচ্ছা থেকে এক বিন্দুও হটাতে পারে নি। তিনি গতর খাটা-খাটুনির সিংহভাগ অর্থই খরচ করতেন ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার পেছনে। নিজে অভুক্ত থেকে ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতেন। নিজে ময়লা এবং তালিযুক্ত কাপড় পরতেন কিন্তু ছেলে-মেয়েকে ভাল ভাল কাপড় কিনে দিতেন। নিজে নগ্ন পায়ে থাকলেও ছেলে-মেয়েকে জুতা-মোজা কিনে দিতেন।

সুফিয়ান আর সুফিয়াকে দেখলে কেউ ভাবত না যে এরা গরীব আলীবর্দীর সন্তান। সুফিয়ান রাস্তায় বের হলে অনেকেই মনে করতেন হয়ত কোন যুবরাজ পথ ভুলে গাঁয়ের পথ ধরেছে। আর সুফিয়াকে দেখলে মনে করত এ যেন স্বর্গের দ্বার খুলে বেরিয়ে আসা হুর। আবার কেউ কেউ মনে করত এ যেন কল্পপুরীর ডানাকাটা পরী। আলীবর্দী কোনদিন তাদেরকে অভাব অনুভব করার সুযোগ দিতেন না। অথচ অভাব-অনটন, অর্ধাহার আর অনাহার ছিল আলীবর্দীর নিত্য দিনের সাথী। দিন মজুরী আর কুলিগিরী ও পশুপালনই ছিল সংসারের ব্যয় বহনের একমাত্র অবলম্বন। সীমার বাইরে খাটুনীর কারণে অকালেই আলীবর্দী বার্ধক্যের সীমান্তে এসে হাজির হলেন।

আলীবর্দী ও গুলজানের একান্ত ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বড় আলেম বানাবেন। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তা আর সম্ভব হয় নি। পিতা-মাতা পরাজিত হয়েছেন নালায়েক ছেলের কাছে। যেমন সিংহশাবক নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছে খেকশিয়ালের কাছে। পিতা-মাতার নারাজির মধ্যে দিয়েই সুফিয়ান জেনারেল শিক্ষাকে বেছে নিল। প্রাইমারী থেকেই সে সরকারী বৃত্তি পেতে লাগল। আলীবর্দী ছেলের কাছে পরাজিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলের লেখা-পড়ার খরচ দিতে

লাগলেন। অষ্টম শ্রেণীতেও সুফিয়ান বৃত্তি পেল। তখন থেকেই বাবরাক কারমাল সরকারের নেক নজর পড়ল সুফিয়ানের প্রতি। মাসে মাসে বৃত্তির টাকা পেয়ে সুফিয়ান যেন এক লাফে স্বর্গে ওঠে গেল। এখন পিতা-মাতারও তেমন ধার ধারতে হয় না। সব বিষয়ে লেটারসহ মেধা তালিকায় প্রথম স্থান নিয়ে সুফিয়ান এস. এস. সি. পাশ করল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার ছবিসহ অনেক সংবাদ নিবন্ধ ছাপা হল। এবার সুফিয়ানের পা আর মাটিতে পড়ে না। তার লেখা-পড়ার যাবতীয় খরচ সরকার নিজ ঘাড়ে তুলে নিল।

সুফিয়া রফিকা, আতিকা, মাহমুদা ও নাঈমাদের সাথে স্কুলে যায়। সুফিয়া তের বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণী পাশ করেছে। বালিকাদের মধ্যে মেধা তালিকায় সেও শীর্ষে। উর্বর সরোবরের কলমি লতার মত সুফিয়ার দেহ পল্লব বিকশিত হতে লাগল। চোখ কেড়ে নেয়ার মত তার রূপ-গড়ন। তার হাঁটার অঙ্গ-ভঙ্গিতে যুবকের মন কেড়ে নেয়। আলীবর্দী ও গুলজান পরামর্শ করলেন মেয়েকে এভাবে আর স্কুলে পাঠানো ঠিক হবে না। পর্দা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, তা ছাড়া সরকারের হাবভাবও ইসলামের অনুকূলে নয়। যে কোন সময় যে কোন ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। কাজেই এখন থেকে তাকে আর স্কুলে পাঠানো ঠিক হবে না। তাই সুফিয়াকে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষা নিয়েই ঘরে ফিরতে হল। গুলজান তার বড় ভাই মৌলভী আকরামকে বললেন, “ভাইজান! আপনার বোনের মেয়েকে আপনার অবসর সময়ে কিছু কিতাবাদি পড়াবেন।” মৌলভী আকরাম এতে রাজী হলেন, তিনি সুফিয়ার মক্তবেরও উস্তাদ। তিনি মহল্লার মসজিদে ইমামতি করেন। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলুম মাদরাসায় লেখা-পড়া করেছেন। তিনি তৎকালীন মুজাহিদে আযম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ)-এর সুযোগ্য শাগরিদ। তাছাড়া তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন শাইখুল আদব ওয়াল ফিক্‌হ হযরত মাওঃ এযায আলী (রহ), হযরত মাওঃ ইদরীস কান্দলভী (রহ) ও শাব্বির আহমদ উছমানী (রহ)। ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের যুবক, ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এ আন্দোলনে তিনিও উস্তাদদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। সে দিনগুলোর সব কথা তাঁর মনে আছে। সুফিয়া মামুজানের কাছে নাহু, সরফ, ফিক্‌হ, মানতিক, উসূল, ফাছাহাত-বালাগাত, ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসের ওপর সুনামের সাথে অধ্যয়ন করতে লাগল। মৌলভী আকরামও ভাগ্নীর লেখা-পড়ার প্রতি খুবই উৎসাহী। এ ধরনের মেধাবী ছাত্রী তিনি খুব কমই পড়িয়েছেন। তাই অধিক আগ্রহ সহকারে সুফিয়াকে পাঠদান করতে লাগলেন।

[তিন]

পল্লী সর্দার মোল্লা ইয়ার আফগানী তাঁর ছেলে রফিককে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন পেশোয়ারের নিকটবর্তী সীমান্ত প্রদেশের একটি মাদরাসায়। নাম দারুল উলুম হাক্কানীয়া। উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সাইখুল হাদীস আল্লামা আঃ হক হাক্কানী। রফিক হাক্কানী সাহেবের নেগরানীতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করতে লাগল। আর আরিফকে পাঠালেন কান্দাহারের এক মাদরাসায়। মোল্লা ওমরও এ মাদরাসার ছাত্র। উভয়েই লেখাপড়ায় একান্ত মনোযোগী।

সুফিয়ার স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে আসাটা সকলের কাছেই ছিল অনাকাঙ্খিত। বিষয়টি সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অন্তরে দাগ কেটে গেল। সুফিয়াকে হারিয়ে অনেকেরই চলার গতি থেমে যাবার উপক্রম। নিরানন্দের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে রফিকা, আতিকা, মাহমুদা, তাছলী ও মাহবুবারা।

বিরহ যন্ত্রণার সাথে পরিচয় তাদের এই প্রথম। আপনহারাদের বেদনা তারা এর আগে কোন দিন অনুভব করে নি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বপ্ন ছিল সুফিয়া শিক্ষার সবগুলো সোপান পেরিয়ে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। ইতোমধ্যে বাবরাক কারমালের পক্ষ থেকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটা অংকের বৃত্তি বরাদ্দ হয়েছে। সুফিয়াকে স্কুল থেকে নিয়ে আসাতে ছাত্র-শিক্ষক আলীবর্দীকে গালমন্দ বকতে লাগল। কেউ কেউ তাঁকে কট্টর মৌলবাদী, অন্ধবিশ্বাসী, গোঁড়া ইত্যাদি বলে গালি দিতে লাগল। একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এক শিক্ষিকাকে পাঠালেন সুফিয়ার বাবা-মাকে বুঝিয়ে তাকে স্কুলে নিয়ে আসার জন্য। সুফিয়ার বান্দবীদেরকেও বলে দিলেন তাকে যেভাবেই হোক বুঝিয়ে স্কুলে নিয়ে আসতে।

শিক্ষিকা প্রথমে সুফিয়ার আম্মা গুলজানের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, "আপনার মেয়ে সুফিয়া সব বিষয়ে খুবই ভাল নম্বর পেয়েছে, এখন তার জন্য সরকারী ভাতা ধার্য্য করা হয়েছে, যেভাবে হোক তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিন। সে বিনা খরচে মাস্টার্স পর্যন্ত লেখা-পড়া করতে পারবে। যদি সে ভালভাবে পাশ করতে পারে তবে তার উচ্চ পদে চাকরির ব্যবস্থা হবে এবং আপনাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে।" গুলজান মিষ্ট ভাষায় বললেন, "আপা! আপনি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আপনার কথা মেনে নেয়া যায় না। ইসলামে পর্দা করা ফরয। যারা পর্দা লংঘন

করে তাদেরকে শরীয়তের ভাষায় দাইয়্যুছ বলা হয়। আর দাইয়্যুছ জান্নাতের গন্ধও পাবে না। তাছাড়া ইসলাম সহশিক্ষাকে সমর্থন করে না। যুবক-যুবতীরা একসাথে লেখাপড়া করবে তা হয় না। এতে উভয়েরই চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

শিক্ষিকা মৃদু হেসে বললেন, আরে পরকাল কি কেউ কোন দিন দেখেছে? মৃত্যুর পরে মানুষ পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। পঁচা লাশের কাছ থেকে হিসেব নেয়ার কথা কোন যুক্তিতে বলেন? শিক্ষিকা নাস্তিক কবির ভাষায় বললেন—

"যদি না দেখ দু-নয়নে,
বিশ্বাস করিও না গুরুর বচনে।"

নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ্ ছিঃ এ আপনি কি বলছেন? গুলজান শিক্ষিকার মুখে এমন কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার দক্ষিণ গন্ডদেশে এক চপেটাঘাত বসিয়ে দিলেন। শিক্ষিকা আঘাত সামলাতে ব্যর্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। একটু পরে মস্তক উত্তোলন করে তাকালে সামনে তিনি শুধু সর্ষে ফুল দেখতে পেলেন। কানেও ভাল শুনছেন না। কানের মধ্যে তার শুধু শোঁ শোঁ আওয়াজ। একটু পরে হুঁশ ফিরে এলে পানি পানি বলে চিৎকার করে উঠল শিক্ষিকা। গুলজান জগ ভর্তি পানি এনে তাকে পান করালেন। নাকে মুখে ছিঁটিয়ে দিলেন ও মাথায় পানি দিলেন। এবার মহিলা সম্পূর্ণ হুঁশ ফিরে পেল। গুলজান তাকে মাটি থেকে তুলে চৌপায়ায় বসালেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপামণি! এখন আপনি কেমন অনুভব করছেন?" শিক্ষিকা এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ?" গুলজান আরো জোরে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আপনার অবস্থা কেমন?" শিক্ষিকা এবারও উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ?" অর্থাৎ সে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আবার প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন, "কানে তেমন শুনতে পাচ্ছি না, আর চপেটাঘাতের বেদনায় অস্থির হয়ে গেছি। দক্ষিণ পাটির দাঁতগুলো সব নড়-বড়ে হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।" এবার গুলজান বিনীত কণ্ঠে বললেন, "জনাবা! আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলেছিলেন, দু-চোখে যা দেখা যায় না, তা গুরুজনের কথায়ও বিশ্বাস করা যাবে না। তাই আমি বলতে চাই, আপনার আঘাত ও ব্যথা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি আপনি নিজেও আপনার ব্যথা দেখতে পাচ্ছেন না। তাহলে আপনার কথা কিভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনার কান ব্যথা করছে?" তিনি আরও বললেন, আপনার জন্মদাতার পরিচয় কি আপনি জানেন? শুধু একজন অবলা নারীর কথায় আপনি একজন পুরুষকে আপনার পিতা হিসেবে সম্মান দিচ্ছেন, তা কি করে হয়? রাত-দিন

প্রতিনিয়ত বাতাস বইছে তাতো দেখা যায় না। ঝড়ে বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিচ্ছে তবুও বলা যায় না এটা ঝড়ের তান্ডবলীলা। কারণ, বাতাস তো আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায় নি, তাই বাতাস যে আছে তা কি অবিশ্বাস করা যাবে? এতটুকু বলে তিনি একটি কবিতার দুটি চরণ আবৃতি করলেন–

"জান্নাত ভি হে, দোযখ ভি হে, না মানে তো মরকে দেখ,
যেয়ছি করনি অয়ছি ভরনী, না মানে তো কারকে দেখ।"

অর্থাৎ জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টিই বিদ্যমান আছে, যদি বিশ্বাস না হয় তবে মরে দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে। আর যা করবে তার ফল অবশ্যই পাবে, যদি বিশ্বাস না হয় তবে মরে দেখ। গুলজানের কথার প্রতি উত্তর দিতে না পেরে শিক্ষিকা লজ্জা ও অনুশোচনায় মাথা নত করে স্কুলের দিকে ফিরে গেলেন।

এদিকে হেড মাস্টার সাহেব সুফিয়ার বান্দবী রফিকা, আতিকা, মাহমুদা ও রহিমাকে ডেকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, "তোমরা যেভাবেই হোক তোমাদের বান্দবী সুফিয়াকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্কুলে নিয়ে আসবে। আর ১০ হাজার টাকা ওর হাতে দিয়ে বলবে যে, "এ টাকা দুমাসের পড়ার খরচ, সরকার প্রতিমাসে তোমাকে ৫ হাজার করে টাকা দিবে। যদি পার, সাথে করে নিয়ে আসবে, তা না হয় দু, এক দিনের মধ্যে আসতে বলবে।

মাস্টারের কথা মত বালিকারা ছুটে গেল সুফিয়াদের বাড়ি। সুফিয়া বান্ধবীদেরকে দেখে আনন্দে আত্মহারা, পুলকে মাতোয়ারা, খুশীতে দিশেহারা, উল্লাসে আপনহারা। একে একে সকলে কৌশল বিনিময় করল সুফিয়ার সাথে। তারপর ওদেরকে নিয়ে তার পড়ার জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করে সবাইকে বসতে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হারিয়ে গেল গল্প-গুজবের মধ্যে। এক পর্যায়ে মাহমুদা তার ভেনেটি বেগ থেকে দশ হাজার টাকা বের করে সুফিয়ার হাতে দিতে দিতে বলল, "সুফিয়া! তুই বড়ই ভাগ্যবতী, তোর কপালটাই ভাল। তোর লেখা-পড়ার খরচের জন্যে বাবরাক কারমাল মাসে ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই নাও দুমাসের ভাতা।"

সুফিয়া মার্জিত ভাষায় বলল, "দেখ বোন! আব্বু আমাকে স্কুলে যেতে মানা করেছেন। আমার আর স্কুলে যাওয়া হবে না। আমি আমার মামুজানের নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষা করছি। স্কুলে পর্দার কোন ব্যবস্থা নেই। নারী-পুরুষ একসাথে পড়তে হয়। পর্দা করা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, "মুসলমানদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুবই পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে, আল্লাহ তা অবগত আছেন।" (সূরা নূর – ৩০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকার ভূক্ত বাঁদী, যৌনকামামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও।" (সূরা নূর-৩১)

সুফিয়া এই আয়াত দুটি পাঠ করে শুনিয়ে বলল, আব্বুর কথা অমান্য করে আমার আর স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এ টাকাও গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

সুফিয়ার কথা শুনে মুহমুদা বলল, "আরে! টাকা হলে সব কিছু করা যায়। এবারের টাকা তোমার আব্বুর হাতে তুলে দিয়ে বল, কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে। আপনাকে আর এত কষ্ট করে আমার পড়ার খরচ যোগাতে হবে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে ও আপনাদের দোয়ায় ৫ হাজার টাকা প্রতি মাসে ভাতা পাব ধার্য্য হয়েছে। আপাতত এস. এসসি পর্যন্ত পড়ে পরীক্ষা দিয়ে আসি। দেখবে টাকা পেলে তিনি রাজী হয়ে যাবেন। এত টাকা কি তোমার আব্বু একমাসে কোন দিন হাতে নিয়ে দেখেছেন? যা সুফিয়া! আমি যা বলেছি তা গিয়ে বল, দেখবি তিনি রাজী হয়ে যাবেন।"

সুফিয়া উত্তরে বলল, "আরে পাগলিনী! টাকা দিয়ে মানুষ খুশি করা যায় না। যারা অর্থলোভী তাদের কথা বাদ দাও, ওরা অর্থের বিনিময়ে নিজের অমূল্য সম্পদ ঈমানটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আব্বু গরীব হতে পারেন কিন্তু অর্থের লোভে বিক্রি হবেন না। তিনি গর্দান গেলেও হক পথ ত্যাগ করবেন না। তাঁর হাতে এ টাকা তুলে দেয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে মাহমুদা অন্যান্য বান্ধবীদের নিয়ে আলীবর্দীর নিকট গেল। সালামান্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করে দশ হাজার টাকা বের করে আলীবর্দীর হাতে দিতে চাইল।

আলীবর্দী তাদের হাব-ভাব বুঝতে পেরে বন্য শার্দূলের ন্যায় তর্জন-গর্জন আরম্ভ করে দিলেন এবং বললেন, "সাবধান! এসব টাকার ওপর আলীবর্দী কোন দিন চোখ তুলে তাকায় নি। এ ধরনের বেয়াদবীর ছবক তোমাদের কে দিয়েছে? এ টাকা মাস্টারের পকেটের টাকা নয়। এ টাকা আফগান সরকার বাবরাক কারমালের নয়। এ সব টাকা আসছে দ্বীনের দুশমন, আমাদের দুশমন রাশিয়া থেকে। টাকার বিনিময়ে এ দেশের মাথাগুলো রাশিয়া কিনে নিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার নামে এ

দেশের হাজার হাজার মেধা রাশিয়ায় পাচার হচ্ছে। ওদেরকে নাস্তিক বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে এদেশে। ওরাই একদিন এদেশ থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেবে বা দাফন করবে। যা ঘটেছে তাসখন্দ, সমরকন্দ, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তুরস্কে। যারাই রাশিয়া থেকে বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে আসছে তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। বাবরাক কারমাল নিজেও একজন নাস্তিক। সে তো সোভিয়েত থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কাজেই এ টাকা আমি কিছুতেই নেব না, আর সুফিয়াও স্কুলে যাবে না।" এরাই টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে আমার একমাত্র পুত্র সুফিয়ানকে নিয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা ছিল, তাকে আলিম বানাব। সে দ্বীনের খিদমত করবে, দেশের সেবা করবে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিবে।

তিনি অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলছিলেন, "আল্লাহ্ পাক আমার একমাত্র ছেলে সুফিয়ানকে যে মেধা দিয়েছেন, তা যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় করতে পারত তবে কতই না উত্তম হত। আজ ইসলামের দুশমনরা তাকে অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়ে গেছে। তাকে দিয়েই একদিন ইসলামের চরম ক্ষতি সাধন করবে। ছেলেটা আগে ৫ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করত। স্কুলে যাওয়ার পর থেকে মসজিদের পথ ভুলে গেছে। শত চেষ্টা করেও তাকে স্কুলের কুশিক্ষা থেকে ফিরাতে পারলাম না। আমার সাথে এক রকম যুদ্ধ করেই সে চলে গেল। আজ তোমাদেরও বলছি, তোমরাও স্কুলে যেও না। ইলমে দ্বীন হাসিল কর, এতে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পাবে। স্কুল কলেজে পড়ে শতকরা দু-একজন মানুষ হয়, আর বাকিরা হয় বড় বড় অমানুষ, চোর-ডাকাত, ঘুষখোর, সুদখোর। এরাই অফিস আদালতে বড় বড় চেয়ার দখল করে কলমের সাহায্যে চুরি করে। মজলুমেরা তাদের কাছে পায় না সুবিচার। জনগণ তাদের খেদমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদের কারণেই দেশে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে। আমলা-দারোগা-পুলিশরা চোর-ডাকাতদের কাছ থেকে নিয়মিত বখরা আদায় করছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে বিচার চাইলে সুবিচার পাওয়া যায় না। মজলুমের পক্ষে এখন আর আদালতে রায় হয় না। যে বেশি টাকা দিতে পারে, তার পক্ষেই রায় হয়। টাকা ছাড়া এখন কোন কাজই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাদের আচরণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। তাদের ষন্ডা-পান্ডারা নিয়মিত জনগণের অর্থ লুটে-পুটে খাচ্ছে। প্রশাসন এদের ব্যাপারে অন্ধ, বধির, অচল। স্কুল কলেজে বর্তমানে শিক্ষার নামে চলছে কু-শিক্ষা। নারী-পুরুষের মধ্যে নেই কোন ভেদাভেদ। সহশিক্ষা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। খবরের কাগজে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের সংবাদ আসছে, শিক্ষক ছাত্রীকে

নিয়ে অথবা ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে উধাও। ব্যাভিচার, ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি নিত্যদিনের সংবাদ। আধুনিক সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষরাই এসব করে বেড়াচ্ছে। কাজেই তোমরাও এই কুশিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাক। কেউ দুনিয়াতে থাকবে না, পরকালে তাকে ফিরে যেতেই হবে। তাই পরকালের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে যাওয়ার চেষ্টা কর।"

আলীবর্দীর ধমক খেয়ে তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেল। তারা প্রত্যেকে বাক্যহারা হয়ে গেল। আলীবর্দীর কথার জবাবে তারা কি উত্তর দিবে ভেবে পেল না। এক এক জন একেক দিকে চলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছিল। কিন্তু তা পারল না, অবনত মস্তকে সবাই দাঁড়িয়ে রইল। আলীবর্দীর কথা শেষ হলে সবাই একে একে সুফিয়ার কক্ষে চলে এল।

সুফিয়া আড়ি পেতে সব কিছু শুনছিল। তবুও মুচকি হাসি হেসে মাহমুদাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি সংবাদ নিয়ে এলে? তোদের মিশন সফল হয়েছে তো?" আতিকা একটু দুষ্টু প্রকৃতির। সে হাসতে হাসতে কি যেন বলতে চাইল কিন্তু পারল না। রফিকা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "বোন! তোর আব্বু আমাদের মেহমানদারী না করিয়ে ছাড়েন নি।" সুফিয়া বলল, "কি খেয়ে আসলে?" মাহমুদা উত্তর দিল, "পেট ভরে কয়েক কেজি ধমক আর কয়েক কেজি বকুনি খেয়েছি। আর কয়েক কেজি উপদেশ নিয়ে এসেছি।" রহিমা বলল, "আপা এবার একটু পানি পান করান।" আসলে ভয়ে তাদের গলা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে। সুফিয়া হাসতে হাসতে পানি এনে দিল। সবাই পেট ভরে পানি পান করে আস্তে আস্তে স্কুলের দিকে পা বাড়াল। রফিকা ও মাহমুদা রয়ে গেল সুফিয়ার বাড়িতে।

মাহমুদা নাছোড় বান্দাহ্। সকলেই পিছপা হলেও সে শেষবারের মত চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এবার সে সুফিয়াকে পরামর্শ দিতে লাগল, "শোন সুফিয়া! তোমার ভাইয়ার বেলায়ও তো এমটি হয়েছিল। কৈ রাখতে তো পারল না। তুমিও যদি একটু আড়ি ধরতে পার তবে তুমিও বিজয়ী হতে পারবে। তোমার আব্বা কয়েকদিন বকুনি দিয়ে শান্ত হয়ে যাবে। তা না হলে সোজা চলে যাবে ছাত্রীবাসে। কত ছাত্রী তো হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। তোমার মুর্খ পিতা-মাতারা শিক্ষার কি মর্ম বুঝে? তোমার জীবনটা তুমি নিজ হাতে নষ্ট করো না। আমি আগামী বছর হোস্টেলে চলে যাব। বাড়িতে থেকে লেখা-পড়া তেমন হয় না। তাছাড়া অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।"

সে সুযোগ-সুবিধা কোনগুলো সুফিয়া জানতে চাইল। মাহমুদা বলল, “বাহঃ! তুমিতো একেবারে ছোট্ট খুকী, কিচ্ছু বুঝ না। দেখ না যারা হোস্টেলে থাকে তাদের গন্ডায় গন্ডায় বয়ফ্রেন্ড রয়েছে। প্রতিদিন বিকাল বেলায় সবাই বয়ফ্রেন্ড সাথে নিয়ে পার্কে বা নদীর তীরে ডেটিং এ যায়। তারা সাঁঝের বেলায় ফিরে আসে। এই সময়টুকু তারা কতইনা মজার মজার গল্প গুজবে কাটিয়ে দেয়। তাছাড়া কিছুদিন পরপর বনভোজনে যায়। সাথে নিয়ে যায় বাদ্য-যন্ত্রসহ নানা প্রকার বিনোদনের উপকরণ। চলে নাচ, গান, পান করে পেয়ালা ভর্তি মদিরা ও এলকোহল। দল বেঁধে অথবা যার যার ফ্রেন্ডদের নিয়ে ছবি তোলে। চলতে থাকে বিভিন্ন রকমের নাচ-গান। তোমার মত এত সুন্দরী আমাদের স্কুলে কজন আছে? কেন! দেখনি, স্কুলে যাওয়ার পথে ছেলেরা তোমার দিকেই বেশি তাকায়। তুমিতো এসব ব্যাপারে বেখেয়াল। নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাক, ডানে বামে কি আছে বা কি হচ্ছে তা চোখ খুলে কখনও দেখ না। দেখবে এক বছরেই তোমার বয়ফ্রেন্ড মিলে যাবে কয়েক গন্ডা।”

মাহমুদা সুফিয়াকে লক্ষ করে আরো বলল, “অ-তুই তো মৌলভী হতে যাচ্ছিস, তাই না? সাত গেরামের দাওয়াত খাবি, খতম-টতম পড়বি আর কত দোয়া কালাম তাই না? ওসব করে লাভ নেই। কুনো ব্যাঙের মত ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকবে আর বেহেশ্‌ত-দোযখের স্বপ্ন দেখবি, এই তো? দুনিয়াটা এখন বদলে গেছে। নারীরা স্বাধীনতা পেয়েছে। সমঅধিকার আদায় করে নিয়েছে। এখন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে। বাবরাক কারমাল এটাই চাচ্ছেন। নারীরা উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে দিন দিন।”

মাহমুদার কথাগুলো সুফিয়ার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধছিল। সুফিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, “আপা! আপনি আমার মত ছোট বোনের নিকট এ ধরনের কথা বলতে পারবেন তা কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। আপনার প্রতিটি বাক্য আমার হৃদয়ে কষ্টের রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। আপনার মুখে এমন অশালীন কথা শুনব তা কখনো ভাবতে পারি নি। এতদূর এগিয়ে গেছেন তা ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে। তবে শুনুন! আপনার পরামর্শ আমার পবিত্র জীবনের পাথেয় নয়। এসব স্পষ্ট শয়তানী। আমি আর কোনদিন স্কুলে যাওয়াতো দূরের কথা স্কুলের মাঠেও পা রাখব না। শুনুন আপা, গ্রামের মেয়েরা এখনো শরীফ, ভদ্র, শালীনতা তাদের গর্ব। সতীত্ব তাদের অহংকার। শহরের অধিকাংশ মেয়েরা বে-পর্দায় চলা-ফেরা করে। স্ত্রীরা স্বামীর বন্ধুদের হাত ধরে বেরিয়ে যায় মার্কেটে, চলে যায় সিনেমায়। গ্রামের

মেয়েরা এখনো এগুলো থেকে পবিত্র। আপনি যা বললেন, তা কোন মুসলমানের মুখে শোভা পায় না।” কথায় কথায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে যায়। সুফিয়া তাকে নামায আদায়ের কথা বলল, সময়ের স্বল্পতার অজুহাত তুলে স্কুলের দিকে চলে যায়। সুফিয়া রফিকাকে নিয়ে নামায আদায় করল। রফিকা পল্লী সর্দার মোল্লা ইয়ার আফগানির একমাত্র আদরের দুলালী। শৈশব কাল থেকেই রফিকা সুফিয়ার সাথী। রফিকার চেয়ে সুফিয়া তিন বছরের ছোট। ছোট হলেও দেখতে প্রায় সমান সমান। ওদের আদব-কায়দা ও চালচলন ছিল খুবই শান্ত ও বিনয়ী। কথা-বার্তায় যেন টপ্‌টপ্‌ করে মধু ঝরে। পল্লীর ছোট-বড় সবাই তাদের দু-জনকে আদর-স্নেহ এবং শ্রদ্ধা করত। এরা সাহসিকতা যেন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছে। ওরাও পাখী শিকার করতে বেশ পটু। অনেক সময় বড়রাও তাদের কাছে হার মানত।

একে অপরকে ক্ষণিকের ত্বরেও ভুলে থাকতে পারে না। ওদের ছিল গলায় গলায় ভাব, পেটে পেটে ভালবাসা। সময়ে অসময়ে দু-জন বসে গল্প করে। অনেক সময় মা-বাবার বকুনী খেয়েও দু-জন তাদের চোখের আড়ালে মিলিত হত। এ ভালবাসার সুবাধেই রফিকা বলে উঠল, “কাল থেকে আমিও আর স্কুলে যাব না। তোর সাথে আমিও ইলমে দ্বীন শিখব।” রফিকার কথায় সুফিয়া ভীষণ আনন্দিত হল। রফিকা সুফিয়াকে বলল, “আব্বু-আম্মু আবার না জানি কি বলে।” সুফিয়া বলল, “আমার আব্বুকে দিয়ে বুঝাব তাহলে কাজে আসতে পারে। সুফিয়া তার আব্বুর মাধ্যমে সুপারিশ করালে মোল্লা ইয়ার আফগানী রাজি হয়ে গেলেন। তিনি দু-জন ছাত্রী পেয়ে গেলেন।”

[চার]

সুফিয়া ও রফিকার বয়স দিন দিন বাড়তে লাগল। জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগল দ্রুত গতিতে। দু-জনই পূর্ণ উদ্দমে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে ইলমে সরফ ও ইলমে নাহুর প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি শেষ করে পবিত্র কুরআনের তরজমাও শেষ করেছে মাত্র ৪ বছরে। মাহমুদা, আতিকা, রহিমা, মাকছুদা ও হালিমারাও এস. এসসি. পাশ করেছে। এর মধ্যে কেউ কেউ লেখাপড়ার ইতি টেনে ঘরে বসেছে। মাহমুদা ও আতিকা ভর্তি হয়েছে কলেজে। কলেজ জীবনে দু-জনের এক সাথে থাকা সম্ভব হল না। আতিকার বড় ভাই সারোয়ার চাকরি করতেন বাগরামে। তাই আতিকাকে নিয়ে বাগরাম কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আতিকা ভাইয়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

মাহমুদা ভর্তি হয়েছে জালালাবাদ কলেজে। সে তার মামার বাসায় থেকে লেখাপড়া করছে। বাসা থেকে কলেজের দুরত্ব প্রায় এক ক্রোশ। তাকে সবটুকু পথই পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। রোদ-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হলেও নিয়মিত ক্লাশ চালিয়ে যাচ্ছে। মাহমুদার মামার নাম এডভোকেট জামাল আফগানী। তিনি ছিলেন একজন গরীবের ছেলে। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে তিনি ওকালতির পেশা বেছে নিয়েছেন। এডভোকেট জামাল উদ্দীন ভাগ্নী মাহমুদার লেখাপড়ার বিষয়ে পূর্ণ তদারকী করেন। চলা-ফেরার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখেন।

মাহমুদার কলেজে পদার্পণের সময় তার বয়স আঠার-এর কোটায় ছিল। পূর্ণ যৌবনের অধিকারিণী সে। তরুণীর দেহ-রত্ন অপরূপ যৌবন-গরিমায় লাবন্যমন্ডিত। সুন্দরীর যৌবনজোয়ার কানায় কানায় ভরপুর। প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভিত সুষমায় তুলতুলে নরম দেহখানি অপার্থিব মহিমায় যেন গৌরবান্বিত। টানা-টানা চোখ দুটি যেন হরিণীর কাছ থেকে ধার করে এনেছে। অধরে তার চাদের তৃতয়িার হাসি শোভিত। উষ্ঠ যুগলের ফাঁক দিয়ে সামান্য রূপালী দাঁত বেরিয়ে আসে। দেখলে মনে হয় যেন মেঘের আড়ালে সূর্য চমকাচ্ছে। যৌবনের ঢেউ খেলে যার সারা অঙ্গে। তার এক চাহনিতেই খরিদ করে নিতে পারে প্রেমাস্পদের মন-প্রাণ। সেজে-গুঁজে রাস্তায় বের হলে মনে হয় যেন ডানাকাটা পরী নেমে এসেছে এ ধুলার ধরায়। তারদিকে না তাকিয়ে পথ চলার সাধ্য কার আছে? চলার পথে দুষ্টুমী করে ওড়নাটা ইচ্ছা করেই বক্ষযুগলের অনেকটা নিচে নামিয়ে

দেয়। তাতেও যুবকের চঞ্চল মনে তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়। হেলে-দুলে অভিনব ভঙ্গিতে পথ চলে সে। যেন কোন রাজকুমারী হাঁটতেছে। এমনিতেই তো পরমা সুন্দরী। আবার আলতা, কাজল, স্নো, পাউডার ও হরেক রকম প্রসাধনীর অভিনব ব্যবহার। দেখলেই মনে হয় সে রূপের বাজার একাই যেন খরিদ করে নিয়েছে। নতুন পথের নব যাত্রী সে। এখানে আসায় একেবারে নিঃসঙ্গ হওয়াতে তার মনে শান্তি নেই। পথ-ঘাট, লোক-জন একেবারেই অপরিচিত। কলেজের কারো সাথে এখনো ভাব জমাতে পারে নি। নিঃসঙ্গ জীবনের অসারতার গ্লানির যবনিকা টেনে কখন যে কার হাত ধরে প্রেম সাগরের উর্মি মালায় ঝাঁপ দেবে। সে শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছে। তার হৃদয়টা যেন উড়ন্ত পাখীর দুরন্ত সফর। বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই, বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই, নেই তার অবকাশ। কেবলই খোঁজে বেড়ায় তার মনের মানুষটিকে। যৌবনের উম্মাদনায় ও তাড়নায় হারিয়ে যায় ভাবান্তরে, তেপান্তরে।

বাগরাম এক জনবহুল নগরী। সর্বক্ষণ গাড়ী-ঘোড়ার কোলাহল। এ যেন এক ব্যস্ততম শহর। প্রাচীন আমলের এক পুরাতন বাসায় ভাড়া থাকেন সারোয়ার। চাকরি করেন বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রে। বেতন যা পেতেন তা দিয়ে কোন রকমে গরীবানা হালতে চলে যেত। আতিকাকে আনার পর তার খরচ আগের তুলনায় বেড়েছে। আয় সীমিত। চলতে হিম-শিম খাচ্ছেন। বাড়ি থেকে খরচ আনার সামর্থ্য নেই। তাই অতিরিক্ত খরচ হ্রাস করে প্রয়োজনীয় খরচ করে যাচ্ছেন।

মাহমুদাকে হারিয়ে আতিকার মনেও শান্তি নেই। নিরানন্দ জীবনের অবসান ঘটানোর মত কোন সুযোগ-সুবিধাও করতে পারে নি। আতিকা মাহমুদার মত এত চালু নয়। তবে স্কুল জীবনে মাহমুদার সাথে থাকার কারণে অনেকটা শালীনতা ও ভিরুতা বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম দর্শনেই কিভাবে একজন যুবকের অন্তরে আসন গাড়া যায়, কিভাবে চললে যুবকদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করা যায়, এসব বিদ্যা মাহমুদার মত এত আয়ত্ত্ব করতে না পারলেও ফেল হওয়ার মত নয়। চেহারা-সুরতও মাহমুদার মত এত ফর্সা ও সুগঠিত নয় কিন্তু এযেন অন্য রকমের এক মায়াবিনী মনহরণী। হৃদয়তলে প্রেম বাণ নিক্ষেপকারিণী। তার একটু মুখের হাসি পাষাণ হৃদয় প্রেমিকের অন্তরও কেড়ে নেয়। বেউকুফের মত হা করে বা খিল খিল করে হাসে না সে। সব সময় তার টকটকে লাল ও পাতলা ওষ্ঠযুগলে আধফোঁটা কুসুমের মত হাসি ফোটে থাকে। হাসলে দন্ত পাটির সামান্য অংশ প্রকাশ পায়। দেখলে যে কেউ মনে করবে মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ যেন সূর্য কিরণ বিচ্ছুরিত করেছে। মাথা ভরা কাল চুল কটিদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত। ফণিনীর

ন্যায় গ্রীবা দুলিয়ে চলার সময় ঈষৎ দোল খায়। কোন কোন সময় চেহারার দু-পার্শ্বের দলহারা অলক গুচ্ছ বয়ে যাওয়া সমীরণ এদিক ওদিক উড়িয়ে নিয়ে খেলা করে। বসন্তের কোকিলের মত তার কণ্ঠস্বর। সুরের মুর্ছনায় দিশেহারা হয়ে যায় গান পিয়াসীরা। গান গেয়ে বেশ কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে সে স্কুল জীবনে। আতিকা নাম বিলুপ্ত করে যদি কোকিল কণ্ঠী, মৃগনয়না, রাজদুলালী ইত্যাদি নামে ডাকা হয় তবে মোটেও ভুল হবে না। এগুলো তার অতিরিক্ত গুণ। আতিকা কোন কোন সময় মনের মানুষটি খুঁজতে গিয়ে হয়রান পেরেশান হয়ে অতি মিহি সুরে গুণ গুণ করে গাইতে থাকে–

ঃ হার তামান্না দিলছে রোখছাত হুগাই আবুত আজা, আবতু খেলুয়াত হুগাই।

ঃ সে যে কেন এল না, কিছু ভাল লাগে না, এবার আসুক --------।

প্রেমের হাট যতই যমযমাট হোক না কেন খরিদদার না থাকলে?

এমনই এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে আতিকা।

পড়ন্ত বেলা, ঘরে মন বসছে না মাহমুদার। মামুজান চলে গেছেন সেই কাক ডাকা ভোরে। ফিরবেন দু-দিন পরে মামীকে নিয়ে। বাসা পাহারা দিচ্ছে মাহমুদা একা একা। এই সময়টার মধ্যে যদি মনের মানুষটির সন্ধান পাওয়া যেত, কাছে পাওয়া যেত, এসব ভাবছে মাহমুদা। সূর্যটা ক্রমশ নিচে নেমে আসছে। মাহমুদা সব ধরনের প্রসাধনি ব্যবহার করে সাজগোঁজ করেছে। শ্যাম্পুতে নাওয়ানো চুলগুলো আঁচড়িয়ে, জরিদার সেলোয়ার-কামিজ পরে, এক হাতে ভেনেটি ব্যাগ ও অপর হাতে ডায়েরীটা নিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

আজ সে স্বাধীন, চলার পথে নেই কোন বাধা-বন্ধন, নেই প্রতিবন্ধকতা। মনের আনন্দে মৃদু-মন্দ অনিল হিল্লোলে উন্মুক্ত আকাশতলের মুক্ত মাঠে চঞ্চল হরিণীর মত ঘুরে বেড়াবে। চপল পায়ে হেলে-দুলে চলছে রাজকুমারী। মহল্লার সামান্য দক্ষিণে রয়েছে পার্ক। পার্কটি এত বড় না হলেও ছোট নয়। এক পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে খেজুর গাছ লাগানো রয়েছে। অপরদিকে সাজানো রয়েছে আখরুট, পেস্তা, আনার ও কাজুবাদাম বৃক্ষ। সেখানকার দৃশ্যাবলি সত্যিই নয়নাভিরাম। তাই পড়ন্ত বিকালে দু-জন করে চলে যায় উক্ত পার্কে। তারা আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গুজবে কাটিয়ে দেয় বিকালের সময়টুকু। সন্ধার সাথে সাথে প্রায় সকলেই চলে আসে নিজ আলয়ে।

মাহমুদা নিরানন্দ হৃদয়ে সামান্য অবকাশ নিতে পার্কে চলে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে একা একা কেউ নেই। সবাই মনের মানুষটিকে নিয়ে ঝোঁপ-ঝাড় বা কোন গাছের নিচে বসে হাসি তামাশা করছে। এসব দৃশ্য

অবলোকন করে মাহমুদার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। কোন একটি স্থান পেল না, যেখানে ক্ষণিকের তরে একটু বসবে। দেখলে মনে হয়, এ স্থানগুলো যেন তারা বাবরাক কারমালের থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

মনোরম একটি স্থান খুঁজে পার্কটি চষে বেড়াচ্ছে মাহমুদা। অবশেষে দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটি বাদাম গাছের আড়ালে বসে গেল। সবুজ ঘাসগুলো তুলতুরে নরম। মনে হয় যেন সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে সারা বাগান জুড়ে। তার আশে-পাশে আর কেউ নেই। ধরণীটা যেন নীরব-নিথর হয়ে তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করছে। মাহমুদা অপলক নেত্রে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। যুবতী চিন্তামগ্ন। হায়! এ বিশাল ধরণীতে কতই না মানুষ বিরাজ করছে, কিন্তু আমার মনের মানুষটি কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। যে মানুষটি আমার অন্তরের জ্বালা মিটাবে, যার স্পর্শে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। প্রেমের আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। তার সাথে চলবে মান-অভিমান, খেলবে লুকোচুরি। হৃদয় উজাড় করে শোনাবে প্রেমের গান। এসব চিন্তায় যুবতী একেবারে আত্মভোলা। দক্ষিণা বাতাস তার চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করছে। কোন কোন সময় চেহারা ঢেকে দিয়ে বিরক্ত করে তুলছে।

অকস্মাৎ একটি বাদাম তার মস্তকে আঘাত হেনে ছিঁটকে পড়ল একটু দূরে। উহঃ করে উঠল। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল মগডালে ঘুঘু দম্পতি বসে একে অপরকে আদর করছে। এদৃশ্য দেখে মাহমুদার মন আরো উতলা হয়ে উঠল। একাকিত্বের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠল। এসব ভাবনার মাঝে আবার একটি নুড়ী পাথর এসে টন্ করে মস্তকে আঘাত হানল। এবারও উহঃ শব্দ উচ্চারণ করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিছুই দেখতে পেল না। তা হলে ---------?

তারপর কিছুক্ষণ মৌনভাবে কাটিয়ে ডায়েরীর পাতাগুলো এক এক করে উল্টিয়ে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো স্মরণ করতে লাগল। কত বন্ধু-বান্ধবীর হস্তলিপি, কত স্মরণীয় ঘটনা, কত জনের ঠিকানা, কত জনের ছবি। ঈদ কার্ড ও ফোন নাম্বারগুলো এক এক করে দেখছে।

এমনই মুহূর্তে তড়িৎ গতিতে কার যেন দুটি হাত তার চোখ চেপে ধরল। মাহমুদা চমকে ওঠে বলল, "কে আমার চোখ টিপে ধরছো?" এই বলে নড়াচড়া না করে আলতো ভাবে নিজের হাত দিয়ে অপর হাত দুটি পরখ করতে লাগল। বুঝল এটা কোন মেয়ে লোকের হাত নয়। ঘন পশম, মোটা-মোটা আংগুল, শক্ত বাহু।

নিশ্চয়ই এটা কোন পুরুষের হাত, অপরিচিতের হাত। প্রথমে সে ভেবেছিল ও বাসার মনি একাজ করেছে। কারণ মনিও পার্কে আসার কথা ছিল। কিন্তু ও আসে নি। তাহলে এ আবার কোন দানব এ অবেলায়! এবার অনেক চেষ্টা করেও চোখ থেকে হাত সরাতে পারল না। খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, চোখ ছাড়বি তো ছাড়! না হলে হাত কামড়ে দেব কিন্তু। এ কথা শুনে চোখ চেপে ধরা লোকটি হেসে ফেলল। মাহুমদা লোকটির হাতে এবার জোরে চিমটি কেটে দিল। এবার চোখের ওপর থেকে হাত সরে গেল। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ ও চাপ খেয়ে থাকায় মাহমুদা চোখে ঝাপসা ও ঘোলাটে দেখছে। বুঝল এক বলিষ্ঠ পুরুষ তার পার্শ্বে দাঁড়ানো।

যুবকটি মাহমুদাকে ভাল করে দেখে লজ্জা পেয়ে বলল, সরি। যুবকের চেহারাটি একেবারে অচেনা। কোনদিন এর সাথে সাক্ষাত হয় নি। যুবকটি বিনীতভাবে বলল, ভুল করেছি আপা! আমাকে ক্ষমা করুন। অন্য একটি মেয়ে মনে করে এমন করেছি। মাহমুদা চোখ কচলাতে কচলাতে তাকিয়ে দেখল, যুবকটি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গড়ন। মাহমুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আপনি কে? আপনার পরিচয় কি? চুপি চুপি এমন দুষ্টুমির মানে কি? যুবকটি বিনীত কণ্ঠে বলল, "আমার পরিচয় বলব, এর আগে আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করেছেন তো?" মাহমুদা বলল, "ক্ষমা না করলে----------?" যুবকটি উত্তর দিল, "ক্ষমাই যে মহত্ত্বের লক্ষণ।" মাহমুদা উত্তর দিল, "আমার নিকট থেকে অত সহজে কেউ ক্ষমা পায় নি। এ নির্জন বাগানে একজন অপরিচিত লোক অবলা নারীর গায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা প্রত্যাশা করা কি উচিত?"

যুবকটি বলল, না আপা আমি রীনাকে মনে করে ------।

মাহমুদা বলল রীনা আবার কে?

ঃ আমার অফিসের একাউনটেন্ট। তারও এ ধরনের স্যালোয়ার -কামিস আছে। আমি সে মনে করেই ---। সরি আপা আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ঃ হ্যাঁ ক্ষমা করতে পারি আগে পরিচয়টা দিন।

ঃ আমার নাম আলম খাঁ। বাড়ি কাবুলে। চাকরির সুবাদে জালালাবাদে থাকতে হচ্ছে।

ঃ কি চাকরি করেন, অফিস কোথায়?

ঃ আমি একটি এন. জি. ও তে চাকরি করি, অফিস বালওয়ানে।

ঃ বালওয়ান কোথায়? কত দূর?

ঃ না বেশি দূরে নয়। দেখুন না ঐ যে বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে লাল দালানটি দেখা যায় এটাই আমার অফিস।

ঃ তাহলে তো আমাদের বাসার পাশেই আপনার অফিস।

ঃ কোনটি আপনার বাসা?

ঃ ঐ যে বাগান বেষ্টিত প্রাচীন আমলের একতলা বিশিস্ট যে বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন সেটাই আমার বাসা।

ঃ অ-তাহলে কি এডভোকেট সাহেবের বাসার সাথেই?

ঃ কোন এডভোকেট?

ঃ এডভোকেট জামাল আফগানী।

ঃ হ্যাঁ

ঃ ঐ বাসাই! জামাল আফগানী আমার মামা।

ঃ অহ্!

ঃ তিনি খুব ভাল মানুষ, তাঁর সাথে আমার খুবই খাতির।

ঃ আপনি আমাদের বাসায় কোনদিন গিয়েছেন নাকি?

ঃ এখনো যাওয়ার সুযোগ হয় নি।

ঃ আপনি অফিসে কোন পদে চাকরি করেন?

ঃ আরে অযোগ্য লোকের আবার কোন পদ আছে নাকি?
লোকে ডি. জি. বলে ডাকে।

ঃ অ-তাহলে ডিরেক্টর জেনারেল।
তাই না? বেতন কত পান?

ঃ ভাই! বেতন যা পাই তা দিয়ে কোন মতে পেটটা বাঁচাই। তবে বলার মত কিছু না, মাসে ২৫ হাজার ৫ শ টাকা মাত্র।

ঃ লেখাপড়া মনে হয় অনেক করেছেন।

ঃ বি. এ. পাস করে মস্কো থেকে মাস্টার ডিগ্রী নিয়েছি।

ঃ ওটা কি ব্রাঞ্চ অফিস?

ঃ না ব্রাঞ্চ অফিস না, হেড অফিস। আমার তত্ত্বাবধানে আরো ৬৮ টি শাখা অফিস রয়েছে।

এবার আলম প্রশ্ন করল, "আপা! আমি তো আমার সব পরিচয় বলে দিয়েছি। কিন্তু আপনার পরিচয়টা এখনো পুরো-পুরি জানা হয় নি। জানালে খুশী হতাম।"

তখন মাহমুদা তার পরিচয় বলতে লাগল। আমার নাম মাহমুদা, হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে পৈত্রিক নিবাস। আমি মোটামোটি একটি অভিজাত এবং

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। এস. এসসি. পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি নিজ গ্রামে। বর্তমানে জালালাবাদ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

ঃ আলম এবার প্রশ্ন করলেন, আপনার সাথে কি আপনার কোন বন্ধু এসেছে? এখনো কোন বন্ধু জুটাতে পারি নি। আমার মত বিশ্রী মেয়েকে কেউ কি বন্ধু বলে বরণ করে নিবে? একা একা বসে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম। কি আর করব বলুন? আমাদের মত গ্রামের মেয়েদের কি আর শহরের ছেলেদের চোখে ধরে? সেসব কিছু বলতে বলতে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাহমুদার বুক চিরে।

ঃ আহ! কি সুন্দর আপনার চেহারা, তবুও বলেন বিশ্রী? তাহলে সুশ্রী মেয়ে হয়ত আমি কোনদিন দেখিই নি। আপা! আপনার চোখ চেপে ধরাতে কি রাগ করেছেন?

ঃ রাগ করব না? একজন অপরিচিত ব্যক্তি একজন পরিচিত মেয়ের চোখ টিপে ধরবে, এটা কি রাগ করার বিষয় নয়। এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত মেয়েদের পিছনে----?

শেষটায় চোর বললেন! চোর তো আর আমি নই, চোর হলেন আপনি, কারণ, এক চাহনিতেই আমার মন-প্রাণ চুরি করে নিয়েছেন। কেন অন্যকে চোর বলেন? আপনি শুধু চোরই নন, এর বড়টা। কারণ, চোর চুরি করে রাতের বেলায়, আর আপনি চুরি করেছেন দিবালোকে। চোরে চুরি করে টাকা-পয়সা আর আপনি চুরি করেছেন আমার মন এবং আত্মা। আপা একটি কথা বললে রাখবেন কি?

ঃ বলতে পারেন, ভেবে দেখব।

ঃ আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, দু-জন সারা রাত -----।

ঃ কেন? আপনার রীনা কোথায়? আপনি নাকি আমাকে রীনা মনে করেই চোখ টিপে ধরেছেন। একজনের কয়জন মেয়ে বান্ধবী থাকতে পারে? একজনে মন ভরে না বুঝি?

ঃ এখনো আপনি রীনার কথা ধরেই বসে আছেন। রীনা হয়ত সি. ও. সাহেবের হাত ধরে চলে গেছে। সে এক-একদিন এক-একজনের সাথে এখানে সেখনে ঘুরে বেড়ায়। নিচের দিকের কর্মচারী তো তাই অফিসারদের মন যুগিয়ে চলতে হয় তাকে। না হয়-----

ঃ না, প্রেম বাজারে কেনা-কাটা করার মত এত সস্তা জিনিস নয়। যান, আপনার কাজে আপনি চলে যান।

ঃ আপনি মনে হয় একজন খাঁটি আফগান নারী। আফগানীরাই এত ভীষণ কঠিন প্রকৃতির। তাজিক ও উজবিকরা এত কঠোর নয়। ওরা খুব নম্র ও ভদ্র।

সকলের বেলায়ই ওরা উদার। আফগান মেয়েদের কাছে বারবার প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়েছি। আজ আবার একই দশা। এক চাহনীতেই যে মনটা কেড়ে নিয়েছেন, তাই তো-----।

মাহমুদা অন্যমনস্ক , কি যেন ভাবছে ও। আলম হঠাৎ করে মাহমুদার হাত থেকে ডায়েরীটা ছিনিয়ে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগল এবং বলল, "ইস, কি সুন্দর হাতের লেখা। অমন দুটি হাত যদি আমার থাকত। লেখার কত স্টাইল, কত ডিজাইন। সত্যিই দেখার মত।" এগুলো বলতে বলতে এক পর্যায়ে আতিকার রংগিন ছবিটি পেয়ে গেল। ছবির অপর পৃষ্ঠায় তার কলেজের পূর্ণ ঠিকানা রয়েছে। আলম মাহমুদার অগোচরে তা হাতিয়ে নিল। মাহমুদা আলমের হাত থেকে ডায়েরীটি ছিনিয়ে নিতে নিতে বলল, "এত প্রশংসার প্রয়োজন নেই, বেশি প্রশংসা ভাল না। পুরুষরা অতিরিক্ত প্রশংসা করে নারীদের মন জয় করতে চায়। এ সম্পর্ক বেশি দিন টিকে না। পুরুষরা ভ্রমরের মত, যারা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় মধু খাওয়ার জন্য, মধু ফুরিয়ে গেলে বাগানের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। এবার আপনি আসতে পারেন।

এতক্ষণে সূর্যটা রঙ্গিন রূপ ধারণ করে ডুবে যেতে চাচ্ছে। সন্ধার শীতলতার পরশে দুনিয়াটা যেন ক্রমানন্বয়ে শান্ত হয়ে আসছে। পরিশ্রান্ত কিরণমালা পর্বত শৃংগের ওপর দিয়ে লালিমা ছড়িয়ে বিদায়ের পাঁয়তারা করছে। শান্ত সমীরণ সন্ধার আগমনী বার্তা নিয়ে দিক-দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। পাখীরাও আপন আপন সাথীদের নিয়ে নিজ নিজ গৃহের দিকে যাচ্ছে।

তরুণ-তরুণীরাও প্রেমালাপের ইতি টেনে নিজ আলয়ে ফিরে যাচ্ছে। এতক্ষণে অর্ধেকেরও বেশি লোক পার্ক ত্যাগ করেছে। কেউ কেউ আলাপের শেষ অংশটুকু শেষ করার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে। যারা আলাপের গভীরে হারিয়ে গেছে এরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপের ইতি টেনে পার্ক ত্যাগ করবে।

মাহমুদার হৃদয়ে তোলপাড় চলছে। যদিও সে নীরব বসে আছে। সে তার মনের সাথেই গল্প করছে। বহুদিনের কাংখিত চেহারার সন্ধান পেয়েছে আজ। তাও ক্ষণিকের তরে। মনের পিঞ্জিরে যদি বেঁধে রাখা যেত লোকটিকে। রশি দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখা যায় না। মানুষকে বেঁধে রাখা যায় একমাত্র ভালবাসা দিয়ে। এসব নিয়ে একা একা ভাবছে মাহমুদা। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, এবার ওঠা দরকার। তার মনে সংশয় এ চেহারাটির দর্শন আবার জীবনে কোন দিন পাব কি না! এসব চিন্তা বার বারই উঁকি মারছে তার হৃদয় আঙ্গিনায়। হঠাৎ পরিচয়, মুখ

খুলে এসব কথা বলাও সমীচিন নয়। কারণ, পুরুষরা ভ্রমরের মত, তারা শুধু এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘুরে বেড়ায়। মধু ফুরিয়ে গেলে ফুলের কথা ভুলে যায়। যে ছেলেটি তার সহপাঠী মনে করে চোখ টিপে ধরেছে। সে হয়ত তার কাছে অধিক প্রিয়, রীনার সাথে হয়ত তার সম্পর্ক আরও গভীর। তা না হলে এমন করে চোখ টিপে ধরে কিভাবে। এসব চিন্তা মাহমুদার অন্তর চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে।

আলম মাহমুদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ভাবছেন, আপা? বাসায় ফিরবেন না? সবাই তো চলে যাচ্ছে। এত কি চিন্তা করছেন? যার জন্য অপেক্ষা করছেন সে বুঝি আসে নি। তাই এত চিন্তা এত পেরেশানি।" আলমের কথাগুলো মাহমুদার অন্তর কাঁপিয়ে দিল। কি উত্তর দিবে সে ভেবে পাচ্ছে না। একটু নীরব থেকে অধরে হাসির রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বলছেন?" আলম উত্তর দিল, "আমার কথা শুনেন নি বুঝি? আমি জিজ্ঞাসা করেছি, আপনার কাঙ্খিত ব্যক্তিটি এখনও আসে নি বলে অপেক্ষা করছেন নাকি? সময় কিন্তু কারো জন্য অপেক্ষা করে নি।"

এবার মাহমুদার নিমগ্নতা ভেঙ্গে সচেতনতা ফিরে এল। আবছা অন্ধকারে পুরো পার্কটি ছেয়ে গেছে। এবার বিলম্ব না করে ঝট-পট চপ্পল দুটি পায়ে দিয়ে ডায়েরীটা হাতে নিয়ে বাসার দিকে চলল। আলমও তাকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে আসছে। যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল ততই বিদায় বাঁশির মিহিন সুরে মাহমুদার অন্তর দলিত মথিত হতে লাগল আর বিরহের অনল যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা অনুভব করতে লাগল।

আলমও মনে মনে অনেক কথা ভাবছে, আর মনে মনে বলছে, "হায়! এই তো একটু পরে চলার গতি থেমে যাবে। আর কয়েকটি বাড়ি পেরিয়ে একটু অগ্রসর হলেই দুজনকে দুপথ ধরতে হবে। অনেক কথাই বলা হল না, কেনই বা এসেছিলাম এ পড়ন্ত বেলায় পার্কে। আর কেনই বা দেখা হল এই মেয়ের সাথে। এসব ভাবনায় এবং মাহমুদাকে হারানোর আশংকায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

এসব ভাবনার মাঝেই কোন সময় যে দুরাস্তার মোড়ে চলে এল কেউই খেয়ালই করে নি। আলম তার বাড়ির রাস্তার দিকে না গিয়ে মাহমুদার রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগল। মাহমুদা তার বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। পা যেন তার ভিতরে প্রবেশই করতে চায় না। মাহমুদা কি যেন একটু চিন্তা করে আলমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা এবার তাহলে আসি।" এই বলে সে ভিতরে চলে গিয়ে গেট বন্ধ করে দিল। আলম গেটের অপর পার্শ্বে বিদ্যুতের খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল।

মাহমুদা দরজা খুলে গৃহে প্রবেশ করে ডায়েরীটা টেবিলে রেখে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, বাহঃ কত সুন্দর চেহারা! কি চমৎকার তার দেহের গড়ন। কথার ভঙ্গিও কত সুন্দর, কত ভদ্র ব্যবহার। হাত দুটি কত নরম, কত মোলায়েম। চোখ টিপে ধরাটার মধ্যে কত আন্তরিকতার ইঙ্গিত বহন করে। ধরুক না সে জেনে অথবা না জেনে, তাতে কি! কোন দিন কি এর বদলা নেওয়ার সুযোগ হবে। সে তো ক্ষমা চেয়েছিল, আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। ওকে তো কিচ্ছুই বলে নি। না তাকে ক্ষমা করব না, যেভাবেই হোক প্রতিশোধ নেব। ওর চোখ দু-টি যে করেই হোক একদিন চেপে ধরব। বসে বসে মাহমুদা অনেক কিছু ভাবছে।

মাহমুদা হঠাৎ করে চেয়ার ছেড়ে করিডোরে বেরিয়ে এল। একটু পায়চারি করে ফটকের কাছে চলে গেল। নিজকে একটু আড়াল করে ফটকের ছিদ্র পথে বাইরে তাকাল। আলম ভাবছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি বিদায় লগ্নের সময় শেষবারের মত একটু দেখে নিতে পারি কিনা। তাই আস্তে আস্তে ফটকের দিকে অগ্রসর হয়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র পথ আবিষ্কার করল। ঐ ছিদ্র পথে দুজনই এক সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং উভয়েরই দুচোখের মিলন ঘটে গেল। চোখের অভিসারে উভয়ে এক অবর্ণনীয় তৃপ্তি অনুভব করল। যা প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না।

কেননা, -------।

ইশক মে কিয়া মজা হে, আশিকুছে পুছলো,
শাখে গুলমে কিয়া মজাহে, বুলবুলছে পুছলো।

অর্থাৎ প্রেমের মধ্যে কি মজা আছে, তা একমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকারাই বুঝতে পারে। আর ফুল গাছের ডালে কি মজা, তা বুলবুলিরা ভাল বলতে পারে।

মাহমুদা এক অভিমানী মেয়ে। অভিমান তার গর্ব। অভিমান তার সৌন্দর্য। যখন তখন অভিমান করে। হঠাৎ চার চোখের মিলনে সে দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। আলম আরো একটু দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। কিছু দুর অগ্রসর হলে সে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কণ্ঠস্বরটি অফিসের কেরানী সাহেবের। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, স্যার, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? প্রশ্ন শুনে আলম সাহেবের চলা হঠাৎ করে থেমে গেল। জ্বী, কি বলছেন কেরানী সাহেব? বলে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, চিন্তায় বিভোর থাকায় কোন সময় বাড়ি পিছনে ফেলে গ্রামের রাস্তা ধরেছেন বলতেই পারেন নি। ইশক বা প্রেম

মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, নিয়ে যায় এক মায়াময় প্রান্তরে। প্রেম তাকে পৃথিবীর অন্য সব কাজ ভুলিয়ে দেয়। প্রেম সাগরে যে তরী ভাসায় সে হারিয়ে যায় অচিন দেশে। আলম সাহেব গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে বললেন, একটু পায়চারী করতে বের হয়েছি। কেরানী সাহেব একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। দোকান থেকে একটি সিগারেট নিয়ে বলল, নিন স্যার সিগারেট খান। আলম সাহেব হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে নিতে বললেন, "আগামীকাল আমার একটি জরুরী কাজ আছে। কাল হয়ত অফিসে যেতে পারব না। আপনার কাজগুলো গুছিয়ে নিবেন।" আচ্ছা স্যার, তা করা যাবে, বলল কেরানী সাহেব। আলম সাহেব সিগারেট পান করতে করতে বাসার দিকে পা বাড়ালেন। তার পা বার বার থেমে যেতে চায়। তার কি যেন হারিয়ে গেছে। কোথায় যেন তার কি রয়ে গেছে। কি যেন পেয়েও পেলেন না। এসব ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলেন। কাজের বুয়া একটু আগে রান্না করে খাবারগুলো গুছিয়ে রেখে গেছে। আলম সাহেব বাথরুমের কাজ সেরে হাত পা ধুয়ে খানা খেতে বসলেন, দু-তিন লোকমা গলধঃকরণ করার পর মনে হল, কে যেন ক্ষিধা সব কেড়ে নিয়ে গেছে। খানা খেতে মোটেও ইচ্ছা করছে না। তাই না খেয়ে হাত মুখ ধৌত করে থালা-বাসন যথাস্থানে রেখে একটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। খোলা বাতায়নে তার দৃষ্টি নিবন্ধ। একটু একটু বাতাস বইছে।

নিঝুম রাত। চারদিক ছেয়ে আছে কাল অন্ধকারে। দূর আকাশে তারকারাজি মিটমিট করে জ্বলছে। মনে হয় কার ইশারায় যেন তারা মিটিমিটি হাসছে। মাহমুদা এপাশ ওপাশ করছে। ঘুম আসছে না তার দুনয়নে। এতক্ষণে ব্যস্ত শহর অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। পথে লোক চলাচল অনেক কমে গেছে। মাঝে-মধ্যে দু-একটি ট্রাক দানবের মত মাটি কাঁপিয়ে চলছে এক শহর থেকে অন্য শহরে। মাহমুদা শুয়ে শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল, সত্যিই কি আমি আমার মনের মানুষটির খোঁজ পেয়েছি? না এটা কোন স্বপ্ন? যুবকটি অন্য কিছু নাতো। আমি কি এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছিলাম। বাস্তব তা হলে কি? যদি তা বাস্তব হত তাহলে সে আমার পাশে নেই কেন? না এটা বাস্তব নয়, আলেয়া মাত্র। মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। আবার অন্য ভাবে চিন্তা করে বলল, না এটা বাস্তব। হায়! তার সাথে তো কিছুই বলা হল না। বাসা তো আজ খালি ছিল, কেন তাকে নিয়ে এলাম না। সে তো উঁকি ঝুঁকি দিয়ে তাকাচ্ছিল। এমন সুযোগ কি আর কোন দিন আসবে? এমন নির্জন খালি বাসা কি আর কোন দিন পাব। তাহলে কি আমি ভুল করেছি? এত অভিমান করা ঠিক হয়

নি। এসব চিন্তায় মাহমুদার চোখে ঘুম নেই। এসব নিয়ে কেবলই চিন্তা-ভাবনা করছে। জাগ্রত রজনী ভোর হতেই চায় না। অপেক্ষা মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। তাই তো কবির ভাষায় বলতে হয়–

ঃ আইয়্যামে মছিবত যাতে নেহি যাতে,
মছিবত কি ঘড়িওমে কাটতে নেহি কাটতে।

অর্থাৎ দুঃখের দিনগুলোর অবসান এত সহজে হয় না। আর কষ্টের সময়গুলো সহজে কাটতে চায় না।

উভয়ে প্রায় একই অবস্থার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। নিঝুম রাতে নির্ঘূম নয়নে একে অপরকে নিয়ে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। উভয়ের মনেই মিলনের প্রত্যয়। কিন্তু একে অপর থেকে আলাদা। আলম ভাবছে কাল সকালেই দাঁত মাজতে মাজতে মাহমুদার গেইটের সামনে যাবে, হয়ত তার সাথে দেখা হয়েও যেতে পারে। দেখা হলে সারাটি রাত কিভাবে কাটিয়েছি জানতে চাইবে। আবার ভাবছে, এডভোকেটের সাথে সাক্ষাত হলে অথবা তিনি যদি দুজনকে একসাথে কথা বলতে দেখেন তাহলে হয়ত খারাপ ভাবতে পারেন।

মাহমুদার মনেও চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। আবার এটাও ভাবছে যে, পুরুষ জাতটা খুবই নিষ্ঠুর। সে হয়ত রীনাকে ভালবাসে। এখন আবার আমাকে দেখে আমার সাথে ভাব জমাতে চায়। কদিন পরে আবার অন্য কাউকে পেলে আমাকে ভুলে যাবে। একটু চিন্তা-ভাবনা করে সামনে এগুতে হবে, যাতে পিছলে পড়ে যেতে না হয়। মাহমুদা এসব কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা বলতেই পারল না।

[পাঁচ]

মহাকালের চাকা তীব্র গতিতে বিরামহীনভাবে ঘুরছে। সময় বদলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। এ পরিবর্তন শাশ্বত, চিরন্তন নিয়ম। আল্লাহপাক কাউকে ইজ্জত দান করেন আর কাউকে বেইজ্জতি করেন। কাউকে রাখেন অট্টালিকায়, কাউকে শোয়ান গাছতলায়। কাউকে দান করেন রাজ সিংহাসন আর কাউকে করেন পথের ভিখারী। এটিই আল্লাহর নিয়ম। আফগানিস্তানের ভাগ্যও দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। বাবরাক কারমালের শাসনামলে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে ছেয়ে দিয়েছিল সারা আফগানিস্তান। তার অন্যায়-অবিচার মুসলমানরা নীরবে সয়ে যায় নি। তারা চুপ করে বসেও থাকেন নি। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে জিহাদ আরম্ভ করে দিলেন। বাবরাক কারমাল বহু চেষ্টা করেও মুজাহিদদের তৎপরতা বন্ধ করতে পারলেন না। তাঁর ব্যর্থতার কারণে মিখাইল গর্ভাচেভ বাবরাক কারমালকে অপসারণ করে ১৯৮৬ সালে ডঃ নজিবুল্লাহকে ক্ষমতায় বসায়। ডঃ নজিবুল্লাহ ক্ষমতায় এসে কমিউনিস্টদের সুযোগ-সুবিধা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেন। দ্বীনদার পরহেজগার চাকরিজীবীদের বরখাস্ত করে বেদ্বীন লোকদেরকে শূন্যপদে চাকরি দেন। তিনি সর্বস্তরে কমিউনিস্ট পন্থীদের বসালেন।

বাবরাক কারমালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মিস্টার নজিবুল্লাহ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সোভিয়েতে পাঠাতেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। তাদের সরকারী ভাতাও দিতেন মোটা অংকে। রাশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারাই একবার ঢুকত, তারাই বেঈমান হয়ে বেরিয়ে আসত। তাদের শিক্ষার সামান্য চিত্র নিচে তুলে ধরা হল।

রাশিয়ার ছাত্রাবাসগুলোতে ছাত্রীদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। যুবক-যুবতীরা একই সাথে লেখা-পড়া, চলা-ফেরা, থাকা-খাওয়া ও ঘুরা-ফেরা করে। ফলে পশুত্ব এদের চরিত্রকে দখল করে নিয়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে পোষাকেরও কোন ব্যবধান নেই। হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট অথবা আরো সংক্ষিপ্ত পোষাক এরা ব্যবহার করে। ওড়না-বোরকা বা ঢিলেঢালা পোষাকের কোন বালাই নেই। ছাত্রাবাস থেকে প্রতিদিন ভোরে সুইপাররা কনডম কুড়িয়ে বালতি ভরে নিয়ে যেত। ইচ্ছা করলেও এদেশে বেহায়াপনা থেকে বাঁচার সুযোগ নেই। পাকিস্তানের খালিদ নামক এক যুবক এসব অশ্লীলতা, অপরাধ থেকে কয়েক বারই বাঁচার চেষ্টা করেছিল। অনেক মেয়েরা এসে তার কাছে খারাপ কাজের

দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকের নিকট গিয়ে বিচার দায়ের করল। শিক্ষক খালিদকে ডেকে পাঠালেন অফিস কক্ষে। অফিসে আরও কয়েকজন কমকর্তা উপস্থিত ছিলেন। চার পাঁচ জন ছাত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল অফিস কক্ষে।

প্রফেসর খালিদকে লক্ষ করে বললেন, এই ছাত্রীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে, তুমি নাকি ওদেরকে পাত্তা দাও নি, তা কি সত্য?

খালিদ বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না স্যার!

প্রফেসর আবার বললেন, এই মেয়েরা কি তোমার কাছে গিয়েছিল?

হ্যাঁ গিয়েছিল। ওরা আমাকে পড়ার সময় প্রায়ই ডিস্টার্ব করে। তাই ধমক দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি, বলল খালিদ।

প্রফেসর চেহারা লাল করে বললেন, "তোমাকে যদি ছাত্রাবাসে থাকতে হয় তবে নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। কোন ছাত্রী যদি তোমার নিকট কিছু আবদার করে তবে অবশ্যই তাদের চাহিদা তোমাকে মিটাতে হবে। আর যদি তুমিও কোন ছাত্রীর কাছে কিছু দাবী কর, তবে ওরাও তোমার খাহেশ মিটাতে বাধ্য থাকবে। এটা ভার্সিটির নিয়ম। যাও আর কোন দিন যেন এ ধরনের কোন বিচার অফিসে না আসে।

এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী নিয়ে দেশে আসলে ডঃ নজিবুল্লাহ তাদেরকে বড় বড় চাকরি দিতেন। রাশিয়ানরা মেধা বা প্রতিভা যাচাই করে তাদেরকে সে অনুপাতে শিক্ষা দিত। যেমন কাউকে ডাক্তার, কাউকে ইঞ্জিনিয়ার, কাউকে ইতিহাস, কাউকে বিজ্ঞান, কাউকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে শিক্ষা দিত। এরা দেশে ফিরে সম্মানজনক পদে চাকরি পেত। তাদের মগজ থেকে তাওহীদ ও ইনসানিয়াত ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে নাস্তিক বানিয়ে দেশে পাঠাত।

আলীবর্দীর একমাত্র ছেলে সুফিয়ান দীর্ঘ কয়েক বছর রাশিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করে। বাবরাক কারমালের আমল থেকে ডঃ নজিবুল্লাহ সরকারের প্রথম ২ বছরের মাথায় উচ্চ ডিগ্রী কমরেড উপাধি নিয়ে সুফিয়ান দেশে ফিরে আসে। ডঃ নজিবুল্লাহ তাকে গণসংবর্ধনা জানায় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে বরণ করে নেন। সরকার সুফিয়ানকে প্রথম বারে সচিবের চাকরি দেন। তিন মাস পরই তার চাকরি স্থায়ী হবে। সরকারী কোয়ার্টারও দেয়া হল তাকে। বেতনও তার দশ কর্মচারীর সমান।

সরকারের সাথে দেখা সাক্ষাতের পর্ব সেরে সুফিয়ান ফিরে আসল নিজ গ্রামে, নিজ বাড়িতে। সুফিয়ানের বাড়ী ফেরার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দশ গ্রামের জনগণ এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগল আলীবর্দীর বাড়িতে। সকাল, বিকাল, দুপুর সন্ধায় লোকের ভীড়। একদল আসে একদল যায়।

অনেকেই বলাবলি করতে লাগল যে, "আলীবর্দী গাধার মত খাটুনী খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়ে, নিজে না পরে ছেলেকে পরিয়ে তাকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আলীবর্দীর কষ্টের দিন শেষ।

একজন বললেন, "আরে আলীবর্দীকে দেখেছি বাজারে কুলির কাজ করতে। আবার কখনো কখনো দেখেছি ক্ষেত মজুরের কাজ করতে, আবার কখনো তাকে দেখেছি রাখালের কাজ করতে, কিন্তু জীবনে দেখি নি তাকে ভাল একটি জামা, ভাল একটি পাজামা গায়ে দিতে। তাকে দেখেছি কঙ্করময় প্রান্তরে মাইলকে মাইল পথ নগ্ন পায়ে হেঁটে যেতে। গতর খেটে সন্তানকে সে কত বড় শিক্ষিত করেছে। এদেশে এতবড় শিক্ষিত লোক দ্বিতীয় কেউ নেই। এ সন্তান আলীবর্দীর বড় কষ্টের ফসল। এখন সুখ তার দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। কত সৌভাগ্য আলীবর্দীর ভাবা যায়!"

এক মহিলা গুলজানকে লক্ষ্য করে বললেন, "বোন তোমার দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়েছে। ছেলেকে বড় শিক্ষিত বানিয়েছ। শুনেছি বড় ধরনের চাকরিও নাকি পেয়েছে। এখন আর তোমাকে পাহাড়ে পাহাড়ে ছাগল চরাতে হবে না। মানুষের বাড়ির গম পিষে আটা আর ছাতু বানাতে হবে না। তালিযুক্ত কাপড় আর তোমাকে পরতে হবে না। দোয়া করি সুখে থাক, শান্তিতে থাক, ঈমান-আমল নিয়ে মান-সম্মানের সাথে দিন গুজরান কর।"

আলীবর্দী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর কারণে অকালেই বার্ধক্য এসে ঘাড়ে সোয়ার হয়েছে। চুল-দাড়ী সাদা। চোখ দুটি কোঠরাগত। চামড়া ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বার্ধক্যজনিত কারণে এখন আর তাকে কেউ কাজে ডাকেন না। বাজারের মুটেগিরীর কাজ শরীরে কুলায় না। অনাহার আর অর্ধাহার তার ঘরের নিত্য দিনের মেহমান। মাঝে-মধ্যে দুএকটি ছাগল বিক্রি করে। আবার কখনো ছাগলের দুধ ও দধি বিক্রি করে হাট-বাজার করেন। এতেও সংসারের অভাব অনটন দূর হয় না। সুফিয়া পিতার এই নাজেহাল অবস্থা দেখে সইতে পারল না। তাই সে রফিকার নিকট থেকে হস্তশিল্প নিয়ে (অর্থাৎ রুমাল, টুপী, গেঞ্জি ও মোজা বুনন) পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সুফিয়া টুপী, গেঞ্জি বুনত। বিভিন্ন ডিজাইনের টুপী, হরেক রকম মোজা, মাফলার, গেঞ্জি বুনতে লাগল। এসব কাজে অল্প ক'দিনে বেশ দক্ষতা অর্জন করল সুফিয়া। সুফিয়া যদিও রফিকার নিকট থেকে এসব বুনন শিখেছে, এখন কিন্তু সে রফিকাকে পিছনে ফেলেছে। রফিকার ১টার সাথে সুফিয়া তিনটা তৈরি করে।

সুফিয়া মিশকাত শরীফের ছাত্রী। লেখা-পড়ার পর তার হাতে তেমন সময় থাকে না। সংসারের দুরবস্থা দেখে কি করবে না করবে, পিতা-মাতাকে কিভাবে সাহায্য করবে এসব নিয়ে ভাবছে সুফিয়া।

একদিন রফিকার সাথে সংসারের অভাব-অনটন ও অন্যান্য খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে পরামর্শ করল সুফিয়া। রফিকাও মিশকাতের ছাত্রী। একই সাথে কাটে তাদের দিন-রাত। সুফিয়ার যেদিন খানা জুটে না, সেদিন রফিকার খানা ভাগ করে দু'জনে খায়। সুফিয়াদের অবস্থা রফিকার কাছে গোপন ছিল না। তাই সুফিয়াকে রফিকা একটি পরামর্শ দিল, "আমার হাতে কিছু টাকা আছে, তা দিয়ে রং-বেরং এর সূতা এনে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যদি কিছু টুপী, মোজা, গেঞ্জি ও রুমাল দু'জনে মিলে তৈরি করি তা হলে এগুলো বিক্রি করলে বেশ টাকা আসবে। তা দিয়ে সংসারের জরুরত পূরণ করা যাবে। সুফিয়া একটু ভেবে রাজি হল। রফিকা টাকাগুলো আলীবর্দীর হাতে দিয়ে বলল, "চাচাজান! বাজার থেকে আমাকে কুশী কাঁটা ও সুঁই-সুতা এনে দিবেন।"

আলীবর্দী তাই করলেন। এবার সুফিয়া ও রফিকা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সুঁই কাটার কাজ করতে লাগল। এক সপ্তাহে তারা বেশ কিছু টুপী ও গেঞ্জি তৈরি করল। তারপর এগুলো দিয়ে আলীবর্দীকে বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাল। বাজারে নেয়ার সাথে সাথে ক্রেতারা হাতে হাতে নিয়ে গেল মালগুলো। দাম যা চেয়েছে, তা দিয়েই সবাই নিয়েছে। কারণ, এত সুন্দর জিনিস এ বাজারে কেউ কোন দিন দেখেন নি। এই ধরনের জিনিসের চাহিদা প্রচুর। আলীবর্দী হিসেব করে দেখলেন, সূতার মূল্যের চেয়ে টুপী-মোজাগুলো অনেক গুণে বেশি মূল্যে বিক্রি হয়েছে। তিনি আরও কিছু সূতা কিনে সন্ধায় বাড়ি ফিরলেন। বেচা-কেনার খবর শুনে উভয়ের আনন্দ দেখে কে? সাথে সাথে দু-রাকয়াত নামায আদায় করে আল্লাহর শোকর আদায় করল সুফিয়া ও রফিকা।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সুফিয়ার সমবয়সীরা কতইনা আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আর সে গ্রামে বসে নেই। গুলজানর শরীরও আগের তুলনায় অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি ঝর্ণা থেকে দুই মশক পানি একাই বহন করতে পারতেন। এখন তাকে ছোট এক মশক পানি নিয়ে কয়েক স্থানে বিশ্রাম করে ঘরে ফিরতে হয়। মেষপালগুলোকে পানি পান করাতে সময় লেগে যায় কয়েক ঘণ্টা। সুফিয়া লেখাপড়া ও হাতের কাজ করে মায়ের কাজে সহযোগিতা করার সময় পায় না।

সুফিয়া আয়ের কিছু টাকা ও ৩টি ছাগল বিক্রি করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছে। রফিকা তাকে কামিজ, সেলোয়ার, বোরকা ইত্যাদি কাটা ও সেলাই করা শিক্ষা দিয়েছে। এখন পল্লীর মহিলারা সুফিয়ার কাছ থেকেই পোষাক তৈরি করায়। কাজের ঝামেলা বেশি হলে রফিকা তাকে সাহায্য করে। সুফিয়া ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১২ ঘণ্টা লেখাপড়া করে ৬ ঘণ্টা সেলাই কাজ করে। আর ৬ ঘণ্টা ঘুমায়, বিশ্রাম করে। এভাবেই চলছে তার দিনগুলো। সুফিয়া সংসারের হাল ধরাতে আলীবর্দীর পেরেশানী অনেকটা লাঘব হয়েছে।

[ছয়]

সুফিয়ানের চাল-চলন, উঠাবসা, চলাফেরা ও কথা-বার্তায় আলীবর্দী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে বটে কিন্তু ঈমানের মত মহামূল্যবান সম্পদ সে হারিয়েছে। তিনি মনের দুঃখে বিড় বিড় করে বলছিলেন, "বাবা! তুমি কয়েক ঠেলাগাড়ী বোঝাই ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরতে পার কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলে না!" এ শিক্ষা-দীক্ষা তার জন্য ভীষণ কষ্টের কারণ।

মসজিদে আযানের পরই প্রথম যে লোকটির সাক্ষাত মেলে তিনিই হলেন আলীবর্দী। এটা তার বুড়ো বয়সের আমল নয়, ছোট থেকেই সে মসজিদ মুখী। কালের মহাচক্রও তার এ নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে নি। আযান হলে প্রতিটি ঘর বা তাঁবু থেকে বৃদ্ধ-জোয়ান, বালক-নাবালক নির্বিশেষে সকলে ছুটে চলে মসজিদ পানে। এ পল্লীর কেউই অলসতা অবহেলা করে জামায়াত তরক করেন না। অথচ সুফিয়ান নামাযের সময় প্যান্ট-শার্ট পরে বা মোটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায়। মুসল্লীরা তার এ আচরণ মোটেই সহ্য করতে পারছে না। মনে হয়, সে যেন ইচ্ছা করেই আলীবর্দী ও অন্যান্য মুসল্লীদের অন্তরে আঘাত হানার জন্যই এমনটি করে। নামায শেষে সুফিয়ানের ছেলেবেলার সাথীরা যখন বেরিয়ে আসে তখন ওদেরকে লক্ষ্য করে বলে, "কিরে তোরা তোদের খোদার কাছ থেকে কি নিয়ে এলি দেখাবি কি?"

তাঁর বে-আদবীসুলভ এসব আচরণে এক যুবক অধৈর্য হয়ে বলল, "খামুশ বে-আদব! এ ধরনের কথা বলে বেঈমানরা। এখনই তোর তাওবা করা উচিত।"

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে দিল সুফিয়ান এবং বলল, ঈমান আবার কি জিনিস? এবারও যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল, "তুই তো বেঈমান, নাস্তিক হয়ে গিয়েছিস। কি শিখেছিস বিদেশে গিয়ে। তোর কথা ও শিক্ষার প্রতি আমি থুথু দিই। তোর সাথে আমাদের কোন কথা নেই। এই বলে যুবকরা সবাই যার যার বাড়ী চলে গেল।

আলীবর্দী নামাযের সময় হলেই সুফিয়ানকে বলতেন, "চল বেটা, চল! নামায পড়ি গিয়ে।" আলীবর্দী নামাযের তাকিদ দেওয়াতে অস্বস্তিবোধ করত সুফিয়ান। এসব দেখে কষ্ট-যন্ত্রণার ভাষায় গালি দিতে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করত না। আলীবর্দীর বুকচিরে একটি শব্দ শুধু বেরিয়ে আসত আহ!

অনেক সময় আলীবর্দীর সমবয়স্ক মুরুব্বীরা আলীবর্দীকে তিরষ্কার করে বলতেন, "গাধার মত খাটুনী খেটে, শরীরের রক্ত পানি করে, ক্ষেত মজুরী আর কুলিগিরীর কাজ করে, নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাইয়ে, নিজে না পরে, ছেলেকে পরিয়ে তাকে উচ্চ শিক্ষিত করেছ, এখন দেখি ছেলেটি একেবারে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। ছেলেটা পাক্কা বেঈমান।"

কেউ কেউ মন্তব্য করে বললেন, "এতো আসলে মানুষ নয়। এ হল পালের নাদুল-নুদুস পাঁঠা। ও যা বলে তা কোন মানুষের মুখে শোভা পায়? ওসব শিক্ষার প্রতি আমরা ধিক্কার জানাই।"

সুফিয়ান পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে কিছু পুরাতন বন্ধু বান্ধবকে একজোট করেছে। এদেরকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিকালের কিছু সময় বা চাঁদনী রাতে কোন এক অনুচ্চ পাহাড়ের টিলায় বসে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। রাশিয়ার দেয়া ফর্মুলা ও ডঃ নজিবুল্লাহর দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী সে তার কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। সুফিয়ানের উদ্দেশ্য হল এসব যুবকের মেধা নষ্ট করে দেয়া, তাদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে তৈরি করা। মহল্লার যুবতীরা যেন শান্তিতে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে চলতে না পারে সে ব্যবস্থা করা।

অল্প কদিনের মধ্যেই তার মিশন অনেকটা এগিয়ে গেল। চার, পাঁচ যুবককে তার চিন্তা-চেতনার অনুসারী করে গড়ে তুলল। বাকিরা তার কথাবার্তা শুনে থুথু নিক্ষেপ করে কেটে পড়েছে। যে চার পাঁচ জনকে সে হাত করে নিয়েছে এরা সবাই মসজিদের প্রথম সারির মুসল্লী ছিল। এখন তার সংশ্রবে এসে নামায ছেড়ে দিয়েছে। অভিভাবকদের ভয়ে মাঝে মধ্যে একটু-আধটু মসজিদে যায় বটে কিন্তু মন তাদের সুফিয়ানের পকেটে।

অল্প কদিনের মধ্যেই তাদের চলাফেরা হাব-ভাব দেখে এলাকার মুরব্বীরা বিষয়টা বুঝতে পারল। এলাকার মানুষ এদের আচরণে দিনদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ছেলের অন্যায় আচরণের কারণে রাস্তাঘাটেও আলীবর্দীকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। তাকে অনেকের অনাকাঙ্খিত অনেক কথার জবাব দিতে হচ্ছে। একদিকে অভাব-অনটনের কষাঘাত, অপর দিকে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা আবার এদিকে পুত্রের জ্বালা-যন্ত্রণা। সব মিলিয়ে আলীবর্দী এখন ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে পালানোর রাস্তা খুঁজছেন। সুফিয়ান পিতা-মাতার কোন কাজে সামান্যতম সহযোগিতাও করে না। বন্ধন মুক্ত খাসী যেমন চারণভূমিতে বিচরণ করে ফিরে, তার অবস্থা অনেকটা সে রকম। শুধু খাওয়ার সময় তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়।

একদিন রাতের আহারাদি সেরে আলীবর্দী ও তাঁর পত্নি গুলজান ছেলেকে নিয়ে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বসলেন। আলীবর্দী সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি আমার একমাত্র পুত্র। আমাদের হৃদয়ের আদর, ভালবাসা উজাড় করে তোমাকে বড় করেছি। শরীরের রক্ত পানি করে তোমাদের সুখ-শান্তি ও লেখা-পড়ার খরচ যুগিয়েছি। তুমি তো দেখেছ, কিভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছি আর তোমাকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অকাতরে মুক্ত হস্তে তোমার হাতে টাকা তুলে দিয়েছি। তোমার কি মনে আছে সেসব কথা? দেখ বাবা! এখন তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে। এলাকার মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি মূর্খতার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করবে। এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করবে। মানুষের মলিন মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু তোমার আচরণে মানুষ নিরাশ হয়েছে। তোমার কথায় লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। কেউ তোমার নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করতে চায় না।"

"দেখ বাবা! এলাকার আর দশ জন যুবক যেভাবে চলে, তুমিও সে ভাবে চলার চেষ্টা কর। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় কর। নামায মানুষকে ফাহেশা কাজ থেকে রক্ষা করে। মৃত্যুর পর সর্ব প্রথম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কাজেই নিয়মিত নামায পড়। আর রাস্তা-ঘাটে যার সাথে দেখা হয়, তাকে সালাম দাও। তাদের খোঁজ খবর নাও। এতে সকলের সাথে তোমার ভালবাসা গড়ে উঠবে।"

"বাবা! তোমার যে পোষাক-পরিচ্ছদ, তা মুসলমানদের নয়। এগুলো ইহুদী-নাসারাদের পোষাক। মুসলমানদের গায়ে এগুলো মানায় না। এসব পোষাক এখন আগুনে জ্বালিয়ে সুন্নতী পোষাক পর।"

তিনি আরো বললেন, "দাঁড়ী রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্ঠির আগে কাটা হারাম। দাঁড়ী না রাখা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। কাজেই এখন থেকে আর কোন দিন দাঁড়ি কামাবে না।"

আলীবর্দীর কথা শেষ হতে না হতে সুফিয়ান অগ্নিশর্মা হয়ে মুখ ভেংচিয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, "তোমাদের মত মূর্খ পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নেওয়াই আমার আজন্ম পাপ। তোমাদেরকে পিতা-মাতা হিসেবে পরিচয় দেয়াও আমার জন্য লজ্জাকর। আদিম যুগের অশিক্ষিত, মূর্খ ও বর্বর মানুষের মত ধর্ম বিশ্বাস তোমাদেরকে প্রগতির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আল্লাহ বলতে কিছু আছে? নেই। আবহমান কাল থেকে এ বিশ্ব যেভাবে চলছে, সামনেও ঠিক

সেভাবেই চলবে। কেউ মরলে পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যায়। পৃথিবীর সব জিনিসই মরে গেলে কিছুদিন পর মাটি হয়ে যায়। যারা মাটি হয়ে যাবে, তারা হিসাব-নিকাশ দিবে কি করে? মাটির নিচে কোন কেরানী খাতা কলম নিয়ে হিসাব করতে বসে আছে?

সুফিয়ান আরো বলল– লজ্জা-শরম বলতে কিছু নেই। লজ্জা-শরম বলতে মানুষ যা বুঝতে চায়, তা আদৌ ঠিক নয়। লজ্জা-শরম হল ভিরুতা, কাপুরুষতা ও সংকীর্ণ মনের বহিঃপ্রকাশ। ছোটকালে কেউ কাপড় পরাকে জরুরী মনে করে না। একজন পুরুষের কাছে কি আছে না আছে তা সবাই জানে, ঠিক তেমনিভাবে একজন যুবতীর নিকট কি আছে না আছে তাও ছোট বড় সবাই জানে তা যতই লুকিয়ে রাখা হোক না কেন; তা গোপন করে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। মানুষ পোষাক-পরিচ্ছদ যা ব্যবহার করে তা শুধু ধুলা-বালু ও শীত-গরম থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য। কেউ ইচ্ছা করলে কাপড় পরবে আর কেউ ইচ্ছা করলে উলঙ্গ থাকবে। এটা তার অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। দাঁড়ী রাখতে হয় দু একটি কারণে। বার্ধক্যের কারণে যাদের চোয়াল ভেঙ্গে গেছে। যখন তাদের ভাঙ্গা চোয়াল দেখতে খারাপ লাগে। যাদের মুখমণ্ডলে ব্রণ বা মেজতা ওঠে চেহারা বদলে গেছে, দেখলেই মানুষ তাকে ঘৃণা করে এদের জন্য দাঁড়ী রাখার প্রয়োজন আছে। এরা দাঁড়ীর আড়ালে এসব ঢেকে রাখে। আমার মত একজন সুশ্রী, সুদর্শন, টগবগে যুবককে দাঁড়ী রাখার পরামর্শ দেয়া মূর্খতারই নামান্তর। সুফিয়ান আরো বলল, "আমি শিক্ষার সর্বোচ্চ ময়দানে বিচরণ করেছি, বিশ্বের বৃহৎ বিদ্যাপীঠ মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিতে গলিতে ঘুরেছি। বড় বড় বিদ্যান ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা করেছি, সেখানে তো এ ধরনের অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনি নি। কাজেই, আজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আর কোনদিন যেন এ ধরনের কথাবার্তা আপনাদের মুখে না শুনি। অন্যথা চরম খেসারত দিতে হবে।"

ছেলের মুখে এ ধরনের বেঈমানী কথা শুনে আলীবর্দী ও গুলজান কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সারা রাত কারো চোখে ঘুম নেই। শুধু এপাশ ওপাশ করে তারা রাত পার করেন। আলীবর্দী গুলজানকে নিয়ে পরামর্শ করলেন, এ ধরনের ছেলেকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়া কখনো উচিত নয়। এত কষ্ট করে এতবড় করে গড়ে তুললাম যে ছেলেকে, সে মুখে মুখে এত কিছু বলতে পারল, যা কোন দিন কল্পনাও করি নি। সে তো মুরতাদ হয়ে গেছে। শরীয়ত তাকে কতলের হুকুম দিয়েছে। প্রশাসন যেহেতু আমাদের অনুকূলে নয়, সেহেতু তাকে ত্যাজ্যপুত্র

ঘোষণা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না। আলীবর্দী তাঁর কথা শেষ করে গুলজানের মতামত জানতে চাইলে গুলজান পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এই ছেলে এখন আর আমাদের নয় বরং শয়তানের। আজকেই তাকে এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে। ও বাড়িতে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আলীবর্দী আযানের সাথে সাথে মসজিদে চলে গেলেন। জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে ছোট বড় সব মুসল্লীদেরকে বসতে বললেন। মুসল্লীরা তাসবীহ-তাহলীল আদায় করে সবাই মিম্বরের সামনে গোলাকৃতি হয়ে বসে গেলেন। আলীবর্দী মিম্বরে উপবেশন করে মুসল্লীদের সামনে কেঁদে কেঁদে রাতের ঘটনাবলি শুনিয়ে বললেন, "আমার নাফরমান ছেলেকে হত্যা করে যদি তার খণ্ডিত মস্তকটি আমার সামনে কেউ পেশ করতে পারে, তবে তাকে আমার অর্ধেক ছাগল পুরস্কার দিয়ে দেব। তা না হলে আপনাদের সম্মুখে তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা দিয়ে দলিল লিখে দিব। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের মতামত জানতে চাচ্ছি।"

আলীবর্দীর কথা শুনে সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। পল্লী সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী সকলের মতামত নিয়ে বললেন। "প্রিয় পল্লীবাসী! সুফিয়ান যে মুর্তাদ হয়ে গেছে এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তার ওপর শরীয়তের হুকুম জারি করা যাবে না। কারণ, সে এখন সরকারের বড় একজন কর্মকর্তা। অর্থাৎ, ডঃ নজিবুল্লাহ্‌র খাস চামচা। এর ব্যাপারে চরম কিছু ঘটান ঠিক হবে না। আর কিছুদিন তাকে অবকাশ দিয়ে দেখি বুঝিয়ে সুজিয়ে দ্বীনের দিকে আনা যায় কিনা। বুঝানোর পরেও যদি ফিরে না আসে তারপরে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাছাড়া, সে তো তিন মাস পরে চাকরিতে যোগ দেবে। সরকারী কোয়ার্টারে চলে যাবে। কাজেই এখন তাকে কিছু বলে বা কিছু করে ফেৎনার সৃষ্টি করা ভাল মনে করি না।

তিনি মুসল্লীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "ইদানিং চার-পাঁচজন ছেলেকে তার সাথে বেশি বেশি ঘোরাফেরা করতে দেখছি। মনে হয়, ঐসব ছেলেরাও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা নিজ নিজ সন্তানদের সতর্ক করে দিন। ওরা যেন এখন থেকেই তার সাথে চলাফেরা, ওঠা-বসা ও কথাবার্তা বর্জন করে। তা না হয় তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"

পল্লী সর্দারের কথায় এলাকার ছোট বড় সবাই একমত প্রকাশ করলেন। সর্দারের সতর্ক বাণী শুনে অন্যান্য যুবকরাও সুফিয়ানের সঙ্গ ত্যাগ করে সতর্ক হয়ে গেল।

[সাত]

দীর্ঘ দিন রাশিয়ায় অবস্থান করে সুফিয়ানের স্বভাব পশুর মত হয়েছে। রাশিয়ায় সে অবাধে জিনা-ব্যাভিচার করেছে। যখন যাকে খুশী তার সাথে যৌন মিলন। কেউ কাউকে বাধা দিত না। বাড়ি ফিরে সে এই অপকর্মটা করতে পারছে না। আফগানে এখনও ব্যাভিচারের বাজার গরম হয়ে ওঠে নি। বেলেল্লা ও বেহায়াপনা সীমা অতিক্রম করে নি। তাই তার জন্য দিনগুলো খুব কঠিন মনে হয়।

সুফিয়ান একবার বাবা-মায়ের কাছে প্রস্তাব পেশ করল, "আমি আমার বোন সুফিয়াকে বিয়ে করব।"

নির্লজ্জ প্রস্তাব শুনে বাবা-মা অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "ছিঃ হারামজাদা, বেহায়া কুত্তা। নিজ বোনকে শাদী করার প্রস্তাব। এমন জঘন্য প্রস্তাব কোন সাহসে মুখে উচ্চারণ করলি? তোর মত কু-পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা যদি এ মুহূর্তে নিজ চোখে দেখতে পেতাম তবে আমার কলিজা ঠান্ডা হত।"

সুফিয়ান উত্তর দিল, "মা! আমার ঘরে উপযুক্ত সুন্দরী বোন থাকতে, অন্যের বোন কেন বিয়ে করব? ওতো যুবতী, কি দোষ ওকে বিয়ে করায়? অন্য মেয়েদের মাঝে যা আছে, তার ওতো তা-ই আছে। নিজের বোন অপরের বোনের মধ্যে পার্থক্য কি? কোন মেয়ে হলেই তো হল! অন্য কোন পুরুষ যদি আমার সুন্দরী বোনকে ভোগের সামগ্রী বানাতে পারে তবে আমি পারব না কেন?"

মা রাগে গোস্বায় অধীর হয়ে হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়ে বললেন, "কুত্তা! এই মুহূর্তে আমার বাড়ির আঙ্গিনা ত্যাগ কর। তোর মুখ আর দেখতে চাই না। তোর মত কু-পুত্র পেটে ধরে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জাকর কথা! এ ধরনের কথা ভাই হয়ে বোনের বেলায় কি করে উচ্চারণ করতে পারলি?

আলীবর্দীও স্থির থাকতে পারলেন না। চৌপায়া থেকে ওঠে সজোরে এক চপেটাঘাত বসালেন সুফিয়ানের বাম গালে। সুফিয়ান মুহূর্তে দেরী না করে বাড়ির বাইরে চলে গেল। গিয়ে চেলগুজা তলায় গিয়ে বসল। মনে মনে ভাবতে লাগল, "পিতাকে হত্যা করা ছাড়া তার এ উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। প্রথমে পিতাকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তারপর বোনকে ফুসলিয়ে রাজি করাতে হবে। তারপর মা এমনিতেই খামুশ হয়ে যাবে।"

সুফিয়ান নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল, মূর্খ পিতার ঘরে জন্ম নেয়ার চেয়ে দুনিয়াতে না আসাটাই ভাল ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক চিরাচরিত নিয়ম, তাই এসেছি। মূর্খ পিতার মৃত্যু ঘটলেই তা ভাল হত। সুফিয়ান কতসব জলপনা-কল্পনা করছে বসে বসে।

ভাইয়ের অশালীন ও অশ্লীল উক্তিগুলো সুফিয়ার কানেও পৌঁছল। সুফিয়া মনে মনে ভাবল, দুনিয়াতে এসেছি আবার চলে যেতে হবে। এখানে হাজার চেষ্টা করেও থাকা যাবে না। তাই এমন একটি কাজ করব যেন চির দিন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে আমার নাম লেখা থাকে। অদৃষ্টে যা আছে তা-ই হবে। ভাল কিছু অবশ্য করতে হবে।

সুফিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, নরপশু ভাইটিকে কুত্তার মত হত্যা করে মনের জ্বালা মিটাবে। তথাপিও তাকে হত্যা করে দৃষ্টান্ত কায়েম করবে।

সুফিয়া অনেক দিন আগে কোন একটি বইয়ে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় পড়েছিল, যদি কেউ মুর্তাদ হয়ে যায় অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করে তবে তার সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। দুনিয়ার আলো-বাতাস উপভোগ করার অধিকার সে রাখে না। এ ধরনের মুর্তাদকে হত্যা করাও মহাপুণ্যের কাজ। সুফিয়া চুপি চুপি মাকে বলল, "মা যে কোন মুহূর্তে আমি ভাই কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারি। ও আমার অমূল্য সম্পদ ইজ্জত লুণ্ঠন করতে পারে। আমার ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে যদি ভাইকে হত্যা করতে হয় তবে আমাকে দায়ী করবে না।" মা বললেন, সাবাস বেটি। তোর ইচ্ছা আল্লাহ্ পূর্ণ করুন।

আলীবর্দীর শরীর অসুস্থ্। দুদিন যাবত জ্বরে ভুগছেন। এদিকে খাবার বলতে ঘরে কিছুই নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সুফিয়ার তৈরি পোষাকগুলো বিক্রি করার জন্য তিনি বাজারে যাওয়ার চিন্তা করলেন। সুফিয়াদের পল্লী থেকে তিন ক্রোশ দূরে ছবিলার হাট। সপ্তাহে একবার বসে। নিকটে আর কোন হাট নেই। পল্লীর অনেকেই উক্ত হাট থেকে সওদা করে। আলীবর্দী আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে পণ্যগুলো পিঠে তুলে হাতে একটি লাঠি নিয়ে যোহরের পর পরই বেরিয়ে গেলেন। আঁকা বাঁকা বন্ধুর পথ। কঙ্করময় প্রান্তরে আলীবর্দী একা পথ চলছেন। গ্রামের অন্যান্যরা অনেক আগেই বাজারের উদ্দেশ্যে গ্রাম ত্যাগ করেছে। কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় পাড়ি দিতেই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন আলীবর্দী। নিকটে কোন ঝর্ণা না পেয়ে এক বেদুঈন পল্লীতে আশ্রয় নিলেন। এক বেদুঈন কন্যাকে ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে তাঁবুর দিকে যেতে দেখে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। যুবতী বুঝতে পেরে এক পিয়ালা পানি বাড়িয়ে দিল। আলীবর্দী

তা পান করে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে পণ্যগুলো পিঠে তুলে নিয়ে ওঠে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। মাথায় চক্কর মেরে পড়ে গেলেন। অন্ধকার দেখতে লাগলেন চারিদিকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়লেন আলীবর্দী। সামান্য সময় চোখ বন্ধ করে আবার ওঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটতে লাগলেন। সন্ধা হওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এসে হাটে পৌছলেন। এদিকে আসরের আযান হয়েছে। আলীবর্দী সোজা মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে কাপড় মহলে ঢুকলেন।

রুচিশীল ক্রেতারা আলীবর্দীর পণ্যের জন্য প্রতি হাটেই অপলক নেত্রে পথ পানে চেয়ে থাকত। আজ বিলম্বের কারণে অনেকেই অন্যদের আনা পণ্য খরিদ করে চলে গেছে। তাই সবগুলো পণ্য বিক্রি করতে সন্ধা লেগে গেল। পণ্য বিক্রি করে সুফিয়ার জন্য সূঁই, সুতা, কুশি কাঁটা ও অন্যান্য খরচাপাতি সেরে মাগরিবের নামায আদায় করে আস্তে আস্তে বাড়ির পথ ধরলেন। তার গ্রামের কোন লোক এখন বাজারে নেই। তারা আসরের পর পরই চলে গেছে। আলীবর্দী একা। পথ চলার সাথী ও বাতি কিছুই নেই। তিনি এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে পথ চলছেন। কী অন্ধকার! বন্ধুর গিরিপথ! চড়াই-উৎরাই পার হয়ে চলছেন আল-ীবর্দী। এক কদম সামনেও কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নূড়ি পাথরগুলো পূর্বের শত্রুতাবশতঃ যেন পা ফুটো করে দিচ্ছে। কখনো কখনো পদস্খলন হয়ে ডানে বামে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। লতাগুলো কেবলই কাপড় আঁকড়িয়ে ধরে। কৃষ্ণ প্রস্তরগুলো দানবের মত দন্ডায়মান। দেখলে ভয় না পাবে এমন মরদ কয়জন আছে।

নগ্ন পায়ে আলীবর্দী হাঁটছেন। ধারালো নূড়ি-পাথরের আঘাতে কাতর হয়ে পড়েছেন আলীবর্দী। এক জোড়া জুতা খরিদ করার তাওফীক হয় নি সারা জীবনে আলীবর্দীর। তিনি সমস্ত অর্থ-সম্পদ ছেলের পিছনে খরচ করেছেন। এসব দুঃখ-বেদনা বুকে পুষে অতি কষ্টে চলছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ পথ চলার পর দেখছেন, বেদুঈন পল্লীর সারি সারি তাঁবুর প্রদীপশিখা মিটমিট করে জ্বলছে। ওখানে গিয়ে সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে পানি পান করে একটু চাঙ্গা হয়ে আবার পথ ধরবেন। এসব ভাবতে ভাবতে বেদুঈন পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন।

পল্লী সর্দার কয়েক জন লোক নিয়ে চওরে এসে গল্প গুজবে মত্ত। আলীবর্দী অতি কষ্টে বেদুঈন সর্দারের নিকট এসে বসলেন। পল্লী সর্দার আলীবর্দীকে অনেক পূর্ব থেকেই চিনতেন। আলীবর্দীও ওদের রসালো আলাপে অংশ নিলেন। পানি পান করে আর একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ির পথ ধরার মনস্ত করলে বেদুঈন

সর্দার বললেন, "এখন আঁধার রাতে একা একা পথ চলা ঠিক নয়। তাই আজ রাতে আমাদের এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন। ভোরে নামায-কালাম পড়ে আস্তে আস্তে বাড়তে যাবেন।"

আলীবর্দী বললেন, "না বাবা! যতই কষ্ট হোক রাতেই ফিরতে হবে। বাড়ির সবাই আমার চিন্তায় রাত জেগে অপেক্ষা করবে।"

তিনি সর্দারের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে আর একটু আগে বেড়ে বললেন, "বাবা! আমি নেহায়েত গরীব মানুষ। গতর খেটে খাই। জমি জমা তেমন নেই, কষ্টের সংসার। আপনারা যদি গরীব বলে অবজ্ঞা না করে একটু আশ্রয় দান করেন তবে আমার পৈত্রিক নিবাস ত্যাগ করে আপনাদের আশ্রয়ে চলে আসব।" আলীবর্দীর প্রস্তাব শুনে বেদুঈন সর্দার এ বৃদ্ধ বয়সে গ্রাম ত্যাগ করার কারণ জানতে চাইলে আলীবর্দী অবোধ বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে সব দুঃখের কথা বললেন। সর্দার আলীবর্দীর দুঃখে দুঃখিত তবে মিছামিছি সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন।

রাত গভীর হয়ে আসছে। অন্ধকারও কম নয়।এখনো প্রায় অর্ধেক পথ বাকি রয়ে গেছে। আর দু'তিনটি অনুচ্চ পাহাড় পাড়ি দিলে গ্রামের নাগাল পাওয়া যাবে। তাতে কয়েক বার বিশ্রাম নিতে হবে। তাছাড়া, পথচলা সম্ভব নয়। সামনের পথটুকু খুবই কঠিন। ঘর নেই, বাড়ি নেই, নেই কোন লোকালয়। এ পথে সন্ধার পর চলা-ফেরা করা খুবই ভয়। অনেক সময় বেদুঈনরা পথিকের মালামাল কেড়ে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় জানও খোয়া যায়। তাই আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের সুর তুলে এগিয়ে চললেন আলীবর্দী।

[আট]

এদিকে পিতা-মাতার কঠোরতায় সারা দিন দানা-পানি কিছুই মুখে তুলে নি সুফিয়ান। পাগলা কুকুরের মত, ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় গ্রামসুদ্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্ধু-বান্ধব জোটানোর জন্য। ওকে দেখে সবাই থুথু নিক্ষেপ করে। এসব আচরণে দুঃখ, বেদনা ও অনুশোচনায় মনে মনে স্থির করল, তার অশিক্ষিত, মূর্খ ও বৃদ্ধ পিতাকে খুন করা ছাড়া নিজের সুন্দরী বোনকে উপভোগ করা যাবে না। পিতাকে হত্যা করতে পারলে মাতা শান্ত হয়ে যাবে।

আজই সুবর্ণ সুযোগ। বাবা দূরের হাট থেকে ফিরবেন রাত দুপুরে। সাথে থাকবে না কোন লোকজন। এমনিই দুর্বল আবার অসুস্থ, যাবার সময় কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে গিয়েছেন। এখন হয়ত আরো দুর্বল হয়ে ফিরবেন। যা ভাবা তা-ই কাজ। কয়েক বোতল মদ গড়গড় করে গলাধঃকরণ করে গরু জবাইয়ের ছুরিটি নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল সুফিয়ান। সুফিয়া ভাইয়ের এসব কাণ্ড নিজ চোখে দেখেছে। তাই পিছু পিছু ডাকল "ভাইয়া। সুফিয়ান ভাইয়া! এ আঁধারে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? সুফিয়ান নিরুত্তর। চোখ বন্ধ করে সোজা হাটের পাশ ধরে আঁধারে হারিয়ে গেল। মাঝখানে, পথের এক পাশে ঝোঁপ-ঝাড়ের অন্তরালে ঘাপটি মেরে বসে গেল। পিতাকে বধ করার মতলবে অধীর অপেক্ষায় বসে রইল সুফিয়ান। নিঝুম রাত। পাহাড়ী অঞ্চল। সন্ধার পর পরই লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আল-ীবর্দী আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছেন। মাঝে মাঝে ক্ষীণ আওয়াজে কাশেন। কাশির আওয়াজ পেয়ে সুফিয়ান বুঝতে পারল, এ আর কেউ নয়, পিতার কাশির শব্দ। তাই ছুরিটা আবার পরখ করে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল। নিকটে আসার সাথে সাথে কাজ সমাধা করবে।

আলীবর্দী সামান্য কয়েক কদম অগ্রসর হতেই পাষণ্ড পুত্র ছুরির আঘাতে বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে দিল। আলীবর্দী 'আল্লাহ' শব্দ করে এক চিৎকারে যমিনে লু-টিয়ে পড়লেন। "আল্লাহ্ বাঁচাও, আল্লাহ্ বাঁচাও বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন। পাষণ্ড ছেলে পিতার বক্ষদেশে চড়ে বসল। এবার আলীবর্দী চিনতে পারলেন এ কোন ডাকাত নয়। রাশিয়া থেকে উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত নিজের সন্তান সুফিয়ান। আলীবর্দী ছেলেকে চিনতে পেরে রোদন করতে করতে বললেন, "হে আমার কলিজার

টুকরো আদরের দুলাল, নয়নের পুতুলী। কোন অপরাধে এ বিজন বনে আমার প্রাণ সংহার করতে আজরাঈলের ভূমিকা পালন করতে চাচ্ছ? আমার জীবনের সমস্ত শ্রম-সাধনা তোমার পিছনে কি খরচ করি নি? হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে কি তোমাকে লালন-পালন করি নি? নিজে উপোষ থেকে তোমার মুখে কি অন্ন তুলে দেই নি? আমার দেহে চিরবাস জড়িয়ে তোমাকে কি উত্তম পোষাক পরিধান করাই নি? আজ কোন অপরাধে তুমি তোমার বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতার বক্ষ বিদীর্ণ করে সীমারের মত বুকে চড়ে বসলে? বাবা রে! আমি যদি তোমার চক্ষু শূল হয়ে থাকি, তবে আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এমন দেশে চলে যাব, যে দেশের কোন একটি পাখিও আমার সন্ধান পাবে না। আলীবর্দীর অরণ্যে রোদন কে শুনে? পাষন্ড ছেলে বুকে চড়ে এবার গলায় ছুরি চালাল। আলীবর্দীর জবান থেকে বেরিয়ে এল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"

পাষন্ড ছেলে পিতার মরদেহকে জোড়ায় জোড়ায় আলাদা করে পাহাড়ের একেক প্রান্তে একেক অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিল, যেন অতি সহজেই বন্য পশুরা সাবাড় করতে পারে। সুফিয়ান পিতাকে টুকরো টুকরো করে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে রেখে রক্তমাখা ছুরিটা হাতে নিয়ে মন্থর গতিতে বাড়ির পথ ধরল।

সুফিয়া অন্য দিনের মত এশার নামায আদায় করে জায়নামাযে উপবেশন করেই পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে লেগে গেল। মাতা গুলজান স্বামীর আগমনের পথ পানে চেয়ে আছেন। রাত গভীর। পল্লীর সবাই হাট থেকে বাড়ি ফিরেছে অনেক আগে। হতভাগা স্বামী এখনো ফিরে নি। গুলজান অস্থির হয়ে পল্লীর দু'তিন বাড়িতে গিয়ে স্বামীর খোঁজ নিয়েছেন। কেউ বলে, 'আলীবর্দীকে সন্ধার পূর্ব মুহূর্তে টুপী বিক্রয় করতে দেখেছি।' কেউ বলে, 'আমার পাশেই তো মাগরিবের নামায পড়েছেন।' কেউ বলল, 'আমি বাজার থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখেছি, খুব আস্তে আস্তে বাজারের দিকে যাচ্ছেন।' কেউ বলে, 'সুঁই, সুতা ও অন্যান্য সওদা কেনাকাটা করতে দেখেছি।' কেউ বলল, 'এতক্ষণ তো বিলম্ব হওয়ার কোন কারণ নেই।'

গুলজান অস্থির হয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলেন। কখনো ঘরে, কখনো বাড়ির বাইরে গিয়ে স্বামীর জন্য ইন্তেজার করছেন। সময় যত বাড়ছে পেরেশানীও তত বাড়ছে। মায়ের অবস্থা দেখে সুফিয়াও অস্থির। সুফিয়ান চুপি চুপি রক্তমাখা ছুরিটা নিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে পাক ঘরে ঢুকল। সুফিয়ানের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বাবা আসছে মনে করে খোলা বাতায়নে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বাইরে দিল। সে দেখল,

এতো আব্বু নয়, আসছে ভাইয়া। গুলজান বাথরুমে থাকার দরুণ এ দৃশ্য দেখেন নি। সুফিয়ার সন্দেহ হল, ভাইয়া এত রাতে কোত্থেকে আসলেন? তিনি তো পাক ঘরে যাওয়ার কথা নয়! কোন সময় তো তাকে এমন করে পাক ঘরে ঢুকতে দেখি নি! এই কৌতূহলে প্রদীপটি হাতে নিয়ে গ্লাস তালাশের বাহানা করে প্রথমে মায়ের ঘরে ঢুকল। তারপর গেল পাক ঘরে। পাক ঘরে ঢুকে সাথে সাথে রক্তমাখা ছুরিটি তার নজরে পড়ল। সুফিয়ার আর বুঝতে বিলম্ব হল না। পাষন্ড ভাই পিতাকে কতল করে ছুরি পাক ঘরে লুকিয়ে রেখেছে।

সুফিয়া তার মায়ের নিকট গিয়ে বলল, "আম্মি! তুমি আব্বুর জন্য এত অস্থির হচ্ছ কেন? আব্বু না বাজারে যাওয়ার পথে আমাকে ডেকে বলেছিলেন যে, "আমি হয়ত রাতে বাড়ি ফিরব না। কারণ, বেদুঈন পল্লীর সর্দারের সাথে রয়েছে আমার খুব দোস্তানী ভাব। তিনি প্রায়ই আমাকে দাওয়াত করেন আতিথ্য গ্রহণের জন্য। আজকেও তিনি আমাকে আটকাতে চাইবেন। তার আবদার এড়ানো খুবই কষ্টকর। কাজেই আজ বাজার থেকে ফেরার পথে সেখানেই অবস্থান নেব।"

আলীবর্দী বাড়ী থেকে বের হয়ে সামান্য অগ্রসর হলে রাস্তায় সুফিয়ার সাথে সাক্ষাত হয়। সুফিয়া তখন রফিকাদের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। সুফিয়ার সাথে এটাই পিতার শেষ সাক্ষাত, শেষ কথোপকথন। সুফিয়া তার পিতার নিকট সুঁই, সুতা ও কুশিকাঁটা আনার জন্য বলেছিল। পথিমধ্যে বাপ-বেটির মিলন দৃশ্য গুলজান বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সুফিয়ার কথা গুলজান বিশ্বাস করে ভাবলেন, এমন হতে পারে। সুফিয়া তার আম্মিকে রাতের খানা খেয়ে ঘুমিয়ে যেতে বলল। এদিকে সুফিয়া রুটি ভর্তি প্লেট নিয়ে ভাইয়ের ঘরে ঢুকে বলল, "ভাইয়া! এত রাত্রে কোত্থেকে এলেন! পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝি! মনে হয় কোথাও রিযিকের ব্যবস্থা হয় নি। চেহারাটা তো ক্ষুধায় মলিন হয়ে গেছে। বসুন, এক্ষুণি খানা খেয়ে বিশ্রাম নিন। রাত যে গভীর হয়ে গেছে। দেশের সব মানুষ এখন ঘুমের কোলে শায়িত। বসুন, জলদি খানা খেয়ে নিন।

সুফিয়ান বোনের এত সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ। তাই রুটির বর্তনটি টেনে সামনে এনে সালুন দিয়ে খেতে লাগল। সুফিয়া একটি মোড়া টেনে পাশেই বসেছে। খাবার ফাঁকে ফাঁকে লোভী চোখে সুফিয়ার দিকে তাকাচ্ছে। সুফিয়ানের বাঁকা চোখের চাহনিতে সুফিয়া কামুকতার লক্ষণ দেখছে। তার মনে পশুবৃত্তি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। আজ রাতেই হয়ত এ বর্বর তার ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য উদ্ধত হবে। কেড়ে নিতে চাইবে ভাই হয়ে বোনের ইজ্জত। যদি তার ধারণা সঠিক হয়, তবে সুফিয়ার করণীয় কি তা সে পূর্বেই ঠিক করে নিয়েছে।

সারা দিন সবাই অনাহারে কাটিয়েছে। রফিকা তা জানতে পেরে বাড়ি থেকে আটা এনে গুলজানকে দিয়ে বলল, "আম্মু এ আটা পাঠিয়েছেন। রুটি তৈরি করে এক্ষুণি খান।" গুলজান আটা দিয়ে রুটি তৈরি করে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। স্বামীর জন্য কিছু রুটি রেখে দিয়ে সুফিয়াকে বললেন, "মা এ কয়টি রুটি নাফরমানটাকে দিয়ে আয়।" সুফিয়া রুটি, পানি ও দস্তরখান নিয়ে ভাই-এর ঘরে ঢুকে দেখল, তার চেহারা এখনো খুনরাঙ্গা হয়ে আছে।

সুফিয়া মায়াভরা কণ্ঠে বলল, "সারা দিন তো বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দানা-পানি তো কিছুই মুখে দেয়া হয় নি মনে হয়। নাও এ রুটিগুলো খেয়ে নাও।" এ বলে ভায়ের সামনে দস্তর খান পেতে রুটি ও তরকারী রেখে দিল। খুনী সুফিয়ান শোয়া থেকে ওঠে খুবই অল্প আহার করল। সুফিয়া ভাইকে বলল "এত অল্প আহার করে সুস্থ শরীরটা খারাপ করো না। পেট ভরে খানা খেয়ে নাও।" সুফিয়ান বলল, "যা খেয়েছি তাতেই চলবে, এগুলো এখন নিয়ে যাও।" সুফিয়া থালা-রুটি গুছিয়ে ও ঘরে নিয়ে গেল। গুলজান ছিলেন নামায রত। সালাম ফিরিয়ে বললেন, "তুমিও রুটি খেয়ে নামায আদায় করে ঘুমোতে যাও।" সুফিয়া বলল, না 'আম্মি! আমাকে শুইতে অনেক দেরী হবে, মিশকাত শরীফের পাঠ এখনো তৈরি করতে পারি নি। কিতাব পাঠ শেষ করে ঘুমাব।

গুলজান অবশিষ্ট নামায আদায় করতে আবার দন্ডায়মান হলেন। সুফিয়া তার ভাইয়ের বিছানা ঠিক করার জন্য ও ঘরে ঢুকে বিছনাপাতি সুন্দর করে ঝেড়ে ঠিক ঠাক করে দিল। সুফিয়ান ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "বাহঃ তুমি এত সুন্দর বিছানা তৈরি করতে পার! ইসঃ কত সুন্দর কত নরম, কত মোলায়েম।" সুফিয়া হাসতে হাসতে বলল, "আরে আমার কি দু-চার জন ভাবী আছে, যে তোমাকে বিছানা বিছিয়ে দেবেন? আমার ভাবী থাকলে তো তার নরম হাতে তোমাকে শয্যা তৈরি করে দিত। আমি যতদিন আছি ততদিন ভাবীর কাজটুকু করে দেব।" সুফিয়ান এদিক ওদিক তাকিয়ে গালভরা হাসি হেসে বলল, "সব কাজই কিন্তু তোমাকে সারতে হবে বুঝলে সুন্দরী, সুফিয়া লজ্জায় অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

কি বলবে কি বলবে না ভেবে পাচ্ছে না। সুফিয়া তার মনোভাব প্রথমেই আঁচ করতে পেরেছে। কেউ কথা বলার আগেই অনেক কিছু বুঝে ফেলে ও। ভাইয়ের কথার উত্তর না দিলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে মনে করে সুফিয়া বলল, "আমি এত কিছু বুঝি না তবে এতটুকু বলতে পারি, তুমি আমার একমাত্র ভাইয়া। বহু দিন মস্কোতে অবস্থান করেছ আমাদেরকে রেখে। দেশের কোন একটি

পরিন্দাও তোমার খবর রাখত না। এক যুগেরও বেশি সময় তোমার আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। সুদীর্ঘ এক যুগ পরে আল্লাহ তোমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। এখন তোমার খেদমত করা আমাদের দরকার। তিন মাস পরে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলব। চাকরিতে চলে যাবে, সরকারী কোয়ার্টারে উঠবে। কাজেই তোমার যা মন চায়, তা পূরণ করার চেষ্টা করব। এতে একটুও অবহেলা করব না।"

সুফিয়ান মস্কোর ভার্সিটিতে অবাধে জিনা-ব্যাভিচার করেছে। সেখান থেকে পশুর স্বভাব নিয়ে দেশে ফিরেছে কিন্তু এখানে পশুত্ব চরিতার্থ করার সুযোগ পাচ্ছে না। আফগানের মেয়েরা ধর্মানুরাগী। বেহায়পনা ও বেগেল্লাপনার ধারে কাছেও ঘেঁষে না তারা। সুফিয়ান অসহনীয় কাম যন্ত্রণায় তার বোনটিকে ভোগ করতে চাইছে। এবার সুযোগ পেয়ে সে সুফিয়াকে বলল, "সব ধরনের আশাই পূরণ করবে সুফিয়া?" "হ্যাঁ সব ধরনের আশা পূরণ করব।"

সুফিয়ান এক পর্যায়ে বোনের ওড়না খুলে নিল। সুফিয়া রাগ সামলিয়ে বলল, "আরে এত পাগল হলে কি চলবে? আম্মুতো এখনো জেগে আছেন। আপনি দরজা খুলে রেখে শুয়ে পড়ুন। আম্মু ঘুমিয়ে গেলে আমি আপনার কাছে আসব। আপনি দরজা আটকিয়ে রাখবেন না কিন্তু, শুনলেন ভাইয়া?"

সুফিয়ান খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার ইন্তেজারে থাকব। ও ঘরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ো না।" সুফিয়া বলল, "আরে আমি তোমার মত এত বেদীশা নই। তোমাকে একা একা এ ঘরে রেখে বুঝি আম্মির পার্শ্বে ঘুমোতে পারব? তুমি শোও আমি একটু পরে আসছি।"

এ বলে সুফিয়া মায়ের গৃহে চলে গেল। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে আর বোনের প্রতীক্ষায় নির্ঘুম নয়নে সময় গুণছে সুফিয়ান। রাত গভীর। এত রাত জেগে থাকার অভ্যাস তেমন নেই। অপর দিকে শরীর খুবই ক্লান্ত। কারণ, কয়েকটি পাহাড়ে উঠতে নামতে হয়েছে পিতার লাশ গুম করার জন্য। তা ছাড়া শেষ সময়ে পিতার করুণ আকুতি ও আহাজারী এখনো তার কানে বাজছে। এসব তাকে অস্থির করে তুলছে। কিন্তু শরীরের ক্লান্তির ভারে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুফিয়া একদেড় ঘণ্টা পর আদরিনী মায়ের একমাত্র আশ্রয়ের হাতটি আলতো ভাবে তার বুকের ওপর থেকে পাশে সরিয়ে রাখল। তার পর দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে ক্ষীণ প্রভাব বিস্তার করে দুএকটি তারা মিটমিট করে জ্বলছে। রাতটি কেমন যেন নীরব, নিস্তব্ধ ও গম্ভীর

বলে মনে হচ্ছে। দুনিয়াটা যেন বিস্ময় চিন্তায় ম্রীয়মান। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। নেই কোন কোলাহল। নিথর যামিনীর যৌবন শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত ভোরের বার্তা নিয়ে সুবহি সাদিক আত্মপ্রকাশ করবে। ভাইয়ের ঘরের বাতিটির তেল প্রায় শেষ হয়ে নিভু নিভু করছে। ভাইয়া হয়ত এতক্ষণ জেগে নেই। এখনই সুবর্ণ সুযোগ। আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। ভাল কাজ যত তাড়াতাড়ি সারা যায়, ততই কল্যাণ। এসব ভাবছে সুফিয়া।

সুফিয়া ওড়না দিয়ে কোমর বেঁধে নিল। অন্য একটি কাপড়ে কেশ গুচ্ছ বেঁধে নিয়ে সোজা পাক ঘরে ঢুকে লুকিয়ে রাখা ছুরিটি হাতে নিল। সুফিয়ার কোমল হৃদয়ে ইসলামের এ বাণীটি বার বার আন্দোলিত হচ্ছিল, "আর যারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে যায়, তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।" আল্লাহ যমিনে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই।

সুফিয়া আল্লাহর হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ছুরিটি নিয়ে ভাইয়ের গৃহের দিকে অগ্রসর হল। দরজার নিকট গিয়ে আস্তে করে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখল, প্রদীপটি এখনো নির্বাপিত হয় নি। নিভু নিভু করে জ্বলছে। সুফিয়ান নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। সুফিয়া বিলম্ব না করে সজোরে খঞ্জর চালাল তার গণ্ড দেশে। সুফিয়ান চিৎকার দেওয়ার সময়টুকু পেল না। প্রথম আঘাতে তার গলার রগগুলো কেটে যায়।

দ্বিতীয় বার ছুরি চালিয়ে পূরো মস্তকটা গর্দান থেকে আলাদা করে ফেলে। হাত পা ছুটোছুটি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে গেল সুফিয়ান। রক্তে ভিজে গেল বিছানাপত্র। মেঝেতেও রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল অজস্রধারায়।

সুফিয়া কাঁথা দিয়ে লাশটি মুড়িয়ে তার ওপর চাটাই দিয়ে ঢেকে রাখল। তারপর নিজের শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মায়ের ঘরে চলে গেল। এতক্ষণে পূর্ব আসমান ফর্সা হয়ে উঠেছে। মুয়াজ্জিনরা মিনারে মিনারে আযান হাঁকছে।

গুলজান গাত্রোত্থান করে অযু ইস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে কবির কণ্ঠে মুনাজাত করেন। তারপর মা-বেটি জায়নামাযে বসেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করেন। অর্ধপারা তিলাওয়াত করে উভয়ে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও দেশের জন্য দোয়া করলেন।

গুলজান স্বামীর জন্য খুবই চিন্তিত। সারা রাতই বৃদ্ধ ও রুগ্ন স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় কাটিয়েছেন। সুফিয়া মায়ের মনোভাব বুঝে শান্তভাবে বলল, "আম্মি!

আজ আমি আপনাকে দুটি শুভ সংবাদ শুনাব। আশা করি বিচলিত না হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে খুশী হবেন। বলব আম্মি? গুলজানের সম্মতি পেয়ে সুফিয়া প্রথমে পুত্র কর্তৃক পিতার শাহাদাতের সংবাদ শুনাল। তারপর গত রাতে সুফিয়ান তার ছোট বোনের সাথে কি আচরণ করেছিল আর সুফিয়া তার ভাই-এর সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছে তা বর্ণনা করল। সরলমতি গুলজান সুফিয়ার কথা বুঝতে না পেরে– মেয়েকে আবার প্রশ্ন করলেন, "কি বলতে চাও ভালভাবে বুঝিয়ে বল।" সুফিয়া খুব বিনীত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আম্মি! আমার আব্বু বাজার থেকে ফিরার পথে আমার উচ্চ শিক্ষিত পাষন্ড ভাইয়ের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।" এতটুকু বলার সাথে সাথে গুলজান হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন। সুফিয়া মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মা! একদিন তো মৃত্যুর সুধা পান করতেই হবে, মৃত্যুটা যদি শহীদী মৃত্যু হয় তবে তো বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আমার আব্বু বৃদ্ধ, দুর্বল, অসহায়, গরীব ও দ্বীনদার মানুষ। এ দুর্বলের ওপর আক্রমণ করেছে তাঁরই ঔরসজাত মুর্তাদ সন্তান। তিনি শহীদ হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।" এবার তিনি শান্ত হয়ে স্বামীর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলেন।

তারপর সুফিয়া দ্বিতীয় শুভ সংবাদটি শুনাল। সে বলল, "আম্মি! যারা ইসলাম ত্যাগ করে তারা আর মুসলমান থাকে না। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে মুর্তাদ বা জিন্দিক বলা হয়। আর জিন্দিকের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। আমার ভাই রাশিয়া থেকে উচ্চ ডিগ্রী আনে। সে উচ্চ পর্যায়ের বেঈমান হয়ে, ঈমান শেষ করে কুকুরের মত চরিত্র নিয়ে দেশে এসেছে। এমন বর্বর ও মুর্তাদ ভাইকে হত্যা করা শরীয়াতের হুকুম। তাই আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটা করেছি। এব্যাপারে আমি দুদিক থেকেই সওয়াব পাব। এক ঃ পিতার হত্যার বদলা নেওয়া, দুই ঃ মুর্তাদের শাস্তির বিধান করা।"

সুফিয়ার কথা শুনে ঈমানদার গুলজান আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে কি হল তার কিঞ্চিত বর্ণনা দাও। সুফিয়া এক এক করে সব ঘটনা খুলে বলল। গত রাত্রে ভাই সুফিয়ার সাথে কি ধরনের কথাবার্তা বলেছে এবং কি ধরনের আচরণ করেছে তা খুলে বলল। এবার পুত্রের হত্যার কথা শুনে তার মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। তারপরও ঘরে ঢুকে পুত্রের গর্দান থেকে মাথা আলাদা দেখে সুফিয়াকে মোবারকবাদ জানায়।

[নয়]

মিস্টার নজিবুল্লাহ্ সরকারের শাসনামলে শুধু আলীবর্দীই পুত্রের হাতে প্রাণ দিয়েছে এমন নয়। এমন হাজার হাজার ঈমানদার বৃদ্ধ খুন হয়েছে। এর ঠিক পরিসংখ্যান কে দেবে? তবে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় হাজারেরও বেশি পিতা-মাতা সুফিয়ানের মত সন্তানের হাতে জবাই হয়েছে। তাদের নজরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হল প্রধান বেকার সমস্যা, তারা সমাজের আবর্জনা, জঞ্জাল। দেশের কোন কাজে আসে না। শুধু বসিয়ে বসিয়ে তাদের অন্ন বস্ত্রের যোগান দাও। তাই যে কোনভাবে তাদেরকে দুনিয়া হতে বিদায় দিয়ে আবর্জনামুক্ত সমাজ গড়া তাদের অঙ্গীকার। কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বার্ধক্যজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হলে তাদেরকে ডাক্তাররা বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে লাশ বানিয়ে কফিনে ভরে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এসব রাশিয়ার ইংগিতে নজিবুল্লাহ্র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হত। এসব খুনের বাদীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর যদিও কেউ বাদী হয়ে থানায় গিয়ে এজহার দিত কিন্তু থানা ঐ সমস্ত কেইসগুলো কখনো আমলে নিত না। আর যদিও কোন কারণে এমন কেইস তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হত দেখা গেছে, বছর বছর কেইসগুলো ফাইলের স্তূপের নিচে নীরবে রোদন করে দাফন হয়েছে। ভাই কর্তৃক বোন ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও ঘটায়। এর সংখ্যা এক জরিপে ৩ হাজারেরও বেশি দেখা যায়। তাছাড়া আফগানিস্তানের পাহাড়ে-পর্বতে, আনাচে-কানাচে ও সীমান্তবর্তী এলাকায় রয়েছে হাজার হাজার পরিবার। সেখানে সাংবাদিকরা পৌঁছতে সক্ষম ছিল না। ঐসব এলাকার মা-বোনদের খবর কে রাখে?

মিস্টার নজিবুল্লাহ্ প্রথমে মসজিদ, মাদরাসা, আলিম-উলামার ওপর কোন ধরনের নির্যাতন চালান নি। তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুকৌশলে কাজ করতেন। কমিউনিজমের বিষাক্ত ইনজেকশন তিনি দেশের যুব সমাজের মনেও পুশ করতেন। একটা দেশ চালাতে যত দরকারী জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় তা সবই রাশিয়া থেকে আমদানী করা হত। চাল-ডাল, ঘি, তেল, পেঁয়াজ, রসুন থেকে নিয়ে ঔষধ, কাপড়, মেশিনারী, যন্ত্রপাতি, সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ সবই আনত রাশিয়া থেকে। নিজের দেশে মিল-ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা গড়ে তোলার পরিবর্তে গড়ে তুলেছে শিল্পীগোষ্ঠী, নাট্যগোষ্ঠী। চিত্তবিনোদনের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করে তৈরি করা হত রঙ্গমঞ্চ। সেখানে রাশিয়া থেকে শ্বেত চামড়ার

নর্তকীদের আমদানী করে সমাজের যুব শ্রেণীকে লেলিয়ে দিত। যুবকেরা ঐ লাল চামড়ার মেয়েদের পেয়ে ভুলে যেত দুনিয়ার সবকিছু। রাশিয়ার বিশাল মার্কেট হিসেবে ব্যবহৃত হত আফগানিস্তান। বিশেষ করে শিয়ারাই এসব অপকর্মে বেশি সাড়া দিয়েছিল। ২৫ থেকে ৩৫ হাজার ক্লাব সরকারী খরচেই পরিচালিত হত। এগুলো ছাড়া আরো হাজার হাজার সংগঠন বেনামে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত। এগুলোর নাম ছিল ভিন্ন, কাজ আর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। এসব নষ্ট যুব সমাজকে সুফিয়া অনেক পূর্ব থেকেই দেখতে পারত না। সুফিয়া ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জোড়ায় জোড়ায় আলাদা করে বাথরুমের স্লাভ তুলে তার ভিতর নিক্ষেপ করে। অতঃপর কাঁথা বালিশ সুন্দর করে ধৌত করে রোদে শুকাতে দেয়। আর ঘরের মেঝের রক্ত লেপে-মুছে পরিষ্কার করে। সুফিয়ারা ছিল পল্লীর মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ও পর্দানশীল। তাই তাদের বাড়িতে অন্য বাড়ির মানুষ খুব কমই আসত। কেউ জানতে পারল না সুফিয়ানের হত্যার বিষয়টি।

মাতা গুলজান স্বামীর চিন্তায় অস্থির। সত্যি তাঁর স্বামী কতল হয়েছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করার অভিলাষ গুলজানের। তাই সুফিয়াকে ডেকে বললেন, "মা তুমি ছাগলগুলো দেখে রেখো। আমি একটু ও পাড়ায় যাব, আসতে হয়ত একটু দেরী হবে।" সুফিয়া তার মায়ের অভিপ্রায় বুঝতে বাকি নেই। তাই মাকে বলল, "আম্মি! তোমাকে তো কোনদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে দেখি নি, আজ ওপাড়ায় যাওয়ার এত দরকার হল কেন? ছাগলগুলো পাহাড়ের ঢালে বেঁধে রেখেছি। আমিও তোমার সাথে যাব।"

গুলজান সুফিয়াকে নিয়ে পল্লীর ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। কেউ বুঝতে পারে নি তারা মা-বেটি কোথায় যাচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পল্লী পিছনে ফেলে সোজা পাহাড় উপত্যকার সরু ও মেঠো পথ বেয়ে হাটের পথ ধরলেন। হাটের দিন ছাড়া এ পথে লোক চলাচল খুব কম করে। আঁকা-বাঁকা পথ। কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে, কখনো খাড়া উপরে, কখনো নামতে হয় পাতালে, প্রায় সারাটা পথ তেমনই হয়। দুধারে লতা-গুল্ম ও কাঁটায় ভরা। মাঝে মধ্যে যেন প্রেমের আবেশে কাঁটাগুলো সুফিয়ার ওড়না আঁকড়িয়ে ধরে কেবলই বিরক্ত করে তুলছে। কোন মতে তা ছাড়াতে না ছাড়াতে আবার সেলোয়ার ধরে বসে। কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে হাতও আহত হয়েছে কয়েক স্থানে। গুলজানের অবস্থাও তদ্রূপ। এভাবে বহু কষ্টে ছোট বড় কয়েকটি টিলা পেরিয়ে উভয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। গুলজান সুফিয়াকে ডেকে বললেন, "বেটি! একটু থামো, একটু বিশ্রাম করে নেই। আর পারছি না যে।"

সুফিয়া মায়ের কষ্ট দেখে থেমে গেল। উভয়ে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। এক পর্যায়ে সুফিয়া বলে উঠল, "আম্মি! পাহাড়ে কি সুরভিত পুষ্প কানন রয়েছে? ইসঃ কোত্থেকে এত চমৎকার খুশবু এসে আমাকে মাতোয়ারা করে তুলছে! না আম্মি আমি ও বাগানে না গিয়ে বাড়ি যাব না। আমি পথ ঘাট সবই চিনি। আর একটু ঘুরে আব্বুর তালাশ করে যদি না পাই তবে তুমি চলে যেয়ো। আমি বাগানের সন্ধান করে বাগানে একটু সময় বিচরণ করব। তারপর এক আঁচল ফুল কুড়িয়ে নেব। একটি মালা গেঁথে রফিকাকে দেব। তা না হয় ও আমার সাথে রাগ করবে। আমি যদি আমার খোঁপায় ফুল গুঁজে রফিকাদের বাড়ি যাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, এ মালা কোত্থেকে আনলে? আমার মালা কই? কাজেই ওর জন্য ছোট্ট হলেও একটি মালা নিতে হবে। আমাদের মালা দেখে সামছীও নাক গলাবে, ঠেং বাড়াবে। ওকে দেব না ও খুব দেমাগী। পাড়ার কোন একটি মেয়ের সাথে ওর বনিবনা নেই। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও বাড়াবাড়ি করে।" গুলজান বললেন, "আরে পাগলী! এ অরণ্যে বুঝি তোমার জন্য বাগান তৈরি করে রেখেছে নজিবুল্লাহ্। যেখানে কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই, নেই কোন মানুষের আনা-গোনা। এখানে বাগান আসবে কোত্থেকে? হয়ত দু একটি বনফুল ফোটে থাকতে পারে কোথাও। কে জানে কোত্থেকে সুবাস ছড়াচ্ছে।"

তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। সুফিয়া আগে আগে চলছে আর বৃদ্ধা গুলজান চলছেন সুফিয়াকে অনুসরণ করে। সুফিয়া আর একটু অগ্রসর হয়ে আম্মি আম্মি বলে চিৎকার দিয়ে উঠল, "এই তো আমার আব্বুর টুপী পড়ে আছে, এই তো রক্তে ভেজা অরণ্য পথ। এইতো পড়ে আছে আমার সুঁই, সুতা, কুশিকাঁটা। এইতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কয়েক কেজি আটা। গুলজান স্বামীর রক্ত দেখে বেহুঁশ হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। সুফিয়ার কথার ওপর গুলজানের সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। কারণ, সে হয়ত অনুমান করে কথা বলছে। এবার তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে বলেই মনে হয়। সুফিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মায়ের শয্যা পার্শ্বে অবোধ বালিকার মত দাঁড়িয়ে আছে। সুফিয়ার অন্তরে হঠাৎ জেগে উঠল কিতাবের ঐ উপদেশগুলো যে, "বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়, ছবর করতে হয় ও বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়।" তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় যে পানির বোতলটি নিয়ে এসেছিল, সে বোতলের ছিপি খুলে পানি নিয়ে মায়ের চেহারায় পানি ছিঁটাতে লাগল ও মুখে পানি দিতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণ পর গুলজানের হুঁশ ফিরে আসে ও সে শোয়া থেকে ওঠে বসে।

সুফিয়া দৃঢ়কণ্ঠে মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "আম্মি! নরাধম পাষণ্ড, মুর্তাদ সন্তানের হাতেই আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন। এতে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিশোধও তো নিয়েছি। মাকে ধৈর্যধারণের জন্য অনেক কথা শোনাল সুফিয়া। সে আরো বলল, "অসহায় দুর্বল ও রুগ্ন পিতা পুত্র কর্তৃক নিহত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি এখন জান্নাতের বাগ-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আম্মি! দেখেন না। আব্বুর রক্ত থেকে জান্নাতী সুবাস বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটা কোন ফুল বনের প্রস্ফুটিত গোলাপের সুবাস নয়। এটা জান্নাতী পিতার রক্তের সুঘ্রাণ।" গুলজান একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে লাশ ....?"

সুফিয়া মায়ের প্রশ্নের জবাবে বলল, "আম্মি! যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন নি, তাঁরা জীবিত। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই আল্লাহ শহীদের লাশের হেফাজত করবেন।" সুফিয়া এ বলে আরো একটু সামনে অগ্রসর হয়ে একটি প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে পিতার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে, লাশ থেকে মস্তকটি আলাদা। তাঁর মুখে মুচকি হাসি ফুটে আছে। চোখ দুটি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন। সত্যি এমন দৃশ্য দেখার সুযোগ অতীতে হয় নি। উভয়ে লাশের পাশে বসে এক এক করে দু-পারা কুরআন শরীফ পাঠ করে শহীদের রুহে সওয়াব পৌঁছালেন।

সুফিয়াকে লক্ষ করে গুলজান বললেন, "বেটি! তোমার আব্বুর লাশটির হেফাজত করা দরকার। দুজনে তো কিছুই করা সম্ভব হবে না। চল পল্লীতে গিয়ে লোকজন ডেকে আনি।" সুফিয়া বলল, না আম্মি পল্লীতে যেতে হবে না। আমরাই সমাধান করতে পারব। আপনি এখানে বসুন, আমি একটু ঘুরে ফিরে দেখি কোন উপায় খুঁজে পাই কিনা। সুফিয়া গুলজানকে বসিয়ে রেখে নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি গুহার সন্ধান পেল। গুহাটি এত বড় না হলেও একটি লাশ অনায়াসে দাফন করা যাবে। সুফিয়া ফিরে এসে তার মাকে নিয়ে লাশটি তোলার চেষ্টা করল। সুবহানাল্লাহ ধরার সাথে সাথে তুলার মত হালকা মনে হল। অতঃপর লাশটি নিয়ে গুহায় রেখে পাথর কুড়িয়ে এনে গুহার মুখটি বন্ধ করে দিল। ওরা পৃথক পৃথক জানাযা পড়েছে। অতঃপর দোয়া করে দুজনে বাড়ি ফিরে আসলেন।

[দশ]
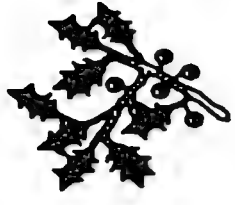
দুপুর গড়িয়ে সূর্য্যটা বিকালের বেলভূমিতে ঢলে পড়েছে। বৃক্ষরাজির ছায়াগুলো ক্রমশ প্রলম্বিত হচ্ছে। গুলজান সুফিয়ার হাত ধরে হিন্দুকুশ পর্বতমালার গা বেয়ে নিচে নামছেন। বুকে তার এক সাগর বেদনা। সাইমুম ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে তার জীবনের সব সুখ-স্বপ্ন। কেড়ে নিয়ে গেল আশা-ভরসার সব কটি অবলম্বন। দুঃখিনী, হতভাগিনী, অসহায়িনীর অশ্রুধারা কপোল বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে।

সন্তানহারা জননীর কান্না আর স্বামীহারা নারীর কষ্ট এবং অভাব-অনটনের নির্মম কষাঘাত যারা কোন দিন ভোগ করে নি তারা এ বেদনা কি করে উপলব্ধি করবে? যে সন্তানকে দশ মাস দশ দিন উদরে ধারণ করে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছে, প্রসবের মত কঠিন বেদনা সইতে হয়েছে সন্তান লালন-পালন করতে তার কত রজনী নির্ঘুম নয়নে পোহাতে হয়েছে, নিজের আরামকে হারাম করে সন্তানের আরামের ব্যবস্থা করেছে। ভাল খাবারটুকু নিজের মুখে না দিয়ে সন্তানের মুখে তুলে দিয়েছে। এমন সন্তান যদি আল্লাহর নাফরমান হয়, আর যদি হয় পিতা-মাতার অবাধ্য, সে কষ্ট তবে কি করে হৃদয় সইবে?

গুলজানের অবস্থা ঠিক এমনটিই। বিয়ের পর থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ দু'টি যুগ যাকে অবলম্বন করে পথ চলছিল, সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার সাথে যে মানুষটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, তাকে আজ নিজ হাতে গীরিগুহায় পাথর চাপা দিয়ে আসতে হল। এসব চিন্তা এসে গুলজানকে বার বার আহত করতে লাগল।

সুফিয়া মায়ের অবস্থা দেখে বার বার সান্ত্বনা দিতে লাগল এই বলে যে, "আম্মি! হযরত নূহ (আ)-এর আদরের পুত্র কেনান ঈমান আনে নি। অনেক দোয়া করেছেন, বুঝিয়েছেন নিজের সন্তানকে, তাতেও কোন কাজ হয় নি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা শুধু মূর্তিনির্মাতা ছিলেন তা নয়, মূর্তিপূজারীও ছিলেন। ছেলে নবী হয়ে অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কেননা, হিদায়াত একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে। গাউছ-কুতুব, অলিআল্লাহ্, পীর, বুজুর্গ, মাতা-পিতা ও নবীদের হাতে নয়। আল্লাহ্ যাকে পছন্দ করেন, তাকেই হিদায়াতের নেয়ামত দান করেন। তাকদীরের লিখন পরিবর্তন হওয়ার নয়। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এর ওপর রাজি থাকাটাই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে।" গুলজান মেয়ের কথা শুনে অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন।

গুলজানের শরীর কাঁপছে। পা এগুচ্ছে না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সাথে নেয়া পানিটুকু অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আশে-পাশে কোন ঝর্ণাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। একটু পর পর শুধু জিভ চুষসে। এভাবে চলতে চলতে একসময় হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে এসে গেলেন। সুফিয়া তার মাকে একটি বিটপী মূলে বসিয়ে ছুটে গেল চারণভূমিতে রাখালদের কাছে। সাধারণত ওদের কাছে খাবার ও পানীয় থাকে। ছুটোছুটির পর কয়েকজন রাখালের সন্ধান পেল, ওরা সবাই রামাল্লা পল্লীর যুবক। এ যুবকরা ছিল তার ভাই সুফিয়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরাই সুফিয়ানকে সঙ্গ দিত। এখন ওরা সমাজে খুব চাপের মুখে আছে। দুষ্টু ছেলেগুলো সুফিয়াকে এ অসময়ে দেখে বিস্মিত হল। কারণ, সে একজন পর্দানশীন, হাদীস পড়ুয়া ও পরমা সুন্দরী যুবতী। তার একা একা এখানে আসার কথা নয়। এক যুবক বলে উঠল, "আরে সুফিয়ানের কথা মনে হয় ঠিক ঠিকই হতে যাচ্ছে। ও-না বলেছিল, তার বোনকে যদি সে বাগে আনতে পারে তবে আমাদেরকেই হিস্যা দেবে।"

অন্য একজন বলে উঠল, "তাই তো!"

সুফিয়া যুবকদের নিকট এগিয়ে গিয়ে লজ্জাবনত মস্তকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল-

ঃ হাভেওয়ালে ইছতিড়ী মাসে? (ভাই আপনারা কেমন আছেন?) যুবকদের একজন উত্তর দিল-

ঃ জুড়হাস্তাম, জানজুড় হাস্তাম বুমবাট হাস্তাম, টুল খায়রিয়াত হাস্তাম! (ভাল আছি, সুখে আছি, শান্তিতে আছি। সর্বদিক দিয়ে খুব ভাল আছি।) অন্য এক যুবক প্রশ্ন করল, "দখতরাম চিড়তা লাগলে?" (বোন! তুমি কোত্থেকে এলে?)

সুফিয়া ঃ জাবালে হিন্দুকুশ।

যুবক ঃ দারাগলে তাকলিফ নিস্তা? (আসতে কষ্ট হয় নি তো?)

সুফিয়া ঃ বাতাক্লিফ নিস্তা। (না কষ্ট হয় নি।)

যুবক ঃ এও নফর রাগলে? (একাই এসেছেন কি?)

সুফিয়া ঃ বালে এও নফর। (হ্যাঁ একাই এসেছি।)

যুবক ঃ বদনেতু তাকলিফ ইস্তা? (তোমার শরীরটা খুব দুর্বল বলে মনে হচ্ছে।)

সুফিয়া ঃ এও তাকলিফ ইস্তা। হ্যাঁ কিছুটা দুর্বল লাগছে।)

অপর এক যুবক ঃ সুফিয়ান কুম যাই? (সুফিয়ান কোথায়?)

সুফিয়া ঃ হাভেওয়ালে সুফিয়ান কুর রাগলে। (সুফিয়ান ভাইয়া বাড়িতে আছেন।)

সুফিয়া হাল পোরস্তির পর যুবকদের কাছে পানি চাইল। যুবকরা সুফিয়ার কথায় সায় না দিয়ে কেবলই একের পর এক প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে উত্যক্ত করতে লাগল। তারা তামাশা করছিল সুফিয়াকে নিয়ে।

এদের কথা-বার্তা বা হাব-ভাব দেখে সুফিয়া বুঝতে পারল, যৌবনের উন্মাদনায় এরা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় কি করবে না করবে ঠিক করতে পরছে না। ওরা তিন জন, সুফিয়া একা। এখান থেকে বেরিয়ে আসাটাও খুব কঠিন। তাই যুবকদের অন্তরে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে বলল, "আমার আম্মি তৃষ্ণায় কাঁতরাচ্ছেন। ঐতো টিলার ওপর বিটপী মূলে তাকে বসিয়ে রেখে পানির সন্ধানে এসেছি। এখন আর দেরী করা যাবে না। যাই।"

সুফিয়া দ্রুতবেগে গুলজানের দিকে ফিরে আসতে লাগল। এমন সময় শাব্বির নামক এক যুবক দুটি রুটি আর এক বোতল পানি নিয়ে সুফিয়ার হাতে তুলে দিল। সুফিয়া পানি ও আহার্য্য নিয়ে গুলজানের নিকট গিয়ে দেখল, মা চির নিদ্রায় শায়ীত। অনেক ডাকা-ডাকির পরও আর চোখ খুলে তাকালেন না। সুফিয়া বুঝতে পারল যে, "কিয়ামতের আগে আর আম্মুর ঘুম ভাংবে না। এটা এমন নিদ্রা, যে ব্যক্তি এ নিদ্রার কোলে একবার ঢলে পড়েছে, সে ইসরাফীলের বাঁশীর আওয়ায ছাড়া কেউ তাকে জাগাতে পারবে না।

সুফিয়া এলো-মেলো কেশে ছুটে চলল পল্লীর দিকে। প্রথমেই রফিকার সাথে সাক্ষাত। রফিকা একটু অভিমানের সুরে বলল, "এত খাতিরের দরকার নেই। সেই সকাল থেকে খুঁজে মরছি। তোর কোন সন্ধান পাই নি, কতবার তোদের বাড়ি গিয়ে খুঁজেছি কোন পাত্তাই মেলে নি।

রফিকা সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছে, টপ্‌টপ্‌ করে অশ্রু ঝরছে তার চোখ থেকে। সুফিয়ার সিক্ত আঁখিযুগলের দিকে তাকিয়ে রফিকারও চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। ভিজে গেছে চোখের পাতা। কান্নাটা একটু সংবরণ করে নিয়ে সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে বোন! অমন করে কাঁদছিস কেন?"

সুফিয়া চোখ দুটি মুছে নিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল, "যা বোন তুই তোর আব্বুর কাছে গিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সব কথা খুলে বল। আর অনতিবিলম্বে যেন আম্মুর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হয়।"

সুফিয়া রফিকার নিকট ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ছুটে গেল তার আপন একমাত্র মামা ও উস্তাদ মৌলভী আকরাম সাহেবের নিকট। আকরাম সাহেব আসরের নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। সুফিয়াকে দেখে প্রথমেই একটু রেগে বললেন, "বেটি! এখনো কি তুমি ছোট্ট খুকী যে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে? তোমার কি লেখাপড়া নেই? মিশকাত শরীফের এখনো ত্রিশ-চল্লিশ পাতা রয়ে গেছে। সময়তো আর বেশি নেই। নেসাব কি শেষ করা যাবে?

সুফিয়া লজ্জাবনত মস্তকে মামার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, “মামুজান! এখন থেকে ২৪টি ঘণ্টাই খেলাপড়া করতে পারব। আজ থেকে আমার আর অন্য কোন ঝামেলা থাকবে না। সব ঝামেলার অবসান ঘটিয়ে এসেছি। আজ থেকে আমি চিরমুক্ত চিরস্বাধীন। কেউ আর আমার কোন কাজে বারণ করবে না।”

মৌলভী আকরাম তার ভাগিনীর দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখল, “সুফিয়া প্রকৃতিস্থ নয়, সে যেন বিকারগ্রস্ত। চোখ দু'টি লাল, গড়িয়ে ঝরছে অশ্রুর বান।

মৌলভী আকরাম সস্নেহে সুফিয়ার অবস্থা জানতে চাইলে সব ঘটনা খুলে বলল সুফিয়া। সুফিয়ার কথা শুনে মৌলভী আকরামের মাথার ওপর দিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে গেল। মৌলভী আকরাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার যবান থেকে বার বার বেরিয়ে আসছে, “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন!!”

পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী তাঁর কন্যা রফিকার যবান থেকে এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে হয়রান-পেরেশান হয়ে সুফিয়াদের গৃহাভিমুখে ছুটে চললেন। রাস্তায় দেখা হল সুফিয়া ও ইমাম সাহেবের সাথে। উভয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন, নামাযের সাথে সাথেই কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবেন। সর্দারজী সুফিয়াকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, “যাও! আল্লাহর মর্জির ওপর সন্তুষ্ট থাকাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য। সেজন্য অশ্রুপাত করে লাভ হবি কি? তুমি আমার আদরের দুলালী রফিকার বান্ধবী। এখন থেকে আমার নিকট তুমি পিতৃসুলভ আচরণ পাবে। তুমি কোন চিন্তা করবে না। যাও মা! রফিকার সাথে থাক গিয়ে। আমরা নামায পড়েই তোমার আম্মির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করছি।” এই বলে দু'জন চলে গেলেন মসজিদে।

নামায সমাপণ করে এলাকার মুসল্লীদেরকে কয়েক দলে বিভক্ত করে, কাউকে কবর খননে, কাউকে বাঁশ ও খাটিয়ার ব্যবস্থা করতে কাউকে গোসলের ইন্তিজামে, কাউকে গোসলের পানি তৈরি করতে বললেন। আকরাম সাহেব, সর্দারজী ও আরও কয়েকজন মিলে লাশ আনার জন্য খাটিয়া নিয়ে হিন্দুকুশের দিকে চলে গেলেন।

এলাকার লোকজন দলবদ্ধভাবে যার যে দায়িত্ব তা পালন করতে লেগে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলজানের লাশ নিয়ে এলো। সুফিয়া, রফিকা ও আরও দু'তিন জন মেয়ে মিলিত হয়ে শেষবারের মত তাঁকে গোসল করাল। এ দিকে কবর খননও প্রায় শেষ। কয়েক মহল্লার লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে। বাদে মাগরিব লাশ দাফন করা হল। কারও ধারণা, তাকে বিষধর সর্পে দংশন করেছে।

আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, হার্টফেল বা স্ট্রোক করে প্রাণ হারিয়েছেন গুলজান।

গুলজানের লাশ দাফন করার পর সমবেত মুসল্লীদেরকে লক্ষ করে সর্দারজী বললেন, "প্রিয় এলাকাবাসী! সকলেই আমার সালাম গ্রহণ করুন। আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপনাদের নিকট আরজ করতে চাই, যুগ যুগ ধরে আমরা এবং আমাদের পূর্বে আমাদের পিতৃব্য, পিতামহ ও দাদাগণ এ অঞ্চলে সুখে-সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করে গেছেন। বর্তমানে আমরাও বাস করছি। কিন্তু কোন দিন দেখি নি কোন একজন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে গালি দিয়েছে বা কারো ওপর হাত তুলেছে। এমন কি কাউকে কোন পশু-পাখির উপরও জুলুম করতে দেখি নি। অথচ আজ আমাদের পল্লীর প্রবীণ মুরুব্বী জনাব আলীবর্দী রোস্তমকে তার উচ্চ শিক্ষিত ছেলে সুফিয়ান হত্যা করে গা ঢাকা দিয়েছে। ছেলে কর্তৃক পিতা হত্যা এ হল উচ্চ শিক্ষার ফসল। এ হল আমাদের নজিবুল্লাহ সরকারের আমদানীকৃত সভ্যতা। এ ধরনের অপ্রীতিকর আজকাল নিয়মিত ঘটছে। এমন জঘন্যতম অপরাধ একমাত্র কমিউনিস্টরাই করতে পারে। প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়ই এসব খবর ছাপা হয়। নিষ্ঠুর ছেলের হাতে অগণিত পিতা-মাতা খুন হচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন একটিরও বিচার হয় নি। আমাদের গ্রামেও কমিউনিস্টরা অনুপ্রবেশ করেছে। আজ থেকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, এ ধরনের কেউ যদি থাকে তবে সে তাওবা করে সরল পথে ফিরে এসো। তা না হয় তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। তিনি আরো বললেন, সুফিয়া আমাদের সকলেরই মেহমান। তার সাথে যেন কোন দুর্ব্যবহার না করা হয়। যদি এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তবে তাকে জ্যান্ত ছাড়া হবে না।" উপস্থিত জনতা এক বাক্যে বলে উঠল, "তাই যেন সত্য হয় মহামান্য পল্লীসর্দার, তাই যেন সত্য হয়।"

অতঃপর সকলেই খুনী সুফিয়ানের বিচার দাবী করল। সর্দারজী হুকুম জারী করলেন যে, "তাকে যেখানে পাবে, সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসবে। তার বিচার করা হবে।"

[এগার]

পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানীর নির্দেশ পেয়ে যুবকরা দলে দলে বেরিয়ে গেল সুফিয়ানের সন্ধানে। গ্রাম-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, শহর-বন্দরে ও বিভিন্ন উপত্যকায় খোঁজা-খুঁজি করে কোথাও সুফিয়ানের সন্ধান পেল না। যুবকরা ব্যর্থ মনোরথে পল্লীতে ফিরতে লাগল।

পল্লীসর্দার গ্রামের দু'একজন মুরুব্বীকে নিয়ে বিষয়টা প্রশাসনের গোচরে দেয়ার জন্য থানায় গেলেন। থানা কর্মকর্তা কেইস গ্রহণ করতে গড়িমসি করতে লাগল। দারোগা পল্লী সর্দারকে লক্ষ করে বললেন, "চাচা মিয়া! যার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করতে এসেছেন তিনি তো আমার আপনার মত সাধারণ লোক নন। মাত্র কয়েদিন বাকি! তারপর তিনি হবেন একজন সচিব। তারপর তো আমাদের বাজবে বারটা আর আপনার বাজবে তেরটা। তা কি ভেবে দেখছেন? মস্কো থেকেই তাঁকে স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োগ দিয়ে পাঠান হয়েছে। তিনি নজিবুল্লাহ সরকারের খুবই কাছের ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। আর থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

অপর এক কনস্টেবল বললেন, "চাচা মিয়া! আলীবর্দীকে যে তার ছেলে সুফিয়ান কতল করেছে তার কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে? না আপনি প্রত্যক্ষদর্শী?"

সর্দার উত্তর দিলেন, "ন৷ আমি তা নিজ চোখে দেখি নি। তবে আলীবর্দীর মেয়ে সুফিয়া, অর্থাৎ সুফিয়ানের বোন তাকে সন্ধ্যার পর পর ছুরি নিয়ে ওদিকে যেতে দেখেছে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ফিরে আসতে দেখেছে। তাছাড়া অন্য কোন সাক্ষী নেই। এর ওপর ভিত্তি করে তদন্ত করে দেখতে পারেন।"

অপর এক সিপাহী বললেন, "চাচা! বুড়োরাতো সংসারের ভেজাল, রাষ্ট্রের বোঝা। ওনারা কাজ-কাম করতে পারে না। কাজেই এদের বেঁচে থাকার কোন যৌক্তিকতা বা সার্থকতা নেই। বুড়োদের ব্যাপারে সরকারী আইনও অনেকটা শিথিল। কাজেই এসব কথা বাদ দিয়ে আপনাদের চলে যাওয়াটাই ভাল মনে করি।

দারোগার উক্তিগুলো সর্দারের নিকট বিষের মত লাগছিল। দারোগার কথা শেষ হতে না হতেই সর্দার অগ্নিশর্মা হয়ে চোখ দুটি কপোলে তুলে বললেন, "তোমরা

কি দেশটাকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিতে চাও? একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে আসামী বুক ফুলিয়ে ঘুরবে আর তার বিচার হবে না, এ কেমন কথা? তাই যদি হয় তবে আমরাই দেখব, কিছু করা যায় কি-না।"

সর্দারের কথার কিছুক্ষণ পর দারোগা হামেদ খোস্তানী বললেন, "ঠিক আছে, আমরাও তা দেখব। আপনি গিয়ে কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করুন ও সাক্ষী প্রমাণ যোগাড় করুন।" এবলে তিনি খাতা বের করে কেইসটি ডায়েরিভুক্ত করলেন।

পল্লীসর্দার ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। সর্দারজী গ্রামবাসীকে ডেকে বললেন, "সুফিয়ানের চাল-চলন, ওঠাবাসা ও আচার-ব্যবহার কেমন ছিল তা সবারই জানা। থানা-পুলিশ আসলে সকলে সবকিছু সত্য সত্য বলে দিবা, কেউ কিছু গোপন রাখবা না।" সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, "লম্পটের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আবার ভয় কিসের! সে এ গ্রামে এসে যুবক-যুবতীদের নিয়ে কি করতে চাইছে তা কে না জানে? সবই প্রকাশ করে দেব।"

হামেদ খোস্তানী এক জন মদখোর, ঘুষখোর ও লম্পট চরিত্রের লোক। বেগানা নারী ভোগ ছিল তার নিত্য দিনের অভ্যাস। সন্ধ্যার পর কোন ফকিরণীও তার সম্মুখ থেকে ইজ্জত নিয়ে যেতে পারত না। কয়েক বোতল মদ পান না করলে তার মাথা ঠিক থাকত না। সে ছিল কাট্টা কমিউনিস্ট। মাত্র দুমাস হল বদলি হয়ে এখানে এসেছে। পথ-ঘাট ও লোকজনের সাথে এখনো পরিচিত হয়ে ওঠে নি। আর কিছুদিন গেলে থানাবাসী বুঝতে পারবে, দারোগা হামেদ খোস্তানী কেমন লোক এবং কি চিজ।

পরদিন সকাল ৮ ঘটিকা। কয়েক বোতল মদ গড়গড় করে গলায় ঢেলে দিয়ে, আর দুই জন পুলিশসহ মোটর সাইকেলের হর্ণ বাজিয়ে রামাল্লা পল্লীতে এসে হাজির হলেন হামেদ খোস্তানী। এলাকার লোকজন ছুটে আসল সর্দারজীর দহলিজে। হাল্কা নাস্তা ও চা-পানের আয়োজন করল। দারোগা সাহেব এলাকার অবস্থান ও লোকজনের হাব-ভাব দেখে খুশী হতে পারলেন না। কারণ, এ এলাকার জনগণ কট্টর মৌলবাদী। মুখভরা দাঁড়ী, মাথাভরা চুল শীরে বাঁধা আমামা, কাঁধে ঝুলছে চাদর। এদের থেকে ঘুষ আদায় করা খুবই কঠিন তা দারোগা সাহেব আগ থেকেই জানেন। তা ছাড়া আরো একটু রাগ এ কারণে যে, পল্লীটা তুলনামূলকভাবে খুবই গরীব। বাড়ি-ঘরের নেই পরিপাটি, নেই জাঁকজমক। কৃষি আর পশু-পালনই হল এদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী থাকলে পয়সা গলানো সহজ হয়। এসব চিন্তায় দারোগা সাহেবের মাথা গরম। কিভাবে তেলের পয়সা উঠানো যায় আর কিভাবে কেইস করার মজাটা বুঝানো যায়, এখন এই ভাবনা তার মাথায়।

দারোগা সাহেব এলাকাবাসীর নিকট থেকে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে সকলেই সুফিয়ানের সুফীগিরীর বর্ণনা দিলেন। দারোগা এক এক করে সকলের মন্তব্য নোট করলেন অনেকে আবার খাছভাবে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। এর মধ্যে গ্রামের তিনটি বখাটে যুবক, যারা ছিল সুফিয়ানের বন্ধু। এদেরকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন আলাপ করলেন। এতে এলাকার অনেকেরই সন্দেহ হল এরা হয়ত আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চাচ্ছে। উক্ত তিন জনের মধ্যে সাদেক এক নম্বর কৃমিনাল। মিথ্যা, চুরি, ধোঁকাবাজী তার অভ্যাস। সে কিছুদিন স্কুলে আবার কিছুদিন হেফজখানায় আবার কয়েকদিন মাদরাসায় পড়েছে। তার এই ধোঁকাবাজী স্বভাবের কারণে না হতে পারল মাস্টার, না হতে পারল হাফেজ বা মাওলানা। অবশেষে সুফিয়ানের পথ ধরেছে।

সাদেক তার সহচরদের নিয়ে প্রায়ই সুফিয়াকে উত্যক্ত করতে থাকে। কখনো ঝর্ণার ধারে, কখনো চারণভূমিতে আবার কখনো বাড়ির আশ-পাশে। লোকজন না দেখলেই কিছু না কিছু বলে। সুফিয়ার সংসারে সে একা। পিতা-মাতা, ভাই-বোন কেউ নেই। তাই শক্তভাবে ওদের কথার জবাবও দিতে পারছে না। সাদেক সুফিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করে বার বারই ব্যর্থ হয়েছে। পল্লী সর্দার ও মসজিদের ইমাম সাহেবের ভয়ে কিছু করতে পারছে না। তা না হয় অনেক আগেই........।

দারোগার বদমায়েশী স্বভাবের কথা সাদেক আগেই জানত। এমদাদ ও রঈছ উভয়ে বয়সের দিক দিয়ে সাদেকের ছোট। বয়সের দিক ও কৃমিনালী দিক দিয়েও সাদেক তাদের উস্তাদতুল্য। তাই ওরা সাদেকের কথার ওপর কোন কথা বলে না।

দারোগার অশালীন আচরণ দেখে সকলেই অনুমান করেছে যে, নিশ্চয়ই সাদেক এখানে পিন মেরেছে। যার কারণে দারোগা শুধু বিরিং বারিং ফাৎ ফুৎ করছেন।

দারোগা সুফিয়াদের বাড়ি ও ঘর-দরজা চেক করেন। তারপর আলীবর্দী ও গুলজানের সমাধিতে যান এবং কবরের বাঁশ উঠিয়ে লাশ দেখেন। আলীবর্দীর কবরের পাথরগুলো সরায়ে যখন লাশের দিকে দৃষ্টি ফেরাল, তখন আলীবর্দীর ডাগর দুটি আঁখি ঘুরে ঘুরে দারোগাকে দেখছিল। এ দৃশ্য দেখে দারোগার পানির পিপাসা লেগে গেল। এমন আজিব ঘটনা তো আর কোন দিন দেখেন নি। দারোগার ইচ্ছা ছিল, লাশ দু'টি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু চোখ মট্‌কানী দেখে তাড়াতাড়ি পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন এবং লাশ তুলে আনার চিন্তা পরিহার করলেন।

সুফিয়ার জবানবন্দী নেওয়ার জন্য ডাকা হল। সুফিয়া আপাদ-মস্তক কাল রং-এর আফগানী বোরকা পরে দারোগার নিকট আসলে রাগে কটমট করতে লাগলেন। সুফিয়ার চোখ দু'টি ছাড়া সমস্ত অঙ্গ ছিল ঢাকা। দারোগা রাগে গরগর করতে করতে বললেন, "তুমি পুরুষ না মহিলা তা চেনার সাধ্য নেই। আমি পুরুষের জবান বন্দি নিয়েছি না মহিলার তা কিভাবে বুঝব? কাজেই তোমার বোরকা খুলতে হবে।" সুফিয়া লজ্জায় কাঁচু-মাচু খেয়ে বলল "স্যার! আমি একজন মহিলা বলছি, আমার চলার ভঙ্গি ও কণ্ঠ শুনে অবশ্যই বুঝতে পারছেন, আমি মহিলা। তবে কেন ফরয বিধান পর্দা লজ্ঘন করতে চাপ সৃষ্টি করছেন? দারোগা আবার রাগারাগী করলে সে মুখমণ্ডলের পর্দা খুলে দিল।

মুখ মণ্ডলের পর্দা উম্মোচনের সাথে সাথে সুফিয়ার ওপর দারোগার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে গেল। তিমির রাতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলে যাচ্ছে। সুফিয়ার রূপশিখা যেন ঠিকরে পড়ছে চারদিকে। লাজুক লাজুক আঁখিযুগল যেন অভিমানে লুকোচুরি খেলছে। দারোগার প্রশ্নের উত্তর দিতে যখন ঠোঁট দুটি নাড়ছে, এরই ফাঁক দিয়ে যেন ধবল দন্তপাটি প্রকাশ পেয়ে হাসির রেখা টানছে। এ যেন মানবী নয় পরীস্তান থেকে পালিয়ে আসা অপরূপ এক সুন্দরী। না হয় কোন রাজ কুমারী পথ ভুলে এ পল্লীতে আগমন করেছে। তা না হলে বেহেশতের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসা কোন হুরবালা হবে তাতে সন্দেহ নেই। এক চাহনিতেই দারোগা হামেদ খোস্তানীর পঞ্চ আত্মা কেড়ে নিয়েছে। দারোগা সাহেব হারিয়ে গেছেন ভাবনা-সাগরের গহীন বারিধি বক্ষে। তিনি প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে একবার ভাসছেন আবার তলিয়ে যাচ্ছেন।

দারোগার পেটে পেটে ছিল শয়তানী। যেভাবেই হোক তাকে নিয়ে যেতে হবে। রেখে যাওয়া অসম্ভব। মেয়েটা যদি পাঠান ও মৌলবাদী না হত তবে
দারোগা এসব চিন্তা করতে করতে বলল, "জানাব সর্দার সাহেব! রিপোর্ট যা সংগ্রহ করার তা করেছি বটে কিন্তু এখনো জটা খোলে নি। আসল রহস্য এখনো বেরিয়ে আসে নি। তাই মৌলভী আকরাম, আপনি ও সুফিয়াকে থানায় যেতে হবে। সেখানে আপনাদেরকে ও. সি. সাহেবের কাছে জবানবন্দী দিতে হবে। তারপর ওগুলো রেকর্ড করে আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে আগে বাড়ব। যদি স্বেচ্ছায় না যান তবে বাইফোর্স নিয়ে যাওয়া হবে। দেখুন কি করবেন?"

সর্দারজী মৌলভী আকরাম ও আর দু-একজন মুরুব্বীর সাথে পরামর্শ করলেন। প্রায় সকলেই বললেন, প্রশাসনের সাথে বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। দারোগা বলছেন, থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবেন, এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

সকলের পরামর্শক্রমে পল্লীসর্দার মুহাম্মদ ইয়ার আফগানী, মৌলভী আকরাম ও সুফিয়াকে নিয়ে থানায় গেলেন।

একটু পরেই মিনারে মিনারে আসরের আযান ধ্বনিত হল। সর্দারজী ও মৌলভী আকরাম নামাযের জন্য মসজিদে যেতে চাইলে দারোগা নিষেধ করে বললেন, "না আপনারা মসজিদে যেতে পারবেন না। এখানেই নামায পড়ুন।" সর্দারজী আকরাম সাহেবকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। দারোগা সুফিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি আপা! নামায পড়বেন কি?"

সুফিয়া উত্তর দিল, ! "হাঁ পড়তে তো হবেই তবে, জায়গা যে নেই।" দারোগা বললেন, "আসুন আমার সাথে।" এই বলে তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন।

সুফিয়া বাসায় গিয়ে অযু করে নামায আদায় করল। দারোগাপত্নি সুরাইয়্যা সুফিয়াকে নামায পড়তে দেখে খুবই আশ্চর্য্য হলেন এই মনে করে যে, এ ধরনের নষ্ট নারীর আবার নামায। তার গায়ে আবার ইয়া বড় বোরকা! রূপ-গুণে তো কম নয়; ব্যবসাটাও ভাল ধরেছে। দারোগাপত্নি সুফিয়াকে নিয়ে এসব আজে-বাজে ভাবছে।

সুফিয়া নামায শেষ করে গৃহকর্ত্রীর রুমে গিয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছেন আপু?" সুরাইয়্যা উত্তর দিলেন, "ভাল আছি বটে তবে মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মিছামিছি নেভানোর ভান করা উচিত নয়।"

সুফিয়া সুরাইয়্যার কথা মোটেই বুঝতে পারে নি। সুফিয়া আবার প্রশ্ন করল, "নামায পড়ে নিয়েছেন কি?

সুরাইয়্যা ঃ নামায পড়েছি বটে, তবে নামায পড়লে কি হবে? উপরে ঠাট-বাট, আর ভিতরে সদরঘাট। আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি চলে না। একদিন তার কাছে হাজির হতেই হবে।

সুরাইয়্যার কোন কথাই সুফিয়া বুঝে উঠতে পারে নি। তাই বিনীত কণ্ঠে বললেন, "আপু! আমি গাঁয়ের মেয়ে, লেখাপড়া তেমন জানি না, তাই আপনার কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে বুঝিয়ে বললে উপকার হত।"

সুরাইয়্যা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কি আর বলব, আমার মনের দুঃখ আমাকেই বলছি।"

"না আপনি সত্যি করে বলুন, কি দুঃখ আপনার?"

সুরাইয়্যা এবার বলতে লাগলেন, "তোমার মত এত সুন্দরী মেয়ের কি স্বামীর অভাব? তবে কেন এমন জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ বেছে নিয়েছ। যে কোন ভাল ছেলে তোমাকে বৌ সাজিয়ে তুলে নিবে। অনেক শিক্ষিত, ধনী, ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবি

ছেলেরা তোমার পাণী গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। ওরা কি তোমার ভরণ-পোষণ করবে না? কেন তুমি দেহ-ব্যবসা বেছে নিয়েছ? সোনার দেহ কেন জাহান্নামের ইন্ধন বানাতে চাচ্ছ?"

সুফিয়া আবার প্রশ্ন করল, "আপু! যা বলতে চান পরিষ্কার ভাষায় বলুন, আমাকে আর কষ্ট দিবেন না।"

সুরাইয়্যা এবার বললেন, আজ তিন তিনটি বছর অতিবাহিত হচ্ছে এ জালেমের ঘরে। মাতা-পিতা, ধন-দৌলত দেখে পুলিশ নামক ডাকাতের হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছেন। পুলিশ জাত এত হারামী তা আগে জানতাম না। প্রতিদিন রাত্রে বাসায় জমে মদপানের আসর। এলাকার মস্তান ও সন্ডা-গুন্ডারা এসে ভীড় জমায়। তাছাড়া এমন কোন রাত অতিবাহিত হয় নি যে রাতে দু-একজন দেহব্যবসায়ী বা নর্তকীকে আমদানি করা হয় নি। কোন কোন সময় নীরিহ ও অবলা নারীদেরকেও রাস্তা-ঘাট থেকে ধরে নিয়ে আসে। ফকিরণী আর মেথরণীর কোন বাছ-বিচার নেই।"

এতটুকু বলতে না বলতে সুফিয়া কেঁদে বুক ভিজাতে লাগল। নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল, "হায়! যদি মেয়েকূলে জন্ম না হত আমার। হায়! নারীজাতির ওপর এত জুলুম-অত্যাচার, এত অবিচার! ওগো আমার প্রভু! আমি তো পরীক্ষার উপযুক্ত নই। অমন করে বারবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা তো খুবই কঠিন। তাহলে দুনিয়াটাই কি পরীক্ষার কক্ষ। শিশুকাল থেকে নিয়ে যৌবনকাল পর্যন্ত শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষা।

সুফিয়ার কান্না দেখে সুরাইয়্যার কোমল হৃদয়ে মায়ার বান ডাকল। তিনি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "বোন! তোমাকে আমি বুঝতে পারি নি। তাই.....। বল, তুমি কোত্থেকে কিভাবে এখানে এলে?" সুফিয়া হৃদয় উজাড় করে জীবনের খুঁটি-নাটি দুঃখ-কষ্ট আর বেদনার কথা বলল। সুফিয়ার দুঃখের কাহিনী শুনে নিজের ব্যথার কথা ভুলে গেল সুরাইয়্যা।

ওদের কথোপকথনের ফাঁকে দারোগা সাহেব এসে মুচকি হাসি হেসে বললেন, "কি ব্যাপার! দু'জনে খুব মজা করে গল্প করছ দেখছি। মেহমানকে নাস্তা-পানি দিয়েছ কি? সুরাইয়্যা বললেন, "এখন কি টিফিনের সময় আছে? একটু পরেই আযান হবে, নামায পড়তে হবে। নামাযের পর সব ব্যবস্থা হবে। দারোগা সাহেব চলে গেলেন অফিসে। সুরাইয়্যা সুফিয়াকে বললেন, "বোন! তুমি পেরেশান হয়ো না, বিচলিত হয়ো না। আমি জীবিত থাকতে তোমার কেশগুচ্ছ স্পর্শ করতে দেব না। একজন পর্দানশীল ও সভ্রান্ত নারীর ইজ্জত হরণ করতে দেব না। অনেক সয়েছি আর নয়।

[বার]

“সন্ধ্যা হওয়ার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাঁকি। নামাযের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাছাড়া বাড়িতে যেতে হবে। এ পর্যন্ত কোন কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করা হল না। আসলে এর পিছনে হয়ত বিরাট কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে” বললেন, পল্লীসর্দার। মৌলভী আকরাম সাহেব সাহস করে দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, “জনাব! দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এখনো আমাদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হল না। মাগরিবের নামায পড়ে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

দারোগা চোখ দু'টি লাল করে সম্মুখের পাটির দাঁতগুলো বের করে বললেন, “বাহঃ বাহঃ! অফিসিয়াল কাজ ফেলে আবার জিজ্ঞাসাবাদ! এতটুকু বলে পুলিশকে ইশারা দেয়ার সাথে সাথে তারা গারদের দরজা খুলে তাঁদেরকে ঢুকিয়ে বাইরে তালা ঝুলিয়ে দিল।

মৌলভী আকরাম ও পল্লী সর্দার দারোগার কাণ্ড দেখে হয়রান-পেরেশান হয়ে গেলেন। কি থেকে কি ঘটে গেল বুঝে উঠতে পারছেন না। নিমর্ম গারদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাদের। সবেমাত্র পরিচয়। ভিতরটা অন্ধকার, দুর্গন্ধ। নাড়ী-ভুড়ি বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। নামায পড়ার মত একটু জায়গাও নেই। কক্ষটা অপবিত্র বলে মনে হয়। নিরুপায় হয়ে আগের অযু দ্বারা রুমাল বিছিয়ে নামায আদায় করলেন তাঁরা।

হামেদ দারোগার অফিসে মন বসছে না। পাগলা মন কেবলই ছুটে যায় হেরেমখানায়। আজকের রাত্রটি তার জন্য ঈদের রাত্রির মত মনে হচ্ছে। রাত প্রায় ১১টার দিকে কয়েকটি মদের বোতল হাতে নিয়ে তিন জন যুবক এসে থানায় ঢুকল। গোঁফগুলো মোটা মোটা, মাথায় লম্বা চুল। গলায় রূপার চেইন ইয়া বড় এক তাবিজ ঝুলানো। মোটা-সোটা দেহ। দেখতে লেজহীন বুনো মহিষের মত। আগন্তুক তিনজনই হলেন নামকরা মাস্তান। দারোগা মাস্তানদেরকে লক্ষ করে বললেন, “দোস্ত! আজ সারারাত চলবে। খাসা মাল নিয়ে এসেছি। দেখলেই মন জুড়িয়ে যাবে।

মাস্তান ঃ হাঃ হাঃ হাঃ। সেকেন্ড হ্যান্ড না তো?

দারোগা ঃ সেকেন্ড হ্যান্ড মানে! একেবারে টাটকা। একদম নির্ভেজাল। দেখলেই রস টপ্‌টপ্‌ করে পড়বে।

মস্তান ঃ তাহলে তো একবার দেখে নেয়া দরকার।

দারোগা ঃ দেখার দরকার হবে না। যা বলছি তার চেয়ে অ ..... নে .... ক উম্‌দা।

মাস্তান ঃ আজ আপনাকে অনেক উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।

দারোগা ঃ উৎফুল্ল মানে! যা, জলদি যা আর কয়েক বোতল নিয়ে আয়। এ কয়টি আমারই লাগবে। যা জলদি যা, দেরি করিসনে কিন্তু।

সুরাইয়্যা সুফিয়াকে ঘরে রেখে বারবার বাসার বাইরে আবার কখনো ছাদে ওঠে পাষাণ স্বামীর খোঁজ নিচ্ছেন। অতঃপর স্বামীর রিভলভার, যা রাশিয়ার তৈরি, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন। ইচ্ছা করলে তা দিয়ে ব্রাশ ফায়ারও করা যায়। সেই রিভলভারটি সুফিয়ার নিকট এনে কিভাবে খুলতে হয় বা লাগাতে হয়, আবার ম্যাগজিন খোলা ও লাগানো এবং ফায়ার করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে সুফিয়ার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার জীবন বাঁচানোর হাতিয়ার। ইজ্জত রক্ষার হাতিয়ার।"

দারোগা বেচারা বদমায়েশী করার নেশায় একদম বেকারার হয়ে ছুটে আসলেন বাসায়, সাথে আরও তিনজন।

সুরাইয়্যা! সুরাইয়্যা ডাকতে ডাকতে হেরেমে প্রবেশ করলেন। সুফিয়া লজ্জা, ভয় ও অনুশোচনায় অস্থির হয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। পাষাণ দারোগা সুফিয়ার দিকে ইংগীত করে বলল, "দোস্ত! মালটা দেখলি তো; কত চমৎকার মাল! আজেবাজে মাল নয়। সুফিয়া পিছন ফিরে দাঁড়ানো থাকায় চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। তাই এক মাস্তান বলে উঠল, "মালটা তো ভালই বলে মনে হয় কিন্তু ....।

দারোগা ঃ কিন্তু আবার কি? একদম নতুন তো তাই। অতঃপর হামেদ পোষাক পাল্টিয়ে শুধু আন্ডার পেন্ট আর গেঞ্জিটা গায়ে রেখে চেয়ারে বসলেন। তারপর সুরাইয়্যাকে ধমক দিয়ে বললেন, "মাগী এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? বোতল খুলে গ্লাসে ঢাল, জলদি দে। হাঃ হাঃ হাঃ

সুরাইয়্যা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, "হারামী, হারাম-খোর। প্রতিদিন রাতে কোন না কোন অবলা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন! মরণ হয় না! বেশরম! আজ আবার একজন পর্দানশীল, সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারের কুমারী যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন। এতদিন যাদেরকে এনেছেন তারা সবাই ছিল

পথে-ঘাটে পড়ে থাকা নষ্ট মহিলা। ওদের গায়ে কেউ থুথুও ফেলত না। ওরা সবাই ছিল বেপর্দা। আজ যাকে এনেছেন, সে তো তেমন নয়। একজন পর্দানশীল, আলেমা মেয়ে। তার গায়ে হাত দিলে আল্লাহ সইবে না। আজ আপনাদেরকে নরম ও গরম ভাষায় বলতে চাই, এ মেয়ের গায়ে হাত দিবেন না। এ আমার আশ্রিতা এক অবলা নারী। তার ইজ্জত রক্ষা করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। আমার জীবন বিপন্ন করে হলেও তার ইজ্জত রক্ষা করব।

হামেদ স্ত্রীর কথা সইতে না পেরে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে সুরাইয়্যার কাছে গিয়ে মস্তকে এক আঘাত করলেন। সুরাইয়্যা আঘাত সামলাতে না পেরে যমিনে পড়ে গেলেন। তিন মস্তান হাত তালি দিয়ে খিলখিল করে হাসছিল। সুফিয়া এককোণে দাঁড়িয়ে অসহায়িনীর মত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তা দেখছিল।

হামেদ দারোগা রাগে গরগর করতে করতে মদের বোতলের মুখ খুলে গলায় ঢালছিলেন। এক এক করে বড় দু'বোতল একাই গলধ করলেন। অতঃপর মাস্তানদেরকে বললেন, "তোরা এখানো বসে আছিস! যা পান করার তা নিজ হাতে পান করে নে। তোদের জন্য দিয়ে দিলাম জেদী মাগীটাকে। আর আমার জন্য ....। মাস্তানরা এবার নিজ হাতে ইচ্ছে মত পান করে একেবারে বিবস্ত্র হয়ে গেল। তারপর চলল গালা-গালি, লাফা-লাফি, কালা-কালি ও হুড়া-হুড়ির পালা।

সুরাইয়্যা আগেই জানতেন, নেশাগ্রস্তদের শরীরে স্বাভাবিক শক্তি থাকে না। তিন মাস্তান যখন একজন একজন করে সুরাইয়্যার দিকে অগ্রসর হয় ঠিক তখনই সে তাদের গায়ে পদাঘাত করে। ছিটকে পড়ে যায় দূরে। এভাবে কয়েক বার লাথির পর ওরা অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়।

হামেদ দারোগা নেশায় টলতে টলতে সুফিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। সুফিয়া বার বার চেষ্টা করে যাচ্ছে বাঁচার জন্য। কিন্তু তারপরও সুফিয়ার গায়ে হাত দিতে চাইল। সুফিয়া রাগে, ঘৃণায় এক লাথি দিয়ে বসল। ছিঁটকে পড়ল ওয়ালের ওপর। আবার ওঠে গিয়ে সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরল। সুফিয়া সেলোয়ারে গোঁজা রিভলভারটি বের করে দারোগার বুক বরাবর ট্রিগার টানল। হামেদ এক চিৎকারে লুটে পড়লেন ভূমিতে। এদিকে তিন মাস্তান ভাগার জন্য ছুটো-ছুটি আরম্ভ করল। কিন্তু তা পারল না। সুফিয়া পরপর ওদেরকে লক্ষ করে আরও কয়েকটি ফায়ার করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাপিষ্ঠরা ধরাশায়ী হয়ে গেল।

সাইলেঞ্চার থাকার কারণে গুলীর শব্দ বাইরে কেউ শুনতে পায় নি। সুফিয়া ও সুরাইয়্যা এখন আযাদ। উভয়ে অযু করে দু' রাকয়াত শুকরানা নামায আদায় করলেন।

থানার ফটকে ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে, ঠন্ ঠন্ ঠন্ রাত তিনটা। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে কূল মাখলূকাত। প্রেমিক-প্রেমিকাদের অভিসার এখন শেষ। অনেক দম্পতি বাহু বন্ধনে আবদ্ধ খাটিয়ায়। নিশাচর ছাড়া কেউ রাস্তায় এখন আর নেই। এখনই যদি বের করে দেয়া যায়, তা হলে সে নিরাপদে যেতে পারবে। এই সব ভাবছেন সুরাইয়্যা।

অতঃপর হামেদ দারোগার খুলে রাখা শার্টের পকেট থেকে গারদের চাবি নিয়ে তালা খুললেন। সর্দারজী ও মৌলভী আকরাম সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলেন। একেতো পঁচা গন্ধ, তারপর আবার অন্ধকার। অপর দিকে মশার কামড়, অন্য দিকে চিন্তায় অস্থির। তাই তারা দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিলেন রাতটি।

তালা খোলার শব্দ পেয়ে আঁতকে উঠলেন, হায় এই বুঝি আমাদেরকে আরো কঠিন শাস্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। আয় রাহমান! ঈমানী পরীক্ষা আর নিও না। দয়া করে ক্ষমা করে দিন।

সুরাইয়্যা বন্দীদের হাত ধরে বের করে নিয়ে এলেন এবং বললেন আপনারা মুক্ত। জলদি থানা এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ভোর হয়ে গেলে মহাবিপদের আশংকা রয়েছে। থানা প্রহরীরা প্রধান ফটকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দণ্ডায়মান।

এই সময় সুরাইয়্যা, এদেরকে নিয়ে বাসার একটি কক্ষে বসতে বলে চলে গেলেন অস্ত্রাগারে। অস্ত্রাগারের জিম্মাদার হামেদ সাহেবই ছিলেন। সুরাইয়্যা তালা খুলে সুফিয়ার সহযোগিতায় তিনটি স্টেনগান পনরটি গুলী ভর্তি ম্যাগজিন ও এক কার্টুন গুলী বের করে নিয়ে আসলেন। তারপর স্টেনগান কিভাবে চালাতে হয় তা বুঝালেন। তারপর এদেরকে বাসার পিছনের কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বের করে দিয়ে বললেন, "আপনারা খুব সতর্ক অবস্থায় ও খুব দ্রুতগতিতে পথ চলুন। খোদা হাফেজ!"

সুফিয়া সুরাইয়্যার বক্ষদেশে মস্তক স্থাপনপূর্বক চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলল, "বোন! আপনার ঋণ শোধ করব কিভাবে? নিজ স্বামীকে হত্যা করে অপরিচিতা বোনের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নেই। আপনাকে রেখে পা সামনে এগুচ্ছে না। আপনাকে বিপন্নাবস্থায় ফেলে যাওয়া অমানবিক কাজ। তা সম্ভব নয়।

সুরাইয়্যা অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "আমার জন্য কোন চিন্তা করিসনে। আমি কি করব বা কিভাবে বাঁচব তা আগেই ঠিক করে রেখেছি। আবার হয়ত সাক্ষাত হবে। যা বোন দেরি করিসনে। অযথা বিপদ টেনে আনিসনে।" এ বলে বিদায় দিয়ে বাসায় চলে গেলেন। সুফিয়া।

সর্দারজী ও মৌলভী আকরাম দ্রুত পদে পথ চলতে লাগলেন। সামান্য একটু পথ অতিক্রম করতেই পিছন দিক থেকে কিসের একটি শব্দ কানে আসল। সুফিয়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে, একটি ছায়ামূর্তি এদিকে দৌড়ে আসছে। সুফিয়া ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এক পর্যায়ে বলে উঠল 'মামুজান! আর হয়ত রক্ষা নেই। পিছন দিক থেকে একটি ছায়ামূর্তি আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এটা নিশ্চয়ই অশুভ সংকেত। কোথাও পালাব এমন কোন স্থানও তো চেনা নেই।" সর্দারজী বলে উঠলেন, "আয় আল্লাহ! তুমি বিনে রক্ষাকারী আর কেউ নেই। তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাই।" সুফিয়া বলল, "দৌড়ে পালানো যাবে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। সকলেই যার যার অস্ত্র ঠিক রাখবেন। প্রয়োজন হলে ....।

আর একটু অগ্রসর হলে এক নারী কণ্ঠ শুনতে পায় সুফিয়া। "সুফিয়া! অ সুফিয়া, একটু দাঁড়াও!" সুফিয়ার কানে সুরটি চিরচেনা মনে হল। পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেল সুফিয়া। তাকিয়ে দেখে এ আর কেউ নয়, ইজ্জত ও জীবন রক্ষাকারী সুরাইয়্যা। "কি বোন, কি হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করল সুফিয়া। সুমাইয়্যা রুমালে পেঁচানো কি যেন দিয়ে বলল, "এগুলো নিয়ে যা, বাড়ি গিয়ে দেখবি। যা বোন, যা দেরি করিসনে।" সুমাইয়্যা চলে গেল।

চারিদিকে অন্ধকার। পথ-ঘাট অসমতল, কঙ্করময় প্রান্তর। চলতে চলতে সকলেই পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। এখন আর আবাদী এলাকা নেই। ভয়ও আর তেমন নেই। এখন শুধু পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই-উৎরাই, গীরিপথ পাড়ি দিয়ে তিন ঘণ্টায় প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। ফজরের আর বাঁকি নেই। ক্ষুদ-পিপাসায় জীবন ওষ্ঠাগত। এ ধরনের পরিশ্রম জীবনে ওদের কেউ কোন দিন করে নি। তবু বাঁচার তাকিদে না করেও উপায় নেই। থানায় কি ঘটেছে তা সর্দারজী আকরাম সাহেব জানেন না। সুফিয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করবে এতটুকু ফরসুত নেই। আকরাম সাহেব বললেন, "চলুন তায়াম্মুম করে নামায আদায় করি। এখন পানি খোঁজার সুযোগ নেই।" অতঃপর সবাই তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে আবার হাটতে লাগলেন। এতক্ষণে হিন্দুকুশ পর্বতমালার চূড়াগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। তাদের গ্রামটি দেখা না গেলেও একটু পরে দৃষ্টিগোচর হবে। হাঁটতে হাঁটতে ভোর ছয়টায় পল্লীতে এসে হাজির হলেন।

[তের]

সুমাইয়্যা বাসায় ফিরে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার যা ছিল, সব একটি ব্যাগে ঢুকালেন। দামি দামি কাপড়-চৌপড়ও ব্রিফকেসে ভরলেন। তারপর হামেদ দারোগার যাবতীয় নথি-পত্র ও ছবির এ্যাল্‌বাম সাথে নিলেন। যে এলবামে ছিল কতগুলো নগ্ন ছবি। সে কার সাথে, কখন কি করেছে, সবই ফটো তুলে রেখেছিলেন। এমন কি কোন মেয়ের সাথে কি অবস্থায় ছিলেন, পার্শ্বে কে কে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, এসবের ছবি এ্যালবামে আছে?

প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে ভোর হওয়ার সাথে সাথে রুমগুলোর দরজা বন্ধ করে প্রধান তালা ঝুলিয়ে সোজা চলে গেলেন পিত্রালয়ে। যাবার আগে অর্থাৎ, রাত্রেই সুমাইয়্যা শাবল দিয়ে আস্তে আস্তে জানালার কব্জা খুলে ঘরে ঢুকার মত একটি ব্যবস্থা করে গেলেন।

সুমাইয়্যার পিতা একজন প্রসিদ্ধ ফল ব্যবসায়ী। নাম হাজী জসিম। জাতিতে পাঠান। অর্থ-সম্পদও একেবারে কম নয়, দ্বীনদার ও পরহেজগার। জালালাবাদ শহরেই তার বাসা। হাজী জসিমকে শহরের অনেকেই চিনে। হাজী জসিম তার পরমা সুন্দরী মেয়ে সুমাইয়্যাকে বি. এ. পাশ ছেলে হামেদের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের পর পরই হামেদের চাকরি হয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। কমিউনিষ্ট পন্থী হওয়ার কারণে অল্প দিনেই সে দারোগার পদ পায়। কয়েক মাসেই পেটের স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়ে যায়। টাকাও কামাই করতে শিখেছে হালাল-হারামে। চারিদিক থেকে বস্তা ভরা টাকা আসছে। চাকরিটা হয়েছিল সুমাইয়্যার মামার মাধ্যমে। সুমাইয়্যার মামা ছিলেন আই. জি। তাই সহজে চাকরিটা পেয়ে যায়।

কিছুটা টাকা-পয়সা হাতে আসার পর হামেদ সাহেব আকাম-কুকাম আরম্ভ করেন। মদ, গাঁজা আর নারী; এ কয়টিই ছিল তার প্রিয় বস্তু। চোর, ডাকাত, হাইজাকার, চাঁদাবাজ, মস্তানরা ছিল তাঁর বন্ধু ও আপনজন। তাঁর এসব অপকর্মের কথা সুমাইয়্যা অনেক আগেই পিতার গোচরে দিয়েছিলেন। পিতা বার বারই মেয়েকে ছবর করার, ধৈর্য ধরার আর দোয়া করার তালিম দিয়েছেন। স্ত্রীর সামনে স্বামী অন্য নারীদেরকে নিয়ে কি করতে পারে তা লজ্জায় প্রকাশ না করলেও কিছুটা ইংগিত দিয়েছেন। হাজী জসিম শুনেও তেমন একটা আমল দিতেন না।

সুমাইয়্যা পিত্রালয়ে গিয়ে সরাসরি তার মামার সাথে যোগাযোগ করেন। মামা সুমাইয়্যার সংবাদ পেয়ে আদরের ভাগিনীর নিকট ছুটে আসেন। বহুদিন পর ভাগিনীর সাথে সাক্ষাত হয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অফিসিয়াল ব্যবস্থায় সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেন না। হাল-পোরস্তির পর সুমাইয়্যা নিজ হাতে মামার জন্য চা তৈরি করে নিয়ে এলেন। চা-নাস্তার পর নিজের ভেনিটি ব্যাগ থেকে এ্যালবামটি বের করে মামার হাতে দিয়ে বললেন, "মামুজান! আমি কেমন আছি তা এসব চিত্র দেখে বুঝবেন। আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনরাও দেখে শান্তি পাবে।"

আই. জি. বাছির এ্যালবামটি হাতে নিয়ে এক এক করে পাতা উল্টাতে লাগলেন। চোখ-মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠল তাঁর। নিজেকে সামলিয়ে রাখা আই. জি. সাহেবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দাঁত কটমট করে বললেন, "বেটি! এ নরপশুকে এখনো জীবিত রেখেছ। দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করো নি? আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি। এক্ষুনি এর ব্যবস্থা নিচ্ছি।"

সুমাইয়্যা বললেন, "মামুজী! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমার সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করেছি। আপনাকে ভাবতে হবে না।" এই বলে তাকে সুফিয়ার হৃদয় বিদারক কাহিনী প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনালেন। সে সময় সুমাইয়্যার চোখ থেকে টপ্‌টপ করে অশ্রু ঝরছিল।

আই. জি. বাছির সাহেব। সুমাইয়্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মা! তোমার দায়িত্ব তুমি আদায় করেছ, বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। ওদের দাফন করতে হলে অর্থাৎ শেষ করতে হলে আইনের আশ্রয়ে অবশ্যই যেতে হবে। এমনকি তোমাকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। তুমি যা করেছ, তা উচিতই করেছ। নিজ হাতে নিজের কমিউনিস্ট লম্পট স্বামী ও তার তিন সহযোগীকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়েছ। তাই তোমাকে ধন্যবাদ।"

সুমাইয়্যা ঃ মামুজান! এ ধন্যবাদ আমার একার নয়। এ ধন্যবাদের প্রধান হকদার আমার অসহায়া বোন সুফিয়া। সে একাই ৪ জনকে ---।

আই. জি ঃ কে সে বীর বালা মহিয়সী?

সুমাঈয়্যা ঃ ঐ যে বললাম, যে মেয়েটির কথা। হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে ওদের পল্লী। রামাল্লা গ্রামের অধিবাসী। পিতা, মাতা, ভাই, বোন কেউ নেই ওর।

আই. জি ঃ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এই বলে তিনি আরো বললেন, "বেটি! আমার চাকরির অবস্থাও তেমন ভাল নয়। যে কোন মুহূর্তে আমি চাকরিচ্যুত হতে পারি। কারণ, নজিবুল্লাহ সরকার সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ আরম্ভ করেছে। কিন্তু

অফিসারদের অপসারণ করে সে স্থলে কমিউনিস্ট পন্থীদের বসাচ্ছেন। দেখ নি, তোমার স্বামী রাশিয়ার শিক্ষা নেয়ার কারণে চোখের পলকে তাঁর কাঁধে তিনটি স্টার লেগে গেল। আমাকে সবাই মৌলবাদী বলে জানে। বাবরাক কারমাল থেকে নিয়ে নজিবুল্লাহ্‌র শাসনামলের কিছু সময় পেয়েছি। তাই আমার একটা পরিচিতি রয়েছে, সুনাম রয়েছে। আমিই সবার সিনিয়র। তা না হলে অনেক আগেই চাকরি খোয়া যেত। তবে চাকরির পরোয়া করি না। যতদিন আল্লাহ রাখেন ততদিন হক পথে সত্য পথে থাকব। চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চাই না। তবে তোমার ব্যাপারটা সামলাতে একটু এদিক সেদিক করতে হবে। এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। তবে তুমি যে হত্যা কর নি, একথাটা তোমাকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। আর তোমার এ্যালবামটাও অনেক কাজে আসবে।

বহুদিন পরে তাদের ঘরে ভাই এসেছে দেখে সুমাইয়্যার আম্মা নিজ হাতে গোশ্‌ত-রুটি পাক করে ভাই-এর সামনে হাজির করলেন। বোনের আবদার রক্ষার্থে মাত্র দু-তিন টুকরো রুটি মুখে দিয়ে খানার পর্ব শেষ করলেন। যদিও পেটে ক্ষুধা ছিল প্রচুর কিন্তু খেতে পারেন নি। অতঃপর বোনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে অফিসে চলে গেলেন।

ভোর আটটা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। সবাই ঘুম থেকে ওঠে নাস্তা-পানি খেয়ে নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে গেছে। থানায় কর্মরত অন্যান্য অফিসাররা নিজ নিজ টেবিলের সামনে বসা। সার্ভিস বুকে সকলেরই দস্তখত দেখা যায় একমাত্র হামেদ সাহেব ছাড়া। ও. সি. সাহেব কনস্টেবল হারুনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে হারুন! তোদের স্যারের তো কোন খবর নেই। সকাল বাজে দশটা। তদন্তের জন্য মফস্বল যেতে হবে, তা কি ভুলে গেছেন উনি! গত রাত মনে হয় খুব খেয়েছে। বেশ কয়েক বোতল হাদিয়াও পেয়েছিল। মনে হয় কয়েক দফায় সব সাবাড় করেছে। তা না হয় এখনো ঘুমিয়ে থাকার ব্যক্তি তিনি নন। প্রায় দিনই তাঁকে কাক ডাকা ভোরে করিডোরে ঘুরাফেরা করতে দেখি। কোন দিক থেকে নতুন কোন কেইস আসে কিনা। কেইস না পেলে চেয়ার ছেড়ে ওঠে যেতেন। কখনো বারান্দায় আবার কখনো মেইন ফটকে ছটফট করে ঘুরতেন। যা খবর নিয়ে দেখ তো, আছে না অক্কা পেয়েছে।

এমন সময় ঝাড়ু বরদার (সুইপার) এসে বলল, "বাবুজী! সালাম, সালাম, সালাম! হামারে হামেদ ছাবকা দরজা বন্দ হুয়াহু। গার মে কুচ হুয়া স্যার! ঘারমে কুচ হুয়া। দরওয়াজা কে নিচেছে কুচ খুন নিকাল আয়া। বাবুজী ঘারমে কুচ হুয়া! ঘার মে কুচ হুয়া।"

সুইপার প্রতিদিন ভোরে এসে থানা ঝাড়ু দেয় ও বাসা বাড়ীর ময়লার টিন নিয়ে যায়। আজ সকালে ময়লা আনতে গিয়ে দেখে, দরজাগুলো বন্ধ কিন্তু দরজার নিচ দিয়ে কিছু কিছু রক্ত বারান্দায় গড়িয়ে আসছে। তাই ও. সি. সাহেবকে খবর দিল, হামেদ স্যারের বাসায় কিছু ঘটেছে।

ও. সি. সাহেব সুইপারের সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য আর তিনজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হামেদ সাহেবের বাসার দিকে গেলেন। কয়েকটি বাসা পর হলেই সোজা উত্তর-পূর্ব কোণের সর্বশেষ বাসা। বাসাটা অন্যান্য বাসা থেকে একটু তফাত ও নিরিবিলি। আর নিরিবিলি থাকার কারণেই আড্ডাটা ভাল জমত।

ও. সি. সাহেব গিয়ে দেখলেন, বারান্দা পর্যন্ত রক্ত জমাট হয়ে আছে। মেইন দরজার দরজায় তালা ঝুলছে। ও. সি. সাহেব দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। ঘরের ভিতরে দেখলেন, ঘরের আসবাবপত্রগুলো এলো-মেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তিনটি লাশ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তিন দিকে পড়ে রয়েছে। জানালা ভাঙ্গা। এ সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন আসতে আরম্ভ করল। সাংবাদিকরাও আসল জানতে ও ছবি নিতে। কার আগে কে ছবি নেবে এ নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। হামেদ সাহেবের লাশের পার্শ্বেই পড়ে আছে চিহ্নিত সন্ত্রাসী মিন্টু, কান্টু ও কানা ফালুর লাশ। এরা সবাই একাধিক খুনের আসামী। থাকত হামেদ সাহেবের ছত্রছায়ায় রাজার হালে। ওদের দিকে যদি কেউ আঙ্গুল তুলে ইশারা করত, সেদিন রাতেই গর্দান থেকে তার কল্লা নেমে আসত যমিনে। পুরা শহরবাসী ও ব্যবসায়ীরা হামেদ সাহেব ও এদের নিয়মিত চাঁদা দিত। এদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শহরের ছোট বড় সকলের মুখ থেকেই বেরিয়ে এলো "আল-হামদুলিল্লাহ" আল্লাহ দেশটাকে রক্ষা করেছেন। কেউ কেউ উল্লাসে একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল, "আগুনে পানি ঢালছে রে, আগুনে পানি ঢালছে।"

ও. সি. সাহেব পুলিশ দিয়ে পুরা বাড়িটা ঘেরাও দিয়ে রেখেছেন। কাউকে কাছে যাওয়া বারণ। হাজার হাজার লোক বাতায়নের ছিদ্র পথে এক পলক দেখে বিদায় নিচ্ছে। তাদের একান্ত সহযোগী দাঁতাল ইনু ও সুমন সে রাত্রে অন্য একটি দান ধরার জন্য গিয়েছিল। তাই হামেদ সাহেবের সহযাত্রী হওয়ার থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে। কিভাবে কি হল তাও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

কর্মরত এক দারোগা এসে ও. সি. সাহেবকে খবর দিলেন, "সার! গান স্টোর থেকে তিনটি স্টেনগান উধাও। তাছাড়া ১৫টি ম্যাগজিন ও এক কার্টুন গুলী নেই।

ও. সি. সাহেবের পায়জামা গরম। বাতাস আসছে আর যাচ্ছে। ও. সি. সাহেব বুদ্ধি করে ওদের সহযোগী দুই সন্ত্রাসী কানা ফালু ও সুমনকে গ্রেফতার করেছেন। তাছাড়া হামেদ সাহেবের সাথে যে ৩ জন পুলিশ থাকতেন, সহযোগিতা করতেন ও ভাগ নিতেন সে তিন জনকেও গ্রেফতার করে গারদে নিক্ষেপ করলেন। এদের মধ্যে সে পুলিশও রয়েছেন, যিনি গত রাতে সর্দারজী ও মৌলভী আকরামকে এই গারদে ঢুকিয়েছিলেন এবং একটু অজুর পানি চাওয়ার অপরাধে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিলেন।

ও. সি. সাহেব বিলম্ব না করে আই. জি. সাহেবের নিকট ফোনে বিস্তারিত জানালেন। আই. জি. সাহেব তার স্পেশাল ফোর্স নিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে চলে আসলেন। তিনি নিজেই সব তদন্ত করে হামেদ পত্নি সুমাইয়্যাকে পিত্রালয়ে, ৩দিন আগে বেড়াতে গিয়েছে উল্লেখ করে উক্ত ৫ জনকে আসামী করে সুমাইয়্যাকে বাদী করে ফোর মার্ডার ও অস্ত্র মামলা মোট দু'টি মামলা দায়ের করেন। তাছাড়া ৫ লক্ষ টাকার মালামাল লুট দেখিয়ে আর একটি মামলা দায়ের করেন। এদের মৃত্যুতে এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়াও উল্লেখ করেন। জব্দকৃত মালামালসহ গ্রেফতারকৃত ৫ জনকে আদালতে প্রেরণ করলেন।

সেদিন শহরবাসীদের কর্মসূচি ছিল মসজিদে মসজিদে শোকরানা নামায ও বিশেষ মুনাজাত। মিষ্টি বিতরণ, বিজয় মিছিল ইত্যাদি। আই. জি. সাহেবের সম্মুখে হাজার হাজার জনতা রাস্তায় নেমে আসে। সাংবাদিকরাও পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদগুলো পরিবেশন করেন। বিজ্ঞ আদালত ৫ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

[চৌদ্দ]

গত রজনীতে কি কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে, তা জানার সুযোগ হয় নি সর্দারজী ও মৌলভী আকরাম সাহেবের। পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির অবসান এখনো ঘটে নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জীবন বের হয়ে যাবার উপক্রম। অনেক কষ্টের পরে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে জীবন নিয়ে রামাল্লায় ফিরে এসেছেন। সুফিয়া উভয়কে সতর্ক করে দিয়ে বলল, আমাদের অস্ত্রগুলো যেন আর কেউ না দেখে। অস্ত্র আছে বলে কেউ যেন জানতে না পারে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের গ্রামে দু'একজন দুশমন নেই তা ভাবা ঠিক হবে না। ঐ তো ছাদেক, এমদাদ ও রঈছ এ দুষ্টুদের কারণে আমাদেরকে থানা পর্যন্ত যেতে হল। তা না হয় থানা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হত না। সুফিয়ার অস্ত্র তার বোরকার নিচে আর বাকি দুজনের অস্ত্র তাদের চাদরের নিচে। ওদের কাছে অস্ত্র আছে বলে কেউ ধারণাও করতে পারবে না। সবাই নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে অস্ত্রের হেফাজত করলেন। তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো জনতার ঢল। আসল সর্বস্তরের মানুষ। শুনতে চাইল থানায় যাওয়ার কারণ ও থানার লোকেরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে।

সর্দারজী বললেন, "আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে থানার একটি ঘরে বসতে দিল। আসরের নামাযের আজান হলে মসজিদে যেতে চাইলাম। দারোগা ধমক দিয়ে মসজিদে যেতে বারণ করলেন। তারপর আমরা থানায় নামায আদায় করলাম। সুফিয়া নামায পড়ল হামেদ দারোগার বাসায়। নামাযের পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মৌলভী আকরাম দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন, সারাদিন বয়ে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখনো আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না কেন? রাত হয়ে গেলে কিভাবে আমরা বাড়ি যাব? দারোগা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "খামুস! আর একটি কথাও উচ্চারণ করবি না। অফিসের কাজ ফেলে রেখে তোদের সাথে গাল-গল্প করব" এতটুকু বলে একজন পুলিশকে ইশারা দিতেই আমাদের জন্য গারদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। গারদে ঢুকতে একটু ইতস্তত করায় খেতে হল লাঠির গুতা। কামরাটা খুবই ছোট। একজন মানুষ কোনভাবে সোজা হয়ে শুইতে

পারবে না। শুইতে হলে ধনুকের মত বাঁকা হতে হবে। কামরাটি জন্মের পর থেকে কখনো সূর্যের আলো দেখে নি। হাত বাড়ালে নিজের হাতটুকু দেখা যায় না। তাছাড়া কামরাটিতে যেন দুর্গন্ধের চাষ করা হয়। মনে হয় ডাস্টবিনের মধ্যেই বসে আছি। আর একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক মনে হল। তা হল নমরূদের হত্যাকারী মশা। আমিতো ভেবেছিলাম এটা অত্যাধুনিক যুগের মশা উৎপাদন খামার। মশার কামড়ে যদি কেউ নড়াচড়া করে তা হলে তাকে রোলের গুঁতো খেতে হয়। এই হল আমাদের গতকালের সংবাদ।

সর্দারজী এক রাত গারদে অতিবাহিত হওয়ার কাহিনীটা এক অভিনব ভঙ্গিতে বর্ণনা করলেন। উপস্থিত জনতার সবাই হেসে খুন।

সুফিয়া উঠল রফিকাদের ঘরে। রফিকা নামায পড়ে কুরআনের তরজমা দেখছে। এমন সময় সুফিয়ার আগমন। সুফিয়াকে দেখে রফিকা আনন্দে নেচে উঠল। পলকে তার হৃদয় ভরে গেল। কুরআন শরীফ তুলে রেখে সুফিয়ার দিকে ঘুরে বসল। সুফিয়া তার দুটি অস্ত্র রফিকার ঘরে লুকিয়ে রাখল।

সুফিয়ার আগমনবার্তা অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ছুটে আসল সব বয়সের মহিলারা। রফিকা খুটিয়ে খুটিয়ে অনেক কিছু জানতে চাইল। সুফিয়া আসল কথা গোপন রেখে অতি সাধারণ কথাগুলো সবাইকে বলল। সে বলল, "আমরা বিকাল ৪ টায় থানায় পৌঁছেছি। মামুজানরা আসরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যেতে চাইলে তাদের গালি ও রোলের গুঁতো দিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দিল। সারা রাত দানা-পানি কিছুই দেয় নি। সারারাত চলেছে মশার মিছিল, মশার আক্রমণ।" তারপর সুফিয়া আবার নিজের কাহিনী আরম্ভ করল। সে বলল, আমি আসরের নামায পড়তে চাইলে তিনি বাসার ভিতর নিয়ে গেলেন। আমি অযু ইস্তে া সেরে নামায আদায় করলাম। মামুজীকে ও সর্দারজীকে দেখতে চাইলে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এভাবে কেটে গেল সারারাত। তারপর কিছুটা রাত থাকতেই আমাদের বাড়ি যেতে বলল দারোগা। খুব কষ্ট করে গ্রামে এসে পৌঁছলাম।

গাঁয়ের বধুরা সুফিয়ার কথা শুনে কেউ হাসছে আবার কেউ আপসোস করছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর এক সময় বউ-ঝিরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল।

রফিকার আম্মা এসে বললেন, "কিরে! এখনো তোরা গল্পে মেতে আছিস? ওযে সারারাত কিছুই খায় নি তাছাড়া পায়ে হেটে এসেছে কত দূর! ওর পেটে কি কিছু দেয়া লাগবে না? এখন গল্প বাদ দিয়ে সুফিয়াকে নিয়ে আয়। ও ঘরে নাস্তা সাজিয়ে রেখেছি।" রফিকা সুফিয়াকে নিয়ে নাস্তা খেতে বসল। রফিকা রুটি ছিঁড়ে কখনো নিজে খাচ্ছে আবার কখনো সুফিয়ার মুখে তুলে দিচ্ছে। কেন যেন সুফিয়ার চোখ দুটি ভারি হয়ে আসছে। ভিজে গেল চোখের পাতা। মুক্তোর দানার মত দু এক ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে এল গণ্ডদেশ পর্যন্ত। রফিকা তাকিয়ে বলে, কিরে সুফিয়া! একি খাচ্ছিস না যে, ওর ওড়নায় অশ্রু মুছে বলল, "আম্মির কথা মনে পড়েছে। নাস্তা খেয়ে চলতো আম্মির কবরটা একটু জিয়ারত করে আসি। দু ফোটা অশ্রু নজরানা দেই আল্লাহর দরবারে আম্মু-আব্বুর আত্মার শান্তির জন্য। খানা সেরে উভয়ে কবরের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু দোয়া-কালাম পাঠ করল। অতঃপর সুফিয়ার মিহিন কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো কবিতার ছন্দ–

আমীরের 'মা' কবিতার কয়েকটি কলি

মা আমার, তুমি গর্ভধারিণী বুকে আদরের ঢেউ,
জগতে মোরে তোমার চেয়ে ভালবাসিত না কেউ।
সোহাগ, প্রীতি, ভালবাসা যত সব আমাকে দিয়ে,
মাথা পেতে নিলে সুখ–দুঃখ যত সন্তান পানে চেয়ে।
মল–মূত্রে ভিজে যেত মাগো তোমার আঁচল খানি,
তবু তুমি মোরে স্নেহ চুমু দিয়ে বুকে লইতে টানি।
মা আমার তুমি দয়ার সাগর এত দয়া তোমার বুকে,
খাওনি কিছু আমায় রেখে চিবিয়ে দিতে মুখে।
দারুণ রোগের কবলে পড়ে শুয়ে ছিলাম বিছানায়,
চোখের জলে নাওয়ায়ে ছিলে বসে মোর কিনারায়।
সব নারীদের চেহারায় মাগো তোমার ছবি খুঁজি,
তোমার ছবি দেখতে মাগো পাবনাকো আর বুঝি।
দেখব না মা এই জগতে তোমার রূপের ছবি
কেঁদে কেঁদে শান্তি চাহে তোমার পাগল কবি।

[পনর]

কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবলীলা যেমন একটি জনপদের চেহারা পাল্টিয়ে দেয়, মুরগীবিহীন বাচ্চাদের যেমন চিল, শকুন, বাজ ও শৃগালের হিংস্র আক্রমণের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে পালহীন বকরির ওপর ক্ষুধার্ত ও হিংস্র হায়েনাদের তেমন লোলুপ দৃষ্টি থাকে, সুফিয়া ও তার অভিভাবকহীন সংসারের অবস্থাও অনেকটা তদ্রুপ।

কস্তুরী অভিলাসী শিকারী যেমন আড়ালে আবড়ালে কস্তুরির সন্ধানে হরিণের পিছনে দৌঁড়ায় আর যখনই কোন হরিণ নাগালে পায় তখনই তীর ছুঁড়ে তার কলিজা বিদীর্ণ করে শুধু নাভীটুকু নিয়ে যায়। শিকারীর হাতে হরিণের প্রাণনাশের কারণ তার কস্তুরী নাভী। ঠিক তেমনিভাবে সুফিয়ার জীবনের হুমকী হল, তার দৈহিক সৌন্দর্য, তার যৌবন আর তার টানা চোখের বাঁকা চাহনি ও ওষ্ঠগুলোর মুচকী হাসি। তাই তার চারদিকে নর-পশুদের আনা-গোনা। কেউ চায় তাকে চিরদিনের জন্য কাছে পেতে। কেউ চায় দৈহিক চাহিদা পূরণ করতে। আবার কেউ চায় মৌমাছির মত আহরণ করে ওড়ে যেতে। কেউ কেউ আবার তার অল্প সংখ্যক ছাগল-পালের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। সুফিয়া আজ পিতা-মাতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত। সে আজ অসহায়িনী, হতভাগিনী ও দুঃখিনী।

পল্লী সর্দার সুফিয়াকে ডেকে বললেন, “মা! তোমাকে আর বাড়ি যেতে হবে না। একা একা সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করি না। এখন থেকে তোমার বোন রফিকার সাথেই থাকবে। তোমার ঘর-দরজা ও ছাগলগুলোর ব্যবস্থা আজকের মধ্যে করব। তোমাদের দু'জনের কাজ হল শুধু লেখা-পড়া করা। আমি আকরাম সাহেবকে বলে দিয়েছি, রাত ৮টা পর্যন্ত তোমাদের পড়াবে। তা না হয় কিতাবাদি শেষ হবে না। আমি তার বেতনও বাড়িয়ে দিয়েছি।”

পিতৃসুলভ সান্ত্বনাদায়ক কথা-বার্তায় সুফিয়া খুবই খুশী ও চিন্তামুক্ত হল। খুঁজে পেল আশ্রয়। এখন লেখা-পড়াটাই তার সাধনা, কামনা। এটাই তার বজ্র শপথ, কঠোর পণ। দু'জনের মধ্যে চলবে প্রতিযোগিতা, চলবে লড়াই।

পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী গ্রামের আর দু-চার জন মুরুব্বীকে নিয়ে সুফিয়ার বাড়ি-ঘর ও ছাগলগুলো নিয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন রামাল্লা পল্লীর বাসিন্দা রহিম গুলকে এসব দেখভাল

করার জন্য বেতন দিয়ে রাখা। রহিম গুল ছাগলগুলো রাখবে আর বাড়ি-ঘর দেখা-শোনা করবে। রহিম গুল একজন সৎ, গরীব ও বৃদ্ধ মানুষ। এতে একজন গরীবেরও কর্মসংস্থান হবে।

সুফিয়া ও রফিকা যেমন এক বৃন্তে দুটি ফুল। চলছে তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রতিযোগিতা। মৌলভী আকরাম সাহেবও নতুন উদ্দমে, নতুন আঙ্গিকে পাঠদান করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। মাগরিবের নামায আদায় করেই আকরাম সাহেব চলে এলেন রফিকাদের বাড়িতে। ওরাও দুজন নামায আদায় করে পড়তে বসল। কার আগে কে ইবারত পড়বে তা নিয়ে চলছে কাড়াকাড়ি। তাদের আগ্রহ দেখে আকরাম সাহেবের আনন্দের সীমা নেই। তিনি বুদ্ধি করে বললেন, "মা মনি রফিকা! তুমি পড়বে এক পৃষ্ঠা আর সুফিয়া পড়বে এক পৃষ্ঠা। আমি ঘড়ি নিয়ে বসব। দেখব, কে কত তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে পড়তে পার। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ পঠিত অংশটুকুর তরজমা শোনাবে। দেখব, কার ভুল কম হয়। এবার বুঝলে তো?" 'জী হুজুর।'

মৌলভী আকরাম সাহেব একজন ভিজ্ঞ আলিম। পড়ানোর যোগ্যতাও অসাধারণ। তিনি বুদ্ধি করে এদেরকে শুধু অতি প্রয়োজনীয় কিতাবাদি পড়াচ্ছেন। নাহু-সরফের কয়েকটি কিতাব খুব ভালভাবে পড়িয়ে ইলমে ফিকহ, ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ইলমে উসুলেরও দু'টি কিতাব পড়িয়েছেন। মেয়েদের জন্য সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করাটাই তিনি সংগত মনে করেন। আকরাম সাহেব এশার আযান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে গেলেন।

সুফিয়া ও রফিকা এশার নামায পড়ে নিজ নিজ কিতাব মুতালা করতে লাগল। একজন একটা না পারলে অপরজনকে তা জিজ্ঞাসা করছে। এভাবে রাত ১১ টা পর্যন্ত পড়ে খানা খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর। কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। রজনীর এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। সুফিয়ার মনে পড়ল সুমাইয়্যার দেয়া পুটলিটার কথা এবং সেই রাতের সেই দুঃসাহসী অভিযানের কথা। সুফিয়া আস্তে আস্তে রফিকাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি যে তোমার হাতে বস্ত্রাবৃত একটি পুটলী অর্পণ করেছিলাম, তার মধ্যে কি লুকানো আছে তা কি দেখেছ?" রফিকা বলল, "অন্যের বস্তুতে চোখ দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা ঠিক নয়। তাই কি আছে কিছুই দেখি নি।

সুফিয়া বালিশের নিচ থেকে দিয়াশলাই বের করে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুটলিটা বের করার জন্য বলল। রফিকা তার বাক্স থেকে পুটলিটা বের করে সুফিয়ার হাতে দিল। সুফিয়া খুলে দেখে এর ভিতরে অনেকগুলো টাকা। গণনা করে দেখল এতে

৫০ হাজার আফগানী টাকা আর একটা চিঠি। রফিকা ও সুফিয়া টাকা দেখে আনন্দে বলে উঠল, "আল্‌হামদুলিল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ। রফিকা চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল-

"বোন সুফিয়া! দোয়া ও আশীর্বাদ নিস। পর সংবাদ এই যে, আমার জালেম, কুখ্যাত, অসভ্য, মদখোর, জিনাখোর ও কমিউনিস্ট স্বামী নীরিহ মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলে কাল টাকার পাহাড় গড়েছিল। দীর্ঘ তিনটি বছর যাবত আমি এ আগুন পোহায়ে আসছি। তা তুমি নিজ চোখেই অবলোকন করেছ। বলার আর অপেক্ষা রাখে না। তুমি একজন বিপন্না নারী হিসেবে আমার অনেক কিছু করার ছিল। দুঃখের বিষয়, আমি তা করতে পারি নি। হ্যাঁ তবে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শোকর আদায় করি এই জন্যে যে, আমি তোমার ইজ্জতের হেফাজত করতে সক্ষম হয়েছি। আমার সামনে তোমার ইজ্জত লুণ্ঠিত হলে আল্লাহর নিকট জবাব দেয়ার কোন রাস্তা ছিল না। আর তুমিও যে আমাকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেছ তা কোন দিনই ভুলতে পারব না।

সুফিয়া! আমার নিজস্ব তহবিল থেকে তোমাকে ৫০ হাজার আফগানী হাদিয়া হিসেবে প্রদান করলাম। আশা কারি বোনের দেয়া হাদিয়াগুলো সাদরে গ্রহণ করবে।

সুফিয়া! তুমি আল্লাহর নেককার বান্দী! তোমার দোয়া আল্লাহ কবূল করবেন। তাই দোয়া কর, আসন্ন বিপদ থেকে আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করেন। আর আমিও দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি দান করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ত কোনদিন আবার আমাদের সাক্ষাত হতেও পারে। ইতি-

তোমার বোন সুমাইয়্যা

পত্র পাঠ করে রফিকা জিজ্ঞাসা করল, "কিরে সুফিয়া! তুই এত লুকোচুরি খেলছিস কার সাথে? এই পত্রটার মধ্যে রয়েছে রোমান্টিক ঘটনার ইঙ্গিত। পত্রটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খানিকটা বেদনা, খানিকটা কান্না, খানিকটা রহস্য। তুমি কাকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেছ আর কে তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছে? এই মহিয়সী সুমাইয়্যা কে? আর যা ঘটেছে তা সত্য সত্য বলবি কি?"

সুফিয়া বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলব। তোমাকে ছাড়া মনের কথাগুলো খুলে বলার আর কে আছে? রফিকা, তবে আমার কথা শুধু তোমার কাছে আমানত থাকবে। সময় সুযোগে তোমার আব্বুকে শোনাবে।" তারপর এক এক করে আদ্যোপান্ত যা ঘটেছে সব শোনাল। রফিকা অবাক হয়ে সুফিয়ার কথাগুলো শুনতে লাগল।

সব ঘটনা শুনে রফিকা বলল, "এযে গায়েবী মদদ ও খোদায়ী সাহায্য এতে কোন সন্দেহ নেই। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর দুর্বল বান্দাদের এমনিভাবে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহর ওপর যারা পূর্ণ আস্থা রাখে এবং যে সকল মা আল্লাহর ফরয বিধান পর্দাকে মেনে চলে তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম আল্লাহ নিজ হাতে রক্ষা করেন।"

রফিকা! তুমি যদি বেপর্দা হয়ে চলা-ফেরা করতে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে তাহলে কি ইজ্জত বাঁচাতে পারতে? আসত কি আল্লাহর রহমত? তা কখনো নয়। সুফিয়া রফিকাকে বলল, এটাকাগুলো চাচাজানের হাতে দিবে ও সব ঘটনা খুলে বলবে।"

অতঃপর সুফিয়া সুমাইয়্যার দেয়া রিভলভারটি বের করে বলল, "এটা এমন একটি লোহা, যার মধ্যে আল্লাহ পাক দান করেছেন সমরশক্তি। এর মধ্যে রয়েছে মানব জাতির অসংখ্য কল্যাণ। লোহাকে আল্লাহর মর্জি মত ব্যবহার করলে শত্রুর শত্রুতা থেকে, নিন্দুকের নিন্দা থেকে, বদজনের বদ নজর থেকে, দুষ্টের দুষ্টুমি থেকে, চোরের চুরি থেকে, ডাকাতের ডাকাতী থেকে, দুশমনের দুশমনী থেকে, দাম্ভিকের দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। লোহার অপর নাম শক্তি। যে শক্তি জনশক্তিকে হার মানায়।"

সুফিয়া আরো বলল, মহান রাব্বুল আলামীন লোহার গুণ, কেরামতি, উপকারিতা ও অপকারিতা এবং তার ব্যবহারবিধি তার বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন। লোহা বিষয়ে নতুন করে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না। কেননা, সকল নবী এ লোহা ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। সর্বশেষ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সকল প্রাণ প্রিয় সাহাবী লোহা ব্যবহার করেছেন। তাঁরা লোহা ব্যবহার করে সকল ফেৎনা নির্মূল করে কুফরী শক্তি খতম করে শান্তি আনয়ন করে শক্তি বৃদ্ধি করে নিরাপত্তা আনয়ন করে দুশ্চিন্তা দূর করেন। লোহা কোথায় ব্যবহার করলে দেশ জয় করা যায় আর এর অপব্যবহার করলে দেশ খোয়া যায়। সুফিয়া আরো বলল,

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যা ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না, এমন জিনিসকে খুব সহজ করে দিয়েছেন। যেমন আগুন, পানি, মাটি, ছায়া, সূর্যের কিরণ ইত্যাদি। ঠিক তেমনিভাবে খনিজ পদার্থের মধ্যে খুবই প্রয়োজনীয় লোহা। তাই লোহাকে তামা, দস্তা, পিতল, রুপা, হিরা ও স্বর্ণের চেয়ে অনেক সস্তা করে দিয়েছেন। যাতে বান্দা খুব আছানের সাথে লোহা ব্যবহার করতে পারে।

দেখ রফিকা, এই লোহা কর্মকার, স্বর্ণকার, চর্মকার, সুতার, কুমার, তাঁতী, জেলে ও কৃষকরা ব্যবাহর করে উপকার পেয়েছে। এ লোহা সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বজনের প্রয়োজন। তাছাড়া এ লোহা ডাক্তার ইঞ্জিঞ্জনিয়িার, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ, বি. ডি. আর. ও আনসাররা ব্যবহার করে তার ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছে। এ লোহা মিল ফেক্টরী, কলকারখানায় ব্যবহার করে মালিকরা প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে। কাজেই আমি আগেই বলেছি লোহা সম্পর্কে বিষদ আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

রফিকা হাসতে হাসতে বলল, "সুফিয়া তুমি থানায় গিয়ে লেকচার তো ভালই শিখেছ! মনে হয় ফুটপাতের সিভিল সার্জন। এক টেবলেটেই ৮১ প্রকার রোগের কাজ করে শুধু এক নিয়তে সেবন করতে হয়। তাই না সুফিয়া!"

সুফিয়া ঃ আরে তুমি তো আমার কথা শুনে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ। আসলে আমি সত্যি বলেছি। কুরআনের বাইরে একটি কথাও বলি নি। এখনই তাফসীরের কিতাবগুলো খুলে সূরা হাদীদের তাফসীর দেখ এবং আমার আলোচনার সত্যতা যাচাই কর।" "তারপর সুফিয়া আরও বলল, "শোন রফিকা! আল্লাহ তায়ালা শক্তিগুলোর মধ্যে দু'টি শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন; (ক) ঈমানী শক্তি ও (খ) লোহার শক্তি। ঈমানী শক্তির সাথে যদি লোহার শক্তি যোগ করা যায়, তাহলে এ শক্তিকে বলে মহাশক্তি। কেন! তুমি কি সীরাতের কিতাবাদি পড় নি? মহানবী (সা) দীর্ঘ দশটি বছর শুধু ঈমানী শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে আরবের ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এতে ফল কি দাঁড়াল? গালি শুনতে হয়েছে। অবর্ণনীয় নির্যাতন সইতে হয়েছে। শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। তিন বছর পাহাড় উপত্যকায় অবরোধ ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে তাঁকে রাতের আঁধারে প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছে। হিজরতের পর মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীবকে ঈমানী শক্তির সাথে আর একটি শক্তি দান করেছেন তা হল লোহা ব্যবহারের ইজাযত দিয়েছেন। উক্ত দুই শক্তি যখন ব্যবহার করতে লাগলেন তখন তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে বুক ফুলিয়ে, মাতা উঁচিয়ে প্রবেশ করলেন সেদিন এ দুই শক্তির সম্মুখে দাঁড়ানোর মত কোন বীর বাহাদুর ছিল না। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে পবিত্র মক্কা নগরী দখলে এসে গেল।"

সুফিয়া আরো বলল, "শোন রফিকা! তুমি যদি চোরের হাত কেটে দাও, তবে দেখবে মুসলমান ছাড়াও হিন্দু বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টান কারো ঘরে চুরি হবে না। তারা সারারাত শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। তাই বলছি লোহা নিরাপত্তা ও সু-নিদ্রা আনয়ন

করে। তাছাড়া তুমি যদি একটি অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় বের হও, তবে চোর-ডাকাত থেকে নিয়ে কোন ধরনের দুশমন তোমার মোকাবেলায় আসতে সামনে সাহস পাবে না। আর সামনে আসলেও যমের মত ভয় করবে। এতে তোমার ঈমান, আমল, মান-সম্মান, অর্থ-সম্পদ ও তোমার সত্ত্বার হেফাজত হবে। বুঝলে?"

সুফিয়া আরো বলল, "শোন আপু! আমরা মহিলা, তাতে কি হয়েছে? আমরা আফগানী। আমরা বীরের জাতি। আফগানী মায়েরা শুধু সুলতান মাহমুদ গজনবী নয় আরো অসংখ্য দিগ্বীজয়ী বীর সন্তান প্রসব করেছেন। অনেক মেয়েরাও পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে। ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। আফগান জাতি চেংগীস খাঁ, হালাকু খাঁ, মোস্তফা কামাল পাশা ও হিটলার সহ আরো অনেক জালেমকে দেখেছে এবং এদের মত শক্তির সাথে যুদ্ধ করে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছে। আফগান জাতি চিরস্বাধীন। চিরবিপ্লবী। তারা কোনদিন বাতেলের সাথে আপোষ করে নি ও মাথা নত করে নি। এটা তাদের গর্ব, এটা তাদের ঐতিহ্য। দেশে যে অরাজকতা চলছে এতে বুঝা যায়, ঘরে বসে থাকলে দ্বীনের হেফাজত হবে না। তোমাকে আমাকেও হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। শুনেছি নজিবুল্লাহ সরকার নাকি মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ান ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করছেন। এতে বুঝা যায়, জিহাদ আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমাকে আমাকে তৈরি হতে হবে। এ বলে উভয়ে ঘুমিয়ে গেল।

[ষোল]

একি স্বপ্ন না বাস্তব? সত্যি যদি তা বাস্তব হয়ে থাকে তবে পেয়েও পেলাম না কেন? চেহারা-সুরতে তো কম নয়, যেন একজন রাজকুমার। মূর্খও নয়, বেকারও নয়। বয়ফ্রেন্ড না বানিয়ে জীবনসঙ্গী তো করে নিতে পারতাম। এমন নিরিবিলি সময় আর কোন দিন পাব কি? ওতো গেইটে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল, আমার সায় পেলেই বাসায় আসত। এমন করে অভিমান করা আমার জন্য মোটেই উচিত হয় নি। কালকেই হয়ত মামুজান মামানিকে নিয়ে ফিরে আসবেন। তখন কি এসব সম্ভব হবে? আজকেই আর একটু ভাব জমিয়ে নেয়া দরকার ছিল। তা হলে কি শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল? চলে গেল কি নাগালের বাইরে?

আরও কত্তসব চিন্তা এসে মাহমুদার অন্তর দলিত-মথিত ও আহত করে তুলছে। মাহমুদার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এক আজনবী।

বার বার চেষ্টা করেও চোখে ঘুম আনতে ব্যর্থ হল আলম। একের পর এক সিগারেট ভস্ম হচ্ছে আলমের হাতে। কখনো শুয়ে, কখনো বসে আবার কখনো একটু পায়চারি করে রাত পোহানোর চেষ্টা করছে। জাগ্রত রজনী দীর্ঘ হয়ে যায়। একা একা ভাবছে। যুবতী পরমা সুন্দরী, অনুপম তার গঠন প্রণালী। তাকে দেখে পরীরাও লজ্জা পাবে। তার হৃদয়ে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তার অন্তরে হয়ত আমাকে একটু স্থান দিয়েছে। তা না হয় আলাপ করার সুযোগ দিত না। তবে মেয়েটা যে অভিমানী এতে সন্দেহ নেই। আর সুন্দরী মেয়েরা একটু অভিমানীই হয়ে থাকে। এখানে সে নতুন এসেছে এখনো কলেজের ছেলেদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে নি। ওর যেই চেহারা আর কথা বলার যা ভঙ্গি, চলার যা গতি, তার মন কাড়া যে চাহনি এতে বেশি দিন লাগবে না বন্ধু জুটাতে। জমজমাট হবে তার প্রেমের বাজার। খরিদ্দার পাবে প্রচুর। এর আগেই যদি তার অন্তরটা নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে জিতে যাব। তা না হয় শুধু প্রেমের আগুনেই জ্বলতে হবে। টাকা যায় যাক, পয়সা লাগে লাগুক। ফাইনালে পৌঁছতেই হবে। এসব ভাবছে আলম খান। মোরগ ডাকছে। কাকাতুয়া পালক ঝেড়ে আকাশে উড়ছে। দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়া গান ধরেছে। ভোরের আগমনী বার্তা নিয়ে অনিল যাচ্ছে চপলা বেগে বসুন্ধরার দ্বিগ-বেধিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিরণমালা পূর্বাকাশে এসে ধরিত্রীকে সালাম জানাবে।

অন্য দিনের চেয়ে আজ সে খুব প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে ব্রাশের মধ্যে সামান্য টুথ-পেস্ট মেখে দাঁত মাজতে মাজতে মাহমুদার বাসার দিকে যাচ্ছে। কোন অজানা শক্তি যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে আলমকে। রাস্তার দু'ধারে দুর্বা ঘাসে কে যেন মুক্তা ছিটিয়ে দিয়েছে। আজকের ভোর অন্যসব ভোরের মত নয়। শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসগুলোও যেন আলমকে নিয়ে উল্লাস করছে।

মাহমুদার রাতের খাওয়া হয় নি। দু-তিন লোকমা উদরস্থ করেছে অনেক কষ্টে।। রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঘুমোতে পারে নি চিন্তায় আর শেষ প্রহরে ঘুমোতে পারে নি ভোরের পাখির কল-কাকলিতে। তাই খুব ভোরেই শয্যা ত্যাগ করে সামনের ফুল বাগানে এসে প্রস্ফুটিত কুসুমের সাথে ভাব বিনিময় করছে। শিশিরে নাওয়া ফুলেরাও যেন ফুল রানীর সাথে মিটমিট করে হাসছে। কটিদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত কুন্তল রাশি যেন সমীরণের সাথে খেলা করছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে এসে পুষ্প কাননের দেয়াল সংলগ্ন খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। স্নিগ্ধ সমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুমের সুবাস নিয়ে দিক-দিগন্তে ছুটে চলছে। আলমের চোখে যেন এক তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল, একি ফুলপরী! পথ ভুলে এখানে এসে ফুলের সাথে খেলা করছে? না এ কোন প্রেম ভিখারিনী রাজ দুলালী। এসব ভেবে আলম হারিয়ে গেছে প্রেম সাগরে।

সহসা মাহমুদা ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকিয়ে দেখে এ যেন সেই অভিপ্রেত আলেখ্য। যে কেড়ে নিয়েছে রাতের নিদ্রাটুকু। এতো সেই ডাকাত, যে দিবালোকে হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে হরণ করে নিয়ে যায় অন্তর। আকস্মাৎ চার চোখের মিলন হয়ে গেল। মাহমুদার অধরে এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। একে অপরের দর্শনে অনির্বচনীয় পুলকাবেগে বিমুগ্ধ হল। প্রিয়তমার সাক্ষাতে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মাহমুদার পেটে পেটে দুষ্টুমী। সে ভাবল, একটি ফুটন্ত লাল গোলাপ ছিঁড়ে আলমের গায়ে ছুঁড়ে মারবে। পছন্দসই গোলাপের সন্ধান পেল বটে, কিন্তু তা নাগালের বাইরে। অন্যসব ফুলের তুলনায় এ ফুলটি আকৃতিতে অনেক বড়, পাপড়িগুলো তরতাজা এবং ফুটন্ত। এটাই কাননের সেরা ফুল।

মাহমুদা ফুলটি হাতের কাছে পাওয়ার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারছে। যতই সে চেষ্টা করছে ফুল গাছ তাকে ততই আঘাত দিয়ে চলছে। গাছটি এতই কৃপণ ও হুঁশিয়ার যে, তার একটি ফুলও অন্য কেউ তুলে নিক তা সে চায় না। কাঁটার খোঁচায় কেবলই তাকে জর্জরিত করে তুলছে। আলম অনতিদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

মাহমুদার চেহারায় যখন বিরক্তিভাব পরিলক্ষিত হল, তখন আলম একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "মাহমুদা! আমি তোমাকে ফুল তুলে দেই?" মাহমুদা উত্তর

দিল, "ইস্‌সে রে! আমার লাগবে না।" এই বলে ফুলটি ধরার জন্য উপরের দিকে লাফ দিল। ফুল নিয়ে আসল বটে, কিন্তু কাঁটার আঘাতে ডানা ছিঁড়ে প্রবাহিত হচ্ছে শোণিতধারা। লাফের তাল সামলাতে না পেরে ছিঁটকে পড়ল যমিনে। রক্তে ভিজে গেল তার কামিজ।

আলম এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে গিয়ে মাহমুদাকে ধরে উঠানোর চেষ্টা করল। মাহমুদা জেদ করে ফুলটি মারল আলমের গায়। আলম ফুলটির কদর করল। তারপর নিজের গায়ের জামা ছিঁড়ে মাহমুদার ডানায় পট্টি বেঁধে দিল এবং বলল, "কি হে সুন্দরী! রাগ করেছ? আমাকে যদি ফুলটি তুলে দেয়ার সুযোগ দিতে তাহলে কি ......। তোমার ছিঁড়েছে ডানা, আর আমার ছিঁড়েছে কলিজা। এমন ভুল কেন করলে?"

মাহমুদা আঘাতের বেদনা সংবরণ করে বলল, "প্রিয়তমের গায়ে ফুলের আঘাত দিতে হলে এর চেয়ে আরও কঠিন কিছু হলেও মেনে নেয়া যায়, তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছুই নেই। প্রেম বিরহের যন্ত্রণার চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা হাজার গুণে শ্রেয়। বুঝলে প্রিয়তমে?"

মাহমুদা বলল, "চলুন বাসায় চলুন।" এই বলে উভয়ে ঘরে প্রবেশ করল। মাহমুদা কেদারাটা এগিয়ে দিয়ে বসতে দিল। আলম চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "মাহমুদা! একাই কি বাসায় থাক? তোমার মা কোথায়?" "আমার কি রীনা আছে যে, ওকে নিয়ে থাকব? একাই থাকি, একাই ভাল। মামুজান-মামানীকে আনতে গেছেন, তাই বাসা খালি।" তুমি এখনো রীনার কথা খোঁটা দিচ্ছ! ওকি আমার প্রাইভেট ওয়াইফ না গার্লস ফ্রেন্ড? ওকে নিয়ে এতকিছু ভাবি না। সে আমার অফিসের একজন কর্মচারী। তাই কোন কোন সময় আমার মন রক্ষার্থে আমার সাথে বিকালে একটু বেড়াতে বের হয়। তাই এত কথা বলছ? কেন জান না, যতগুলো এন. জি. ও. বর্তমানে আফগানিস্তানে আছে, সবগুলো মহিলাদেরকে চাকরি দেয় এবং ঋণও তাদেরকেই দেয়। শতকরা ২০ জন পুরুষ আর ৮০ জনই হল মহিলা। পুরুষের বেতনের চেয়ে মহিলাদের বেতন বেশি। তাছাড়া যে যত বেশি সুন্দরী হবে তার ডিমান্ডও অন্যদের তুলনায় তত বেশি। আর একটা কথা মনে রাখবে, মহিলারা বিবাহিতা হোক চাই কুমারী, ওরা সবকিছু দিয়ে ওদের বসের মন জয় করার চেষ্টা করে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলের চেয়ে বেশি অফিসারের সাথে ভালবাসা রাখতে হবে। শোন নি, আরবের মোহাম্মদের কথা। পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং নিজের জীবনের চেয়ে নবীকে ভালবাসতে হবে, তা না হয় পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। ঠিক তেমনিভাবে এন.

জি. ও. অফিসারদেরকে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতে হবে। তাছাড়া ওরা এন. জি. ওতে চাকরি করতে পারবে না। ওদের কাছে যখন যা চাওয়া হয়, তখন তা দিতে বাধ্য থাকবে। যদি কোন এন. জি. ও. কর্মী তার স্বামীর বাহু বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, এমতাবস্থায় অফিসারের ডাকে চলে আসতে হবে। তা ছাড়া তার চাকরি থাকবে না। যেহেতু আমি একজন অফিসার। তাই অফিসের মেয়েরা আমার মন জয় করার জন্য এসব কিছু করে থাকে। তুমি যদি একজন অফিসার হও, তবে তোমাকেও তোমার বসকে খুশী করতে হবে। প্রত্যেক অফিসেই একটি নির্জন কামরা আছে, সেখানে বিশ্রামের জন্য বা খেদমতের জন্য যাকেই ডাকা হবে তাকেই যেতে হবে। বুঝলে সুন্দরী?"

আলম আরো বলল, এন. জি. ওতে চাকরি করলে উদার মনের অধিকারী হতে হয়। কোন সংকীর্ণ লোক এন. জি. ওতে চাকরি পাবে না। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

❒ অবহেলিত নারী সমাজকে পর্দার বেড়াজাল থেকে টেনে এনে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড় করানো।

❒ নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

❒ সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী সমাজের কর্মকাণ্ড চালু করা এবং যথাযথ মুল্যায়ন করা।

❒ নারীদের শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে তাদের কর্ম সংস্থান-এর ব্যবস্থা করা।

❒ মধ্যযুগীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন করে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

য নারীদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা।

❒ হাঁস-মুরগী ও পশু-পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুটির শিল্প, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, এসব প্রকল্প চালু করে নারীদেরকে কাজে লাগানো।

❒ এদেশের মক্তবগুলোতে প্রতিদিন ভোরে প্রাচীনতম শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন– বা, তা, ছা ইত্যাদি। এসব সরলমনা শিশুদেরকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দিয়ে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা।

❒ এন. জি. ও. কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তোলা এবং বৃহৎ জনশক্তিকে কাজে লাগানো।

আলম আরো বলল, "মাহমুদা! তুমি যদি আমাদের সংস্থায় চাকরি করতে চাও তবে অফিসার স্তরে চাকরি পাবে। কারণ, সুন্দর চেহারা ও আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনের সুবাদে। সুযোগ-সুবিধাও পাবে অনেক। বেতনও পাবে ঢের। কষ্ট করে আই. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। তুমি রাজী হলে চাকরির জিম্মাদারীটা আমি নিতে পারি।"

মাহমুদা বলল, "তোমার কথাগুলো তো খুবই সুন্দর, যুক্তিযুক্ত। তবে প্রতিবন্ধক হবেন মামা। তাছাড়া, আম্মা-আব্বাও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেন।"

"তুমি শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে এ ধরনের কথা বলা আদৌ শোভা পায় না। নারীদের স্বাধীনতার জন্যই তো আমাদের প্রচেষ্টা। নিজেকে যদি তুমি স্বাধীন করে নিতে পার তবে তোমার মাতা-পিতা আর মামারা কি করবে? কিছুই করতে পারবে না। সরকার তোমার পক্ষে, আদালত তোমার পক্ষে, তাহলে তোমার ভয় কিসের? ওরা যে তোমার কিছুই করতে পরবে না, তার নিশ্চয়তা দিতে পারি। এখন চিন্তা করে দেখ কি করবে।"

"আরে সময়তো অনেক হয়ে গেল, নাশ্‌তা পানি তো কিছুই হয় নি। চলুন সামান্য নাশ্‌তা করে নেই।" এ বলে কিছু বিস্কুট আর চা এনে হাজির করল। একে অপরের মুখে বিস্কুট তুলে দিচ্ছে। মনের আনন্দে ওরা নাশ্‌তা করছে। উভয়ের সময়টুকু ঈদের দিনের মত বা বাসর ঘরের আনন্দ ঘন মুহূর্তের মতই মনে হচ্ছিল। নাশ্‌তা শেষে মাহমুদার ডায়েরি হাতের কাছে পেয়ে পাতা উল্টাতেই আতিকার একটি চিঠি নজরে পড়ল। আলম চিঠিটা আগাগোড়া পাঠ করে বিষয়বস্তু জেনে নিল। তারপর নিজের বাসায় চলে গেল।

[সতর]

দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন। দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কালের চাকা এভাবে ঘুরছে। কিন্তু আতিকার ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন নেই। বন্ধু-বান্ধবহীন নিরানন্দ জীবনের অসারতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে লাগল আতিকা। পড়ায় মন বসছে না। খানা-পিনা ভাল লাগছে না। গোটা দুনিয়াটাই যেন বিষাদময় হয়ে গেল আতিকার। এই তো কিছুদিন আগে পর পর সংবাদ পেয়েছে, তার খেলার সাথী রহিমা, মাকছুদা, হালিমা ও সেতুর বিবাহ হয়েছে। ওরা নতুন করে সংসার পেতেছে। দাম্পত্য জীবনের মধুময় অঙ্গনে পা দিয়েছে। ওরা সবাই নতুন পথের যাত্রী। তাহলে এত লেখাপড়া করে কি লাভ! এতদিন পার হয়ে গেল, এখনো কোন একটা যুবক একটু ভাব বিনিময় করতে এগিয়ে আসছে না। অনেক মেয়ের সাথেই তো দেখি এক দুজন যুবক রয়েছে। মনে হয় কেউ আমাকে ভালবাসতে রাজি নয়। কেউ আমাকে পছন্দ করে না। তা না হয় কেনই বা আমার এ নিসঙ্গতা! এ ধরনের লেখাপড়া করার অর্থ কি? তা হলে রফিকা আর সুফিয়ার জীবনটাই তো ভাল। ওরা আল্লাহর দ্বীন শিখছে। আর আমরা শয়তানের দ্বীন শিখছি। এসব চিন্তায় বিভোর আতিকা।

চতুর্থ প্রিয়ট প্রায় শেষের দিকে। ঘণ্টা চলছে ইতিহাসের। আজ পড়ানো হয়েছে নাদের শাহের শাসনামল। এখনো কিছু অংশ বাকি। দপ্তরি চাচা করিডোরে ঝুলানো বেলে হাতুড়ীর আঘাত হানতে লাগলেন। ঘণ্টাধ্বনি ছাত্র-ছাত্রীদের জানিয়ে দিল, এখন ক্ষণিকের তরে বিরতি। স্যারেরা নিজ নিজ ক্লাস ত্যাগ করে অফিস রুমের দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় কেরানী স্যারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসল– আতিকা! প্রথম বর্ষ, রোল– ৮ ....। আতিকা বইগুলো ভাঁজ করে বেগে রেখে দৌড়ে অফিস কক্ষে প্রবেশ করে, "জী স্যার?" "তুমি আতিকা?" "জী স্যার। "নাও তোমার চিঠি।" এই বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা আতিকার হাতে দিলেন। আতিকা পত্রটি হাতে নিয়ে ক্লাস রুমে চলে গেল। সবাই বাইরে। কেউ গাছতলায়। কেউ স্টলে। শুধু পলি তার বেঞ্চে বসে কি যেন লিখছে। ক্লাসরুমে পলি খুব দুষ্টু মেয়ে। তার ব্যাপারে স্যারেরা সব জেনেও না জানার ভান করে থাকে। একবার এক ছেলে পলির নামে এ বলে বিচার দিল যে, "সে আমার রাফ খাতায় আজেবাজে অনেক কিছু লিখেছে।" স্যারেরা লেখা দেখে হাসলেন। খারাপ লেখা। স্যার পলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পলি! এ লেখা কি তোমার?" "জী স্যার" পলি উত্তর দিল। "ওর খাতায় কেন লেখলে?" "ওর খাতায়ই তো শুধু লিখি নি, অন্যদের খাতায়ও তো লিখেছি। অন্যদের খাতায় সব সময় লিখি। ওর খাতায় মাত্র আজকে লিখেছি। তারপরও বিচার?" "এসব লেখলে কেন?" "ভাল লাগে তাই লেখেছি।" "সাবধান আর কোনদিন কারো খাতায় কিছু লেখবে না।" "তাহলে আপনার ডায়েরিটা রেখে যাবেন স্যার.......।" তারপর থেকে স্যারেরাও কিছু বলে না ওকে।

আতিকা পত্রটি হাতে নিয়ে উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখছে। হ্যাঁ এটা তো মাহমুদার লেখা। আমার পাঠানো চিঠির উত্তর। এত বিলম্বে উত্তর! সে কি লেখাপড়ায় এতই ব্যস্ত যে, যথা সময়ে পত্রের উত্তরটা পর্যন্ত দিতে পারে না। অনেক ভেবে-চিন্তে পত্রটা খুলে পড়তে লাগল–

প্রিয় আতিকা,

পত্রের শুরুতে নিস তোর রেখে যাওয়া বান্ধবীটির পক্ষ থেকে প্রস্ফুটিত গোলাপের স্নিগ্ধ হাসি, গাল ভরা চুমু আর অফুরন্ত প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা। আশা করি শান্তির কুলহীন পারাপারের উর্মিমালায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছিস। আর আমিও দূর থেকে কামনা করি তাই।

প্রিয় আতিকা,

তুমি যদিও আমার চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছ কিন্তু মনের আড়ালে নও। শয়নে-সপনে, ভোর-বিহানে, ক্ষণে-ক্ষণে, পলে-পলে তোমার ছায়া, তোমার কায়া, তোমার মায়া, আমার হৃদয় সরোবরে শিউলির মত ভেসে বেড়ায়। ভুলতে পারি নি

তোমার তুলতুলে নরম হাতের স্পর্শের লোমহর্ষক কাহিনী। ভুলতে পারি নি তোমার নম্রতা, ভদ্রতা, মানবতা, উদারতা, বদান্যতা, সহিষ্ণুতা ও পর দুঃখে কাতরতার কথা।

ঃ দিল কি আয়না মে হে তাছবীরে ইয়ার কি,
যব্ যরা গর্দান জুকালী দেখলি।।

অর্থাৎ আমার হৃদয় দর্পণে শুধু তোমার আলেখ্য বিরাজ করছে। যখনই অবনত মস্তকে হৃদয়ের আঁখি খুলে তাকাই, তখনই তা দেখতে পাই।

প্রিয় আতিকা,

কত দিন কালের করাল গর্ভে বিলীন হতে চলছে। ডাকপিয়ন তোমার তুলতুলে নরম হাতের প্রাঞ্জল ভাষার একখানি চিঠি দিয়ে গেল। তা পাঠ করে তোমার মনের সব অবস্থা জানতে পারলাম। সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া অন্যকোন উপায় নেই। তবে এতটুকু বলতে পারি, তোমার মনের আশা একদিন না একদিন পুরা হবেই। নিরাশ হয়ে হাল ছাড়তে নেই।

ঃ ইয়াবাম উরা ইয়া নিয়াবাম, জুসতে জুয়ী মিকুনাম,
হাছেল আয়াদ ইয়া নি'আয়াদ আরজুয়ে মিকুনাম।।

অর্থাৎ, আমি তোমাকে পাই বা না পাই, তালাশ করতেই থাকব। তোমাকে হাছেল করতে পারি আর না-ই পারি, আশা ছাড়ব না। তাই আশা করতেই থাকব।

প্রাণাধিক আতিকা,

অনেক চেষ্টা তদবীরের পর আমার আশাটি পূরণ হওয়ার পথে। মনের মানুষটিকে অতি কাছে পেয়ে গেছি। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটিই পেয়েছি। তবে সামাজিক প্রতিকুলতা, পিতা-মাতার অনিচ্ছা এবং রেওয়াজী জটিলতার প্রাচীর ভেদ করে আমাকে সামনে এগুতে হবে। জানি না, এতে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারব। লক্ষস্থলে যদি পৌঁছুতে ব্যর্থ হই তবে হয়ত দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে ....।

স্নেহের আতিকা,

ঈদের বন্ধ হবে। আর মাত্র কদিন বাকি। ছুটিতে হয়ত বাড়ি যাবে। তখন দেখা হবে। তখন অনেক কথা হবে বুঝলি? যতই লিখি না কেন, কথা থেকেই যায়।

ঃ শিশিরে ভিজে না মাটি বিনা বর্ষণে,
পত্রে জুড়ায় না মন বিনা দর্শনে।।

ছুটির সময় বাড়িতে তোমার আগমনের পথ পানে চাতকের মত তাকিয়ে থাকব। তোমার মঙ্গল কামনায়–

"মাহমুদা"

এ্যাডভোকেট জামাল সাহেব শ্বশুরালয় থেকে পত্নিকে নিয়ে ঘরে ফিরছেন বিকাল দু'টায়। বাসায় তালা ঝুলানো দেখে ভাবলেন, মাহমুদা এখনো কলেজে। কিছুক্ষণ মুচড়া মুচড়ি করে অন্য চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। রাজিব ও শান্তা ওরা দুই ভাইবোন। রাজিবের বয়স চার বছর আর শান্তার বয়স আট। ওরা খুবই চঞ্চল। ঘরে বসে থাকার অভ্যাস ওদের নেই। কখনো বাগানে, কখনো উঠানে, আবার কখনো আপেল বাগানে চলে ওদের দৌড়-ঝাপ।

রাজিব একটু একটু কথা বলতে শিখেছে, এক পর্যায়ে শান্তা ডাকল, "আপু! আপু! এই যে লক্ত! আপু এখানে লক্ত।" শান্তা অন্য মনস্ক! কয়েকবার ডাকা-ডাকির পর শান্তা জিজ্ঞাসা করল, "রাজিব! তুমি কি বলছ?" "এই যে লক্ত।" শান্তা দৌড়িয়ে গিয়ে দেখল, ছেঁড়া একটি শার্ট রক্তে ভেজা। শান্তা তার আব্বুকে জ্নাল। জামাল সাহেব ঘরের পিছনে গিয়ে রক্তে ভেজা শার্টটি দেখলেন। জামাল সাহেব ভাবনায় পড়ে গেলেন। বাউন্ডারী ওয়ালের ভিতরে রক্ত মাখা কাপড় কি করে এলো? জামাল সাহেবের পত্নিও এ নিয়ে ভাবছেন। মাহমুদা এখনো বাসায় ফিরছে না, এও একটি চিন্তার বিষয়।

জামাল সাহেব একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেলেন কলেজে মাহমুদার সন্ধানে। কলেজে গিয়ে দেখলেন, ছুটি হয়ে গেছে অনেক আগেই। কোন ছাত্র-ছাত্রী কলেজে নেই। যাওয়ার পথে রাস্তায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে পেয়েছেন কিন্তু মাহমুদাকে দেখেন নি। নিরাশ হয়ে বাসার পথ ধরলেন। ভাবলেন, হয়ত অন্য পথে চলে গেছে।

মাহমুদা কলেজে যাওয়ার পরিবর্তে চলে গিয়েছিল আলম সাহেবের অফিসে। আলম সাহেব মাহমুদাকে নিয়ে ক্লিনিকে গিয়ে ক্ষতস্থান ওয়াশ করিয়ে পট্টি বেঁধে নিয়ে আসছে। অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরা মাহমুদাকে দেখার জন্য ভীড় জমিয়েছে। সবাই ভাব আদান-প্রদানে ব্যস্ত। একজন কর্মচারী আলম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার ইনি কে?" আলম সাহেব উত্তর দিলেন, "ইনি আমার বান্ধবী। অনেক পুরনো খাতির। তিনি এন. জি. ওতে চাকরি নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। দেখি, কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।"

"স্যার! তিনি একজন শিক্ষিতা, ভদ্র ও সুন্দরী মহিলা। তাঁর চাকরি নিতে তো বেগ পেতে হবে না। অতি সহজেই পেয়ে যাবে।" আলম মাহমুদাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বেশ আপ্যায়ন করালেন। তারপরে টমটম নিয়ে মাহমুদাকেসহ চলে আসলেন মাহমুদার বাসায়। টমটম এসে দাঁড়াল ফটকের কাছে। "আপু আসছে, আপু আসছে" বলে দৌড়িয়ে এলো শান্তা। আলম খুব তাড়াতাড়ি ভাড়া

দিয়ে কেটে পড়ল। শান্তাদের দেখে মাহমুদার মুখ শুকিয়ে গেল। মামা হয়ত ঘটনা আঁচ করে ফেলবেন। ভয়ে জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল মাহমুদা। মামানীকে ভাল-মন্দ জিজ্ঞেস করে পড়ার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মামা রুমে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে মাহমুদা! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কলেজে তো যাওয়া হয় নি। ছিলে কোথায়?"

জামাল সাহেবের প্রশ্নে মাহমুদা বুঝতে পারল যে, অর্ধেক ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেছে। সব মিথ্যা বলে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে জবাব দিতে লাগল। সে বলল, "মামা! আজকে ভোরে বাগানে গিয়ে ফুলগুলো দেখছিলাম। বড় গোলাপ গাছটির মগ ডাল থেকে একটি বড় ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটার আঘাতে আমি রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করছিলাম। একজন পথিক এ অবস্থা দেখে তার গায়ের জামা ছিঁড়ে বেন্ডেজ করে আমাকে ঘরে রেখে যায়। বিকেল দুটোর দিকে বেদনায় অস্থির হয়ে ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা ওয়াশ করে পট্টি বেঁধে দিয়েছেন, ইনজেকশন দিয়েছেন। তারপর বেদনা কমার জন্য ও ঘা শুকানোর জন্য টেবলেট দিয়েছেন। ক্লিনিকে ভীড় থাকার কারণে ফিরে আসতে একটু দেরি হয়েছে।"

জামাল সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "বেটি! সব কাজে হুঁশ রাখতে হয়। এত দিশেহারা হলে কি চলে?"

শান্তা তার পিতার সামনেই জিজ্ঞাসা করল, "আপু! তোমার সাথে টমটমে কে এসেছিল? তিনি যে আমাকে দেখেই ওদিকে চলে গেলেন!" জামাল সাহেবের অন্তরে সন্দেহ ঢুকে গেল।

মাহমুদা শান্তভাবে উত্তর দিল, "ঐ ব্যক্তিকে চিনি না, টাকার ভাংতি নেই বিধায় টমটমওয়ালা ওকে ডেকে তার নিকট থেকে টাকার ভাংতি নিয়েছে। তাকে আমি চিনি না।"

জামাল সাহেব একজন এডভোকেট। তাঁর জ্ঞান-গরীমা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও কল্পনা-জলপনা সাধারণ মানুষের মত নয়। মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা বলে দিতে পারেন। তাই মাহমুদাকে অতি নম্রভাবে বললেন, "মা-মনি! তোমার আব্বু অনেক আশা করে তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তোমার যেন লেখাপড়া ভাল হয়। দেখ মাহমুদা! রেজাল্ট যদি ভাল না হয় তবে আমারও বদনাম হবে আর তুমিও মুখ দেখাতে পারবে না। কাজেই আমার বাসায় থাকতে হলে খুব ভাল করে লেখাপড়া করতে হবে। এখানে থেকে যেন উল্টা-পাল্টা চলাফেরা করতে না দেখি।"

মাহমুদা লজ্জাবনত অবস্থায় মামার কথাগুলো শুনল। এরই প্রায় এক সপ্তাহ পরে ঈদের বন্ধ হল। সবাই বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে। মাহমুদাও বাড়িতে ঈদ করবে। অতঃপর ঈদের ছুটি হল বিশ দিনের। মাহমুদাকে তার মামা গাড়ীতে তুলে নিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

[আঠার]

ঈদের ছুটি। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, অফিস-আদালত, মিল-ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা সবই বন্ধ। শহরবাসীরা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে ঈদ করবে। তাই দলে দলে চলছে গ্রামের দিকে। মাহমুদা ফিরে এসেছে গ্রামের বাড়ি। ঈদের আনন্দে দেশ জুড়ে বইছে আনন্দের বন্যা।

জামিলা, রহিমা, শিল্পী, ডলিরাও স্বামীর বাড়ি থেকে ঈদ করার জন্য পিত্রালয়ে আসছে। এ সুবাদে বাল্য বান্ধবীরা, খেলার সাথীরা, প্রাইমারী এবং হাইস্কুল জীবনের অনেক নতুন-পুরাতন বান্ধবীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হবে। একে অপরকে কুশল বিনিময় করবে। শুনবে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলি। পুনরাবৃতি করবে হারানো দিনের কথা। তাই বুড়োদের চেয়ে যুবকদের আনন্দ একটু অন্যরকম, ভিন্ন ধরনের।

বছরের ঈদ আসছে আনন্দের সওদা নিয়ে। আর তা বিলিয়ে দেবে সবার ঘরে ঘরে। কিন্তু সুফিয়ার জন্য নিয়ে আসছে ছেলে কর্তৃক পিতা হত্যার বেদনা ভরা ইতিহাস। একমাত্র কন্যাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মা জননীর চির বিদায়। এবারের ঈদ সুফিয়ার ঘরে হাজির হয়েছে ভাইয়ের মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে। দুঃখে জর্জরিত সুফিয়ার হৃদয়। আহঃ! হায়রে দুনিয়া ....।

কারো ঘরে শিরনী, সেমাই, গোশত-রুটি, পোলাও, কুরমা, জর্দা, ফিরনী, পায়েশ পাকানো হয়েছে। আবার কারো ঘরে পুরনো আটার সস্তা রুটি, ভর্তা বা নেমক ছাড়া ক্ষুদের জাউ। কারো গায়ে রং বেরংয়ের দামি পোষাক আর কারো গায়ে হরেক রকম তালিযুক্ত পুরনো কাপড়। কেউ ঈদের আনন্দের ঢেউয়ের ফেনায় বন্ধুদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কত যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ ও শিশুরা বাঁচার আশা নিয়ে হাসপাতালের সীটে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কেউবা শ্বশুরালয়ে শালা-শালীদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছে। আবার কত নিরপরাধ মানুষ নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মুক্তির আশায় প্রহর গুণছে। সুফিয়ার চিত্রপটে শুধু এসব দৃশ্য বার বার ভেসে ওঠে অন্তরকে আহত করে তুলছে। তাই সুফিয়ার অধরে হাসির রেখা ফোটে উঠতে দেখে নি কেউ। সুফিয়ার দুঃখভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে রফিকাও হারিয়ে যায় দুঃখের সাহারায়।

ঈদ চলে গেছে দু'দিন আগে। চলছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও বেড়ানোর পালা। আতিকা এলো মাহমুদাদের বাসায়। দীর্ঘদিনের

পর সাক্ষাত, সকলেরই অন্তরে রয়েছে জমাট বাধা কত কথা। কার কথা আগে বলবে, কোনটা আগে প্রকাশ করবে তার সূচি তৈরি করতে পারে নি ওরা। এরই মধ্যে মাহমুদা বলল, "আতিকা! তুমি হয়ত সুফিয়ার কথা শুনে থাকবে, ইস কত দুঃখ, কত বেদনা। আপনজনহারা একটি বালিকার হৃদয়ে এতসব বেদনা কি করে সইবে? হায় বেচারী কতই না ভাল ছিল। গ্রামের ছোট বড় সবাই তো তাকে সেই ছোটকাল থেকেই ভালবাসত। তাছাড়া, ওতো আমাদের মত শয়তান নয়। কত ধার্মিক, কত পরহেজগার! আজ তার এ করুণ অবস্থা।

আতিকা তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত করে বলল, "আমি আগে জানতাম না, সুফিয়ার ওপর দিয়ে যে মসিবতের ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে। বাড়ি এসে ভাবির কাছে জানলাম। এখনো যে বেচারী টিকে আছে এজন্য ধন্যবাদ। কার ওপর দিয়ে কখন যে কি ঘটে যায়, তা কেউ বলতে পারবে না। অতঃপর বলল, "চল না ওকে একটু দেখে আসি। তার মুখ থেকে কিছু শুনি আর আমরাও সমবেদনা প্রকাশ করে কিছু সান্ত্বনা দেই।" মাহমুদা বলল, "সেতো আর তার বাড়িতে নেই। এখন নাকি রফিকাদের বাড়ি থাকে। চল যাই, একটু দেখে আসি।"

উভয়ে চলল রফিকাদের বাড়ি। পল্লীর উত্তর প্রান্তেই ওদের নিবাস। মাত্র ২০/২৫টি বাড়ি পার হলেই ওদের ঘর। পদব্রজে চলছে দু'সখী। হাজির হল রফিকাদের বাড়ি। সুফিয়া ও রফিকা পড়ার ঘরে কিতাব নিয়ে ব্যস্ত। দেখল দু'বালিকা ওদের ঘরের দিকে আসছে। মাথা তুলে তাকাল ওদের দিকে। চোখাচোখি হল পরস্পরে। খাটিয়ায় বসতে দিল সুফিয়া। রফিকা মেহমানের আগমনবার্তা জানিয়ে দিল ওর আম্মুর নিকট। চলছে নাশ্‌তা টিফিনের আয়োজন।

এদিকে দীর্ঘ দিনের পুরাতন বান্ধবীদের মিলন দৃশ্য এক মধুময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। চলছে ভাব বিনিময়ের পালা। সকলের অন্তরে উদিত হতে লাগল অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোর কথা। ওদের মনে ভেসে ওঠে চারণভূমির দৃশ্যাবলি। কোথায় সে চারণভূমি? কোথায় মেষপাল? কোথায় বৃদ্ধ সুলাইমানের খেজুরতলার বিচারালয়। আজ খেলোয়াড় অপরাধীদের বিচার হচ্ছে না দাদা ভাই এর আদালতে। ভীড় জমে নি মশক হাতে ঝর্ণাধারার পার্শ্বদেশে। আজ নেই সে সিলুক কাটা আর চিমটি কাটা খেলার প্রতিযোগিতা। এখন সবাই বড় হয়েছে। যৌবনে পদার্পণ করেছে। শিক্ষা-দীক্ষায়ও এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। পল্লীর স্মৃতিরা যতই হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকছে, সেদিকে তাকাবার সুযোগ নেই। মাহমুদা সুফিয়াকে লক্ষ করে বলল, "সুফিয়া! তোমার অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গত বড়ই হৃদয় বিদারক, বড়ই বেদনাতুর। তুমিতো ধর্মানুরাগী, ছিলে পর্দানশীল

ইবাদত-বন্দেগীর পরও তোমার মালিক তোমার ওপর দয়া করল না। তোমার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হল। এতে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। আমরা তোমার বাকি জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।"

সুফিয়া মাহমুদাকে লক্ষ করে বলল, "আপু! আপনি আমার হাল হাকিকত জানার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ করছেন বলে আপনাকে জানাই মোবারকবাদ। কামনা করি আপনার ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি। তবে আপনার মন্তব্যে আমি একমত হতে পারলাম না। কারণ, আপনি আমার মাওলার ওপর অন্যায় অভিযোগ এনেছেন। আল্লাহর ওপর অভিযোগ করা মহাপাপ। কেননা, আল্লাহর সত্বা অভিযোগের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ অসীম আর বান্দাহ সসীম। সসীম হয়ে অসীমের ওপর অভিযোগ করা অনধিকার চর্চা। তা জায়েয নয়। মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের মউত যখন যেভাবে, যেখানে রেখেছেন তখন সেখানেই হবে। এর ব্যতিক্রম হবে না। আমার আব্বু-আম্মু ও বড় ভাই এর মউত যেভাবেই ভাগ্যে লিখা ছিল সেভাবেই হয়েছে। এতে বিলাপ করে লাভ কি বোন?" সুফিয়া আরো বলল:-

"আল্লাহ পাক বান্দাহকে সবচেয়ে বড় যে নেয়ামত দান করেছেন, তা হল ঈমান। ঈমানের হেফাজতের কারণে বান্দাহ চির শান্তির চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে যাবে। আর ঈমান না থাকার কারণে জাহান্নামের বিভীষিকাময় অগ্নিতে দগ্ধ হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর পক্ষ থেকে ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। ঈমান অনুপাতে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। যেমন নবী-রাসূলগণের ঈমান বেশি, তাই তাদের পরীক্ষাও বেশি কঠিন। যেমন, হযরত নূহ (আ)-কে তুফান দিয়ে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করে, হযরত জাকারিয়া (আ)-কে করাতে চিরে, হযরত আয়ুব (আ)-কে কঠিন রোগ দিয়ে, হযরত ইসমাঈল (আ)-কে ছুরির নিচে দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন। তাছাড়া, আরো হাজারো ঘটনা রয়েছে। শেষ যামানায় আমাদের প্রিয়নবী (সা) সহ সকল সাহাবায়ে কেরামগণ কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন। কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সয়ে, দেশ ত্যাগ করে, সহায়-সম্পদ বিনষ্ট করে, যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে এবং আরো কত দুঃখ-কষ্ট তাদের ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই, তুমি আমিও যদি ঈমানের দাবী করি তবে তোমাকে আমাকেও আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।"

প্রবাদ আছে, "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" সুফিয়ার কথাগুলো শুনেও না শোনার ভান ধরে নীরব বসে রইল। কোন ধরনের মন্তব্য বের হল না ওদের মুখ থেকে। এতে সুফিয়া অনুমান করে নিয়েছে যে, ওদের কাছে কথাগুলো তেমন ভাল লাগে নি।

এমন সময় অন্দর মহল থেকে ভেসে আসল নারী কণ্ঠ, "রফিকা! রফিকা।" ডাকছেন রফিকার আম্মা। রফিকা আসন ত্যাগ করে চলে গেল অন্দরে। ফিরে আসল দস্তরখান, গ্লাস, জগ, নেমকদান নিয়ে। এক এক করে হাজির হল হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার। সকলেই তাদের রুচিমত খাবার খেয়ে নিল। অতঃপর আবার চলছে তাদের আলাপের পালা। মাহমুদা সবাইকে লক্ষ করে তার মনের লুকায়িত কথাগুলো বলতে লাগল।

"শোন রফিকা, আতিকা ও সুফিয়া! আজ আমি আনন্দিত, গর্বিত ও প্রফুল্ল এই জন্য যে, সুদীর্ঘকাল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তালাশ করছিলাম একটি লোক, একটি সুন্দর মুখ, যে আমাকে আনন্দে নাচিয়ে তুলবে, যে খুশীতে ভরে দিবে আমার হৃদয় পেয়ালা। অনেক চেষ্টা-তদবীরের পর এমন একটি লোকের সন্ধান পেয়েছি।" তারপর এক এক করে বলতে লাগল সেদিন বিকালের পার্কের কথা, ফুল বাগানের কথা ও এন. জি. ও. অফিস ও হাসপাতালের কথা। এমনভাবে তার কথায় সাহিত্যিকতা ফুটে উঠছিল, যেন সে এ যামানার 'সুরুযী'। আলমের গঠন প্রণালী, তার আচরণ, শিক্ষাগতযোগ্যতা ও চাকরি জীবনের যা জানে, তার থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করল।

আতিকার কাছে কথাগুলো খুব চমৎকার বলেই মনে হল। সম্ভবতঃ এসব কাজে নিজের ব্যর্থতার জন্য মাঝে মধ্যে তার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘশ্বাস। সুফিয়া মাহমুদার সব কথাই মন দিয়ে শুনছিল এবং এর গভীরতা বিশ্লেষণ করছিল। একটু নীরব থেকে সুফিয়া বলল–

"আপামনি! আপনি আমার চেয়ে বয়সে ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড়। আপনাকে বুঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া, বুঝের মানুষকে বুঝানোও মুশকিল। তথাপি বোন হিসেবে দু'একটি কথা বলা জরুরি মনে করি। আমার কথাগুলো পালন করলে আপনার জীবনে মঙ্গল বয়ে আসবে। আর যদি তা পালন করতে ব্যর্থ হন তবে অচিরেই আপনার জীবনে নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। মোকাবেলা করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি খুব উৎফুল্ল হয়ে বলছেন, অনেক চেষ্টা-তদবীর করে আপনার মনের মানুষটি খুঁজে পেয়েছেন। সাথে সাথে সে ব্যক্তিটির অনেক গুণ-গরিমার কথাও প্রকাশ করেছেন। এই আলোকে আমি বলতে চাই, এটা আপনার ভুল সিদ্ধান্ত। আপনি চরম বিপর্যয়ের বেলাভূমিতে দাঁড়ানো। কারণ, যারা এন. জি. ওতে চাকরি নিয়েছে বা এন. জি. ওরা যাদেরকে চাকরি দিয়েছে, এদেরকে আমি মুসলমানই মনে করি না। যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমান রয়েছে তারা এন. জি. ওতে চাকরি নিতে পারে না।

মাহমুদা ঃ আরে তুই একি বলছিস? ওর নাম তো আলম খান। এ আবার বেঈমান হয় কি করে? আজে-বাজে বকছিস!

সুফিয়া ঃ শুধু নামে মুসলমান-অমুসলমান নির্ণয় করা যায় না। নির্ণয় করতে হয় তার আমল-আখলাক ও পরহেজগারী দিয়ে। এন. জি. ওরা সেবার মুখোশ পরে, উন্নয়নের ব্যানার নিয়ে, মানবতার ধজা উঁচিয়ে এদেশে এসেছে। আসলে ওসব কিছু নয়। ওরা এসেছে সরলমনা মুসলিম মা-বোনদেরকে পর্দার আড়াল থেকে টেনে রাস্তায় নিয়ে আসতে, অর্থের লোভ দেখিয়ে ঈমানহারা করতে। ইসলামী রীতি-নীতি, কৃষ্টি-কালচার দাফন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার ঘটাতে। নারী স্বাধীনতার নামে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কেড়ে লুটে নিতে। নিরক্ষরতা দূর করার নামে তাদের কুশিক্ষার ছবক পড়াতে। গরীবের ঘরে ঘরে সুদের ব্যবসা চালু করতে। অল্প ঋণ দিয়ে বেশি মুনাফা নিতে। তাছাড়া, যেসব মহিলা এন. জি. ওতে চাকরি নিয়েছে, ওদের চরিত্র নিয়ে মানুষ সন্দেহ করছে। আর যাদের বিয়ে হয়েছে, ঐসব মহিলাদের স্বামীরা চরম অশান্তিতে আছে। ওরা স্বামীর চেয়ে অফিসারদের বেশি ভালবাসে। সাবধান! সাবধান! নিজের ঈমান-আমল ও চরিত্র বরবাদ করো না। সুফিয়া আরো বলল–

ঃ মাশুক হাজার দুস্তেরা দিল না দেহী
ওয়ার মিদেহী আঁ দিল বজুদাই বনেহী।

অর্থাৎ যার শত-সহস্র বন্ধু রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কেননা, সে এক সময় তোমাকে ছেড়ে অন্যের সাথে চলে যাবে।

ঃ ছোহবতে ছালেহ্ তরা ছালেহ্ কুনাদ,
ছোহবতে তালে তরা তালে কুনাদ।

অর্থাৎ ভাল লোকের সাথে ভালবাসা রাখলে তুমিও ভাল হবে। আর খারাপের সাথে ভালবাসা রাখলে তুমিও খারাপ হবে।

সুফিয়া আরো বলল–

"আপামণি! আপনি যে সুন্দর মুখটি খুঁজে বের করেছেন, সে মুখটি শুধু আপনারই মনে করবেন না। তালাশ করে দেখুন, আপনার মত আর কত ললনার সাথে সে ভাব জমিয়ে রেখেছে। এক সময় শুধু হায় হায় করে পথে ফিরতে হবে।

প্রেম সত্যিই পবিত্র জিনিস। এটাকে সব সময় পবিত্র রাখতে হয়। ধ্বংসশীল বস্তুর প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া খুবই নির্বুদ্ধিতা। প্রেম যদি করতে হয় আল্লাহর সাথে করুন। যিনি কোনদিন তাঁর প্রেমিকাকে ভুলবেন না। মাখলুকের সাথে প্রেম

করা মূর্খতা। আপনি যে প্রেমের পিছনে দৌড়াচ্ছেন এটা আলেয়া মাত্র। এই প্রেম আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। কেননা, পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, গল্প-গুজব করা ও হাসি মযাক করা কিছুতেই জায়েয নয়। সম্পূর্ণই হারাম। আপনার মত একজন পরমা সুন্দরীর নিকট যদি কোন পুরুষ আসে তবে কি সে ঠিক থাকতে পারবে? না আপনাকে আপনি পবিত্র রাখতে পারবেন? কাজেই বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, এখন থেকে এ ধরনের প্রেম থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরে রাখুন। দেখবেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গলের ফায়সালা করবেন।"

সুফিয়ার কথা শুনে মাহমুদা ও আতিকা একটু দুর্বল হয়ে গেল। সুফিয়ার কথাগুলো তাদের কাছে খুবই তিতে লাগছিল। এখানে বসে থাকা কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। তাই তারা এবারের মত বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

পথিমধ্যে আতিকা মাহমুদাকে বলল, "এতক্ষণ তো শুধু একতরফা ওয়াজই শুনেছি। কোন উত্তর বের হচ্ছিল না। আসলে তো কথাগুলো সত্যিই বলেছে, তবে এখন কি আর সে যামানা আছে? প্রাইমারী সীমা অতিক্রম করতে না করতেই সবাই বয়ফ্রেন্ডের তালাশ করে। আমরাই শুধু ভেড়ার মত ঘুরছি। আর সংশয় নয়। কিছু দিনের মধ্যেই কাউকে বেছে নেব। লেখা-পড়া শেষ হলে বিয়ে দিয়ে দেবে। তখন কি আর ওসব করা যাবে?" মাহমুদা বলল, "ঠিকই বলছ বোন। ঠিকই বলছ।" এসব আলাপ করতে করতে বাড়ি পৌঁছল।

[উনিশ]

পেশোয়ারের নিকটবর্তী সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত দারুল উলূম হাক্কানীয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল হক হাক্কানী সাহেবের সাহচর্যে থেকে রফিক বিভিন্ন ইলমের ওপর জ্ঞান অর্জন করেন। সর্বশেষ সিহাহ্ সিত্তার কিতাব ছাড়াও ইলমে হাদীসের বেশ কয়টি কিতাব আল্লামা আবদুল হক হাক্কানী সাহেবের নিকটই অধ্যয়ন করেন। সালানা পরীক্ষায় কোন কিতাবে আমার নিচে নম্বর পায় নি। তাই সবাই রফিককে সমীহ নজরে দেখে।

মাওঃ আঃ হক হাক্কানী নিজেই একদিন উক্তি করেছিলেন যে, রফিকের মত এত মেধাবী ছাত্র বিগত দশ বছরে হাক্কানিয়াতে আসে নি। দারুল উলূম হাক্কানিয়ার ছাত্ররা শুধু ৫ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ম, মুর্দা দাফন করা আর বিবাহ পড়ানো এবং খতম পড়ানোর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইলম হাছেল করে না। ইলমে নব্বীর পূর্ণ বিকাশ ঘটানো তাদের অঙ্গীকার। বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের পূর্ণ

অনুসারী তারা। শুধু দারুল উলূম দেওবন্দের সিলেবাস পড়িয়ে তারা দেওবন্দী নয়। দেওবন্দের পূর্ণ আকিদা ও চিন্তা-চেতনার বাস্তব নমুনা হল দারুল উলূম হাক্কানিয়া।

বর্তমান বিশ্বের আনাচে কানাচে অসংখ্য মাদরাসা দেওবন্দী নেছাবে পরিচালিত হচ্ছে। আবার নতুন নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠাও লাভ করছে। সে সব মাদরাসার লেখা-পড়ার মান ও ছাত্রদের আখলাক অন্য সব মাদরাসার তুলনায় অনেক গুণে ভাল। তবে একটি কথা তিক্ত হলেও সত্য আর বাস্তবতার দিক দিয়েও সঠিক যে, দারুল উলূম দেওবন্দের মৌলিক চেতনা এইসব মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কমিটির কাছে অনুপস্থিত। তা হল ইসলামের সর্বোচ্চ সোপান ও ফরয একটি ইবাদত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্ররা ওস্তাদের সম্মুখে বা ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে যেমনিভাবে নামাযের অনুশীলন অর্থাৎ রুকু-সিজদা, কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি অনুশীলন করে। ঠিক তেমনিভাবে তীর, বর্ষা, নেজা নিক্ষেপ করা, খঞ্জর চালানো, বন্দুক চালানো, তলোয়ার ঘুরানো এবং আঘাত প্রতিহত করে কিভাবে দুশমনকে ঘায়েল করা যায় সেসব কলা-কৌশল শিক্ষা করেছিলেন। আজ দেওবন্দে এর সামান্য কিছু থাকলেও অন্য সব মাদরাসা থেকে জিহাদের প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন হিজরত করে বিভিন্ন ক্লাবে চলে গিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য কিছু কলা-কৌশল শিক্ষা করা, দুশমনকে পরাভুত করার বিদ্যা হাছেল করা আমাদের ওপর ফরয দায়িত্ব। আজ আমরা জিহাদী প্রশিক্ষণকে নিষ্প্রয়োজন মনে-করি। আল্লাহ যা প্রয়োজন মনে করে ফরয করেছেন, তা আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। এ ধরনের আকিদা পোষণ করলে ঈমান থাকবে কিনা তা পাঠকের বিবেচনার আদালতে সোপর্দ করলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) থেকে নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ), ইমাম মালেক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ), ইমাম হাম্বল (রহ) এবং হযরত আবদুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী, শাহওয়ালিউল্লাহ (রহ), শাহ ইসমাঈল (রহ), কাশেম নানাতুবী (রহ), ফজলে হক খায়রাবাদী (রহ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ), হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ), রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ), সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ) প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীন শুধু হাদীসের মসনদের শাইখুল হাদীস বা মাযহাবের ইমাম ও খানকার পীরই ছিলেন না। তাঁরা একদিকে ছিলেন ইমাম অপর দিকে ছিলেন যুগসংস্কারক, অন্য দিকে ছিলেন হাদীস বিশারদ আবার অপর দিকে ছিলেন খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথের জানবাজ মুজাহিদ ও সিপাহসালার। তাঁদেরকেই দেখেছি খানকার পীর হিসেবে উম্মতকে আত্ম মাধ্যমে আল্লাহ আল্লাহ যিকির শিক্ষা দিতে।

বর্তমানে আমরা জিহাদের মত কষ্টসাধ্য ইবাদতকে বাদ দিয়ে সহজ সহজ ইবাদতকে বেছে নিয়েছি। যেমন আমাদের মধ্যে অলস প্রকৃতির যারা, তারা বেছে নিয়েছি পীর-মুরীদিকে, যা বিনা পুঁজিতে ব্যবসা নামে খ্যাত। আবার কিছু কিছু আলিম শুধু তালিমকেই প্রাধান্য দিয়েছি। আবার কেউবা কিতাবী ইলম কম থাকায় দাওয়াত তাবলীগের কাজটিকে বেছে নিয়েছি। এ সমস্ত দ্বীনি কাজের চর্চা বেশি থাকার কারণে এবং এর ওপর বেশি বেশি ফাযায়েল বর্ণনার কারণে ছেলেরা ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে রণাঙ্গনে মুজাহিদদের উপস্থিতি শূন্যের কোটায়। উক্ত খিদমতগুলোকে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন মনে করার কারণ নেই। তালিম দেয়া, তাবলীগ করা, আত্মশুদ্ধি করা ফরয। এগুলোর প্রতি অনিহা থাকলে তার ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। এসব কাজ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপুর্ণ ফরয বিধানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে পরিহার করাটা কুফরী।

আমি যদি একজন পীর হই বা মুয়াল্লিম হই তবে আমার ছাত্রদের বা মুরীদদের মধ্যে কেউ হবে পীর, কেউ হবে মুবাল্লিগ, আবার কেউ হবে, মুজাহিদ আর কেউ হবে মুয়াল্লিম। তাহলে দ্বীনের সবগুলো কাজই সুন্দরভাবে চলবে। দুনিয়াতে দ্বীন বিজয়ী থাকবে। সমাজের বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শান্তিময় পরিবেশ ফিরে আসবে। বর্তমানে আমাদের অবস্থা হল যে যেটা করি সেটাকে এমন প্রাধান্য দেই যে, এটা ছাড়া অন্যসবই বাতিল। আমি যা করি এটা হক, এটাই করণীয়।

যতদিন পর্যন্ত এ সংকীর্ণ মানসিকতার পরিবর্তন না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ জাতি মাথা তুলে সমাজে দাঁড়াতে পারবে না, গোলামীর জিঞ্জির থেকেও মুক্তি পাবে না।

তাই শাইখুল হাদীস মাওঃ আঃ হক হাক্কানী সাহেবের মাদরাসায় ইলম শিক্ষার পাশাপাশি জিহাদের প্রশিক্ষণ জরুরী করে দিয়েছিলেন। ফারেগ হওয়ার পরও এক বছর পর্যন্ত ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে জিহাদের কলা-কৌশল শিখতে হচ্ছে। তালেবান নেতা হযরত মাওঃ জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবও এই মাদরাসারই ছাত্র।

রফিক ও তার সহপাঠী ছাত্ররা ইলমে দ্বীন শিক্ষার সাথে সাথে অনেক ধরনের অস্ত্র চালানো এবং যুদ্ধের নানা ধরনের কলা-কৌশল রপ্ত করেছে। মাওঃ আঃ হক সাহেব অনেক সময়ই ছাত্রদেরকে বলতেন, "বাবারা! ইসলাম মরুভূমির মত তৃষ্ণার্ত। ইসলামকে সজীব রাখতে হলে তার ওপর শহীদদের তাজা খুন ঢালতে হবে। এছাড়া দ্বীন জিন্দা হবে না। ইসলাম শক্তিশালী হবে না।" রফিককে লক্ষ

করে প্রায়ই বলতেন, "বাবা রফিক! তোমাদের নজিবুল্লাহ সাহেব রাশিয়া থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করছেন। রাশিয়ার পুতুল সরকার তোমাদের নজিবুল্লাহ সাহেব। তিনি দেশটাকে রাশিয়ার হাতে তুলে দেবেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজম। এটা আমাদের জন্যেও এক বিপদ সংকেত। আফগানিস্তান দখলের পরপরই তার টার্গেট হবে পাকিস্তান। তারপর আস্তে আস্তে হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও বার্মাসহ তার বলয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই, আমরাও নিরাপদ নই। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিপদ সংকেত দেখছি। আফগানিস্তানের অধিবাসী যারা, তোমরা জিহাদের প্রশিক্ষণ খুব ভালভাবে রপ্ত কর, তাহলে তোমাদের ঈমান, তোমাদের তাহজিব-তামাদ্দুন, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারবে। তা না হয় ঈমান, ইজ্জত, দেশ সব খোয়া যাবে।

হাক্কানী সাহেবের নছিহতগুলো সব ছাত্রই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন একমাত্র আবদুর রউফ ওয়াতানী ছাড়া। ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে সব ছাত্রই জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য এক বছরের জন্য নাম লিখিয়েছে। আর আবদুর রউফ ওয়াতানী নাম লিখেয়েছে এক ছালের জন্য। অথাৎ তাবলীগে এক বৎসর কাটাবে ওয়াতানীর উক্তি হল নবী (সা) দশটি বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কাফেরের জুলুম-অত্যাচার বরদাশ্ত করেছেন। তারপরও রাগ করেন নি, বদদোয়া দেন নি। তায়েফের ময়দানে তায়েফবাসীরা নবীকে রক্তাক্ত করেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্তারা এসে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, "হে নবী! তায়েফবাসীরা আপনাকে মেরেছে, রক্ত প্রবাহিত করেছে আল্লাহ তা সইতে পারেন নি। তাই আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তায়েফবাসীদের শাস্তির জন্য। আপনি যদি বলেন তাহলে দু'দিকের দু পাহাড়কে একসাথ করে তায়েফবাসীদেরকে আটার মত পিষে দেব। দয়াল নবী এ কথা শুনে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে আরজ করলেন, "ওগো আমার মাওলা, তায়েবাসীরা আমাকে চেনে নি। তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। আযাব দিয়ে যদি আমার উম্মতকে ধ্বংস করে দাও তবে কার কাছে দাওয়াত নিয়ে যাব?" নবীর দোয়া আল্লাহ কবুল করেন, আর আযাবের ফেরেশ্তাদের আকাশে তুলে নিয়ে গেলেন। আমিও উম্মতকে দ্বীনের দাওয়াত দেব, বুঝাব, ওদের জন্য দোয়া করব। ওদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ এসে গেলে পরস্পর হানাহানি থাকবে না, মারামারি বন্ধ হবে। সবাই যদি কলমাওয়ালা হয়ে যায়, দ্বীনের দায়ী হয়ে যায়, দ্বীনের দরদ আর ফিকির দিলে পয়দা হয়ে যায় তবে চুরি-ডাকাতী, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ কিছুই থাকবে না। প্রয়োজন হবে না পুলিশ, থানা, আদালত ও জেলখানার। অর্থাৎ দাওয়াতের প্রভাবে সবাই দ্বীনদার, পরহেজগার ও আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে।

আবদুর রউফ ওয়াতানীর উক্তি শুনে রফিক বলল, "ওয়াতানী ভাই! তোমার চমৎকার জাহেলী যুক্তি ও গোমরাহী চিন্তাধারা দেখে মুর্দাবাদ ও গোমরাহ্‌বাদ না জানিয়ে পারছি না। এক যুগ ধরে ইলম হাছিল করে আজ তার এ কুব্যাখ্যা তুলে ধরেছ।"

"আচ্ছা ওয়াতানী ভাই! ৫ / ৭ বছরের মধ্যে কোন দিন আপনি ফযরের আগে গোসল করেন নি। কোন দিন ছবকে বসে স্বপ্নে জান্নাতের হুর-গেলমান দেখেন নি। ছবকে বসে আপনার কাজ ছিল দু'টি, হয়ত বসে বসে শরীর চুলকাতেন, না হয় রোগা মুরগীর মত ঝিমোতেন। তাছাড়া, তাকরারে বসলে একটু পরপর অযূ করতে যেতেন। এইতো ছিল আপনার নিত্য দিনের আমল। প্রায় রমজানে আপনি বলতেন, "চল এক চিল্লা দিয়ে ঈমান মজবুত করে আসি।" আমি জিজ্ঞাসা করি তাহলে কি তালিমের দ্বারা ঈমান মজবুত হয় না? তাজকিয়ার দ্বারা ঈমান পুখতা হয় না? জিহাদের দ্বারা ঈমানে মজবুতী আসে না? শুধু তাবলীগ করলেই কি ঈমান মজবুত হয়? অন্য কিছুর দ্বারা হয় না? এ গোমরাহী আক্বিদা ও পথভ্রষ্টতার ছবক কোত্থেকে পেলেন?"

"আমাদের প্রিয় নবী (সা) দশ বছর মক্কার যমিনে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ দশ বছরে ইসলামের তেমন উন্নতি বা অগ্রগতি দেখা যায় নি। নবীর মত আমল-আখলাক আর ঈমানী শক্তি অন্য কারো মধ্যে নেই। কথা বলার কৌশল ও যুক্তি অন্যদের মধ্যে ছিল না, ছিল না হিকমত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান। নবীর দোয়ার মত অন্য কারো দোয়া কবুল হত না। সবকিছু মিলিয়ে, কলা-কৌশল ও হিকমত খাটিয়ে রাতের পর রাত দোয়া করার পরও সব মানুষ দ্বীন বুঝতে পারে নি। মাত্র দশ বছরে অল্প কজন মানুষ দ্বীন কবুল করেছিলেন। অন্যসব মানুষ দ্বীন থেকে দূরে ছিল। আশানুপাতে দ্বীনের উন্নতি আর অগ্রগতি না হওয়ায়, মহান রাব্বুল আলামীন নবীকে অস্ত্র ধারণ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। সে দিন মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা ছিল না। তাই অনেকের অন্তরে দ্বীনের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা কবুল করতে সাহস পায় নি। বরং তাদের ভয় ছিল যে, মুসলমান হলেই ঘর ছাড়তে হবে, পিটুনি খেতে হবে ও অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করতে হবে। এই ভয়ে অনেকেই দ্বীন কবুল করে নি।"

"মহানবী (সা)-এর ওপর জিহাদের নির্দেশ আসলে নবী (সা) যখন তলোয়ার হাতে নিলেন, তখন যান-মালের নিরাপত্তা বিধান হল। যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা কমে গেল। তখন থেকে দলে দলে কাফের মুশরেকরা ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিতে লাগল। জিহাদ হল ইসলামের সর্বোচ্চ সোপান। জিহাদ ছাড়া দ্বীন পূর্ণাঙ্গ

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নবীজী (সা) তলোয়ার হাতে নেয়ার পর মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছিল, জিজিয়া দিচ্ছিল, মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়েছিল। তলোয়ার ছাড়া তাবলীগ, পূর্ণাঙ্গ তাবলীগ নয়।"

রফিক আরো বলল–

"আঃ রউফ ভাই! আপনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন যে, দাওয়াত দিয়ে সব মানুষকে দ্বীনদার বানিয়ে ফেললে পুলিশ, থানা, আদালত ও জেল খানার প্রয়োজন হবে না। আপনার এ খোঁড়া যুক্তিকে আমি মূর্খতা বা পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি না। কেননা, মহানবী (সা)-এর এত মেহনতের পরেও যখন সব মানুষ দ্বীনদার হল না, তখন আপনার মত মুবাল্লেগরা তা পারবেন কি করে? তাছাড়া, দাওয়াতের মাধ্যমেই যদি সব কাজ হয়ে যেত তবে শরীয়তে শুধু দাওয়াতের কথাই বলা হত। চোরের হাত কাটা, ডাকাতী বা হত্যার বদলে হত্যা, জিনার জন্য ছংগেছার, মিথ্যার জন্য দুর্রা মারার হুকুম আসত না। এতে বুঝা যায়, দাওয়াতের পরও কিছু লোক রয়ে যাবে। তারা ফেৎনা-ফাসাদ করবে। এদেরকে শায়েস্তা করার জন্যই এসব বিধান দিয়েছেন।

হুজুর (সা) নিজে জিহাদ করেছেন। কাফেরকে হত্যা করেছেন, কাফেরকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন। কাফেরকে হত্যা করার জন্য সশস্ত্র কাফেলা পাঠিয়েছেন। ভাই আবদুর রউফ ওয়াতানী! আপনি একজন আলেম হয়ে জিহাদের প্রতি অনিহা দেখাতে পারেন কি? জিহাদ না করে নিজেকে মাসুম মনে করাও গুনাহে কবীরা।

ভাই ওয়াতানী, আপনার সময়ের চেয়ে নবীজির সময়ের মূল্য অনেক বেশি ছিল। জীবনের অনেক মূল্যবান সময় তিনি জিহাদে ব্যয় করেছেন। আপনার রক্তের চেয়ে নবীজির রক্ত কম দামী ছিল না। তিনি অহুদের প্রান্তরে শরীরের তাজা রক্ত ঝরিয়েছেন। আপনার চেয়ে উম্মতের দরদ আর ফিকির কম ছিল না, নিজ হাতে তাঁর প্রাণ প্রিয় সাহাবীদেরকে জিহাদের পোষাক পরিয়েছেন, তাদের হাতে তীর-ধনুক ও ঢাল-তলোয়ার তুলে দিয়েছেন।

হযরত হারেছ বিন ওমায়েরের মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদ শুনে নবীজী ঠিক থাকতে পারলেন না। হারেছের রক্তের কীমত নবীর কাছে কম দামী ছিল না। নবীজীর কোমল অন্তর ব্যথায় ভরে গেল। প্রতিশোধের আগুনে নবীর অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল। হারেছের রক্তের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কলিজার টুকরা সাথী যায়েদ বিন হারেছাকে হারাতে হয়েছে। নিজের চাচাত ভাই জাফরে তৈয়্যারকে মুতার প্রান্তরে

টুকরো টুকরো হওয়ার সংবাদ তাঁকে শুনতে হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মত বীর বাহাদুরের শাহাদাতের সংবাদ শুনতে হয়েছে।

এই দ্বীনের জন্য ছাহাবায়ে কেরামকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, বাড়ি ছাড়তে হয়েছে, সন্তানকে এতিম আর বিবিকে বিধবা করতে হয়েছে। আল্লাহর যমিনে আল্লাহ্‌র খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, তামাম দুনিয়ায় দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদী মিশন নিয়ে ছুটে গিয়েছেন। তাদের অনেকেই আর স্বজনদের কাছে ফিরে আসেন নি।

❑ হযরত আবু তালহা (রা) জিহাদ করতে গিয়ে বুখারার তপ্ত যমিনে শাহাদাত বরণ করেছেন।

❑ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) ইস্তাম্বুলে টুকরা টুকরা হয়েছেন।

❑ বদরী সাহাবী হিশাব বিন আস (রা)-এর টুকরো টুকরো দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল আজরাদিনের ময়দানে।

❑ নুমান বিন মুকাররাম (রা) রক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে ছিলেন নেহাওয়ান্দের ময়দানে।

❑ ইয়েমেনের সর্দার হযরত মুয়াম্মার (রা)) চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন নেহাওয়ান্দের ময়দানে।

❑ ওক্ববা বিন নাফে (রা) রক্তস্নাত অবস্থায় শায়িত হয়েছেন বিসফেরাত নামক স্থানে।

❑ তিউনিসিয়ার খুনরাঙ্গা প্রান্তরে ঘুমিয়ে আছেন হযরত আবু লুবাবা ও আবু জুম্মু (রা)।

❑ মাআবাদ ইবনে আব্বাস ও আবু ইবনে আব্বাস (রা) দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সোমালিয়াতে।

❑ হযরত কাসেম বিন আব্বাস (রা)-এর রক্তমাখা শরীর দাফন হয়েছে সমরকন্দে।

❑ হুযাইফা বিন মুসলিম আলবাহী (রা) ঘুমিয়ে আছেন ফারগানার কঙ্করময় প্রান্তরে।

❑ মাআজ বিন জাবাল (রা) শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন ইয়ারমুকের ময়দানে।

❑ উবায়দুল্লাহ্ বিন জাররার (রা), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা), যায়েদ বিন হারিসা (রা), জাফর বিন আবি তালিব (রা)সহ ২৫ হাজার সম্মানিত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন জর্দানের নিষ্ঠুর ময়দানে (মুতায়)।

❑ সত্তর জন সাহাবী লিবিয়ায় ও পাঁচ শত রয়েছেন মিশরে।

❑ ওক্ববা বিন আমের ও ফজল বিন আব্বাস (রা) শায়িত আছেন সিরিয়ায়।

❑ হযরত বাছির ইবনে কারাবা (রা) ছোট্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি হিযরত করে মদীনায় আসলে তাঁর মা-জননী ইন্তেকাল করেন। বাছির মাতার আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হন। ছোট্ট বাছির একা হয়ে গেলেন। এমন সময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। হযরত কারাবা (রা) মাছুম বাচ্চাকে হুজুর (সা)-এর নিকট রেখে

যুদ্ধে চলে যান। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী সাহাবীগণ গনিমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। কাফেলা মদীনার মসজিদের সামনে আসার সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনরা দৌড়ে আসতে লাগল। বালক-বালিকারা এসে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াতে লাগল। পিতারা আপন আপন সন্তানদের কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ সোহাগভরে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। ছোট্ট বাছির দৌড়ে এসে কাফেলা প্রদক্ষিণ করতে লাগল, কিন্তু তার আব্বুকে খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবছে, হয়ত তিনি মসজিদে নামায পড়ছেন। দৌড়ে গিয়ে মসজিদে খুঁজে না পেয়ে ভাবছে, হয়ত পেশাব-পায়খানার জরুরাতে গেছেন। এদিক-ওদিক খোঁজা-খুঁজি করেও কোথাও না পেয়ে বাছির কাঁদতে লাগল। বাছিরের কান্না দেখে মহানবীর চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল। দয়াল নবী কান্না সংবরণ করে বাছিরকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন, "বাছির! তুমি কেঁদো না, তোমার আব্বু শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি আর ফিরে আসবেন না। এখন থেকে আমিই তোমাকে আদর করব। আমাকেই আব্বা বলে ডাকবে।"

কত করুণ ঘটনা। রফিক এসব ঘটনা শুনিয়ে বলল, দ্বীনের সবগুলো দায়িত্ব তোমাকে আমাকেই পালন করতে হবে। কাজেই মূর্খের মত একটা নিয়ে থাকবে না।

[বিশ]

রফিক দাওরায়ে হাদীস পাশ করে এক বছর জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসল নিজ বাড়িতে। রফিকের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ল আশ-পাশের কয়েক মহল্লায়। এক নজর দেখার জন্য ও দোয়ার জন্য নেমে এলো জনতার ঢল।

রফিক গ্রাম, পাড়া ও মহল্লার ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সকলের সাথেই হাসি-খুশী ব্যবহার করল। ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নিল এবং সকলকে সাধ্যানুসারে আপ্যায়নও করাল। রফিককে পেয়ে সবাই আনন্দিত ও গর্বিত। রামাল্লার দু'চারজন আলেমের মধ্যে রফিক সকলের ঊর্দ্ধে। সে একজন তরুণ মুজাহিদ আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করল।

শুক্রবার। জুমুয়ার নামাযের জন্য তৈরি হচ্ছে মহল্লার ছোট বড় সবাই। দুপুর বারটার দিকেই মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেল। করিডোরের বাইরেও বাচ্চাদের তিন কাতার হয়েছে। কোন একজন পুরুষ লোকও নেই বাড়িতে।

আজকের জুমুয়ার নামাযের খুৎবা পাঠ করবে পল্লী সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানীর বড় ছেলে মাওলানা রফিক। রফিকের মামা মৌলভী আকরাম শয্যাগত। তাঁর পক্ষে নামায পড়ানো সম্ভব নয়। তাই রফিককেই বলেছেন, আজকের নামাযটি পড়িয়ে দিতে। রফিক নামায পড়াবে, খুৎবা দিবে। এ সংবাদ পেয়ে সুফিয়ানের সহচর, ছাদেক, ইমদাদ ও রঈছ আজ মসজিদে এসেছে। সুফিয়ানের অনুসারী এ তিন লম্পট এর আগে কোন দিন এমনভাবে মসজিদে আসত না। তবে সমাজের তীব্র চাপের মুখে মাঝে মধ্যে আসতে হত।

মুসল্লিরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নত আদায় করছেন। একটু পরেই মাওলানা রফিক একজন ফিল্ড মার্শালের মত মিম্বরে গিয়ে বসলেন। মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। মাওলানা রফিক মিম্বরের সিঁড়িতে পা রেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে এক অগ্নিঝরা ভাষণ দান করলেন। ভাষণের বিষয়বস্তু হল আফগানিস্তানে রুশী ফৌজের উপস্থিতি, ডঃ নজিবুল্লাহ্ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আফগান জনগণের করণীয় কি। তাছাড়া, তিনি জিহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। কখন, কার সাথে, কিভাবে জিহাদ করতে হবে এবং মুজাহিদের মর্যাদা ও শহীদের ফাজায়েল সম্পর্কে দীর্ঘ খুৎবা প্রদান করলেন।

উপস্থিত মুসল্লিগণ এমন তেজোদীপ্ত ভাষণ অতীতে কোন দিন শোনেন নি। বাচ্চা থেকে নিয়ে যুবক-বৃদ্ধ সকল মুসল্লির শিরায় শিরায় উষ্ণ শোনীতধারা তড়িৎগতিতে সঞ্চালন হচ্ছিল। তাঁরা রুশীদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম। মাওলানা রফিক খুৎবা শেষ করে নামায আদায় করলেন। অতঃপর সুন্নত আদায় করার সাথে সাথে মোল্লা সিকান্দর দাঁড়িয়ে বললেন, "উপস্থিত মুসল্লি সাহেবান! আজ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটি দুঃখজনক দসংবাদ আপনাদেরকে শুনাতে চাই। যা একটু আগে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পেয়েছি। সালাংপাশ গীরিপথ বেয়ে রাশিয়ান ফৌজ ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে এদিকে এগুচ্ছে। শুনেছি তারা অনেকগুলো বস্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। আলেম-উলামাদের ধরে নিয়ে তাদের বন্দী শিবিরে আটক রেখেছে। আমার সংশয় হচ্ছে, যেভাবে নরখাদক মানুষরূপী বন্য হায়েনারা এদিকে এগুচ্ছে তাতে যেকোন সময় আমাদের মহল্লা আক্রান্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়ে রাখা দরকার।"

পল্লী সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী বললেন, "প্রিয় এলাকাবাসী! মোল্লা সিকান্দর যা বলেছেন, তা সত্য। আমিও এ সংবাদ পেয়েছি। আত্মরক্ষার জন্য অবশ্যই আমাদের যে কোন ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে আজ বিকাল চারটার

সময় আমরা মসজিদে বসে পরামর্শ করব। এতে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হবে শুধু তাঁরাই থাকবেন, আর বাকিরা নিজ নিজ জায়গায় থেকে দিক-নির্দেশনার অপেক্ষা করবেন। গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই আমাদের এ সিদ্ধান্ত। কাজেই, এখন দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে দোয়া হবে। তারপর আমরা নিজ নিজ নিবাসে ফিরে যাব।" এই বলে পল্লী সর্দার বসে গেলেন।

মাওলানা রফিক দরুদ, ইস্তিগফার পড়ে মুসলমানদের অস্তিত্বের হেফাজতের জন্য দোয়া করলেন। দোয়ার পর সবাই বাড়ি চলে গেলেন। মাওলানা রফিক মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছেন এক বোঝা চিন্তা নিয়ে। ডঃ নজিবুল্লাহ সরকার এত তাড়াতাড়ি রাশিয়ান ফৌজ নিয়ে আসবেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি আনমনে হেটে হেটে বাড়িতে তাঁর আম্মার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে তিনি সালাম দিলেন, যদিও একটু আগে দেয়ার দরকার ছিল, কিন্তু চিন্তার কারণে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন।

সুফিয়া সে ঘরেই চারপায়ার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। মাওলানা ভাবছিলেন, তাঁর বোন রফিকা হয়ত নামায আদায় করছে। তাই চারপায়ার অপর এক কোণে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসলেন। সুফিয়া নামাযরত অবস্থায় কি করবে না করবে তা স্থির করতে পারছে না। সে চার রাকয়াত সুন্নত পড়েই কিভাবে ওখান থেকে কেটে পড়বে তা ভাবছে। এমন সময় রফিকা এসে বলল, "ভাইয়া! চলুন ও ঘরে, সেখানে আপনার খানা রেখে এসেছি।" রফিক রফিকাকে দেখে আঁত্‌কে উঠলেন। "তাহলে নামাযরতা মেয়েটি কে?" আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখছেন। যদিও বড় চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত, তারই একটু ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চন্দ্র তুল্য চেহারার একটু ঝলক বাইরে প্রকাশ পেল।

মাওলানা রফিক রফিকাকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটি কে? এত সুন্দর করে নামায পড়ছে?"

"রফিক ভাইয়া, একে চিনেন নি? এতো আপনার রাখাল জীবনের সেই মেয়েটি। যাকে নিয়ে আপনি---।"

মাওলানা রফিক আবার একটু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চার চোখের মিলন হয়ে গেল। সুফিয়া সালাম ফিরাচ্ছে আর রফিক তাকাচ্ছেন। তাই একে অপরকে দেখে ফেলল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করল, "রাখাল জীবনের সেই মেয়েটি তার মানে?"

"কেন! ভুলে গেলেন সুফিয়াকে? শিশুকালে যখন ধুলো-বালু নিয়ে খর্জুর বাগানে বসে খেলা করতেন, তখন আপনি হতেন রাজা আর সে হত রানী।

চারণভূমিতে মেষপালগুলো ছেড়ে দিয়ে যখন খেলায় হারিয়ে যেতেন তখন যে আপনার মেষপালগুলো দূর থেকে তাড়িয়ে আনত। যার বকরীগুলোকে আপনি পানি পান করাতেন। এতো সেই সুফিয়া। আপনি যার হারিয়ে যাওয়া বকরীগুলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে তালাশ করে ওদের খোয়াড়ে তুলে দিয়ে আসতেন। মাওলানা হওয়ার পরে বুঝি বাল্যস্মৃতি সবই ভুলতে বসেছেন?"

"অ ...... এই সেই সুফিয়া! যার করুণ কাহিনী ও মর্মান্তিক ঘটনা প্রবাসে থেকে শুনেছি। ওর কথা ভাবতে গিয়ে অনেক চোখের পানি ঝরিয়েছি, অনেক দোয়া করেছি। এতো সেদিনের ছুট্ট খুকী। আজ তো দেখি অনেক ....।"

সুফিয়া সালাম ফিরিয়ে তেড়ে ভাগল। লুকাল গিয়ে আল্‌নার আড়ালে। দাঁড়াল লজ্জাবনত মস্তকে। সুফিয়ার অন্তরে বাল্যকালের স্মৃতিরা এসে তড়িৎ তরঙ্গে খেলা করছে। ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসছে সুফিয়ার কোমল হৃদয়ে।

মাওলানা রফিক নতশীরে কি যেন ভাবছেন। কোন বাক্যই যবান থেকে নির্গত হচ্ছে না। রফিকা বলল, "ভাইয়া! আব্বু খানা নিয়ে আপনার জন্য ইন্তেযার করছেন। চলুন না ও ঘরে।" রফিক নিরুত্তর। এক পর্যায়ে রফিক সুফিয়াকে লক্ষ করে বললেন, "সুফিয়া! তোমার কলিজা ছেঁড়া দুঃখ-বেদনায় আমিও মর্মাহত। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর ওপর যা আসে তা অম্লান বদনে মাথা পেতে নিতে হয়। এর মধ্যেই বান্দাহর কামিয়াবী, তুমি চিন্তা করো না। তোমার সুন্দর ফায়সালা আল্লাহ্ করবেন", এ বলে খানা খেতে ওঘরে চলে গেলেন। রফিক ওঘরে চলে যাওয়ার পর, রফিকাকে লক্ষ করে সুফিয়া বলল, "আপু! এখন তো আমরা রফিক ভাইয়ার কাছে দু' একটি কিতাব পড়তে পারি, পড়াবেন কি উনি?"

"সুফিয়া! তোমার প্রস্তাবটা খুবই সুন্দর। মামার পক্ষে সবগুলো কিতাব একা পড়ানো খুবই কষ্ট কর। একসাথে অতগুলো কিতাব মুতালা করা একার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে? যে দিনই উস্তাদজী মুতালা ছাড়া আসেন সেদিনই ছবক বুঝে আসে না। আমি ভাইয়াকে অবশ্যই বলব। আশা করি আমাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবেন না।

মাওলানা রফিক খানাপিনা সেরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর চোখে ঘুম আসছে না। দেশের অবস্থা নিয়ে অনেক ভাবছেন তিনি। তাছাড়া, আর একটি চিন্তা পেয়ে বসল তাঁকে। সুফিয়ার অসহায়ত্বের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর মাথা নষ্ট হওয়ার উপক্রম। সে আজ দুঃখিনী, হতভাগিনী, অসহায়িনী! দুনিয়াতে তার আপন বলতে কেউ নেই। মাওলানা রফিক মনে মনে স্থির করলেন যে, সুফিয়ার মত পরমা সুন্দরী,

বুদ্ধিমতী, দ্বীনদার, পরহেজগার মেয়ে তেমন একটা পাওয়া যায় না। তাকে বউ করে ঘরে তুলে আনলে কেমন হয়? কিন্তু আম্মু-আব্বু যদি দ্বিমত পোষণ করেন।

ইস! কি সুন্দর চেহারা! কি তার চাহনী! সুঠোল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এসব কিছু ভাবতে গিয়ে রফিক নিজেকে হারিয়ে ফেললেন সুখের অরণ্যে।

এমন সময় রফিকা সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "ভাইয়া আপনি তো বড় আলেম হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আমরাও বাড়িতে থেকে ইমাম সাহেবের নিকট কিছু কিতাবাদি পড়েছি। বর্তমানে মিশকাত শরীফ পড়ছি। উস্তাদজীর পক্ষে এখন সবগুলো কিতাব পড়ানো সম্ভব নয়। তাই সুফিয়া প্রস্তাব দিয়েছে আপনার কাছে কয়েকটি কিতাব পড়তে। আপনি যদি রাজি হন তবে খুবই উপকার হবে।"

মাওলানা রফিক হাসতে হাসতে বললেন, "আরে তোমরা মিশকাত শরীফ পড়ছ? তা তো জানি না। এত এগিয়ে গেলে কিভাবে?" রফিকা বলল, "উস্তাদজী আমাদেরকে আসল কিতাবগুলো পড়িয়েছেন। এভাবে আমরা এ পর্যন্ত সহজেই আসতে পেরেছি।" রফিক বললেন, "তোমাদের পরীক্ষা নিতে হবে, দেখি কেমন পড়েছ।" তারপর তিনি একটু ঠাট্টা করে বললেন, "সুফিয়াকে কি আমি পড়াতে পারব? তার ইলম তো আমার থেকে বেশি।" সুফিয়া দাঁড়িয়েছিল একটু আড়ালে। কান ছিল খরগোস ছানার মত খাড়া। কি বলছেন তা শুনছিল। সুফিয়া আড়াল থেকে বলে উঠল, "রফিক ভাইয়া বিদ্রূপ করছেন। আমি মেয়ে মানুষ, ছেলেদের মত এত বুঝি না। দয়া করে পড়ালে আমাদের ফায়েদা হত, পড়াবেন কি?"

রফিক ঃ মেয়েদের এত পড়ার দরকার কি? দু'দিন পরে তো বিয়ে হয়ে যাবে। বউ হবে, মা হবে, সংসারী হবে, তাহলে এত পড়া-পড়ির দরকার কি?

সুফিয়া ঃ আমার মত দুঃখিনী হত ভাগিনীর আবার বিয়ে? এমন কোন বোকা ছেলে আছে, যে আমাকে পছন্দ করবে? যার সংসারে কেউ নেই, ডান, বাঁ সবই খালি, নেই চেহারার শোভা, নেই বিদ্যাবুদ্ধি, এমন মেয়েকে কে কবুল করবে?

রফিক ঃ তুমি ওসব কি বকছ? কেউ যদি তোমাকে পছন্দ করে তবে ......।

সুফিয়া ঃ না, ওসব বাজে কথা। বলুন, পড়াবেন কিনা?

রফিক ঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করতে চাইলে তো পড়াতেই হয়, কিন্তু পর্দা তো ফরয।

সুফিয়া ঃ আমরা কি আপনার সামনে এসে বসব? আমরা পর্দার আড়ালে বসব।

রফিকা হেসে হেসে বলল, "পর্দার যদি সমস্যাই হয় তবে জায়েয করে নেব।"

"কিভাবে জায়েয করবে রফিকা?" "কেন ভাবী বানিয়ে নেব।" রফিক খানিকটা লজ্জিত হয়ে হাসলেন এবং বললেন, "এসব কি বলছিস? সুফিয়া আমাদের

মেহমান, তার দেখা-শোনা করা, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। ওসব কথা বললে ওর মনে আঘাত লাগবে। আর কোন দিন যেন ওসব কথা না শুনি।"

"ভাইয়া! আপনি রাগ করেছেন বুঝি? ছোটকাল থেকে আমরা একসাথে চলাফেরা করেছি। বাকি দিনগুলোও একই সাথে কাটাতে চাই। আম্মু-আব্বুকেও চুপি চুপি এ ধরনের আলাপ করতে শুনেছি।" তারপর সুফিয়ার বীরত্বগাঁথা অতীতের ঘটনাবলি আস্তে আস্তে ভাইয়ের নিকট প্রকাশ করল। রফিক আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এদিকে গ্রামের এক ব্যক্তি এসে রফিককে ডেকে বললেন, "মসজিদে দাওয়াতী মুসল্লিরা সবাই এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

মাওলানা রফিক শয্যা থেকে ওঠে পোশাক পরিধান করে মসজিদে চলে গেলেন। দাওয়াতী মুসল্লি ছাড়াও ছাদেক, এমদাদ, রঈছ ও কানা ফালু এসেছে। এরাই ছিল সুফিয়ানের সহচর ও কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী। পল্লী সর্দার ওদেরকে দেখেই অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "কিরে! তোদের কে খবর দিয়েছে? তোরা আবার মুরুব্বী হলি কবে? আমরা বিশেষ পরামর্শে বসছি। তোদের এখানে প্রয়োজন নেই। দরকার হলে পরে জানাব। যা এখন চলে যা।" সর্দারের ধমক শুনে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে ওরা মসজিদ ত্যাগ করল।

এবার দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নানা জনে নানা ধরনের আলোচনা করলেন। সকলের প্রায় একই কথা যে, রুশী ফৌজের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য এক অশুভ সংকেত। মা-বোনদের ইজ্জত আবরু রক্ষা ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। সালাংপাশ গীরিপথের দু'ধারে ওরা অনেক পরিখা তৈরি করেছে। প্রতিনিয়ত চলছে মুসলিম হত্যা, লুটতরাজ ও মা-বোনদের ইজ্জত হরণ। আমাদের উপরও আক্রমণ হওয়া এখন নিশ্চিত, বললেন গ্রামের অপর এক মুরুব্বী।

মাওলানা আকরাম সাহেব বললেন, "আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধা করতে হবে। তাই আমি মনে করি, এলাকার সব যুবকদেরকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার ও মোকাবেলা করার মত শক্তি অর্জন করব।"

মাওলানা রফিক বললেন, "বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের জনগণের ওপর জিহাদ করা ফরযে আইন।" তিনি বলেন, "জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার জন্য শর্ত হল ৪টি, যথা–

(১) কাফেররা যুদ্ধের জন্য কোন মুসলিম দেশে প্রবেশ করলে।
(২) কাফের ও মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হলে।
(৩) মুসলমানদের আমীর যুদ্ধের আহ্বান জানালে।
(৪) কোন একজন মুসলমান নারী বা পুরুষ কাফেরদের হাতে বন্দী থাকলে।

এর যে কোন ১টি শর্ত পাওয়া গেলে সকলের ওপরই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।" তিনি আরো বলেন, "সব মাযহাবের ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের অভিমত হল, উক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সকলের ওপরই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তখন সন্তান মাতা-পিতার ইজাজত ছাড়া, স্ত্রী স্বামীর ইজাজত ছাড়া, গোলাম-মনিবের ইজাজত ছাড়া, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার পাওনাদারের ইজাজত ছাড়াই জিহাদে যেতে পারবে। কারো ইজাজতের প্রয়োজন হয় না।" তিনি আরো বলেন–

"শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, "মুসলমানদের ইজ্জত, আবরু, সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং দ্বীনের ওপর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা ঈমানের পরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন। এতে জিহাদের ছামানা যেমন- তীর, ধনুক, ঢাল, তরবারী, বর্শা, শিরস্ত্রাণ, গোলা-বারুদ, ছাওয়ারী, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ইত্যাদির ব্যবস্থা না থাকলেও জিহাদ করতে হবে। আহনাফসহ সব মাযহাবের মতামত এক। (ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ্, ফতোয়ায়ে কুবরা সংযুক্ত, ৪র্থ খণ্ড ৬০৮ পৃঃ)

উক্ত আলোচনা শুনে সকলেই জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ও জিহাদ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। অতঃপর এলাকার যুবকদেরকে নিয়ে পরদিন আবার পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেলেন।

[একুশ]

পল্লী সর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী সর্দার পত্নিকে নিয়ে পরামর্শ করলেন রফিকের বিয়ের ব্যাপারে। সর্দারজী বললেন, "ছেলে লেখা-পড়া শেষ করে আলেম হয়ে দেশে ফিরেছে। বিবাহের উপযুক্ত সময় এটাই। কাজেই বিলম্ব না করে তার জন্য কনে দেখা দরকার।"

সর্দার পত্নী স্বামীর কথা শুনে বললেন, "আপনার প্রস্তাব যথার্থ। পিতা-মাতার ওপর দায়িত্ব সন্তান উপযুক্ত হলে বিবাহ দেয়া বা করানো। আপনার চিন্তা-চেতনায় আমি একমত। তবে কথা হল, কনের জন্য বাইরে খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন কি? কারণ, আজ বেশ ক বছর যাবত সুফিয়াকে আমরা দেখ-ভাল করে আসছি। তার স্বভাব-চরিত্র ও মন-মানসিকতা আমার জানা। চেহারা, নমুনা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও

ইলম-আমলের দিক দিয়ে শত মেয়েকে হার মানাবে। কাজেই আমার প্রস্তাব হল ছেলে-মেয়েকে প্রস্তাব দিলে, উভয়ে যদি এতে সম্মত হয় তবে শুভ কাজ সমাধা করা হোক। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?"

সর্দারজী পত্নার কথা শুনে হেসে বললেন, "আরে! তোমার পুত্রবধূ যদি তোমার পছন্দ হয় তবে এতে আমার দ্বিমত থাকবে কেন? তোমার আমার মতের মধ্যে কোন ফারাক নেই। তাহলে ছেলে-মেয়ে উভয়ের মত যাচাই করা হোক।"

সর্দার পত্নী রফিকাকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন, "তুমি তোমার ভাইয়া ও বান্ধবী সুফিয়ার মতামত জানার চেষ্টা কর। দেখ, ওদের মতামত কি?" তিনি এটাও বলে দিলেন যে, "আমাদের প্রস্তাব লক্ষ করে যেন ওদের মত প্রকাশ না করে। এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে তুমি খুব অভয় দিয়ে তাদের ভালভাবে বুঝাবে। তাছাড়া, এদের পক্ষ থেকে কেউ যদি অন্য কোন প্রস্তাব দেয় তাও দিতে পারে এটা তাদের ইখতিয়ার। অন্য প্রস্তাব দিলে তাও আমরা বিবেচনা করে দেখব। এ বলে রফিকাকে তাদের নিকট পাঠালেন।

রফিকা এ সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা। প্রথমেই দৌড়ে সুফিয়ার পড়ার রুমে ঢুকল। সুফিয়া তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে অতীত ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছে। এমন সময় রফিকা এসে হাসতে হাসতে বলল, "কি গো সুন্দরী! শুয়ে-শুয়ে কি ভাবছ? আর একা একা ভাবতে হবে না। এবার দু'জনে এক হয়ে ভাবনার ব্যবস্থা করে দেব। তোমার বিছানায় আর একজনকে দেব তোমার চিন্তার ভাগিদার হতে, তোমার ব্যথায় ব্যথিত হতে, তোমার দুঃখে দুঃখিত হতে। তাকে স্থান দেবে কি সুন্দরী?"

সুফিয়া তার কথা প্রথমে বুঝতে পারে নি। তাই বলে উঠল, "এমন হতভাগা কে আছে এ সংসারে, যে আমার ব্যথায় অংশ নেবে? এমন দরদী পাব কি কখনো?" রফিকা হাসতে হাসতে বলল, "আরে তোমার সরোবরে পদ্ম ফুটেছে। ভাগ্য খুবই প্রসন্ন। যদি তা মানতে পারিস।" অতঃপর তার পিতা-মাতার প্রস্তাব তাকে শুনাল।

সুফিয়া এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত করে বলল, "আমি চাই না কেউ আমার মত চির দুঃখিনীকে গ্রহণ কর শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হোক। চাই না শ্যালক-শ্যালিকার দুলা ভাই ডাক শ্রবণ থেকে মাহরুম থাকুক। তাকে এখন বিবাহ করে ঝামেলা না বাড়িয়ে আফগান জাতিকে রুশীদের কবল থেকে রক্ষা করা, আলেম-উলামা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করাই আমি শ্রেয় মনে করি। রফিক ভাইয়া, ইলম-আমলে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, চেহারা-নমুনায় ও অর্থ-সম্পদে কম নয়।

তাকে আমরা উচ্চ বংশের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করাব। আমার মত দুঃখিনীকে কেন তিনি গ্রহণ করবেন? এমন সুপুরুষের কাছে বিয়ে দিতে অমত করবে না কেউ। কাজেই অন্য চিন্তা করুন। আমি জিহাদ করতে করতে জীবনের যবনিকা টানব। শাহাদাত বরণ করব।" সুফিয়ার মনোবল ছিল অটল, অবিচল।

রফিকা সুফিয়ার মনোভাব হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রেখে ছুটে গেল রফিকের নিকট। আস্তে করে সালাম জানিয়ে প্রবেশ করল গৃহাভ্যন্তরে। রফিক সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রফিকা, কিছু বলবে কি? রফিকা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ ভাইয়া, কিছু বলতে এসেছি। এই বলে রফিকের সাথে সুফিয়ার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করল। রফিক একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, রফিকা! এ প্রস্তাব কি তোমার পক্ষ থেকে, না অন্য কারো?

রফিকা ঃ আম্মু-আব্বুর পক্ষ থেকে। তাঁরা এ নিয়ে পরামর্শ করেছেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করার না করার আপনার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। সুফিয়াকে গ্রহণ না করে যদি অন্য কোন মেয়ের প্রস্তাব দেন, তাও তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন। বলুন কি করবেন। এখনই আপনাদের অভিমত নিয়ে তাঁদের কাছে যেতে হবে, বলুন কি করবেন?

মাওলানা রফিক ঃ এ প্রস্তাব যদি আম্মু-আব্বুর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে আমার দ্বিমত থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, সুফিয়ার মত গুণবতী, রূপবতী মেয়ে খুব কমই আছে। আম্মু-আব্বুর পছন্দই আমার পছন্দ। তবে এতে আমার একটু কথা রয়েছে, তা হল ডঃ নজিবুল্লাহ্ সরকার আফগানিস্তানকে রুশ সরকারের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। হাজার হাজার রুশী ফৌজ ইতিমধ্যেই ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এদিকে ধেয়ে আসছে। মুসলমানদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। দোকানপাট লুট করছে। নির্বিচারে আলেম-উলামাদের শহীদ করছে। এ আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষার জন্য মুজাহিদরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। জিহাদের জন্য আমিও তৈরি হচ্ছি। যে কোন মুহূর্তে আমি জিহাদে চলে যেতে পারি। আর এ যাওয়াটাই হতে পারে আখেরী যাওয়া, হয়ত আর ফিরে আসব না। এমতাবস্থায় বিয়ে করে কোন মেয়ের জীবনকে নষ্ট করা সমীচিন মনে করি না। তবে আমার এসব কথা সুফিয়াকে বলে তার মতামত নাও।

রফিকা ঃ ভাইজান, আমি একটি কথা বলব, রাগ করবে না কিন্তু। মনে হয় তোমরা দু'জনে তলে তলে খাতির জমিয়েছ এবং পরামর্শ করেছ। তা না হয় দু'জন একই ধরনের কথা কিভাবে বলছ? আমি কি ঠিক বলি নি ভাইয়া?

মাওলানা রফিক মৃদু হেসে বললেন, "তা হলে কি সুফিয়ার সাথে মত বিনিময় করেছ? কি বলেছে সে?"

রফিকা ঃ ভাইয়া, সে প্রথমে তার অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে বলল, "আমার মত হতভাগিনীকে বিয়ে করে শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর-সোহাগ থেকে কেউ বঞ্চিত থাকুক তা আমি চাই না। তাছাড়া, বর্তমানে আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের ওপর চলছে রুশীদের আগ্রাসী আক্রমণ। এহেন পরিস্থিতিতে বিয়ে করে ঝামেলা বাড়ানোর চেয়ে জিহাদ করে শহীদ হওয়াটাই আমার নিকট শ্রেয়।"

রফিকার যবান থেকে সুফিয়ার উক্তিগুলো শুনে রফিক হয়রান -পেরেশান হয়ে গেলেন। একি! একজন অবলা নারীর মুখে জিহাদের কথা! একজন নারীর অন্তরে এ ধরনের ভাব কিভাবে উদয় হল? তা হলে এমন একজন মহিয়সী ও বীরঙ্গণা নারীর খিদমত করতে পারলে জীবন ধন্য মনে করব। আমি তার খিদমতে নিজেকে পেশ করব। জিহাদের আকাঙ্ক্ষা আর শাহাদাতের বাসনা কয়জন মহিলার মধ্যে পাওয়া যায়? না এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। রফিক সুফিয়াকে বিয়ে করার জন্য সর্বান্তকরণে রাজি হয়ে গেলেন।

ভাই-এর সম্মতি পেয়ে রফিকা খুশীতে টগবগ করতে করতে সুফিয়ার গৃহে গিয়ে বলল, "সুফিয়া, ভাইয়া তো তোমার প্রতি খুবই অনুরাগী। তিনি বিয়েতে রাজি হয়েছেন। তুই এতে অমত করিসনে।"

এখন থেকে কিন্তু তুমি আমার -------।

রফিকার কথা শুনে সুফিয়ার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। রফিকার বুঝতে বাকি নেই যে, সুফিয়া রাজি হয়ে গেছে। অতঃপর রফিকা তার পিতার কাছে গিয়ে উভয়ের মতামত ব্যক্ত করল। সর্দারজী পত্নীর সাথে তাদের মতামত ব্যক্ত করে বললেন, "শুভ কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।" পত্নী বললেন, "কথা তো ঠিকই। আমাদের প্রথম ছেলেকে বিবাহ করাব, এতে পাড়া-পড়শী, গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজনদের জিয়াফত করতে হবে। সে হিসেবে প্রস্তুতিও নিতে হবে। আজই একটি তারিখ নির্ধারণ করুন।"

সর্দারজী পনর দিন সময় হাতে নিয়ে একটি তারিখ সাব্যস্ত করলেন। পর দিনই মুখে মুখে সুফিয়ার বিবাহের কথা ছড়িয়ে পড়ল এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়িতে, এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায়, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। প্রতিদিনই সুফিয়ার বান্ধবীরা দলে দলে এসে সুফিয়ার সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগল। সর্দারজীর পক্ষ থেকে গ্রামের ঘরে ঘরে ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বাড়ি দাওয়াত পৌঁছান হল।
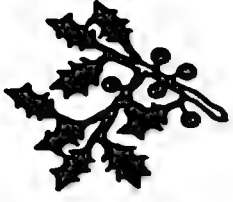
[বাইশ]

পরদিন বিকাল তিন টায় এলাকার সব যুবক এসে জড়ো হল সর্দারজীর আঙ্গিনায়। কেন যুবকদের ডাকা হল তা অনেকেরই বোধগম্য নয়। সকলের মনে মনে একটাই ধারণা, সর্দারজী হয়ত বিশেষ কিছু বলবেন বা গুরুত্বপূর্ণ কোন একটি কাজের হুকুম দিবেন।

মাওলানা রফিক উর্দী পরিধান করে বেরিয়ে এলেন বহিরাঙ্গিনায়। সকলকে লক্ষ করে সালাম দিলেন। সবাই সালামের উত্তর দিয়ে রফিকের নূরানী চেহারার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। রফিক সবাইকে বসার জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন-

"হে আমার প্রিয় এলাকাবাসী, আজ আমি আপনাদের সম্মুখে কুরআন-হাদীসের আলোকে হৃদয় খুলে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করেছি। আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে সচেষ্ট হবেন।"

"হে আমার প্রাণ প্রিয় যুবক ভাইয়েরা! বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তি রাশিয়ার পুতুল সরকার ডঃ নজিবুল্লাহ সাহেব আমাদের দেশের ক্ষমতা দখল করার সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সচিব থেকে নিয়ে অফিস, আদালত, মিল-ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা, সরকারী, আধা-সরকারী, শায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, হাসপাতাল ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কম্যুনিস্টপন্থী দেখে বড় বড় পদে বসান হয়েছে। দেশ ও দ্বীন প্রেমিক যত কর্মকর্তা ছিলেন ওদের মধ্যে কাউকে পেনশন দিয়ে আবার কাউকে চাকরিচ্যুত করে সরিয়ে দিয়েছেন। সারা দেশে চলছে- অরাজকতা, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিত। মুসলমানদের বসবাস করার মত পরিবেশ এখন আর আফগানিস্তানে নেই।"

"হে আমার তরুণ ভাইয়েরা! আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মা-বোনরা কেউই নিরাপদে নেই। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অবহেলিত-এ ফরয বিধানকে আবার জিন্দা করতে হবে। দলে দলে শাহাদাত বরণ করতে হবে। তাছাড়া দ্বীন-ধর্ম, ইজ্জত-আবরু ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করে দেশ রক্ষা করা।" তিনি আরো বললেন–

"দেশকে আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিজীবি, বুদ্ধিজীবি, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে

বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, ছেলে-মেয়ে সকলেরই সাধ্যানুসারে জিহাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। কেউ জান দিয়ে, কেউ মাল দিয়ে, কেউ পরামর্শ দিয়ে, কেউ দোয়া দিয়ে, কেউ সন্তান-সন্ততি দিয়ে সকলকে জিহাদে শরীক হতে হবে। শুধু দোয়া আর খতমে কাজ হবে না। দোয়া তখনই কবুল হবে, যখন আমরা দৃঢ়পদে শত্রুর মোকাবেলা করে যাব।" তিনি আরো বলেন–

"আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেছেন, "মুসলিম ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে কাফেররা মুসলিম সীমান্তে প্রবেশ করলে তাদেরকে প্রতিহত করা পর্যায়ক্রমে সকল দেশের মুসলমানদের ওপর ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামে ভুখণ্ডগত সীমারেখার কোন গুরুত্ব নেই। এমতাবস্থায় কেউ কারো ইযাজতের অপেক্ষা করবে না। ইমাম আহমদ (রহ)-এর অভিমত এটাই। এই পরিস্থিতিকে শরীয়তের পরিভাষায় নফীরে আম (সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন) বলা হয়। (ফতোয়ায়ে কুবরা ৪র্থ খণ্ড ৬০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

ঃ "তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে; এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তাওবা ৪১নং আয়াত)

ঃ যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ জিহাদে বের না হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা তাওবা ৩৯নং আয়াত)

ঃ আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ) বলেন, "তাবুক যুদ্ধের বছর নবী করীম (সা)-এর সাথে মিলিত হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে হুকুম করেন। উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা জিহাদ সকলের ওপরই ফরয হওয়া প্রমাণ করে। জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা বা জিহাদ না করা গুনাহে কবীরা।"

"প্রিয় বন্ধুরা, এখন থেকে আপনাদেরকে জান ও মাল দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে উলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, পীর-মাশায়েখ ও ডাক্তার, প্রফেসর এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতোমধ্যেই কিছুসংখ্যক লোক পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে প্রশিক্ষণের জন্য ঘর ত্যাগ করেছেন। যারা জিহাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে–

মাওলানা কমান্ডার জালালুদ্দীন হাক্কানী
মাওলানা আরসালান খান রহমানী
মাওলানা পীর মুহাম্মদ রূহানী
বুরহান উদ্দীন রব্বানী

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী
আব্দে রাব্বি রাসূল সাইয়াফ
মাওলানা আবদুর রাহমান ফারূকী
মাওলানা ইলিয়াস কাশ্মীরী
মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম
মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ্
মাওলানা খালেদ জুবায়ের
মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুর লেথড়িয়াল
গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার
আহমদ শাহ মাসউদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

"এদের মধ্য থেকে আমরা মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের নেতৃত্বে জিহাদ করার ইচ্ছা রাখি। এতে যদি আপনারা একমত হন তবে কথা দিতে পারেন।"

মাওলানা রফিক সাহেবের কথা শুনে এক নওজোয়ান দাঁড়িয়ে বলল–

"হে আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা, এ ব্যাপারে আমাদের মতামতের কোন প্রয়োজন মনে করি না। কেননা, আমরা সবাই অজ্ঞ, ডান-বাম কিছুই বুঝি না। আপনার সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত। আপনি আমাদের কমান্ডার। আপনি যা নির্দেশ করবেন, আমরা তা-ই করব। যে দিকে যেতে বলবেন, সেদিকেই যাব। এখন আপনি কবে, কোথায় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়াবেন তা জানিয়ে দিন। তাছাড়া, কি কি ছামানা আমাদের সাথে নিতে হবে তাও বলে দিন।"

একথাগুলো বলে যুবকটি সকলের মতামত জানতে চাইলে একবাক্যে সবাই বলে উঠল, "তোমার কথায় আমরা সবাই একমত। আমাদের কথা তুমি বলেছ।"

মাওলানা রফিক সকলের মতামত জেনে বিশ দিনের সময় দিয়ে বললেন, "এখন থেকে বিশ দিন পর আমরা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করব। আপনারা এ বিশ দিনের মধ্যে যে যেই কাজ জানেন, সে সেই কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ভাড়া নিজেদের বহন করতে হবে। সকলকে যার যার সামর্থ্যানুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় করতে হবে। অস্ত্র ছাড়া দুশমনের সাথে কি দিয়ে মোকাবেলা করবেন? কাজেই নিজের হাতিয়ার নিজেকে সংগ্রহ করতে হবে।"

মাওলানা রফিক আরো কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে সবাইকে দোয়া ও ধন্যবাদ দিয়ে মিটিং এর সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অতঃপর কামিয়াবীর জন্য দোয়া করে বিদায় দিলেন।

যুবকদের অন্তরে জিহাদের যজবা ও শহীদ হওয়ার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হল। সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল।

মাওলানা রফিকও অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সুফিয়া ও রফিকাও আজকের আলোচনা মন দিয়ে শুনছিল।

[তেইশ]

ঈদের ছুটি কাটিয়ে পল্লী অঞ্চলের চাকরিজীবিরা দলে দলে শহরাভিমুখে ছুটে চলছে যার যার কর্মস্থলে। শিক্ষানবিসরা গ্রাম ছেড়ে চলছে শিক্ষালয়ে বা হোস্টেলে। অন্যদের মত মাহমুদা ও আতিকারাও কলেজের উদ্দেশ্যে ঘর ত্যাগ করছে। আবার কখন তাদের দেখা-সাক্ষাত হবে তা কে জানে? তারা কিছু পথ একসাথেই যেতে পারবে। তারপর এক একজন এক এক দিকে চলে যাবে। তাই শেষ বারের মত পরস্পরে কিছু আলাপ সেরে নেয়ার দরকার।

আতিকা মাহমুদাকে বলল, "আপা, সুফিয়া তো তার জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। সুফিয়া যদিও আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায়া কিন্তু এখন আর সে অসহায়া নয়। কিছু দিনের মধ্যে তার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হবে। তার দেখ-ভাল করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আশ্রয়স্থলও পেয়ে গেছে। যদিও আমাদের চেয়ে বয়স তার কিছুটা কম তবুও সে সকলের আগেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। মনের মত স্বামী পেয়েছে। চেহারা নমুনা আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও সহায় সম্পদও অঢেল।"

মাহমুদা বলল, "সত্যিই তার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন। তবে আমিও বাসায় গিয়ে কোন একটি ঘটাব। মামা ও মামানী আমার পথের কাঁটা। তারা না থাকলে অনেক আগেই কোন একটা খবর পেয়ে যেতে।"

আতিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, দেখি আমিও কিছু করতে পারি কি না।"

একমনে এসব আলাপ করতে করতে ওরা বাস স্টেশনে এসে পৌঁছল। বাসের আওয়াজ শুনে ওদের ভ্রম ভাঙ্গল। অতঃপর উভয়ে যার যার পথে চলে গেল। মাহমুদা বিকাল চারটায় এসে জালালাবাদে মামার বাসায় পৌঁছল। মামা এডভোকেট জামাল আফগানী ভাগিনী মাহমুদার নিকট বাড়ির কুশলাদি জানলেন। জানলেন এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে। তাছাড়া, রাশিয়ান ফৌজের জুলুম-অত্যাচারেরও খোঁজ-খবর নিলেন। মাহমুদার যা জানা ছিল তা তার মামাকে বলল। মামী অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু টিফিন নিয়ে হাজির হলেন। মাহমুদা টিফিন সেরে বাগানে গেল। রোদের প্রখরতা অনেকটা মন্দিভূত। সে অল্পক্ষণ পরেই রক্তিম আভা ছড়িয়ে হারিয়ে যাবে নীল গগনে।

মাহমুদা তার প্রিয় ফুল গাছটির নিকট দাঁড়িয়ে সেদিনের স্মৃতিগুলো হৃদয়ে আঁকছে। তার আঁখিযুগল ভারি হয়ে আসছে অশ্রুতে। ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। কখনো নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে, কখনো পুষ্পরাজির স্নিগ্ধ হাসির মনোরম পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে তার চঞ্চল মনটি কোথায় যেন ডানা মেলছে। এভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ।

সন্ধা নেমে আসছে। আঁধার ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে। মাহমুদা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে বই-খাতা নিয়ে বসল। বইয়ের পাতায় পাতায় শুধু আলমের আলেখ্য দেখছে মাহমুদা। পার্কের লুকোচুরি, বাগানের খুঁটি ধরে দাঁড়ানো, জামা ছিঁড়ে বেন্ডেজ লাগানো, হাসপাতালে কিছু সময়। এসব স্মৃতিরা তাকে অস্থির করে তুলছে। মাহমুদার পড়ার বিষয়বস্তু যেন এগুলো।

এডভোকেট সাহেব পর্দার আড়াল থেকে মাহমুদার লেখা-পড়ার দৃশ্য দেখছেন। আসলে সে প্রকৃতিস্থ নয়, একজন উম্মাদিনী তা তিনি এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছেন। তিনি আরো দুকদম এগিয়ে রুমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই মাহমুদা চমকে গেল। তাড়াতাড়ি ইতিহাস বইটি খুলে পড়তে লাগল। এডভোকেট সাহেব রাগ সামলাতে না পেরে বলে উঠলেন–

"মাহমুদা, তোমার আব্বু বড় আশা নিয়ে তোমাকে আমার নিকট দিয়েছেন লেখা-পড়া করার জন্য। তাদের ধারণা আমার তত্ত্বাবধানে থাকলে তোমার লেখাপড়া ভাল হবে। আমিও যথাসাধ্য দায়িত্ব না এড়িয়ে যথাযথ পালন করার চেষ্টা করছি। আর তুমি কি-না প্রেম বিখারিণী সেজে বখাটে ছেলেদের পিছনে ঘুরছ। তুমি যদি লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হতে পার তাহলে উপযুক্ত বর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

মাহমুদা তার মামার কথা শুনে বলল, "মামুজান, আপনি ওসব কি বলছেন?"

এডভোকেট সাহেব রেগে দাঁত কটমট করতে করতে বললেন, "বেহায়া কুলাঙ্গার, আবার আমার সামনে মুখ খুলছিস? একটু ভয় নেই তোর অন্তরে। আমি কি প্রমাণ ছাড়া তোর ওপর মিথ্যা অভিযোগ করছি। এই দেখ তার প্রমাণ।" এই বলে আলমের একটি চিঠি ওর টেবিলে ছুঁড়ে মেরে নিজ গৃহে গিয়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। মাহমুদা তার মামার গতিবিধি লক্ষ করে রুমের ছিটকারী লাগিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

"প্রিয় মাহমুদা,

লিপির শুরুতে নিস তোর হতভাগা বন্ধুটির হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা, প্রাণঢালা অভিনন্দন, প্রস্ফুটিত গোলাপের স্নিগ্ধ হাসি ও গালভরা চুমু। আশা করি ঈদের ছুটিতে আপন বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে খুবই আনন্দ উপভোগ করছিস। আজ বেশ কদিন গত হতে চলছে তোমার সুন্দর মুখখানা দর্শন থেকে বঞ্চিত। ক্ষণিকের তরেও তোমাকে ভুলে থাকতে পারি নি। তুমি যদিও চোখের আড়ালে, আসলে মনের আড়ালে নও। তোমাকে হারিয়ে এখন আমি উম্মাদের মত ছুটোছুটি করছি। তুমি ফিরে এসেছ মনে করে দু'দিন তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। হায় দুঃখ, গেটে তালা ঝুলানো দেখে দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে এসেছি।

ওগো মাহমুদা, তুমি না বলেছিলে, আমার ভালবাসা কোনদিন ভুলবে না। তাহলে এত দিন কি করে ভুলে থাকতে পারলে? তোমার তুলতুলে নরম হাতের লিখা প্রাঞ্জল ভাষার চিঠিখানা বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়। এত দিনে হয়ত কলেজে ফিরে এসেছ। তাই কলেজের ঠিকানায় পত্রটা প্রেরণ করছি। যদি তোমার হস্তগত হয় তবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা না করে সে দিনের মত সোজা আমার অফিসে চলে এসো। আমি তোমার আগমনের অপেক্ষায় পথপাণে চাতকের মত চেয়ে আছি।

প্রিয় মাহমুদা, এন. জি. ও. অফিসারদের তিন দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ চলছে। আগামীকাল অর্থাৎ ১৩ তারিখে শেষ হয়ে যাবে। তাই ১৩ তারিখের পরে আসবে কিন্তু। তা না হয় ....। ইতি তোমার মঙ্গল কামনায়–

আলম খান
৩/ক, এন. জি. ও. ভবন
জালালাবাদ।

পত্রখানা কলেজের কেরানী সাহেব এডভোকেট সাহেবকে দিয়ে দিল মাহমুদাকে দেয়ার জন্য।

পত্র পাঠ করে মাহমুদার অন্তরে নির্বাপিত প্রেমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল। মাহমুদা ছটফট করছে। কি যেন ভেবে টেবিলের বই-পুস্তক ও খাতা-কলম ছুঁড়ে মারল। নারী জীবনের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে লাইট বন্ধ করে বাগানের এক প্রান্তে এসে বসল। আর কোন দিন লেখাপড়া করবে না এমন তার ইচ্ছা। সে নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা দিতে দিতে বলল, "আরে হতভাগিনী, পোড়ামুখী, একেতো তুই নারীকূলে জন্ম নিয়েছিস। আবার মুসলিম ঘরে।

স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও এন. জি. ওতে চাকরিজীবি কত মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করছে, গণ্ডায় গণ্ডায় বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে নিয়েছে। ওদের জীবন কতই না সুন্দর, কতই না উত্তম। ওরা বাধার প্রাচীর মাড়িয়ে প্রতিরোধ তোরণ ডিংগিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে। আলম ভাইয়ার কথাগুলো যথার্থ। ওর পরামর্শই সঠিক। ধিক্কার ধর্মের, ধিক্কার এ সমাজের। ধিক্কার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের। নিজের ভবিষ্যত নিজেই বেছে নিতে হবে। কালই কলেজে যাওয়ার ছলে আলম ভাইয়ার অফিসে গিয়ে দেখা করতে হবে। যদি চাকরিটা পেয়ে যাই তবে দুজন মিলে সুখের সংসার গড়ে তুলব। কারো যুক্তি শুনব না, কারো কথা মানব না। এই তার প্রতিজ্ঞা।

পড়ার কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে মামীমা মাহমুদার রুমে প্রবেশ করে দেখলেন, পাঠক বিহনে বইগুলো যেন এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আর্তনাদ করছে। রুমটি যেন স্বজনহারার বেদনায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। তিনি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে মাহমুদাকে খুঁজতে লাগলেন। বাগানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে তাকিয়ে দেখলেন, একটি পুষ্প ঝোঁপের আড়ালে এক মানবীকে দেখা যাচ্ছে। এরই মাঝে শুনতে পেলেন অখিল কাননের নীরবতা ভঙ্গ করে, মৃদুমন্দ অনিল হিল্লোলে ভেসে আসছে এক করুণ রাগিনী–

ঃ আয় পিয়ারে দেখতাহুঁ মায়, তুনে মুজকু ভুল গিয়া
তেরে যিকির মেরে দিলমে হরদম জারি রাহ গিয়া

অর্থাৎ ওহে প্রিয়া, আমি দেখছি তুমি আমায় ভুলে গেছ। তোমার আলোচনা আমার হৃদয়ে, তোমার কল্পনা আমার অন্তরে শততই বিরাজমান।

ঃ আয় পিয়ারে কব দেখেংগে ফের তেরে দিদার কো
তেরে লিয়ে ভুল গিয়া মায় ইয়ে তামাম জাহাঁ কো

অর্থাৎ হে প্রিয়া, তোমার দেখা আবার কখন হবে? কোথায় গেলে আবার তোমাকে প্রাণ ভরে দেখতে পাব? তোমার বিরহ যাতনা কষাঘাতে আমাকে দুনিয়ার সব কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে।

ঃ আগার দানাম তুরা আজ মান জুদায়ী
নমি কারদাম খেয়ালে আঁ শেনায়ী

অর্থাৎ আমি যদি জানতাম, তুমি আমাকে অমন করে ভুলে যাবে তাহলে কখনো তোমাকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসতাম না।

মামীমা নিঃশব্দে মাহমুদার পশ্চাতে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কর চেপে ধরলেন এবং বললেন, "মাহমুদা, তোমার জন্য এসব কিছু শোভা পায় না বেটি। তুমি যে

একজন অকৃতদার তরুণী, তা আমরা জানি। সবে মাত্র নওজোয়ানীর সিঁড়িতে পা রেখেছ। লেখা-পড়া এখনো শেষ হয় নি। তোমার সার্বিক চিন্তা তোমার মাতা-পিতা ও মামারা করছেন। আলম নামে ছেলেটি কে? কোথায় তার নিবাস? আমরা কেউ কিছু জানি না। তোমার সাথে ওর পরিচয় কোত্থেকেই বা হল তাও জানি না। তোমার দিল থেকে ওসব দুষ্টুমি বের করে দিয়ে দুটি বছর ভাল করে লেখা-পড়া কর। তারপর তোমার ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আর আলম যদি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান ও সুশিক্ষিত ভদ্র ছেলে হয়ে থাকে তবে তার ব্যাপারেও চিন্তা করব। যাও ঘরে যাও। তোমার মামা যদি তোমার এসব কাণ্ড-কীর্তি জানতে পারেন তবে কিন্তু রক্ষা নেই। যাও ঘরে যাও। খানা খেয়ে শুয়ে পড়।”

মাহমুদা মামীমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তবু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ওড়নার আঁচলে চোখের পানি মুছে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মামীমা খানা খাওয়ার জন্য অনেক পিড়াপিড়ি করলেও তাতে সাড়া দেয় নি মাহমুদা। সারা রাত মাহমুদার চোখে ঘুম নেই। এপাশ-ওপাশ করে রজনী পোহাল।

পরদিন প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসল। বাসার সবাই মনে করেছে যাক মাহমুদার মনের পরিবর্তন হয়েছে। সকাল সাতটায় সুন্দর করে গোসল সেরে নাশ্‌তা পানি খেয়ে সুন্দরভাবে সেজে-গুজে কলেজের উদ্দেশ্যে বের হল। যাওয়ার পথে তার সবগুলো গহনাপত্র এবং সঞ্চিত টাকা-পয়সা যা ছিল সবগুলো ভ্যানেটি বেগে ভর্তি করে নিয়ে গেল। এসব কেউ টের পায় নি।

মাহমুদা কলেজে না গিয়ে সোজা চলে গেল আলম সাহেবের অফিসে। আলম সাহেব এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষায়ই ছিলেন। মাহমুদা আলম সাহেবকে পেয়ে রাতের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেল। মাহমুদা যে তার আত্মীয়-স্বজন থেকে চির বিদায় নিয়ে এসেছে তাও জানিয়ে দিল।

আলম সাহেব বুদ্ধিতে খুব পাকা। সে চিন্তা করল, তাকে এখানে রেখে ঝামেলা বাড়ানো ঠিক নয়। তাই তিনি তাড়াহুড়ো করে আভিঝা হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠলেন। মাহমুদাকে রুমের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, “তুমি এখানে অবস্থান করতে থাক। তোমার চাকরি ও থাকার ব্যবস্থা দু’এক দিনের মধ্যে করা হবে। আমি সন্ধায় ফিরে আসব।” এই বলে আলম বেরিয়ে এলেন।

আলম সাহেব সেখান থেকে এসে সোজা হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করে তার চাকরির ব্যবস্থা করলেন। মাহুমদার চাকরি হল আঞ্চলিক ব্রাঞ্চের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে। বেতন তিন হাজার টাকা। তিন মাস তাদের প্রশিক্ষণ হবে, তারপর বেতন বাড়বে আরও ২ হাজার টাকা। থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। দু'দিন পর চাকরিতে যোগ দেবে।

সন্ধা ঘনিয়ে এলো। এখনো মাহমুদা কলেজ থেকে ফিরে আসে নি। এডভোকেট জামাল সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরেছেন চারটার দিকে। তিনি আজ অন্য দিনের চেয়ে একটু আগে বাসায় এসেছেন। পত্নীকে মাহমুদার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কেন সে এখনো ফিরছে না? পত্নী মাহমুদার কিছু আচরণের কথা প্রকাশ করলে তিনি ওকে তালাশ করতে সোজা কলেজে চলে গেলেন। কেরানী সাহেবকে মাহমুদার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "না, মাহমুদা তো কলেজে আসে নি।"

জামাল সাহেব হতাশ হয়ে বেশ কিছু স্থানে খোঁজাখুঁজি করে রাত দশটায় বাসায় ফিরলেন। পর দিন বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিলেন, বাড়িতেও যায় নি। সব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি খবর দিলেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলে নি। মাহমুদার বৃদ্ধা জননী কেঁদে কেঁদে পাগল প্রায়। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

[চব্বিশ]

মাওলানা রফিক সাহেব এলাকার যুবকদের নাম লিস্ট করে প্রায় ৫৯ জনকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করলেন।

খোস্ত প্রদেশের মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানী জিহাদের দাওয়াত নিয়ে প্রতিটি জেলায় জেলায় সফর করতে আরম্ভ করলেন। মসজিদে মসজিদে, মাদরাসায় মাদরাসায় জিহাদের ওপর অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়ে শত শত যুবককে জিহাদের ওপর উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

মাওলানা রফিক সাহেবের কার্যক্রমও আর গোপন রইল না। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার তৎপরতার কথা। মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানী সাহেবও মাওলানা রফিকের জিহাদী তৎপরতার সংবাদ পেয়ে রামাল্লায় এসে তাঁর সাথে গোপনে সাক্ষাত করেন ও একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। কিভাবে কি করবেন এ ধরনের পরামর্শ হয় তাঁদের মধ্যে।

মাওলানা রফিকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলল। আশপাশের গ্রামগুলো থেকেও প্রতিদিন শত শত যুবক, ইমাম সাহেব ও আলেমগণ দলে দলে এসে ভীড় জমাতে লাগল। তার কারণ হল ডঃ নজিবুল্লাহ সরকার ও রাশিয়ান সৈন্যদের নির্যাতন তীব্রগতিতে বেড়ে চলায় শান্তিপ্রিয় জনগণ দিশেহারা। মা-বোনরা ইজ্জত রক্ষায় শঙ্কিত। জানমালের নিরাপত্তা নেই কোথাও। তাই দিশেহারা জনগণ রফিকের নিকট এসে কিভাবে এ জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতেন।

মুনাফেক চক্রের সদস্য ছাদেক, এমদাদ ও রঈছরা রাশিয়ান ক্যাম্পে গিয়ে সংবাদ দিল যে, "মাওলানা রফিক নিজেও একজন মুজাহিদ আবার এলাকার সকল যুবককে সে মুজাহিদ ট্রেনিং দিচ্ছে। একে যদি এই মুহূর্তে পাকড়াও না করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে এ এলাকায় কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

রাশিয়ান মেজর ডাকুয়েভ ছাদেকের কথা শুনে মাওলানা রফিকের পূর্ণ বিবরণ ও পথ-ঘাটের কথা ভালভাবে জেনে নিলেন। মেজর ডাকুয়েভ স্থির করলেন আগামী কাল রাতে হানা দিয়ে মাওলানা রফিককে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে

আসবেন। এ ব্যাপারে ছাদেকের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ালে ছাদেক, এমদাদ ও রঈছ একযোগে বলে উঠল, "আমরাই আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। এতে কোন অসুবিধা হবে না। মেজর ডাকুয়েভ ওদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

পূর্বের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী মাওলানা রফিকের বিয়ের আয়োজন চলছে অনেক ধুমধামের সাথে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানীর প্রথম ছেলের বিবাহে সকলে শরীক হবে। সর্দারজী দুই থেকে আড়াই হাজার লোকের খানার ইন্তেজাম করলেন।

এদিকে বর-কনের পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে নিয়ে মূল্যবান জেওর-অলংকার তৈরি করা হয়েছে। এ বিবাহের ব্যাপারে সকলের অন্তরেই খুশীর জোয়ার। কারণ, সুফিয়া পিতা-মাতাহীন, অসহায়া, অবলা, দুঃখী তরুণী। তার মাথাগোঁজার ঠাঁই পৃথিবীতে ছিল না। আজ তার আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই সকলেই তাকে মোবারকবাদ জানাতে চাচ্ছে। সুফিয়ার সমবয়স্ক বান্ধবীরাও খুশীতে আটখানা। ফাতিমা, রওশনা, মাসূমা দলবেঁধে এসেছে সুফিয়ার বিয়েতে। ওরা সুফিয়াকে মনের মত সাজাবে। তরুণীরা পল্লীয় প্রথানুযায়ী সুফিয়াকে বিয়ের গোসল করাবে, হলদি ঘিলা মাখাবে, পুষ্প অংকনে নরম হাতে মেহেদী লাগাবে। এসব কাজে তরুণীরা খুবই ব্যস্ত। একেক জন একেক কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে।

রফিকার আনন্দ আজ অন্যদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। একদিকে তার পরমা বান্ধবী বাল্য সাথী সুফিয়া আজ তার ভাবী হতে চলছে। অপর দিকে বড় ভাই রফিক আজ নব জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এসব দিক বিবেচনায় আজ রফিকার আনন্দ সীমাহীন।

রফিকা অন্য তরুণীদের থেকে নিজেই বাসর ঘর সাজানোর দায়িত্বটা চেয়ে নিয়েছে। রফিকা নিজ হাতে পুষ্প কুড়িয়ে মালা গাঁথছে। বাসর ঘরের শয্যা রচনা করছে। ফুলের পাপড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে বিছানার উপরে। আতর, গোলাপ, কস্তুরী ছিটিয়ে দিয়েছে নরম শয্যায়। এ যেন এক বেহেশ্তের সুরভিত কুঠরী।

এদিকে বিকাল থেকেই কয়েকশত মেহমান খানাপিনা সেরে বিদায় হয়েছেন। পল্লীর মুরুব্বীগণও সকলে এসেছেন। ইমাম সাহেব অর্থাৎ মাওলানা আকরাম সাহেব বিবাহ পড়ানোর জন্য ইন্তেজার করছেন। তরুণীরা সুফিয়ার গোসলের কাজ সেরে জেওর-কাপড় পরিয়ে জায়নামাযে বসিয়েছে সুফিয়াকে। এদিকে রফিকাও ভাইকে কাপড় পরিয়ে পাগড়িটা মাথায় পেঁচিয়ে অন্যদের সাথে মুরুব্বীদের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছে।

মুরুব্বী মহলে মহর সম্পর্কে আলোচনা চলছে। সাক্ষী কে কে হবে তাও পরামর্শের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। চারজন লোক মুরুব্বীদের মধ্য থেকে সুফিয়ার কাছে গিয়েছেন বিবাহের সম্মতি আনার জন্য। সুফিয়া হাসিমুখে বিবাহের সম্মতি দিয়ে দিল। এরই মধ্যে রাশিয়ান একটি জিপ এসে মাওলানা রফিকের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে এলোপাতাড়ী ফাঁকা ফায়ার করল। আশপাশের লোকজন প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। এ কিসের আওয়াজ, রফিক প্রথমে তা বুঝতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন হয়ত দুষ্টু ছেলেরা ফুর্তি করে ফটকা ফাটাচ্ছে। আর্মিদের জীপে বসা ছিল ছাদেক, এমদাদ ও রঈছ। তাদের গায়ে ছদ্মবেশী পোষাক থাকা সত্বেও অনেকেই দেখে চিনে ফেলেছে।

ছাদেকের অঙ্গুলী-ইশারায় সৈনিকরা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত লাফিয়ে পড়ল মাওলানা রফিকের ওপর। এক মিনিটও তাকে সময় না দিয়ে জোর করে জীপে তুলে নিল। রফিকা এ দৃশ্য দেখে ঠিক থাকতে না পেরে ভাইয়া ভাইয়া চিৎকার দিয়ে ভাইকে রাখার চেষ্টা করল। সৈনিকেরা কণ্ঠের আওয়াজ শুনে পিছনে তাকিয়ে এক সুন্দরী, রূপসী ও যুবতীকে দেখে তাকেও ধরে নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই বিবাহ বাড়িতে নেমে এলো শোকের ছায়া। আনন্দঘন পরিবেশে অকস্মাৎ দৌড়া-দৌড়ি ও কান্নাকাটির কারণ সুফিয়া প্রথমে বুঝে উঠতে পারে নি। তারপর কে যেন তাকে রফিক ও রফিকার গ্রেফতারির কথা বলে দিল। সুফিয়ার কর্ণকুহরে এ দুঃসংবাদটি যেন বজ্রাঘাত করল। বেচারির বুক ফেটে অগ্নিকুণ্ডলি বের হতে লাগল। ডান-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে ফাতিমা, রুখসানা ও মৌসুমীরাও জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সকলে কাঁদছে। সকলের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

সুফিয়া পাগলিনীর মত পরিপাটি কুন্তলগুচ্ছ টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। এ করুণ অবস্থা সুফিয়ার কচি মন মেনে নিতে পারছে না। তার অন্তর থেকে চির দিনের জন্য বিয়ের বাসনা ও বিয়ের সাধ বিদায় নিল। দুঃখে-ক্ষোভে ও অনুশোচনায় শরীরের সমস্ত পোশাক ও জেওরপত্র খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সাধারণ পোষাক পরে নিল। সুফিয়া কি করবে না কি করবে তা স্থির করতে পারছে না। হঠাৎ তার অন্তরে পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতটি এসে হাজির হল, "ছবরকারীদের সাথে আল্লাহ্ আছেন।" সাথে সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ নামায পড়ে সেজদাবনত মস্তকে চোখের পানিতে জায়নামায সিক্ত করছে। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, "আয় মেরে মাওলা, মায় গুনাহ্গার হুঁ, মেরে তামাম গুনাহুঁকো মাফ ফরমা। আয় রব্বে জুলজালাল, মেরে বাযু মে তাকত আওর কুয়ত আতা ফরমা। তামাম তাগুতী কুওয়তকে সাথ লড়নেকি তাওফীক

এনায়েত ফরমা। হামারে হাতুঁমে দুশমনানে ইসলামকো তাক আওর বরবাদ ফরমা। মুসলমান কি ফরিয়াদ কবুল ফরমা। মেরে দিলমে এলেম আওর হেকমত আতা ফরমা। মেরে খুনকো দ্বীনকে লিয়ে এস্তেমাল কারনে কী তাওফীক এনায়েত ফরমা। আল্লাহুম্মারজুকনা শাহাদাতান, কামিলাতান, ফীসাবী লিল্লাহ” বার বার কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করছিল।

এদিকে মুনাফেক চক্রের সদস্য ছাদেক, এমদাদ ও রঈছরা ছাদেকের বৈঠকখানায় বসে পরামর্শ করছিল। এমদাদ বলল, “দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খা আজ পুরা হতে চলছে। পুরা মহল্লা জুড়ে চলছে অস্থিরতা, কেউ কারো খবর নেওয়ার মত শক্তি সাহস রাখে না। চল আমরাও আমাদের অবশিষ্ট কাজটি সমাধা করে আসি। ছাদেক বলল, “সুফিয়া কিন্তু খুবই সাহসী। ওর গায়ে হাত তোলা সহজ হবে না। আমরা একযোগে যদি ব্যাঘ্রের ন্যায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ওর জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয় দেখাই তবে হয়ত খামুশ হয়ে যাবে। তারপর আমরা তাকে পাহাড়ের দিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব।”

রঈছ বলল, “তোমাদের কথা ঠিক তবে ওর এ চিৎকার শুনতে পেলে কিছু লোকজন যে আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। তাছাড়া, আমরা যে রাহাবরী করে ওদেরকে নিয়ে এসেছি তাও হয়ত অনেকে জেনেছে। কয়েক জনের সাথে মুখোমুখী দেখা হয়েছে। ওরা হয়ত আমাদের চিনে ফেলেছে। এসব ভেবে কাজে হাত দিতে হবে।”

লম্পট ছাদেক একটু চিন্তা করে বলল, “তাহলে প্রথমে আমরা তাকে হাসি-খুশীর ভিতর দিয়ে দাওয়াত দিয়ে দেখি হয়ত কবুলও করতে পারে। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে।”

ছাদেকের বোন মাহফুজা ওদের পরামর্শ আড়ি পেতে শুনছিল। মাহফুজার গোপন ভালবাসা ছিল এমদাদের সাথে। এমদাদ মাটি হাতে নিয়ে আসমান যমিনকে সাক্ষী রেখে কথা দিয়েছিল, জীবনে কোন দিন মাহফুজাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসবে না এবং অন্যকোন মেয়েকে বিয়ে করবে না। আজ নিজ কানে শুনছে, তারা একজন সতীসাধবি অবলা নারীর অপহরণের পরামর্শ করছে। এ দেশের ছেলেরা এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে তা কোন দিন কল্পনাও করে নি মাহফুজা। সুফিয়ার সাথে মাহফুজার ছিল ছোট কাল থেকেই ভালবাসা। ওদের মধ্যে কোন দিনই মুখ কালাকালি হয় নি। মাহফুজা মনে মনে ইরাদা করল, যেভাবেই হোক সুফিয়াকে আশু বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। তার সংসারে কেউ নেই। সে একজন অসহায়া, অবলা ও দ্বীনদার মেয়ে। তার ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে তা কোন দিন সইতে পারব না।

এসব চিন্তা করে মাহফুজা নগ্ন পায়ে ছুটে চলল সুফিয়ার নিকট। কয়েকটি বাড়ি পার হলেই সুফিয়ার ঘর। মাহফুজা দৌড়ে গিয়ে দেখে সুফিয়া সেজদাবনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছে। কারো আগমনের পদধ্বনিতে সুফিয়া মাথা উত্তোলন করে তাকিয়ে দেখল, মাহফুজা তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাঁপ্ছে। অসময়ে মাহফুজার আগমন দেখে হঠাৎ চম্‌কে উঠল সুফিয়া। মাহফুজা হাতের ইশারায় সুফিয়াকে চুপ থাকতে বলল। সুফিয়া অশ্রুভেজা চোখে মাহফুজার দিকে তাকিয়ে রইল। মাহফুজা এক এক করে দুরাচার পাপিষ্ঠ, নরাদম ছাদেক গংদের পরিকল্পনার কথা জানাল।

"অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর।" সুফিয়ার অবস্থা তেমন। দাঁত কটমট করতে করতে বলল, "কুত্তারাতো মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, জীবিতদের নিয়ে নয়। আমিতো জীবিত, আমার অন্তরে রয়েছে কালিমা, সিনায় রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীস। মুখে রয়েছে আল্লাহর যিকির। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, "যাদের অন্তরে আল্লাহর যিকির রয়েছে তারা জ্যান্ত আর যাদের অন্তরে যিকির নেই তারা মৃত। সে হিসেবে আমিও জীবিতদের দলভুক্ত। আরে আমার দেহ স্পর্শ করবে কুত্তারা তা কোন দিন হতে পারে না। আমার দেহরত্ন তো সংরক্ষণ করেছি একজন আলেমের জন্য, একজন মুজাহিদের জন্য। আমার জীবনটি একজন মুজাহিদের হাতে তুলে দেব। ঐ সকল পশু যেন এ ধরনের দুস্বপ্ন না দেখে। জীবন যেতে পারে তবুও আমার কেশগুচ্ছ স্পর্শ করার সুযোগ ওদের দিব না। মাহফুজা সুফিয়ার দৃঢ় মনোবল দেখে বাড়ী ফিরে গেল।

সুফিয়া আস্তে আস্তে রফিকের ঘরে ঢুকে ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে বড় আলমীরাটি খুলে থানা থেকে সুমাইয়্যার (দারুগার বউ) দেয়া রিভালভারটি বের করে সব কিছু পরখ করে নিজের কাছে রেখে দিল।

রাত গভীর। লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। পল্লীসর্দার সুফিয়াকে শান্তনা দিয়ে বললেন, "মা! চিন্তা করোনা, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আগামী কাল হয়ত তাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তোমার চাচিমার সাথে গিয়ে শুয়ে পড়। সুফিয়া বলল, "না! আমি রফিকার কক্ষেই থাকব। আশা করি অসুবিধা হবে না।" সর্দারজী এতে সম্মতি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সুফিয়াও রফিকার ঘরে ঢুকে বাতায়ন খুলে দিয়ে অস্ত্রটি নিয়ে আলমীরার আড়ালে বসে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদেকগং ক্ষুধার্ত কুকুরের মত সুফিয়ার ঘরের পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। তিন জন একই সাথে বাতায়নে দাঁড়িয়ে সুফিয়া! সুফিয়া বলে চুপি চুপি ডাকলো। সুফিয়া এসুযোগে রিভালভারের ট্রিগার টানল। মূহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল পাষন্ডেরা। একজন অকুস্থলে পড়ে রইল। বাকি দু'জন একটু দূরে গিয়ে পড়ল। সুফিয়া তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে মাথায় ও বুকে রিভালভার ঠেকিয়ে আরো কয়েকটি বুলেট ছুড়লেঅ। পাপিষ্ঠরা ওখানেই লাশ হয়ে পড়ে রইল।
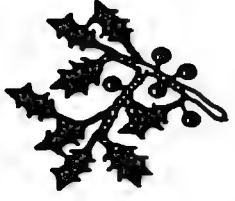
[পঁচিশ]

মাহমুদাকে পেয়ে আলম খানের আনন্দের সীমা নেই। এমন একজন সুশিক্ষিতা, সুশ্রী ও ভদ্র মেয়েকে বাগে আনতে পারায় এন. জি. ওদের বড় বড় অফিসাররা আলমের ভুয়সি প্রশংসা করতে লাগল। এ খবরটি শুধু এন. জি. ও. মহলেই সীমাবদ্ধ রইল না। ইথারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পৌঁছে গেল এন. জি. ও. গুলোর প্রধান প্রধান অফিসে। তাছাড়া, সীমান্তের পর সীমান্ত পেরিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী সাঁতরিয়ে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে পর্যন্ত।

সেবার নামে এন. জি. ওরা আফগানিস্তানে এসে খুঁটি গাড়ার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে প্রধানত হল মহিলাদেরকে পর্দার বাইরে টেনে আনা, ঘরে ঘরে সুদের চর্চা ছড়িয়ে দেয়া। ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের বিলুপ্তি ঘটানো, জিনা-ব্যভিচারের বাজার সস্তা করা, নারী অধিকার আদায়ের ভূঁয়া শ্লোগান তুলে মা-বোনদেরকে পুরুষের কাতারে নিয়ে এসে অবাধে মেলা-মেশার মাধ্যমে যৌন চাহিদা মিটানো এবং বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করে কুকুর-কুকুরির কাতারে মানুষকে দাঁড় করানো। সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল, এসব পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করে আফগানিস্তানের পুন্যভূমি থেকে ইসলামের নির্বাসন দেয়া।

আলম খান আগের বাসা পরিবর্তন করে নতুন বাসা নেয় এবং মাহমুদাকে হোটেল থেকে এনে বাসায় উঠান। এন. জি. ও. তে চাকরিজীবি মহিলাদের আরেক ধোঁকা হল, এরা রাস্তায় বের হলে আপাদমস্তক বোরকায় ঢেকে বের হয়। এর কারণ হল দুটি। এক নম্বর হল অনেকেই পিতা-মাতা ও স্বামী ছেড়ে এন. জি. ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাদেরকে আত্মীয়-স্বজনরা যেন চিনতে না পারে এজন্য বোরকা পরিধান করে। দু'নম্বর হল অন্য মহিলারা যেন মনে করে এন. জি. ওরা বোরকা পরে।

আলম সাহেবও মাহমুদাকে বাজারের সেরা বোরকা কিনে দিল। মাহমুদা বোরকা ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানালে আলম কললেন, "আরে তোমাকে তো খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমার আত্মীয়রা। রাস্তা-ঘাটে যদি তোমাকে চিনে ফেলে .....। এবার মাহমুদার ভ্রম ভাঙ্গল এবং বোরকা পরতে রাজী হল। এন. জি. ওতে যে সব মহিলা চাকরি করে ওদেরকে কমপক্ষে পাঁচ জন অফিসারে মন জুগিয়ে চলতে হয়। তা না করলে বেতন বৃদ্ধি হয় না এবং পদোন্নতিও হয় না। তাই সব মহিলাই এন. জি. ও. অফিসারদের মন রক্ষা করে চলে।

কিছুদিন পর পরই প্রশিক্ষণের নামে মহিলাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় দূর-দূরান্তে। সে সব স্থানে প্রশিক্ষণের নামে অবাধে চলে জেনা-ব্যভিচার। আফগানিস্তানের হেলমান, ফারারোদ, ফরিরোদ, কুলাঙও লোগার নামক নদীসমূহের অববাহিকায় রয়েছে এন. জি. ওদের অনেক অফিস। ওসব অঞ্চলে লোক যাতায়াতও খুব কম। তাই তারা ঐসব এলাকায় গড়ে তুলেছে অবকাশ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কথিত আছে, ঐসব অফিসের নর্দমাগুলো প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার না করলে কনডমে আঁটকে যেত। এসব কেন্দ্রে প্রতি মাসে কার্টুন কে কার্টুন কনডম সরবরাহ করা হয়।

বহু দিনে মাহমুদার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়েছে। এবার সেও যাচ্ছে দশদিনের প্রশিক্ষণে। যাওয়ার পথে অন্য একজন মহিলা মাহমুদাকে বলল, "আম্মা, অন্যদের তুলনায় আপনি অনেক সুন্দরী। স্বাস্থ্যও ভারী। কাজেই আপনার কষ্ট হবে অনেক বেশি। তাই এখনি চিন্তা করে দেখুন কুলাতে পারবেন কি না।"

মহিলার কথা শুনে মাহমুদা বলল, "আমাকে অত ভয় দেখাস কেন? তুমিওতো বহু বার প্রশিক্ষণে গিয়েছ আবার যাচ্ছ। তোমরা পারলে আমিও পারব।"

আলম খান মাহমুদাকে নিয়ে চলল ফারারোদ নদীর অববাহিকায় নির্মিত অফিসে। সাথে চলল আলম সাহেবের ঊর্ধ্বতন আরও, পাঁচ জন কর্মকর্তা। উনারাও সাথে নিয়েছেন তিনজন নতুন চাকরি প্রাপ্ত তরুণীকে। উক্ত কাফেলায় শিক্ষানবিস চারজন আর ইন্‌সফেক্টর ছয় জন। গাড়ী নিয়ে ফারারোদের উদ্দেশ্যে জালালাবাদ ত্যাগ করল। বিকাল পাঁচটার দিকে তারা ফারারোদ নদীর তটে এসে হাজির হল। তাদের জন্য পূর্ব থেকেই একটি বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হল। সবাই ও ঘরে উঠলেন। মাহমুদা ঘরে প্রবেশ করেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল দেয়ালে দেয়ালে রয়েছে উলঙ্গ নারী-পুরুষ ও যুবক যুবতীর ছবি। যে কোন যুবক-যুবতী এসব ছবি দেখে স্থির থাকতে পারবে না। সাথে সাথে আরম্ভ হয়ে যাবে যৌন সুঁড়সুড়ি।

রাত হল। সুস্বাদু খানা নিয়ে এলো খানসামারা। সবাই খানা খেতে বসল। খানার সময় এমন কিছু কাণ্ড ঘটল, যা স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসে খাওয়ার সময় হয়ে থাকে। মেয়েরা অফিসারদের এহেন আচরণে খুশী হতে পারে নি।

খানা-পিনার পর্ব সেরে সবাই কার্পেটে-ঢালু বিছনায় বসল। এদিকে বেয়াড়ারা বড় বড় মদের বোতল ও গ্লাস এদের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখল। কক্ষের এক কোণে টেবিলে স্থাপিত রঙ্গিন টি. ভি. থেকে বেরিয়ে এলো বাজনার শব্দ। আস্তে

আস্তে আরম্ভ হল একের পর এক নগ্ন ছবি। যাকে বলে ব্লুফিল্ম। কিছুক্ষণ পর এক নর্তকী এসে অঙ্গ-ভঙ্গিতে নাচ আর গান আরম্ভ করল। অপর এক তরুণী এসে মদের বোতলের চিপি খুলে গ্লাস ভর্তি করে একেক জনের সামনে হাজির করতে লাগল। দর্শকরা গ্লাসগুলো হাতে নিয়ে গড়গড় করে মুখ গহ্বরে ঢেলে গলধকরণ করল। জোর করে মহিলাদেরও পান করানো হল। তারপর যা হওয়ার তা-ই হল। কারো মুখ থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হল না। সবাই সাদরে এসব আচরণ বরণ করে নিল। এভাবেই ওদের রাত পোহাল।

সকাল আটটা বাজার আগেই নাশ্তা পানি হাজির করা হল। সকলে পেশাব-পায়খানা সেরে যার যার রুচিমত নাশ্তা খেয়ে ক্লাসের জন্য তৈরি হল। সকাল নয়টায় সবাই ক্লাস রুমে হাজির। প্রধান লেকচারার এসে সমবায় ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার উপকারিতার ওপর এক ঘণ্টা বক্তব্য দান করলেন। বিশেষ করে মহিলারা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কি কি ফায়দা হতে পারে, তার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "হে আমার বোনেরা, পৃথিবী নামক গ্রহে যতগুলো প্রাণী আছে, তার মধ্যে মানুষ নামক প্রাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ দু প্রকার নর এবং নারী। একই মাতা-পিতার ঔরসে জন্মে ছেলে এবং মেয়ে, কিন্তু অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম ধর্ম সৃষ্টি করেছে বৈষম্য। সাক্ষীর দিক দিয়ে এক জন পুরুষের সমান দু'জন মহিলা। পিতৃসম্পত্তি বণ্টনের বেলায়ও দেখা যায় দুই মেয়ের সমান এক ছেলে পায়। তাছাড়া, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও মহিলারা অনুপস্থিত। একজন পুরুষ ৩-৪টি বিয়ে করে আনন্দ উপভোগ করে। মেয়েদেরও তো মন চায় একাধিক পুরুষ থেকে একাধিক মজা লুটতে। তাছাড়া, কিছু হতে না হতেই পুরুষেরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়। কথা ঠিক নয় কি?" সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

অতঃপর আরো বললেন, "হে আমার বোনেরা, আমরা (এন. জি. ও.) আফগানিস্তানে এসেছি নারী জাতিকে মুক্ত করার জন্য। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। তাদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য। মেয়েদের রোজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে পুরুষের মত স্বাবলম্বি করে গড়ার জন্য। প্রিয় বোনেরা, আপনারা যদি ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন তবে স্বামীরা আপনাদের ওপর নির্যাতন করতে পারবে না। কোন স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন করে তবে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করবেন। যদি বিচার না করে তবে, আপনারা ঘরে-ঘরে একসাথে পাক-শাক, রান্না-বান্না বন্ধ করে দেবেন। তখন দেখবেন, পুরুষরা বাগে এসে যাবে।" উক্ত অফিসার একটানা দুঘণ্টা লেকচার দিলেন।

অপর এক অফিসার এসে বললেন, "প্রিয় বোনেরা আমার, আমরা (এন. জি. ও.) আপনাদেরকে ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে উন্নত দেশের মহিলাদের মত গড়ে তুলতে চাই। ঐসব দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। মিল-ফেক্টরিতে, কল-কারখানায়, অফিস -আদালতে নারী-পুরুষ একসাথেই কাজ করে। ফলে সব দেশে মহিলাদের উন্নতির সাথে সাথে দেশেরও উন্নতি হয়েছে। কাজেই আপনারা ধর্মের বর্ম পরে জাতির ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকবেন না। মৌলবাদীরা যা বলে বলুক, স্বামীরা যা করে করুক, এতে আদৌ-কর্ণপাত না করে আমাদের নির্দেশিত পথে চলুন। এক স্বামীর পরিবর্তে পাবেন আমাদের মত শত শত স্বামী। আপনার আঁচল ভরা পয়সা থাকলে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন। আলোচনা এখনকার মত এখানেই শেষ।"

দুপুর বারটা। গোসল, খানা ও বিশ্রামের জন্য ছুটি দেয়া হল। মাঠের এক পার্শ্বে রয়েছে গোসলের জন্য একটি হাউজ। ফাঁকে ফাঁকে বসানো ফুলের টপ্। মহিলা কর্মীরা এখানেই গোসল করে। হাউজের চারি পার্শ্বে রয়েছে কয়েকটি কেদারা। গোসলের সময় অফিসাররা কেদারাগুলো দখল করে বসে থাকেন এবং গোসলের ভি. ডি. ও. করেন। আজকের গোসল অনুষ্ঠানেও তার ব্যবস্থা আছে।

গোসল সমাপন করে সবাই খানা-পিনা সেরে বিশ্রাম নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে রোকাইয়া নামক একজন মেয়ে মাহমুদাকে লক্ষ করে বলল, "মাহমুদা আপা, এগুলোই কি আমাদের প্রশিক্ষণ? না আরো কিছু আছে? আমাদের রূপ-লাবণ্য ও দেহ নিয়ে ওরা আনন্দ উল্লাস করছে। তা হলে আমরা কি ভোগ্য সামগ্রী? আমরা তো অভাবের তাড়নায় এন. জি. ও. তে চাকরি নিয়েছি। ওদের কাজ করব, ওরা বেতন দিবে। তাই বলে দেহ বা সৌন্দর্য্য বিক্রির জন্য তো আসি নি।"

রোকাইয়া আরো বলল, "মাহমুদা আপা, অফিসার সাহেব যে সব সবক পড়িয়েছেন তা শুধু ইসলামের বাইরেই নয়, যুক্তিরও বাইরে। তিনি বলেছেন, পুরুষরা তিন-চারটি টি বিয়ে করতে পারলে নারীরা তিন, চারটি স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না কেন? আচ্ছা সব ধর্মেই সন্তানরা থাকে পিতার। কোন মহিলার যদি তিন-চারটি স্বামী থাকে, আর যদি সে সকলের সাথে মেলামেশা করে তবে কাকে পিতা পরিচয় দিবে? মাহমুদা বলল, "সত্যিই তো, আগে তো তা ভাবি নি।"

রোকাইয়া আরো বলল, "দেখুন তো আপা, তিনি যে বলেছেন, সম্পত্তি বণ্টনে বৈষম্য রয়েছে। এক ছেলের সমান পায় দুই মেয়ে। কেন সমান ভাগ পাবে না?

বিয়ের পরে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বামী গ্রহণ করে। স্বামীর ওপর এ দায়িত্ব পালন জরুরী করে দেয়া হয়েছে। আর ছেলে বালেগ হলে পিতার ওপর তার ভরণ-পোষণের জিম্মাদারী থাকে না। সে হিসেবে তো ছেলেরাই অসহায়। মেয়েরাতো পিতার সম্পদ থেকে পায় আবার স্বামীর সম্পদ থেকেও চারআনা পায়। এতে মেয়েরা দু'দিক থেকে সম্পদের মালিক হচ্ছে আর ছেলেরা হচ্ছে এক দিক থেকে। এখানেও তো স্যারের যুক্তি অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে। মেয়েদের গঠনপ্রণালী, হাড়-মাংস, চিন্তা-চেতনা, মেধা ও শারীরিক শক্তি পুরুষের মত নয়। পুরুষরা যে ধরনের পরিশ্রম ও শক্ত কাজ করতে পারে, তা কি মেয়েদের দ্বারা সম্ভব? তাহলে কি করে সম অধিকারের দাবী করা যায়? এ দাবী বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। জানি না এন. জি. ও.-রা আমাদেরকে কোন স্বর্গ রাজ্যে নিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, ওরা আমাদের পবিত্র রেহ্‌ম থেকে জারজ সন্তান পয়দা করে দেশ ভরে দিতে চাচ্ছে। যখন আমরা বার্ধক্যে পা দেব আর চাকরিও হারাব তখন আমাদেরকে ওরা দেশের বোঝা মনে করে চিড়িয়াখানার বাঘের খোরাক বানাবে, যা রাশিয়াতে হচ্ছে। অন্যসব মহিলাদের সন্তান থাকবে। তারা বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত করবে। আমাদের তো তা থাকবে না। অন্য কোন পুরুষও আমাদেরকে সেকেন্ড হ্যান্ড মনে করে গ্রহণ করবে না। কাজেই এ ধরনের চাকরি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আগামী কালই এমন চাকরির মাথায় লাথি মেরে বিদায় নেব।” কথাগুলো অনেক দরদ নিয়ে বলল রোকাইয়া।

রোকাইয়ার কথা শুনে অন্য সব মেয়েদের অনুভূতিতে স্পন্দন শুরু হয়েছে। একজন বলল, “বোন রোকাইয়া, তোমার কথা তো সত্যিই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমরা কি করছি? পেটের দায়ে আমাদেরকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে। তা না হয় কি ....?”

মাহমুদা বলল, “আমি তো যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে চলে এসেছি। যা হওয়ার তা-ই হবে। আমিও যা করার তা-ই করব। ফিরে যাব না। আছি, থাকব, যা ভাগ্যে আছে তা মাথা পেতে নেব।” পরদিন রোকাইয়া চাকরি রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

[ছাব্বিশ]

নীরব নিথর রজনী। বিয়ে অনুষ্ঠানে যে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে সকলের মনেই কষ্ট। শংকিত অবস্থায় রাত পোহাল। মসজিদে মসজিদে আযান হচ্ছে। মুসল্লিরা ঘুম থেকে জেগে গাত্রোত্থান করে, অযু ইস্তেঞ্জা সেরে মসজিদ পানে ছুটে চলছেন। রফিকের বাড়ির আঙ্গিনায় আসতেই তিনটি লাশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কয়েক জন মুসল্লি আঁতকে উঠেন। ভোরের আলো এখনো পূর্ণ প্রকাশ না পাওয়ায় লাশ সনাক্ত করতে পারে নি।

নামায সমাপন করে মুসল্লিদের মধ্যে কানা-ঘুষা হচ্ছিল। মাওলানা আকরাম মুসল্লিদের কানা-ঘুষার কারণ জানতে চাইলে একজনে বিষয়টা তাঁকে জানালেন। ইমাম সাহেব সে সংবাদ পেয়ে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলেন। সকলেই লাশের কাছে গিয়ে সনাক্ত করলেন এগুলো এ মহল্লারই তিন যুবক ছাদেক, এমদাদ ও রঙ্গেছের লাশ। সকলেই মনে মনে খুশী হলেন ও আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। দেশের ও মুসলমানদের দুশমন, আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন নিপাত হল। তাই ঘরে ঘরে, অন্তরে অন্তরে, মনে মনে নীরবে বইছে আনন্দের ঢেউ।

পল্লী সর্দার লাশের অভিভাবক ও এলাকার লোকজনকে নিয়ে লাশের বিষয়ে পরামর্শ করলেন, কি করা যায়। ছাদেকের আব্বা বলে উঠলেন, রাশিয়ান ফৌজকে আমি ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, ওরা আমার ছেলেকে হত্যা করে নি, আমাদের গ্রামটা বাঁচিয়েছে। সে অনেক আগেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে মনে মনে ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়েছি। বাড়ি থেকেও বের করে দিতাম অনেক আগেই, কিন্তু প্রশাসনের ভয়ে তা করি নি। আজ রাশিয়ান ফৌজের উছিলায় ও আল্লাহর খাছ রহমতে এ কুপুত্র লাশ হওয়ায় আমার কলিজা ঠান্ডা হয়েছে। সে যদি বেঁচে থাকত তবে এলাকাটা ধ্বংস হয়ে যেত। এমদাদ ও রঙ্গেছের আব্বার কথাও অনেকটা এ রকমই। সকলের একই ধারণা যে, গত রাতে রাশিয়ান ফৌজের গুলীর আঘাতে ওরা নিহত হয়েছে। সর্দারজী বললেন, থানায় না জানিয়ে দাফন করা যাবে না। তাই তিনজনকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। থানার লোকেরা ঘটনা শুনে বলল, "এতে আমাদের কিছু করার নেই। তোমরা গিয়ে লাশ দাফন করে ফেল।" থানার সংবাদ পেয়ে সর্দারজী দাফন-কাফনের হুকুম দিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যেই

কাফন-দাফন শেষ করে সর্দারজী পল্লীর গণ্যমান্য ৩/৪ জন লোক নিয়ে রফিকের সন্ধানে বের হলেন। রামাল্লা পল্লী থেকে দু'কিলোমিটার দূরে শালাংপাশ গীরিপথের সন্নিকটে একটি অনুচ্চ টিলার অপর পার্শ্বেই রুশী ফৌজের ছাউনী।

ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী সহচরদেরে নিয়ে ছাউনিতে গিয়ে দেখেন সেখানে আরো দু'জন আলেমকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। এদেরকে শারীরিক নির্যাতনের পর বাংকার খননের কাজে লাগান হয়েছে। কাজ করতে করতে যখন হয়রান বা পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তখন বড় বড় কুত্তারা এসে লাল চক্ষু মেলে তাকায় এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে। একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানী, আরসালান খান রহমানী ও পীর মুহাম্মদ রূহানীকে চেন?" এক এক করে সবাই উত্তর দিলেন, "স্যার। আমরা উনাদের নাম শুনেছি কিন্তু কোন দিন দেখি নি।"

মাওলানা রফিক পিতার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। পিতা-পুত্রের চার চোখের মিলনে এক পুলক শিহরণ অনুভূত হল। কিছুক্ষণ যেন বাপ-বেটা নীরব ভাষায় হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন। তারপর বৃদ্ধ পিতার নয়নযুগলে অশ্রুর বান ডাকল। মাওলানা রফিক পিতার অবস্থা দেখে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, "আব্বা, আপনার সিক্ত আঁখি অবলোকন করব এমন কোন দিনই চিন্তা করি নি। আপনি হযরত সাহাবায়ে কেরামের মত প্রস্তরসম দিলের অধিকারী হোন। আমার ওপর বেলাল হাবশী (রা)-এর মত ঈমানী পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। দোয়া করুন, যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি। আব্বা, আপনার আদরের ছেলের রক্তের বিনিময়ে যদি এদেশে কালিমাখচিত ঝাণ্ডা উত্তোলিত হয়, তবে তো আপনি সার্থক পিতার মর্যাদা পেলেন। আপনার প্রিয় সন্তানের জীবনের বিনিময়ে যদি আফগানের পবিত্র ভূমি শত্রুমুক্ত হয়, লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের হেফাজত হয়, মসজিদ-মাদরাসা ও খানকাসমূহের নিরাপত্তা বিধান হয় তবে তো আপনার চোখ অশ্রুতে ভারী হওয়ার পরিবর্তে খুশীতে চকচক করে ওঠার কথা।"

"আব্বাজান, আপনি হয়ত আমাকে ছাড়িয়ে নিতে বা দেখে যেতে এসেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। কারণ, আমার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু ছাদেক, এমদাদ ও রঈছরা রিপোর্ট দিয়েছে। আমার সমস্ত জিহাদী প্রোগ্রাম ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিষয়ে এদেরকে জানানো হয়েছে। তাই মুক্তির আশা করতে পারি না। তবে আল্লাহ যদি কোন সুরত বের করে দেন।"

রফিকের কথা শুনে পল্লীসর্দার বললেন, "বাবা, তোমার দুশমন, দ্বীনের দুশমন ছাদেক গংরা গত রাতে গোলার আঘাতে নিহত হয়েছে। তাদের বক্ষদেশে তিন তিনটি বুলেটের ক্ষত দেখা গেছে। এই মাত্র তাদের কাফন-দাফনের কাজ সেরে এসেছি। তা না হয় অনেক আগেই আসার ইচ্ছা ছিল।"

পিতার কথা শুনে রফিক দুহাত ঊর্ধাকাশে উত্তোলন করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, ফৌজেরাতো ফাঁকা ফায়ার করেছে। কোন মানুষ তো হত্যা করে নি, তাহলে ....। রফিক আরো একটু চিন্তা করে নিয়ে পিতাকে বললেন, "আব্বা, আপনি বাড়ি ফিরে যান। আম্মুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন। আমার জন্য দোয়া করুন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। জান্নাতে সাক্ষাত হবে। আর সুফিয়ার প্রতি লক্ষ রাখবেন। কচি বয়সে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হাতে মেহদির রং লেগেছে কিন্তু বিয়ে হয় নি। তার অন্তর যে চৌচির হয়ে গেছে। হৃদয় ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেছে সে ব্যথা কে বুঝবে?" কথাগুলো বলার সময় রফিকের কণ্ঠস্বর ক্রমশই ভারী হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আরো বললেন, "আব্বা! আমার আদরের ছোট ভাই আরিফকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত লেখা-পড়া করাবেন। সুফিয়াকে আরিফের হাতে তুলে দিবেন। আর মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের নিকট পাঠাবেন জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য। এই আমার আখেরী দরখাস্ত।"

বৃদ্ধ পিতা, ছেলের কথা শুনে চোখের পানিতে দাঁড়ি সিক্ত করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন দিয়ে মস্তক উত্তোলনপূর্বক রফিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, আমার মা মনী রফিকাকে দেখছি না যে? সে কোথায়? রফিক পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সজোরে কেঁদে ফেললেন। বুক কাঁপছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। পুরো দুনিয়াটাই যেন অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে রফিকের কাছে। পিতার অবস্থা আরো খারাপ হবে বিধায় রফিক কান্নাটা কোন মতে সামলিয়ে বললেন, "আব্বা, আমার অতি আদরের বোন রফিকার ঋণ পরিশোধ করেছি। গত রাতে রফিকা নিজ হাতে আমাকে গোসল করিয়ে আতর-গোলাপ, জামা-পাগড়ী পরিয়ে বর সাজিয়েছিল। নিজ হাতে বাসর ঘর রচনা করে, ফুল ছিটিয়ে দিয়েছিল। আমার বিয়েতে তার কত যে আনন্দ অনুভব হচ্ছিল তা একমাত্র সে-ই জানত। যতবার তার দিকে তাকিয়েছি ততবারই দেখেছি আনন্দিত, উৎফুল্ল, উল্লসিত। খুশী যেন ঠিকরে পড়ছিল তার নূরানী মুখাশ্রয়ী থেকে।"

"আব্বা, গত রাতে আমাদেরকে ক্যাম্পে এনে অনেক মার-পিট করেছে জানোয়াররা। রফিকা আমাদের কান্না ও শাস্তি সইতে না পেরে ফিরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর সে করুণ আর্তনাদে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বলে "তোমরা আমার ভাইয়াকে মেরো না, আমাকে মেরে ফেল। কয়েকটি বেত্রাঘাত রফিকার শরীরেও লেগেছিল। রফিকার হয়রানিতে পাষণ্ডরা বেত্রাঘাত বন্ধ করে হাত পা বেঁধে আমাকে তাঁবুর সামনে ফেলে রাখে। অতঃপর ওরা আমার সামনে ইজ্জত লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। রফিকা বাঘিনীর মত হুংকার ছেড়ে বলছিল, "ওরে নারীলোভী পাষণ্ড, জানোয়ার, বেহায়া, কুত্তা, বদমাইশ, জালিম, পরদেশ

আক্রমণকারী কুকুরের বাচ্চারা! আমার পবিত্র দেহে জীবন থাকতে হাত দিবে তা হয় না। ভাইয়ের সামনে বোনের ইজ্জত হরণ জীবন থাকতে সম্ভব হবে না। ভাইকে সে দৃশ্য দেখতে দেব না।"

"এই বলে রফিকা তার দুটি আংগুল সজোরে মেজরের চোখে ঢুকিয়ে দিল। সাথে সাথে মেজরের দুটি চোখ বেরিয়ে আসল বাইরে। মেজর 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার দিয়ে যমিনে লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটি রফিকা হাতে তুলে নিয়ে দুজন সিপাহীকে গুলী করে হত্যা করল। অতঃপর তার পিছন দিক থেকে এক ঝাঁক গুলী এসে বোনের জীবন কেড়ে নিয়ে গেল। রফিকা রক্তাক্ত অবস্থায় যমিনে ছটফট করছিল এবং কলেমা পড়ছিল। আমাকে অসহায়ের মত এ দৃশ্য দেখতে হল। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তাঁবুর কাছেই। তাই তার লাশকে সরিয়ে নেয়ার জন্য রাশিয়ান সেনারা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ওরা বহু চেষ্টা করেও এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক নাড়াতে পারে নি তার লাশ। অবশেষে তারা নিরূপায় হয়ে আমার কাছে এসে বলল, "মাওলানা! তোমার বোনের লাশ তুমি সরাও।" এই বলে আমার হাত পায়ের বন্ধন খুলে দেয়। আমি আমার বন্দী সহকর্মীদের নিয়ে শালংপাশের অল্প একটু দূরে কবর খনন করে, জানাযা পড়ে তাকে সমাধিস্থ করি। চোখের পানি মুছে তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বললাম, ওগো আমার অতি আদরের ছোট বোন রফিকা, আজ আমি নিজ হাতে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। গতরাত তুমি তোমার ভাইয়ের জন্যে নিজ হাতে বাসর ঘর রচনা করেছিলে। আমিও আজ নিজ হাতে তোমার বাসর ঘর (কবর) রচনা করে তোমার সুখ নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিলাম। তুমি জান্নাতবাসিনী হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তুমি শান্তিতে থাক এটাই কামনা করি। তুমি মৃত্যুবরণ কর নি, তুমি জীবিত। কাজেই আমার জন্য দোয়া করো, আমিও যেন অতি তাড়াতাড়ি তোমার সাথে মিলিত (শহীদ) হতে পারি।"

মাওলানা রফিক পিতার কাছে কথাগুলো বলছিল পুশ্‌তু ভাষায়। তাই রুশী ফৌজেরা তা বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধ পিতা মেয়ের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে অবোধ বালকের ন্যায় কেঁদে ফেললেন। ধবধবে সাদা দাঁড়িগুলো সিক্ত হয়ে অশ্রুর ধারা যমিনে নেমে এলো।

মাওলানা রফিক পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, "আব্বা, রফিকার জন্য মোটেই চিন্তা করবেন না বা দুঃখ পাবেন না, আমাদের মধ্যে সে-ই পুন্যবতী নারী, যে সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে। আল্লাহ শহীদদের মর্যাদার বর্ণনা করে বলেছেন, 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (বাকারা-১৫৪)

জিহাদ না করে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জানাযা পড়তে ও কবর জিয়ারত করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "তাদের মধ্য

থেকে কারো মৃত্যু হলে তাদের ওপর কখনো নামায (জানাযা) পড়বেন না এবং তাদের কবরে দাঁড়াবেন না। তারা যে আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (সূরা তাওবা - ৮৪)

পল্লীসর্দার পুত্রের কথা শুনে কান্না সংবরণ করে বললেন, "বাবা, রফিকার মাজারের সন্ধান বলে দাও, সেখানে গিয়ে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে আমার বিগলিত অন্তরকে শীতল করি।" পিতার কথা শুনে রফিক বললেন, "আব্বা, তার শরীরের প্রথম রক্তের ফোঁটা যমিনে পতিত হওয়ার পূর্বেই তার জীবনের সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। কাজেই শহীদের আত্মার মাগফেরাতের প্রয়োজন নেই। তবে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করলে বা তাদের মাজার জিয়ারত করলে নিজেরই ফায়দা হয়।" এই বলে তিনি বোনের মাজার দেখিয়ে দিলেন।

পল্লীসর্দার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রফিকার মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফাতিহা পাঠ করলেন ও মুনাজাত করলেন। মুনাজাত অবস্থায়ই এক জান্নাতী খুশবুতে পুরো এলাকা মোহিত করে তুলল এবং তাদের চোখ জুড়ে ঘুম আসল। ঘুমের অত্যাচার সইতে না পেরে পাশে তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে গেলেন। সাথীরা বৃদ্ধের পার্শ্বে বসে রইলেন। আনুমানিক ৫-৬ মিনিট ঘুমিয়ে নিজ ইচ্ছায় ঘুম ভাংলে ওঠে বসলেন। সহসা সর্দারের মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বেরিয়ে এলো। তিনি বললেন, "বাবারা, আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম, রফিকা একটি মনোরম বাগানে বিচরণ করছে। আর তার ডান বাঁয়ে রয়েছে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর পুরুষ ও নারী। বয়স ১২ থেকে ১৬ বছর হবে এদের। ওরা সবাই রফিকার খেদমতে নিয়োজিত, তাছাড়া রয়েছে একটি মনোরম প্রাসাদ, যা ইয়াকুতের নির্মিত। আর বাগানের পাদদেশে রয়েছে দুধ, মধু শরবত ও মিষ্টি পানির নহর, যা সব সময় বয়ে চলছে কলকল তানে। রফিকা উক্ত বাগানে বিচরণ করছে এবং ডেকে বলছে, আব্বু, আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি খুব সুখেই আছি। আম্মু, সুফিয়া ও ভাইয়াকেও আমার সালাম দিবেন।" এতটুকু দেখেই সর্দারজীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অতঃপর কবর থেকে একমুঠো সুরভিত মাটি নিয়ে সর্দারজী বাড়ি ফিরে গেলেন।

সর্দারজী বাড়ি গিয়ে সব ঘটনা এক এক করে খুলে বললে বৃদ্ধা জননী কেঁদে কেঁদে বেহুশ হয়ে গেলেন। মাথায় অনেক পানি ঢালার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। সর্দারজী মেয়ের কবরের মাটি মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, "জনাবা, এই নাও তোমার জান্নাতবাসিনী রফিকার কবরের মাটি।" মাটিগুলো হাতে দিতেই এক জান্নাতী খুশবুতে পুরা ঘরটি উদভাসিত হয়ে গেল। বৃদ্ধা জননী তা চুম্বন করে চেহারায় মাখলেন। এক অনাবিল শান্তিতে তার মন ভরে উঠল।

[সাতাইশ]

সুফিয়া রফিক ও রফিকার কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে তার পড়ার রুমের বিছানায় পড়ে গেল। এ রুমে সহসা কেউ প্রবেশ করে না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। সুফিয়া এখনো গোসল করে নি, খানা খায় নি, নামাযও পড়ে নি। সর্দারপত্নী সুফিয়ার রুমে উঁকি দিয়ে দেখলেন, সুফিয়া এখনো ঘুমে অচেতন। সে যে মূর্ছা খেয়ে নিথর হয়ে পড়ে আছে তা তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, ঘুম থেকে জাগাবেন না। আরো একটু ঘুনিয়ে নিক। কিন্তু নামাযের সময় বয়ে যাওয়ায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে মিহিন সুরে ডাকলেন, "সুফিয়া, মা সুফিয়া! ওঠ নামাযের সময় বয়ে যাচ্ছে।"

হায় সুফিয়াতো একটুও নড়াচড়া করছে না! মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দাঁতে দাঁত লেগে আছে। কেঁদে ফেললেন গৃহকর্তী। কান্নার আওয়াজ পেয়ে সর্দারজী দৌড়ে এলেন। অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি দাঁত খোলার চেষ্টা করলেন এবং নাকে-মুখে বার বার শীতল পানি ছিটিয়ে দিলেন। এভাবে কিছুক্ষণ পানি ছিটানোর পর চোখ মেলে তাকাল সুফিয়া। সর্দারজী শিয়রে বসে বললেন, "মা! তুমি হয়ত সব খবরই শুনেছ! বুঝি, এতে তোমার কলিজা চৌচির হয়ে গেছে, বেদনায় বক্ষদেশ বিদীর্ণ হয়েছে। দেখ মা! বিপদে যদি এমনি ভাবে ভেঙ্গে পড় তা হলে কিভাবে চলবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যা ঘটে তা মাথা পেতে অম্লান বদনে মেনে নিতে হয়। তা না হয় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।"

"রফিক আবার আমাকে তোমার প্রতি বিশেষ ভাবে নজর রাখতে বলেছে। তোমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভাগী হওয়ার জন্য তাকিদ দিয়েছে। মা সুফিয়া! তুমি একজন আলেমা। তুমি আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবে, বুঝাবে। ছবর করার উপদেশ দিবে। এখন যদি তুমি নিজেই ভেঙ্গে পড় তাহলে কে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবে? যাও মা, ওঠ! নামায পড়ে দোয়া কর।"

সুফিয়া একটু নীরব থেকে মাথা তুলে বলল, "চাচাজান! সত্যি কি রফিকাকে হায়েনারা শহীদ করে দিয়েছে? সে কি আর ফিরে আসবে না। তা হলে কি চির দিনের জন্য হারালাম ওকে? একা একাই কি আমাকে থাকতে হবে? না আমি রফিকাকে ছাড়া একমূহুর্তও থাকতে পারব না।" এ বলে আবার অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। গৃহকর্তী মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "মা! এত বিচলিত হলে কি চলবে? আমার মেয়ে একা মরে নি, সে লম্পট মেজরকে চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দিয়েছে। তার চোখ দুটি বের করে নিয়েছে। তাছাড়া, আর তিনটি লম্পট সিপাহী খতম করে রফিকা শাহাদাত বরণ করেছে। তোমাকে আমাকেও হয়ত এ পথেই অগ্রসর হতে হবে। ওঠ মা, ওঠ! নামাযের সময় যায় যায়।"

সুফিয়া এবার শয্যাত্যাগ করে অজু-ইস্তেঞ্জা সেরে নামাযে দণ্ডায়মান হল।

নামায সমাপন করে দীর্ঘ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অনেক দাবী জানাল। সর্দারপত্নী নিজেই তার জন্য রুটি, কাবাব ও দধি এনে তার সামনে রেখে বললেন, "মা, সুফিয়া! নাও, খানা খেয়ে নাও।" সুফিয়ার কণ্ঠ দিয়ে রুটি নামছে না। রুটির থালা সরিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দধির বাটিটি হাতে নিয়ে অল্প অল্প করে খেতে লাগল। বাকী খাবার দস্তরখানে পড়ে রইল।

সুফিয়া আবার শয্যা গ্রহণ করল। রাজ্যের চিন্তা এসে সুফিয়াকে বার বার বিব্রত করতে লাগল। সুফিয়ার শিরায় শিরায় বইছে প্রতিশোধের শোনিত ধারা। অন্তরে জ্বলছে বদলা নেয়ার অগ্নিশিখা। কিভাবে রফিককে মুক্ত করা যায়। কিভাবে দুশমনের বাহু গুড়িয়ে দেয়া যায়। মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করা যায়, দেশ থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দেয়া যায়। এসব নিয়ে ফিকির করতে করতে আবার অতীতের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলো সুফিয়ার হৃদয়াকাশে মেঘের মত ভীড় জমাতে লাগল। আজ রফিক দুশমনের বন্দীশালায় বন্দী। এতো সেই রফিক, যিনি আমার মেষ পালকে পানি পান করাতেন, যখন আমি ভীড় ঠেলে পানি আনতে ব্যর্থ হয়ে মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুধু ব্যর্থতার জন্য কাঁদতাম। তিনি তো সেই রফিক, যিনি আমার মেষপালগুলো তাড়িয়ে নিয়ে খোয়াড়ে তুলতেন আবার হারিয়ে যাওয়া বকরিগুলো পল্লীর ঘরে ঘরে তালাশ করে বাড়ি পৌঁছে দিতেন। তিনি তো সেই রফিক, যিনি আমার সাথে পাখি শিকারে ও মক্তবে লেখা-পড়ায় প্রতিযোগিতা করতেন। মেষ চারণভূমিতে বাড়ি থেকে নাশ্‌তা তিনি আমাকে না দিয়ে মুখে তুলতেন না।

আমি বেঁচে থাকব আর রফিক বন্দী হয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করবে তা কি করে হয়! না, তা হতেই পারে না। জীবন বাজি রেখে তাকে মুক্ত করবই করব। হয়তো জীবন বিলিয়ে দিয়ে বিজয়ের মালা তার গলায় পরাব, না হয় রফিকার সাথী হয়ে জান্নাতে পলায়ন করব। এসব ভাবতে ভাবতে তার আবার দু'নয়ন অশ্রুতে ভরে ওঠে। আবার হাত তুলে বিনীত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে, "ওগো আমার মাওলা, রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্! আপনার এ অবলা বান্দীকে আপনার খাছ বান্দী হযরত সুফিয়া (রা)-এর মত শক্তি-সাহস দান করুন, যিনি তাঁবুর খুঁটি দিয়ে কাফের সর্দারকে হত্যা করে বন্দী মুসলমান নারীদেরকে উদ্ধার করেছিলেন। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে উম্মে আম্মার (রা)-এর মত সাহস দান কর, যিনি মহানবী (সা)-এর সাথে অনেক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অহুদ যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে তাঁর শরীরের একাধিক স্থানে যখম হয়েছিল। এক বছর পর্যন্ত তাঁর সেই যখম শুকায় নি। যখম না শুকানোর কারণে হামরাউল আছাদের

যুদ্ধে শরীক হতে না পারায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন। যিনি ৫২ বছর বয়সে মহানবী (সা)-এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে শরীক হয়ে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর একটি হাত শহীদ করেছিলেন। তবুও তিনি এক হাতেই তলোয়ার চালিয়েছিলেন। যিনি আহতদেরকে পানি পান করাতেন, নেকড়া পুড়ে ছাই বানিয়ে আহতদের ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে দিতেন। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে হযরত উম্মে হারামের মর্যাদা দান কর, যিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে সামুদ্রিক অভিযান ও সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ আক্রমনে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে মদীনায় পৌঁছার পর খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং এমতাবস্থায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।"

'ওগো আমার রব, তুমি তোমার এ দাসীকে এমন সাহস দান কর, আমি যেন হযরত আকরামার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকিম (রা)-এর মত অবদান রাখতে পারি। যিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং সে যুদ্ধে স্বামীকেও হারিয়েছিলেন। যিনি তাঁবুর খুঁটি তুলে সাতজন যুদ্ধবাজ কাফিরকে হত্যা করেছিলেন। ওগো রব্বে কায়েনাত! আপনি উম্মে যিয়াদ (রা)-এর মত আমার বাহুতে তাকাত দান করুন। যিনি ছয় জন মহিলাকে উদ্বুদ্ধ করে খায়বরের যুদ্ধে নিয়ে যান এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। আমাকে দান করুন বিবি খানছা (রা)-এর মত ঈমান। যিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে চার জন সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর জিহাদ করতে করতে চার ছেলে সহ তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন।"

আয় আল্লাহ, আপনি তো পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের ওপর এবং তোমাদের শত্রুদের ওপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের ওপরও, যাদেরকে তোমরা জান না। আল্লাহ্ তাদেরকে চিনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল-৬০)

আয় আল্লাহ আপনি অপর এক আয়াতে বলেছেন, "তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তাওবা – ৪১)

আপনি আরো বলেছেন, "অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো তোমাদের কর্মহ্রাস করবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ – ৩৫)

আয় আল্লাহ, আপনার পবিত্র আয়াতগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করছি। আমলের জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করুন। আমি আজ এই জিহাদের ময়দানে রাহমানের রাহমানিয়াত, জাব্বারের জাব্বারিয়াত, কাহ্হারের কাহহারিয়াত, সাত্তারের সাত্তাবিয়াত দেখতে চাই। আমি আমার যা আছে তা নিয়েই কাফিরের মোকাবেলায় ঝাপিয়ে পড়ব। ইয়া রাব্বুল আলামীন! তোমার হাবিবের উসিলায় ও শহীদদের উসিলায় আমার এই দোয়া কবুল কর। আমীন!"

এমন সময় মুয়াযযিনের কণ্ঠে আসরের আযান শোনা গেল। সুফিয়া অজু করে নামায আদায় করে গৃহকর্তীর রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করতে পাক ঘরে গেলেন।

সর্দারজী মসজিদ থেকে ফিরে এসে খুব আফসোস করে বললেন, "আহ, আজ রাশিয়ান ফৌজ ও রশিদ দুস্তামের বাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় শতাধিক মুসলমান যার মধ্যে রয়েছে আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তি, ওদেরকে শহীদ করে গণকবর দিয়েছে, আর জ্বালিয়ে দিয়েছে শতশত ঘরবাড়ি, লুণ্ঠন করেছে মা-বোনদের ইজ্জত।

এতক্ষণে টকটকে লাল সূর্যটা নিস্প্রভ হয়ে অস্তাচলে হারিয়ে গেছে। গৃহবধুরা সন্ধার কাজগুলো খুব দ্রুত সেরে নেয়ার চেষ্টা করছে। বালিকারা শামাদান মুছে তৈল ভর্তি করে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাচ্ছে। রাখালরা পশুপাল নিয়ে খোয়াড়ে তুলে কর্ম বিরতি যাপনের চেষ্টা করছে। মুসল্লিরা পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদ পানে ছুটে চলছেন।

সুফিয়াও নামায সেরে দরজা বন্ধ করে সুমাইয়ার দেয়া রাইফেলটি বের করে তিন বার চুমু খেয়ে ভালভাবে পরখ করে নিল। ম্যাগজিনে কার্তুজ ভর্তি করে আলনার পিছনে লুকিয়ে রাখে। প্রতিশোধের প্রবল যন্ত্রণায় সুফিয়া ছটফট করছে। কখন যে রাত গভীর হবে, লোক চলাচল বন্ধ হবে, সে অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। কিছুক্ষণ পরেই গৃহকর্তীর আহ্বান এলো ও ঘরে গিয়ে খানা খেতে। সুফিয়া ওঘরে গিয়ে সামান্য আহার করে কয়েকটি রুটি ও গোশতের কাবাব একটি রুমালে বেঁধে নিল। অতঃপর এক বোতল পানি ভর্তি করে তার রুমে নিয়ে এলো। নিঝুম রাত। চারদিকের কোলাহল বন্ধ হয়েছে। কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মধ্যে দুএকটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে রাতের নীরবতা ভঙ্গ করছে। রাত এক প্রহর পাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় প্রহরে পা রাখছে।

সুফিয়া একটি বড় চাদরে শরীরটা ঢেকে নিয়ে তার অভ্যন্তরে রাইফেলটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। রুটির পুটলিটা ও পানির বোতলটা কটিদেশে ভালভাবে বেঁধে নিল। আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

দূরাকাশে দু'একটি তারকা মিটমিট করে জ্বলছে। মনে হয় ওরা সুফিয়ার পথ নির্দেশনার জন্য এত রাত জেগে আছে। সুফিয়া আস্তে আস্তে পল্লীত্যাগ করে চারণ ভূমিতে এসে উপনীত হল। বেশ কয়েক বছর পর গভীর রাতে সে আজ চারণভূমিতে আসল। পরিচিত সারি সারি খুর্জর বীথিকা। এতো সেই বৃদ্ধ সুলাইমানের বিচারালয়, যেখানে বসে তিনি বালক-বালিকাদের বিচার করতেন। এতো সেই চারণভূমি যেখানে অতীতের হাজারো স্মৃতিগুলো আজো বহন করছে। সুফিয়া চারণভূমি পিছনে রেখে হিন্দুকুশ পর্বতমালার গা বেয়ে ছোট-বড় টিলাগুলো মাড়িয়ে চলছে সোজা উত্তর দিকে। উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা সুফিয়াকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। এগিয়ে চলছে সুফিয়া। রফিককে মুক্ত করবে, দ্বীনের দুশমনকে হত্যা করবে এই তার প্রতিজ্ঞা।

কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার পর দূর থেকে দেখে বেশ কয়টি বিজলী বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। এখানে বিদ্যুত থাকার কথা নয়। হয়ত কৃত্রিম উপায়ে এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে বুঝল, এটাই যে দুশমনের ঘাঁটি তাতে কোন সন্দেই নেই। সুফিয়া বাতিগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। দেখল, বেশ কয়টি তাঁবু বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি তাঁবুতে ৪ – ৫ জন করে সৈন্য থাকতে পারে। তাঁবুগুলোর মধ্যখানে ছোট্ট একটি মাঠ।

সুফিয়া যে চাদরটিতে তার দেহ আবৃত করেছিল তার রং গাঢ় সবুজ। দূর থেকে তাকালে তেমন একটা নজরে পড়ে না। ঝোঁপ-ঝাড় বলে মনে হয়। সে জীবনের মায়া ত্যাগ করে কখনো বসে বসে, কখনো ক্রলিং করে চলল তাঁবুর দিকে। গভীর রাত। এখনো সৈন্যরা মাঠের মধ্যে বসে আছে। একজন ঊর্ধতন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে রুশী ভাষায় অন্যদের কি যেন বুঝাচ্ছেন। সুফিয়ার তা বুঝার সাধ্য নেই।

একটু পর অন্য একজন দাঁড়িয়ে পশ্‌তু ভাষায় বয়ান করেন। তিনি রশিদ দুস্তামের একান্ত অনুগত একজন মেজর। তিনি বলছিলেন, "হে যৌথ বাহিনীর বীর সৈনিকেরা! আমরা ডঃ নজিবুল্লাহ্‌ (আফগানের শাসন কর্তা) ও গর্ভাচেভ (সোভিয়েত শাসনকর্তা)-এর অনুগত বাহিনী। আমাদের ওপর নির্দেশ হল, যেভাবেই হোক মৌলবাদ দমন করে আফগানিস্তানের ঘরে ঘরে, শহরে-বন্দরে কমিউনিজমের পতাকা উত্তোলন করা। এতে যদি নির্বিচারে মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করতে হয় তবে তা-ই করব। যদি বাড়ি-ঘর জ্বালাতে হয় তা-ই করব। মুসলিম ললনাদের ধর্ষণ করতে হয় তা-ই করব। কিন্তু পিছু হটব না। আর মুজাহিদদেরকে জ্যান্ত ধরে এনে ডঃ নজিবুল্লাহর কার্যালয়ে প্রেরণ কর। এতে প্রচুর পুরস্কার পাবে। বক্তৃতা শেষ করার সাথে সাথে করতালিতে রাতের নীরবতা ভঙ্গ হল। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে চলছে মহিলাদের নৃত্য-গীত ও মদ্য পান।

সুফিয়া একটি তাঁবুর আড়ালে এ দৃশ্য অবলোকন করছে আর চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে। এমন সময় তাঁবুর অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছে কান্নার সুর লহরী। আওয়াজ খুবই ক্ষীণ। নারী-পুরুষ তা কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। সুফিয়া এতটুকু বুঝতে পারছে যে, এ তাঁবু গর্ভে রয়েছে কোন বন্দী। সুফিয়া একটি খুঁটির বন্ধন খুলে আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করে দেখে তৈলঅভাবে একটি বাতি নিস্প্রভ হয়ে আসছে। একটু পরেই বাতিটি নিভে যাবে। আর তাঁবুর এক কোণে তিন জন বন্দী উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এদের মধ্যে একজন নারী আর দুজন পুরুষ। বাতিটি নিভে যাওয়ায় তাদের চেহারা সনাক্ত করতে পারে নি সুফিয়া।

সুফিয়া খুব দ্রুত বন্দীদের হাত পায়ের বন্ধন খুলে চুপি চুপি বলল, ভাইয়েরা! আপনারা জলদি এ স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। আপনারা এখন মুক্ত। বন্দীরা বন্ধন মুক্ত হয়ে মুক্তিদাতাকে চিনতে চাইল কিন্তু নারী না পুরুষ তা ঠাওর করতে পারল না। এদের মধ্যে একজন বলল, "হায়! কোথায় যাব, পথ-ঘাট তো কিছুই চিনি না।" প্রহারে প্রহারে সবাই বিপর্যস্ত। সোজা হয়ে দাঁড়ানোও তাদের জন্য কষ্টকর।

সুফিয়া নিজ হাতে তাদের হাত-পাগুলো মর্দন করে দিল। যেন তাদের অবশ শরীর সবল হয়ে ওঠে। এরপর সবাইকে তাঁবুর পিছন দিক থেকে বের করে নিয়ে এলো। গুরুতর আহত ব্যক্তিটিকে নিজ কাঁধে ভর করিয়ে সামনে চলল। বাকী দুজন একটু একটু হাটতে পারছে। আসল পথ এড়িয়ে সুফিয়া ওদেরকে নিয়ে চলছে জঙ্গলের দিকে। যেন দুশমনরা কোনভাবে আসামী পালানোর ব্যাপারে টের না পায়। কয়েকটি টিলা ও ঝোঁপ-ঝাড় পাড়ি দিতে গিয়ে অনেক কষ্ট হয়েছে এদের। চলার পথে লতা-গুল্ম পায় জড়িয়ে ধরে চলার গিত থামিয়ে দেয়। মনে হয় ওরাও যেন এদের বিশ্রাম নিতে পায় ধরছে। লতা-পাতা ও কাঁটায় বার বার কাপড় আঁকড়িয়ে ধরছে। ওরা যেন বলছে, "হে পথিক! একটু থেমে যাও।" কিন্তু পথিকের গতিরোধ করতে পারে নি বলে সকলের জামা-কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ পথ চলার পর আস্তে আস্তে পাগুলো থেমে গেল। এখন ওরা দুশমনের নাগালের বাইরে। একটি গাছের মূলে বসে তারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

এতক্ষণ কারো মুখে কোন কথা ছিল না। শুধু ছিল আল্লাহর নাম। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মৃত্যুর হাত থেকে এক হৃদয়বান ব্যক্তির উসিলায় আল্লাহ তাঁদের রক্ষা করেছেন। সবাই আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

এখনো কেউ কাউকে চিনে না। মাওলানা রফিক বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন, "ভাই আপনি কে? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ আঁধার রাতে আমাদেরকে মুক্ত করতে এসেছেন?" সুফিয়া ভারি কণ্ঠে বলল, "আমার পরিচয় পরে হোক, আগে আপনাদের পরিচয় জেনে নিই।" এই বলে পাশের লোকটিকে প্রশ্ন করলে, তিনি উত্তর দিলেন, "আমার নাম মাওলানা ইসমাঈল। নিবাস জালালাবাদে। আমি এক মসজিদে ইমামতি করি। পাষণ্ডরা আমাকে ও আমার বোন সুরাইয়াকে ধরে নিয়ে এসেছে।"

সুরাইয়া নাম শুনার সাথে সাথে সুফিয়া অবাক হল। সুফিয়া সুরাইয়াকে প্রশ্ন করল, "আপা, আপনি কি হামেদ দারোগার সহধর্মিনী? হাজী সেলিম কি আপনার পিতা?"

সুরাইয়া আশ্চর্য হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যা মনে করছেন তা-ই। তবে কি করে আমাকে চিনেন?"

"সে কথা কি ভুলে গেছেন, যে দিন আপনার পাষণ্ড স্বামী আমাদেরকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। আপনি আমাদের প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। হাজতখানার তালা খুলে আপনিইতো আমাদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে রাতের আঁধারে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আমিই সেই হতভাগিনী সুফিয়া।"

রফিক সুফিয়ার কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "সুফিয়া, তুমি সুফিয়া! এত দূর পথ আঁধার রাতে একা একা কি করে এলে আমাদের উদ্ধার করতে? আমি না তোমার স্বামী হতে চাচ্ছিলাম। তা তো হতে দেয় নি হানাদার বাহিনীরা। তাহলে সত্যিই কি তোমার হৃদয়ে আমি বেঁচে আছি। ভুল নি কি আমাকে? এ বলে মাওলানা রফিক সিজদায় পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সুফিয়া ও দেশবাসীর জন্য দোয়া করলেন।

[আটাইশ]

প্রশিক্ষণের নামে চলে গেল দশ-বার দিন। অঙ্গভঙ্গি, নাচ-গান এগুলো হল প্রশিক্ষণের মূল বিষয়। তাছাড়া, কিভাবে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ঘরে ঘরে প্রবেশ করানো যায়, বিশেষ করে নারী সমাজ-এর ওপরও তালিম চলল। এ দশ দিনে মাহমুদার যৌন চাহিদাও অনেকটা মিটল। এবার সকলে চলে গেল নিজ নিজ কর্মস্থলে। পরের দিন আবার শিক্ষা সফরের তারিখ ধার্য করা হল।

মাহমুদা আলম খান এর সাথে চলে এলো ভাড়া বাসায়। প্রতিদিন সকাল ৯ টায় আলম সাহেব অফিসে চলে যান, আসেন সন্ধার একটু পূর্বে। মাহমুদাও চলে যায় সকাল ৮ টায় তার ব্রাঞ্চ অফিসে, ফিরে সন্ধায়। এভাবেই চলছে তাদের দিনকাল। মাহমুদার অফিসে পুরুষ ৩ জন আর সবাই মহিলা। কারো বিয়ে হয়েছে, কারো বিয়ের কথা চলছে। তবে সব মহিলাকে এই তিন পুরুষের মন রক্ষা করতে হয়। কারণ এরা তাদের বস। না হয় চাকরি খোয়া যাবে। মাহমুদা প্রায়ই আলমের নিকট তার প্রিয় বান্ধবী আতিকার প্রশংসা করে। আতিকাও একজন বয় ফ্রেন্ডের সন্ধানে আছে তাও জানাল। মাহমুদার প্রশংসায় আলমের পশুবৃত্তিতে এক নতুন স্পন্দন জাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক তার আতিকাকে বাগে আনতেই হবে।

বেশ কিছুদিন পর কোন এক রাতে আনন্দঘন মুহূর্তে মাহমুদা আলমকে বলল, "আমাদের তো বিয়ে হয় নি, চলুন না এভাবে না থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাই।"

আলম একথা শুনে রেগে ফায়ার হয়ে বলল, "এটা তো পুরনো দিনের কিচ্ছা। যখন মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছু জানত না। কনডম, প্যানথার ইত্যাদি আবিস্কার হয় নি। তখন ধর্মের আবরণে বিবাহ প্রথা চালু ছিল।"

"বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। উন্নত দেশগুলোতে বিবাহের মত মধ্যযুগীয় বর্বরতা নেই। যে যাকে ভালবাসে তারা একসাথে থাকে। দুজনের মধ্যে গরমিল হলে আবার অন্যকে ভালবেসে কাছে টেনে নেয়। আধুনিক মেয়েরা এক স্বামীর ঘরে থেকে জ্বালা পোহাতে রাজি নয়। এক রং-এর কাপড় সব সময় পরতে কার রুচিতে ধরে? এক ধরনের তরকারী সব সময় ভাল লাগে? দুনিয়া যেমন পরিবর্তনশীল, মানুষের রুচিও পরিবর্তনশীল। কাজেই তোমার এসব কথা যদি বন্ধুরা শুনে তবে তারা হাসতে হাসতে মরবেন, বুঝলে সুন্দরী?"

মাহমুদা আলমের কথা শুনে বলল, "আপনার কথা ঠিক তবে সমাজ যে তা মেনে নেবে না। কোন দিন যদি পিত্রালয়ে যেতে হয় তাহলে যেন ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। তা না হয় বিবাহের কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"মাহমুদা, আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস কম। তুমি ভাবছ, আমি যদি তোমাকে ফেলে চলে যাই? তাই না? ওসব তোমার ভুল ধারণা। আমরা (এন. জি. ও. রা) সব সময় থাকতে চাই বাধা-বন্ধনহীন, স্বাধীন ও মুক্ত। আমরা এভাবেই সমাজটাকে ঢেলে সাজাতে চাই। আমার সাথে থাকতে তুমি সমস্যা মনে করলে অন্য বয়ফ্রেন্ড যেন খুঁজে নিতে পার এই সুযোগ থাকা চাই। আমি মনে করি, তোমার আমার ভালবাসা চির দিন অম্লান ও অক্ষুণ্ন থাকবে। এতে কোন ফাটল ধরবে না।" মাহমুদা কোন উত্তর না দিয়ে নীরব হয়ে গেল। এভাবেই তাদের কাটতে লাগল দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ আর পক্ষের পর মাস। সন্তান গর্ভে না আসার জন্য আমেরিকা যত ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে সব ধরনের ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে।

কিছু দিন যেতে না যেতেই আলম সাহেবের বদলি পরোয়ানা আসল। মাসের শেষ তারিখে বাগরাম প্রদেশে তার বদলি। আলম মনে মনে খুবই উৎফুল্ল। তার দীর্ঘ দিনের তামান্না আজ প্রতিফলিত হতে যাচ্ছে। মাহমুদার ডায়েরি থেকে আতিকার ঠিকানা ও ছবি চুরি করেছিল অনেক আগে। তা মাঝে মাঝে খুলে দেখেন। বাগরামে গিয়ে চাকরিতে যোগদান করার সাথে সাথেই আতিকার খোঁজ নেবেন, এটাই তার সংকল্প।

আলম সাহেবের বদলির কথা শুনে মাহমুদা চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে। একা একা কিভাবে বাসায় থাকবে, কিভাবে আলমকে ছাড়া দিন কাটাবে তা স্থির করতে পারছে না মাহমুদা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভার সামলাতে না পেরে আলমের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবুঝ বালিকার ন্যায় কেঁদে ফেলল মাহমুদা। আলম মাহমুদার অশ্রু মুছে দিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে অস্পষ্ট আওয়াজে তার মনের দুঃখ-বেদনা খুলে বলল। আলম প্রিয়তমার কথা শুনে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "মাহমুদা, তুমিই আমার একমাত্র আদরিণী, সোহাগিনী। তোমায় ছাড়া সামান্য সময় দূরে থাকতে পারি না। তোমার দিকে তাকালে আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। তোমার মধুমাখা ও স্নিগ্ধ পরশে আমার হৃদয়-মন আনন্দে ভরে যায়। তোমার চাহনিতে আমার প্রাণ জুড়ায়। তোমার মুচকি হাসিতে আমার হৃদয়ে প্রেমের মুর্ছণা জাগায়। তোতা পাখির মত তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমার হৃদয় গলে যায়। তোমার নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার শরীর প্রেমাবেশে রোমাঞ্চিত হয়। তোমাকে ছাড়া আমার ক্ষণিকের তরেও থাকা সম্ভব নয়।"

"দেখ মাহমুদা, নতুন চাকরি হয়েছে তোমার। আর আমার হয়েছে বদলি, বেতনও পাব আগের চেয়ে দেড় গুণ। এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আমি প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে বাসায় এসে তোমার সাথে সাক্ষাত করব। প্রয়োজনে দু'একদিন তোমার সাথে থাকব। তারপর দুএক মাস পার হলে আমার অফিসে অথবা পার্শ্ববর্তী কোন অফিসে তোমার চাকরির ব্যবস্থা করব ও একটি সুন্দর বাসা ভাড়া নেব। সেখানে থাকব শুধু তুমি আর আমি। কি বল সুন্দরী?"

এবার মাহমুদার মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। যেমন মেঘের আড়ালে সূর্যের ঝিলিক। এবার মাহমুদা আলমের হাতদুটি চেপে ধরে বুকে তুলে বলল, "আলম ভাইয়া, তুমি কিন্তু আমায় ভুলবে না। যা বলছ তা যেন সত্যি হয়। আমি প্রতি সপ্তাহে তোমার জন্য নরম বিছানা পেতে অপেক্ষা করব। না আসলে কিন্তু ....।"

"আরে পাগলিনী, যা বলেছি তা-ই হবে। তবে কোন সময় কাজের চাপে যদি আসতে না পারি তবে কিন্তু দুঃখ পেয়ো না। কারণ, আমার তত্ত্বাবধানে রয়েছে প্রায় ৩০ টি ব্রাঞ্চ অফিস, সে সাথে স্যারের খবরাখবর ও দেখ-ভাল তো আমাকেই করতে হবে। কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান আমাকেই করতে হবে। এসব কারণে আসতে না পারলে ক্ষমা সুন্দর নজরে দেখবে প্রিয়তমা!"

মাহমুদা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আলম নির্ধারিত তারিখে বাগরামের উদ্দেশ্যে জালালাবাদ ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অধিনস্থ শতশত কর্মচারী তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে আসছেন। অফিসাঙ্গনে লোকজন এসে ভীড় জমিয়েছে। আলম সাহেব সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "প্রিয় সহকর্মী

ভাই-বোনেরা, আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায়লগ্নে আপনাদের জানাই বিদায়ী অভিনন্দন। আজ আমি আপনাদেরকে কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। আশা করি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করবেন।"

"প্রিয় সহকর্মী ভাই ও বোনেরা! আমরা (এন. জি. ও.) যে অঙ্গীকার নিয়ে আফগানিস্তানে কার্যক্রম আরম্ভ করেছি তা ক্রমান্বয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শতকরা ৪৫ জন বেকার ও অসহায় মহিলাদেরকে আমরা কাজ দিতে পেরেছি। এখনো ৫৫ জন মহিলা মৌলবাদীর পোষাক পরে আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাই তবে মৌলবাদী সংগঠনগুলোর এমন শক্তি নেই যে, আমাদের অগ্রযাত্রা রোধ করবে। আগামী তিন বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব বলে আশা রাখি। এতে আপনাদেরই স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রিয় এলাকার গরীব ও অসহায় জনগণ, আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ফতোয়াবাজদের তোয়াক্কা না করে আমাদের থেকে ঋণ নিয়ে সাবলম্বী হওয়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মৌলবাদীরা চায় আপনাদেরকে প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে এনে সমাজের বোঝা বানিয়ে রাখতে। ওরা চায় মসজিদ মাদরাসা, আর খানকায় বসে বসে হালুয়া রুটি খেতে। আর আপনারা গতর খাটা পয়সাগুলো হাদীয়া হিসেবে তাদের হাতে দোয়া ও খতমের জন্য তুলে দিতেন। সাবধান, সাবধান! ওদের কথায় কোন দিন কান দেবেন না।"

"প্রিয় এলাকাবাসী ও আমার সহকর্মীবৃন্দ! আমাদেরকে (এন. জি. ও.) উৎখাত করার জন্য মৌলবাদীরা সংগঠিত হচ্ছে। ওরা নাকি আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ওরা জানে না যে, আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসি নি। ডঃ নজিবুল্লাহ্ সরকার আমাদেরকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। আমাদের পক্ষে রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রাশিয়া। এদেশ থেকে ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার কর্মীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। ওরা প্রশিক্ষণ শেষে রিক্ত হাতে ফিরবেন না। ওরা গোলা-বারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেশে আসবে। আমাদের বড় বড় অফিসগুলোর মধ্যে (আন্ডার গ্রাউন্ডে) রয়েছে অস্ত্র রাখার বিশাল কক্ষ। ইতোমধ্যে বেশ কিছু অস্ত্র আমাদের হাতে এসে গেছে। তা সরকারও জানে না। আমরা যখন কাজে নেমে যাব, তখন মোল্লা-মুন্সিদের পালানোর জায়গা থাকবে না। কাজেই আপনারা কোন ভয় করবেন না। সাহসিকতার সাথে এন. জি. ও. পতাকা নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন। বিজয় আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

আলম সাহেব এলাকার দরিদ্র জনগণ ও রেখে যাওয়া সহকর্মীদের আলেম-উলামাদের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুললেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অন্তরে

এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আফগানবাসী খুব শক্ত ঈমানের দাবীদার। ইসলামকে ওরা সযত্নে হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে রাখে। তাৎক্ষণিকভাবে আলম সাহেবের কথার কোন জবাব দেন নি বটে। কিন্তু কথাগুলো তাদের দিলের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। অনেকেই আগামী দিনের অপেক্ষায় রইলেন। জনগণ প্রতিবাদ না করায় আলম সাহেব বুঝলেন, সকলেই তাদের পক্ষে।

বেলা ১১টা। গাড়ী এসে অফিসাঙ্গিনায় অপেক্ষা করছে। এ গাড়ীতে চড়েই তিনি বাগরাম যাবেন।

আলমের বিরহ যাতনায় মাহমুদার অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। মাহমুদার বিগলিত অন্তরে একটি প্রশ্ন বার বারই উঁকি দিচ্ছে, অল্প দিনের ব্যবধানে উভয়ের অবস্থান দুই মেরুতে। আলম তো আমার স্বামী নয়, তাকে তো কোন দিন স্বামী হিসেবে দাবী করাও সম্ভব নয়। সে তো আমাকে বিয়ে করে নি। আমার মত আরো যে দুচার জন মেয়ে তার খায়েশের খোরাক নয়, এমন নয়। আমার চেয়ে আরো সুন্দরী কোন মেয়েকে যদি সে বাগে আনতে পারে, তাহলে আমার খবর না নিলেই বা তার কি ক্ষতি হবে। ভ্রমর যেমন ফুলের মধু পান করে নিরুদ্দেশে ডানা মেলে উড়ে যায়, পুরুষরা তো তা-ই। নারীদের অমূল্য সম্পদ সতীত্ব। এ অমূল্য সম্পদ উদার চিত্তে বিলিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে সব অফিসারই আমার রূপের পাগল। এখন তো বন্ধু জুটানো আমার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। তারা 'আপা' 'আপা' ডেকে দু'হাত বাড়িয়ে নিজ চেয়ারে বসায়। সিনেমায়, পিকনিকে, ভ্রমণে, ক্লাবে, পার্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কলিরা যখন ফুটে, সৌরভে ভরে যায় গোটা এলাকা। দূর-দূরান্ত থেকে মধুমক্ষিকারা গুণ্‌গুণ গান গেয়ে ছুটে আসে মধু আহরণে। যতদিন মধু থাকে, ততদিন বাগান মুখরিত থাকে দোয়েল শ্যামা, কোকিল, বুলবুল আর পাপিয়ার তানে। ফুলেরা যৌবন হারিয়ে যখন ঝরে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পাপিয়া আর মৌমাছিরা পালিয়ে যায় অন্য কাননে।

এমন একদিন আসবে, যেদিন বার্ধক্যজনিত কারণে আমার যৌবনে ভাটা পড়বে। থাকবে না রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য। থাকবে না শরীরের মসৃণ পেলব, চামড়া হয়ে যাবে ঢিলা। ভেঙ্গে যাবে গলার স্বর। তখন এ কণ্ঠে কেউ শুনবে না প্রেমের গান, করবে না কেউ প্রেম নিবেদন। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়, তারা তো বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একই সাথে কাটায়। সুখে-দুঃখে হয় একে অপরের সাথী। সে দিন সন্তানরা পিতা-মাতার খোঁজ-খবর নেয়। নাতি-নাত্‌নী নিয়ে তারা মেতে ওঠে খেলায়। আমার জীবনে তো এমনটা হওয়ার নয়। হায়, আমার জীবনটা কি তাহলে এমনি নিঃশেষ হয়ে যাবে? সুখ দেখতে পাব না? পিত্রালয়ে আত্মীয়-স্বজনরা ছিঃ ছিঃ করবে। মাহমুদার অন্তরে এসব চিন্তা এসে শেলের মত আঘাত হানছে। চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরছে।

আলম সাহেব ব্যাগ-ব্যাডিং নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসলেন। মাহমুদা বিগলিত হৃদয়ে আঁখি ভরা জল নিয়ে শেষ বারের মত প্রিয়তমের পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। আলম মাহমুদার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এদিকে ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ মাহমুদা অশ্রুসিক্ত নয়নে আলমের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাল। এমনিভাবে আলম এক সময় হারিয়ে গেল মাহমুদার দৃষ্টি থেকে।

☆☆☆☆☆☆

বিকাল পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে গাড়ী এসে পৌঁছল বাগরামের অফিসের সামনে। নতুন এলাকা, নতুন মানুষ। কারো সাথে পরিচয় নেই। অফিসের লোকজন আলম সাহেবকে স্বাগতম জানাল। সবাই ‘স্যার’ ‘স্যার’ বলে কুশল বিনিময় করল। অফিসের কর্মচারীরা প্রায় সবাই তরুণ-তরুণী। গালভরা হাসি, বাঁকা চোখের চাহনি, মিষ্টি-মধুর বচন ও অমায়িক ব্যবহারে আলম সাহেব খুবই খুশী। তরুণীদের মধ্যে যারা আছে, ওরা মাহমুদার স্থান পূরণ করতে পারবে বলে আলম নিশ্চিন্ত।

[ঊনত্রিশ]

সুরাইয়্যা সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল এবং বলল, “সুফিয়া! তাহলে আজ তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করলে! জানের বদলে জান বাঁচালে। সে দিন তো তোমরাও ছিলে তিন জন, (তুমি, মাওলানা আকরাম ও পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ) আজ আমরাও তিন জন, তাই না!” সুফিয়া উত্তরে বলল, “সব আল্লাহর ইচ্ছা, এতে আমার কোন বুজুর্গী নেই। এ বলে কোমরে বাঁধা খাদ্যের পুটলি ও পানির বোতলটি বের করে বলল, “এখন ওসব কথা বাদ দিয়ে কিছু আহার্য গ্রহণ কর বোন! ক্ষুধায় তো মনে হয় জীবন যায় যায়। ইস কতই না কষ্ট দিয়েছে পাষণ্ডরা। নাও তিনজনে এগুলো খেয়ে একটু পানি পান করো। বাড়ি গিয়ে আরো অনেক আলাপ হবে।”

সুরাইয়্যা ও তার বড় ভাই রেজা এবং মাওলানা রফিক রুটি খেতে লাগল। ওরা তো জীবনে কোন দিন উপোষ থাকার কষ্ট অনুভব করে নি। রোযার দিনেও ততটা বোধ করে নি অনাহারের মর্মজ্বালা। কয়েক সন্ধা অনাহারে থাকার পর আহার্য্যগুলো পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন তাঁরা। মাওলানা রফিক

সুরাইয়্যার কথাগুলো মোটেই বুঝতে পারেন নি। "ওরা কি বলল, জানের বদলে জান রক্ষা হয়েছে আর তিন জনের বদলে তিন জন। আবার আমার পিতার কথাও বলছে, এসব কি?"

মাওলানা রফিকের অজানাকে জানার অভিলাষ প্রবল হয়ে উঠল। তাই খানা খাওয়ার এক ফাঁকে সুফিয়াকে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা ইশারা ইংগীতে এসব কি বলছ? শুনাবে না আমাদেরকে তোমাদের গোপন কাহিনী?"

সুফিয়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে উত্তর দিল, "আরে মিয়া সাহেব! ওসব অন্য কিছু নয়, আমারই দুঃখের কাহিনী। এগুলো শুনে লাভ নেই, তবু বলছি শুনুন!" ভাই সুফিয়ানের কথা, পিতা-মাতার কথা ও থানায় কিছু সময় কেন, কিভাবে কাটিয়েছে এসব সংক্ষেপে বলে সুফিয়া। সুরাইয়্যার উসিলায় কিভাবে জীবনে রক্ষা পায় ও ইজ্জত বাঁচায় তারও ইতিহাস শুনায়।

মাওলানা রফিকের কাছে কথাগুলো কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। তিনি যেন অন্য কোন মেরুতে হারিয়ে গেলেন। কি বলবেন, ভাষাও হারিয়ে ফেলছেন মাওলানা রফিক।

সুফিয়া গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে ফনিনির ন্যায় বলল, "আরে মিয়া! সময় কিন্তু অনেক হয়ে গেছে, পথও রয়ে গেছে অনেক। সুবহে সাদিক আগমনের পূর্বেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। তা না হয় দুশমনের মোর্চায় ফিরে যাওয়া উত্তম। গল্প করে সময় খোয়ানোর কোন যৌক্তিকতা নেই।" এই বলে সুফিয়া ওঠে দাঁড়ায়। সুফিয়ার দেখা-দেখি বাকী তিনজনও দাঁড়িয়ে যায়।

সুফিয়া আগে আগে হাঁটছে বাকীরা পিছনে। রফিক পিছনের দিক থেকে ডেকে বললেন, "সুফিয়া! কোথায় যাচ্ছ? তুমিতো রাস্তা ভুল করছ।"

সুফিয়া উত্তরে বলল, "ভাইয়া! রাস্তা ভুল করি নি। একটু কষ্ট হলেও ঘুরা পথে যাব। যদি রাস্তায় কোন লোকের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়? তাহলে খবর গোপন থাকবে না। কাজেই এভাবেই পথ চলা সঙ্গত মনে করি। এখন আপনি যা বলেন তা-ই করব।" বলল সুফিয়া।

মাওলানা রফিক সুফিয়ার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলেন না। এভাবে চুপিচুপি পথ চলতে চলতে সুবেহ সাদিকের একটু আগেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছল তারা। মাওলানা রফিক বাড়িতে প্রবেশ করেই বৃদ্ধা মায়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্ষিণ আওয়াজে ডাকলেন, "আম্মু! আম্মু! তোমার আদরের ছেলেটি ফিরে এসেছে, দুয়ার খোল। আম্মু! তোমার বন্দী ছেলে বন্ধন ছিঁড়ে তোমার কোলে ফিরে এসেছে। দুয়ার খোল আম্মু!!"

দুঃখিনী মাতার চোখে ঘুম নেই আজ দুদিন। অঘুম নয়নে রাত দিন পাড়ি দিচ্ছেন। ঘরে রান্না-বান্না নামকে ওয়াস্তে। তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব। আম্মু-আম্মু ডাক শুনে মনে করছেন স্বপ্নের ঘোরে রফিক এসে অমন করে ডাকছে। রফিকা আর একটু আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়ায় তিনি বুঝতে পারছেন এ স্বপ্ন নয়, বাস্তব। মা চিৎকার দিয়ে দরজা খুলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "বাবা! তুমি কিভাবে এলে, তুমি না বন্দী ছিলে?"

সুফিয়া মুখে হাত দিয়ে ইশারা দিল কথা আস্তে বলার জন্য। মা এতক্ষণ সুফিয়াকে দেখেন নি। এবার চেয়ে দেখেন, সুফিয়া গায়ে এক ইয়া বড় চাদর জড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে আরও দুজন লোক।

বৃদ্ধা সুফিয়াকে বললেন, "মা! ও ঘরটি খুলে দাও, মেহমানদের বসতে দাও। বাতি জ্বালো। বিছানা পেতে দাও। যাও মা।" পল্লীসর্দার বাইরে লোকের কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। হারানো পুত্রের সাক্ষাত পেয়ে খুশীতে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "বাবা! আয় বাবা, আমার বুকে আয়? আমার বিগলিত কলিজা ঠান্ডা কর। তোমাকে যে আল্লাহ্ আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন তা কোন দিন ভাবি নি" এ বলে বাপ-বেটা বুকে বুকে বুক মিলিয়ে নীরব ভাষায় কি যেন বলছেন। বাপ-বেটার মিলন দৃশ্য ছিল এক অপূর্ব আনন্দময় ও স্মরণীয় বিষয়। আকাশের তারকারাও তখন গগন জুড়ে আনন্দ মিছিল করছিল। নিহারিকা আনন্দে বহু দূর ছুটে গেছে। ইউসুফকে হারিয়ে ইয়াকুব (আ)-এর অবস্থা যেমন হয়েছিল, পল্লী সর্দারের অবস্থা তাঁরই মত। চিরতৃষ্ণার্ত মরুভূমির উড়ন্ত বালু-কণারা শূন্য থেকে যেমন নেমে আসে ধরাপৃষ্ঠে, আজ সর্দারজীর অবস্থাটা ঠিক তেমন। ছেলেকে পেয়ে পিতার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনে যেন পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে। সুফিয়া সবাইকে সতর্ক করে বলল, "রাত বিদায় নিয়েছে। আঁধার দূরিভূত হয়েছে। পাখ-পাখালিরা ভোরের আগমনী গান ধরেছে। অল্পক্ষণ পরেই মুয়াজ্জিনের আযান শোনা যাবে। আপনারা মসজিদে না গিয়ে ঘরেই নামায আদায় করুন। কারণ, আপনাদের মুক্তির সংবাদ গোপন থাকা ভাল মনে করি। কেননা, সংবাদটা যদি প্রকাশ হয়ে যায় তবে যে কোন মুহুর্তে আবার গ্রেফতার হওয়ার আশংকা রয়েছে। যান, অযু করে ঘরে চলে যান। সারা রাত তো একটুও ঘুমোতে পারেন নি। আমি এক্ষুণি আপনাদের জন্য রুটি সেঁকে নিয়ে আসছি। নামায সেরে রুটি খেয়ে ভালমানুষের মত ঘুমিয়ে পড়ুন।

সুফিয়া এই বলে চলে গেল পাক ঘরে। অন্যরা অযু করে নামাযের জন্য তৈরি হচ্ছেন। আর সর্দারজী চলে গেলেন মসজিদে। ওরা নামায শেষ করে তাসবীহ তাহলীল আরম্ভ করার পূর্বেই রুটি নিয়ে হাজির। মেহমানরা রুটি খাচ্ছেন। সুফিয়া

নামায পড়ে তিলাওয়াতে বসে গেল। সুফিয়ার কোমল অন্তরে বার বারই রফিকার কথা উদয় হয়ে ব্যথায় ভরে তুলল। সে মনে মনে ভাবছে, আজ সে কোথায়, যার সাথে আমার প্রতিদিন চলত তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা। আমাকে কাঁদিয়ে সে আজ জান্নাতে চলে গেছে। সে আজ আর পার্শ্বে গুণগুণিয়ে হাদীস অধ্যয়ন করে না। আহঃ তার বদলে যদি আল্লাহ আমাকে নিয়ে যেতেন। এসব ভাবনায় এবং অশ্রুর বন্যায় সুফিয়ার কামিজ ভিজে যাচ্ছে।

মেহমানরা সবাই রুটি খেয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। সর্দারজী মসজিদ থেকে এশরাক নামায আদায় করে সুফিয়ার ঘরে ঢুকে দেখেন, সুফিয়া অঝোর ধারায় কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সর্দারজী একটি কাশি দিয়ে সুফিয়াকে বললেন, "মা-মনী! আল্লাহ্ তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করেছেন। মেহেদির রংটুকু মুছে যাওয়ার আগেই তোমার প্রিয়তমকে ফিরে পেয়েছ। দেখ মা, আল্লাহ কত মহান, কি তাঁর কুদরতী কেরেশমা। সে দিন হাজার চেষ্টা করেও চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছি। ভেবেছিলাম, দোয়া করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তোমরা সবাই দোয়া করেছ! আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন। তিনি সুফিয়ার কাছে বাকী মেহমানদের কথা জানতে চাইলেন।

মাওলানা রফিক ও বাকী দু'জন মেহমান কিভাবে ছাড়া পেলেন সর্দারজী ও তাঁর পত্নী কিছুই জানেন না।

সুফিয়া এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত করে বলল, "চাচাজান! আপনি যে মেহমানদের কথা জানতে চেয়েছেন এদের মধ্য হতে মহিলা মেহমান হলেন আমাদের মুক্তিদাতা সেই মহিয়সী সুরাইয়্যা, যিনি থানা থেকে আমাদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। যিনি বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনটি অস্ত্র। তিনি সেই হামেদ দারোগার স্ত্রী ও হাজী জসিমের কন্যা। সাথে তাঁর বড় ভাই রেজা। অসভ্য বর্বর রুশীরা ওদেরকেও রাস্তা থেকে ধরে এনে শারীরিক নির্যাতন করে বন্দী করে রেখেছিল। ছিনিয়ে নিয়েছে এদের টাকা-পয়সা-ও অংলকার। সুরাইয়্যার দেয়া চাইনিজ রাইফেলটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম রাত দুপুরে। আল্লাহর রহমতে সুবেহ সাদিকের পূর্বেই ফিরে এসেছি গন্তব্যে।" সুফিয়ার কথা শুনে সর্দারজীর ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল বটে কিন্তু একজন মহিলা দ্বারা কি করে তা সম্ভব হল এ নিয়ে তিনি দিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সর্দার পত্নী ও সর্দারের যবান থেকে আসল ঘটনা জানতে পারলেন। এতক্ষণে সুফিয়ার চোখ দুটিও ঘুমে ভারি হয়ে আসছে। সর্দারজী সুফিয়ার অবস্থা অবলোকন করে বললেন, "মা-মনী! আমি যাই, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও মা!" এ বলে সর্দার নিজ কক্ষে ফিরে গেলেন।

সময় দুপুর ১২টা। সুরাইয়্যা জাগার সাথে সাথে সুফিয়ার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। সুফিয়া সুরাইয়্যাকে বলল, "আপা মনী! আপনি গোসল সেরে নিন, অনেকটা আরাম হবে, তারপর নামায ও খানাপিনা সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ির পথ ধরবেন। বুঝি, এখানে আপনাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে। আর কষ্ট হওয়ারই কথা। কারণ, একদিকে মানসিক অশান্তি অপর দিকে খেদমতের অবহেলা। কাজেই যদি আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি তবে নিজেও শান্তি পাব।"

সুরাইয়্যা উত্তরে বললেন, "সুফিয়া! এসব কথা বলে মেহমানকে কষ্ট দিলে, যদি শান্তি পাও, তবে আর যা আছে বল। খেদমতে অবহেলা আবার কখন হল? তোমার ঋণ কি জীবনে পরিশোধ করতে পারব? দোয়া করি মাওলানা রফিকের সাথে বিয়ে হওয়ার দাম্পত্য জীবনের আনন্দ উপভোগ কর।"

সুফিয়া বলল, "আপু! ঝর্ণাতে গিয়ে গোসল না করে বাড়িতেই করুন। আমি এক্ষুণি পানি নিয়ে আসছি।" এ বলে দুটি মশক নিয়ে ঝর্ণার দিকে পা বাড়াল সুফিয়া। একটু পরে পানি ভর্তি মশক এলে সুরাইয়্যাকে গোসল করতে বলল, এদিকে সাবান, তোয়ালে ও কাপড় বাড়িয়ে দিল। সুরাইয়্যা গোসল শেষ করতে না করতে আর কয়েক মশক পানি নিয়ে এলো এবং বলল, "আপনার ভাইয়া রেজাকে ডেকে দিন, তিনিও গোসল সেরে ফেলুক।" সুফিয়া নিজে জাগিয়ে দিল মাওলানা রফিককে।

ওরা গোসল সেরে নামায পড়ে নিল। গৃহকর্তী খানাপিনা তৈরি শেষ করেছেন একটু আগেই। সুফিয়া নিজ হাতে খানা নিয়ে মেহমানখানায় হাজির হল। মেহমানরা তৃপ্তি সহকারে আহার করে বিছানায় গেল। এদিকে সুফিয়া গোসল, খানা ও নামায সেরে রফিকার পড়ার ঘরে ঢুকল এবং সুরাইয়্যাকে ডেকে পাঠাল। সুফিয়া দরজা জানালা বন্ধ করে সুরাইয়্যাকে বলল, "আপু! আপনি তো ছিলেন দারোগার বউ। অস্ত্র সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার কথা। যতটুকু পারেন, আমাকে একটু শিখিয়ে দেন না আপা!" সুরাইয়্যা বললেন, "অত কিছু তো বলতে পারি না, তবে সাধারণ কিছু ধারণা দিতে পারব। আমার পাষণ্ড স্বামী ও এলাকার সন্ত্রাসীরা আমাদের বাসায় বসে যখন অস্ত্র খুলে মুছত আবার তৈল লাগিয়ে জোড়ায় জোড়ায় মিলাত তা দেখে দেখে অনেকটা আয়ত্ব করেছি। অনেক সময় জালেম স্বামীর অস্ত্রগুলো আমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছি।"

সুফিয়া দুটি অস্ত্র বের করে বলল, "এটা আপনার দেয়া হাদীয়া।"

সুফিয়া : আর এটা গতরাতে রাশিয়ার ক্যাম্প থেকে গনিমত হিসেবে নিয়ে এসেছি। এটার নাম কি আপা?

সুরাইয়্যা : এটার নাম হল স্টেনগান, এটাও রাশিয়ার তৈরি।

সুফিয়া : চারিদিকে অনেকগুলো ছিদ্র, তা দিয়ে কি গুলী বের হয়?

সুরাইয়্যা ঃ না, এগুলো দিয়ে বাতাস ঢুকে বেরেল ঠান্ডা রাখে। তা না হয় ব্রাশ ফায়ারে বেরেল গরম হয়ে যায়, ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

সুফিয়া ঃ ব্রাশ ফায়ার কি আপা?

সুরাইয়্যা ঃ ব্রাশ ফায়ার হল একসাথে ২৮ টি গুলী বেরিয়ে যাওয়া। আর সিংগেল হল এক টানে একটা করে বের হবে।

চাইনিজ রাইফেল ও স্টেনগান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দিলেন সুরাইয়্যা। খোলা, মুছা, ফিট করা, ম্যাগজিনে গুলী ঢুকানো, ম্যাগজিন খোলা ও লাগানো ইত্যাদি। এবার সুফিয়ার সাহস আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়ে গেল। তাই খুশীতে নিজকে হারিয়ে ফেলার উপক্রম। এখন সে নিজে নিজে আল্লাহর শোকর আদায় করতে গিয়ে বলল, "সুরাইয়্যা আপা! আল্লাহ তায়ালা সব মুসলমানকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করা ফরয করেছেন। আপনার উসিলায় আজ সে ফরযটি আমার আদায় হল। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।"

বেলা প্রায় তিনটার কাছাকাছি। মেহমানকে বিদায় দিতে হবে। তাই সুফিয়া একটা পুটলি বের করে বেশ কিছু আফগানী মুদ্রা সুরাইয়্যার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "আপা মনি! এগুলো সাথে রাখেন, পথে কাজে লাগবে!" সুরাইয়্যা এতগুলো মুদ্রা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সুফিয়া বলল, "আপু! এ অর্থ আমার নয়, এগুলো আপনারই। থানা থেকে বের হওয়ার পর আপনি আমাকে এগুলো দিয়েছিলেন। দেখুন না, এই রুমাল কার? এই রুমালেই তো বাঁধা ছিল টাকাগুলো।" সুরাইয়্যা তাকিয়ে দেখে আসলেই তো ঠিক। এ রুমালে বেঁধেই তো সে সুফিয়াকে কিছু অর্থ দিয়েছিল। আল্লাহর মহিমা দেখে সুরাইয়্যা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "হায়, তাহলে কি আমার মুক্তির সামানপত্র আমি আগেই প্রেরণ করেছি? আমার দেয়া অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করলে। আবার সংখ্যার দিক দিয়েও তিন। আমার দেয়া অর্থ দিয়ে আমাকে দেশে পাঠাচ্ছ। আয় আল্লাহ্, তোমার মহিমা বুঝার সাধ্য কার? তুমি মহান, তুমি পবিত্র, তুমি প্রজ্ঞাময়।"

সুফিয়া বলল, "আপু! যারা দুনিয়াতে দিল খুলে দান করবে, সে দানগুলো হাশরের দিন, মহামসিবতের দিন ঠিক এমনিভাবে কাজে লাগবে। যেমন আপনার বেলায় যা ঘটেছে। সুরাইয়্যার ছিল রিক্ত হাত। সব টাকা-পয়সা লুটেরারা নিয়ে গেছে। এই রিক্ত হাতে টাকাগুলো পেয়ে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলেন। অতঃপর রেজাকে সাথে নিয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। পল্লীসর্দার রাস্তা বাতলিয়ে দিলেন। পরস্পরে সালাম, দোয়া ও ভালবাসা বিনিময় করে পথিকেরা পথে মিলিয়ে গেলেন ....।

[ত্রিশ]

বিকাল বেলা। অফিসের কাজ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। তাছাড়া, বড় অফিসারদের তুলনামূলক কাজ কম থাকে। আলম রাস্তায় বেরুলেন। আনমনে পথ চলছেন। বিস্তারিত নয়নে তাকাচ্ছেন ডানে বামে, এদিকে ওদিকে। কেউ দেখলে মনে করবে লোকটি কি যেন হারিয়েছে।

হাতে তার আতিকার আলেখ্য রঙ্গিন ছবি। তাকে এ চেহারাটি খুঁজে বের করতেই হবে। ওর সাথে ভাব জমাতেই হবে। আলমের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন আতিকার সাক্ষাত সে পাবে।

কলেজ ছুটি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ছেলে-মেয়েরা বাড়ির পথ ধরেছে। কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে প্রাইভেট পড়ছে। আলম সাহেব একদিক থেকে বাজ পাখির দৃষ্টিতে ছবির চেহারাটিকে তালাশ করছেন।

কয়েকটি রুম অতিক্রম করে লাইব্রেরীতে নজর পড়ল। দেখেন, ছেলে-মেয়ে মিলে সাত আট জন ইতিহাস পড়ছে। এদেরই মধ্যে রয়েছে কাঙ্খিত চেহারাটি। আলম চেহারার সাথে বারবার ছবি মিলিয়ে দেখছেন। কোন বেশ কম বুঝা যাচ্ছে না। তবে ছবির তুলনায় চেহারাটি অত ফর্সা নয়। তবু অন্য সব মেয়েদের চেয়ে এ চেহারাটিই মনকাড়া। আলম জানালার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আতিকাকে আবিস্কা করছেন। আলমের উঁকি-ঝুঁকির প্রতি নজর পড়ল আতিকার। লোকটি সুন্দর, সুপুরুষ, সুঠাম সাস্থ্যের অধিকারী। আতিকাও পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা চোখের আড় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আলমকে দেখে নিল। আলম তাকালে আতিকার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। আতিকা তাকালে আলম দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। চলছে চাওয়া-চাওয়ির লুকোচুরি। হঠাৎ চার চোখের মিলন ঘটে গেল। আলম নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হয়ে মুচকি হাসলেন। আতিকা হাসির জবাব হাসিতে না দিয়ে অভিনয়ের এক চাহনীতে জবাব দিল। মনে হয় যেন ওদের পরিচয় পূর্ব থেকে।

আলম মনে মনে আতিকাকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন। ইস .... তরুণীর দেহরত্ন কত অপরূপ। যৌবন গরিমা লাবণ্যমণ্ডিত। প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভিত সুষমায় তনুদেহ অপার্থিব মহিমায় যেন গৌরবান্বিত। আঁখিযুগল প্রেমাস্পদের হৃদয়তলে মায়াবান নিক্ষেপ করতে শিখেছে। তার উজ্জ্বল গৌরকান্তি ও অনুপম গঠন-সৌষ্ঠব প্রেমিকের নয়ন-মন হরণ করে। বিরহী প্রান্ত প্রেমের মূর্ছণা জাগায়।

কুন্তল-বেনী পৃষ্ঠদেশের মধ্যখানে কটিদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত। নাসিকাটি কত উন্নত, যুক্ত ভ্রূযুগল, টানাটানা চোখ, কবিরা দেখলে ওকে মৃগনয়না বলে কবিতা রচনা করত। অকৃতদার তরুণীর আংগুলের মাথার দিকে তাকালে আংগুরের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। তরুণীর দেহ পল্লব নরম, কত মোলায়েম, কত মহান। এগুলো ছাড়াও আরও কত ভাবনা আলমের হৃদয়ে। ভাবনার অতল তলে হারিয়ে গেছেন আলম সাহেব।

তপন দগ্ধে ধরণী ছিল দগ্ধিভূত। এতক্ষণে উষ্ণতা অনেকটা মন্দিভূত হয়ে আসছে। সবিতা ক্লান্ত হয়ে অস্তাচলের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। দেবদারু বৃক্ষের ছায়া পূর্ব দিকে প্রলম্বিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দিনমনি লুকিয়ে যাবে অস্তাচলে। এখনই হয়ত আতিকার ছুটি হয়ে যাবে। তাই বাতায়নে অপেক্ষা না করে একটু দূরে এক ছায়াদার বিটপী মূলে বসে অপেক্ষা করছেন আলম সাহেব।

আগন্তুকের মিষ্টি হাসি আর চোখাচোখিতে আতিকার হৃদয় আন্দোলিত হতে লাগল। কে সে জন? দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গড়ন, সুন্দর সুপুরুষ! কেনই এলো এ অবেলায় কলেজ আঙ্গিনায়? কি তার মতলব? আগেতো দেখেছি বলে মনে হয় না। ওকি এ কলেজেই পড়ে? কোন ইয়ারের ছাত্র সে? না কোন দিন তো দেখি নি। কেনই বা এসে অমন লুকোচুরি খেলে আবার উধাও হয়ে গেল অলক্ষে। এসব ভাবতে গিয়ে এতক্ষণ স্যার কি পড়িয়েছেন বা কি পড়েছে তা কিছুই মনে নেই।

স্যার অকস্মাৎ মাথা তুলে আতিকাকে পাঠ থেকে অন্যমনস্ক দেখে বললেন, "কি আতিকা, সময় অনেক হয়ে গেছে বুঝি! আজকে টিফিন কর নি? ক্ষুধা লেগেছে মনে হয়! তাই পাঠ ভাল লাগছে না তাই না আতিকা?"

"না স্যার, টিফিন করেছি, আজ কেন যেন মন ভাল লাগছে না। স্যার আজ পাঠ এখানেই থাকল। আগামী কাল এর পর থেকে আরম্ভ হবে।" "আজ যতটুকু হয়েছে তা ভালভাবে মুখস্থ করে আগামী দিনের পাঠও এক নজর দেখে আসবে। পরীক্ষার দুএকদিন আগেই আশা করি বইটি শেষ করা যাবে, তোমরা যদি অলসতা না কর। যাও আজকের মত ছুটি।"

বন্দী ঘুঘুরা ছাড়া পেলেই চম্পট দেয় বৃক্ষ শাখে। ছাত্ররাও ছুটি পেলে দিক-বেদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে চলে নিজ ঠিকানায়। ওরাও ছুটি পেয়ে কার আগে কে বেরুবে তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। সবাই চোখের পলকে বেরিয়ে গেল আসন ছেড়ে বই খাতা নিয়ে।

আতিকা খুব মন্থর গতিতে রুম থেকে বেরুল। আতিকার হৃদয়ে আগন্তুকের স্বপ্ন। রহস্য উদঘাটনে অন্তর খুব ব্যস্ত। আবার একনজর লোকটিকে দেখার জন্য

মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বিস্ফারিত লোচনে এদিক ওদিক খুঁজছে আর একবার দেখে নেয়ার জন্য।

কামাল দূর থেকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখছেন, আতিকা চঞ্চলা হরিণীর মত মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। আতিকা আনমনাভাবে অগ্রসর হতে হতে প্রায় নিকটেই এসে গেছে।

আলম বৃক্ষের আড়াল থেকে গালভরা হাসি হেসে নিজকে প্রকাশ করে বললেন, "আতিকা! কেমন আছিস, ভাল তো?" আগন্তুকের মুখে 'আতিকা' নাম শুনে চমকে গেল! একি, এ যুবক আমার নাম জানে কি করে? ইস কত সুন্দর ডাক! মধুভরা ওর ডাকে! আতিকা হাসির জবাব হাসিতে দিয়ে বলল, "ভাল আছি! আপনি?"

ঃ আমিও ভাল আছি।

ঃ আপনাকে চিনছি না যে?

ঃ চিনবে কি করে? আর কোন দিন তো দেখ নি।

ঃ আপনার নাম?

ঃ আমার নাম আলম খান। চাকরি করি এন. জি. ও তে। জালালাবাদ থেকে বদলি হয়ে দুদিন আগে বাগরামে এসেছি। এন. জি. ও. হেড অফিসেই বসি।

ঃ আমার নাম জানলেন কি করে? আপনি গণক না কি?

আলম মৃদু হেসে "জানব না কেন? শুধু গণক হলেই কি জানা যায়? আমরা (এন. জি. ওরা) কোন গাঁয়ে কয়টি মেয়ে আছে? কে, কোন স্কুলে বা কলেজে পড়ে? তাদের সংখ্যা কত এবং কোন ক্লাসে কত জন, কার নাম কি সবই জানি। এগুলোর তালিকা আমাদের কাছে আছে। সে সূত্র ধরেই ....।

তা হলে বলুন তো আমাদের ক্লাসে ছাত্রী কত জন এবং কার নাম কি?

এবার থ হয়ে গেলেন আলম খান। হাসিটা একটু চেপে রেখে বললেন, "তুমি তো ভারি চালাক! আমি কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি?" "আরে ইন্টারভিউ না, কথায় কথায় বলছি। তাতে রাগ করলেন কি?" "না।" "তুমি তো প্রথম দর্শনেই আমাকে পরাজিত করতে চেয়েছ তাই না আতিকা ....।" "আমি একজন অবলা নারী। পুরুষকে পরাজিত করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে কৌতূহল শুধু একটাই, আমার নাম কি করে জানলেন? আপনি তো শুধু নাম চুরি করেই ক্ষান্ত হন নি। আরও কিছু চুরি করেছেন।" হাঃ হাঃ হাঃ আলম হাসলেন।

ঃ তুমি আমাকে চোর বললে?

ঃ অবশ্যই! তুমি চোর, তুমি ডাকাত, তুমি যাদুকর। তুমি হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা। তোমার চাহনিতে রয়েছে মোহিনী শক্তি আর হাসিতে রয়েছে সুতীক্ষ্ণ ধার, যা মানুষের অন্তরকে রক্তাক্ত করে।

ঃ তুমি প্রথম সাক্ষাতেই এত সব বুঝে ফেললে আর চোখে চোখে সব বদনাম বলে দিলে, আসলে দেখি তুমি নজ্জুম!

ঃ অ-উচিত কথা বলছি কি না, তাই নজ্জুম হয়ে গেছি।

ঃ তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করবে আতিকা?

ঃ কেন তোমার মেহমান হব? তোমাকে তো আমি চিনি না।

ঃ এখন তো চিনলে।

ঃ হ্যাঁ এখন চিনেছি। তাই বলে মেহমান হতে হবে?

ঃ যদি অনুগ্রহ হয়?

ঃ যেতে পারি এক শর্তে যদি মন্‌যুর হয়?

ঃ কি শর্ত আতিকা?

ঃ না এখন বলব না, পরে বলব।

ঃ বল না, তোমার অভিপ্রায় কি? যদি গরীবের পক্ষে পুরা করা সম্ভব হয়। বল না লক্ষি মনী।

ঃ এখন বলব না, পরে বলব। অ- তাহলে এখনো ইন্টারভিউ বাকী আছে তাই না?

ঃ এবারও আপনি ভুল বুঝলেন?

ঃ ঠিক আছে যাব, কিন্তু কখন কোথায় যাব?

ঃ যাবে আমার অফিসে, তবে অফিস টাইমে নয়। সকাল ৯ টার আগে না হয় বিকাল ৪ টার পরে। তাছাড়া রাত্রে।

আলম অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। অফিসের ঠিকানা বাসা থেকে উল্টো দিকে শহরতলীতে এক মনোরম স্থানে। বাসা থেকে হেটে গেলে তিন মিনিটে পৌঁছা যাবে। তারিখ ঠিক করা হল শুক্রবার দিন বিকেলে। সেদিন লেখাপড়া কম। অফিসও থাকে না। তাছাড়া বড় সুবিধা হল। সেদিন আতিকার ভাই বাড়ি যাবেন। তাই এটাই উপযুক্ত সময়। আলম আবার সতর্ক করে বললেন, "দেখ, ভুলে যেন না যাও। আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব।"

এদিকে সূর্যতো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। রক্তিম আভা ছড়িয়ে অস্তপারে তলিয়ে গেছে। উভয়ে বিদায় বিনিময়ে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আতিকা এখনো বাসায় ফিরছে না। এমনটি তো কখনো হয় না। আতিকার ভাবী-চিন্তায় অস্থির। কখনো রান্না ঘরে কখনো করিডোরে আবার কখনো ফটকে দাঁড়িয়ে পথপানে চেয়ে আছেন। আতিকার ভাই নাইট ডিউটিতে চলে গেছেন অনেক আগেই। তা না হয় তাঁকে খোঁজার জন্য পাঠানো যেত। দীর্ঘক্ষণ ছটফট করে কাটালেন ভাবী। হঠাত ফটকে করাঘাত শুনে ভাবী দৌড়ে

বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?" আতিকা ক্ষীণ আওয়াজে উত্তর দিল, "আমি ভাবী। আমি আতিকা।" ভাবী ফটক খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কি কলেজ অনেক দূরে চলে গেছে? ফিরতে এত দেরি হল যে ....।"

ঃ কি যে বলছ ভাবী! আমার না পরীক্ষা। প্রাইভেট স্যার নিয়েছি। ইতিহাসের স্যার। আজকের পাঠ খুবই বিদঘুটে। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

ঃ তাহলে বুঝি পড়ায় অনেক মন দিয়েছ?

ঃ মন দেব না? ফেল করলে তো তোমরা দুজনে মিলে ------।

ঃ চোখ দুটিতো কোটরাগত আর মুখটি শুকিয়ে কাষ্ঠ। যাও, ওঘরে আগে খানা সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বস।

আতিকা ওঘরে খানা খেতে বসেছে মাত্র। কয়েক গ্রাস উদরস্ত করে হাত ধুয়ে চলে আসল। এত তাড়াতাড়ি খানা শেষ হয়েছে, তাই ভাবীও ঘরে গিয়ে দেখেন রুটির বর্তনে রুটি আর সালুনের বাটিতে সালুন পড়ে রয়েছে। একটি রুটির এক টুকরো মাত্র খেয়েছে আতিকা।

আজকের সব কিছুই উল্টো-পাল্টো মনে হচ্ছে। কলেজে কিছু ঘটেছে না-কি! ভাবছেন ভাবী। আসল কথা জানার জন্য ফুসলাতে লাগল আতিকাকে। কিন্তু কোন কথাই বের করতে পারছে না। মনের গহীনে কি একটা লুকিয়ে রয়েছে আতিকার, তা বুঝতে পারছে ভাবী। তাই আতিকার পড়ার রুমে গিয়ে এক পার্শ্বে বসলেন। আতিকা বালিশে হেলান দিয়ে অর্ধশোয়া অবস্থায়।

ভাবী ঃ আতিকা! আজ আমি তোমার কাছে কয়েকটি কথা বলব। আশা করি খেয়াল করে শুনবে। দেখ বোন! বর্তমানে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। গান-বাজনা, নাচ বেপর্দেগী, বেহায়াপনায় দেশ ভরে গেছে। এন. জি. ওরা সেবার নামে কুলবধুদেরকে রাস্তায় টেনে এনেছে। সে সব নারীরা সম অধিকার আদায়ের শ্লোগান তুলছে, তাদেরকে সম অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই এক টুকরো রুটির জন্য ঐসব মহিলারা রাস্তায় মাটি কাটছে, রাজ মিস্ত্রীর যোগালির কাজ করছে। এন জি. ও. রা সু-কৌশলে ওদের নিকট থেকে অল্প অর্থে বেশি শ্রম নিচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে। নারীরা সতীত্ব হারিয়েছে। ওরা কিন্তু ইসলামের শত্রু, দ্বীনের দুশমন। জানি না কখন এদেশে আল্লাহর গজব নেমে আসে। বর্তমানে ডঃ নজিবুল্লাহ্ সরকারের ছত্রছায়ায় কমিউনিস্টরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দ্বীনদার, পরহেজগার ও আলেম-উলামাদের সাথে ওরা সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। এদিকে আলেমরাও নিশ্চুপ বসে নেই। তাঁরাও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিচ্ছেন, জিহাদের দামামা বেজে উঠেছে চারিদিকে। কোন মূহুর্তে কি ঘটে যায় তা বলা যায় না। দেখ বোন! তুমি আগের মত ছোট্ট খুখী নও। এখন বড় হয়েছ। রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনের কানায় কানায় যৌবন ভরে গেছে। রাস্তায় চললে যে কাউকে তোমার প্রতি একবার তাকাতে হবে। তাই আগামী কাল থেকে বোরকা

পরে কলেজে যাবে। মেয়েদের জন্য বোরকাই হল মুশকিল কুশা। অনেক পাপ কাজ ও বালামুছিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কাল আমার বোরকাই ব্যবহার করিস। তোমার ভাইয়া পরে তোমার জন্য সুন্দর দেখে একটা বোরকা কিনে দেবেন।

আতিকা ঃ কি কও যে ভাবী! তুমিও দেখি একেবারে বুড়োবুড়ির কথা বল! আমার এখনো বোরকার সময় হয়েছে? তোমার মত বয়স হলে, বিয়ে-শাদী করলে বোরকা পরব। এখন আবার বোরকা কিসের? তুমি তো একদিনও কলেজের বারান্দায় পা রাখ নি। তাই ওসব বলছ। শতাধিক মেয়ের মধ্যে কেউ বোরকা পরে কলেজে যায় না। আমি যদি বোরকা পরে কলেজে যাই তবে বান্ধবীরা হাসবে। শুধু হাসবেই না, বোরকা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।

ভাবী ঃ আতিকা! তোর কপালে দুঃখ আছে বোন। আমি তোমার ভালর জন্যই পরামর্শ দিচ্ছি, বাকি তোমার ইচ্ছা। এই বলে ভাবী চলে গেলেন ওঘরে এবং নামায পড়ে শুয়ে গেলেন। আতিকা একটু বই খাতা উল্টিয়ে আলমের কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গেল।

আলম পর দিন এক বিখ্যাত চিত্রকরকে ডেকে পাঠালেন। আতিকার ছবিটি হাতে দিয়ে বললেন। দুদিনের মধ্যে আমার দেয়ালে অভিনব ভঙ্গিতে এ ছবিটি অংকন করবে। তারই পার্শ্বে থাকবে আমার নিজের ছবি। একই ছবি বিভিন্ন ভঙ্গিতে অংকন করবে। তোমার পারিশ্রমিক থেকে একশ আফগানী বেশি পাবে।

চিত্রকর রংতুলি নিয়ে গেল। তার সমুদয় কলা-কৌশল দেয়ালে ঢালতে লাগল। শিল্পী আগেই শর্ত করেছিল। কাজ আরম্ভ করা থেকে নিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত রুমে কেউ ঢুকতে পারবে না। আলম তাই মঞ্জুর করেছেন। দিনে রাতে দুদিনে কাজ শেষ করলেন। এবার ঘরে ঢুকার অনুমতি হলে আলম সাহেব প্রবেশ করলেন। চিত্রকর লাইট অন করে দিল। আলম চারিদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। ভারি চমৎকার। চিত্র দেখেই যৌবনের সুঁড়সুঁড়ি আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি পাবিশ্রমিক থেকে একশত টাকা বেশি দিয়ে শিল্পীকে বিদায় করলেন।

আতিকা প্রাইভেট পড়ার কথা বলে শুক্রবার সকালেই চলে গেল আলমের অফিসে। তার থাকার রুমটি অফিস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আলম আতিকাকে পেয়ে খুশীতে বাগ-বাকুম। উভয়ে কবুতর জড়ার মত একান্ত নিবিড়ে কি যেন আলাপ করছে। আতিকা প্রথমে দেয়ালের দিকে লক্ষ করে নি। সহসা তার চোখ দেয়ালে গিয়ে ঠেকল। আতিকা এ দৃশ্য দেখে হয়রান পেরেশান। হায় একি কাণ্ড আমাকে নিয়ে! আমি তো ওসব কিছুই জানি না। আলম আতিকাকে বলল, "দিনে রাতে যখনই পার, বিনা বাধায় আমার এখানে আসবে। আতিকাও তার কথায় সম্মত হল। অতঃপর আতিকা আস্তে আস্তে বাড়ির পথ ধরল।

[একত্রিশ]

একদিকে সুফিয়ার আনন্দ, সে মাওলানা রফিককে রুশী হায়েনাদের থাবা থেকে ছিনিয়ে এনেছে। অপর দিকে সে দুঃখিত, এ বিজয় তো ক্ষণিকের তরে, এ বিজয় বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। গ্রামের পর গ্রাম, মহল্লার পর মহল্লা উজাড় করে চলছে রাশিয়ান বাহিনী। ওরা কখন যে আবার আক্রমণ করে বসে রামাল্লা মহল্লায় তা কে বলতে পারে। রফিককে যদি আবার ধরে নিয়ে যায় পাষণ্ডরা তবে তাকে জ্যান্ত রাখবে না। তিলে তিলে, পলে পলে শেষ করে দেবে এই সুন্দর মানুষটিকে। দু'দিনেই সোনার দেহ ছাই করে দিয়েছে হায়েনারা। তাই এলাকায় অবস্থান করা তার জন্য ঠিক হবে না। বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন দেখা হবে। এসব বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা করছে সুফিয়া।

রফিক ভীষণ অবাক হয়েছে। একজন অবলা নারী হয়ে কিভাবে দুশমনদের কড়া পাহারা ফাঁকি দিয়ে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে ছিনিয়ে এনেছে তাদেরকে? বিষয়টা ভাবতে সে বারবার শিহরিত হচ্ছে। সুফিয়ার গুণ গরিমার কথা ছোট কাল থেকেই রফিক জানে।

কিন্তু মেয়ে মানুষ এত দুঃসাহসী হতে পারে, এমন ভয়াবহ অভিযান তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে কোনদিন এমন কল্পনাও তার দিলে উদয় হয় নি।

পল্লীসর্দার পত্নীর সাথে পরামর্শ করলেন। এবার জলদি বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। হাট-বাজার তো সবই করা আছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মেহমানদারীও তো আগেই করা হয়েছে। এখন শুধু আকদটা হয়ে গেলেই চলে। পত্নী সায় দিয়ে বললেন, "আজ রাতেই হোক।"

সুফিয়া তাদের কানা-ঘুষা বুঝতে পেরে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে বলল, "চাচী মা, আপনারা যা ভাবছেন, তা অত সহজে হওয়ার নয়। আপনারা কি ভুলে গেছেন, বর্তমানে দেশের কঠিন পরিস্থিতির কথা? ভাইজানের বিরুদ্ধে যেসব রিপোর্ট হয়েছে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? সরকার তাঁকে মুজাহিদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তিনি নাকি মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এসব কারণেই একমুহূর্তও এখানে অবস্থান করা ভাইজানের উচিত হবে না। আমার মনে হয়, ওরা আজ রাতেই আবার এ বাড়িতে হানা দেবে পলাতক আসামীকে ধরতে। আমার

মতে তিনি এখনই এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাক। তারপর মুজাহিদদের নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক হানাদার বাহিনীর ওপর। জিহাদ ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় আমাদের বর্তমানে নেই।"

সুফিয়ার কথাগুলো মাওলানা রফিক হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করছিলেন। সুফিয়ার চিন্তা অত্যন্ত, পরিচ্ছন্ন।

পল্লীসর্দার ও তাঁর পত্নী থ হয়ে গেলেন। তাদের মুখ থেকে আর কোন কথাই নিঃসরণ হচ্ছে না। সর্দারজী ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মা, তোমার কথা একদম সত্য। কিন্তু বাছা আমার যাবে কোথায়? দীর্ঘ প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই আবার বাড়ির বাইরে। ওর ওপর একটির পর একটি বিপদ ধেয়ে আসছে।"

"চাচাজান, ভাইজানকে পাঠিয়ে দেন পাকতিয়ার ওদিকে, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের কাছে। তাঁর জন্য হাক্কানী সাহেবের দলে যোগ দিয়ে জিহাদ করা ভাল হবে।"

মাওলানা রফিক এগিয়ে এসে পিতাকে লক্ষ করে বললেন, "আব্বাজান! আর কোন চিন্তা করবেন না। দোয়া করবেন যেন দ্বীনের খেদমতের জন্য আল্লাহ আমাকে কবুল করেন। আমি জীবিত থাকব আর দ্বীন মিটে যাবে তা হয় না। আমার শরীরের রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দ্বীনের ঝান্ডা উড্ডীন করব, ইনশাআল্লাহ। আজ রাতেই আমি মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের নিকট চলে যাব। সেখানেই খুঁজে পাব শান্তির ঠিকানা।"

"আম্মি! মাফ করে দিও। তোমাদের কোন খেদমত করতে পারি নি। যদি দেশ শত্রুমুক্ত হয়, ইসলাম গালিব হয়, শান্তি ফিরে আসে তবে হয়ত দেখা হবে।"

"'মাগো! তোমার মত লক্ষ মায়ের ইজ্জত রক্ষা করতে, রফিকা ও সুফিয়ার মত সহস্র বোনের ইজ্জত বাঁচাতে, মৃত্যুর বদলা নিতে এবং সন্তানহারা জননীর আর্তনাদ, স্বামী হারা বিধবা নারীর চিৎকার আর মজলুমের বুক ফাটা চিৎকার বন্ধ করতে তোমার ছেলেকে এগিয়ে যেতে হবে।"

"মাগো সব মুজাহিদ তোমার সন্তান। ওদের সেবা করো। দোয়া দিও। তুমি এক সন্তানের জননী নও। আমাকে যদি আর জীবনে না পাও, তবে হাজার ছেলে পাবে। তখন তোমার মত গর্বিতা মাতা আর কে হবে? তুমি হবে শহীদের মা, তুমি হবে বেহেশ্‌তবাসিনী। ইসঃ কি মজা হবে!"

মাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা! আজ আমার বুকে থাক কাল যাবি।"

মায়ের আবদার অলঙ্ঘনীয়। একটি রাত মায়ের পার্শ্বে থাকা, মাকে সান্ত্বনা দেয়া একান্ত দরকার। তাই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন, "আম্মি! আপনার হুকুম শীরোধার্য্য। আপনি শান্ত হোন, আজ রাত আপনার খেদমতেই কাটাব।"

বেলা শেষ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আঁধার নেমে আসবে। সর্দারজী চলে গেলেন মসজিদে। সুফিয়া রফিককে অযুর পানি দিয়ে জায়নামায পেতে দিল মায়ের ঘরে। রফিক নামায আদায় করে দীর্ঘ মুনাজাত করছেন। সুফিয়াও তার পড়ার ঘরে নামায সেরে অন্য দিনের মত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে বসে গেল। কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করার পর সুফিয়া ওঘরে গিয়ে আস্তে-আস্তে ডাকল, "রফিক ভাইয়া, রফিক ভাইয়া। রফিক তাসবীহাত সেরে সবে মাত্র বিরতি নিচ্ছিলেন। সুফিয়ার ডাক শুনে, "কে ডাকছ, সুফিয়া?"

"জী ভাইজান, আমি ডাকছি। সুফিয়া এতই পর্দানশীন যে, রফিক বাড়ি ফেরার পর কোনদিন তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পান নি। তবে একটু আধটু কথাবার্তা বলেছে তাও একান্ত প্রয়োজনে। কিন্তু চোখ তুলে দেখেন নি কেউ-কাউকে।

আজকের ডাক শুনে একটু হতবাক হয়ে গেলেন মাওলানা রফিক সাহেব। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ডাকছ সুফিয়া? কথা আছে, কাজের কথা, একটু বেরিয়ে আসুন। সুফিয়া ঢুকল তার পড়ার রুমে। রফিক জুতো দুটি পায়ে দিয়ে চলে গেলেন সুফিয়ার রুমে।

সুফিয়া সালাম দিয়ে বলল, "রফিক ভাইয়া। আপনিতো কাল খুব ভোরে চলে যাচ্ছেন। আর দেখা নাও হতে পারে। বিদায়ের প্রাক্কালে আপনাকে একটি ইলম শিখতে হবে। যে ইলম শিক্ষা করা আল্লাহ্ উম্মতে মুসলিমার ওপর ফরয করে দিয়েছিলেন। যে ইলম না থাকার কারণে আজ মুসলিম জাহান একটু একটু করে কাফেরের কব্জায় চলে যাচ্ছে। এই বলে গোপন স্থান থেকে রাইফেল ও স্টেন গানটি বের করে বলল, "দেখুন ভাইজান, এটার নাম রাইফেল, চীনের তৈরি, অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এটাকে তিনভাবে বুঝতে হবে, বাঁট (পিছনের অংশ), বডি (মধ্যের অংশ), বেরেন (অগ্রভাগ)। এটা ব্যাক সাইড, ইউ. আর. এটার নাম, ফরন সাইড নফ। এই দু'টি যদি লক্ষ বস্তুর সাথে মিলে যায় তবে টার্গেট সঠিক হবে। এটা স্টিগার গার্ড আর এটা হল স্টিগার লক, আর এইটা স্টিগার। এই জিনিসটার নাম হল ককিং হ্যান্ডেল, এভাবে টান দিলে গুলি চেম্বারে চলে যায়, এটাকে ককিং বলে। বাম হাতটি সামনে বাড়িয়ে আর ডান হাতটি স্টিগারের উপরের অংশে ধরে ডান হাতের শাহাদাত আংগুল দিয়ে স্টিগার টানতে হবে। ডান বুকের ডান পাশে লাগাতে হবে বাঁটের পিছনের অংশ। ধরতে হবে খুব

মজবুতভাবে। নিশানা ঠিক করার সময় নিশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে। নিশানা মিলে গেলে, "রামাইতা ইজ রামাইতা অলা কিন্নাল্লাহা রামা"-বলে ট্রিগার টানতে হবে।

এভাবে স্টেন গানটি চালানোর তালিম দিল কয়েক মিনিটে। কিভাবে ম্যাগজিন খুলতে হয়, গুলী ভরতে হয়, কিভাবে ম্যাগজিন লাগাতে হয় এসব বুঝিয়ে দিল। মাওলানা রফিক আগেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তা সুফিয়া জানত না।

মাওলানা রফিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুফিয়া! এ ইলম তুমি শিখলে কোত্থেকে?" উত্তরে সুফিয়া বলল, "ভাইজান! কথায় বলে, "ঠেকছি যেখানে শিখছি সেখানে।" এই বলে থানার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল, রাইফেলটি বোন সুরাইয়্যা থানা থেকে দিয়েছিলেন। আর স্টেনগানটি গনিমত হিসেবে এনেছিলাম রাশিয়ান ক্যাম্প থেকে। এগুলোর তালিম সরাইয়্যা থেকে শিখেছি।"

সুফিয়া আরো বলল, "ভাইজান! কুরআন-হাদীস পাঠ করে যদি তার ওপর আমল করা না যায় তবে দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই বরবাদ। কুরআনের কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ বাদ দেয়া পূর্ণ ঈমানদারের আলামত নয়। ভাইজান! মাফ করবেন, আপনি অনেক বড় আলেম হয়েছেন কিন্তু আপনার ইলম আপনাকে দুশমনের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারে নি। আপনিও কিছু আয়াতের ওপর আমল করছেন আর কিছু তিলাওয়াতের জন্য রেখে দিয়েছেন। ওসব আয়াতের ওপর আমল করেন নি। যেমন কিতালের আয়াত। বর্তমানে জিহাদ শুধু কিতাবের পাতায়। নেই আমলের খাতায়। দেখুন, আমি মাত্র কয়েক মিনিট অস্ত্র চালনা শিখেছি, তার বদৌলতে ঈমান কত মজবুত হয়েছে, কত পাকা। এর আগে এতসব কল্পনাও করতে পারি নি। এ ইলম হাছেল করার কারণেই ঈমানী শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে দুশমনের ক্যাম্প থেকে আপনাদেরকে উদ্ধার করার সাহস পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্। এটা গর্ব অহংকারের কথা নয়। এটা আমলের জাযা, আল্লাহ্‌র নুসরত।"

ভাইজান, এ দুটো অস্ত্র থেকে যে অস্ত্রটি আপনার পছন্দ হয় সে অস্ত্রটি আপনাকে দেয়া হল। আজ থেকে ক্ষণিকের তরে অস্ত্র হাত থেকে দূরে রাখবেন না। অস্ত্র ছাড়া ঘর শয়তানের আড্ডা। (আহসানুল ফতোয়া)

মুমিন অস্ত্র সাথে রাখলে শয়তান তার কাছে আসে না। চাই মানুষ রূপী হোক, চাই জীন রূপী হোক। রাত গভীর। দুনিয়া এখন জেগে নেই। লোক চলা-ফেরা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। রফিক তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সুফিয়া ঘুমের ভাব ধরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকল তার রুমে।

রাত দ্বিপ্রহর। সুফিয়ার চোখে ঘুম নেই। তন্দ্রা ক্রমে যখনই আশ্রয় চায় তার অক্ষিযুগলে, তখনি চিন্তা এসে হানা দেয় তার সুপ্ত হৃদয়ে। কে যেন ডেকে বলে, "সুফিয়া তোমার প্রিয়তমকে ধরতে আসছে। চিন্তা আর তন্দ্রার সংঘর্ষে তার রাতের নিদ্রা হারাম হয়ে গেল। রাশিয়ান ফৌজ এই আসছে, এই বাড়ি ঘিরে তল্লাশি চালাচ্ছে। এ ধরনের ভাবনা সুফিয়ার অন্তরে।

রাতের দুটি প্রহর অতিবাহিত হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। সুফিয়া স্টেনগানটিতে ম্যাগজিন ভরে চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করে বাড়ির বাইরে এলো। সুফিয়া এখন একজন চৌকিদার, একজন অতন্দ্র প্রহরী। সে বাড়ির চারি পার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভিক সাহসী সালারের মত। হঠাৎ পাহাড়ের দিক থেকে গাড়ির হেড লাইটের বাতির মত একটি বাতি এসে তার চোখ ঝলসে দিল। পরখ করতে লাগল, বিষয়টা কি? কিন্তু আর বাতি দেখছে না। কোন আওয়াজও পাচ্ছে না। সুফিয়ার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, রুশীয় সৈন্যরা গাড়ী রেখে পদব্রজে এগিয়ে আসছে। কারণ, গাড়ীর শব্দে গ্রামবাসীরা সতর্ক হয়ে যাবে। সুফিয়ার ধারণা একেবারে অনর্থক নয়।

এখন নিশ্চিন্তে বসে থাকার সময় নয়। তাই মাওলানা রফিক সাহেবের রূমের পার্শ্বে গিয়ে ডাক দিল, "রফিক ভাইয়া, দুশমন বিলকুল নিকটে এসে গেছে। জলদি বের হোন।"

রফিক রাইফেলটি নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সুফিয়ার ডাকাডাকি শুনে পল্লীসর্দারও বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা-সুফিয়া কি বলছ যেন?"

ভাইয়াকে ডাকছি। দুশমন এসে গেছে, গাড়ীর লাইটের আলো নিজ চোখে দেখেছি। এই বলে সুফিয়া নিজ রুমের কাঁথা-বালিশগুলো গুছিয়ে নিয়ে আসবাবপত্র রুমের ভিতর ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে বাইরে তালা ঝুলিয়ে দিল। রফিকের রুমেও সে এমন করল। যেন এ ঘরে কোন লোকজন থাকে না বলে প্রমাণ হয়। অতঃপর চাবিগুলো সর্দারজীর হাতে দিয়ে বলল, "চাচাজান! দুশমন যদি রফিক ভাইয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে বলবেন, ওকে তো দু-তিন দিন আগে আপনারা ধরে নিয়ে গেছেন। এখন আবার কি? তারপর হয়ত ফিরে যাবে।" এতটুকু বলে সে রফিককে নিয়ে বাড়ির বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বৃদ্ধ পিতা ঘরে শুয়ে অনাগত যামানা নিয়ে ভাবছেন। সুফিয়া রফিককে নিয়ে কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেল। যে দিকে সাধারণত দিনের বেলায়ও কোন লোকজন যাতায়াত করে না।

সুফিয়া রফিককে আস্তে আস্তে বলল, "ভাইজান! আমরাতো আল্লাহর ফজলে বেঁচে গেছি বটে, তাই বলে কি ওদের ওপর কোন আক্রমণ করব না? ওরা বহাল তবিয়তে ফিরে যাবে? ওরাতো নিশ্চয়ই খালি হাতে যাবে না। লুটতরাজ করে মালামাল ও নারী-পুরুষদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। কিছু যদি না করি তবে ওদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। তাই মরি আর বাঁচি ওদের ওপর হামলা করতে চাই। আপনার অভিমত কি?"

মাওলানা রফিক ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, "সুফিয়া! তোমার চিন্তা-চেতনার সাথে হুবহু মিলে গেছে অমার চিন্তা-চেতনা। এ ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার মনে। হামলা আমরা কোথায় কিভাবে করব, সে কথা ভাবতে হবে।"

"আমরা যদি মহল্লায় ওদের ওপর আক্রমণ করি তবে গ্রামটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে ওরা। কাজেই গ্রামের দিকে না দাঁড়িয়ে সোজা পূর্ব দিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে, ওদের ফিরে যাওয়ার পথে কোন একটি নিরাপদ স্থান আমাদের বেছে নিতে হবে। তারপর সুবিধা বুঝে অতর্কিতে ওদের ওপর আক্রমণ করতে হবে। আর একটি কাজ যদি সম্ভব হয় তবে তাও করা যাবে। তা হল, ওদের গাড়ি যদি খালি দেখি তবে তা নষ্ট করে দেব। আর যদি লোক দু'একজন থাকে তবে তাদের জীবিত পাকড়াও করার চেষ্টা করতে হবে।"

"সুফিয়া! তুমি এতক্ষণ কমান্ডারের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আচ্ছা চল, তুমিই আজকের মত আমার কমান্ডার।"

"ছিঃ ছিঃ আলেম হয়ে হাদীসের বরখেলাফ উক্তি। নবী (সা) বলেছেন, "নারীরা কোনদিন পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না। নেতৃত্বের হকদার পুরুষরা।"

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলল পূর্ব দিকে। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে ওদের রেখে যাওয়া গাড়ীর সন্ধান পেল। গাড়ীতে চালক একা একা বসে আছে। মাওলানা রফিক খুব সন্তর্পণে গাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ড্রাইভারের নিকট গিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন, "দ্রেস! হোল্ড।" ড্রাইভার চম্‌কে উঠল, রফিক বলল, "দস্তে খুদরা বালাকুন।" হাত উপরে তোল। ড্রাইভার হাত উপরে তুলল।

সুফিয়া ওড়নার আঁচল ছিঁড়ে দুশমনটাকে বেঁধে ফেলল। অতঃপর তেলের টাংকী খুলে কয়েক মুঠো বালি ঢেলে দিল তাতে। তারপর কয়েকটি অস্ত্র নিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করলেন। কোন ফায়ার করলেন না।

[বত্রিশ]

কালের চক্রের ঘূর্ণীপাকে কত যে উত্থান-পতন হয় তার পরিসংখ্যান কে রাখে। রবির আগমনে হয় নিশাবসান। রবির অবসানে ধরণী বক্ষে বসে তিমির মেলা, আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে এ লুকোচুরি খেলা। তখন শুধু ইতিহাস হয়েই বেঁচে থাকে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। জন্মলগ্ন থেকে জীবনের যবনিকা পর্যন্ত শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। তা কেউ লিখে, কেউ লিখে না, তা শুধু মানুষের হৃদয়ের পাতায় স্থান দখল করে থাকে।

ঠিক তেমনি ভাবে মাহমুদার চারি পাশে ঘিরে আছে অসংখ্য ইতিহাস, চারণভূমি থেকে নিয়ে মক্তব, প্রাইমারী, হাই স্কুল ও কলেজ পর্যন্ত। চারণভূমির বালক-বালিকাদের পরস্পর ঝগড়া-বিসংবাদে বালক-বালিকারা ছুটে যেত খর্জুর তলার জাস্টিজ বৃদ্ধ সুলাইমানের কাছে। সুলাইমান লেখা-পড়া তত একটা না জানলেও ইনসাফের সাথে ঝগড়া মিটিয়ে দিতেন। এজন্য তাঁকে ফিস দিতে হত না। মক্তব, স্কুল, কলেজেই যদি কেউ কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তবে তার জন্য সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। সংশোধনের পথ রয়েছে। কিন্তু এন. জি. ও. গোষ্ঠির অসভ্যপনা ও অশালীন আচরণ ও নারীদেরকে ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করার অপরাধের বিচার করবে কে? এটা কোন ধরনের নারী স্বাধীনতা! এটা কোন সভ্যতা! কিসের নারী মুক্তি? এসব প্রশ্ন মাহমুদার অন্তরে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। জবাব মিলে না। প্রাণ প্রিয় আলম চলে গেছে কত দিন হয়েছে। কিন্তু একটি বারও আসল না, খোঁজ নিল না। এসব চিন্তায় মাহমুদা খুব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। সামাধান কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। সুখ পালিয়েছে তার থেকে কোন সুদূরে!

অফিসের নারী লোভী কর্মকর্তারা অনেকেই মাহমুদার বাসায় আসে, আড্ডা জমায়, আলাপ করতে করতে অনেক গভীরে পৌঁছে যায়, কিন্তু আগের তুলনায় মাহমুদা অনেকটা সতর্ক। মাহমুদার অন্তরে একটি জিনিস দানা বেঁধে উঠেছে, তা হল, মন যাকে দিয়েছি, তাকেই দেব, এতে অন্যদের দখল নেই।মরি বাঁচি এ জীবন তাঁরই জন। এ পর্যন্ত অনেক কামুক পুরুষেরা কামভাব চরিতার্থ করে

পালিয়েছে। কেউ সহজে ধরা দিতে চায় না। এটাই যে এন. জি. ওদের ধর্ম তা মাহমুদার বুঝতে বাকী রইল না।

তবে ওদের মন কিছু না কিছু রক্ষা না করলে চাকরিটা খোয়া যেতে পারে। এ ভয়ে সে কিছু কিছু অফিসারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। এভাবে চলে গেল বিরহের দিনগুলোর মধ্য থেকে ১৫ দিন। কামাল ফিরে আসে নি বিরহিনীর বিরহ জ্বালার অবসান ঘটাতে। এক মুহূর্তের জন্য শুকায় নি মাহমুদার অশ্রুসিক্ত ওড়নাঁচল। যার অধরে প্রায় সময়ই উৎপল সদৃশ হাসির রেখা চপলা শোভায় খেলা করত, আজ তার সেই উচ্ছল হাসি নিষ্প্রভ হয়ে তিমিরে লুকাচ্ছে। মাহমুদা প্রিয় জনের আগমনের পথ পানে চেয়ে আছে অধীর আগ্রহ নিয়ে।

কোন এক বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বেজে উঠল কলিং বেল। অফিস থেকে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল মাহমুদা। সে কলিং বেলের আর্তনিনাদে সীমাহীন বিরক্ত বোধ করছিল। কারণ, প্রতিদিনই তার কাছে দু'এক ডজন বখাটে এন. জি. ও. যুবক এসে ভীড় জমাত। ক্ষণিকের তরেও বিশ্রাম নেয়ার ফরসুত ছিল না মাহমুদার। তাই আজ শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার চিন্তা করছিল। কিন্তু কলিং বেলের কান্নার শব্দে মাহমুদার কেমন কমল হৃদয়ে দয়ার উদ্রেগ হল। তাই আস্তে আস্তে ওঠে চপ্পল পায়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তাকিয়ে দেখলে, সেই হারানো চাঁদ মুখখানা উদিত হয়েছে তার দুয়ারে। মাহমুদা আনন্দের অথৈ পাথারে হারিয়ে গিয়ে আলমকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, "কি হে পলাতক! এতদিন পরে প্রিয়তমার কথা মনে পড়ল? ওরে মন চোরা! চুরি বিদ্যাটা তো খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছ! আমার অজান্তে আমার মন তুমি হরণ করেছ, তা একটুও টের পাই নি। এখন তো প্রায় প্রতি নিশিথে যুবকরা এসে ভিড় জমায় আমার হেরেমে। আমার মন পাওয়ার আশা নিয়েই ওদের আগমন। আমি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি আমার মন চুরি হয়ে গেছে। এক চোর আমার অগোচরে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে, এখন হাত একদম খালি; দেয়ার মত এক বিন্দু মন ও ভালবাসা আমার কাছে নেই। আশা করি ক্ষমা সুন্দর নজরে দেখবেন।"

আলম কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, "মাহমুদা! নতুন জায়গায় গিয়েছি, নতুন পথ-ঘাট, নতুন মানুষ, আর নতুন পরিবেশ। চাকরিটা একটু পাকা-পোক্ত না করে সরা যায় না। তাছাড়া বসদের সাথেও একটু খাতির জমাতে না পারলে চাকরিটা মরি মরি রবে কান্না জুড়ে দেয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে বিলম্ব হয়েছে। তুমি রাগ করেছ লক্ষি মনী?"

"সমাজে একমাত্র মহিলারাই অসহায়, ওদের আবার রাগ আছে নাকি? ওসব গাল-গল্প বাদ দিয়ে ভিতরে চল," এ বলে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল আলমকে। এতক্ষণে সবিতা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বার্ধক্যে উপনিত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তিম আভা ছড়িয়ে পশ্চিম গগনে আত্মগোপন করবে।

মাহমুদা আলমের সামনে চা নাশ্‌তা হাজির করে রজনীভোজের আয়োজনে চলে গেল রন্ধনশালায়। একাই সব কাজ করতে হয় মাহমুদার। কোন কাজের মেয়ের ব্যবস্থা এখনো করতে পারে নি। হাট-বাজার তাকেই করতে হয়। কারণ, ওর হাতে যে অল্প কিছু টাকা ছিল তা দিয়েই চলতে হচ্ছে। কেননা, মাস শেষ না হলে বেতন পাবে না। এ কয়দিনে বেশকিছু টাকা খোয়া গেছে হাত থেকে। সন্ধাকালীন মেহমান অনেক বেশি। ওরা সবাই এন. জি. ও. কর্মকর্তা। তাদের চা-পানে আপ্যায়িত না করলে ভাল দেখায় না। ওরা আসে শুধু যৌন চাহিদা নিয়ে, কেউ হাদিয়া নিয়ে আসে না। ঘরে যা ছিল, তা-ই পাক করে নিয়ে এলো মাহমুদা।

উভয়ে একই বর্তনে খানা খেতে বসেছে। দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত মানুষটি বুকের কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা, খুশীতে মাতোয়োরা, উল্লাসে দিশেহারা, পুলকে আপনহারা।

উভয়ে আনন্দে কাড়াকাড়ি করে ভোজন পর্ব শেষ করল। এখন খোশ-গল্প-গুজবের পালা।

মাহমুদা কথা প্রসঙ্গে বলল, "আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই, বলবে কি প্রিয়তম?" আলম একটু বিরক্ত ভাব নিয়ে বললেন, "এত রাতে কি আবার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমার? কি জানতে চাও বল?" "রাগ করবেন না তো আবার?" "না, রাগ করব কেন।"

"তুমি চলে যাবার পর তোমার লেলিয়ে দেয়া বন্ধু-বান্ধব ও অফিসাররা অনেক উৎপাত করেছে। ওদের মধ্যে মনুষ ত্ববোধ আছে? হায়েনা-জানোয়ারের মত ওদের আচরণ।"

আলম মাহমুদার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন। "কি যে বল মাহমুদা! এন. জি. ওতে যারা চাকরি করে ওরা এ ধরনের উদার প্রকৃতিরই হয়ে থাকে। ওরা ধর্মের নামে ভণ্ডামির ধার ধারে না। খাও-দাও ফুর্তি কর। টাকা-পয়াসা কামাই কর। স্বাধীন ভাবে ঘোরা-ফেরা কর। এই তো আমাদের ধর্ম। দুনিয়াকা মজা লে লো, দুনিয়া তুম্‌হারী হে।"

মাহমুদা বিনয়ের সুরে বলল, "তা বুঝলাম বটে, চলুন না আমরা কোর্টে গিয়ে ম্যারিজ রেজিস্ট্রারটা করে নেই, এটা আমার প্রার্থনা।"

আলম খানিকটা চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "তা হলে টাকা পাব কোথায়? আমার বেতন তুলে কাজটা সারতে হবে। ঠিক আছে তাই করা হবে। এদিকে অর্ধ রজনী পেরিয়ে গেছে, চোখ ঢুলু ঢুলু করছে ঘুমে। উভয়ের কথার ইতি টেনে ঘুমিয়ে গেল দুজনে।

নিশাবসান হওয়ার আর বেশি বাকী নেই। পাখ-পাখালিরা কিচির মিচির গান জুড়ে দিয়েছে। পালক ঝেড়ে কাকাতুয়া আকাশে ডানা মেলেছে। দোয়েল, কোকিল, শ্যামা, ঘুঘু, ময়না, টিয়ারা জেগে উঠেছে। পূর্ব আসমান রক্তিম আভায় রঙ ধরেছে। মুয়াজ্জিন মিনার চূড়ায় 'আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম' বলে আযান হাঁকছে। নামাযীরা শয্যা ত্যাগ করে মসজিদ পানে ছুটে চলছে। এমন সময় আলম-মাহমুদার ঘুম ভাঙ্গে। তারা হাতমুখ ধুয়ে ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। প্রতিদিন ভোরে নারী-পুরুষ একসাথে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাদের ব্যায়াম করতে হবে। তাই ওরাও রাস্তায়।

এন. জি. ও. শিক্ষালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একই সাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্যারেট করাচ্ছে এবং তারা শ্লোগান দিচ্ছে, "শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো", "স্বামীর কথা মানব না ভাংগা হয়ে থাকব না।" "আমরা সবাই গরীব চাষী-এন. জি. ওদের ভালবাসি।", "স্বামীর কথা শুনব না পর্দার ভিতর থাকব না।" প্রায় ঘণ্টাখানিক ব্যায়াম করে বাসায় ফিরে এলো মাহমুদা, সঙ্গে আলম ও তার দুই বন্ধু। মাহমুদা দ্রুতগতিতে তাদের নাশ্তার ব্যবস্থা করল। সবাই নাশ্তা খেয়ে বাইরে বেড়াতে যাবেন।

"ছুটির দিনগুলো এখানেই কাটানোর চিন্তা আলম সাহেবের। বন্ধুদের পিড়া-পিড়িতে আলম সাহেব মাহমুদাকে বললেন, "আমি একটু বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাব। দুপুরে বাসায় ফিরব।" এই বলে বন্ধুদের সাথে বেরিয়ে গেলেন। মাহমুদা নিজেও নাশ্তা সেরে খাটের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। টেবিলের কোণে আলমের ব্যাগটি শোভা পাচ্ছিল। মাহমুদা ব্যাগের চেইন খুলে ভিতরে হাত ঢুকাতেই ডায়েরীটি বেরিয়ে আসে। এবার একটি একটি করে পাতাগুলো উল্টাতে লাগল। মাঝেমাঝে চাকরি সংক্রান্ত কিছু প্রোগ্রাম, কিছু উপদেশ বাণী, কিছু নিজের মন্তব্য আবার স্মরণীয় ঘটনাবলি নজরে পড়ল। এমনকি মাহমুদা কখন, কোথায় তাকে কি বলেছিল এমন কিছু লিখাও এতে দেখতে পেল। মাহমুদার নিজের হাতেরও কিছু লিখা ডায়েরীতে কয়েকটি পাতা দখল করে রয়েছে। এভাবে উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ চিরচেনা হস্তলিপি নজর কেড়ে নিল। এটা কোন শিল্পীর হস্তলিপি তা লেখা নেই বটে কিন্তু এটা এমন একটি হাতের লেখা যে হাতটির

সাথে এক যুগেরও বেশি সময় থেকে তার পরিচয়। পরিচিত এ লেখা অন্য কোন হাতের নয়, এ লেখা তারই প্রিয় বান্ধবী আতিকার! এবার লেখাগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ করছে-

০ প্রেমিকের সব আলামত গো তোমার কাছে পেয়েছি,
তাই তো আমি তোমার ওপর আশেক হয়ে পড়েছি॥

০ তোমার ওপর আশেক হয়ে জীবন বাতিল করেছি,
তুমি আমার না হলেও আমি তোমার হয়েছি॥

০ সাত সাগরের পানিতেও মিটবে না মোর পিপাসা,
তোমার ঠোঁটের পরশ পেলে মিটবে আমার সব আশা॥

০ প্রেমিকেরে জিজ্ঞাসিও কেমন মজা প্রেমেতে,
বুলবুলিকে জিজ্ঞাসিও কেমন মজা ফুলেতে॥

০ তুমি আমায় ছেড়ে যাবে আগে যদি জানিতাম,
তোমার প্রতি আশেক আমি কখনো না হইতাম॥

০ সবকিছু আজ ভুলে গিয়ে তোমার প্রেমে মজেছি,
আরাম-আয়েশ সব ত্যাজিয়ে প্রেমের রশি ধরেছি॥

০ আঁখু কি পানি ছে মেরে মিছলে দরিয়া বন্ গিয়া,
রুতে রুতে ছিনা মেরা পারা পারা হুগিয়া॥

০ তেরি ছুরত ছবছে বেহতের তেরি ছীরত নেক হে,
ইছলিয়ে আশেক হুয়া মায় তু মেরা মাশুক হে॥

০ মেরে দিলকো খুশী করনা তুম্‌কো ওয়াজিব হুগিয়া,
কেঁওকে তুনে আজ মুজকো রুনে ওয়ালী কর দিয়া॥

০ আয় সালামাত করনেওয়ালে তুজে মায় ইনসাফগার,
এশকেমে মাজুর মুজকো রাখ সালামাত ছে গুজার॥

০ উনপে আশেক হুগিয়া মায় উনপে শিদা হুগিয়া,
উছ জারাছি বাত কি দুনিয়ামে চর্চা হুগিয়া॥

০ তাছবির বানাতাহুঁ তুজে খুনে জিগরছে।
দেখতাহুঁ তুজে মায়নে মহব্বত কি নজরছে॥

অতিকার তুলতুলে নরম হাতের অংকিত এ হৃদয় উজাড় করা কবিতাগুচ্ছ পাঠ করে মাহমুদা হয়রান পেরেশান হয়ে গেল। এ লিখা এখানে কেন? এ ডায়েরি আতিকার হস্তগত কি করে হল? তা হলে ওখানে গিয়েও কি আলম আতিকার দিকে প্রেমের হাত বাড়িয়েছে? আতিকা তো এসব ব্যাপারে অনেকটা কঠোর। অত সহজে আতিকাকে বাগে আনা তো কঠিন বিষয়। না, আতিকা তো বর্তমানে

কলেজের ছাত্রী, হয়ত অন্যসব মেয়েদের দেখাদেখি সেও বয়ফ্রেন্ডের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। ও শহরে থাকে। কার খবর কে রাখে? স্বামীর হাত ধরে ঘুরছে, না ফ্রেন্ডের সাথে ফুর্তি করছে- তা কি গায়ে লেখা থাকে? হতেও তো পারে আতিকাকে সে পথে পেয়ে তার সাথে ভাব জমিয়েছে। আর আতিকাও এমন টুক্‌টুকে সুন্দর সুপুরুষ দেখে তাকে সব দিয়েছে। এসব চিন্তায় মাহমুদা অস্থির। সময় দ্বিপ্রহর। রৌদ্র দগ্ধ ধরণী বক্ষে বিচরণ করা সাধ্য কার। ইথারের ঢেউয়ের বাঁকে বাঁকে মরিচিকার মেলা। চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। বহ্নি মরুৎ প্রবল বেগে বইছে। ধুলা-কণারাও তপ্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বিহঙ্গ উড়ছে ডানা মেলে বিটপী ছায়ায়। প্রত্যাশায় পথিকেরা চলার গতি থামিয়ে কেউ খর্জুর বীথিকার তলদেশে আবার কেউ বা দেবদারু বৃক্ষের নিম্নদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। অশান্ত বসুন্ধরার পথগুলো হয়ে যাচ্ছে পথিকহীন। তাপ মন্দিভূত না হওয়া পর্যন্ত কেউ আর পথ চলবে না। তাই আলম তার বন্ধু রাজুকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

মাহমুদা ডায়েরী পড়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে কিছুক্ষণ। এখনো চোখের পাতাগুলো অশ্রুতে ভেজা। আলম রাজুকে নিয়ে চলে গেল মাহমুদার ঘরে। জানালার ফাঁক গলিয়ে ঘরে আসা সূর্যের আলোক রশ্মি যুবতীর গণ্ডদ্বয়ে এসে পড়ায় চেহারার উজ্জ্বলতা আরো যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। তারা উভয়ে মাহমুদার দিকে অপলক নেত্রে চাতকের মত তাকিয়ে আছে। আলম ওড়নাঁচলে তার ভেজা চোখ দুটি মুছতে গেলে মাহমুদার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখে শিয়রে দণ্ডায়মান প্রিয়তমা ও তার বন্ধু রাজু। আলম তাকিয়ে দেখলেন, খাটের ওপর পড়ে আছে তার ডায়েরীটি আর আতিকার স্বহস্তে লিখিত কবিতা গুচ্ছ ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রেমিকের মুখপানে।

মাহমুদা তার বুকের ব্যথা গোপন করে খুব বিনয়ীভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আলম ভাইয়া! আপনার ডায়েরিতে দেখি আমার বোন আতিকার লিখা একটি প্রেমের কবিতা। ওকে পেলেন কোথায়? আমার সাথে ওর দেখা সাক্ষাত নেই অনেক দিন।"

আলম উত্তরে বললেন, "আরে মোটা হলেই কি দারোগা হওয়া যায়? টাকমাথা হলেই তালুকদার নয়। লম্বা কুর্তা পরলেই হুজুর হয় না। এ লেখাও আতিকার নয়। তুমি যা দেখছ, তা ঠিক কিন্তু যা ভাবছ তা ঠিক নয়। ঐ লেখা আমার এক নতুন কর্মচারী ফুয়াদের। ও আমার দুদিন আগে জয়েন্ট করেছে। সে আমার অনুমতি নিয়ে এ কবিতাটি লিখেছে। বুঝলে এবার?"

আলম তিন দিনের জন্য ছুটিতে এসেছিল মাহমুদার কাছে। এখন তার ছুটির দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি আবার মাহমুদা থেকে বিদায় নিয়ে বাগরামে চলে যান।

তেত্রিশ

মাওলানা রফিক, গ্রেফতারকৃত রুশী সৈন্য (ড্রাইভার) ও সুফিয়াকে নিয়ে এক অনাবাদী ভূমির দিকে চলে গেলেন। সাথে গনিমতের অস্ত্র। সফল অভিযানের আনন্দে নেচে উঠল উভয়ের মন প্রাণ। দুশমনকে হত্যা করা বিজয়ের নিম্নতম সোপান। জ্যান্ত ধরে বন্দী করা হল উর্দ্ধতন সোপান। কেননা, ধৃত দুশমন থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

মাওলানা রফিক বন্দীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন নিরীহ আফগান মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ? এতে তোমাদের মতলব কি?"

উক্ত বন্দী বললেন, ড. নজিবুল্লাহ সরকারের আমন্ত্রণে ও রাশিয়ার ত্রাণকর্তা ও ভাগ্য বিধাতা মিঃ গর্ভাচেভের নির্দেশে আমরা আফগানিস্তানে এসেছি। আমাদের আগমন আমাদের একান্তই ইচ্ছার বাইরে।"

ঃ "নির্বিচারে গনহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও জ্বালাও পোড়াও নিতীর আসল উদ্দেশ্যটা কি?" ঃএবার কোন উত্তর দিচ্ছে না বন্দী।

সৈনিকের তাপস নিতী বরদাশত করতে না পারায় বক্ষদেশে দশ কেজি ওজনের এক লাথি বসিয়ে দিল। বন্ধনরত থাকার দরুন লাত্থির ঝাঁকুনি সইতে না পেরে ধরাম করে যমিনে পরে গেল বন্দী। অতঃপর আরও একটি লাথি দিয়ে সুফিয়া বলল, "পাষণ্ড নরাধম, জালিম! যা জিজ্ঞাসা করা হয় তা সাফ সাফ বলে দিতে বিলম্ব হয় কেন?"

"স্যার স্যার! বলছি, বলছি শুনুন আমাদের সরকারের ইচ্ছা হল গোটা দুনিয়ায় কমিউনিজম হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। দেশের মানচিত্র সম্প্রসারণ করা। উদায়াচল থেকে অস্তায়াচল পর্যন্ত কমিউনিজম শাসন ছাড়া অন্য কোন শাসন থাকবে না। এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য র্গভাচেভ প্রথম আফগানিস্তান দখলে এনে, ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও বার্মা নিজ শাসনে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে ইরান হয়ে আরব মূলুকে

প্রবেশ করবে। এভাবে গোটা বিশ্বে চালু করবে কমিউনিস্ট নেজাম। আফগানিস্তান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু।"

মাওলানা রফিক আবার প্রশ্ন করলেন, "এ আক্রমণে বা পরিকল্পনায় কতটুকু সাফল্যের আশা করছ?"

"বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের হাতে রয়েছে অর্থের চাবিকাঠি। মুসলমানরাই বিশ্বের সেরা ধনী। তাদের রয়েছে তেল সম্পদ, গ্যাস, অর্থাৎ সমস্ত জ্বালানী সম্পদ মুসলমানদের দখলে। তাছাড়া, স্বর্ন, হীরা, তামা, দস্তা, লোহা, শীশা, কয়লা থেকে নিয়ে এটমিক পদার্থ ইউরিনিয়ামের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তাদেরই দখলে। এত সম্পদ থাকা সত্বেও মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারবে না। কারণ, (ক) অনৈক্য (খ) সম্পদ ব্যবহারের অনিয়ম, (গ) সুষম বন্টনের অভাব, (ঘ) নারী-মদ বিলাসিতা, (যা বর্তমানে সৌদি শাসক গোষ্ঠীরা করে থাকে) পৃথিবীর আভিজাত হোটেলগুলো বর্তমানে চিত্তবিনোদনের জন্য তাদেরই দখলে। (ঙ) মুসলমান বিশেষ করে উলামায়ে কেরামগণ জিহাদ বিমুখ হয়ে আছে। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে। তাই মুসলমানদের বিজয়ের আশা অতি ক্ষীণ।"

বন্দী আরো বললেন "মুসলমানরা এত অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমরাস্ত্র নির্মাণ বা সমর প্রযুক্তি থেকে বিরত রয়েছে। আমরা তৈরি করি মরাণারাস্ত্র আর মুসলমানরা তৈরি করে মসজিদ, ঝকঝকে মসজিদ। কিন্তু মসজিদ সংরক্ষণ করার মত কোন ব্যবস্থা ওরা নিচ্ছে না। তাই আমরা অতি সহজে মসজিদ ধ্বংস করে ক্লাবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হচ্ছি।"

মাওলানা রফিক বন্দির কথাগুলো শুনে বললেন "তোমর কথাগুলো যথার্ত একটি কথাও মিথ্যা বলনি। আচ্ছা আর একটি কথা জানতে চাই তাহল। আপনারা যারা সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিয়েছেন, তারা কেন আফগারিস্তানে অমানবিক সন্ত্রাসী আগ্রাসানে অংশ নিয়েছে?"

"আমি এর উত্তর আগেই দিয়েছি যে ড. নজিবুলাহ সরকারের আমন্ত্রণে ও গর্ভাচেভের নির্দেশে আমাদের আসতে হয়েছে। আসলে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি একটি কোম্পানির ট্রাক চালাতাম। জোর করে আমাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো হয়েছে। ১০/১৫ দিনের

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে আফগানিস্তানে। আমার মত হাজারো সৈন্য রয়েছে, যাদেরকে জোর পূর্বক সেনাবাহিনীতে আনা হয়েছে।”

“ তাহলে আপনারা এর প্রতিবাদ করলেন না কেন?”

“ কেন আপনারা জানেন না?”

কমিউনিস্ট শাসিত দেশে সম্পদ ও জনগন সবই সরকারের। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সম্পদ সরকারের, জনগনের কিছুই নেই। কাজেই আমাদের ইচ্ছা, ইচ্ছা নয় সরকারের ইচ্ছাই ইচ্ছা।

মাওলানা রফিক বন্দির কথা শুনে বুঝতে পারলেন আসলে গর্ভাচেভ ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা, তাঁতী, জেলে, অশিক্ষিত ও মুর্খদের ধরে এনে মাথার চুল ছেটে সামরিক পোশাক পরিয়ে নামে মাত্র সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে প্রেরণ করছে। ওরা প্রাথমিক পর্যায়ে যতটুকু পারে জুলুম চালিয়ে যাবে। তারপর মজবুত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের দিয়ে ভারি ভারি অস্ত্র দিয়ে পাঠাবে।”

সুফিয়া সৈন্যটির অসহায়ত্ব দেখে বলল “তুমি যদি এ সংকট ময় মুহুর্তে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও এবং এ অঙ্গীকার কর যে, আর কোনদিন রাশিয়ানদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না, তাহলে তোমার প্রাণভিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

বন্দী এক দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত করে বলল, “মা! যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয় তাহলে এর ব্যীতক্রম হবে না। আর এ কথাও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, আমি তো দেশে ফিরে যেতে পারব না। কারণ আমাদেরকে এ কথা বলেই পাঠানো হয়েছে হয়ত বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে আর না হয় আফগানিস্তানেই মুত্যুবরণ করবে। এর ব্যতিক্রম করলে তাকে আর জ্যান্ত রাখা হবে না। দেশে ফিরে গেলে সরকার আমাকে আর বেঁচে থাকতে দিবে না। কাজেই আমি মুসলমান হয়ে আপনাদের সাথেই থাকব এবং রোশদের গোপন তথ্য দিয়ে আপনাদের সহযোগীতা করব।”

বন্দীর কথা শুনে সুফিয়া মাওলানা রফিককে লক্ষ্য করে বলল “ভাইজান! আমার ইচ্ছা বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া এবং কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে আমাদের সাথে রাখা, তার দ্বারাও দ্বীনের ফায়দা হতে পারে। তবে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।”

মাওলানা রফিক সুফিয়ার কথার উত্তরে বললেন, "ধৃত অবস্থায় ঈমান আনা আর বেহুশ অবস্থায় তওবা করা একই কথা। তবে যেহেতু সত্যিকার অর্থে তিনি নিজ গরজে এ দেশে যুদ্ধ করতে আসেনি সেহেতু তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে।" তাঁর এ কথা শুনে সুফিয়া বন্দির হাত পায়ের বাধন খুলে দিল। বন্দী খুশিতে লা ইলাহা ইলালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ" কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। রফিক তাকে কালিমার অর্থ ও মাকছুদ ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

মাওলানা রফিক চিন্তা করলেন, রাত শেষের দিকে কাজেই এখানে আর বেশিক্ষণ অবস্থান করা ঠিক হবে না। আমাদের অন্যত্র যাওয়া উচিত হবে।

সুফিয়া বিনীত কণ্ঠে বলল, "রফিক ভাইয়া! আমরা বাড়ি ফিরে না গিয়ে চলুন ওদের ক্যাম্পে গিয়ে আক্রমণ করি। তাছাড়া যেসব সেনা অপারেশনে এসেছে ওদের উপরও আক্রমণ করতে পারি। আপনার অভিমত কি?"

সুফিয়ার কথা শুনে নওমুসলিম সৈন্য বললেন, "ক্যাম্পে মাত্র ছয়জন সৈন্য রয়েছে, আমরা তিনজনে যদি অতর্কিত ওদের উপর আক্রমণ করি তবে ওদেরকে হত্যা করা কোন কঠিন কাজ নয়। ক্যাম্পের সব কিছুই আমার জানা আছে।"

সুফিয়া নও মুসলিমকে বলল, "আমরা যদি ক্যাম্পে গোলাগুলি করি তবে সেই শব্দ শুনে গ্রামে আসা সৈন্যরা সতর্ক হয়ে যাবে। আমার পরামর্শ হল আপনি যদি ক্যাম্প থেকে ২/১ জন সৈন্যকে বাইরে ডেকে আনতে পারেন তবে খঞ্জর দিয়ে কাজ শেষ করা যাবে।"

সুফিয়া আরো বলল, "ওরা অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু দূরে পজিশন নিয়ে থাকবে। যাদেরকেই ডেকে আনা হবে তাদেরকে স্যালেন্ডার করিয়ে তৎক্ষণাত বেধে ফেলব। এভাবে সবাইকে বেধে দুরে নিয়ে যাব আর গনিমত হিসেবে যদি অস্ত্র-শস্ত্র পাই তাও নিয়ে আসব। অত:পর তাদেরকে জবাই করে অপারেশন গ্রুপের উপর গুলি চালাব।"

সুফিয়ার পরামর্শ শুনে মাওলানা রফিক বললেন, "সুফিয়া যথার্ত পরামর্শের জন্য তোমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সহস্র ধন্যবাদ। এই

তিনজনে আস্তে আস্তে রুশীদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলেন। শেষ পর্যন্ত সুফিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী ছয়জনকে বন্দী করে আনা হল। এতে গনিমত হিসেবে পাওয়া গেল ছয়টি ক্লাশিনকভ। ওদেরকে অন্য এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে হাত পা মজবুত করে বেধে ফেলে রাখা হল। অত:পর দ্রুত চলে গেলেন গাড়ীর পার্শ্বে। সুফিয়া দুজনকে বলল, "আপনারা দু'জন আরো একটু আগে চলে গিয়ে আক্রমণ করবেন। উক্ত আক্রমণ যদি দু একজন বেঁচে যায় আর গাড়ির দিকে ফিরে আসে তবে সাথে সাথে গুলী করে হত্য করা হবে। মাওলানা রফিক তাই করলেন। সুফিয়া গাড়ীর দরজা খুলে অস্ত্রটি পূর্ণ লোট করে ড্রাইভার সেজে বসে গেল। আর বাকী দুজন চলে গেলেন আর একটু এগিয়ে এক টিলার অপর প্রান্তে। শিকারী বিড়ালের মত শিকার ধরার অভিপ্রায়ে তারা অপেক্ষায় রইল।

রাত প্রায় শেষ হওয়ার পথে। রুশ ফৌজরা গোটা গ্রাম লুটতরাজ করে ক্যাম্পের দিকে ফিরছিল। গ্রাম থেকে অন্য কোন মানুষ বন্দী করে আনেনি ওরা। রুশ সেনারা মাওলানা রফিকের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথেই দু দিক থেকে একই সাথে গর্জে উঠল তাদের রাইফেল। ওখানেই লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন। বাকীরা প্রাণ ভয়ে গাড়ীর দিকে দৌড়াচ্ছে। তারা গাড়ীর নিকটবর্তী হলেই সুফিয়া তার স্টেনগান উচিয়ে ব্রাশফায়ার করল। সাথে সাথে ঝড়ে গেল কয়েকটি তাজা প্রান। মুহুর্তের মধ্যেই দুশমনের তামাম আস্ফালনের যবানিকা ঘটে গেল। বেশ কয়েকটি অস্ত্র পাওয়া গেল। গোলাবারুদ পাওয়া গেল অনেক। তা তাদের তিনজনের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। এগুলো এমনিতে ফেলে দেয়া ঠিক হবে না। লক্ষ টাকা হাতিয়ার নষ্টও করা ঠিক হবে না। তাই মাওলানা রফিক বললেন সুফিয়া তুমি এখানে বস অস্ত্রগুলো পাহাড়া দাও। আমরা দুজন যা পারি তা নিয়ে রেখে আসি।" সুফিয়া এতে রাজি হল। তাঁরা দুজনে অস্ত্র নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

সুফিয়া একাকিনী ভাবেছে এভাবে অস্ত্রগুলো গোপন করতে তাদের অনেক সময়ের দরকার হবে। এদিকে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনা করে সেজদাবনত মস্তকে গভীর রজনীতে অন্ধকারময় উপত্যকায় মাওলাকে ডাকছে। "ওগো অসহায়ের সহায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, দুর্বলের সবল মাওলা। আপনার দ্বীনের জন্য

আমাদের কবুল করে নিন। আমাদেরকে হেকমত ও কৌশল দান করুন। আপনার সাহায্য ছাড়া বান্দার পক্ষে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমাদের প্রতি আপনার রহমতের দুয়ার খুলে দিন।"

সুফিয়া দোয়া শেষ করে মস্তক উত্তোলন করে চেয়ে দেখে, একটি গাধা তারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এমন সময় এখানে গাধা দেখে চমকে উঠল সুফিয়া। এ গভীর রজনীতে কোত্থেকে এলো। আশেপার্শ্বে নেই কোন বস্তি, নেই লোকালয়। গাধা আসার কারণ থাকতে পারে না। ভাবছে এটা জিন ভুত কিছু নয়তো? এসব নিয়ে সুফিয়ার হৃদয়ে ভাবনা। পরক্ষণে তার অন্ত রে ভয় দুরীতুত হল। সে ভাবল এ জিন-ভুত কিছুই নয়। এ হল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের বাহন। সুফিয়া সাহসে ভর করে সবগুলো অস্ত্র তুলে দিল গাধার পিঠে। গাধা তার পৃষ্ঠ দেশে অস্ত্রের ভার বুঝতে পেরে মনের আনন্দে আপন গতিতে সর্দার বাড়ির পথে এগিয়ে চলছে। কিছু পথ অগ্রসর হলে রফিকের সাথে সাক্ষাত হল। রফিক এ কাণ্ড দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেলেন বাড়িতে। অস্ত্রগুলো হেফাজতের জন্য সুফিয়ার হাতে তুলেন মাওলানা রফিক। রাত শেষ রফিকের চলে যেতে হবে পাকতিয়ায়। তাই মাতা পিতার সাথে শেষ বারের মত দেখা সাক্ষাত করে,প্রয়োজনীয় উপদেশ নিয়ে নও মুসলিমকে সাথে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। উভয়ের গায়ে কাশ্মীরী চাদর আর তার নিচে অস্ত্রটি লুকানো আছে। চলছে সতর্ক অবস্থায়।

চৌত্রিশ

আলম খান মাহমুদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বাগরামে। আতিকা আলমের আগমনের প্রহর গুনছে। সে তিন দিনে কয়েক বার সে আলমের খোঁজে গিয়েছিল। না পেয়ে দু:খ ভরা মন নিয়ে ফিরে আসে। আজ বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে আবার খোঁজ নেবে এ মনোভাব নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছে। কোনমতে ক্লাস শেষ করে প্রাইভেট স্যার থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেল আলম সাহেবের অফিসে।

আলম সাহেব সবেমাত্র গাড়ী থেকে নেমে অফিসে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন করে, হাত মুখ ধুয়ে, ইজি চেয়ারে বসে দেয়ালে অংকিত ছবিগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। এমন সময় কে আসতে পারে তা ভেবে পাচ্ছিলেন না আলম সাহেব আবার বেজে উঠল কলিং বেল, অধীর আগ্রহে কয়েক কদম এগিয়ে দরজা খুলে দিলেন। মনে হল দরজা পথে এক ঝলক প্রখর রোদের আলো ঘরে প্রবেশ করে তামাম অন্ধকার দূরীভূত করে দিয়েছে। এ সময় আতিকা আসবে তা কল্পনার বাইরে। অনাকাঙ্খিত সময়ে আতিকার দর্শন পেয়ে তার সর্বাঙ্গে খেলে গেল পুলক শিহরন। সে ভাববেগে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল আতিকাকে। উভয়ের ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ শোণিতধারা। পুরুষের বাহুবন্ধনের অন্তরালে এত আনন্দ ছড়িয়ে আছে তা কোনদিন অনুভব করতে পারেনি আতিকা। পুরুষের শরীরে যে রয়েছে এত তড়িৎ প্রবাহ তা এখন হারে হারে, ধমনিতে-ধমনিতে, শিরায় শিরায় ও রগে রগে অনুভব করছে আতিকা। তাদের এ আলিঙ্গন প্রায় কয়েক মিনিট স্থায়ী ছিল। অত:পর দুটি চেয়ারে মুখু মুখি বসে দুজনের কুশলাদি জিজ্ঞাসা বিনিময় করল।

আতিকা বলল, "সত্যি কি আপনি আমাকে ভালবাসেন, না এ ভালবাসা কৃত্রিম?"

ঃ সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি, এটা কৃত্রিম ভালবাসা নয়।

ঃ আপনি কি এর আগে কোন মেয়েকে ভালোবাসা দিয়েছেন?

ঃ না এর আগে অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসি নি। তবে কলেজ জীবনে অনেক মেয়ে আমাকে ভালবাসা নিবেদন করতে চেয়েছিল। যা তাদের আচার-আচরণে ধরতে পেরেছি।

ঃ এ ভালবাসা কি চিরদিন অক্ষুন্ন থাকবে?

ঃ অবশ্যই থাকবে, লয় হবে কেন?

ঃ অন্য মেয়েকে পেয়ে আমাকে ভুলে যাবেন নাতো?

ঃ কি বল যে, প্রিয়তমে? আমি এ ধরনের ছেলেই নই।

এ বলে খুব মিহিন সুরে হৃদয় উজাড় করে গাইতে লাগলেন-

* ফরামুশী মান্না কারদাম আয় দোস্ত
কছম আল্লাহর মাননা কারদাম ফরাশুশ॥

অর্থাৎ হে প্রিয়, আমি কোন দিন তোমার প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ভুলব না। আল্লাহর কসম, আমি কোন দিন তোমাকে ভুলব না।

* ফরামুশী কেছেরা গুয়ী নাদানাম
হামেশা বর লব্বে খান্দা মিকুনাম।

অর্থাৎ ভুলে যাওয়া কাকে বলে তা আমি জানিই না। সবসময় আমার মুখে থাকবে তোমার নামের জপ।

* ফরামুশী মেরে দিলমে নেহি হে
খোদা মালুম তেরে দিলমে কিয়া হে॥

অর্থাৎ আরে ভুলে যাওয়া যে বস্তু, তা আমার দিলেই নেই। ভুলে যাওয়া বস্তুর আসন আমার অন্তকরণে নেই (আমার দিলের কথা তো বললাম) এখন একমাত্র আল্লাহ জানেন, তোমার অন্তরে কি? তোমার অন্তরে কি আমার ভালবাসা আসন গেড়ে বসে আছে না অন্যের, তা আল্লাহ ভাল জানেন।

* আগার মুরা ফরামুশী দিদাম,
বরুজে মাহশারে দামান বগীরাম॥

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! তুমি যদি আমাকে ভুলে যাও, তা হলে কাল কিয়ামত দিবসে তোমার আঁচল টেনে ধরব। এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে দেব না।

আলম গদ-গদ কণ্ঠে কবিতাগুলো পাঠ করে আতিকার অন্তরের সংশয় বিদূরিত করে স্থায়ীভাবে আসন পেতে বসলেন। আতিকার কোমল চেহারায় ফুটে উঠল রঙ্গিন আভা। ছাড়ল শান্তির নিঃশ্বাস। আতিকা মুখে হাসির রেখা টেনে আলম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল-

"আলম ভাইয়া! এমন কি পদ্ধতি রয়েছে য, আপনার সাথে সব সময় থাকতে পারি। এতে যেন কোন দিন কেউ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করতে পারে।"

আলম আতিকার কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠেন। কারণ, এটাই লুকিয়ে ছিল তার মনের গভীরে। এটাই তার মনের কথা, এটাই তার চরম চাওয়া-পাওয়া। তাই আতিকাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি তোমার ভাইয়্যাকে গিয়ে বল আমি চাকরি করব এবং ফাকে লেখাপড়া করে পরীক্ষাটা দেব। অনেকেই তো এমন করে থাকে। দেখ সে কি বলে, যদি না বলে তবে ইচ্ছা করেই পরীক্ষায় ফেল করবে।

তারপর দেখবে এমনিতেই তার মন ভেঙ্গে যাবে। তখন তোমার জন্য লক্ষ্যে পৌছা একদম সহজ হয়ে যাবে। তাছাড়া তাকে আরো একটি বিষয় বুঝানোর চেষ্টা করবে যে বর্তমানে কত ছেলে-মেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বেকার ঘোরা-ফেরা করছে চাকুরী মেলে না। বেকার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে স্বয়ং সরকারও হিমশিম খাচ্ছেন। আপনি সামান্য বেতনে চাকরি করে যে অর্থ পান তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে যায়। এর উপর আমার খরচ চালাতে আপনাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আমি আর কতদিন আপনার উপর বোঝা হয়ে থাকব? দুজনে যদি পাঁচ-সাত হাজার টাকা আয় করতে পারি তবে সুখে-স্বাচ্ছন্দে চলেও টাকা থাকবে। তা দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কিছু করা যাবে।"

আতিকার নিকট পরামর্শ গুলো খুবই চমৎকার মনে হল। সময়ের স্বল্পতার কারণে আর বিলম্ব না করে আতিকা বাসার পথ ধরল।

হায় প্রেমের টানে তার পদযুগল চৌকাঠের বাইরে বেরুচ্ছে না। চলার পথ কন্টকাকীর্ন বলে মনে হচ্ছে। বিদায়লগ্নে করমর্দন করে অনেক কষ্ট করে বেরিয়ে এল। কি যেন মায়ার বাঁধন, কি যেন আকর্ষণ তাকে ঘিরে রেখেছে। আর একবার আলমের উজ্জ্বল বদনের দিকে চেয়ে বলল, "যাই হে প্রিয়তম তখন তার চোখ ছিল অশ্রু ভরা। বুক ভরা ব্যথা আর মুখ ভরা হাসি।

সন্ধ্যার পূর্বেই বাসায় ফিরতে হবে, না হয় হৈ হুল্লা পরে যাবে বাসায়। তাই বাহুতে ভেনেটি ব্যাগ আর অপর হাতে ডায়রিটা নিয়ে চলে চপলা হরিণীর মত দ্রুতগতিতে চলছে। মস্তকের পশ্চাত দিকে যমকালো বিন্নি দুটি পৃষ্টদেশে খেলা করছে। এতে তার শোভা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কোন যুবক আছে তার দিকে একবার না তাকিয়ে পারবে? এমনিভাবে সন্ধার কয়েক মিনিট আগেই বাসায় ফিরে এলো আতিকা।

রাত ৮টা আতিকা পড়ার রুমে নিশ্চুপ বসে বসে কল্পনার জাল বুনছে। ভাই সরোয়ার এখনো ক্লাব থেকে বাসায় ফিরেনি। আতিকার রুমের নীরবতা দেখে ভাবী রুমে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন আতিকা বসে বসে কি ভাবছ? ছাত্রীদের চিন্তা শুধু লেখা পড়া। অন্য কোন চিন্তা মাথায় স্থান দেয়া যাবে না। তা না হয় লেখা পড়ায় কেউ কামিয়াব হতে পারবে না। জানি বয়স হয়েছে অনেক চিন্তাও মনে আসবে, আর এটাই বাস্তব। তবু নিজেকে সামলিয়ে রাখতে হবে।"

আতিকাঃ কি যে বলেন ভাবী আপনাদের চিন্তাই বেশি করি। তারপরও এত সন্দেহ? এত খারাপ ধারনা আমার প্রতি?

ভাবীঃ আমাদেরকে নিয়ে আবার কি চিন্তা করছিস? কিসের এত চিন্তা আতিকা?

উত্তরে আতিকা বলল, "ভাবী ভাইয়্যা অল্প বেতনে চাকরি করেন। এ পয়সা দিয়ে সংসার চালাতে তার অনেক কষ্ট হয়। তদুপরি আমি তোমাদের উপর বোঝা হয়ে আছি। তাই আমি একটি চাকরি নেয়ার কথা ভাবছি আশা করি চার হাজার টাকা বেতন হতে পারে। ভাই-বোনে মিলিয়ে যদি প্রতিমাসে সাত আট হাজার টাকা আয় করতে পারি, তবে ভালভাবে চলে টাকা থাকবে। এ দিয়ে কিছু না কিছু করা যাবে।" ভাবীর ভাবীর অন্ত র গলে গেল আতিকার কথা শুনে প্রতিমাসে সাত আট হাজার টাকা শুনতে পারলে খুবই ভালো লাগবে। আতিকার কথাগুলো সরোয়ারের কাছে সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারলে তিনি হয়ত রাজি হয়ে যাবেন। ভাবী রাত্রেই সরোয়ারের নিকট আলাপ করলেন।

ভোরে আতিকাকে ডেকে ভাইয়া জিজ্ঞেস করলেন তুমি নাকি চাকরির বন্দোবস্ত করেছ, তা কি সত্যি?"

আতিকা ঃ হ্যা ভাইয়া ছোট একটা চাকুরী করতে পারি যদি আপনার অনুমতি হয়।

সরোয়ার কি চাকুরি করবে আতিকা?

আতিকাঃ বিদেশী একটি এন.জি.ওতে।

সরোয়ার ঃ একি বলছ আতিকা এন.জি.ও রা তো মুসলমানই নয়। উলামায়ে কেরামগণ ইতিমধ্যেই তো এদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিধ্বংসী অভিযোগ এনেছেন। ওরা নাকি সরলমনা মুসলমানদের অমুল্য সম্পদ ঈমান হরণ করেছে। মা বোনদেরকে অর্থের লোভ দেখিয়ে পর্দার বাইরে নিয়ে আসছে। এমনকি নারী ধর্ষনের অনেক অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরোদ্ধে। এইতো সেদিন পত্রিকায় এক জরিপ রিপোর্ট পেশ করেছে, আফগানিস্তানে তিনশ পয়ত্রিশটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেক মাছুম বাচ্চা রয়েছে। তারা আজ মায়ের আদর সোহাগ থেকে

বঞ্চিত। ঐসব মায়েরা এন.জি.ও সদস্য হয়ে সন্তানাদি ও স্বামীদেরকে ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি ভাই হয়ে যুবতী বোনকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারি না। অনাহারে থাকতে পারি তবু তা সম্ভব হবে না। এটাই আমার চূড়ান্ত ফায়সালা।

আতিকাঃ আপনি যা বলছেন অনেকটা সত্য বটে কিন্তু এতটা নয়। বেকারদের কর্মসংস্থান করা, গরীবদের ঋণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। রোগীদের চিকিৎসা দেয়া। রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন করা, নিরক্ষরতা দুর করা, কুটির শিল্প স্থাপন করা, হাস মুরগী ও পশু পালন করা, এগুলো কি ইসলাম বিরোধী কাজ? এন.জি.ও মহিলাদের কি আপনি বোরকা ছাড়া বেরুতে দেখেছেন? আমি এন.জি.ওতে চাকরি নিলেই যে বেঈমান হয়ে যাব তা না। আমার ধর্ম আমার কাছে ওদের ধর্ম ওদের কাছে। হিন্দু মাহাজনের দোকানে চাকুরী নিলে সে হিন্দু হয়ে যায় না। কাজেই এসব কথার যুক্তিকতা খোজে পাওয়া যায় না। আমি আশা করি আমি ওসব ফতোয়াবাজি তোয়াক্কা না করে ইজাজত দিয়ে দিয়ে দিবেন।"

সরোয়ার বোনের কথা শুনে একমত অপারগ হয়েই ইজাজত দিয়ে দিলেন।

পয়ত্রিশ

মাওলানা রফিক চলছেন নিরুদ্দেশে, পথ-ঘাট তার জানা নেই। পথিমধ্যে কার কাছে কোথায় আশ্রয় নিবেন তাই ভাবছেন। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন রেখে প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা অতটা সহজ নয়। এটা একমাত্র মুজাহিদদের দ্বারাই সম্ভব। কেননা তাদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুস্টি অর্জন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেম প্রবেশ করে গায়রুল্লার প্রেমকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সত্য প্রেমের আবির্ভাব হওয়ায় নকল প্রেমের বিলুপ্তি ঘটেছে। এমন নিখাদ খোদা প্রেমিকগণের দ্বারাই সম্ভব জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে বিলিয়ে দিতে। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পেতে তার মাতা

পিতা, ভাই-বোন ত্যাগ করে প্রেমিকের হাত ধরে যদি বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে একজন মুজাহিদের পক্ষে সম্ভব হবে না কেন এভাবে ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্য আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসার জন্য নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তির জন্য দেশ ও আপনজন ত্যাগ করা?

রফিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। পাশে তাঁর বৃদ্ধা মাতা-পিতা দাঁড়িয়ে অশ্রুতে বুক ভাসাচ্ছেন। সেদিকে মাওলানা রফিকের কোন খেয়াল নেই। অন্তরে জিহাদের জযবা, চোখে জ্বলছে প্রতিশোধের অনির্বাণ অগ্নিশিখা। কোন ভালবাসা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আল্লাহ পাকের ঘোষণা তো এমনটিই। আল্লাহ বলেন-

"বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ তাঁর রাসুল ও তার রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তওবা-২৪)

তাই তিনি সকল মায়া পশ্চাতে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলতে চলতে তিমিরে লীন হয়ে গেলেন। ফজরের আগেই তাঁকে লোকালয়ে ত্যাগ করে জনহীন প্রান্তরে পৌঁছতে হবে। এখন মানুষ রূপী দুশমনের ভয় প্রতি কদমে কদমে। কঙ্করাকীর্ণ পথ-ঘাট, দ্রুত অতিক্রম করা অসম্ভব। তবু তিনি যথাসাধ্য দ্রুত পদে চলছেন। অকস্মাৎ পশ্চাত দিক থেকে কি যেন পতিত হওয়ার শব্দ তার কানে আসল। তাঁরা থেমে গেলেন। ঘার ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, এক মনুষ্য মূর্তি এদিকে আসছে। রফিক রোমাঞ্চিত হয়ে নও মুসলিমকে ইশারা দিয়ে দেখালেন। পালানোর কোন স্থান তাদের জানা ছিল না। তাই নিজ নিজ হাতিয়ার হাতে তুলে নিলেন এবং ফায়ার পজিশনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনুষ্য মুর্তিটি প্রায় নিকটে এসে গেলে অক্ষি নামক ক্যামেরাতে ভেসে উঠল হায় এতো আর কেউ নয় এ তো প্রিয়তমা সুফিয়া।

সুফিয়া ক্ষীন আওয়াজে ডাকছে রফিক ভাইয়া! অ রফিক ভাইয়া!

রফিক ভাইয়া দাঁড়াও। দাঁড়াও।

কত মধুর ডাক কত মায়াভরা ডাক। সুফিয়া ছাড়া আর কে আছে অমন করে ডাকবে। আর একটু নিকটে আসলে সর্বপ্রথম রফিকের যবান থেকে বেরিয়ে এলো আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ। সুফিয়া সালামের উত্তর দিয়ে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাপাচ্ছে। অত:পর ওড়না থেকে একটি পুটলি বের করতে করতে বলল "ভাইয়া মাফ করবেন আগে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই নিন প্রয়োজন হলে এগুলো খরচ করবেন। রফিক হাত বাড়িয়ে পুটলিটা নিতে নিতে বললেন "আরে পাগলীনি এসব নিয়ে তুমি এত পথ কেন দৌড়িয়ে এলে? তোমার এ আচরণ আমার হৃদয়ে বার ভেসে উঠবে। বার বার স্মরণ হবে তোমার এ ত্যাগের বিবরণ ভেবেছিলাম, তোমাকে আরো কাছে টেনে নেব। আরো আপন করে নেব। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস তা এখন আর হল না। আমিতো জিহাদের ময়দানে চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল ময়দানে, হয়ত আর দেখা হবে না কোনদিন। যদি শহীদ হয়ে যাই, তবে দেখা হবে চির শান্তির নীড় জান্নাতে।"

"সুফিয়া! আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাস। জালিমের কবল থেকে তুমি আমাকে ছিনিয়ে এনেছ। তোমার এ ত্যাগের ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারিনি। পরিশোধ করা সম্ভবও নয়। ভালোবাসার ঋণ একমাত্র ভালোবাসার মাধ্যমেই পরিশোধ করা যায়।"

"সুফিয়া তোমার জন্য রেখে গেলাম আমার অতি আদরের ছোট ভাই মাওলানা আরিফকে। সে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে মাওলানা হয়ে তিন মাস পরেই ফিরে আসবে। আম্মু আব্বুকে বলে এসেছি আরিফ বাড়ি আসার সাথে সাথে তোমার যেন ওর সাথে আকদ (বিবাহ) সম্পন্ন করে দেন। আমাকে যেমন ভালোবেসেছিলে তাকেও তুমি ভালোবাসবে। আস্তে আস্তে আমার ভালোবাসা থেকে মনকে সরিয়ে নিবে। জানি ভালোবাসার বীজ একবার বপন করলে তা উপড়ানো খুবই কঠিন। সহজে ভুলা যায় না ভালোবাসার মানুষটিকে। তবুও কর্তব্যের তাড়নায় কখনো ভুলতে হয়। পরিবেশ যদি অনুকূলে থাকত তবে তোমাকে আমার সহধর্মীনি রূপে ময়দানে নিয়ে যেতাম। তাতো আর সম্ভব হচ্ছে না। দু একদিনের জন্য বিয়ে করে তোমার জীবনটা নষ্ট করে লাভ কি? তুমি সুখে থাক, শান্তিতে থাক এটাই আমার একান্ত কাম্য।"

"সুফিয়া রাততো শেষ হয়ে আসছে। ভোরের আযান এখনই শোনা যাবে। লোক চলাচল আরম্ভ হবে আমরা ঐ পাহাড়ের কোন গুহায় আশ্রয় নেব। গুহার অভ্যন্তরে দিন যাপন করব। আবার সন্ধ্যায় বেরিয়ে পথ চলা শুরু করব। যাও সুফিয়া, বাড়ি ফিরে যাও। অনেক কথা অনেক ব্যথা না বলাই রয়ে গেল। যাও সুফিয়া বাড়ী চলে যাও। সুফিয়া অবনত মস্তকে দন্ডায়মান। তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হচ্ছে না। তার চোখ থেকে শুধু ফোটা ফোটা অশ্রু ঝড়ছে। রফিক বিদায়ি সালাম জানিয়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলেন। সুফিয়াও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ির পথ ধরল।

মাওলানা রফিক দুটি পাহাড় পাড়ি দেয়ার আগেই পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে উঠল। ঝর্ণা থেকে ওযু করে পাথরের উপর দাড়িয়ে নামায আদায় করলেন। নও মুসলিম এমতাবস্থায় কি করবেন, স্থির করতে না পেরে পার্শ্বে বসে অপেক্ষা করছেন। রফিক নামায শেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাতর সুরে প্রার্থনা করলেন, "প্রভুহে! এ জনহীন প্রান্তরে তোমার এক গোনাহগার বান্দাহ, জীবনের পাপরাশিকে নিয়ে হাজির হয়েছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি গাফফার, রাহমান, সাত্তার। তোমার এসব নামের বরকতে আমাকে মাফ করে দাও।"

"ওগো রাব্বুল আলামীন! আমরা জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমলকে ছেড়ে দেয়ার কারণে আমাদের উপর রাশিয়াকে চাপিয়ে দিয়েছ। এ পরশক্তির সাথে মোকাবেলা করে টিকে থাকা বা বিজয়ী হওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। তোমার কুদরত, তোমার রহমত, আর তোমার নুসরত যদি আমাদের পার্শ্বে থাকে তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না।"

"আয় আল্লাহ! উম্মতে মুসলিমার অন্তরে দ্বীনের মহব্বত পয়দা করে দাও। মুসলিম জনগনকে জাগ্রত করে দাও। জিহাদের গুরুত্ব ও জিহাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝবার তওফীক দাও। আয় আল্লাহ তোমার মর্জি মত চলার ও জিহাদ করার তওফিক দান কর। আমীন।"

মাওলানা রফিকের কাকুতি-মিনতি দেখে নও মুসলিম সৈন্যটি প্রশ্ন করলেন, স্যার কার কাছে আবেদন করলেন? আপনার আরাধনা কে শুনছে?"

রফিক উত্তর বললেন, "ভাই এ জাহানের মালিক একজন আছেন। যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। তারই হাতে আমাদের জান, তিনি অমর, অক্ষয়, চিরঞ্জীব। তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। জীবিতকে মৃত দেন, আর মৃতকে জীবিত করেন। হাসি-কান্না, সুখ-দু:খ তারই হাতে। তিনি সমস্ত প্রশংসা ও উপাসনা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। অন্য কেউ নয়।"

মাওলানা রফিকের কথাগুলো সৈনিকের কাছে কেমন যেন নতুন নতুন মনে হল। "এ ধরনের কথা তো আর কোনদিন শুনেনি।"

সৈনিকটি বললেন, "আরে আমরাতো সারা জীবন ভর শুনে আসছি সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে। তাহলে কি সত্যিই একজন শ্রষ্টা রয়েছেন? যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা?

"হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তাছাড়া কি এত সুন্দরভাবে বিশ্ব পরিচালিত হত? একটি পরিবার চালাতে গিয়ে কর্তাকে কত হিমশিম খেতে হয়, কত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর এ বিশ্ব চরাচর আবহমান কাল থেকে একই নিয়মে চলে আসছে। তা থেকে কি এক আল্লাহর পরিচয় প্রমাণ করে না?" সৈন্য বললেন হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। আমি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের উপর ঈমান আনয়ন করলাম।"

অত:পর রফিক সুফিয়ার দেয়া পুটলিটা খুলে দেখলেন তার ভিতর রয়েছে কতগুলো রুটি ও খর্জুর এর মধ্যে আর একটি পুটলি। তাতে রয়েছে কয়েকহাজার আফগানি মুদ্রা। রফিক শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন যে, হায় খুবই তাড়াতাড়ি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। রাহা খরচের জন্য কিছুই সঙ্গে আনিনি। সুফিয়া এতই বিচক্ষন মেয়ে যে এতপথ এগিয়ে এসে এত জরুরী জিনিস হাতে দিয়ে গেল। রফিক সুফিয়ার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলেন। তারপর কিছু আহারাদি করে গুহার ভিতর শুয়ে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

গুহার ভিতর দুটি প্রাণ তামাম দিবস কাটিয়ে দিলেন। বাইর জগতের সাথে সারাদিন কোন সম্পর্ক ছিল না তাদের সবেমাত্র সূর্য অস্ত গিয়েছে পশ্চিম আকাশে। উষ্ণ বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। বইছে স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া। উত্তপ্ত ধরণী অনেকটা শান্ত।

মাওলানা রফিক নও মুসলিম সৈন্যটিকে বললেন "আমরা এখন মাগরিবের নামায পড়ব। আপনি আমার ডান পার্শ্বে একটু পিছিয়ে দাঁড়াবেন। আমি যা করি আপনিও তাই করবেন। আর মনে মনে আস্তে আস্তে আল্লাহ আল্লাহ বলবেন। ঝর্ণা থেকে ওযু করে উক্ত নিয়মে মাগরিবের নামায শেষে তাসবীহাত আদায় করেন এবং মুনাজাত করেন। নও মুসলিম নামাযের অনুসরণ করে যখন মুনজাত করছিলেন তখন অনাবিল এক শান্তি এসে তাকে ঘিরে ফেলল। তিনি এমন আনন্দ জীবনে কোনদিন অনুভব করেননি। এত প্রশান্তি তাঁর দিলে কখনো লাগেনি। সৈনিকের নাম ছিল ডন ক্লোন্স। রফিক তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ আব্দুল্ল-াহ। এতে আব্দুলার খুশির অন্ত নেই। সে বার বার নিজের নামটি মুখে উচ্চারন করতে লাগল। বলছিলেন আদবুল্লাহ, আদবুল্লাহ রফিক একটু হেসে বললেন না আদবুল্লাহ না, আবদুল্লাহ। কয়েকবার চেষ্টা করার পর নামটি সুন্দরভাবে মুখস্থ করে ফেললেন।

দুরের পথ। যেতে হবে বহুদুর। পথ-ঘাট অচেনা নেই কোন রাহবার। লঙ্খিতে হবে পাহাড়, পর্বত, গিরি, কান্তার। কিছুক্ষণ পরপরই নিতে হবে বিশ্রাম। এখানে সময়ের অপচয় করা যাবে না একদণ্ড। তাই নিজ নিজ হাতে হাতিয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে কাশ্মিরী চাদর গায়ে জড়িয়ে নিলেন উভয়ে। যেন সহজে কেউ অস্ত্রের খোঁজ না পায়।

গুহা ত্যাগ করে যাত্রা শুরু হল পাকতিয়া অভিমুখে। ইস কি আঁধার রজনী কে যেন মসি লেপ্টে দিয়েছে চতুর্দিকে। মনে হয় কোন শিল্পি কালি মেখে দিয়েছে রাতের গায় কঙ্করাকীর্ণ বন্ধুর গিরিপথ। চলার পথে কেবইলই ধারালো পাথর কণা পা ফুটো করে জানিয়ে দিচ্ছে হে পথিক জিহাদের পথ অতি দুর্গম। নির্ভিক চিত্তে কোথায় যাচ্ছ? শরীর জ্বলবে, ক্ষুধা,তৃষ্ণা হবে তোমার নিত্ত দিনের সাথী। জীবন কেড়ে নিবে দুশমনের বারুদে। পাবে না তুলতুলে নরম বিছানা। পিষ্ট হবে সামরিক জান্তাদের বুটের তলায়। ঈমানকে আর একবার পরখ করে নাও।

পথ যেন নীরব ভাষায় পথিককে হুশিয়ার করে দিচ্ছে। মাওলানা রফিকের অন্তর থেকে পাথুরে পথকে জানিয়ে যাচ্ছে হে পথ তুমি কাকে ভয় দেখাচ্ছ? আমার মাওলাতো আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা

হয়েছে। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়ত কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাতের জন্য কল্যানকর। আর হয়ত কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন তোমরা জাননা।" (সূরা বাকারা-২১৬)

আল্লাহপাক তো জিহাদ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। জিহাদ না করলে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন। অযথা কেন ভয় দেখাও। ওহে কণ্টকাকীর্ণ গীরিপথ কেন তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহতো আমাদেরকে হীনবল হতে নিষেধ করেছেন এই বলে, "আর তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দু:খ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরাই বিজয়ী হবে।" (আলে ইমরান-১৩৯)

জিহাদ করা ছাড়া কি জান্নাতে যেতে পারব?

তাই আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, "তোমরা কি মনে করে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ্ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (সূরা আলে ইমরান-১৪২)

অযথা ভয় লাভ নেই। দুর্গম গিরি পথ বেয়ে পাহাড় পর্বত মাড়িয়ে, সাগর-নদী পেরিয়ে, সাহারা অতিক্রম করে আমাকে যেতেই হবে। ভয় দেখাসনে।

রফিক অব্যক্ত ভাষায় পথকে সতর্ক করে দিয়ে নিজ গতিতে চলছেন। দিনে ঘুমান আর রাতে সামনে অগ্রসর হন। এভাবে কয়েকদিন হেঁটে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পরেন।

মাওলানা রফিক একদিন নও মুসলিম খান মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে নিয়ে কোন এক গিরি গুহায় আশ্রয় নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। দুপুর বারটায় উভয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায় মজলুমদের আর্তনাদে। গুহা থেকে বের হয়ে দেখলেন প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে আকাশ ছেয়ে গেছে কালো ধুয়ায়। লেলিহান শিখায় আগুন জ্বলছে। রুশী সৈন্যরা যে ওখানে নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে লুট তরাজ করছে এবং বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তা আলামত দেখেই বুঝা যায়। এখনি এ মুসলমানের পার্শ্বে দাড়ানো কত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কাজেই চুপ চাপ বসে থাকা ঠিক নয়। খান সাহেবকে নিয়ে পরামর্শ করলেন তারা রুশদের উপর হামলা চালিয়ে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিবেন।

যোহরের নামায আদায় করে তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন বিধ্বস্ত গ্রামের দিকে। ততক্ষণে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। এলাকাবাসী সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আগেই গ্রাম ছেড়ে দূরে আশ্রয় নিয়েছে। রুশীরা চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা গ্রামে এসে কিছু বাড়ি ঘর রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

যোহরের নামায আদায় করে তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন বিধ্বস্ত গ্রামের দিকে। ততক্ষণে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। এলাকাবাসী সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে আগেই গ্রাম ছেড়ে দূরে আশ্রয় নিয়েছে। রুশীরা চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা গ্রামে এসে কিছু বাড়ি ঘর রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

মাওলানা রফিক গ্রামবাসীকে ডেকে একসাথে জড়ো করে বললেন "প্রিয় দেশবাসী! আমাদের স্বাধিকার, অধিকার, জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান আজ হুমকির সম্মুখিন। এ মহাবিপদ থেকে ঈমান, জান-মাল, ইজ্জত ও দেশকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে যার যা আছে তা নিয়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তা না হলে ঈমান থেকে নিয়ে আমাদের সবকিছুই খোয়া যাবে। দুশমনের সাথ লড়াই করে যদি নিহত হই তবে এটা হবে শাহাদাতের মৃত্যু। আর শহীদের প্রথম রক্তের ফোটা যমিনে পতিত হওয়ার পূর্বেই তার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তার রূহকে প্রেরণ করা হয় জান্নাতে। কাজেই আসুন আমরা এই মুহুর্তে যার কাছে যা আছে তা নিয়েই শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পরি।

রফিকের কথায় উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে দা লাঠি, শাবল, কুড়াল নিয়ে দুশমনের ঘাঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পরলেন। এতে ১৭ জন সৈন্য প্রাণ হারায় আর আহত হয় ২৮ জন। জীবিত ধরা পরে সাতজন পলায়ন করে ৪৩ জন। মুসলমান শহীদ হয় ৫ জন আর আহত হয় ৩ জন। মুজাহিদরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গনিমত হিসেবে পায়। এ অস্ত্রগুলো এলাকার যুবকদের মাঝেই বন্টন করা হয়। রফিক একদিন অবস্থান করে অস্ত্রের তালিম দিয়ে জামাতবদ্ধ করে, আমীর নিযুক্ত করে, জিহাদ সংক্রান্ত উপদেশ দিয়ে ৫ জন যুবক নিয়ে পাকতিয়ায় চলে গেলেন জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের কাছে।

ছত্রিশ

মাহমুদার অন্তর ব্যথায়, বেদনায়, চিন্তায় ও পেরেশানিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হতে লাগল। লজ্জা ও অনুসুচনায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। বুক ফেটে খান খান হয়ে যাচ্ছে। তার এই ব্যথার কথা বলার মতো আর বুঝার মত কোন সুহৃদও পাচ্ছে না। কালের চক্র গতিহীনভাবে অবিরাম চলছে কিন্তু মাহমুদার পরিবর্তন হচ্ছে না। আলম খান প্রথমে দু মাসে একবার আসতেন, দু-একদিন থাকতেন। এখন দু-তিন মাসেও দু-একবার আসেন না। সকল নারী চায় দাম্পত্য জীবনের শান্তি। সকলেই চায় চায় সুখে দুঃখে, হাসি-কান্নায়, আরাম-আয়েশে, বালা-মসিবতে, খেয়ে না খেয়ে স্বামীর সাথে থাকেতে। চায় স্বামীর আদর সোহাগ, ভালোবাসা পেতে। চায় স্বামীর বাহুবন্ধনে জীবনের রজনীগুলো পোহাতে। কিন্তু মাহমুদার জীবনে এমনটি কমই হয়েছে। এখনতো আলম তার বয়ফ্রেন্ড নয়। আলম তার বৈধ স্বামী কোর্টে তাদের বিয়ে হয়েছে। যদিও পিতা-মাতা, ভাই-বোন, মামা-মামির অগোচরে। বিয়ে তো হয়ে গেছে এখন কেন আলম দূরে সরে থাকতে চায় মাঝে মধ্যে আসলেও হাসি মুখে দিল খুলে কিছু বলতে চায় না। এর কারণ মাহমুদা খুজে পাচ্ছে না। তবে এতটুকু মনে পরে প্রায় এক বছর আগে কোন এক নিশিতে আলম বলেছিলেন আমরা জীবনে সন্তান নেব না। চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক জন্মনিয়ন্ত্রণের সবগুলো পন্থা এক এক করে অবলম্বন করব। আর আমাদের মধ্যে (এন.জি.ও) সন্তান না নেওয়ারই পরামর্শ দেওয়া হয়। সন্তান নিলে সাস্থ খারাপ হয়, রোগ-ব্যধি দেখা দেয়। হাজারো সমস্যা পোহাতে হয়। এর মধ্যে প্রধান হল স্যারেরা যখনই ডাক দেন কোনদিকে নিয়ে যেতে চান, যেমন প্রশিক্ষণে, শিক্ষাসফরে, ক্লাবে, ভ্রমণ ও পিকনিকে তখন খুবই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এজন্য এন.জি.ও মহিলারা সন্তান নেন না।

আলমের কথা শুনে মাহমুদা বলেছিল, "এটা কোন বিবেকবান বা জ্ঞানী জনের কথা নয় সবাই ভাল ফলাফলের আশা করে। কৃষক সোনালী

ফসল ঘরে তুলতে চায় তবে দাম্পত্য জীবনে সন্তান থাকা চাই একটি। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানরাই পিতা মাতার পাশে থাকে। অতএব আমিও দু একটি সন্তান নেব। ওদেরকে লালন-পালন করে মানুষ করব।"

মাহমুদার কথা শুনে আলম অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিলেন, "দেখ মাহমুদা তুমি কিন্তু অনেক বাড়াবাড়ি করছ। বাচ্চা নেয়া এন.জি.ও ধর্মে নেই বিশ্বের জনসংখ্যার হার বিপদ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ বাড়ি-ঘরে আবাদি জমির চাষাবাদ ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। ভুভুক্ষ জনতা একমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। বেকারত্ব দিন দিন বেড়ে চলছে। কাজ না পেয়ে যুবকরা রাতের আঁধারে পথিকের মাল লুণ্ঠন করছে। চুরি-ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য পাগলা ঘোড়ার মত উর্ধগতিতে ছুটছে। জনগণের মৌলিক চাহিদা ডঃ সরকার মিটাতে পারছে না। অধিক সন্তান হলে তাদের পালা পোশা, দেখা-শোনা, শিক্ষা-দিক্ষা দিয়ে মানুষ করা এখন আর কোন পিতার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের আয় সমিতি, খরচে যদি বেড়ে যায় তখনই সংসারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আয় বুঝে ব্যায় করতে হয় সময় মত পথ ধরতে হয় আলম আরো যুক্তি দিয়েছিল যে আগে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। খাদ্যের কোন অভাব ছিল না।

গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গাছ ভরা ফল, মাঠ ভরা ছিল সোনালী ফসল। অভাব কি জিনিস ব্যাখ্যা করেও বুঝানো যেত না। কড়াই ভরা দুধ দিয়ে জ্বাল দেয়ার পর তা যখন গাড় হত তখন মানুষ দুধ পান করত। অনেক সময় তারা দুধ ফেলে দিয়ে শুধু সর খেত। ভাল ভাল বড় বড় মাছ খেত। আর ছোট খাট মাছ বাজারে বিক্রিও হতো না। জিনিস পত্রের দাম খুবই কম ছিল। দুটাকার বাজার আনলে ৭ থেকে ৮জন মানুষ ৬/৭ দিন আনায়েসে চলতে পারত। রোগ বালাই তেমন ছিল না। বর্তমানে রোগের সীমা নেই রোগের অভাব নেই হাসপাতালে জায়গা নেই। সমস্যা!সমস্যা!সমস্যা! দুনিয়ার এ বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই আমেরিকা বৃটিশ, বৃটেন অর্থাৎ উন্নত দেশগুলো অনেক চিন্তা-গবেষণা করে সমস্যা চিহ্নিত করেছে। এসব সমস্যার একমাত্র কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই তারা জন্মরোধের অনেক পদ্ধতি

আবিস্কার করেছে এবং আমাদেরকেও সে সব পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছে।” আলম সাহেবের কথা ও যুক্তি শেষ হল।”

মাহমুদা বলল স্বামীগো! আপনার সাথে কথা কাটাকাটি করা আমার জন্য বেয়াদবি। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে যুক্তি-তর্কের দিক দিয়ে আমার অপেক্ষা আপনার জ্ঞান অনেক গুণ বেশী। তবে আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু বলতে চাই যে যখন মানুষের অভাব ছিল না লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম,দই, দুধ, মাছ, গোশত, ডিম, ডাল, তৈল, শাক-শব্জি, ঘি, মধু গলা পর্যন্ত খেত তখনকার মানুষ ছিল বোকা। এত খাওয়ার পরও তারা যমিনের মধ্যে রেলগাড়ী, প্রাইভেট কার, বাস, ট্রাক, টেমপো, রিক্সা, সাইকেল তৈরি করতে পারেনি। দূরে যেতে হলে টাংগায় , ঘোড়ায় বা মহিষের গাড়িতে যেত। ১০ মিনিটের রাস্তা এক দিনে যেতে হত। শত শত টন মাল এক জায়গা থেকে অন্য অন্যজায়গায় নিতে হলে ঠেলা গাড়ী উট বা গাঁধার পিঠে বহন করতে হত, একদিনের কাজ করতে সময় লাগত এক মাস। তারা এত খাওয়ার পরও যমিনে স্থাপন করতে পারেনি মিল-ফ্যাক্টরি ও কল-কারখানা। আগের মানুষ মহিষের মত উদর পূর্ণ খেয়েও নদীতে বা সমুদ্রে স্টীমার নামাতে পারেনি। তারা নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা চালাত বা গুন টেনে নিয়ে যেত। এতে প্রচুর সময় ও লোকজনের দরকার হত।

বর্তমানে লোকসংখ্যা অনেক বেশি না খেয়ে থাকার পরও বিশাল বিশাল গাড়ী, বড় বড় নৌযান তৈরি করেছে। হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ টন মাল নিয়ে নদীর উপর দিয়ে জাহায ভেসে চলছে। অল্প সময়ে অল্প লোকে এসব কাজ করছে।

তখনকার লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম আর খাদ্য দ্রব্যের ছিল না কোন সমস্যা পুষ্টিকর খাবার খেয়ে এককে জন হত বুনো মহিষ। কিন্তু আকাশে উড়ার মত কোন স্বপ্ন তারা দেখত না। বর্তমানের মানুষ এত দুর্বল থাকার পরও ক্ষুধার্ত থাকার পরও বিমান চড়ে হাজার হাজার মাইলের পথ মাত্র একঘণ্টায় অতিক্রম করে। চন্দ্র লোকে যাতায়াত করে এমন কি ধরার ধুলায় মানুষ আজ মঙ্গল গ্রহের খবর রাখে। এত দুধ, মাছ আর পুষ্টিকর খানা খেয়েও তার তা পারেনি।

আগেকার মানুষ এত দুধ কলা খেয়েও কোথায় কি হচ্ছে সে খবর ঘরে বসে নিতে পারেনি। বর্তমানে ভুখা নাঙ্গা মানুষ পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা শুধু ঘরে বসে খবরই নিচ্ছে না দু চোখেও তা দেখছে।

আগেকার বিশালাকৃতির মানুষেরা এত খাওয়ার পরও প্রতি একর জমি থেকে ৯০ থেকে ১২০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারেনি। আর বর্তমানে মানুষ অল্প জমি থেকে প্রচুর ফসল উৎপাদন করছে। একমন ওজনের মিষ্টি কুমড়া, ৭ কেজি ওজনের বেগুন, ২ কেজি ওজনের আলু, ২৫০ গ্রাম ওজনের টমেটু, ৬ কেজি ওজনের পেপে, দেড় কেজি ওজনের পেয়ারা খাওয়াতো দূরের কথা তা কোনদিন দু নয়নে অবলোকনও ভাগ্যে জুটেনি।

আগেকার মানুষ ঠাকুরের মত এত দুধ কলা খাওয়ার পরও তীর,ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, খঞ্জর-বর্ষা, খুব কম রেঞ্জের বন্দুক, কামান চালাত। দুর পাল্লার কোন মারানাস্ত্র তৈরি করতে পারেনি। তখনকার যুদ্ধগুলো এসব অস্ত্র দ্বারাই হত। বর্তমানে লোক সংখ্যা আধিক্যের কারণে খাদ্যভাবেও যদিও পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে তবু তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি করেছে পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, স্টেনগান, এস.এল.আর, এস.এম.জি, এল.এম.জি, এস.এম.জি কামান, মর্টার, মিসাইল, স্কাট ক্ষেপনাস্ত্র, পেট্রিয়ট ক্ষেপনাস্ত্র, গ্রেনেড, ডিনামাইড, ক্লাসিনকভ, মার্টারতুপ, রকেট, লাঞ্জার, জংগী বিমান, বি ফিফটি বোমারু, গান শিপ, হেলিকাপ্টার, রণতরী ইত্যাদি।

আগে লোক সংখ্যা কম ছিল ওরা কোন দিন দু থেকে ত্রিতল বিশিষ্ট দালান দেখেনি। বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরও মাটির নিচেও কয়েক তলা আর মটির উপরে নির্মান করে বহুতল ভবন। লিফটের সাহায্যে উঠা-নামা করে।

মাহমুদা এসব যুক্তি এনে আলম সাহেবকে বলল প্রিয়তম "আপনার! যুক্তিগুলো আধুনিক যমানার তুলাদন্ডে একবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন।

শুনুন! আল্লাহ মানুষ তৈরি করেছেন তার রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বও তিনি নিজ হাতে রেখেছেন। আল্লাহ মানুষকে চলার জন্য দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্ত া-চেতনা ও বিবেচনা। মানুষ যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই মাথা খাটিয়ে তার সমাধান খুঁজে বের করে। মানুষ যখন এক বিঘা জমি থেকে ৩ মণ ধান পেত, তখন যদি তাকে বলা তোমার এই তিন মণ ফসলের জমিতে

৬০মণ ধান ফলানো সম্ভব। তাহলে কৃষক তাকে পাগল বলে গালি দিত। আল্লাহ বান্দাকে নিত্য নতুন বুদ্ধি দান করে থাকেন গবেষণা করলে অনেক শংকটের সমাধান পাওয়া যায়। কাজেই এসব তর্ক-বিতর্ক করে মন খারাপ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমার আশা আমি দু-একটি সন্তানের মা হব আমি সন্তান নেবই। সন্তানের মুখের দিকে তাকালে সব দুঃখ দুর হয়ে যায়। সন্তানকে বুকে নিয়ে সোহাগ করলে সকল জ্বালার অবসান ঘটে।

যেদিন মাহমুদা আলম এর সাথে একান্তে এ কথাগুলো বলাবলি করছিল সেদিন থেকেই আলমের মাঝে তার প্রতি একটু একটু বিরক্ত ভাব ও অনাগ্রহ দেখা দিতে লাগল। যদিও চরম পর্যায়ের কোন ঝগড়া হয়নি। তবুও মাহমুদার ভাল কথায়ও রেগে যান আলম সাহেব। প্রথমে কথা ছিল মাহমুদা এখানে ২-১ মাস থাকবে পরে তাকে আলমের কাছে নিয়ে যাবে। এখন কাছে নেওয়াতো দুরের কথা চিঠি দিলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ২-৩ মাস পর একবারও যদি আসেন আবার রাগারাগি করে চলে যান। এভাবে কেটে গেল দাম্পত্য জীবনের যৌবন জোয়ারের তিনটি বছর। এর মধ্যে মাহমুদা হয়েছে অন্তঃসত্বা। দিন দিন তার স্বাস্থের অবস্থা অবনতি হতে লাগল।

এখন মাহমুদা অফিসে গেলে অন্যান্য মহিলারা তার পেটের দিকে ইশারা দিয়ে হাসাহাসি করে। ঠাট্টা-মশকারা করে মাহমুদা এগুলো নীরবে হজম করে যেন ওদের কথা শুনে না শুনার ভান ধরে বুঝে না বুঝার ভান ধরে। অনেক দুষ্ট মেয়েরা বলে, "এত খেয়ে এসেছেন আপা! পেট যে এত ভারী?" অফিসাররাও আগের মত তাকে সু নজরে দেখে না। তারা অফিসের ঝাড়ুদার মেথরের সাথেও এমন ব্যবহার করে না যা মাহমুদার সাথে করে।

কোন এক সময় একজন অফিসার শয়তানের মত দাঁত বের করে, চোখ দুটো কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে মাহমুদা! এন. জি. ওতে চাকরি করার সাধ এখনো আছে? মাহমুদা উত্তর দিল, জী স্যার! তা হলে তোমার পেট এত ভারী হল কেন? জান না, এন. জি. ও. সদস্যারা কোন সন্তান গ্রহণ করে না! দেখ না অন্য মেয়েদেরকে? সন্তান নেয়া এক প্রকার অভিশাপ। প্রশিক্ষণের সময় কি তোমাদেরকে এসব ব্যাপারে বুঝানো হয় নি? জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, তার কি প্যাকটিকাল করানো হয় নি? আমাদের পরিবার কল্যাণ ক্লিনিকে

মাসে একবার চেকআপ করানোর কথা, সেখানে কি যাও নি? এ ধরনের অঘটন কারো হয়ে গেলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং সন্তান বিনষ্ট করার কথা কি বলা হয় নি? রত্না, রাহেলা, ময়ুরী বেগমের স্বামী নেই। ওদের তো অসতর্ক থাকার কারণে এমনটি হয়েছিল। তারপর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের নিকট গিয়ে ঝামেলা মুক্ত হয়। তোমার কি এমনটি করা উচিত ছিল না? এ ধরনের কত ভৎর্সনা প্রায় দিনই শুনতে হয় মাহমুদার। অতিষ্ঠ হয়ে মাহমুদা ২-১ দিন পর পর ছুটি কাটায়।

দিন দিন মাহমুদার স্বাস্থ্য অবনতির দিকে যাচ্ছে। সে স্বামীর আদর-সোহাগ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। মাতা-পিতা, ভাই বোনদের সুদৃষ্টি থেকে আড়ালে। সুখ-দুঃখের কথা বলার কোন লোকও তার কাছে নেই। আশ্রয়ের জায়গা নেই। এমনই এক মর্মজালার মধ্য দিয়ে মাহমুদার দিন রাত অতিবাহিত হচ্ছে। মাহমুদা জীবনের ভুলগুলো সামনে এনে মনে মনে ভাবছে। যৌবনের উম্মদনায় কোন কাজ করতে নেই।

সংযমী হওয়া দরকার ছিল। শুধু কারো চেহারা-সুরতের পাগল হওয়া মোটেই উচিত হয় নি। সে শুধু আমাকেই ভালবেসেছে তা নয়। আর কত শত মেয়েকে মিথ্যা আশ্বাসবাণী শুনিয়ে তাদের যৌবন চুষে নিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? জেনে শুনে কেন এমন নির্দয় নিষ্ঠুর প্রেমিকের জন্য বিলিয়ে দিয়েছি যৌবন জীবন। কবিগণ যর্থাথই বলেছেন-

* মাশুক হাজার দুস্তেরা দিল না দেহি
অর মেহিদি আদিল বুঝদাই বনেহি

অর্থাৎ যার শত সহস্র বন্ধু আছে তাকে তোমার মন দিও না ভালো বেসো না। কেননা ওকে যদি ভালবাসো তবে একদিন তোমাকে ছেড়ে অন্য দোস্তের সাথে চলে যাবে।

দিল মাদাহ বা দিল বরানে বে অফা
যাকে দারান্দ সায়ওয়াহ জুর অযফা॥

অর্থাৎ নিষ্ঠুর বন্ধুকে কখনও ভাল বাসবে না এই জন্য যে সে জালেম জুলুম করার বা কষ্ট দেয়ার অভ্যাস তার চরিত্রে বিদ্যমান।

* তেরে ছাওয়া মেরে হাবীব নেহি হে
মেরে ছাওয়া তেরে মাহমুব বহুত হে॥

অর্থৎ তোমাকে ছাড়াতো আমার অন্য কোন বন্ধু নেই। তাই একমাত্র তোমাকেই ভালবাসি। আর আমাকে ছাড়া তোমার তো আরো বন্ধু আছে যার কারণে তেমন ভালোবাসো না।

* দরই দুনিয়া কেছি ইয়ারে নাদীনাম,
আগার দীদম অফাদারী নাদীনাম॥

অর্থাৎ এ নশ্বর ধরাধমে কোন বন্ধু পাইনি। যদিও পাই তবে হৃদয়বান নয়।এসব কবিতা আবৃত করে বিলাপ করতে করতে মাহমুদার দিন রাত কাটছে।

সাইত্রিশ

সুফিয়া তার মামা মাওলানা আকরাম সাহেবের নিকট হিদায়া, জালালাইন ও মিশকাত শরীফ পর্যন্ত খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু সিহা সিত্তাহর কিতাবাদি পড়ার খুব আগ্রহ থাকা সত্বেও তার আর সুযোগ হল না। এখানেই তার লেখা-পড়ার ইতি।

সুফিয়া গৃহকর্ত্রীর কাজে সহায়তা করে। ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-তিলাওয়াত, কিতাবাদি দেখা ও রোনাজারির মধ্য দিয়েই দিনগুলো অতিবাহিত করছে। একদিন শুয়ে শুয়ে রাতের নিরালায় ভাবছে, "আজতো মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মখিন। প্রতিনিয়ত নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে সামরিক জান্তার হাতে। পর্দানশীন মা- বোনদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এন. জি. ওরা নিয়ে যাচ্ছে অর্থের লোভ দেখিয়ে। এসব মা- বোনদেরকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনা, তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানো তো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এদের পিছনে অবশ্যই মেহনত করতে হবে। সুফিয়া এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

পর দিন ফজরের পর সুফিয়া পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী সাহেবকে চা দিতে দিতে বলল, "চাচা জান! আপনার সাথে আমি কথা বলব। আপনার হুকুম পেলে তা বলতে পারি।" এ সময় বেগম সর্দারও পার্শ্বের চেয়ারে বসা ছিলেন। সর্দারজী বললেন। "কি বলতে চাও মা বল?"

সুফিয়া বর্তমানে আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে বলল, "আফগানের মা- বোনদেরকে এন. জি.ওদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে বাচানোর জন্য আপনি যদি একটু উদ্যোগ নেন তা হলে আল্লাহ আমাদের কামিয়াবী দান করবেন।"

সর্দারজী মাথা তুলে সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কিভাবে সম্ভব হবে মা?" সুফিয়া বলল, "আপনি আশপাশের গ্রাম ও মহল্ল-ার পুরুষদেরকে বলে দিবেন, আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন বিকাল ২টা মাফলার, টুপী, মোজা বুনন এবং পাঞ্জাবি-পায়জামা, সেলোয়ার-কামিজ, শার্ট- পেন্ট, ব্লাউজ ইত্যাদি তৈরি করা শিখানো হবে। সকল মহিলাদেরকে যেন পাঠিয়ে দেয়। আমি ওদেরকে তালিমের মাঝে মাঝে হস্ত শিল্প শিক্ষা দেব। এন. জি.ওদের উদ্দেশ্য এবং সমস্ত ষড়যন্ত্রের মুখোশ উম্মোচন করে দেব। এতে একদিকে, মহিলারা দ্বীনি ইলম শিখতে আসবে, অন্য দিকে ইবাদত-বন্দেগী ও স্বামীর খেদমত করার তালিম পাবে। আর অর্থ সঞ্চয় করারও একটি পন্থা তারা পেয়ে যাবে পর্দার ভিতরে থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। অন্য দিকে তাদের অন্তরে আস্তে আস্তে এন. জি. ওদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।" সে আরো বলল, "আমার কাছে প্রায় ১২ হাজার টাকা আছে। প্রয়োজনে কয়টি ছাগল বিক্রি করে ৩ টি সেলাই মেশিন, সূই-সুতা, কুশীকাটা ২-৩ টি কেঁচি আর কিছু কমদামী কাপড় এনে দিলে এদেরকে সেলাই কাজ শিক্ষা দেব। এতে আশা করি মা- বোনদেরকে গুনাহর কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সুফিয়ার কথা শুনে বুড়ো-বুড়ী আনন্দে নেচে উঠলেন এবং বললেন, "মা- তোমাকে আল্লাহ দীর্ঘ হায়াত দান করুন। উম্মতে মুসলিমার দরদ আর ফিকির তোমার ভিতর পয়দা হয়েছে। তাই তোমাকে জানাই শত সহস্র মোবারকবাদ। তবে তোমার বকরী বিক্রয়ের প্রয়োজন নেই। তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি আজকেই যোহরের নামাযের পরে মসজিদেই একথা ঘোষণা করে দেব। বাকী এলাকায় ২-১ দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব।

সর্দার জী যোহরের নামাযের পর সকল মুসলিকে লক্ষ্য করে বললেন,

হে আমার এলাকাবাসী দ্বীনদার, পরহেজগার মুসলি ভাইয়েরা, আমরা আফগানী, তদুপরি পাঠান। আমাদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

আফগান জাতির ইতিহাসে দাসত্বের কালিমা নেই আমরা চির স্বাধীন। দাসত্বের শৃখল এ জাতি পরতে শিখে নি। আমাদের সম্মুখে আজ হাজির হয়েছে ঈমানের পরীক্ষা। ডঃ নজিবুল্লাহ সরকার রাশিয়ার হায়েনাদের ডেকে এনেছে আমাদের শায়েস্তা করার জন্য। এদেশে যারা সেবার ধ্বজা উড়িয়ে, সেবার আড়ালে এন. জি. ও নাম নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছিল তারাও আজ গোপনীয় ভাবে কমিউনিষ্টদের সাথে যোগ দিয়েছে। এদেশের পথ-ঘাট, অফিস-আদালত, মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোর অবস্থানের কথা এন. জি.ও রাই ওদেরকে জানিয়েছে। ওরা প্রায় অর্ধ যুগ ধরে এদেশে গোয়েন্দার কাজ করছে। মা- বোনদের চাকরি দেয়ার নামে ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। দাম্পত্য জীবনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। ঈমান হরণ করেছে। ঘরে ঘরে সুদের ব্যবসা চালু করেছে। এদেশের মেহনতি মানুষের শ্রম অল্প পয়সায় খরিদ করে নিচ্ছে। তাদের অফিস গুলোতে নিয়মিত গান-বাজনা মদ্য পান ও সিনেমার র্চচা হচ্ছে। কাজেই এরা আমাদের দেশের ও দ্বীনের দুশমন। এদের থেকে আর কেউ ঋণ গ্রহণ করবেন না। মেয়েদেরকে তাদের সদস্যা হতে বারণ করবেন। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের ঋণের বদলে যে সুদ তারা এতদিন নিয়েছে, তা আসলের চেয়েও বেশি। অতএব, তাদের পাওনা শোধ।"

তিনি আরো বললেন, "ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা সকল নারী-পুরুষের ওপর ফরয। এ ফরয আদায়ের লক্ষ্যে প্রতি দিন বিকাল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সূরা-কিরায়াত, মাসলা-মাসায়েলের তালিম হবে এবং এক ঘন্টা কুটির শিল্পের নানা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোন মহিলাই বেকার থাকবে না, পর্দায় থেকেই তারা রুজী- রোজগার করতে পারবে। এন. জি. ওদের নিকট যেতে হবে না। সুই-সুতা ও সেলাই মেশিনের কাজ শিক্ষা দেয়া হবে। এতে কোন ফি বা বেতন লাগবে না। আলেমা সুফিয়া নিজেই তালিম দিবে। এ ব্যাপারে আপনাদের যদি কোন পরামর্শ থাকে তবে বলতে পারেন।"

উপস্থিত জনতার মধ্যে যুব সমাজের নেতা বীর বাহাদুর শাব্বির দাঁড়িয়ে বললেন, "মাননীয় সর্দারজী! আপনার দীর্ঘ আলোচনা শুনে সত্যি আমাদের ঘুমন্ত হৃদয়ে সাড়া জেগেছে। দিক-নির্দেশনামুলক বয়ান হয়েছে। এ মহৎ কাজে আমরাও যুবকদের পক্ষ থেকে দু- তিনটি সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করে দেব।"

অপর দিক থেকে বয়স্ক এক ব্যক্তি বললেন, "এ মহৎ কাজে আমরাও কিছুসহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্ট করব।"

অন্যান্য মুসল্লিরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "জনাব! আমরাও আমাদের মেয়ে লোকদের পাঠিয়ে দেব। তবে কোন দিন থেকে ওরা যাবে, দয়া করে তারিখটি জানিয়ে দিলে ভাল হয়।" সর্দারজী বললেন, "আগামী বুধবার, অর্থাঃ দুদিন পর, সকলকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি কালকেই সরঞ্জামাদির জন্য শহরে যাব।" অতঃপর মুসল্লিরা খুশি হয়ে নতুন বার্তা নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

উক্ত সুসংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল মেয়ে মহলে। মেয়েরা নতুন উদ্দীপনায়, নতুন চেতনায়, নতুন যাত্রাপথের ও নব দিড়ন্তের সন্ধান পেল। এলাকার ছোট বড় সকল মহিলাই সুফিয়াকে জানে, চিনে। তার বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা-চেতনা, খোদাভীরুতা, পর্দা-পুশিদা, মিষ্টভাষিতা, বাকপটুতার জন্য সবাই তাকে স্নেহ-শ্রদ্ধা করেন। অনেকেই সুফিয়ার সাথে দেখা করতে, আলাপ করতে আগ্রহী। সুফিয়ার কাছে আসলে সহজে উঠতে চায় না কেউ। সুফিয়া মোহিনী শক্তির অধিকারিণী।

ঘরে ঘরে আনন্দের কলরোল। ছোট-বড় সবাই যাবে দ্বীনী জ্ঞান আহরণ করতে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে দু একজন নষ্ট মহিলা, যারা এন. জি. ও দের বাদীতে পরিণত হয়েছে, আর ওদের কাছে অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করেছে, এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

সর্দারজী পর দিন শহরে গিয়ে ৩ টি সেলাই মেশিন ৫০ গজ থান কাপড়, কেঁচি, সুতা কুশিকাঁটা, উলের সূতা এগুলো খরিদ করে দুটি গাধার পিঠে তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন। সুফিয়া সর্দারজীর কর্মতৎপরতায় প্রশংসা ও আল্লাহর শোকর আদায় করল। উক্ত মেশিনগুলোতে নিজ নিজ হস্তে তৈল মেখে সর্দারজীর বড় গৃহে সারি সারিভাবে বসাল। পল্লীর বউ-ঝিরা এসে দলে দলে দেখতে লাগল। সকলেই আনন্দে আত্মাহারা।

দিন-রাত অতিবাহিত হয়ে এলো বুধবার। নবী (সাঃ) বলেছেন, "নতুন কোন কাজ বুধবারে আরম্ভ করলে খায়ের ও বরকত হয়। তাই বুধবারের অপেক্ষায় ছিলেন মা-বোনেরা। বিকাল দুটা বাজার একটু আগেই শিক্ষানবিশরা এসে হজির হলেন। একটু দূর থেকে যারা আসছেন এদের একটু বিলম্ব হয়েছে।

সুফিয়া সুন্দরভাবে অযু করে ঘরে প্রবেশ করে ইসৎ হেসে সকলকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিল। সমস্বরে সকলে বলে উঠল ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। অতঃপর সকলের কুশল জেনে নিল তারপর ফেকার কিতাবাদি হাতে নিয়ে অজু- গোসল ও পাক-নাপাকের বিষয়ে আলোচনা করল। একটি মাসয়ালা বেশ কয়েকবার শুনিয়ে আবার মাঝে মধ্যে দু-একজনকে প্রশ্ন করে ভালভাবে মুখস্থ করাতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ সূরা-কিরায়াত মশক করাল অতঃপর মাফলার বুনন শিক্ষা দিতে লাগল। একটি বিষয় বার বার দেখিয়ে বেশ কয়েক জনের হাতে তুলে দিল কুশিকাটা ও উলের সূতা। ওরা বার বার চেষ্টা করতে লাগল। ওদের চেষ্টা শেষ হলে আবার অন্যদেরকে এভাবে চেষ্টা করতে সুযোগ দিল। সকলেই একান্ত আগ্রহে দেখে দেখে শিখতে লাগল। এমনভাবে দু-এক সপ্তাহ যদি নিয়মিত তালিম গ্রহণ করে তবে অনেকেই বুনন শিখতে পারবে।

তালিম ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতার সুখ-শান্তি, মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা রাখা যে ঈমানী দায়িত্ব, কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিম মহিলারা দেশরক্ষায় কতটুকু অবদান রাখতে পারে সে সম্পর্কে মাঝে মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করতে লাগল। জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারীতা, শহীদের মর্যাদা, মহিলা সাহাবীদের জিহাদী জযবা এবং তাদের গৌরবাজ্জল ইতিহাস, বীরত্বগাথা, রোমান্টিক কাহিনী খুব সুন্দরভাবে মার্জিত ভাষায় বুঝতে লাগল। মহিলারা সুফিয়ার মনোমুগ্ধকর আচরণ, মধুর ব্যবহার, পাঠ দানের কৌশল ও শিল্পকলায় নৈপুণ্যতা দেখে, শিক্ষার্থীগণের অনেকেই বলতে লাগল যে আপা তিনঘণ্টা সময় না হয়ে আরো বেশি সময় দরকার ছিল।

দু-তিন দিন যেতে না যেতেই যুবকরা চাঁদা কালেকশন করে আরো দুটি শেলাই মেশিন ও আনুসাঙ্গিক মালপত্র এনে পল্লী সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "জনাব আপনার উপর আল্লাহর রহম করুন। আপনার এ উদ্যেগ মোবারক হোক। আমরা আরো সহায়াতা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।"

দুই মাস অতিবাহিত হতে না হতেই ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এন.জি.ওদের গাত্রাদাহ আরম্ভ হয়ে গেল। নিম্ন পর্যায়ের এন.জি.ও সদস্যরাও সুফিয়ার বিদ্যালয়ে আসতে লাগল। ওরা কল্পনাতীত ফায়দা অনুভব করতে লাগল।

এবার সুফিয়া বুদ্ধিমতী সুস্বাস্থের অধিকারীনী মেয়েদেরকে নির্বাচন করে সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সুফিয়া যতটুকু অস্ত্র চালনা জানে ততটুকু শিক্ষা দিচ্ছে। ফলে আট দশজন মহিলা রণকোশলী ও যোদ্ধা হিসেবে গড়ে উঠল। কিছু দিনের মধ্যেই গণীমতের যে কয়টি অস্ত্র ছিল সবই প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করতে লাগল।

আসলে সুফিয়ার মনের গভীরে যে জিনিসটি লুকিয়ে ছিল তা হল এন.জি.ও দের কবল থেকে আফগানি মা ও বোনদেরকে উদ্ধার করা ও তাদেরকে জাহান্নামের দ্বার প্রান্ত থেকে তুলে আনা এবং এন.জি.ওদের তাড়িয়ে দেয়া। এন.জি. ওরাই রোশীদের পক্ষে ওকালতি করে এবং গোয়েন্দা সেজে ওদের কাছে খবরা খবর পৌছে দেয়। এদের বিরোদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত মহিলা বাহিনী গঠন করা। এ আশা বাস্ত াবায়নের জন্যই ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে সুফিয়া।

আটত্রিশ

মাওলানা রফিক পাকতিয়া প্রদেশে পৌছে, মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী সাহেবের সন্ধান করতে লাগলেন। জনে জনে জিজ্ঞাসা করেও হাক্কানী সাহেবের সন্ধান করতে পারছেন না। হাক্কানী সাহেবের সুসজ্জিত মুজাহিদ বাহিনী খুবই সন্তর্পনে চলাফেরা করে। দেখলে চেনা যায় না। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রয়েছে তাদের ব্যংকার, মাটি গর্ভে রয়েছে মরিচা। তাদের খোঁজে খুঁজে বের করা দুস্কর। এলাকার নারী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই মুজাহিদদেরকে আশ্রয় দেয়, খানা খাওয়ায় ও তাদের

হেফাজতের চিন্তা করে। মদীনার আনসারদের মত তাদের কুরবানী। মুজাহিদদেরকে না খাওয়ায়ে তারা আহার করে না। ছোট ছোট বাচ্চাদের অন্তরেও রয়েছে তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

চারিদিকে ছোট বড় অগনিত পাহাড় সগর্বে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কালের সাক্ষী হিসেবে যুগ যুগ ধরে পাহাড় থেকে খানিকটা দূরে গড়ে উঠেছে জনবসতি। রফিক প্রায় তিন দিন এ অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করছেন। সূর্য ডুবে গেলে কোন মসজিদের বারান্দায় নিশি যাপন করেন।

অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা কঠিন বিষয়। যে কোন মুহুর্তে যে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। রাসূল (সাঃ) সহ কোন সাহাবী অস্ত্র ছাড়া থাকতেন না। অস্ত্র রেখে দূরে কোথাও যেতেন না। সব সময় অস্ত্র সহ্ থাকা তাওয়াক্কুল, একিন ও তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। ইসলামের দুশমনরা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ওরা যেন মুসলমানদের দিকে রাঙ্গা চোখে তাকানোর সাহস না পায়। ওরা যেন মুসলমানদেরকে গাফেল মনে না করে। এজন্যই আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা ঃ) সব সময় সশস্ত্র অবস্থায় থাকতেন। শ্রুতি কটু হলেও সত্য, আজ কতিপয় লেবাসধারীরা নিজেকে আলেম পরিচয় দিয়ে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। সরলমনা মানুষ তাদেরকে আলেম হিসেবে মনে করে আসলে ওরা ইহুদী নাসারাদের এজেন্ট ঐসব ভন্ড। ইহুদি নাসারা ও পৌত্তলিকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে অস্ত্র রাখা সন্ত্রাসী কাজ। কোন ভালো লোক নিজের কাছে অস্ত্র রাখতে পারে না। এরা যে শুধু জিহাদের বিরোধিতা করে তা নয়। এরা দাওয়াতে তাবলীগ ও মাদ্রাসার তালিমেরও বিরোধিতা করে। এরা যে ইহুদি নাসারা ও পৌত্তলিকদের এজেন্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কুচক্র মহলের মধ্যে কেউ কেউ নামের আগে নিজেরাই আলহাজ্ব, মুফতী, মাওলানা ইত্যাদি খেতাব লাগিয়েছে। আবার কেউ কেউ পীর সেজে মাজার খানকা বেছে নিয়েছে। তারা দাওয়াত আর হাদিয়া পেয়ে দশ মাসের অন্তঃসত্তা মহিলাকেও হার মানিয়েছে। এদের অনেককে দেখা যায় ওয়াজ মাহফিলের বক্তা আর খতমের কন্টাকটারী করত। সমাজের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব তারাই বেছে নিয়েছে। ওরাই লাশ গাড়ীতে উঠানো নামানো, লাশ গোসল, লাশ দাফন, কবর যিয়ারত, যাবতীয় খতম, কুলখানি, ফাতিহা, টিউশনী,

দোকানে দোকানে কুরআন তিলাওয়াত করে পয়সা নেয়া বাসে-ট্রেনে, মোড়ে-মোড়ে, খেয়ারঘাটে সুর দিয়ে ওয়াজ করে পয়সা উঠানো এ সমস্ত বাসে কাজগুলো এরাই করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। এ সব পেট পুজারী আলেম নামধারী লোকেরাই জিহাদের বিরোধিতা করে থাকে।

আমাদের আকা বেরদের মধ্যে যেমন
হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)
হযরত আবদুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)
হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ)
হযরত হাফেজ জামেন শহীদ (রহঃ)
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী (রহঃ)
হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)
হযরত কাশেম নানুতুবী (রহঃ)
হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)
হযরত ফজলে হক খায়রাবাদী (রহঃ)
হযরত তীতুমীর, দুদুমিয়া, মজনুশাহ (রহঃ)
এবং আরো অনেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ এক একজন ছিলেন হিদায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। এরা সকলেই পীর ছিলেন। ছিলেন দ্বীনের রাহবার। এ মহামনিষী শুধু শুধু খানকার পীর আর শাইখুল হাদীসই ছিলেন না সাম্রাজ্যবাদী জালেম ইংরেজদেরকে তাড়ানোর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ সকল তাপস প্রবল ও সাধকগণ শুধু জিকরুল্লাহর মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না, তাদের মধ্যে ফিকরুল্লাহও ছিল ।

বর্তমান যামানার সাধক বা পীর নামধারী কতিপয় ব্যক্তিরা হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করেই লোকদেরকে সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছিয়ে দেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকট কাফেরদের খণ্ডিত মস্তক হাদিয়া পাঠালে তিনি খুশি হতেন। যেমন আবু জেহেল ও কাব বিন আশরাফের

মাথা কেটে নবীর নিকট পাঠিয়েছিলেন)। আর বর্তমান পীর মুর্শিদের কাছে ডাব,বেল,তাল,জাম্বুরা পাঠালে খুশি হয়।

এতই খুশি হন যে তাকে খেলাফত দিয়ে দেন। তখনকার পীর সাহেবরা শাগরিদ-মুরিদ নিয়ে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়তেন। আর বর্তমান কতিপয় পীর সাহেবরা মুরিদের বাড়ি বাড়ি দাওয়াত খেয়ে ফয়েজ বিতরনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। নিজের মেয়েকে নিজের সামনে লেংটা করলে, বোনকে চোখের সামনে ধর্ষণ করলে ছবর করার নছিহত করেন।

রফিক ও আবদুল্লাহ স্কন্ধদেশে কাশ্মেরী চাদরের অন্তপূরে অস্ত্র লুকানো রয়েছে। যতই লুকিয়ে রাখুকনা কেন কিন্তু এলাকাবাসীর কারো কারো কাছে তা ধরা পরেছে। জনগণ ওদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় অস্ত্রধারী গোয়েন্দা মনে করেছে। কিন্তু রফিককে দেখে তা মনে হয় না। কারণ, নূরানী চেহারা, সুন্নতী লেবাস, পাক্কা নামাযীও। আর অপর ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে মনে হয় ভদ্রলোক এ এলাকার বাসিন্দা নয়। দেখতে উজবেক সৈন্যের মত মনে হয়। কারণ গোঁফ তার ইয়া বড় মুখে নেই দাড়ী। নেড়া মাথা। রুশী ফৌজরা নিয়মিত মাথা কামায়। এসব আলামত দেখে তাকে রুশী সৈন্য হিসেবেই ধরে নিয়েছে।

সাধারণ মুজাহিদরা বার বার মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানী সাহেবের নিকট উক্ত দুজনকে গ্রেফতার করার ইজাজত চাইলেন। মাওলানা জালাল উদ্দীন হক্কানী সাহেব তাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে কোন ভেজাল দেখলে হত্যা করতে বললেন।

এভাবে কেটে গেল প্রায় এক সপ্তাহ। মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী এক কিংবদন্তী সেনানায়ক। খাটি ঈমানদার লোক সুন্নতের পাবন্দ। জিকরুল্লাহ থেকে কখনো গাফেল থাকেন না। তিনি জিহাদী তৎপরতা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। তার অনুসারীদেরকে সুন্নতের উপর চলার তাকিদ দেন। ব্যতিক্রম হলেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। প্রতি রাত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে সেজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে সব মুজাহিদ।

মাওলানা রফিকের চলাফেরা দেখে গ্রামের একজন মুরুব্বী জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! আজ কয়দিন যাবত তোমাদেরকে এ এলাকায় ঘোরা- ফেরা করতে দেখি, তোমাদের নিবাস কোথায়? এ এলাকায় তোমাদের কাজ কি?

বৃদ্ধার কথা শুনে রফিক একটু এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "চাচাজান! আমরা হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে রামাল্লা মহল্লায় থাকি। আমি মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী সাহেবকে খুজঁছি। তাঁর সাথে দ্বীনি পরামর্শ আছে।" "বাবা! তুমি লেখা-পড়া করেছ কিছু?" "হ্যাঁ-আমি শাইখুল হাদীস আল্লামা আঃ হক ছাহেব দামাত বরকাতুহুম সাহেবের নিকট হক্কানীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেছি। বর্তমানে আমি মাওলানা জালালুদ্দিন সাহেবের সংস্পর্শে থেকে দ্বীনের কাজ করতে চাচ্ছি।

"তাঁকে কোনদিন দেখেছ কি? বর্তমানে তিনি কি করেন তা জান?"

"ইতিপূর্বে তাকে দেখার সুযোগ হয়নি বটে। তবে তার ব্যাপারে অনেকের কাছে অনেক কিছুই শুনেছি। আর বর্তমানে তিনি রুশী আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এতটুকু জানি।"

বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, "বাবা এ কয়দিন যার ইমামতিতে নামায আদায় করেছ তিনিই আমাদের প্রাণ প্রিয় মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী।" তিনি এখন কোথায় তা জানতে চাইলে বৃদ্ধ বললেন, "তা জানি না তবে নামাযের সময় পাবে।"

রফিক অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুঃখের বিষয় আসর ও মাগরিবের সময়ও প্রধান ইমাম এলেন না। দুঃখ ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মসজিদে বসেই অপেক্ষা করছেন। এশার সময় ঘনিয়ে এল। মুয়াজ্জিন এসে আযান দিলেন। এর একটু পরেই তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে প্রধান ইমাম মসজিদে এলেন। এশার নামায সমাপন করে উপস্থিত মুসুল্লিদেরকে সতর্ক করে বললেন, " আজ রাত রাশিয়ানদের ঘাটিতে বড় ধরনের আক্রমণ হবে।" তিনি আরো বললেন, "প্রিয় এলাকাবাসী দুশমন আক্রান্ত হওয়ার পর এদিকে ধাওয়া করতে পারে। তাই রাতের পাহারাদারীতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। তোমাদের কাছে যা আছে তা দিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তোমরা যেন দৃঢ়পদ থাক। তা না হয় আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে না। খোদা না করুক যদি ওরা গ্রামে ঢুকেই পরে তবে জীবনের মায়া না করে ওদের মোকাবেলা করে সবাই শহীদ হয়ে যাবে। কেউ বেঁচে থাকার এরাদা করব না। আমি এখনই মারকাযে চলে যাচ্ছি। এই বলে তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন।

মাওলানা রফিক সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে মনে করে দৌড়ে মসজিদের বাইরে এলেন এবং হাক্কানী সাহেবকে সালাম দিয়ে দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুসাফাহ ও মুয়ানাকা শেষ করে হাক্কানী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "বাবা কিছু বলবেন কি? রফিক উত্তরে বললেন, হুজুর আজ একটি সপ্তাহ অতিবাহিত করেছি আপনার সাথে সাক্ষাতের এরাদা করে। তারপর রফিক নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, হুজুর আমরা দুজন আপনার কমান্ডে জিহাদ করতে এসেছি যদি আপনার অনুগ্রহ হয়। আমরা আপনার সাথে থাকতে চাই। মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী রফিকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন বাবা তুমি যদি মুনাফেক না হও তবে তোমার মত যুবকের আমার খুবই দরকার। তোমাকে তো দেখলে রাজপুত্রের মত মনে হয়। এখানে থাকা-খাওয়া, অযু-গোসল, আরাম-আয়েশ অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাপারে খুবই কষ্ট হবে। তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারনি। আচ্ছা ঠিক আছে আপাদত তোমরা গ্রাম বাসীদের সাথে থাকবে। তারা যা করে তোমরাও তা করবে। এই বলে মোসাফাহ করে হারিয়ে গেলেন অন্ধকারে। এলাকার লোক জন লাঠি শাবল নিয়ে বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। ছোট বালক বালিকারা পর্যন্ত প্রতিরোধের জন্য তৈরি। একেক গ্রুপে লোকসংখ্যা আট থেকে দশজন।

একদল বালক দুই আড়াইশ গ্রাম ওজনের পাথর কুড়িয়ে এনে দুই হাত লম্বা রশির মাথায় মজবুত করে বাধতে লাগল। তাদের এ অভিনব কর্মকান্ড দেখে মাওলানা রফিক জিজ্ঞাসা করলেন কি হে ছোট বন্ধুরা তোমরা কি এগুলো দিয়ে খেলা করবে?" প্রশ্নের সাথে সাথে এক বালক দাঁড়িয়ে নিজ বক্ষদেশে থাপ্পর লাগিয়ে বলল, "আমরা সবাই মুজাহিদ সোভিয়েত সৈন্যরা গ্রামে ঢুকলে আমরা দেয়াল বা পাথরের আড়াল থেকে ওদেরকে লক্ষ্য করে ঐ পাথর ছুড়ে মারব। এতে চোখ যাবে,দাত যাবে, মাথা ফাটবে, বুকের পজর গুড়িয়ে যাবে তারপর ভাগবে।" এই বলে ছেলেটে রশির মাথায় পাথর বেধে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ ছেড়ে দিল এমনি গাছে গিয়ে আঘাত হানে। সাথে সাথে গাছটির ছাল উঠে যায়। ছেলেটিকে রফিক জিজ্ঞাসা করল রাইফেলের মোকাবেলায় এ দিয়ে কুলাতে পারবে তো? বালক উত্তরে বলল আমাদের প্রাণ প্রিয় মুজাহিদ নেতা বলেছেন যার

যা আছে তা দিয়ে আঘাত হানতে। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আর যদি শহীদ হই তাহলে সাথে সাথে জান্নাতে যাব।"

ছোট্ট বালকটির কথা শুনে মাওলানা রফিক আনন্দে আত্মহারা। মনে মনে ভাবলেন এ অঞ্চলের মানুষকে জিহাদ এমনভাবে বুঝানো হয়েছে যার দরুন ছোট বড় সবাই জিহাদ ফরজ ইবাদত হিসেবে মেনে নিয়েছে। রাফিক আবার প্রশ্ন করল এসব কথা কার কাছ থেকে শুনেছ? "ছেলেটি উত্তর দিল কেন এসব কথাতো প্রতিদিন মক্তবের উস্তাজী বয়ান করে থাকেন। উস্তাজী থেকে শুনে শুনে এসব এসব শিখেছি।"

মাওলানা রফিক মনে মনে আফসোস করতে করতে বললেন হায় আজ যদি প্রতিটি মসজিদে ইমাম সাহেবরা মক্তবে মক্তবে উস্তাজীরা মাদ্রারাসায় মাদরাসায় হুজুররা জিহাদি আলোচনা করতেন জিহাদের মাসলা মাসায়েল বয়ান করতেন, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, জিহাদের ফজীলত শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে বুঝাতেন তবে সরলমনা জাতি এত বিভ্রান্তিতে পরতনা। জিহাদ যে একটি ফরজ ইবাতদ তা উম্মত ভুলে গিয়ে জিহাদকে সন্ত্রাস বলতে শুরু করেছে নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

রাত আনুমানিক আড়াইটা। হাক্কানী সাহেব ১৭জন মুজাহিদ নিয়ে রুশী সেনা ছাউনিতে আক্রমণ করলেন। উক্ত ক্যাম্পে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু শতাধিক। সে হামলায় আব্বাস নামক এক পাকিস্তানী মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আর আহত হয় তিনজন। দুশমনদের মধ্যে ১৩জন নিহত আর ২২জন গুরুতর আহত। ধরা পরে ১৮জন। বাকিরা সব জান নিয়ে পালিয়ে যায়। উক্ত হামলায় গণিমতের অস্ত্র হাতে আসে সব মিলিয়ে ২৩টি। ধৃত সৈন্যদেরকে আত্ম সমর্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল আমরা দেখেছি বিরাট দেহ বিশিষ্ট মুজাজিহদরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছে। তাই আমরা ভয়ে ওদের কাছে আত্মসমর্পন করেছি।

উনচল্লিশ

আতিকা তার ভাই সরোয়ারের পরামর্শ আগ্রাহ্য করে বলে বলল, আমার ভবিষ্যত নিয়ে আমিই ভাবব। আমাকে বাধা দিবেন না। কেননা এখন আমি ছোট খুকী নই।" মুখে মুখে এ ধরনের আচরন শুনে খুবই আশ্চর্য হলেন সরোয়ার সাহেব। বোনের মুখ থেকে এ ধরনের আচরনের কথা কোনদিন কল্পনাও করেননি সরোয়ার।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলে তো মরিয়ম তোমার ননদীর কথা? বল এই মুহুর্তে এই পাপিষ্ঠাকে কি করতে পারি?" গতর খাটা খাটুনি প্রায় অর্থ খরচ করেছি বোনের পিছনে। যার অসুখ-বিসুখে তোমার গলার হারটি বিক্রি করে চিকিৎসা করেছি। আমার শরীরের তিন পাউন্ড রক্ত যার শরীরে দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। সে বোনটি আজ এন.জি.ওদের চাকরি নিয়ে নিজের জীবন নিজে গড়তে চাচ্ছে। এই কি শিক্ষার মর্যাদা? এই কি সভ্যতা? একজন শিক্ষিতা মেয়ের মুখে কি করে এ ধরনের কথা শোভা পায়?"

সরোয়ারের পত্নী মরিয়ম বিণীতভাবে বললেন, "আরে তেতুলের চাষ করে আনারের আশা করা তো পাগলের প্রলাপ মাত্র। বর্তমানে স্কুল, কলেজ আর ভার্সিটির ছাত্র ছাত্রিরা কয়জনে মুরুব্বিদের মানে বা তাদের পরামর্শ নিয়ে চলে? শতকরা একজনকেও তো দেখছি না। ওরা মনে করে মুরুব্বীরা মুর্খ, লেখাপড়া জানে না। ওরা কি বুঝে? অথচ যারা দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় কখনো দেখেছেন মুরুব্বীদের অমান্য করতে? তারা বিনয়ী, নম্র, ভদ্র হয়ে থাকে। ওদের দিলে থাকে পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়। তাই ওরা খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। দেখেননি আমার দু ভাইকে। সোহায়েল পরে মাদ্রাসায় তার আমল আখলাক কত ভাল। গ্রামের ছোট বড় সবাই ওকে আদর করে। আব্বু তার জন্য প্রতি মাসে খরচ করে তিনশ আফগানী মুদ্রা। আর বড় ভাই রাজু পরেন কলেজে। তার পিছনে খরচ হয় প্রতিমাসে ১২শ আফগানী মুদ্রা। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে মাসে মাসে টাকা বেশি নিয়ে যায়। এমন কোন রাত নেই সে সিনেমায় না যায়, ধুমপান করে না। সে বেহুদায় টাকা খরচ করায়

দক্ষ। নামায রোজার তো ধার ধারে না। বাড়ির সবাইকে খুব জ্বালায়। আপনার বোনকে যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন তাহলে এ ধরনের বে আদবী আচরণ কখনো তার দ্বারা সম্ভব হত না। ভুলতো প্রথমেই করেছেন, এখন বিলাপ করার অর্থ হল অরণ্যে রোদন করা।

সরোয়ারঃ ঠিকই বলেছ মরিয়ম। তোমার কথা বিলকুল সত্য। আমিও আজ থেকে পন করছি। আল্লাহ যদি আমাদের সন্তান দেন তবে মাদরাসায় পড়াব।

মরিয়মঃ আপনি এতদিনে আমার মনের কথা বলেছেন আমারও ইচ্ছা তাই। সবাইকে আলেমে দ্বীন বানাব। কোন আলেমকে আল্লাহ না খাওয়ায়ে রেখেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তাদের মান সম্মান আল্লাহই বৃদ্ধি করে দেন।

সরোয়ার নাস্তা না খেয়েই চলে গেল অফিসে। মরিয়ম নাস্তা এনে খুব জোরাজুরি করেছিলেন খাওয়ানোর জন্য কিন্তু এক লোকমাও গ্রহণ করতে পারলেন না।

আতিকা এতক্ষণে মুখ ভার করে গাল ফুলিয়ে বসে ছিল। ভাই বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ভাবীর সাথে আরম্ভ করল বাক যুদ্ধ। সে বলল ভাবী তুমিতো এতক্ষণ আমাকে খুব নীতি কথা শুনাচ্ছিলে আমার হয়ে একটি কথাওতো বললে না। আমার বিরদ্ধ কথা বলার জন্য যুক্তি আর উপমা পেশ করার জন্য কি তোমাকে আমি বাদি রেখেছি? পরের ঘরে এসে এত মাতব্বরী দেখাচ্ছ কেন? তুমি হলে আমাদের বাড়ির বাঁদী।"

একেই বলে অল্প বিদ্যায় ভয়ংকরী, জুতারে ডাকে আলমারী, বদনারে কয় রেলগাড়ী, লোটারে ডাকে ঠেলাগাড়ী তোমার অবস্থাও অনেকটা এমনই। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে এম.এ.এর ধাপ দেখাও। আর এম. এ পাশ করতে পারলেতো তোমার কাছেই ভিড়া যেতনা।"

"ভাবী তোমার ভিতর হিংসায় ভরা। তোমার স্বামী ইন্টার পাশ করে বিদ্যুৎ অফিসে চাকরি নিয়েছে। মাসে পায় মাত্র দু হাজার টাকা আর এমনও হতে পারে আমার স্বামী বেতন পাবে ৩৫ হাজার টাকা। যা তোমার স্বামী সারা জীবনে এ টাকা চোখেও দেখবে না। আর আমিও পাব প্রতি মাসে তিন

হাজার টাকা। আমার সুখ শান্তি হবে বলেই তুমি এত হিংসা করছ। মরিয়ম আতিকার কথা শুনে বলল তাহলে নিজে নিজে বিয়েও ঠিক করেছিস? না তামাসা করছিস? তোমার ভাইতো তোমার বিয়ের ফিকির করছেন। হয়ত কামিয়াব হবেন। তোমার কলেজের প্রফেসর সাহেব এখনও বিবাহ করেন নি। তোমার ব্যপারে কিছু আলাপ আলোচনা চলছে।"

আতিকাঃ আমি আগেই তো বলেছি আমার জন্য কাউকে পেরেশান হতে হবে না। আমি আমার সমস্যার সমাধান করব। আজ থেকে তুমি তোমার অন্তর থেকে তোমার ননদীনির নামটা মুছে ফেল। পোড়া মুখ হয়ত তোমাদের সামনে আর আসবে না মনে রেখ। একদিন তোমাকে ও ভাইয়াকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা হাতাব তখন তোমরা আমার কাছে ধরা না দিয়ে থাকতে পারবে না। কাজেই সময় থাকতে ভাইয়াকে বলো রাগারাগি করে লাভ নেই। তিনি যেন আমার পদক্ষেপ মেনে নেন এবং রাজি থাকেন। না হয় একদিন পস্তাতে হবে।

মরিয়মঃ আরে বোন তুমি যদি টাকা পয়সায় কোটিপতি হয়ে যাও তবুও তোমার ভাইয়া তোমার সুখ শান্তি, ধন দৌলত, টাকা পয়সার দিকে চোখ তুলে তাকানো তো দুরের কথা, থুথুও ফেলবেন না। জাননা তোমার ভাইয়্যার স্বভাব?

এই বলে মরিয়ম আরো বলল "তাহলে কি তুমি তোমার বিয়েও ঠিক করে নিয়েছ?"

আতিকাঃ হ্যাঁ ঠিক করেছি। যিনি আমার স্বামী হবেন, তিনিও মাস্টার্স পাস। বেতন পান বর্তমানে ৩৫ হাজার টাকা। তিনিও এন.জি.ও অফিসে চাকরি করেন। বড় অফিসার তিনি। দেখতে যেমন শাহাজাদা কথাও তেমন মিষ্টি। এ কথা বলতে না বলতেই মরিয়ম আতিকাকে বলল আতিকা আমি তোমার ভাবী হয়ে বলছি এ ধরনের চিন্তা তোমার অন্তর থেকে বাদ দাও। এক সময় হায় হায় করতে হবে। তখন আপিল করার জায়গাও পাবে না। এন.জি.ওরা ধান্দাবাজ ওরা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে জানে না। কিছুদিন পর টের পাবে। তোমার মত আরো ললনাকে হাতের তালুতে করে নাচাচ্ছে। সেদিন সে তোমার দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। পরে কিন্তু তোমাকে ভাঙ্গা থালা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে।

মরিয়মের কথাগুলো আতিকার অন্তরে শুলের মত বিধছিল। তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করল আতিকা। রাগারাগির এক পর্যায়ে বটি নিয়ে মরিয়মের উপর চরাও হল। ভেবেছিল এক কোপ দিয়ে দু ভাগ করে ফেলবে। মরিয়ম সরে না দাড়ালে হয়ত তাই হত। তবুও ডান হাতে সামান্য আঘাত লেগে একটু কেটে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

আতিকা মনে মনে ভাবল অবস্থা যখন কঠিন পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে তাই ভাইয়া বাড়ি ফিরলে আর রক্ষা নেই। কাজেই এর আগে এখান থেকে পালাতে হবে। মরিয়ম দুপুরের খাবারের রান্নার ব্যবস্থা করছেন। আতিকা এমন সময় সামান্য টাকা পয়সা ও তার কাপড় চোপড় নিয়ে বেরিয়ে এলো। অত:পর একটি রিক্সায় চড়ে সোজা আলমের নিকট চলে এল। মরিয়ম জানতে পারল না কোথায় গেল আতিকা।

চল্লিশ

সুফিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি যদিও চারদিকে ছড়িয়ে পরছিল কিন্তু এন.জি.ওদের এটি গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অনেক এন.জি.ও মহিলা সুফিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রী হওয়াতে এন.জি.ও দের সীমা অতিক্রম করছিল। অনেক মহিলা তাদের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেনি। এটাও রাগের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ। পল্লীসর্দার নিজেও একবার বলেছিলেন যে এন.জি.ওদের থেকে যারা ঋণ নিয়েছ তার আসল টাকা ফেরত দিবে সুদের একটি পয়সাও দিবেনা। মহিলারা এ কথার উপরই ভিত্তি করে টাকাগুলো আটকিয়ে দেয়।

এন.জি.ওরা সুফিয়ার মাদ্রাসাটিকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য এক পরিকল্পনা হাতে নিল। তা হল উক্ত মহল্লার এন.জি.ও সদস্য হল দিলারা বেগম। কুট বুদ্ধিতে খুবই পাকা। দিলারাকে হাত করার জন্য একদিন দুজন অফিসার দিলারার বাড়িতে আসেন। সেদিন দিলারার স্বামী বাড়িতে ছিল না গভীর রাত। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। মহল্লার সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ জেগে নেই।

দিলারার পার্শ্বের বাড়ির মেয়ে মায়মুনা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘুম ভাঙ্গল। সে তার জরুরত সেরে দেখে দিলারার ঘরে প্রদ্বীপ জ্বলছে। সে আস্তে আস্তে দিলারার ঘরের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে দেখে দুজন এন.জি.ও অফিসার দিলারার সাথে খুব জমে আলাপ করছে। মায়মুনা দিলারাকে অনেক বুঝিয়েও মাদ্রাসায় আনতে পারেনি। সে মাদ্রাসার কথা শুনতেই পারে না। সেদিন থেকেই মায়মুনা দিলারার ছায়া টুকু দেখতে পারে না। মায়মুনা কান দুটিকে খরগোসের মত খারা করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদেরকে দেখছে ও কথাবার্তা শুনছে।

এন.জি.ও অফিসার দিলারার হাতে একটি ওয়ারলেছ সেট দিয়ে বলল, "এটা তোমার কাছে রেখে দাও আগামীকাল তুমি সুফিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হবে। সেখানে যা হয় তা ওয়ারলেছের মাধ্যমে প্রতিদিন রাতে আমাদের জানাবে। মাদ্রাসার মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তা বলে সুফিয়ার বিশ্বাসভাজন হবে। সে যখন তোমাদেরকে উপদেশ দিবে তখন ওয়ারলেছটি অন করে তার কাছে বসবে। তাহলে আমরাও তার গোপন ষড়যন্ত্র ধরতে পারব। অতঃপর এক বান্ডিল টাকা দিলারার হাতে দিয়ে বলল "এ টাকা তোমাকে দেয়া হল। প্রয়োজন মত খরচ করবে। তুমি যদি ভালো রেজাল্ট দেখাতে পার তবে আরো ৫০,০০০.০০ টাকা পুরস্কার পাবে।" এ বলে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিলারা টাকাগুলো এবং ওয়ারলেছ বালিশের নিচে রেখে মেহমানদেরকে এগিয়ে দিতে বাইরে চলে গেল। সুচতুর মাইমুনা আস্তে আস্তে ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পরল। তা কেউ টের পায়নি। দিলারা ঘরে এসে টাকা ও ওয়ারলেছ না পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেল। ঘরের সব কিছু তালাশ করল, কিন্তু কোথাও পেল না। তারপর বাড়ির বাইরে এসে আশে পার্শ্বের বাড়িতে ঘুরে দেখল কেউ জাগ্রত আছে কি না? এভাবে অঘুম নয়নে খুব অস্থির অবস্থায় রাত পাড়ি দিল।

মায়মুনা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায আদায় করে বোরকা পরে সোজা মাদ্রাসায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে ছাত্রীরা নামায পরে কুরআন তিলাওয়াত করছে। সে সুফিয়াতে হাতের ইশারায় ডেকে এনে এক নিরব কামরায় রুদ্ধ দ্বারে বসে রাতের ঘটনা আদি-অন্ত সব খুলে বলল

এবং টাকা বান্ডিলটা এবং ওয়ারলেছটা সুফিয়ার হাতে দিয়ে বলল আপা এ টাকগুলো জিহাদের ফান্ডে খরচ করবেন।" সুফিয়া গুনে দেখল এখানে ৫০ হাজার টাকা রয়েছে। অতঃপর এগুলো খুব গোপনে রেখে দিল এবং বলল, "সাবধান, এ ঘটনা কারো কাছে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। এগুলো কি করা যায় তা পরে দেখা যাবে।"

দিলারা মায়মুনাকে সন্দেহ করতে লাগল। তার ধারনা এ কাজ মায়মুনা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। এত চালাক ও এত সাহস অন্য কারো নেই। সে হয়ত চুপি চুপি তা দেখেছিল। তা না হয় এ ধরনের কাজ হল কি করে। দিলারা পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম অফিসারদের কি জবাব দিবে তা ভেবে পাচ্ছে না। অফিসাররা একটি কথা বার বারই বলেছিল যে, আমাদের কথার ব্যতিক্রম হলে জীবনের তরে শেষ করে দিব। দিলারার মনে বার বারই এসব কথা জাগছিল। সে সকাল ১০টায় মনমরা ভাব নিয়ে আস্তে আস্তে মাদ্রাসায় গিয়ে সুফিয়ার সাথে দেখা করে বলল, বোন সুফিয়া আগে তো বুঝিনি এখন বুঝতে পারছি, এন.জি.ওরা কত খারাপ, কত অভদ্র। তাদের আসল পরিচয়টা এখন দেখতে পারছি। দয়া করে আমাকে তোমার মাদ্রাসায় ভর্তি করে এলমে দ্বীন ও হাতের কাজ শিক্ষা করায় সু ব্যবস্থা করে দাও।

সুফিয়া দিলারার কথা শুনে মুচকি হেসে বলল "আপা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন তাইনা আপা? আপনি যদি মাদ্রাসায় ভর্তি হন হতে পারেন, কিন্তু আপনার মুরুব্বীরা রাগ করবে না তো? "আমার আবার মুরুব্বী কে? বলল দিলারা।

সুফিয়াঃ আপনার স্বামী এবং এন.জি.ও কর্মকর্তারা ওরা আপনার এ পদক্ষেপ মেনে নেবে?

দিলারাঃ কথার চোটে বলে ফেলল ওরাইতো আমাকে জোরপুর্বক আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে।" এ বলে হঠাৎ জিহ্বায় কামড় দিয়ে ভাবল হায় এটাতো ঠিক করিনি। এতো গোপন রাখার কথা ছিল। আবার ভাবল না হয়ত এগুলো বুঝতে পারেনি। এসব কিছু আলাপ করে বাড়ি ফিরে এলো কিন্তু দিলারার মনে শান্তি নেই। অনেক চিন্তা করে স্থির করল যে ব্যাপারটা কিছুতেই গোপন থাকবে না।

একভাবে না একভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে। তখনতো আর কিছুই করার থাকবে না। কাজেই এর আগে নিজেই বলে ফেলি।

দিলারা বাড়ি এসে সাথে সাথে চলে গেল এন.জি.ও অফিসে। সেখানে গিয়ে বলল "সর্বনাস হয়েছে টাকা ও ওয়ারলেছ চুরি হয়ে গেছে এখন উপায় কি?

অফিসারঃ তুমি বুঝি মৌলবাদী হয়ে গেছ। টাকা মেরে মিথ্যা কথা বল। কখন কিভাবে কে চুরি করেছে তার সাক্ষী আছে?

দিলারাঃ সাক্ষী নেই। তবে মাইমুনাকে সন্দেহ হচ্ছে। ও ছাড়া এ কাজ আর কেউ করেনি।

অফিসারঃ তোমার কথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি?

দিলারাঃ স্যার তার কাছে তো আপনারা দশ হাজার টাকার কিস্তি পান তা কি আদায় করতে পারছেন? সে তো এখন সুফিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রী। কুরআন কিতাব পরে। পাক্কা মুসুল্লী সেজে অপতৎপরতায় লিপ্ত। তার ব্যাপারে এখনো কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন নি।

অফিসারঃ আচ্ছা যেভাবেই হোক তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অফিসে নিয়ে আস। তারপর দেখি কি করা যায়। অফিসারের হুকুম পেয়ে দিলারা বাড়িতে এসে মাইমুনাকে বুঝাতে লাগল যে, "আপা অফিসে তো তোমার কাছে ১০ হাজার টাকা পায়। এখনতো তা পরিশোধ করনি। তাই স্যারেরা তোমার উপর খুবই রাগ। তুমি যদি অফিসে গিয়ে তোমার সব কথা খুলে বল তাহলে হয়ত তোমার সব টাকা মাফ করে দিতে পারেন আবার হয়ত আসলটা বাদে সব সুদ মাফ করে দিতে পারেন। চল এখনই চল দেখি কোন উপায় করা যায় কি না।

মাইমুনা সুফিয়ার নিকট এন.জি.ও অফিসে যাওয়ার পরামর্শ চাইলে সুফিয়া চিন্তা করল, ওরা হয়ত আসল টাকা উদ্ধার করার জন্য সুদ মাফ করে দিবে। তাই যদি হয় তবে দশ হাজার টাকা দিয়ে ভেজাল চিরতরে নির্মূল করতে পারলে ভালই হয় । এসব চিন্তা করে মাইমুনাকে এন.জি.ও অফিসে যেতে পরামর্শ দিল।

মাইমুনা দিলারার সাথে এন.জি.ও অফিসে গিয়ে বিকাল চারটার দিকে হাজির হল। কয়েকজন অফিসার দিলারার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা

করছিল। অফিসে পা রাখার সাথে সাথে একজন অফিসার বলে উঠল কি হে দিলারা এত বিলম্ব হল কেন?

দিলারাঃ স্যার ওতো ক্লাশ করেছে তাই আসতে একটু দেরি হয়েছে তাই ক্ষমা করবেন।

অফিসারঃ (মাইমুনাকে লক্ষ্য করে বলল) মাইমুনা আমরা দারিদ্রতা ও নিরক্ষরতা দুর করার জন্যই তোমাদের পার্শ্বে এসেছি। সে উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে দেশ ব্যাপী কার্যক্রম চালাচ্ছি। তুমি তো আমাদের একজন সম্মান্নিতা সদস্যা। আমাদের কাছ থেকে কয়েক কিস্তিতে ঋণও নিয়েছ। এখন সুদে আসলে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাওনা। তুমি কিস্তি পরিশোধ করছ না। ঋণও নিচ্ছ না। আবার শুনেছি তুমি নাকি মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছ। এটা কি তোমার জন্য উচিত হয়েছে?

মাইমুনাঃ স্যার আসল টাকাই দিতে পারছি না সুদ দেব কোত্থেকে? আপনাদের ঋণ দেয়ার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হস্তশিল্প শিখছি। সেলাই কাজ করে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করব।

মাইমুনার কথা শুনে অন্য একজন অফিস্যার গড় গড় করতে করতে বলতে লাগল, "এই মুহুর্তে আমাদের ঋণ কড়ায় গন্ডায় পরিশোধ করতে হবে। তানা হয় তোমাকে যেতে দেব না। দিলারা তুমি ওর আব্বা আম্মাকে বল ওকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে। তাকে যেতে দেব না।

এদিকে সূর্য তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। দিলারা অফিসারের কথা শুনে দ্রুত পদে বেরিয়ে আসল অফিস থেকে। মহল্লায় ফিরে এসেই মাইমুনার আব্বাকে খবর জানাল। মাইমুনার আব্বা দৌঁড়িয়ে গিয়ে পল্লী সর্দারের নিকট অবগত করালেন। পল্লী সর্দার দু একজনের সাথে পরামর্শ করে সাব্যস্ত করলেন সকালে টাকার ব্যবস্থা করে তাকে ছাড়িয়ে আনবেন। টাকা ছাড়া তো ওরা কথাও বলবে না। টাকা নিয়ে যেতে হবে। মাইমুনার আব্বা দুঃখ ভরা মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।

রাত ৯টার দিকে সুফিয়া সর্দারজীর কাছ থেকে মাইমুনার ঘটনা জানতে পেরে খুব দুঃখ পেল কিছুই পেল না। সর্দারজী শুয়ে পরল। সুফিয়া তার ১০জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রীর সাথে মাইমুনাকে মুক্ত করার জন্য পরামর্শ করল। সকলেই এতে একমত হল।

সুফিয়া রাতের আধোরে অস্ত্রগুলো এনে মুছে গান ওয়েল মেখে গুলি ভরে প্রস্তুতি করে নিল। অতঃপর সবাইকে পুরুষের পোষাক পরতে নির্দেশ দিল। আর সুন্দরী কারিমাকে বলল, "তুমি মনের মত সাজ।" কারিমা এমনিতেই ছিল সুন্দরী মেয়ে আবার হৃদয় উজার করা সাজ।

কারিমাকে বলল, "তুমি গিয়ে গেইটের দারোয়ানের নিকট রাত যাপনের আশ্রয় চাইবে এই বলে যে, আমি একজন অবলা অসহায় নারী আমার কোন আশ্রয় নেই। আজ রাতটুকু আমাকে এখানে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দিন। সকালে চলে যাব।" এ ধরনের আরো কিছু কথা তাকে শিখিয়ে দিল।

রাত ১১টার দিকে সবাই অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এন.জি.ও অফিসের দেয়ালের সাথে অর্থাৎ গেইটের দুদিকে গিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল। কারিমা পরীর রুপ ধরে দারোয়ানের সম্মুখে গিয়ে অসহায় বেসে দাঁড়াল এবং বলল স্যার! আমাদের রাশিয়ান ফৌজরা হানা দিয়ে অনেক নারী পুরুষ ধরে নিয়ে গেছে। আমি জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিন।"

দারোয়ান কারিমার রূপ রেখা অবলোকন করে পাগল প্রায় তার ঘুমন্ত ইন্দ্রীয়গুলো জাগ্রত হতে লাগল। তেমন কোন কথা না বাড়িয়ে গেইট খুলে দিল। দারোয়ান ভাবছিল তাকে নিয়ে সারা রাত................।

কারিমা গেইটে প্রবেশ করার সাথে সাথে রাইফেলটি হাতে নিয়ে নিল এদিকে বিদ্যুৎ গতিতে সুফিয়া বাহিনী নিয়ে দারোয়ানের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল। দারোয়ান বুঝবার আগেই জিব বের করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে জাহান্নামের চৌরাস্তা পেরিয়ে গেল।

সুফিয়া তার বাহিনী নিয়ে সবগুলো ঘর তালাশ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাচ্ছে না। সবগুলো রুমেই বাইরে তালা ঝুলানো ছিল। অপেক্ষাকৃত একটু দুরে একটি ঘর সেখানে গিয়ে দেখল বাইরে কয়েক জোড়া জুতা বিক্ষিপ্তভাবে পরে আছে দরজায়ও তালা নেই। এরা এ ঘরে তাতে বুঝবার বাকি নেই।

সুফিয়ার বাহিনী পূর্বের মত ওৎ পেতে বসে রইল আর কারিমা দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে মিহি সুরে স্যার স্যার বলে দরজা খোলার আবেদন

জানাল। এত রাতে মেয়েলি কণ্ঠ শুনে একজন অফিসার দরজার ছিদ্রপথে তাকিয়ে দেখে এক রুপসী তরুণী অসহায় বেসে দরজায় দন্ডায়মান। অফিসার দরজা খুলে কারিমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? এত রাতে এখানে কিভাবে এলে ইত্যাদি।”

কারিমা কাতর স্বরে পূর্বের ন্যায় ঐ কথাগুলো বলতে লাগল, যা দারোয়ানের নিকট বলেছিল। এবং এটাও বলল যে দারোয়ান গেইট খুলে দিয়ে এখানে আশ্রয় নিতে বলেছেন তাই আসছি। এন.জি.ওরা প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় ছিল। ওরা মদ পান করে পাশবিক অত্যাচারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ওদের সাথে কারিমা যখন আলাপ করছিল ঠিক সে সময় সুফিয়া বাহিনী হায়েনাদের উপর বজ্রের মত পতিত হল। স্টেন গানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাজরা করে দিল হায়েনাদের বক্ষ দেশ। অফিসারদের মধ্যে কেউ আর জীবিত রইল না। দুজনেই জাহান্নামে চলে গেল।

সুফিয়া লাশগুলোর পকেট চেক করে চাবি বের করে আলমারি খোলার চেষ্টা করল। আলমারি খুলে বেশ টাকা পয়সা পেল। তাছাড়া ঋণ পরিশোধ না করার কারণে যে সব গয়নাপত্র মহিলাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ঐসব স্বর্ণালঙ্কার গনিমত হিসেবে নিয়ে নিল। তারপর অফিসের কাগজপত্রগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বন্দিনী মাইমুনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

মাদ্রাসায় এসে অযু গোসল করে শোকরানা নামায আদায় করে অস্ত্র-শস্ত্রের হেফাজত করল। তখন রাত প্রায় ৩টা পেরিয়ে গেছে। সুফিয়া মাইমুনাকে গোপন করার জন্য পরামর্শ চাইল। কারণ তাকে যদি গোপন করা না যায় তবে পুরা গ্রামটি এন.জি.ওরা জ্বালিয়ে দিবে এবং থ্রি মার্ডারের দায় মাথা পেতে নিতে হবে। মহিলারা গোপন কথা প্রকাশ করে দেয় তাই কোন মেয়ে যেন মাইমুনার মুক্তির সংবাদ না পায় সে জন্য খুব সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল। মাইমুনা নিজেই বলল, “সুফিয়া আপা! আমি বাকি রাতটি এখানেই কাটিয়ে দেই তারপর মানুষ ঘুম থেকে জাগার আগেই পাহাড়ে চলে যাব। বোরকা পরে সারাদিন পথে পথে ঘুরব। মানুষ পথিক মনে করবে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না এমনকি সন্দেহ করবে না। দিনে যদি এন.জি.ওরা বা পুলিশরা মাদ্রাসায় বা বাড়ি তালাশ করে তবে পাত্তা পাবে না। আপনারা পরে যে ফায়সালা করেন তা আমি রাতে এসে জেনে

নেব।" সুফিয়া মাইমুনার বুদ্ধি খুব পছন্দ করল এবং বলল "আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তাই করবে দোয়া কর আল্লাহ যেন তোমাকে এবং আমাদের হেফাজত করেন।" অতঃপর ফজরের আগেই কিছু আহার্য ও পানীয় দিয়ে মাইমুনাকে পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিল।

একচল্লিশ

পরিস্থিতি ঝটিকা বেগে পরিবর্তন হতে লাগল। এমন কোন মুহুর্ত নেই যে, কোন স্থানে মুসলমান আক্রান্ত হচ্ছে না বা গোলাগুলির আওয়াজ শুনা যাচ্ছে না। এমনই এক মহাতঙ্ক আফগানের জনগন সময় অতিবাহিত করছেন।

ভোর হল মানুষ রাস্তায় নেমে এল নিজ নিজ কর্মশালায় যেতে লাগল। কর্ম ব্যস্ত মানুষেরা কাজে যোগদান করছে। সকাল নয়টা এন.জি.ও কর্মকর্তারা অফিসে অফিসে ছুটে চলছে। কয়জন অফিসার কৌতুহলে অন্যদিন অপেক্ষা একটু আগেই অফিসে চলে আসছে মাইমুনার খবর নেয়ার জন্য। ওরা মনে করেছিল সারা রাতের নির্যাতনে হয়ত অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করেছে। সুফিয়ার আস্তানার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়েছে।

একজন অফিসার কক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে শোনিত সিক্ত লাশগুলো দেখে মস্তকে কর স্থানপূর্বক বসে গেলেন। লাশগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পরে আছে, কিন্তু বন্দির কোন সন্ধান নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে এন.জি.ও কর্মীগণ এসে ভীড় জমাতে লাগল। বাধভাঙ্গা জোয়ারের মত নেমে আসে জনসাধারণের ঢল। মুখে মুখে অনুরণিত হতে লগল হত্যাকান্ডের ঘটনা। কেউ কেউ বলতে লাগল এ ঘটনার নায়ক কোন ডাকাত হতে পারে। নানা জনের নানা কথার ঝড় বইতে লাগল।

সুফিয়া মাইমুনাকে ছিনিয়ে এনে রাত্রেই পল্লী সর্দারের নিকট পূর্ন ঘটনা অবগত করেছিল। সর্দারজী ফজরের নামায আদায় করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। ইমাম সাহেব বললেন জনাব! মাইমুনাকে যে এন.জি.ওরা বাড়ি থেকে খবর দিয়ে নিয়েছে এবং সেখানে যাওয়ার পর আটক করেছে তা এলাকার ছোট বড় সকলেই জানে।

একথার আর কারো কাছে গোপন নেই। কাজেই আমরা মাইমুনার আব্বাকে সহ ১০/১২ জন লোক মিলে চলুন মাইমুনার মুক্তির দাবি করি। তারপর সেখান থেকে আমরা সোজা থানায় চলে যাব। থানা অলাদের নিকট এজহার দায়ের করব এই বলে যে, এন.জি.ওরা আমাদের লোক খবর দিয়ে এনে আটক করে নির্যাতন করেছে। ও গুম করে ফেলেছে অনতিবিলম্বে যেন আমাদের মানুষ আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে কাজ করলে হয়ত আমাদের উপর থেকে খুনের দোষারূপ কমে যাবে।

সর্দারজীর নিকট ইমাম সাহেবের কথা খুবই পছন্দ হল এবং অন্যদের নিকটও পরামর্শ চাইলেন। সকলেই ইমাম সাহেবের পরামর্শের উপর রায় দিলেন। সর্দারজী সাথে সাথে ১০/১২জনকে নিয়ে প্রথমে এন.জি.ও অফিসে গিয়ে জোরে শোরে মাইমুনাকে ছাড়ার দাবী জানালে একজন কর্মকর্তা বলল যে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।" অতঃপর সুজা থানায় গিয়ে এজহার দাখেল করলেন। থানার কর্মকর্তাগণ প্রথমে কেইছ গ্রহনে অমত ছিলেন। কোন একজন পুলিশ বললেন" এসব ফালতু মার্ডার কেইছ সরকার না নেওয়ার জন্যই নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিদিন কোননা কোন এলাকায় যৌথ বাহিনী রুশী ও নজিবুল্লার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হচ্ছে। সবগুলোর কেইছ গ্রহন করলে ফাইলের ওজন দাঁড়াবে কয়েক টন। এসব ফাইল কোর্ট ওলারাও পড়তে চায় না। কারণ এসব কেইছ আরো কিছু দিন চলতে থাকলে কোন ফায়দা নেই। কোন বিচারের রায় হচ্ছে না একের পর এক তারি শুধু তারিখ পরে যাচ্ছে। এজন্যই আমি এসব কেইছ গ্রহণ করার চেয়ে না করাই ভাল মনে করি।

এসব উক্তি উপেক্ষা করে পল্লীসর্দার কেইছ গ্রহণের জোরদাবী জানালেন এবং অনতিবিলম্বে দোষী ব্যক্তির গ্রেফতার ও মাইমুনার মুক্তির দাবী পেশ করলেন। পুলিশ কর্মকর্তারা তাদেরকে থানায় রেখেই এন.জি.ও থ্রি মার্ডার দেখতে পায়। তাঁরা লাশগুলো চাটাইয়ে মোড়ায়ে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

লাশবাহী গাড়িটি একটি মোরের নিকটবর্তী হলে দ্রুতগামী একটি ট্রাক এসে গাড়িটিকে ধাক্কা মেরে লাশসহ গাড়িটা চুর্ন বিচুর্ন করে দেয়। লাশের কোন চিহ্ন অবশিষ্ঠ রইল না। উক্ত সংঘর্ষে ড্রাইভার সহ ৫জনের মৃত্যু হয়।

পুলিশরা অনেক খোঁজখোঁজি করেও সাক্ষীদাতা খুঁজে পেল না। পরিশেষে কেইছ লেখা হয় আততায়ীরা সুন্দরী মাইমুনাকে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে পিছু ছুটা মানুষের উপর গুলি চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। আততায়ীরা সন্দেহভাজন মুজাহিদ। তবে মাইমুনাকে কোথায় কিভাবে রেখেছে তার অনুসন্ধানের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পল্লীসর্দার থানা থেকে ফিরে এসে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন এবং বললেন "মাইমুনাকে খুঁজে বের করার জন্য টিম গঠন করেছে। ওরা যদি মাইমুনাকে আমাদের এখানে পায় তবে থ্রি মার্ডার কেইছ পুনঃ আমাদের ঘারে আসবে, এ সংকটের সমাধান কি হতে পারে তার উপর পর্যালোচনা করা হোক।"

উক্ত মহল্লার হাকীম সাকাফী (তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত গোয়েন্দা অফিসার) বললেন বর্তমানে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। খুন, ধর্ষন, ছিনতাই, রাহাজানী, গুম এসব নিত্যদিনের খেলা। এসব নিয়ে প্রশাসনের মাথা ব্যথা নেই। মাইমুনা আছে কি নেই এসব ওরা খুঁজতে যাবে না। তবে এন.জি.ওদের বাড়াবারিতে তারা তৎপর হতে পারে। এ থেকে বাঁচার জন্য আমার খেয়াল হল তাকে দূর প্রদেশে বিয়ে দিয়ে দেয়া। সে ওখানেই শশুরালয়ে বসবাস করতে থাকবে। প্রয়োজনে এলাকার নাম গোপন করবে। হাকীম সাকাফীর পরামর্শ শুনে পল্লী সর্দার খুবই খুশী হলেন। এখন বিয়ে কোথায় দেয়া যায় এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন সর্দারজী।

হাকীম সাকাফী সর্দারজীর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, জনাব! এত চিন্তা করতে হবে না। আপনার ও মাইমুনার আব্বার এজাজত হলে আমি তার ব্যবস্থা দু একদিনের মধ্যেই করতে পারব। আমার একমাত্র ভাগিনা মাওলানা তাসফিন যাউজানী , যাউজানী তার নিবাস। গত দু বৎসর আগে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপাঠ দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে নিজ এলাকায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এলেমে নববীর খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। সংসারে তার মুরুব্বী বলতে কেউ নেই আমাকে ছাড়া। তার কাছে মাইমুনাকে বিয়ে দিতে পারব।

হাকীম সাকাফীর কথা শুনে পল্লীসর্দার মাইমুনার আব্বাকে ডেকে পাঠালেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। মাইমুনার আব্বা উক্ত প্রস্তাব

হাসিমুখে গ্রহণ করে নিলেন। হাকীম সাকাফী পরামর্শ করে পরদিন ভোরে মাইমুনা ও তার আব্বা এবং পল্লী সর্দারকে নিয়ে যাউজানের উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করেন। যথা সময়ে সাকাফী বোনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বোনের নিকট ভাগিনীর বিয়ের কথা আলোচনা করেন। বোন ভাই এর কথায় রাজী হলেন। এদিকে মাওলানা ও রাজী হলেন। অতঃপর সকলের সম্মতিক্রমেই রাত্রে তাদের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করে পর দিন বাড়ি ফিরে আসেন।

সুফিয়া অপরেশন সেরে অস্ত্র শস্ত্র ভাল করে মুছে গান ওয়েল মেখে ভালভাবে পলিথিন মোরায়ে রেখে দিয়েছে বাড়ি থেকে তিনশগজ উত্তর পূর্ব দিকে মহল্লার ইজমালী গোরস্তানের পুরাতন চার পাঁচটি কবরে। সেখা দিবালোকেও সহজে কোন বোধগম্য প্রানী যায় না। লোকমুখে শ্রুত সেখানে নাকি রয়েছে ভুত পিশাচের আস্তানা।

বিয়াল্লিশ

মাওলানা রফিককে আকিল নিয়ে গেল তার বাড়িতে। এদিকে মাদরাসায় পরে গেল হৈ হুল্লা। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। পুলিশ ছড়িয়ে পরেছে পুরা এলাকা। চলছে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি সন্দেহভাজন যাকে পায় তাকেই ধরে। হাত বেরি লাগিয়ে নিয়ে যায় হেফাজতে। আকিলের আব্বু একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি দোকান থেকে বাড়ি আসেন কম। সে দিনও তিনি বাড়ি ছিলেন না। আকিলরা ভাইবোন দুজন। বোনের নাম ফাতিমা। বয়স আকিলের থেকে পাঁচ বছরের বেশি। সবেমাত্র বলুগিয়াতে পা রেখেছে। চেহারা সুরতে খুবই সুন্দরী। ফাতিমা ক্লাশ নাইনের ছাত্রী।

আকিল রফিককে আন্দর মহলে নিয়ে আশ্রয় দিয়ে বলল, আপনি এখানে অবস্থান করুন আমি বাইরের হালত জেনে আসি। এদিকে তার আম্মা ও বোনের কানে কানে বলে গেল আগান্তুক একজন মুজাহিদ জীবন দিয়ে হলেও তার হেফাজত করতে হবে।" এ বলে আকিল চলে গেল। বাড়ির বাঁকে বাঁকে ঘুরে আকিল মেইন রোডে যেতেই দেখে পুলিশরা পুরা

এলাকা ঘিরে রেখেছে। আকিলও পুলিশ ঘেরাওয়ের মধ্যে পরে গেল। রোডের এক পার্শ্বে বেশ কিছু বন্দিদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ভেন। বন্দীদের মধ্যে আকীলের দুজন উস্তাদ রয়েছে। এক পুলিশ আকিলকে জিজ্ঞাসা করল, "খোকা এ এলাকায় মুজাহিদরা কোথায় থাকে বলতে পার?" আকিল মাথা নেরে বলল, না স্যার, আমি মুজাহিদদেরকে দেখিনি।" তুমি কোথায় যাচ্ছ এ অন্ধকারে?" জিজ্ঞাসা করল পুলিশ আকিল উত্তর দিল, "মাদরাসায়" তারপর পুলিশ তাকে ছেড়ে দিল সে মাদরাসার দিকে চলে গেল।

পুরো এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে ফাঁকা গুলির শব্দে লোকজন ছোটাছুটি বন্ধ করে দিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে লাগল। এদিক থেকে সবগুলো বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে মুজাহিদদের সন্ধান করছে। এক বাড়ির লোক নিয়ে অন্য বাড়িতে প্রবেশ করিয়ে একজন লোক ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে এ লোক এ বাড়ির কি না। বাড়ির লোক হলে ছেড়ে দেয় আর অপরিচিত বা মেহমান হলেই মুজাহিদ মনে করে গ্রেপ্তার করে। হেন্ডকাপ পরিয়ে ভ্যানে উঠায়।

আকিল দৌড়িয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে বাইরের অবস্থা তার আম্মাকে অবগত করাল। বোন ফাতিমা ও তার আম্মা মেহমানের হেফাজত কিভাবে করা যায় তা নিয়ে ভাবছিলেন। মাওলানা রফিক সব চিন্তা বাদ দিয়ে আকিলকে ডেকে বললেন, "ভাই তুমি তো আমাকে হেফাজত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। আল্লাহ এর বিনিময় অবশ্যই দিবেন। দেখ আকিল আমি যদি তোমাদের বাসায় গ্রেপ্তার হই তাহলে তোমাদের আর রক্ষা নেই। আমার একার জন্য তোমাদের ক্ষতি হবে এটা আমি চাই না। আমরাতো নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া ও মুসলমানদের জান, মাল ও ইজ্জত হেফাজত করার শপথ নিয়েছি। কাজেই আমি এক্ষুনি তোমাদের বাড়ির বাইরে যাচ্ছি ফাতিমা লজ্জাবনত মস্তকে বিনয়ের সাথে বলল মুজাহিদ ভাইয়া তুমি বাইরে যেও না। আকিল এইমাত্র খবর নিয়ে আসছে বাইরের অবস্থা খুব ঘুলাটে। অনেক মানুষ বন্দি হয়েছে সবগুলো রাস্তা টইল দিচ্ছে। বিপদজনক মুহুর্তে বাড়ির বাইরে যেও না। যেভাবেই হোক তোমাকে রক্ষা করব।"

রফিক উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, "ফাতিমা আমি জানি তোমাদের জীবন দিয়ে হলেও আমাকে রক্ষা করবে। তোমাদের বিন্দু বিস্বর্গ ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। তোমাদের বাড়িতে যদি গ্রেপ্তার হই তবে তোমাদের অস্তিত্ব রাখবে না। কাজেই আমি চললাম। এই বলে জামা কাপড় খুলে আকিলকে দিয়ে বললেন ভাই এ কাপড়গুলো তোমার জিম্মায় রেখে দাও। ফিরে এলে দেবে আর যদি নাই ফিরি তবে তুমি এগুলো ব্যবহার করবে। গা থেকে কাপড় খোলার কারণ কেউ জানল না।

কাপড়গুলো আকিলকে দিয়ে রফিক বাসা থেকে বেরিয়ে এলেন। মাত্র দুটি বাড়ি পার হওয়ার সাথে সাথে তিনজন পুলিশকে আকিলদের গৃহাভিমুখে যেতে দেখলেন। আশেপাশে আর কোন পুলিশ নজরে পরল না। পুলিশ মাওলানা রফিককে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কি? বাড়ি কই? যাচ্ছ কোথায়? রফিক উত্তর দিল আমার নাম আবদুল্লাহ (আঙ্গুলের ইশারায়) ঐতো আমাদের বাড়ি মেচ আনার জন্য দোকানে যাচ্ছি।"

পুলিশ রফিকের কথা শুনে ছেড়ে দিল গেঞ্জি গায়ে দেখে মনে করেছে হয়ত এসব বাড়ির লোক হবে। দুরের লোক হলেতো জামা কাপড় গায়ে থাকত। পুলিশ দুটি বাড়ির সবগুলো ঘর তালাশ করে কাউকে না পেয়ে আকিলকে জিজ্ঞাসা করল তোমাদের মহল্লায় নাকি মুজাহিদদেরকে আশ্রয় দিয়েছ তাকি ঠিক?" আকিল উত্তর দিল মুজাহিদ থাকলেতো পেতনই এসব আমাদের এলাকায় নেই। দুজন পুলিশ আকিলকে ঘিরে কথা বলছে আর একজন পুলিশ এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখছে। এর মধ্যে নজরে পরে গেল ফাতিমার উপর। ফাতিমা পুলিশের লোলপ দৃষ্টি এড়াতে পারল না। পুলিশের বদনজর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে দৌড়িয়ে ঘরে লুকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা পারেনি। ফাতিমাকে দেখার সাথে সাথে পুলিশের পশু প্রবৃত্তি ও কাম ইন্দ্রিয়গুলো জাগ্রত হতে লাগল। এমন সুদর্শন ললনার সাথে অতীতে কোনদিন সাক্ষাত ঘটেনি। দুএকদিন হলেও তাকে থানায় নিয়ে যাবে।

পুলিশ দিক বেদিক চিন্তা না করেই হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পরল ফাতিমার উপর। ফাতিমা শরীরের সবগুলো শক্তি প্রয়োগ করেও নিজকে রক্ষা করতে পারল না। অবশেষে তার কণ্ঠথেকে বেরিয়ে এল বাঁচাও বাঁচও

বাঁচাও আর্তণাদ। বাঁচাও বাঁচও শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে আছরে পরছে চতুর্দিক। মেয়েলি কণ্ঠের আর্তনাদে থমকে দাঁড়ালেন রফিক। কোন হতভাগিনীর কান্না ইথারের ঢেউয়ে ভেসে আসছে রফিকের কোমল হৃদয়ে তা কেউ ঠাহর করতে পারেনি। মজলুমকে সাহায্য করা আল্লাহর হুকুম, ফরয বিধান। তা অবশ্যই পালন করতে হবে। উপেক্ষা করার জো নেই। রফিক মনে মনে স্থির করলেন যেভাবেই হোক মজলুম বোনকে দানবের হাত থেকে উদ্ধান করতে হবে। জীবন যায় যাক, তবু হায়েনাদের নির্যাতন থেকে মুসলিম ললনাকে রক্ষা করতে হবে। এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে মেইন রোডে পার্শ্বে একটি দেয়ালের আড়ালে ওৎ পেতে বসে রইলেন। পুলিশ জোরপূর্বক ফাতিমাকে ধরে নিয়ে ভ্যেনের দিকে এগুচ্ছে। মহল্লার লোকজন ভয়ে আতঙ্ক। কেউ বাইরে বের হচ্ছে না একটি মাত্র মেয়ের আহাজারী ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। পুলিশ সবেমাত্র রোডে পা দেবে এমন সময় আরম্ভ হল কমান্ডো কায়দা হামলা পুলিশ তিনজন ছিটকে পরল তিনদিকে। কেউ দাঁত হারিয়েছে কারো ভেঙ্গেছে পা বজ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়ায় তারা হয়ে গেছে দিশেহারা।

রফিক প্রথমে স্টেনগানটি হাতে নিয়ে নেন। তারপর দুটি রাইফেলও এসে যায় রফিকের কব্জায় পুলিশ নিরস্ত্র হয়ে বেকুবের মত হাত উচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক ফাতিমার বন্ধন মুক্ত করে বললেন "যাও বোন এখান থেকে পালাও দেরি করো না কিন্তু এ বলে ফাতিমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

রফিক তিনজনকে পুলিশের লাইনার খুলে মজবুত করে বেঁধে ফেললেন। দুটি রাইফেল থেকে একটি নিলেন নিজে অপরটি দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে তিনজনকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন রফিক পুলিশদের জিজ্ঞাসা করলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদের ভ্যান কোথায়?" একজন পুলিশ হাতের ইশারায় বলল, "এইতো ওদিকে।" কয়েকশ কদম এগিয়ে দেখেন বন্দীদের নিয়ে মুজাহিদদের জন্য যেন অপেক্ষা করছে। পার্শ্বে পাহারা রত দুজন পুলিশ সিগারেট পান করছে। রফিক অন্য কোন চিন্তা না করে ছীনা লক্ষ্য করে একটি গুলি ছুড়লেন সাথে সাথে ঢলে পরল দুটি তাজা প্রাণ। এসময় অন্য পুলিশরা মহল্লাবাড়ী গুলো তাল্লাশী করছিল। দুজনকে হত্যা করে বেরলটি ঘুরিয়ে ধরলেন আহত পুলিশের দিকে। সাথে সাথে তিনজনকেই

ফায়ার করে হত্যা করলেন। তারপর ভ্যানে উঠে বন্দিদের বন্ধন খুলে দিয়ে বললেন" আপনার রাস্তা ছেড়ে ছরিয়ে ছিটিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটে যান। এক মুহুর্ত যেন বিলম্ব না হয়।

বন্দীরা এ সুযোগে লাফালাফি, ফালাফালি করে এ স্থান ত্যাগ করল। কোথা থেকে কি হল বন্দীরা তা মুটেই বুঝতে পারেনি। এমন কি এলাকার লোকজন গুলির শব্দ শুনে আরো ভয় পেয়ে পেয়ে গেল। মহল্লার যে পুলিশ ছরিয়ে ছিটিয়ে তল্লাশী চালাচ্ছিল ওরা প্রথমে ভাবছে এটা পুলিশের ফায়ার কিন্তু মুহুর্তের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল এ ফায়ার পুলিশের পক্ষ থেকে নয়। এটা মুজাহিদদের পক্ষ থেকে। পুলিশরা মুজাহিদ তল্লাশি বাদ দিয়ে থানাভিমুখে পালাতে লাগল। এক মুহুর্তে পুলিশরা পুরো এলাকা ছেরে চলে গেল। মাওলানা তিনটি অস্ত্র নিয়ে আকিলদের বাসায় হাজির হলেন। গেইট বন্ধ। ভিতরে প্রবেশের কোন উপায় নেই। প্রথমে গেইটে আওয়াজ দেয়ার পর ভাবছিলেন হয়ত কেউ খুলে দিবে। কিন্তু তা আর হলো না। বরং ঘরের দরজা আরো মজবুত করে আটকাতে লাগল। মাওলানা রফিকের বুঝতে বাকি নেই যে ওরা আবার পুলিশের ভয়ে আতঙ্ক হয়ে দরজা বন্ধ করছে।

এবার আস্তে আস্তে ডাকলেন "আকিল অ আকিল তোমার মুসাফির ভাইয়া আবার ফিরে আসছে। গেট খোল" আকিল ফাতিমা তার আম্মা একই ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে বসে মুসাফিরের নগ্ন গায়ে ভেগে যাওয়ার দৃশ্য বর্ণনা করছে। ফাতিমাকে কে বা কারা পুলিশ নামক হায়েনাদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তার কাহিনী শুনাচ্ছে। রফিকের ডাক শুনে আকিল দৌড়ে গিয়ে গেইট খুলে অন্দর বাড়িতে নিয়ে গেল। বাহ! আশ্চর্য! নগ্ন গায়ে, খালি পায়ে, রিক্তহাতে যে লোক বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, সে লোক পাঁচটি অস্ত্র নিয়ে বাসায় ফিরেছে। আকিলের কচি মনে এক্কিন জন্মেছে যে তার বোন ফাতিমার মুক্তি দানকারী আর কেউ নেয়, সে জন হল নবাগত মুসাফির।

আকিল ভাবাবেগে বলে উঠল "ফাতিমা আপু! দেখেন তো ইনি কে এসেছেন। এইতো তোমার উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা ও রক্ষাকারী। এসোনা বুবু জলদি এসো! ফাতিমা আকিলের ডাক শুনে কৌতুহলে ঘর থেকে

বেরিয়ে এসে দেখল অস্ত্র নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন সে চন্দ্রতুল্য চেহারাটি যা সন্ধার পরপরই দেখেছিল। ফাতিমা লজ্জাবনত মস্তকে সালাম দিলে রফিক সালামের জবাব দিলেন। এবার আকিল রফিককে হস্ত চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। ফাতিমা জামা কাপড় ও পাগড়ী এনে বলল "মুসাফির ভাইয়া এই নাও তোমার জামা কাপড়।"

রফিক অস্ত্রগুলো ঘরের এক কোনে রেখে জামা কাপড়গুলো পরিধান করে এশার নামায আদায় করলেন। নামায সমাধা করার সাথে সাথেই খানা নিয়ে আসল আকিল। উভয়ে খানা খাচ্ছে এক প্লেটে।

ফাতিমা পরিবেশন করছে। ফাতিমার মুক্তিদাতা মেহমানকে নিজ হাতে খানা পরিবেশন করতে পারছে বলে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। এখনো তার শরীরের কম্পন কমেনি। রফিক যে পাঁচজন পুলিশকে হত্যা করে ভ্যান ভর্তি বন্দীদেরকে মুক্ত করেছে তা ফাতিমা জানত না। ফাতিমা খুব বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করল, "মেহমান ভাইয়া! তুমি একা কিভাবে বজ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পরলে পশুদের উপর? ওরাতো সবাই ছিল সশস্ত্র আর তুমি ছিলে নিরস্ত্র। একা কিভাবে তা সম্ভব হল? ইস বেটারা তোমার লাথির চোটে হুমরি খেয়ে ছিটকে পরে গেছে। মা-রে বাপরে করে চিৎকার দিচ্ছে। তোমার গায় এত জোড় এত সাহস! তুমি কি ইসমে আযম জান মুসাফির ভাইয়া? না তোমার সাথে জিন আছে? বলবে ভাইয়া?

ফাতিমার আবুল তাবুল শুনে রফিক হেসে বলল আরে তুমি এত কিছু ভাবছ কেন? কুশেশের সাথে যদি আল্লাহর নুসরত থাকে তাহলে অসাধ্যকেও সাধ্য করা যায়। আমি দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যুদ্ধের কলা কৌশল রপ্ত করেছি। নিরস্ত্র অবস্থায় ১০/১২ জন সশস্ত্র ব্যক্তির সাথে কিভাবে লড়া যায় এবং আত্মরক্ষা করা যায় তা শিখেছি। তাই তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে এনেছি এবং পাচজন খুনিকে হত্যা করে অসহায় বন্দীদেরকে মুক্ত করেছি। আকিল ও ফাতিমা বিস্ফোরিত লোচনে রফিকের দিকে তাকিয়ে রইল এবং জিজ্ঞাসা করল কি ভাইয়া সত্যিকি পাঁচজন পুলিশ মেরেছ? এত সাহস তোমার? আল্লাহ তোমার হেফাজত করুক।

হঠাৎ গেইটে কলিংবেল বেজে উঠল। এ রাতে কার আগমন? কে আসল? কোন অতিথি না পুলিশ। ভয়ে সবাই পালাই পালাই অবস্থা।

রফিক চট করে দাঁড়িয়ে রাইফেলটি কাঁধে ঝুলিয়ে হাতে নিলেন স্টেনগান। এবার আস্তে আস্তে পা পাপ করে ফটকের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি পরিচয় দিন।" আগান্তুক অপরিচিত কণ্ঠ শুনে তিনিও প্রশ্ন করলেন আপনি কে?" গেইট খুলে তারপর পরিচয় তালাশ করুন। রফিক ভাবলেন, হয়ত কোন মেহমান এসে থাকবেন। কথার সুরে বুঝা যাচ্ছে কোন অপরিচিত লোক নয়। তাই গেইট খুলে দিলেন। আগান্তুক ভিতরে প্রবেশ করেই অস্ত্রধারী লোকটিকে দেখে ভয়ে চিৎকার দিলে আকিল ফাতিমা দৌড়ে এসে বলল, "আব্বু ইনি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আপনি ভয় পাচ্ছেন কি?" রফিকের ভ্রম ভেঙ্গে গেল। এ লোক অন্য কেউ নন বাড়ি মালিক ও আকিলের আব্বা। রফিক সালাম মুসাফাহা করে কৌশল বিনিময় করলেন। গেইট বন্ধ করে গৃহকর্তা ঘরে ঢুকলেন। পত্নী কানিজা ও কন্যাকে ধরে কেঁদে ফেললেন। রক্তে ভেজা কাপড় দেখে ফাতিমা ও আকিল জিজ্ঞাসা করল আব্বু তোমার কি হয়েছে? কে মেরেছে? বলনা আব্বু? গৃহকর্তা কাপড় ব্যবসায়ী সলিম বেগ। তিনি দোকান বন্ধ করে বাসায় ফিরছেন পথে এসে ধরা পরলেন পুলিশের হাতে। চাবুকের আঘাতে আঘাতে শরীর রক্তাক্ত করে পুলিশের ভ্যানে উঠাল। এতটুকু বলতে না বলতেই ফাতিমা বলে উঠল, "পুলিশের ভ্যান থেকে কে তোমাকে উদ্ধার করেছে তা জান আব্বু? ইনিই সে মহান ব্যক্তি যার উসিলায় আমি তুমি আরো অনেক ব্যক্তি রক্ষা পেয়েছে।

রফিক বলল জামা কাপড়গুলো খুলে ফেলুন রক্ত মুছে পরিস্কার করে দেই। সলিম বেগ জামা খুলে বসলেন, রফিক তুলায় স্যাভলন মেখে আলতু ভাবে রক্ত গুলো পরিস্কার করে দিলেন। অতঃপর খানা পিনা সেরে রফিকের পরিচয় জানতে চাচ্ছেন। রফিক তার পূর্ণ পরিচয় ও অত্র এলাকায় আসার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তাছাড়া জিহাদী কার্যক্রম মুজাহিদের তৎপরতার কথা জানালেন।

সলিম বেগ রফিককে লক্ষ্য করে বললেন "বাবা ঈমান-আমল মান-ইজ্জত ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে দেশে থাকা যাবে না। ডঃ নজিবুল্লাহ সরকারের উৎখাত ছাড়া বাঁচার আর কোন বিকল্প নেই। বাবা তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আমরা অন্য কিছু করতে না পারলেও আর্থিক সহযোগীতা দিয়ে

যাব। আমি বনিক সমিতির সভাপতি। প্রসেস করে প্রতি মাসে তোমাদেরকে ৫০ হাজার টাকা দেব। এছাড়াও ব্যবসায়ীদের সব গুলো যাকাতের অর্থ তোমাদেরকেই দেব। তা জায়েজ হবে তো? "হ্যাঁ যাকাতের হকদারের মধ্যে মুজাহিদদের হক আছে। বরং মুজাহিদরাই প্রথম দরজার হক। সুরা তওবার ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। সলিম বেগ আরো বললেন বাবা আমাদের এলাকার ১০/১২জন যুবক জিহাদের প্রশিক্ষন নিতে চাচ্ছে তাদেরকে কোথায় পাঠাব? সে ঠিকানাও পাচ্ছি না। দয়া করে ওদের ব্যপারে একটু চিন্তা কর। যাতায়াত খরচ খানা পিনা আমি নিজেই বহন করব ইনশাআল্লাহ।

রফিক আনন্দ চিত্তে বললেন "জনাব! আমার সফরের কারণের মধ্যে এটাই প্রধান কারণ যে যুবকদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া। আমার কমান্ডার মাওলানা জালুলুদ্দীন হাক্কানী সাহেব এ দায়িত্ব দিয়ে এসব এলাকায় পাঠাচ্ছেন। আগামী কালের মধ্যে যদি যেতে পারে তবে আমার সাথেই যেতে পারবে। আর যদি না পারেন তবে ঠিকানা দিয়ে যাব উক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করবেন। সেখান থেকে রাহবরের মাধ্যমে সীমান্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দেব। ওদের আর কোন চিন্তা করতে হবে না। সলিম বেগ বললেন, "ঠিক আছে তিন দিন পর আমি ওদেরকে পাঠিয়ে দেব। এসব আলাপ-আলোচনার পর উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে, অযু ইস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করলেন। ফাতিমা চা-নাশতা এনে হাজির করল। সলিম বেগ সাহেব রফিককে নিয়ে চা-পান করলেন। সলিম বেগ সাহেব চলে যাবেন দোকানে বেশি সময় দিতে পারবেন না তিনি। তাই রফিককে বললেন, "বাবা! তুমি তো আমাদের জীবন রক্ষা করেছ। তোমার ঋণ পরিশোধ করার নয়। তুমি কিছু দিন আমাদের এখানে থাকে। তোমার মেহমানদারী করে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করব।"

উত্তরে রফিক বললেন, "হুজুর! এখানে বেশি সময় অবস্থান করা ঠিক হবে না। এলাকার ওপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাপ আসতে পারে। তাই চলে যাওয়াটাই ভাল মনে করি।"

সলিম বেগ সাহেব রফিকের কথাগুলো শুনে এবং বললেন, "তা সত্য, তবে মাঝে মধ্যে গরীবালয়ে এস। এ বলে ওঘর থেকে ৫০ হাজার টাকা

এনে বললেন নাও বাবা জিহাদের ফান্ডে কয়টি টাকা দিলাম, প্রয়োজনে খরচ করো। এ বলে তিনি বাজারে চলে গেলেন।

রফিক অস্ত্রগুলো পার্টে পার্টে খুলে একটি বস্তায় ঢুকালেন। ফাতিমা খানা এনে বলল, "ভাইজান! খানাগুলো খেয়ে নিন! রফিক খানা খেয়ে বিদায় নিতে চাইলেন, ফাতিমা অশ্রুসিক্ত নয়নে পার্শ্বে দন্ডায়মান।

রফিক বললেন, "ফাতিমা! তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি ক্ষমা করে দিও। আকিল! তমি ভালভাবে লেখা-পড়া করো। আরো একটু বড় হলে তোমাকে জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাব। তোমাকে মুজাহিদ হতে হবে কিন্তু। ফাতিমা রফিকের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল এবং বলল, "মুজাহিদ ভাইয়া! তুমি কি আর আসবে না। আমাদের বাসায়? ভুলে যাবি কি তোর বোনটিকে? দুদিনেই যে তুমি আমাদের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসেছে! অনেক কথাই অন্তরে উঁকি ঝুঁকি মারছে কিন্তু বলতে পারছি না। আবার আসবে কিন্তু-------! কেমন?

ফাতিমার কথাগুলো রফিকের দিলের মধ্যে শ্যেলের মত বিঁধছিল। অশ্রু বর্ষনে রফিকের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। শেষবারের মত ফাতিমার দিকে আর একবার তাকিয়ে কথা দিতে বাধ্য হলেন, "আবার আসব, শান্ত হও।"

ফাতিমা পিছু পিছু হাটছে, রোডে এসে স্কুটারে আরোহণ করে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। সে সময় একে অপরের দিগে অশ্রু সিক্ত নয়য়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তেতাল্লিশ

এক অশান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আতিকা ইন্টারমেডিয়েটের ফাইনাল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ করল। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি উল্কাবেগে পাল্টিতে লাগল। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার। খুন, ধর্ষণ, ছিন্তাই, গুম, রাহাজানি, চুরি ডাকাতি ও গৌষ্ঠিগত দাঙ্গা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সত্যের সাথে মিথ্যার লড়াই, হকের সাথে বাতেলের দ্বন্দ্ব, ভালর সাথে

মন্দের কলহ, ন্যায়ের সাথে, অন্যায়ের বিবাদ, আস্তিকের সাথে নাস্তিকের যুদ্ধ দিন দিন বেড়েই চলছে।

মাহমুদা ও আলমের কথা যখনই তার মানসপটে ভেসে ওঠে তখনই সে চিন্তার সাগরে তলিয়ে যায়। একজন অবলা নারীর সাথে স্বামী হয়ে কিভাবে এমন আচরণ করতে পারে? কি ভাবে আপন সন্তানকে ভুলতে পারে! পুরুষরা এতই নিষ্ঠুর? এতই হারামী? নারীকে তারা ভোগের বস্তু বানাচ্ছে! কাঁচা মালেরও তো একটা মূল্য আছে, নারীদের একটুকু মূল্য কই রইল! মাহমুদার জীবন কি এমনিতেই তিলে তিলে নিঃশেষ হবে? আহ! বেচারি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী থেকেও দূরে। কোন দিন হয়ত ওর সাক্ষাত ঘটবে না। যৌবনের উম্মাদনায় কিছুই করতে হয় না। যৌবনের ঢেউয়ে ভাসতে নেই। সংযমী হওয়া, ধৈর্য ধারণ করাটাই শ্রেয়। পিতা-মাতার অবাধ্য হতে নেই। মাহমুদা যদি এমন করে প্রেম সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপ না দিত, তবে আর অনেক লেখা পড়া করতে পারত। এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হত না। বিদ্যা-বুদ্ধি ও চেহারা নমুনা যা ছিল, সে হিসেবে অনেক বড় ঘরে বৌ বানিয়ে নিত তাকে।

আতিকা একা একা নিঝুম রাতের কোন এক প্রহরে আরো ভাবতে থাকে যে, প্রেম তো অত্যন্ত পবিত্র জিনিস ছিল। আধুনিক সভ্য জগতের যুবক যুবতীরা পবিত্র প্রেমকে অপবিত্র বানাচ্ছে। সত্যিকার প্রেমকে নির্বাসন দিয়ে অশ্লিল প্রেমে মার্কেট সরগরম করে দিচ্ছে। বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে স্কুল-কলেজে পার্কে সিনেমায়, সমুদ্র সৈকতে, নদীর ঘাটে ও ঝোঁপে ঝাড়ে প্রেম বিনিময় হচ্ছে। ছিঃ কত নোংরামী ভাবতেও অবাক লাগে। পাশাপাশি বেঞ্চে বসে ক্লাশ করার সময় ছেলে মেয়েকে, মেয়ে ছেলেকে আবার কখনো কখনো স্যারেরা চোখে খুচা মারে। রাস্তায় রাস্তায় যুবক যুবতীরা হাত ধরাধরি করে চলে। এটা কোন সভ্যতা? এটা কিসের প্রেম? এ ধরনের প্রেমের ফলাফল হল মাহমুদা ও আলম।

ভালোবাসা-বাসি এটা মানুষের অর্জিত সম্পদ নয়। এটা ফিতরতি, (জন্মগত ও খোদা প্রদত্ত স্বভাব। অযথা একজনকে ভাল লাগবে তার কথা, তার চলা, তার চাহনি তার কর্ম এমনিতে ভাল লাগবে। কেন ভাল লাগে তা

তালাশ করে পাওয়া মুশকিল। এ ভালোবাসাকে সুপথে প্রবাহিত করতে হবে। শয়তানের উঁকি ঝুকি থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। কুপ্রবৃত্তির সাথে নিয়মিত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ভালোবাসার অনল অন্তরে প্রজ্জলিত হতে থাকবে কিন্তু তা করতে হবে। একজন প্রেমিক সে পিচ্ছিল পথের যাত্রি। চলার পথে তাকে অনেক সাবধানে পথ চলতে হবে পা ফেলতে হবে। পা পিছলে গেলে কিন্তু জাহান্নমের তলদেশে হবে তার ঠিকানা। প্রেমিক স্বয়নে স্বপনে তার ভোর বিহানে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় প্রেমিকাকে নিয়ে ভাবতে থাকে। এ ধরনের প্রেম থেকে সন্ধানীরা ইবরত হাসেল করে শিক্ষা গ্রহণ করে। সন্ধানীরা মনে মনে ভাবে "হায়! একজন মানুষ সে এত সুন্দর! এত মনোরম! কিন্তু সে তো সৃষ্টি। হায়াত সম্পর্কে উভয়েই বেখবর। যার একটি হাঁচির সাথে দম বের হয়ে যায়। যে এত অসহায় তার সাথে ক্ষণিকের তরে প্রেম করে লাভ কি? কিছু দিন পর চামড়া ডিলে হয়ে যাবে, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি লুপ পাবে। যৌবনে ভাটা পরবে। পিঠ কুঝ হয়ে যাবে এত দুর্বল ও অসহায় মানুষকে ভালবেসে লাভ কি? তার যে স্রষ্টা তার যে মালিক, যার মৃত্যু নেই, বার্ধক্য নেই, যিনি চিরদিন থাকবেন, এমন একজনের সাথে ভাব জমানো বাঞ্ছনীয়। সে প্রেমই হবে স্থায়ী। সে প্রেমই তাকে নিয়ে যাবে চির শান্তির আবাস স্থল জান্নাতে। সে প্রেমেই প্রেমাস্পদ ছাড়া সব কিছুকে ভুলিয়ে দেবে। সে প্রেমের প্রভাবে তার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে ভুলিয়ে দিবে। সেটাই আসল প্রেম সেটাই এশকে হাকিকী। সে প্রেমই বাহন হয়ে প্রেমিকাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

- এশকে আঁ শুলাস্ত কুচু বর ফরুখত,
- হারচে জুজ মাশুকে বাকি জুমলা ছুখত।

অর্থাৎ প্রেমের অগ্নিশিখা যার দিলে প্রজ্জ্বলিত হয়। সে দিলে প্রেমাস্পদ ছাড়া যা কিছু আছে সব কিছু ভষ্মিভুত করে দেয়। আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে (গায়রুল্লাহকে) জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। আর দিলে হার হামেশা শুধু আল্লাই বিরাজ মান থাকে। ঠিক সে সময়ই প্রেমিকের রসনা থেকে বেরিয়ে আসে-

- হার পালুমে আল্লাহমিয়া তুহি তুহে তুহিতু হে,
- যেধার দেখতাহুঁ মায় তুহিতু হে, তুহি তু হে।

অর্থাৎ চোখের পলকে শুধু আল্লাহই আল্লাহ যে দিকে চোখ ফিরাই সে দিকেই শুধু আল্লাহই আল্লাহ। আতিকা আরো ভাবছে, যে শরীর পচেঁ-গলে দুর্গন্ধ বের হয়ে। কেউ কাছে ঘেঁষবে না। যে শরীর মাটি চাপা দিয়ে রাখবে দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য সে শরীরকে ক্ষণিকের তরে ভালবেসে লাভ কি? ধ্বংসশীল বস্তুর পেছনে জীবন ক্ষয় করার যোক্তিকতা কোথায়? ধন-দৌলত, সহায়-সম্পদ কিছুই তো সাথে যাবে না। তাহলে....? যে প্রেমের পিছনে রয়েছ কামিয়াবী ও সফলতা, সে প্রেমের পিছনে জীবন বিলিয়ে দিতে পারলে জীবনটা কতই না ধন্য হত। যে প্রেমের উম্মাদনায় (প্রেমিকের চোখের ঘুম ও আরামের বিছানা হারাম হয়ে যায়। যে প্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে কুহু-কিনির মত আল্লাহ! আল্লাহ ডাকতে থাকে। সেজদায় মস্তক যমিনে লুটিয়ে পড়ে গাইতে থাকে, "সুবাহানা রাব্বিয়াল আলা" সে প্রেমের মদিরা পান করে ধন্য হতে চাই। ধিক এ জীবনের, ধিক পচাঁ গান্দা প্রেমের। সুফিয়া ঠিকই বুঝেছে। তার সিদ্ধান্ত সঠিক যে শিক্ষামানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে শিক্ষার কপালে হাজার লাথি, শত ঝাটার বারি। স্কুল কলেজের শিক্ষা নাস্তিকদের আবিস্কার। তাই এ শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যায় না। পৌঁছলেও খুবই নগন্য যে শিক্ষায় মানুষকে জাগতিক প্রেমের দিকে ধাবিত করে চরিত্র হরন করে সে শিক্ষার উপর শত ধিক্কার শত ভৎর্সনা। এখন থেকে ইহুদি নাসারাদের লিখা সমস্ত পুথি শাস্ত্র আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসিয়ে দেব। যে শিক্ষায় আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে ইতর প্রাণী বানরের বংশধর বলে আখ্যায়িত করেছে। সি শিক্ষার প্রতি ধিক শত ধিক।

আতিকা উন্মাদিনীর মত একা একা বসে রাত পোহাচ্ছে। আতিকাকে কে যেন অদৃশ্য থেকে ডেকে বলছে, "আয় আয় এদিকে! ফিরে আয়। ফিরে আয় কামিয়াবির পথে সফলতার পথে। আতিকার অন্তরে নূরের জ্যোতিতে নূরানী হয়ে উছলে উঠেছে। সে মনে মনে কল্পনা করছে জীবনে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। সে এখন থেকেই স্কুল কলেজ আর ভারসিটির শিক্ষাকে পদাঘাত করে ইসলামী শিক্ষায় মনো নিবেশ করবে। দেশে ফিরে গিয়ে সুফিয়ার মাদরাসায় ভর্তি হবে। সুফিয়ার ছাত্রী হবে। আহ কি মজাটাই হবে।

মোরগ ডাকছে, পাখীর কূজনে রাতের নীরবতা ভঙ্গ করছে। দু একজন অলস ছাড়া, সবাই গাত্রোত্থান করে মসজিদ পানে ছুটে চলছে। আর মেয়েরা নিজ নিজ গৃহের অভ্যন্তরে নামাযে দন্ডায়মান হয়েছে। আতিকার অন্তরে আজ নতুন আনন্দ নতুন ফুর্তি। অন্য দিনের চেয়ে শরীরটা অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে তার অন্তর জ্যোতির্ময়। সে অযু করে নামায পড়ছে সূরা কেরাতের অর্থ তেমন একটা না বুঝলেও এত ভাল লাগছে তার কাছে তা বুঝা মুশকিল। নামাযে এত সাধ এত মজা তা আর কোন দিন সে অনুভব করেনি। রুকু সেজদা আদায় করছে খুব ধীরস্থিরে। নামাযে পরতে পরতে কে যেন মধু মেখে দিয়েছে। এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যেতে ইচ্ছে করে না। অতঃপর নামায শেষ করে কুরআন তেলাওয়াতে বসল। কুরআন তেলাওয়াতে একই দশা অন্য দিনের চেয়ে প্রায় ঘণ্টা বেশি তেলাওয়াত করেছে। অতঃপর নাস্তা খেয়ে ভাই এর নিকট মনের ভাব খুলে বলল। ভাই ও ভাবী তার কথা শুনে একমত হয়ে গেলেন এবং বললেন ঠিক আছে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং খুবই ভাল দুদিন পর আমার সাপ্তাহিক ছুটি সেদিন তোকে বাড়িতে নিয়ে যাব।”

দুদিন অতিবাহিত হলে আতিকাকে নিয়ে সারোয়ার বাড়ি চলে গেলেন এবং সকলের কাছেই তার অন্তরের ব্যথা বেদনা ও বর্তমান পরিস্থির উপর আলোচনা করলে তার আব্বা-আম্মা সবাই মাদরাসায় পড়াতে রাজি হলেন। এমনকি পিতা নিজেই আতিকাকে নিয়ে সুফিয়ার মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন।

চুয়াল্লিশ

সে কতদিন হল ঘুট ঘুটে অন্ধকারে বাড়ি থেকে বের হয়েছে রফিক এখনো আসেনি। নেই কোন চিঠি পত্র নেই খোঁজ খবর। প্রতিনিয়ত হচ্ছে গোলাগুলি, মরছে লোকজন। দিন দিন হাঙ্গামা বেড়েই চলছে। জানিনা হতভাগার ভাগ্যে কি জুটেছে। গভীর রাতের প্রহরে একাকিনী বসে ভাবছে সুফিয়া।

দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে সুফিয়ার অন্তরে বিরহের আগুন ততই দাউ দাউ করে জ্বলছে। কেন এত হতাশা, কেন এত পরীক্ষা, তা ভেবে পাচ্ছে না সুফিয়া। কচি হৃদয়ে কি করে সইবে সে এত জ্বালা? পৃথিবীতে আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা নেই। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক রফিকের সাথে তার শুভ প্রনয় হতে যাচ্ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! তা আর তাকদীরে জোটেনি। সে সময় থেকেই রফিকের প্রতি তার আন্ত রিকতা আরো বেশি গাড়ো হয়ে বসে। সে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটার পূর্বেই তাকে হারাতে হল। অদ্যবধি তার সাথে আর দেখা হল না...... ।

মেঘমুক্ত আকাশ, চাদনী রাত, মৃদুমন্দ দোলা দিয়ে যায় সমীরণ। মহল্লার লোকজন বাড়ির বাইরে খর্জুর তলায় বা আপেল বাগানের পার্শ্বে বসে গল্প করছে। কেউ রশি পাকাচ্ছে আবার কেউ মনের আনন্দে গজল, কাওয়ালী, হামদ-নাত ও ইসলামী সংগীত গাইছে। রাত্রটি খুবই মনোরম খুবই মনমুগ্ধকর পরিবেশ।

সুফিয়া দুজন ছাত্রী নিয়ে পায়চারী করছে বাড়ির বাইরে। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে কখন যে চলে গেল চারণভূমিতে তা কেউ টেরও পায় নি। সুফিয়া বসে গেল বৃদ্ধ সুলাইমানির খর্জুর তলায়। যেখানে বসে রাখাল-খোলোয়ার ও বালক-বালিকাদের ঝগরা মিটাত। বাকি দুজনও বসে গেল সুফিয়ার সম্মুখে। সকলেই যুবতী যৌবন কানায় কানায় ভরা। অপর দুজনের নাম সুরাইয়া ও সালমা। বয়সের দিক দিয়ে ওরা সুফিয়ার চেয়ে ৪/৫ বছরের ছোট। সুরাইয়া আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, সুফিয়া আপা! দেখ দেখ তারকারা আমাদেরকে দেখে মিট মটি করে হাসছে। ওদের চোখেও ঘুম নেই। ওরাও আমাদের সাথে প্রহরের পর প্রহর জেগে থাকবে, আমাদের কথা শুনবে তাইনা সুফিয়া আপা?"

সুফিয়া অন্যমনস্ক ছেলেবেলার স্মৃতিরা এসে হৃদয় আঙ্গিনায় ভীর জমাচ্ছে। অতীতের কত খেলাধুলা, কেচ্ছা-কাহিনী, মান-অভিমান এ মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্মৃতিরা ডেকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে" সুফিয়া আমি সেই বৃক্ষ! যেখানে বসে বিশ্রাম নিতে আর সাথীদের নিয়ে রুটি, গম ভাজা ও ছাতু খেতে। ঝর্ণারা ডেকে বলছে সুফিয়া আপা! আমিতো সেই ঝর্ণা যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি অশ্রু ঝড়াতে ভিরের কারণে পানি নিতে পারনি

বলে। টিলারাও ডেকে বলছে, ওরে রামাল্লা দুহিতা! আমিতো সেই টিলা যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছাগলগুলো দেখতে। ঘাস খেয়ে কত দূর বিচরণ করছে বিস্তির্ণ সবুজ প্রান্তর ডেকে বলছে "ওরে গাঁয়ের মেয়ে সুফিয়া! আমিতো সেই মাঠ যে মাঠে তোমার সাথীরা তোমাকে নিয়ে খেলা করত। ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় আর লতা গুল্ম ওরাও ডেকে বলছে হে সুফিয়া! তুমি না আমাদের আড়ালে মিছামিছি লোকুচুরি খেলতে পা ফসকে পরে যেতে কংকর ময় প্রান্তরে। আকাশ ছোয়া বিটপি বলছে, "ওরে সুফিয়া! তোরা না আমার ছায়ায় বসে একে অপরের মাথার উকুন আনতি। এভাবে অতিতের দিনগুলোর পাতা এক এক করে সামনে আসছে।

সুফিয়ার মুখে ভাষা নেই, হাসি নেই বেরিয়ে আসছে ক্ষনে ক্ষনে দীর্ঘশ্বাস। হৃদয় মিশে আছে এ চারণ ভূমিতে। পশুপাল গুলো ঘাষ খেয়ে খেয়ে হারিয়ে যেতো কোন সুদুরে খেলায় মগ্ন সুফিয়া প্রথমে ঠাহর করতে পারেনি। যখন খেয়াল হত তখন মেষপাল না দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওড়না ভিজাত। রফিক খেলা ছেড়ে দৌড়িয়ে গিয়ে তালাশ করে পশু গুলো ফিরিয়ে আনত। সুফিয়া যে সব বৃক্ষের মগডালে চুপটি করে লুকিয়ে থাকত, আর কেউ কাছে গেলে ভয় দেখাত, সে বৃক্ষগুলো আজো স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ চারণভূমির দৃশ্যগুলো এখনো অম্লান হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু নেই রফিক-রফিকা, আতিক-আতিকা, সুফিয়ান, নাজমা, সালমা, মাহমুদ-মাহমুদা, তৈয়্যব-তৈয়্যবা, শিরিন, জসিম, রোকেয়া ও জুলেয়খারা। এদের মধ্যে কেউ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে(পরপারের যাত্রি হয়েছে) কেউ একমুঠো অন্নের সন্ধানে দূরদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। কেউ সংসার সাজিয়ে সংসার করছে। আবার কেউ কেউ প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এটাই কি দুনিয়ার চিরাচিরিত নিয়ম? এমনিভাবেই কি স্মৃতি রাজ্যের স্মৃতিগুলো মুছে যায়? এটাই কি মহান প্রতিপালকের অমোঘ বিধান? এমনই কি পরিবর্তনশীল দুনিয়ার খেলা। এসব ভাবছে সুফিয়া। আনন্দঘন পরিবেশে যেন নিরানন্দ ঝরো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নিরব নিথর পৃথিবী, বাকহীন মুখ আর সুরহীন গান। সালেহা মেয়েটা খুবই চঞ্চল নিশ্চুপ থাকতে পারেন ও একটা কিছু বলতে হবে ওর বা শুনতে হবে সে

আস্তে আস্তে সুফিয়ার বিন্নিটা টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করল” কিগো আপা হুজুর! অমন করে নিশ্চুপ বসে...। দু একটা কেচ্ছা কাহিনী শুনাননা? আপনি না অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জানেন। আজ একেবারে বোবা বনে গেলেন? ” সুফিয়া বিন্নিটি ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে বক্ষদেশে স্থাপনপূর্বক বলল, “সব সময় কি কেচ্ছা কাহিনী বলা যায়? আসছিলাম বুকের জ্বালা ঠান্ডা করতে এ চরণ ভূমিতে কিন্তু হল কৈ আরও দ্বিগুন বেড়ে গেল।

সালেহাঃ আপা হুজুর ইদানিং মরিচ বেশি খাচ্ছেন নাকি? মরিচ খাওয়া তো খুবই ক্ষতিকর। সুফিয়া একটু বিরক্ত হয়ে বলল কবে দেখেছিস আমি জন্মের মত মরিচ খাই মরিচের গন্ধ পর্যন্ত নিতে পারি না।”

সালেহাঃ তাহলে বুক জ্বালা পোড়ার কথা বলছেন যে?

সুফিয়াঃ তা বুঝবি না আর একটু পাকলে বুঝবি।

সালেহা নাছোর বান্দা কেচ্ছা কাহিনী শুনবেই সুফিয়া একটু বিরক্ত ভরে বলল এ চারণ ভুমির আত্ম-কাহিনী বড়ই মর্মান্তিক, বড়ই বেদনাদায়ক, আর হৃদয় বিদারক। সুফিয়া বলছে আর বাকি দুজন মন দিয়ে শুনছে। বলার ফাকে ফাকে সুফিয়ার বক্ষদেশ ভেঙ্গেচুড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আর হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। মনে হয় এ তপ্ত শ্বাসে তামাম দুনিয়া জ্বলে পুরে ভস্ম হয়ে যাবে।

সুফিয়ার কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রেমের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সালেহা ও সুরাইয়া বিদ্যুৎ চমকানির ফাঁক ফোকরে যা সংগ্রহ করার তা করে নিচ্ছে।

সুরাইয়াঃ আপা হুজুর! যে রফিক আপনার ছাগল দুর থেকে তাড়িয়ে আনতেন ভীড়ের মধ্য দিয়ে ছাগলের পানি সর্বারাহ করতেন পথ ভোলা মেষগুলোকে বাড়ি বাড়ি তালাশ করে আপনার খোয়ারে তুলে দিতেন নিজের আহার্যগুলো আপনাকে নিয়ে খেতেন তিনি কি পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানীর জ্যাষ্ঠ পুত্র?

সুফিয়াঃ হ্যাঁ তার কথাইতো বলছি।

সুরাইয়াঃ লোকমুখে শুনেছি তিনি আজ কাল অনেক বড় মুজাহিদ হয়েছেন। তার কথায় নাকি শত শত ছেলেরা জান দিতে প্রস্তুত। তাকি আপা সত্যি? সুফিয়াঃ সত্য হবে না কেন তিনি তো পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের

অন্তর্গত দারুল উলুম হাক্কানীয়া মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে আর এক বৎসর জিহাদের ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন। তারাই হাদীসের উস্তাদ শাইখুল হাদীস আল্লামা আঃ হক্ক হাক্কানী সাহেবও বড় মুজাহিদ। তিনি ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলক জিহাদের প্রশিক্ষণ করেন। কেউ যদি জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অনীহা ভাব দেখায় তাহলে তার রক্ষা নেই। তিনি বলেন" আমরা নামাযের মাসআলা পড়াই তার সাথে সাথে প্রশিক্ষণও দেই। ঠিক তেমনি জিহাদের মাসআলা পড়াই কিন্তু তার ট্রেনিং হুজুররাই জানেন না। হুজুর (সাঃ) জিহাদের মাসআলা পড়াতেন জিহাদের ময়দানে। আর আমরা জিহাদের মাসআলা পড়াই হাটুগাড়া নদীতে আর ফ্যানের নিচে বসে। এ কারণেই আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অপমান, বেইজ্জতি ও জিল্লতির বোঝা। কোন ছাত্র যদি কোন ট্রেনিং না করে তবে সেদিন তার খানা বন্ধ রাখা হয়। তিনি বলে জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া, নামায, রোযা, হজ্জ যাকাতের মতই ফরয। সুতরাং প্রত্যেকেরই ট্রেনিং নিতে হবে। হাক্কানী সাহেবের তত্তাবধানে ও নেগরানীতে রফিক ভাইয়া পাক্কা ট্রেনিং নিয়ে আসছেন।"

সালেহাঃ সুফিয়া আপা হুজুর আমি তো উনাকে দেখেছি। ইস কি সুন্দর পুরুষ তিনি! দাদুর সাথে মসজিদে এসে উনার বয়ানও শুনেছি। যদিও আমি তেমন একটা বুঝতামনা। উনার বয়ান শুনে বড়দেরকে কাঁদতে দেখেছি। এমনকি যুবকরাও হয়রান পেরেশান হয়ে যেত। সুফিয়া আপা! আপনার জন্য উপযুক্ত পাত্রটাই তিনি। এমন লোক সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না তিনি আমাদের গৌরব দোয়া করি আল্লাহ্ তাঁকে যেন আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনেন। প্রাণ ভরে দেখব তিনি আসলে আমরাও কিন্তু সবক পড়ব তাঁর কাছে কুদুরী আর তরমাজাতুল কুরআন পড়ব। এ দুটি ঘন্টা উনার নিকট দেবেন আপা?"

সুফিয়া সাদা ধবধবে দাঁতগুলো বের করে অধরে মিষ্টি হাসির রেখা টেনে বলল "এ দুটি কেন যত পারিস তত কিতাবই পড়িস। এতে মানা কিসের? ভাল আলেমের কাছে পড়বি তো ভাল আলেমা হবি।"

ওদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সালেহা বলে উঠল দেখতো আপা ওগুলো কিসের বাতি! মনে হয় গাড়ী আসছে। এত রাতে আসবে কি করতে? না কেন.....। বাকিরা হতচকিত অবস্থায় বিস্ফোরিত নেত্রে ওদিকে তাকাল। গাড়ী যদি হয় তবে একটা নয় তিনটা গাড়ী লাইটের ফুকাসে গাড়ী বলেই মনে

হচ্ছে। তবে কেন এত রাত গভীর রাতে এদিকে গাড়ী আসবে তা প্রশ্ন জাগল সবার মনে। সুফিয়া আলোর ঝলকে বিপদ সংকেত ও অশুভ লক্ষণ মনে করল। তাই দুজনকে হুশিয়ার করে বলল "আজ মনে আমাদের মহল্লার উপর দিয়ে রুশী হায়েনাদের পক্ষ থেকে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এতে প্রাণ হানির আশংকা রয়েছে যথেষ্ট। চল জলদি চল গ্রামবাসিকে সতর্ক করে দেই, আর আমরাও প্রস্তুতি নেই।" এ বলে সুফিয়া দুজনকে নিয়ে পল্লীর দিকে দ্রুতগতিতে চলে গেল। আঁকা-বাঁকা সরুপথ। গাড়ী খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছে। সুফিয়া অনেক আগেই পৌঁছে গেছে মহল্লায়। সর্দারজীকে গাড়ী আগমনের সংবাদ জানালে তিনি বললেন মা চিন্তা করিসনে আমাদের গ্রামরক্ষী বাহিনী টের পেয়েছে। সবাই স্থানে স্থানে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। পল্লীবাসীরা খুবই সতর্ক আমাদের যে কয়টা আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তা ছাড়াও দাও, লাঠি, খন্ত া, শাবল, বল্লম, ছুড়ি নিয়ে যুবকরা তৈরি হয়ে আছে।

সুফিয়া সস্তির নিঃশ্বাস নিঃসরণ করে ছুটে গেল মাদরাসায়। ছাত্রীদেরকে জড়ো করে বলল তোমরা মাদরাসায় অবস্থান না করে মহল্লার বাইরে উন্মুক্ত মাঠের দিকে চলে যাও এবং একজন দুজন করে নিচু স্থানে বা খাদে বসে থাকবে বা যমিনে শুয়ে পরবে। আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরন করবে। এ বলে সবাই সবাইকে মাদরাসার বাইরে পাঠিয়ে দিল। আর বাকি ৮জন তরুণীকে নিয়ে সোজা চলে গেল লুকিয়ে রাখা অস্ত্র আনতে গোরস্তানে। এতক্ষণে রাশিয়ান ফৌজ মহল্লা ঘিরে ফেলেছে। মাওলানা আক্রামের নেতৃত্বে স্বশস্ত্র ক্ষুদ্র একটি দল পরিচালিত হচ্ছে অন্যান্য যুবকদের দিয়ে ১০জন ১০জন করে এক একটি গ্রুপ রচনা করেছেন। এদের কাছে রয়েছে গ্রাম্য হাতিয়ার।

রাশিয়ান সৈনিকরা গোপনসুত্রে সংবাদ পেয়েছে যে মাওলানা রফিকের বাড়ী এ মহল্লায় এবং এখানকার মহিলারা পর্যন্ত অস্ত্র চালাতে জানে। তাই তাদেরকে দমন করার জন্যই কার্ণেল ক্লিউয়ারের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হচ্ছে। এদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন ওরা প্রথমেই ফায়ার করেনি চেয়েছিল বেছে বেছে কিছু নারী পুরুষ গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে আসবে। ওরা প্রথমেই মহিলা মাদরাসায় হানা দেয় কিন্তু কোন ছাত্রী পায়নি। অবশেষে মাওলানা রফিকের বৃদ্ধ মাতাকে প্রশ্ন করে জানতে চায়

যে ছাত্রীরা কোথায়? বৃদ্ধা উত্তর দিলেন" ছাত্রী মাত্র দশবারজন কেউ কেউ বাড়ি থেকে আসে আর কয়েকজন আবাসিক। পরীক্ষা হয়ে গেছে কালকে। বর্তমানে মাদরাসা বন্ধ ছাত্রীরা যার যার বাড়িতে। আপনারা ওদেরকে খোঁজছেন কেন? কাফের বেঈমানরা রাগে কটমট করে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত হানে। বৃদ্ধা আঘাত প্রতিহত করতে না পেরে এক চিৎকার দিয়ে যদিনে লুটিয়ে পরে। মাওলানা আক্রাম অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের তান্ডবলীলা অবলোকন করছিলেন বৃদ্ধার গায়ে হাত তোলা তিনি বরদাশত করতে না পারায় গুলি করার নির্দেশ করেন। আরম্ভ হল তুমুল লড়াই। প্রথমে কর্ণেল সহ ৪জন নিহত হল। কোনদিক থেকে গুলি আসছে তা ওরা বুঝতে পারেনি। তাই এলাপাথারিভাবে গুলি ছারতে লাগল। মহল্লার শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের মধ্যে ৭জন শাহাদাত বরণ করেন এবং ৩/৪জন আহত অবস্থায় যমিনে ছটফট করতে থাকেন। এ করুণ দৃশ্য দেখে পল্লীবাসীদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন ধাও ধাও করে জ্বলে উঠল। যার কাছে যা আছে তা দিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল। জনগনের পিটুনিতে আরও কয়েকজন সৈন্য প্রাণ হারায়।

সুফিয়া বাহিনী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মহল্লা থেকে বেশ দূরে এক উপত্যকায় ওৎ পেতে বসে থাকে। রুশীরা লড়াইয়ে টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। ওরা যাওয়ার পথে তাদের সৈনিকদের লাশ ও অস্ত্র নিয়ে যেতে পারেনি। ওরা যখন গাড়ি নিয়ে ভাগতেছিল সুফিয়ার বাহিনী তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। আক্রমনতো এমন আক্রমণ নয়। সুফিয়া বাহিনীর আক্রমণ রাইফেলের গুলির আঘাতে চাকা ব্রাস্ট হয়ে অকেজো হয়ে গেল। আহত সৈনিকরা সারিগানের মত কান্না জুড়ে দিল। অন্যেরা গুলাবৃষ্টি বর্ষন করতে লাগল। সুফিয়া বাহিনী হঠাৎ হঠাৎ ফায়ার করে তাদের প্রতিটি ফায়ারেই একজন একজন করে দুশমনের জীবন শেষ হতে লাগল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ফায়ারের পর দুশমনের গুলা ফুরিয়ে এল। সুফিয়া বাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে জিবীত সৈন্যরা অস্ত্রসহ একসাথে জমা করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোম ফাটিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। আহতদের মধ্যে বেশ কজন সুফিয়ার হাতে নিহত হয়। আর বাকী ৪/৫জন ক্রলিং করলে সুফিয়ার হাতে বন্দি হয় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তারপর তাদের থেকে

অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এতে নিজ গ্রামের দু তিনজন ব্যক্তির নামও উল্লেখ করে। মুনাফেকরা মোটা অংকের টাকা পেয়ে ইসলামের বিরোধিতায় নেমে যায়। এদের মধ্যে তিনজনই হল মেয়েলোক। সুফিয়ার বাহিনী তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহের পর তাদেরকে ব্রাশ ফায়ারে তাদের শরীর ঝাঝরা করে দেয়। অতঃপর সুফিয়া আল্লাহর শোকর আদায় করে সকলকে লক্ষ্য করে বলল "হে আমার প্রিয় সখীরা! তোমাদেরকে জানাই মোবারকবাদ। আর সফল অভিযানের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি মহান রাব্বুল আলামীনের। হে আমার সাথীরা! তোমরা আনন্দে আত্মভোলা হয়োনা। এখন বেশী বেশী তওবা এস্তেগফার পড়। এটাই কুরআনের নির্দেশ। এ বিজয় আমাদের নয়, এতে আমাদের ফখর করার কিছু নেই। আল্লাহর নুসরত আর মদদ যদি শামেল না হত তবে আমাদের দ্বারা কিছুই হত না। তাই প্রশংসা সবই আল্লাহর।। হে আমার বান্ধবীরা মুনাফেকদের তালিকা তোমাদের স্পষ্ট। এদের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সে পরামর্শ চাই। ঠান্ডা মাথায় পরামর্শ দাও।"

সুরাইয়া একজন ফিল্ডমাষ্টারের মত দাঁড়িয়ে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলল আপা হুজুর! এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হল যার যার ভাইকে সে-ই হত্যা করবে। আর তা বিলম্বে নয় এ রাতেই। সালেহা ও রোকেয়া বলে উঠল ধন্যবাদ সুরাইয়াকে। আমাদের ইচ্ছাও তাই। সুফিয়া তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলল, "দেখ যা বলছ তাই হবে কিন্তু তোমাদের মাতা-পিতা যেন জানতে না পারে। জানলে ফেতনা হবে। এ বলে গনীমতের অল্পকয়টা অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে মহল্লায় ফিরে আসে।

পঁয়তাল্লিশ

মাওলানা রফিক গণীমতের অস্ত্র-শস্ত্রসহ গিয়ে পৌছলেন মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের মুর্চায়। আসলে মোর্চাটি মুজাহিদ রচিত নয়। এটা খোদা প্রদত্ত বিশালাকারে গিরিকন্দর। এটাকেই সাফাই করে ঘরে মেজে মোর্চা হিসেবে ব্যবহার করছেন।

মাওলানা রফিককে পেয়ে মোর্চার মুজাহিদরা নারা লাগিয়ে খোশ আমোদ জানাল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল। হাক্কানী সাহেব তখন মোর্চায় ছিলেন না। বেলা ডোবার বেশি বাকি নেই। রক্তিম আভা ছরিয়ে দিচ্ছে। পাশ্চিমের পাহাড়ের ছায়া প্রলম্বিত হয়ে মোর্চার পাহাড় পর্বত পর্যন্ত পৌছে গেছে। মাগরীবের নামাযের তৈরি নিচ্ছেন মুজাহিদগণ। সকলেই একটি করে চর্ম নির্মিত মশক বা কেন্টিনার নিয়ে ঝর্ণার দিকে যাচ্ছে। অযু করে মশক ভর্তি পানি নিয়ে মোর্চায় ফিরবে। মাওলানা রফিকও ওদের সাথে যাচ্ছেন। কেউ যাচ্ছেন কেউ আসছেন। অল্প সময়ের মধ্যে অযু করে সকলেই মোর্চায় ফিরে আসছেন। ৪জন মুজাহিদ ৪কোনায় দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। অন্যরা মাওলানা রফিকের পিছনে নামায আদায় করেছেন।

নামায সমাপন করে সকলেই ইস্তেমায়ী আমলে অর্থাৎ খতমে সূরা ইয়াসীন ও ওয়াকেয়া, খতমে দোয়ায়ে ইউনুস, দুরুদ, এস্তেগফার ইত্যাদি আমলে বসে গেল চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন যে হে আল্লাহ! আমরা বড়-গুনাহগার। তোমার অনেক ফরয বিধান লঙ্ঘন করছি। অনেক সুন্নতকে কতল করছি। নাফরমানীর সীমা পেরিয়ে গেছি। আয় আল্লাহ! তুমি গাফফার, সাত্তার, রাহমান, রাহীম। অতএব আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও। ওগো দয়ার সাগর, করুণার আধার, রাহমানুর রাহীম! আমরা ঈমান আমলের দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। আমরা নিরস্ত্র আর আমাদের প্রতিপক্ষ সশস্ত্র। তোমার মদদ আর সাহায্য ছাড়া এক কদম অগ্রসর হতে পারব না। অতএব আমাদেরকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে লক্ষ লক্ষ রুশী পবিত্র আফগান ভুমিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ওরা ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিয়ে কমিউনিজম অর্থাৎ কুফরী মতবাদ চালো করতে চায়। আফগানিস্তাকে কবর স্থান বানাতে চায়। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ওয়াদা করে বলছি, আমাদেরকে বিশ্বের পরিশক্তি রাশিয়ার উপর বিজয় দান করলে আমরা পবিত্র কুরআন হাদীস অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করব। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করব। আয় আল্লাহ! এটা আমাদের ওয়াদা, পাক্কা ওয়াদা। এভাবে তাদের মোনাজাতের সমাপ্ত করলেন।

রাত আটটা বেজে কয়েকমিনিট। এখনো নামায পড়া ও খানা হয়নি। পরদিন কে কি কাজ করবে সে ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে কমান্ডার জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেব হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আলামীর উচ্চ পর্যায়ে দুজন কমান্ডার মাওলানা আর সালান খান রুহানী ও নসরুল্লামনসুর লেংড়িয়ালকে নিয়ে মুর্চায় তাশরীফ আনেন। ইতোপূর্বে এ দুজন মহান নেতাকে এখানকার কেউ দেখেনি কিন্তু এদের নাম শুনেনি এমন লোক আফগানিস্তানে নেই বললে ভুল হবে না। মুর্চার অন্যান্য সাথীরা এস্তেকবাল করতে এগিয়ে যান। মুর্চার সাথীরাও দাঁড়িয়ে মুসাফা ও মুয়ানাকা করতে লাগলেন। কৌশল বিনিময় পর্ব শেষে মাওলানা আরসালান খান রাহমানী হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বলেন। সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে গেলেন। মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী দাঁড়িয়ে মেহমানদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "হে মুজাহিদ বন্ধুরা! আমাদের মাঝে আজ এমন দুজন মহান অতিথি তাশরীফ এনেছেন, তাঁদের পরিচয় দেয়া নগণ্যের পক্ষে অসম্ভব। আমি যতই বলিনা কেন তাঁদের মর্যাদা আল্লাহপাকের কাছে অনেক বেশী। কাজেই তারীফ করে তাঁদেরকে খাটো করতে চাই না। তবে এতটুকু জেনে রেখ এ দুজন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী আলমীর জানবাজ কমান্ডার আমার ডান পার্শ্বের হযরত হলেন মাওলানা আরসালান খান রহমানী, আর আমার বাম পার্শ্বের যাকে দেখছ তিনি হলেন কমান্ডার নাসরুল্লাহ মনসুর লেংড়িয়াল। এদের নাম শুনলে রাশিয়ান ফৌজের পেশাব বেরিয়ে যায় প্যান্টের চেইন খোলার সময় পায় না। আমার বিশ্বাস এ ধরনের মহান ব্যীক্ত বর্গের কুরবানী আল্লাহ বিফলে দিবেন না। অচিরেই তোমরা আফগানিস্তানে কালিমা খচিত বিজয় নিশান উড়তে দেখবে। এখন তোমাদের মহামূল্যবান নসিহতে ধন্য করবেন আমাদের মুয়াজ্জাজ মেহমান, মাওলানা আরসালান খান রাহমানী।"

মাওলানা রাহমানী সাহেব সালাম ও হামদ নাতের পর বলেন, "হে আমার প্রাণ প্রিয় নবীন মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা বিভিন্ন মায়ের সন্তান। আসছ বিভিন্ন খিত্তা থেকে। তোমাদের চেহারায়ও রয়েছে ভিণ্নতা। মেজাজেও আছে পৃথকতা। চিন্তা চেতনায় শিক্ষা দিক্ষায় ও কৃষ্টি কালচারেও রয়েছে পার্থক্য। মনে রেখ দ্বীনের ব্যাপারে সবাই এক ও অভিন্ন। নবী যুগে

ফিরে গেলে দেখবে বিভিন্ন দেশের লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। কিন্তু কালিমার ছায়া তলে এসে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়েছেন। আমরা যখন নামায আদায় করতে মসজিদে কাতার বন্দি হই তখন যে যেখানে স্থান পাই সেখানেই দাঁড়াই। কে আগে কে পিছনে কে ডানে কে বামে কে তার পার্শ্বে এগুলো বিচার করি না বা করাও ঠিক না। একজন আলেমের পার্শ্বে এসে কুলি দাঁড়াচ্ছে। পীর সাহেবের আগে রিক্সাওয়ালা দাঁড়াচ্ছে। মন্ত্রির পার্শ্বে দাঁড়াচ্ছে দিনমজুর। এতে আমরা খারাপ মনে করি না। এ ব্যাপারে আমরা অভেদ জ্ঞান করি। কিন্তু যিনি ইমাম তার সামনে বা তার বরাবর দাঁড়ানোর শরীয়ত এজাজত দেয়নি। সে চাই মন্ত্রী চাই প্রেসিডেন্ট হোক। ঠিক তেমনিভাবে জিহাদ একটি ফরয ইবাদত। এখানে সবাই সমান। তবে যাকে আমীর বানানো হয় তিনিই ইমাম বা নেতা তাকে মান্য করাও ফরয। নামাযে যদি মুসুল্লীগণ ইমামের অনুস্মরণ না করে তবে মুসুল্লীদের নামায হয় না। তাছাড়া ইমামের আগে পিছেও নামাযের আরকানগুলো আদায় করা যায় না।

ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের ময়দানে আমীরের হুকুম বা কমান্ড মানা অথবা অনুসরণ করা ফরয। তা না হলে তার জিহাদ, তার আত্মত্যাগ আল্লাহর কাছে গ্রহণ করা হবে না। ইমাম যদি অল্প শিক্ষিত, কাল, গরীব, খাট, চিকন ও একেবারে নিম্নমানের পোষাক পরে মুসল্লায় দাঁড়ায়, আর তার পিছনে মাওলানা, মুফতী, মুহাদ্দীস, পীর, মন্ত্রী-মিনিস্টা ও প্রেসিডেন্টও দাঁড়ায় আর যদি ইমামের দুর্বল দিক গুলোর প্রতি নজর করে দু এক জায়গায় অনুস্বরণ না করে তবে কি ওদের নামায হবে? না কক্ষনো না।

ঠিক তেমনিভাবে কমান্ডার বা আমীর যদি অশিক্ষিত, মুর্খ, কাল, গরীব ও নিচ বংশীয় হয় আর সাধারণ সেপাইরা যদি উচ্চ শিক্ষিত, সুন্দর মোটা ও সৈয়দ বংশের হয় তবু কমান্ড না মানলে তাদের জিহাদ কবুল হবে না। তিনি আরো বলেন–

"হে আমার মুজাহিদ সাথীরা! আফগানিস্তানে ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে রয়েছে অনেক ভিন্নতা যেমন ভাষার দিক দিয়ে রয়েছে পুশতন, তাজিক, হাজারা, উজবেক, আইমান, পার্সিয়ান, তুর্কমেন, বালুচী ও নুরস্ত ানী এসব ভাষা ভাষির লোকদের মধ্যে রয়েছে গোত্রিয় ব্যবধান। তারা

পৃথক পৃথক জামাতে ও বিভিন্ন সাংগাঠনিক নাম নিয়ে জামায়েতে হয়ে জিহাদের কাজ করছে। যদিও সংগঠনের নাম পৃথক আসলে কাজ সকলেরই এক। সবাই রুশী খোদাও রুশী হত্যার কাজে নিয়োজিত। কাজেই একে অপরকে নিন্দা করবে না। যেমন তোমাদের মোর্চায় রয়েছে, আবদুল করিম, আবদুল রহিম, আবদুল মান্নান, আবদুল হান্নান, ওমর, বকর ও খালেদ, সবাই এক মায়ের সন্তান নয়। এক ধরনের চেহারা নয় কিন্তু কাজ সবারই এক। ঠিক তেমনিভাবে সংগঠন ভিন্ন, নেতা ভিন্ন কিন্তু কাজ এক। ইখতেলাফ করো না ইখতেলাফে অনেক জনপদ বিরান হয়ে গেছে। জিহাদের ময়দান হল ঐক্যের আরাফাত। হে আমার নবাগত মুজাহিদ বন্ধুরা-

তোমরা আসছ আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করতে। আল্লাহর রাহে জীবন উৎস্বর্গ করাকে কুরবানী বলে। দেখ কুরবানী বহু কঠিন জিনিস। একটি পশুর গলায় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ছুরি চালিয়ে গলা কেটে দেয়াই কুরবানীর শেষ না। দম বের হওয়ার পর চারটি ঠেং এর নলার চার দিক থেকে ফারে। ঠেং ও গলা থেকে লেজ পর্যন্ত গলা চিরে। তারপর ছুরি দ্বারা চামরা খুলে। অতঃপর হাড়-গোশত আলাদা করে টুকরো টুকরো করে। এতেই কিন্তু কুরবানী শেষনা। তারপর হাড় গোশত একত্র করে লবন মসলা দিয়ে পাতিলে সিদ্ধ করে। তারপর ৩২টি দাতের সাহায্যে চিবিয়ে উদরস্ত করে।

প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের কুরবানীও তদ্রুপ। আমরা মারব, মরব, বন্দী হব, জেল-জুলুম, নির্যাতন সইব। পঙ্গুত্ব বরণ করব, ভয়, ক্ষুধা, অনিদ্রা হবে আমাদের নিত্য দিনের সাথী। হতে হবে ঘরছাড়া, বাড়ি ছাড়া, পিতা,মাতা সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন। এগুলো মাথা পেতে অম্লান বদনে মেনে নিতে হবে। জান নিয়ে ময়দানে চলে আসা খুবই সহজ কিন্তু মাল.....। আল্লাহ তাআলা জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করতে বলেছেন। তাই তোমরা আগামীতে জানের সাথে যথাসাধ্য মালও নিয়ে আসবে। আর অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবে।

প্রিয় বন্ধুরা! বাদশাহ যদি গোলাম নিতে চায় আর কেউ বাদশার গোলাম হতে চায় তবে উত্তম রুপে গোসল করে, গায়ে তৈল মেখে, চোখে

সুরমা লাগিয়ে, চুলগুলো ভাজ করে, ভাল খুশবু মেখে সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরে বাদশার কাছে বিনয়ী হয়ে হাজির হতে হয়। এমতাবস্থায় হতে পারে বাদশার নজর কারবে। আর যদি চোখে কেতর লাগিয়ে মাথায় ঝটা, নাকে শ্লেস্মা, ১২ বৎসরের ময়লা কাপড় গায়ে ও দুর্গন্ধ পোষাক পরে বাদশার কাছে হাজির হয় তবে চাকুরী তো দুরের কথা গুতো গুতোর উপর খেয়ে জান হারিয়ে ফিরতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে তোমরা যদি চাও আল্লাহর সর্বোত্তম নেয়ামত শহীদি শুরা পান করতে হুরদের সংগী হতে বেহেশতে বিচরণ করতে তাহলে তোমরাও যাবতীয় গুনাহ থেকে পাক ছাফ ও পবিত্র থাকবে। তওবা ইস্তেগফারের সাবান দিয়ে দৈনিক শতবার গোসল করবে। এবাদত বন্দেগীর সুঘ্রান মেখে সুন্নতের দামী পোষাক পরে ময়দানে এসে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাক। চোখের তপ্ত পানিতে পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত কর এবং বল হে আল্লাহ! তুমিতো বলেছ মুমিনের জান জান বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছ। বান্দাহ জান নিয়ে হাজির। তোমার জান তুমি নাও আমার বেহেশত আমাকে দাও। এভাবে কান্নাকাটি করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের জানকে কবুল করবেন।

হে আমার অতি আদরের মুজাহিদ দোস্তরা! পরস্পর ঝগড়া করো না, মুমিনকে গালি দিয়োনা, ঝগরা হতে পারে এমন কোন কাজ করো না সন্দেহমূলক কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। হিম্মত হারা হবে না। কোন একটি কাজের জন্য বার বার চেষ্টা করতেই থাক। একদিন কামিয়াবি তোমার পদচুম্বন করবে। যবানের হেফাজত কর যবানের হেফাজত কর বেহুদা কেচ্ছা কাহিনী, গল্প-গুজব করা ও কাল্পনিক উপন্যাস পড়া পরিহার করে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে মন দাও। অনেক যুবক রয়েছে কাল্পনিক উপন্যাস পড়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দেয়। আফসোস সেসব যুবকের প্রতি। ওরা যদি রাতকে রাত আল্লাহ আল্লাহ বলে কাটিয়ে দিত তবে কতইনা উত্তম হত। ঐপন্যাসিকগণ নিজের কল্পনাকে বাস্তবের সাথে এনে মিসিয়ে দেয়। সত্যের চালনা দিয়ে চাললে কি থাকবে তা নির্নয় করা মুশকিল।

হে প্রিয় বন্ধুরা! আসমান যমিন, চন্দ্র সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্র থেকে অনেক বড় মানুষের দিল। সে দিল থেকে গায়রুল্লাহকে পদাঘাত করে দূরে সরিয়ে আল্লাহকে স্থান দাও আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করে করলে গায়রুল্লাহ দূর

হয়ে যায়। আল্লাহ আসেন নিকটে। তাই বেশী বেশী যিকির কর। হে প্রিয় মুজাহিদ সাথীরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে পারলে আল্লাহ গায়েবী ভাবে তোমার কাজ সমাধা করে দেবেন। আছলেহার (অস্ত্র) প্রতি ঈমান এনো না, ঈমান রাখ আল্লাহর উপর। তবে অস্ত্রের দরকার খুব বেশী বটে, কিন্তু অস্ত্র দিয়ে দেশ জয় করা যায় কিন্তু মন জয় করা যায় না। তাই অস্ত্রই শক্তি অস্ত্রই সবকিছু এমন ধারনা থেকে দূরে সরে থাক। প্রিয় বন্ধুরা! মিথ্যা অহংকার, তাকাব্বুরী, কৃপনতা, প্রবণতা, রিয়া, মুনাফেকী এসব সিফত পরিত্যাগ করে ভাল ভাল সিফতের মালিক হও। তখন দেখবে তোমার ঈমানী, রুহানী, জিছমানী ও আধ্যাতিক শক্তির ক্ষমতা কত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ শক্তিকে পরাজিত করার মত কেউ নেই এ পৃথিবীতে। আল্লাহ কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এতটুকু বলে জামালুদ্দিন হাক্কানীর নেতৃত্তে অর্থাৎ ইমামতিতে বাকিরা নামায আদায় করলেন।

ছেচল্লিশ

রামাল্লা পল্লীর ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া। কেউ হারিয়েছে তার জীবন সংগী স্বামীকে। আর কেউ হারিয়েছে গর্ভধারীনী মাতাকে কেউ হারিয়েছে ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবকে। অনেক মা হারিয়েছে তার কলিজার টুকরা নয়নের মনি ও বুকের ধন সন্তানকে।

এতিমের কান্না, সন্তানহারা জননীর চিৎকার, স্বামীহারা রমনীর আর্তনাদ ও স্বজন হারাদের বিলাপে গোটা পল্লীটা প্রলয়ংকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারো মুখে হাসি নেই, আছে শুধু মার্সিয়া চিৎকার। একখন্ড আবর এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদের কিরণ মনে হয় চাঁদ ও তারারা শোক প্রকাশ করছে। নিস্প্রভ হয়ে গেল যমিনের প্রভা। কার লাশ কোথায় আছে কে কোথায় পরে মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে তা দেখার জন্য কিছু লোক মশাল হস্তে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। মশালের আলোতে আপনজনকে খুঁজে বের করছে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিচ্ছে। সুরাইয়া, সালেহা ও

রোকেয়া মুনাফেকদের ফায়সালার জন্য কুকুর তাড়ি ও শশক শাবকের মত পুরা মহল্লা চষে বেড়াচ্ছে। যে মোনাফেকদের আহ্বানে রুশীরা এসে কিয়ামত লিলা সংঘটিত করল। এদের জিবীত রেখে স্বস্তির সিশ্বাস নেয়া যায় না। অর্থাৎ শতাধিক জনতার প্রাণহানি তা এত সহজে মেনে নেয়া যায় না। প্রলয় কান্ড ঘটিয়ে পাপিষ্ট, নরাধমরা কোথায় লুকোচ্ছে তা খুজে বের করতে হবে। কথাগুলো বলছিল সুরাইয়া।

এদিকে আমর ,খলীল ও পারভেজ সাওদান মহল্লা থেকে একটু দূরে খেজুর বিথিকার অন্তরালে বসে আলাপ করছিল। সুরাইয়া মুনাফেকদের কে আহত ও নিহতদের মধ্যে তালাশ করে না পেয়ে মনে মনে ভাবছে, পাষন্ডরা হয়হ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। না হয় কোথাও লুকিয়ে আছে। অকস্মাত সুরাইয়্যার দিলে উদয় হল খর্জুর বিথিকার কথা। ওরা ৩ জন প্রায়ই ওখানে বসে গল্প-গুজব করতে দেখা যেত। সময়ে অসময়ে ও খানেই বসে কাটাত বেশী সময়। তাই বাগানেখোঁজ নেয়ার জন্য সুরাইয়্যা ওদিক যাচ্ছে। পেছন থেকে সালেহা ডেকে জিজ্ঞাসা করছে, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন আপা? আমরাও আসব?" "না তোমাদের আসতে হবে না। একটু ওদিক থেকে ঘুরে আসি, এক্ষুণি ফিরে আসব!" বলল সুরাইয়্যা।

সুরাইয়্যা দ্রুত বিথিকার দিকে এগুচ্ছে। কটি দেশে পিস্তল আর হাতে রিংমুক্ত গ্রেনেড শোভা পাচ্ছে। বাগানের নিকটবর্তী হলে তিনটি ছায়া মূর্তি দৌঁড়িয়ে পালাতে দেখেছে তার বুঝতে বাকি রইল না যে তারা ভয়ে পালাচ্ছে। সে বুদ্ধি করে জোরে জোরে ডাকছে। আমার ভাইয়্যা! অ-আমার ভাইয়্যা! আপনি এখানে আছেন! আমি সুরাইয়্যা আসছি আপনাকে খুঁজতে। আপনার সাথে কথা আছে, জরুরি কথা, কাজের কথা। সুরাইয়্যার কণ্ঠ ওদের নিকট ছিল পরিচিত। তাই তিনজনই ফিরে এসে পূর্বের স্থান দখল করল।

সুরাইয়্যা কৃত্রিম কান্না জুড়ে দিয়ে বলল, "ভাইয়্যা! তুমি এখনো জীবিত আছ? তোমার জন্য পল্লীর ঘরে ঘরে, খিমায় খিমায়, লাশের সারিতেও আহতদের মাঝে কতইনা খোঁজাখুঁজি করছি, আর তুমি বুঝি এখানে। আল্লাহ তোমাকে তোমার বন্ধুদেরসহ এখনো জীবিত রাখছেন। খোদার শোকর, হাজার শোকর এ বলে আর কয়েক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে বড় একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল তিন জনের

মধ্যে। সাথে সাথে বিকট আওয়াযে বিষ্ফোরিত হয়ে তিন তিনটি দেহ ছিন্ন ভিন্ন ও টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সুরাইয়্যা মহান আল্লাহর শোকর আদায় করল। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কগ্রস্ত লোকজন আবার ছুটাছুটি আরাম্ভ করে দিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন কি সুফিয়া বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে জীবন নেয়া দেয়ার জন্য এক পায় খাড়া। সুরাইয়্যা পল্লীর অবস্থা জানার জন্য দৌড়িয়ে মহল্লার দিকে যাচ্ছিল। সুফিয়া বাহিনী ঠিক সে দিকেই পজিশন নিচ্ছিল। এদিকে ধাবমান একটি ছায়া মুর্তি দেখে অনেকেই তাক করে অপেক্ষা করছে। এমন সময় রোকেয়া ও সালেহা ডেকে বলল আরে তোরা কি করছিস! সুরাইয়্যা আপা মনে হয়। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ওদিকে গিয়েছিলেন। মনে হয় জুরুরত সেরে ফিরে আসছেন। সাবধান সন্দেহের ওপর যেন গুলী চালানো না হয়। রোকেয়ার চিৎকারে সুফিয়া বাহিনীর সদস্যরা গুলী চালানো থেকে বিরত রইল। ভাগ্যিস! ভাগ্যের গুণে বেঁচে গেল সুরাইয়্যা।

সুফিয়া বিষ্ফোরণের সিঠিক সংবাদ জেনে অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করার জন্য পল্লীসর্দারের গোচরে দিলে পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী ব্যঘ্রের মত হুংকার ছেড়ে বললেন, "ওহে লোক সকল! তোমরা যেখানে আছ সেখান থেকে সে অবস্থায় আমার নিকট চলে এসো। তোমরা যে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে বিপদাশঙ্কার প্রমাদ গুণছিলে, আসলে তা নয়। ভায়ের কোন কারণ নেই। তোমরা জলদি এখানে চলে আস।

সর্দারজীর কণ্ঠ সকলেরই পরিচিত। সে কণ্ঠের আওয়াজে অনেকেরই স্বস্থী ফিরে এল। ভয় দূর হল, এবার সবাই যার যার স্থান ত্যাগ করে সর্দারের নিকট আসতে লাগল। যুবক, যুবতী, বুড়া-বুড়ি ছেলে মেয়ে সবাই আসছে। অনেক মায়েরা মাছুম বাচ্ছাদের কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। রহিম, আযাদ ও ইজদানরা বড় বড় মশাল জ্বেলে সভাস্থলের অন্ধাকার দূর করল। সকলেই সর্দারজীর চেহারার দিকে এক লোলুপ ভঙ্গিতে ও বিষ্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইল। কে জানে এ মুহূর্তে কি নির্দেশ হয় কি করতে বলনে।

সর্দারজী পল্লীবাসীকে খেতাব করে বললেন, "হে আমার এলাকাবাসী! তোমরা শুনে রেখো, অদ্য রজনীতে রামাল্লার ওপর দিয়ে যে রুশী ঝড়ো

হাওয়া বয়েছে তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্য প্রতিশোধ। আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয করেছেন। তা আমরা লঙ্ঘন করেছি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে জানিয়েছিলেন আল্লাহর সে বাণী,"তোমরা যদি আল্লাহর পথে জিহাদ না কর, তবে অন্য জাতিকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। নবী (সাঃ) নিজেও তাঁর হাদীস শুনিয়ে সতর্ক করছিলেন যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুনাফেকের মৃত্যু হবে। আমরা শত শত আয়াত আর শত হাদীসকে উপেক্ষা করে চলছি। তাই আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে রাশিয়া নামক কুফুরী ফেৎনাকে। হে আমার দেশবাসী! আমরা শরীয়তের শাসন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে গনতন্ত্র রাজতন্ত্র সৈরাতন্ত্র এক নায়কতন্ত্র ও কমিউনিজমকে আকড়িয়ে ধরেছি। কোনদিন খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার ফিকির করিনি। এমন কি আমাদের ধর্মীয় নেতা আলেম-ওলামাগণ ও পীর-মাশায়েখগণও বলেন নি বা এ ব্যাপারে কোন চিন্তাও করেননি। উনারা বহাল তাবিয়তে আছেন নিজ নিজ মসনদে উপবেশন। যেমন পীর সাহেবরা খানকা নিয়ে, ইমাম সাহেবরা মসজিদ নিয়ে, মুয়াল্লিম সাহেবরা মাদ্রাসা নিয়ে, আর মুবাল্লেগ ভায়েরা তাবলীগ নিয়ে। এগুলো কোনটাই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নয়। দ্বীনের শাখা বা জুজ এসব কিছু আমাদেরই করতে হবে। অবশ্যই করতে তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকবে কুফুরী। আর আমরা যুগ যুগ ধরে তা মেনে নেব তা হয় না এর জন্য চাই কুরবানী ও আত্মত্যাগ। বাড়ি যদি নিরাপদ থাকে তবে সে বাড়িতে বসে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে মনে অনেক কিছুই করা যায়। গোটা দ্বীন যদি গালেব থাকে তা হলে অন্যান্ন এবাদতও খুজু-খুশুর সাথে করা যায়। তা না হয় সব এবাদতেই বেঘাত সৃষ্টি হয়। জিহাদ হল দ্বীনের প্রতিরক্ষা। জিহাদ দ্বীনের বেরা, ওয়াল, দেয়াল বা প্রচির। দেয়াল না থাকলে যেমন ঘরের আসবাব পত্রের নিরাপত্তা থাকে না ঠিক জিহাদ না থাকলে দ্বীনের অন্যসব এবাদত ঠিক থাকে না। হে আমার পল্লীবাসী! আমাদের সম্মুখে এর চেয়ে কঠিন মুহূর্ত আসছে। আজকের অবস্থায় ঘাবরিয়ে গেলে চলবে না। দুশমনের বুলেটের আঘাতে মায়ের কোলের দুধ পানকারী সন্তান কেড়ে নেয়ার দৃশ্য অবলোকন করতে হবে। নামাযরত মুসুল্লীদেরকে সেজদারত অবস্থায়

বুলেট বিদ্ধ হয়ে কাঁতরানোর যন্ত্রনা দেখতে হবে। তার চেয়ে আরো কঠিন পরিস্থিতি আমাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হবে। কাজেই এ দৃশ্যগুলো সবেমাত্র আরম্ভ হচ্ছে। তাই বলে হিজরত করে রিপুজী জিন্দেগী বেছে নেয়া, হাত পা গুটিয়ে জড় পদার্থের ন্যায় বসে থাকা হবে নেহায়াত অন্যায়।

আমাদের অসহায় ও দুর্বল নারী শিশুদের উপর জালিমগণ গুলি চালিয়েছে। এরা শহীদ, এরা জান্নাতী, বর্তমানে তাদের মরাদেহ যদিও আমাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের রুহ সপ্তকাশে পারি দিয়ে জান্নাতে চলে গেছে। আমরা আজ এ জন্য গর্বিত যে আমাদের সন্তানরা আমাদের আগে জান্নাতে চলে গেছে। তিনি আরো বলেন যে, রাত পোহালে এলাকার উপর কিয়ামত লিলা নেমে আসবে, কারণ তিনটি গাড়ী সহ ৪০/৫০জন সৈন্য নিহত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এই তো ১১টার খবরে বিবিসি, লন্ডন, বয়েজ অব আমেরিকা ও তেরডি তেহরান থেকে আমাদের সংবাদ পরিবেশন করছে। আমাদের পার্শ্বে হয়ত মুজাহিদরা এ সংবাদটি ওদেরকে দিয়েছে। বা অন্য কোন মুজাহিদরা এ সংবাদটি দুনিয়ায় ছরিয়ে দিচ্ছে। এ সংবাদ শুনে হয়ত আগামী কাল বিমান হামলা চালাতে পারে। কাজেই আমাদের বসে থাকা চলবে না। মোকবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে দু ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র লাশগুলোকে দাফন করা। তোমরা দলে দলে কোদাল শাবল নিয়ে বেরিয়ে যাও, ওদেরতো গোসল দিতে হবে না। তাই ঝামেলাটাও অনেকটা কম। আর মা বোনদের বলছি, আপনারা মহিলা লাশগুলোকে কাফন পরিয়ে দিন, আমরা জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করছি।

সর্দারের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে লোকজন খন্তি, কোদাল, শাবল নিয়ে। মশাল জ্বেলে, কবর খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সবগুলো কবর খনন করার কাজ শেষ হয়ে গেল। সুফিয়া ছাত্রীদেরকে নিয়ে মহিলাদের কাফন পরাচ্ছে আর পুরুষরা পুরুষের। লাশগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখল। পুরুষের সারিতে পুরুষ আর মহিলা সারিতে মহিলা, বালক সারিতে বালক দেরকে একসাথে। অতঃপর জানাযার নামায পড়ে লাশগুলো দাফন করলেন।

সাতচল্লিশ

ভোর হল, মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছেন। মুসুল্লীগণ ছুটে যাচ্ছেন মসজিদ পানে। মাওলানা আক্রাম নামায পড়ালেন এবং শুহাদাদের জন্য শোকাহত পরিবারের জন্য এবং দেশের জন্য মোনাজাত করলেন।

পল্লীসর্দার দাঁড়িয়ে বললেন "প্রিয় মুসুল্লিয়ানে কেরাম আপনারা এক্ষুনি বেরিয়ে পরুন। পল্লীর ঘরে ঘরে জানিয়ে দিন ওরা যেন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও পশুপালগুলোকে পর্বতমালার বিভিন্ন উপত্যকায় নিয়ে যায়। মহল্লায় থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। বিমান হামলার আশংকা করছি। ওদেরকে নিরাপদে স্থানে রেখে যেন খাদ্য-দ্রাব্যও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের হেফাজত করে।

সর্দারের দিক নির্দেশানা পেয়ে মুসুল্লীগণ পল্লীর ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে দিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র লোকজন সাথে সাথে বিবি বাচ্চা ও বুড়া মা বাপদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালাচ্ছেন। কেউ পশুপালগুলো তাড়িয়ে নিচ্ছে। কেউ গাধার পিঠে খাদ্য-দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় মালামাল বোঝাই করে পাহাড়ের দিকে হাকাচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে উজার হয়ে গেল রামাল্লা পল্লী। আহঃ কি করুন দৃশ্য! আপন বাড়ি ঘর ত্যাগ করে বন্য পশুর মত ঝোপে ঝাড়ে আশ্রয় নেয়া। এক বুড়ো পিছন দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বলছে, "হে আমার প্রিয় রামাল্লা! দীর্ঘ ৭০টি বছর তোমার মাঝে বসবাস করে আসছি কোনদিন তুমি রাগ করনি। ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করনি। তোমার বুক চিরে লাঙ্গল চালিয়ে ফসল উৎপাদন করে বাল-বাচ্চ নিয়ে দিন যাপন করেছি কিন্তু কখনো চলে যেতে বলনি। আজ রাশিয়ান ফৌজের নির্মম অত্যাচার সইতে না পেরে তোমার প্রেম আর ভালোবাসা বুকে ধারন করে বিদায় নিচ্ছি। বিদায়ের পথে স্মৃতিরা পা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করছে "হে বুড়ো! কোথায় যাচ্ছ আমাদের রেখে? ফিরে আসবেনা কি আর? স্মৃতিরা চলার পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। ৭০

বৎসরের স্মৃতিদের কি ভোলা যায়? না তা ভুলা যায় না। আবার ফিরে আসব তোমাদের মাঝে। এখন যাই, আলবিদা আলবিদা হে রামাল্লা আলবিদা......। অপর এক অর্ধবয়স্ক কৃষাণ পথে পথে দাঁড়িয়ে বলছে হে রামাল্লা আমার পল্লী মা! দীর্ঘ ৪০টি বছর তোমার কোলে লালিত পালিত হয়েছি পিতা হয়েছি এখন দাদা হয়েছি, তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি। হে পল্লী জননী। তোমাকে রেখে একা পথ চলতে ইচ্ছা হয় না কেবল পা থেমে যায়। আমরা স্বজনদের নিয়ে নিরাপদে যাচ্ছি। আমরা তো ছিলাম তোমার সন্তান চল তুমিও মোদের সাথে।

পল্লীর কণ্ঠ চিরে যেন আওয়াজ বেরিয়ে আসছে হে কৃষাণ! তুমি যাও নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি যাবনা কোনদিন। আমার তৃষ্ণা এখনো মিটেনি শুহাদাদের রক্তে আমার তৃষ্ণা মিটাব। শুহাদাদের তপ্ত খুনে আমি স্নান করব। আমার ভূমি উর্বর হবে শহিদী খুনে। হে পথিক আমি কাপুরুষের মত ভেগে যাওয়া ব্যক্তি নই। ভেগে যাওয়া আমার অভিধানে নেই আমি বুক পেতে কাফিরদের বোমা লইব। বৃষ্টি গুলা সয়ে যাব। লক্ষ কোটি বিস্ফোরনে দগ্ধ হব। হিরোশিমাম ইতিহাসে পুনঃবৃত্তি আবৃত্তি করব। শহিদী খুনে লেখা হবে আমার ইতিহাস। আমি ঝাঝরা হব ক্ষত-বিক্ষত হব। জ্বলে পুরে ভস্ম হব। তবু এক কদমও নড়ব না।

হে কৃষাণ! বিদায়বেলা দুটো কথা শুনে রাখ আমার বুকে কাফেররা মুসলমানের রক্ত ঝড়াচ্ছে, শুহাদাদের রক্ত আমার বক্ষ রঞ্জিত করছে মনে রেখ যে ভূমিতে শহীদদের রক্ত ঝরে সে ভূমির মালিক একমাত্র মুসলমানরাই হয়ে থাকে। এ যমি কাফেরদের দখলে যেতে পারে না। তবে মুনাফেকদের মুনাফিকি না থাকলে। তোমরা ভীত হয়ো না মনোবলকে সবল কর। নিরাশ হয়ো না আমার বক্ষদেশে ওরা যত বোমের আঘাত হানবে অর্থনিতীর দিক দিয়ে তারা তত দুর্বল হবে। একদিন দেখবে ওরা দেওলিয়া হয়ে গেছে। একদিন ওরা ভাঙ্গা জুতা কাথা ও বদান বেচে জীবন বাঁচাবে। টাক্কু মাথায় হেলমেট দেখবে না। গামছা চিরে রচনা করবে ভিক্ষার ঝুলনা।" পল্লী সর্দার এলাকার আলেম জ্ঞান-জ্ঞুনী ব্যক্তিদের ৪/৫জনকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দুজন মসজিদের ইমাম মাওলানা আক্রাম সাহেব ও মাওলানা খলিলুর রহমান

খালাসী এবং অবঃ জেনারেল জুলফিকার। তাছাড়া আরো একজন প্রবীন মুরুব্বী হাজী আরফানগুল।

দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পর জেনারেল জুলফিকার সাহেব বললেন, "এখন আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে মহিলা শিশু ও বৃদ্ধদের আরামের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হল সবাই মিলে কয়েকটি গ্রুপ রচনা করে তাদেরকে খিমা তৈরি, পানি সরবরাহ করা ও পাহাড়ের গুহা তালাশ করে তা পরিস্কার করে সেখানে থাকার উপযুক্ত করা। তাদের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারি। জেনারেল সাহেবের পরামর্শ সকলের কাছেই খুব মনপুঃত হল। অতঃপর সবল ও দুর্বল একত্র করে কয়েকটি জামায়াত রচনা করে তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন। পল্লীসর্দারসহ বাকি ৪জন কাজের তদারকী দায়িত্ব নিলেন।

পাহার জঙ্গল তালাশ করে একটি মনোরম স্থানের সন্ধান পেলেন তিন দিকে ঘিরে আছে অনুচ্চ পাহাড় শৃঙ্গ। এরই মাঝখানে রয়েছে এক বিশাল ময়দান। অনুচ্ছ পাহাড়ের পাদদেশে থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নির্ঝরণী সুমধুর তানে কলকল রবে বয়ে চলছে আবহমান কাল থেকে। উক্ত পর্বতের এদিক ওদিক রয়েছে ছোট বড় ৯টি গুহা। এর মধ্যে ৫টি এতই বড় যে একটু সংস্কার করলে এককেটি গুহায় ২০ থেকে ২৫জনের স্থান হবে। বাকি গুলোতে ৮ থেকে ১০জনের স্থান হবে। মধ্যের ফাকা জায়গা রয়েছে ছোট ছোট কাটা জাতিয় ঝোপ ঝাড় ও লতাগুল্ম। এক কোন ঘিরে আছে বাবলা বাগান এ থেকে জ্বালানির চাহিদাও অনেকটা মেটানো যাবে। তাছাড়া আশপাশে রয়েছে লতা-পাতা ও ঘাস। পশুদের জন্য ৮/১০দিনের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এতে।

সকলেই এই স্থানটি নির্বাচন করে সংস্কারের কাজ করতে লাগল পাহাড়ের কুল ঘেসে বেশ কয়েকটি সবুজ ও খাকী রংয়ের তাবু রচনা করা হল। গুহাগুলো পরিস্কার করে মশক ভর্তি সাজানো হল। এবার তাদেরকে বিভিন্ন খিমায় ও গুহায় প্রবেশ করতে বলা হল। সবাই যার যার স্থানে আশ্রয় নিল। পাশাপাশি দুটি গুহা দেয়া হল সুফিয়াকে। সে এখানে বসে মহিলাদের তালিম চালিয়ে যাবে। কৃত্রিম উপায়ে কয়টি অস্থায়ী বাইতুল খোলা লেট্রিন তৈরি করা হল।

কোন সামরিক লোক যদি এ স্থানটিকে দেখেন তবে বলতে বাধ্য হবেন এ যেন একটি দুর্বেধ্য কিল্লা বা সেনা নিবাস। এর রচায়িতা একমাত্র আল্লাহ। মনে হয় তার অসহায় ও দুর্বল বান্দাদের রক্ষার জন্যই সৃষ্টি লগ্ন থেকে তৈরি করে রেখেছেন।

পুনঃর্বাসনের কাজ শেষ করে জেনারেল সাহেব একদল যুবক নিয়ে চলে গেলেন নিজ মহল্লায়। সেখানে গিয়ে প্রতিটি বাড়িতে ব্যাংকার খননের নির্দেশ দিলেন। কিভাবে ব্যংকার তৈরি করবে এর একটা নকশা তিনি করে দিলেন। এভাবে চলছে ব্যংকার তৈরি কাজ। একদলকে হুকুম দিলেন পাথর ও বালি আনতে। ওরা গাড়িতে ও গাধার পিঠে বহন করে বালি ও পাথর গ্রহ করতে লাগল।

বিকাল দুটা বেজে গেছে। খানা গোসল ও নামায পড়া এখনো হয়নি। সবাই ক্লান্ত হয়ে পরেছে। কোদাল ও শাবল উঠানোর শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। মাথা চক্করদিচ্ছে। জেনারেল সাহেব তাদের অবস্থা দেখে ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। এক পর্যায়ে বললেন, "দেখ জিহাদের ময়দানে এটা কোন কষ্ট নয়। এর চেয়ে শত শত গুণ কষ্ট করতে হবে। ঠিক আছে এখন গোসল করে খানা-পিনা ও নামায সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে খনন করবে চল জলদি চল।

সবাই কাজ সেরে গোসল ও খানা খানা পিনা সেরে নামায আদায় করছে। জেনারেল সাহেব দুর আকাশে একটি বিমান চক্কর দিতে দেখেছেন। এটা যে গোয়েন্দা বা চোরা বিমান তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বুঝতে পারলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমভিং আরম্ভ হবে। তাই লোকজন নিয়ে দ্রুত পদে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। এর মধ্যেই আরম্ভ হল উপুর্যপরি বোমভিং। দূর থেকে আগুনের লেলিহান ও ধুম্র কুন্ডলিগুলো দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। বিকট শব্দে যমিন কাপতে লাগল। কিছুক্ষণ বোমভিং এর পর বিমানগুলো উড়ে গেল নিরাপদে। পরদিন ভোরে মহল্লায় গিয়ে দেখেন অনেক বাড়ি-ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। অনেক স্থান বড় বড় খাদে পরিণত হয়েছে। মহল্লাটা যে পরিমানে ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল যে অনুপাতে অনেকটা কম। জেনারেল সাহেব গর্তগুলোকেই ব্যংকার বানানোর নির্দেশ দিলেন। এতে অনেক কম শ্রম কমে গেল। বোমের টুকরাগুলো জমিয়ে ৮মন লোহা পেল। প্রতি মণ লোহার মূল্য ৮হাজার টাকা এটাও ছিল আল্লাহর রহমত কিছু কিছু গর্ত থেকে সচ্ছ পানি বের হচ্ছিল এতে পানির চাহিদাও মিটে গেল।

আটচল্লিশ

মাওলানা রফিকের ছোট ভাই আরিফ পল্লী সর্দারের ছোট ছেলে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে মাওলানা হয়ে দেশে ফিরে আসছেন আসার সময় বেডিং পত্র ও কিতাবাদি সাথে নিয়ে আসছেন। ওজন কয়েকমন পাহাড় পর্বত ও মাঠ-ঘাট পাড়ি দিয়ে রাত ৯টার দিকে বাস থেকে নামলেন। বাসস্ট্যান থেকে রামাল্লা নগরী ৪মাইল দূরে। মালামাল নিয়ে এত রাতে পথচলা নিরাপদ নয়। কোন যানবাহনের ব্যবস্থা হল না নিরাপত্তার অভাবে টাংগাঅলারা রাতে বের হয় না। তাই কিছু মাল একজনের কাছে আমানত রেখে বাকি মাল নিয়ে পদব্রজেই পথ চলছেন। খালিজান নিয়েও পাহাড়িপথ চলা খুব কষ্ট। তারপরে পিঠে মাথায় দেড় মন ওজনের কিতাবের গাঠরী। লোকজন না থাকায় একাই বহন করতে হল সারা পথ। বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে এক বেদুঈন পল্লীতে এসে বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি দিলেন। বেদুঈনরা সাধারনত একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে পথিকদের কাছে কিছু পেলে তা হাতিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আলেমের প্রতি ওরা খুবই সদয় খাজনা আদায় করে না কোনদিন। আলেমর প্রতি ওরা খুবই দুর্বল। আরিফকে দেখে বেশ কজন লোক এসে দাঁড়াল তার পার্শে। আরিফ দীর্ঘ আট বৎসর পর দেশে ফিরছে। চোখে তার আনন্দের ফোয়ারা। বাড়ি যাবেন, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে মিলিত হবেন। তাই মরু বিয়াবনে তিনি হারিয়ে গেছেন।

বেদুঈন দলপতি ওয়াক্কাছ যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে বললেন "আমার নাম আরিফ বিন ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী নিবাস হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে রামাল্লায়।" এতটুকু বলতে না বলতেই বুড়ো এক দীর্ঘ শ্বাস নির্গত করে বললেন বাবা! তোমাদের গ্রামটি আজ বিকেলে এক ঝাক রুশী বিমান এসে উপুর্যপরি বোমভিং করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

মনে হয় বাড়ি ঘর বাগ বাগিচা , পশুপাল ও লোকজন বেঁচে নেই সবই ধ্বংশ করে দিয়েছে। হায় হায় মনে হয় লোকজন বেঁচে নেই। যদি সন্ধা নেমে না আসত তবে অবশ্যই গিয়ে ধ্বংশ লিলা দেখে আসতাম।”

বুড়ো ওয়াক্কাছের কথা শুনে আরিফের অন্তর যেন বজ্রঘাতে আহত করে দিল। সে যেন জড় পদার্থের ন্যায় নির্বাক ও স্পন্ধনহীন অবস্থায় বসে পড়লেন। ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ভেঙ্গে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে আহঃ! আহঃ এ আহঃ শব্দটি যে কত করুন ও বেদনাদায়ক তা ভাষায় বুজাবার নয়। মানুষের দুঃখ বেদনার চরম অবস্থাটা বুঝানো হয় এই আহঃ শব্দটি দ্বারা। মাওলানা রফিক কিংকর্তব্য বিমূঢ়, হিতাহিত জ্ঞান হারানোর উপক্রম। আরিফ বহুদিন আগে পত্র মারফত বোন রাফিকার মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদ পান সে বেদনা ভুলতে পারেন নি আজও। এক বেদনা ভুলতে না ভুলতেই আবার বাড়ি ঘর ধ্বংস ও বুড়ো পিতা-মাতার নিখোঁজের সংবাদ। হৃদয় বেদনাভার সইতে পারছে না আরিফের। আরিফ অনেক ভেবে চুপি চুপি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেদুঈন দলপতিকে বললেন “বাপজান আমার কিতাবাদি আপনার জিম্মায় রইল আমি একটু পিত্রালয়ের ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে দুফোটা অশ্রু নজরানা দিয়ে ফিরে আসব। তাছাড়া দেখি আম্মু-আব্বুর কোন সন্ধান পাই কিনা। আমাকে আমি সংযত রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি যাই বাপজান।” বেদুঈন সর্দার বললেন, “বাবা তোমাকে মানা করে রাখানা যাবে না তা বুঝি কিন্তু অমন করে একা একা ছেড়ে দিতে পারছি না যে? আচ্ছা যাও কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে পথ চলবে আর তোমার আব্বু আম্মুর সন্ধান পেলে জরুরি খবর জানাবে। ঠিক আছে যাও বাবা।”

আরিফ মহল্লাভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। নুঝুম রাত পৃথিবীটা নিরব নিথর ঘুমের কোলে গা এলিয়ে দিয়েছে সবাই অনেক্ষণ ধরে। পথ-ঘাট ফাঁকা, নেই লোকজন, কুকুর-কুকুরীরাও জেগে নেই। দুর আকাশে চাঁদের সাথে অসংখ্য তারাকারা মিটমিট করে ঘুমন্ত প্রকৃতিকে অবলোক করছে। বেদনাভরা হৃদয় নিয়ে আরিফ পথ চলছেন একা ছোট্ট একটি পাহাড়ের গা বেয়ে গ্রামের পশ্চিম দুয়ার দিয়ে গাঁয়ে ঢুকলেন। হায় একি অবস্থা! একি রামাল্লা! যেখানে শিশুকাল থেকে কৈশর পাড়ি দিয়েছে। সে

গ্রামের কি করুন দৃশ্য! অনেক বাড়ি ঘর মাটির সাথে মিশে গেছে। অনেক বাগ বাগিচা অগ্নিদাহ পল্লবহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে বড় বড় গর্ত রচনা করেছে নিষ্ঠুর বোমের আঘাতে যে সব ঘর-দোর এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেসব ঘরবাড়িগুলো যেন স্বজনদের হারিয়ে বিলাপ করছে। যেখানে মসজিদ ও মক্তব ছিল সে স্থানটিকেও রাশিয়ান বোমেরা ক্ষমা করেনি। মসজিদ মক্তব বোমের কোপানল থেকে দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। বিশালাকার গর্তে পরিণত হয়েছে ওসব স্থান।

আরিফ মহল্লাটি ঘুরে ঘুরে হাজির হল নিজ বাড়িতে। পুরো মহল্লায় এ বাড়িটিই ছিল বিশালাকারের। বাড়িটি যদিও বোমের আঘাত হনেনি। কিন্তু বোমের বিকট আওয়াজ মাটি কম্পনে তিনটি দেয়ালই ভেঙ্গে পরেছে। সংস্কার করা ছারা থাকাই যাবে না। গোটা মহল্লাতে একজন প্রাণীরও সাক্ষাত পেল না। হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেলেন পুরাতন গোরস্তানে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, পুরাতন গোরস্তান এখন আর পুরাতন নয় নতুন নতুন কবরে জমজমাট। ক্ষুধার্ত গোরস্তান আজ উদর পূর্ণ করেছে শহীদদের লাশে। গোরস্তান যেন আরিফকে ডেকে বলছে আমি আজ গর্বিত আমি আজ উৎফুল্ল, আমি আজ আনন্দিত। আমার মাঝে শহীদরা চির নিদ্রায় শায়িত।”

অন্যান্য গ্রামগুলো থেকে রামাল্লা বাসীর পশুপাল ছিল অনেক বেশী। মেষ, ছাগল, দুম্বা, গাধা ও ঘোরা। এসব পশু পালেরও সন্ধান নেই। তাহলে কি এ বিশাল গতে মানুষ ও পশুপালসহ পুতে রেখেছে না অন্য কোথাও চলে গিয়েছে? মহল্লার এ করুণ দৃশ্য আর দেখার ইচ্ছে করছে না আরিফের ক্লান্ত-শ্রান্ত আরিফ বিটপী মূলে বসে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে। এজীবনের উন্নতি কোথায়? জীবনের আশার ভেলা মাঝ দরিয়াই অস্তমিত হয়েছে। বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই পিতা-মাতার হত্যাকারী, স্বজনদের কাতেলের যদি প্রতিশোধ নাই নিতে পারি তাহলে দুনিয়ায় থাকা অর্থহীন। ইসলামের দুশমনের কবর রচনা না করতে পারলে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে মুখ দেখাব কি করে? এত কিছু ধ্বংস লীলা দেখার পরও যদি সুপ্ত ঈমান না জাগে সাড়া না দেয় তবে কিয়ামত ময়দানে নবীকে দেখা দিব কি করে? না আর হীনমান্যতা নয় জিহাদ ছাড়া

এ জাতিকে উদ্ধারের আর উপায় নেই। আর অন্য উপায় নবীও বাতলিয়ে যাননি। আরিফ বিটপি মূলে বসে একা একা দৃঢ় সংকল্প করলেন। কাফিরের বিরোদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ন হবেন । দৃঢ় সংকল্প দৃঢ় প্রত্যয়ে আরিফ ভয়-ভীতি, দুঃখ কষ্ট, সংকীর্ণ মনা গা থেকে ঝেরে ফেলে দিয়ে আবার পল্লীর ধ্বংসলীলা চন্দ্রের আলোতে অবলোকন করে বেদুঈন পল্লীতে ফিরে গেলেন। বেদুঈনরা এতক্ষণে অনেকেই ঘুমিয়ে পরেছে। তবে দু-একটি খিমায় এখনো মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। তবে ওয়াক্কাছ এখনো ঘুমায়নি আরিফের আগমনের টের পেয়ে তিনি তাবুর বাইরে এলেন। একটি মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন বাবা এখানে বস বল দেখি রামাল্লার কি অবস্থা? এদিকে মেহমানের খানা পিনার জন্যও তাকিদ দিলেন।

আরিফ অত্যন্ত দুঃখ ভরা মন নিয়ে পল্লীর ধ্বংসলীলার কিঞ্চিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, সর্দারজী বোমার আঘাতে গ্রামটি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। মসজিদ মক্তবকেও ওরা ক্ষমা করেনি। বহু বাড়ি-ঘর মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। বাগ-বাগিচার সে সবুজ দৃশ্য আর নেই। মনে হয় রাসায়নিক বোমা ব্যবহার করেছে। পত্রবিহীন ঝলসে যাওয়া বৃক্ষগুলো এতিমের মত দাঁড়িয়ে বিলাপ করছে। গ্রামটিতে অনেক বড় বড় গর্ত দেখতে পেলাম। গোরস্তান উদর পূর্ন করেছে তাজা প্রাণে। আমার আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষাত মিলেনি। মনে হয় ওরা বেঁচে নেই। এতটুকু বলতে না বলতেই আরিফ কেঁদে ফেলল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। নীরব নীথর হয়ে গেছে আরিফ। সর্দার ওয়াক্কাস সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, "বাবা! তুমিতো আলেম মানুষ! তোমাকে বুঝানোর ভাষা আমার নেই। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা আফগানী, লাশের উপর দাঁড়িয়ে হাসতে শিখেছি, গোলামী করতে শিখি নি। এটা আমাদের ঐতিহ্য, এটা আমাদের পৈত্রিক সুত্রে পাওয়া মেযাব।

তিনি আরো বললেন, হতে পারি আমরা জাঁযাঁবর বেদুঈন। অশিক্ষিত-মূর্খ। কিন্তু পরাজয়, পরাভব আমাদের গায়ে সয় না। যদিও মাঠে মাঠে ছাগল চরায়ে ফিরি, কিন্তু দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে জীবন দেয়া আমাদের জন্য কোন কঠিন জিনিস নয়। এখন থেকে আমাদের দরকার বেঈমান রুশীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তোমার চোখের পানি দেখে

আমার অন্তরে ঘৃণা লাগছে। পিতা-মাতা, ভাই- বোন ও প্রতিবেশীদের হত্যাকারীর প্রতিশোধের অগ্নি এখনো তোমার দিলকে পোড়ায় নি। ঘুমন্ত হৃদয়ে সাড়া জাগায় নি। কাপুরুষতা ভীরুতার চাদরে ঈমানের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শিখা ঢাকা পড়ে গেছে। তোমার অশ্রু দেখে মনে হচ্ছে তুমি আফগান যুবক নও, পাঠান বংশে তোমার জন্ম হয় নি। ভুলে গেলে পুরনো ইতিহাস! ইংরেজ বেনিয়ারা যখন সারা দুনিয়া দখল করে নিয়েছিল, তখনও আমরা তাদের বশ্যতা মেনে নেই নি। আমরা ছিলাম চির আযাদ। সে দিন ইংরেজরা তাদের হাজার হাজার সৈন্য হারিয়েছিল আফগান ভুমিতে। আর আমরাও ইরেজদের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাজার হাজার ফৌজের লাশের স্তুপে দাঁড়িয়ে অট্রহাসি হেসেছিলাম। লাশের স্তুপে দাঁড়িয়ে বিজয় নিশান উড়িয়েছিলাম।

আরিফ সর্দারের কথাগুলো শব্দে শব্দে বুঝতে না পারলেও মূল বিষয় বুঝতে বাকি নেই। কারণ এরা ব্রাহুই কবিলার (গোত্রীয়) লোক। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছাগল চরায়। নিয়মিত কোন এলাকায় বস্তি বানায় নি ওরা। যেখানেই ঘাস সেখানেই পাওয়া যায় ওদেরে। অন্যসব গোত্রের তুলনায় এরা একটু উশৃঙ্খল। শিক্ষার হারও শূন্যের কোটায়। তবে নামায- রোযার কসুর করে নি ওরা। কুরআন তিলাওয়াত যিকির আজকারও করে থাকে।

একজন ব্রাহুই সর্দারের কথা শুনে আরিফের ঈমান আরো মজবুত হল। সাহস বল বৃদ্ধি পেল। প্রত্যুষেই তিনি সীমান্ত প্রদেশে হাক্কানীয়া মাদরাসার দিকে পা বাড়াবেন। সেখানেই ভাই রফিকের সন্ধানও মিলতে পারে। রফিক জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়েছে তা আগেই জানতেন আরিফ। মনে মনে এসব ভাবছিলেন আরিফ।

রাত দুপুর ছারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। বেদুঈন সর্দারের একমাত্র কন্যা জুলাইখা মেহমানের জন্য রুটি সেকে গোশতের কাবাব তৈরি করে পিতার খিমায় রেখে দিয়ে বাইরে এসে সালাম দিয়ে বলল।

হ্যান্ডওয়ালে রুটাই গাওস্তা, আস্তেইশা খোরাদাইশখনে। অর্থাৎ হে আমাদের মুসাফির ভাই তোমার জন্য রুটি ও গোসতের কাবাব তৈরি করে নিয়ে আসছি। এখন খানা খাও।” আরিফ ব্রাহুই ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত

নয়। কিন্তু কিছু কিছু বোঝেন তবু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় উত্তর দিলেন "হ্যান্ডওয়ালে! রোটাই চে লাওয়াস্তানি? আম্মাস্তে ওয়ানেসা জরুরতে মি ওয়াকলে!

অর্থাৎ রাত দুপুরে কষ্ট করে কেন রুটি নিয়ে আসছ? আমারতো খানা খাওয়ার মোটেই ইচ্ছে নেই।

জুলাইখাঃ বাসওয়ালে! বদনে তু দিদাম আস্তে খুবী গম সাওয়াস্তে কিমু কিমু নজরআয়াদী।

জুলাইখা ইসরে তোমার সুন্দর মুখমন্ডল মলিনতা প্রস্ফুটিত। তা দেখে কে বুঝবে না। নাও খেয়ে নাও অত অভিমান কর না।

আরিফঃ এত্তমে হলে ওয়াদী দিদাম মিয়ামতে দাস্তাইশ খোরদাওয়াশীকে জিতাওশে জেও বে তুরে। অর্থাৎ যদিও আমার উদর অনলে দাউ দাউ করে জ্বলছে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ক্ষুধাও পালিয়ে গেছে। তাই এখন খানা খাওয়ার ইচ্ছা নেই। তারপরও বাপ বেটির অনুরোধ না রেখে পারলেন না। বেদুঈন সর্দার একপার্শ্বে শুয়ে আছেন আরিফ খাচ্ছেন আর জুলাইখা খানা পরিবেশন করছে। খানা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চোখ পরল জুলাইখার উপর। মলিন কামিজ পুরাতন সেলোয়ার তালিযুক্ত ওড়না। এরই অভ্যন্তরে রয়েছে জরদ রং এর এক ব্রাহুই নারী মুর্তি। মলিন বস্ত্রাবরণের ভিতর থেকে রুপ তার ঠিকরে পরছে কি অপরুপ চেহারা। একাকিনী কেউ দেখলে মনে করবে ফুলপরী। উত্তম পোষাকে সাজলে কে বলবেনা ওকে রাজকুমারী মুচকি হাসির রেখা ওষ্ঠযুগলে লেগেই আছে। হঠাৎ তাকালে মনে হয় মুক্তা ঝড়ছে। বেদুঈন ঘরে এমন কন্যা জন্ম নিতে পারে তা কল্পনাতীত। কথায় বলে, "যেন গোবরে পদ্য ফুল বা ডাস্টবিনে রক্তমল।" জুলাইখা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ইচ্ছেমত অবলোকন করছে নও মুসাফিরকে। এতো কোন মনিষী নয় এ যেন সদ্য আকাশ থেকে নেমে আসা বেহেশতী ফেরেশতা। জান্নাতের দুয়ার খুলে পালিয়ে আসা মানবরুপী ফেরেশতা। চেরাগের মত জ্বল জ্বল জ্বলছে নুরানী মুখমন্ডল। গায়ে জুব্বা, মাথায় কালো পাগড়ী, কতইনা মানিয়েছে ওকে। কত ধীরস্থিরভাবে রুটির টুকরাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে আহার করছে। কত শান্ত, কত ভদ্র, কত প্রেমময় তার অবয়ব। তাবুর আড়াল থেকে ভাবছে

জুলাইখা। একে অপরের অন্তর কেড়ে নিয়েছে। কারো অন্তর কাউকে ভুলতে পারছে না। খানা শেষে জুলাইখা থালা-বাসন নিতে খিমায় প্রবেশ করলে আরিফ মিষ্টি হেসে বললেন, “জুলাইখা তোমার তৈরি খানা সত্যিই খুব সুস্বাদু। উদর পূর্ন করে খেয়েছি তোমাকে না দিয়ে সবগুলো খেয়ে ফেলেছি। রাগ করবে না তো? জুলাইখা লজ্জা বনত মস্তকে বলল, “রাগ করব কেস মুসাফির ভাই আমরাতো সন্ধায় খেয়েছি।”

সর্দারজী জুলাইখাকে বললেন “মা দক্ষিণের ছোট খিমায় কোন লোকজন নেই ওখানেই মেহমানের থাকার ব্যবস্থা কর। জুলাইখা খিমাটি পরিস্কার করে সেখানে শয্যা রচনা করে বলল, “ভাইজান বিছানা আপনার জন্য ইন্তেজার করছে। চলুন রাত অনেক হয়ে গেছে একটু ঘুমালে শরীর অনেকটা হালকা হবে।” আরিফ উক্ত তাবুতে গিয়ে পর্দা ফেলে শয্যা গ্রহণ করলেন। জুলাইখা চলে গেল তার তাবুতে।

উনপঞ্চাশ

রাত পোহানোর এখনো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকী। এক এক করে মুজাহিদরা শয্যা ত্যাগ করতে লাগলেন শেষ প্রহরের নামাজের জন্য। (তাহাজ্জুদ) সবাই পাক সাফ হয়ে মুর্চার এদিক ওদিক খিমায় খিমায় যার সুবিধে মত কিছু নামায পড়ে হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে মোনাজাত করছেন।

ঃপ্রভুহে আমরা গুনাহগার আমরা তোমার নাফরমান বান্দা আমাদের পাপের কোন শেষ নেই। আমরাও আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি। অত্যাচার করেছি তোমার অনেক হুকুম পালন করতে গিয়ে অলসতা করেছি আমরা নবীর সুন্নত তরক করেছি। এখন আমরাও শক্ত আযাবের লায়েক হয়েছি।

প্রভুহে তুমি রাহমান, রাহীম, কারীম, গাফফার, সাত্তার! ক্ষমার ভিখারী সেজে তোমার ক্ষমার দুয়ারে হাজির। অতএব ক্ষমা করে দাও হে আল্লাহ

চেয়ে দেখ রিক্ত হস্ত তোমার দরবারে তুলে ধরেছি। এ হাতগুলোকে শক্তিশালী করে দাও। বাহুযুগল মজবুত বানিয়ে দাও আমরা যেন দৃঢ়পদে কাফিরদের মোকাবেলা করতে পারি। হে আল্লাহ আমাদের এটম নেই, হাইড্রোজেন নেই। নাপাম ও কার্পেংটিং নেই, বোমা নেই, নেই গুচ্ছ বোমান। নেই বোমারু বিমান, আর গানশীপ, হেলিকাপ্টার, নেই সাজোয়া যান, মেশিনগান বিমান বিধ্বসী ক্ষেপনাস্ত্র আর, ক্লোজমিজাইল ও টিংগার ক্ষেপনাস্ত্র। রাইফেল, স্টেনগান, এল.এম.জি, এস.এম.জি, এল.এস.আর ক্লাসিনকভ ও রকেট লাঞ্চার। এমনকি পিস্তল ও রিভলভারও নেই। আছে শুধু কুঠার, খন্তি শাবল, লাঠি, ছোরা, দা, বল্লম।

হে আল্লাহ! অত্যাধুনিক মরানাস্ত্র আর ক্ষেপনাস্ত্রের মোকাবেলায় আমরা এগুলোকে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পরব। তোমার দুশমনদের সামনে বুক টান করে দাঁড়াব, বিশ্বের পরিশক্তির সাথে লড়ব। এমতাবস্থায় তোমার মদদ চাই আমাদের কদম দৃঢ় রেখ। হে আল্লাহ! আমরা ওয়াদা করেছি কথা দিচ্ছি, বিজয় হলে কুরআনী শাসন জারী করব। অতএব সাহায্য দান কর।

মুর্চার এক কোন থেকে খুবই ছোট আওয়াজে আযান ধ্বনিত হল। মোনাজাত সমাপ্ত করে সবাই এক স্থানে সারিবদ্ধভাবে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী সাহেবের ইমামতিতে নামায সমাপ্ত করেন।

নামায সমাপ্ত করে হরকাতুল জিহাদের জানবাজ কমান্ডার মাওলানা আরসালান খান রাহমানী ও নসরুল্লাহ মনসুর লেংড়িয়াল বিদায় চাইলে খুব তাড়াতারি চা নাশতার ব্যবস্থা করা হল। সবাই একসাথে চা নাশতা করে দুজন সম্মানিত মেহমানকে কিছু এগিয়ে নিয়ে বিদায় করলেন।

মেহমান বিদায় দিয়ে হাক্কানী সাহেব মুজাহিদদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে মুজাহিদ সাথী ও ভায়েরা! আমরা আস্তে আস্তে কঠিন থেকে কঠিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দিতে হবে ঈমানের ফাইনাল পরীক্ষা যে পরীক্ষা সমস্ত নবীগণ দিয়েছেন এবং দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তিনি আরো বলেন, "হে আমার মুজাহিদ বন্ধুরা! গতকাল ফারারেদ নদীর অববাহিকায় হাজার বছরের

পুরান গ্রামে বিপুল পরিমান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রুশীরা হানা দেয়। এতে গ্রামের পুরুষরা গ্রাম ছেরে পালিয়ে যায়। উক্ত গ্রামে কোন পুরুষ না পেয়ে মেয়েদেরকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তরুণীদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। হাল্কা অস্ত্র দিয়ে হেলিকাপ্টার কিছুই করতে পারেনি গ্রামবাসিরা। কারো বোন, কারো মেয়ে কারো খালা, কারো ফুফু ধরে নিয়ে গেছে গ্রামে পরে গেল কান্নার রোল।

রাশিয়ান কুকুরেরা পাশবিক অত্যাচার করে আবার হেলিকাপ্টারের তুলে উক্ত গ্রামে এসে হাজার হাজার ফুট উপর থেকে বিবস্ত্র করে নিচে ফেলে দেয় এতে বহু মসলিম ললনার প্রাণ হারায়। তাদের রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত ও থেতলে যাওয়া লাশগুলো যখন জমা করতে লাগল ঠিক সে সময় আবার হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার ও বোমা ফেলে শত শত লোককে হত্যা করে দিয়েছে। জানাযা পড়ার মত কোন লোক সে গ্রামে ছিল না।

হে আমার মুজাহিদ ভায়েরা! গত কাল বিবিসি বয়েজ অব আমেরিকা ও রেডিও তেহরান খবরে শুনেছি, রামাল্লা গ্রামটিও নাকি বোমের আঘাতে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে গ্রামের লোকজন পশুপালের হতাহতের খবর জানায়নি। হাক্কানী এতটুকু বলার সাথে সাথে মাওলানা রফিক কেঁদে ফেললেন। হাক্কানী সাহেব সান্তনা দিয়ে বললেন বাবা তুমি শান্ত হও। ১০ জন মুজাহিদ সহ সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এর প্রতিশোধ নিয়ে ফিরবে।

তিনি আরো বললেন, "শুনেছি অনেক মসজিদ মাদরাসা ধ্বংস করে দিয়েছে, শত শত আলেম ও ছাত্র নেতা জনতা ট্যাংকের চেইন পিস্ট করে দিয়েছে মক্তবের নিস্পাপ মাসুম বাচ্চাদেরকে।

হে আমার ভায়েরা! আর বিলম্ব নয় আমাদের নিকট যা আছে তা দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওদের উপর। আমি আমার মাদরাসার তালিম সমসাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছি। বর্তমানে দ্বীনের তাকাজা হল দ্বীন, দেশ ও জাতিকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করা। দুশমন প্রতিটি এলাকায় প্রবেশ করেছে। ওদের অত্যাচার নীরবে সয়ে যাওয়া ঈমানের পরিচয় নয়। ওদের বিরোদ্ধে জিহাদ করা আফগানের প্রতিটি নারী-পুরুষ, বুরা-বুড়ি,

যুবক-যুবতী ও শিশুদের উপর ফরযে আইন। সমস্ত ইমাম গণের ফতোয়া এমনটিই কাজেই আমরা যত অসুবিধার সম্মুখিন হইনা কেন পিছপা হবনা ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ বিজয় দান করবেন হাক্কানী আলোচনা শেষ করে বেছে বেছে দশ জন মুজাহিদের একটি কাফেলা রচনা করলেন। মাওলানা রফিককে কমান্ডার নিযুক্ত করে বললেন, “রফিক তোমাদের আমীর তোমরা সব সময় আমীরের অনুগত্য করবে সাবধান! সাবধান পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করবে না। আমীরের আনুগত্য না করলে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।”

তিনি আরো বলেন, “এখান থেকে রামাল্লা বহুদূরের পথ। সবটুকু পথ যেতে হবে পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পথ চলতে হবে। চলার পথে হয়ত দুশমনের সাথে লড়াই করতে হতে পারে। দুশমনের অনেক ছাউনি পেরিয়ে যেতে হবে পাহাড়ী পথ ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহকে বানিয়ে নিবে রাহবর একমাত্র তিনিই সরল সোজা পথ দেখাতে পারেন। এ বলে গণিমতের তিনটি রাইফেল তিনজনকে একটি ক্লাশিনকভ মাওলানা রফিককে এবং তিনটি ষ্টেনগান তিনজনের হাতে তুলে দিলেন। আর বাকি তিনজনকে দিলেন তিনটি পিস্তল কয়েকটি গ্রেনেড ও খুব সামান্য গোলাবারুদ।

এসব ছামানা দিয়ে পাঁচ সেকেন্ডও যুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু আরতো নেই দেব কোত্থেকে? কাফেলা সাজিয়ে প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিয়ে বললেন তোমরা রাতের বেলায় পথ চলবে দিনের বেলায় খুব বেশি ভয়। দুর থেকেই দুর্বিনে ধরা যাবে। আজ মাগরিবের নামায মুর্চায় পড়ে তোমরা বেরিয়ে যাবে। এভাবে সব কাজ ঘুচিয়ে তিনি অন্য কি জরুরি কাজে চলে গেলেন।

সারাদিন ওরা মুর্চায় কাটালেন। মাগরিবের নামায আদায় করে সকলেই রোনাজারির সাথে মোনাজাত করলেন আজ দশজন সাথীকে পাঠানো হচ্ছে দূরের অভিযানে। এদের সাথে হয়ত এটাই শেষ দেখা কিনা কে জানে? এসব চিন্তায় সবাই চিন্তিত দোয়া শেষে খানা পিনা সেরে মুর্চা ত্যাগ করলেন। এখন থেকে সফরের হালাত খোদায়ী নুসরত ও অপারেশনের বিভিন্ন ঘটনাবলি কমান্ডার মাওলানা রফিক এর যবান থেকে শুনান।

মুর্চা থেকে সকলেই কোলাকোলি করে বেরিয়ে এলাম। চাদনী রাত দশ গজ দূরের বস্তুকেও চেনা যায় সারি সারি পাহাড়গুলো দানবের মক সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। এর উপর দিয়ে তাকালে দৃষ্টিগোচর হয় পর্বত শৃঙ্গ। পাহাড়ী পথ অতিক্রম করা খুবই কষ্ট। চড়াই উৎরাই পাড়ি দিতে হয় ক্ষণে ক্ষণে কঙ্করময় বন্ধুর গিরিপথ ৩০ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লেগে যায় ৩/৪ ঘণ্টা। আমাদের রসদ পত্র যদিও নগন্য তবুও বহন করা খুবই কষ্ট। গলা শুকিয়ে শুখনো কাঠের মত হয়ে যায়। জিহ্বা নড়াচড়া করতে অক্ষম হয়ে তালুর সাথে লেগে যায় একটু পর পর সামান্য পানি মুখে নিতে হয়। এভাবে পথ চলছি মানুষ নেই, ঘর দোর নেই নেই কোন লোকালয়। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ভয়ে গা ছম ছম করে কখন দুশনের এলাকায় ঢুকে পরি তা কে জানে। একমত জুর করেই আমাকে বানানো হল কাফেলার জিম্মাদার। এর আগে পরিকল্পিত ভাবে কোন হামলা করিনি বা নেতৃত্ব দেইনি জিম্মাদারী যে এত কঠিন তা কোন দিন অনুভব করার সুযোগ হয়নি।

আমার মনে বিষম ভয়ের সৃষ্টি হল। কারণ আমি দশজন সাথীর আমীর আমার ভুলের কারণে যদি সাথীদের কষ্ট বা ক্ষতি হয়ে যায় তা হলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব? আমার মত নগন্যের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমীরে মোহতারামের নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। আর ভয় হল আমাদের গোলাবারুদের সংখ্যা খুবই কম আমার ভুলের কারণে যদি একটি গুলি বেশী খরচ হয়ে যায় তবে তো আমানতের খেয়ানত হবে। আমাদের মধ্যে যদি কোন সাথী আমার আগে শহীদ হয়ে যায় তবে তা বরদাশত করব কিভাবে? এসব চিন্তায় আমার পা থেমে যায় আমাকে নিয়ে সামনে যেতে চায় না। পদযুগলকে জোর করেই বাধ্য করেছি আমাকে নিয়ে যেতে।

কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করার পর সাথীরা ক্লান্ত হয়ে পরে বিশ্রাম না নিয়ে চলা কঠিন। তাই কাফেলার গতিরোধ করে একটি পাহাড়ের চূড়ায় গ্রাউন শীট বিছিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা নিলাম। কঠোর পরিশ্রমের পর সামান্য বিশ্রাম নিতে গিয়ে সব সাথীরা ঘুমের কোলে ঢলে পরে। আমি তায়াম্মুম করে দুরাকাত নামায আদায় করে সেজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর নিকট

কাফেলার হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করলাম। একটু পরে কখন যেন নিদ্রা এসে আমাকে আহত করে যমিনে শুয়িয়ে দিল তা টেরই পাইনি। আমরা বিশ্রামের যখন বসছি তখন দেখেছিলাম রাত তিনটা বাজার কয়েকমিনিট বাকি। এরপর আমি প্রায় ঘণ্টা বা পোণে এক ঘণ্টা জাগ্রত ছিলাম তারপর কি ঘটল তা বলতে পারিনি।

পরদিন সকাল ৭টায় প্রচণ্ড বোমভিংএর আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখি বাবুই পাখির ঝাঁকের মত অগনিত ফাইটার বিমান প্রলংকারী নিনাদে মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। হঠাৎ দু একটি বিমান বাজ পাখির মত খাড়াভাবে নিচে নেমে বোম ফেলে চোখের পলকে আকাশে উড়ে যায়। এ ধরনের বোমভিং অতীতে আর কোনদিন দেখিনি। ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে কেবল চক্করই দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল আমাদের পাগড়ীগুলো ছো মেরে নিয়ে যাবে।

জাগনা না পাওয়ায় ফজর নামাযটি পড়তে পারিনি দিলের মধ্যে ভয় অনুভব করলাম যে জীবনে শেষ ফজরের নামাযটি কাজা হয়ে গেল। তাই সবাই তায়াম্মুম করে নামাযের তৈরি নিতে নির্দেশ দিলাম সবাই তায়াম্মুম করে তৈরি হল। হাফেজ ইয়াহিয়া ফারিয়াবীকে ইমামতি করার নির্দেশ দিলাম নামায শেষ করে দেখলাম ডজন ডজন বোম আমাদেরকে লক্ষ্য করে ফেলছে অথচ একটি বোমও আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আমি মনে করি আমরা আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে রয়েছি। কাজেই এ স্থান ত্যাগ করা আমাদের ঠিক হবে না। এতে সবাই একমত হয়ে গেলেন।

এমনভাবে বিমানগুলো ঝাক বেধে চক্কর দিচ্ছে যে সুর্যের কিরণ যমিনে আসতে পারে না। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে নির্দেশ দিলাম এবার যদি আবার বিমান বহর আমাদের দিকে ধেয়ে আসে, তবে অন্য কোন চিন্তা না করে আমাদের হাতিয়ার যা আছে তা দিয়েই গুলী ছুড়ব। আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করব। বাঁকি আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবেন বোমাগুলো পতিত হয়ে যখন বিস্ফোরন ঘটত তখন পাথরগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পন পন শব্দ হয়ে আকাশে উড়ে যেত। ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান সংমিশ্রন কুন্ডলীতে কালো হয়ে যেত পুরা এলাকা।

আমরা সবাই অস্ত্র লোট করে বকিং হেন্ডেল টেনে চেম্বারে গুলী তুলে অপেক্ষা করছি ও আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আয় আল্লাহ ওদের মজবুত শক্তিশালী বিমানগুলো ফেলার মত কোন অস্ত্র আমাদের নেই যা আছে তা দিয়েই আক্রমণ করব। দয়াকরে গুলীগুলো বিমানের গায়ে লাগিয়ে ভূপাতিত করে দিও। এ ধরনের দোয়া করতে না করতেই তিনটি বিমান এক যোগে আমাদের দিকে আসতে লাগল।

তৎক্ষণাত আমরা অমা রামাইতা ইজ রামাইতা অলা কিন্নাল্লাহা রামা বলে ফায়ার করলাম। দুঃখের বিষয় বিমানের বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে গুলী ছুড়লাম। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তিন তিনটি বিমানে আগুন ধরে যায়। বিমানের ভিতরে যত গোলা বারুদ অস্ত্রছিল সবগুলো বিস্ফোরিত হয়ে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডলী ধারণ করে যমিনে পতিত হল। এর পিছনে আরো দুটি বিমান নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে পশ্চিমের পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। চোখের পলকে বাকি বিমানগুলো পালিয়ে যায় এখন বিমানমুক্ত আকাশ আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করতে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। পরে বুঝতে পারলা, যে অমন করে পাহাড়ের চূড়ায় খোলা আকাশের নিচে বিশ্রাম নেয়া ঠিক হয়নি। গোয়েন্দা বিমান উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাডার ও দুরবীন নিয়ে চক্কর দেয়ার সময় আমাদেরকে দেখে ফেলে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

দিনের বাকি সময়গুলো আমরা এক গুহায় কাটিয়ে দিলাম। মাগরিবের নামায পড়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। একটানা একটা পর্যন্ত হাটলাম। শরীর খুব ক্লান্ত তাই ঝরনার এক কিনারে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পেট ভরে পানি পান করে হাটতে লাগলাম। শুধু পাহাড় আর পাহাড় তারই বাকে বাকে হাটছি। এবার সবাই দিক হারিয়ে ফেলেছি। কোন দিক যাচ্ছি তা কেউ বলতে পারিনি। ঠিক এমনই মুহুর্তে এক অদ্ভুত প্রাণী এসে আমাদের গতিরোধ করে দাড়াল এ ধরনের ভয়ঙ্কর অদ্ভুত প্রাণী অতীতে আর দেখিনি। প্রানীটি একটি খেকশিয়ালের চেয়ে বেশি বড় হবে না। কিন্তু জন্তুটির দিকে তাকালে পঞ্চ আত্মায় পানি থাকে না। হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায়।

আমরা দাঁড়ালে প্রানীটি দূরে সরে যায় পথ চলতে শুরু করলে ক্ষিপ্রগতিতে আবার সামনে এসে দু পা উপরে তুলে আক্রমণ করতে চায়। দাঁড়িয়ে গেলে আবার দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েকবার এমনটি করার পর ফায়ার করার জন্য বন্দুক তাক করি হায় একি কান্ড অমনি চোখের পলকে মিলিয়ে যায়। কয়েকবার এমন করার পর মনে হল এ আসলে এ ধরনের কোন প্রাণী নয় আসলে এটা দুষ্ট জ্বীন ভয় দেখাতে অমন করে। বার বার বাধাগ্রস্ত হলে দুজন সাথীকে পাহাড়ের চূড়ায় পাঠালাম আশপাশে কোন শহর, বন্দর বা গাঁও দেখা যায় কি-না। যদি পাওয়া যায় তবে আমরা লোকালয়ে চলে যাব। দুজন চলে গেল ঘণ্টা খানেক পরে এসে সংবাদ দিল "রফিক ভাই দুশমনরা অতি সন্নিকটে এ পাহাড়ের ওপার্শ্বেই দুশমনের ঘাঁটি। নিচে তাকিয়ে দেখি সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো ট্যাংক দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ সাঁজোয়ান যান। অসংখ্য খিমা, দুটি কপ্টার। মনে হয় জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাতি জ্বালাচ্ছে। বেশ কজন টাক্কু মাথায় পাহাড়া দিতে দেখেছি। বাতির আলোতে খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এদিকে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা দিক পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলতে লাগলাম। এমতাবস্থায় প্রাণীটি আমাদের আগে আগে হাটতে দেখেছি। এমনকি ফজর পর্যন্ত প্রাণীটি আমাদের রাহাবরি করছে। তারপর একিন হল, হিংস্র প্রাণীর সুরতে আল্লাহর গায়েবী মদদ।

একবার আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনদিন এক গুহায় অবস্থান করতে ছিলাম। আমাদের সাথে খাবারের কিছুই ছিল না। দুজন সাথী অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাদের অসুস্থতার কারণে আমাদের কাফেলা সামনে এগুতে পারিনি। এমন খানার অভাবে সকলের জিভই ওষ্ঠাগত হয়ত না খেয়েই শহীদ হতে হবে সাথে যা পানি ছিল তা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে বললাম প্রিয় সাথীরা মনে হয় আমার গুনার কারণে আমার রব (রাজ্জাক) রিযিক বন্ধ করে দিয়েছে, চলুন দেখি তওবা করে দোয়া করে দেখি আল্লাহ ক্ষমা করে রিযিকের ব্যবস্থা করেন কি না। তারপর সবাই মিলে তওবা ও দোয়া করলাম। চেয়ে দেখি নেড়ে মাথা কাল একটি গাভী গুহার সামনে দাঁড়ানো। একজন সাথী পিয়ালা নিয়ে দুধ দোহন করতে গেল গাভিটি নড়াচড়া করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানির পাত্র দুধে

ভরে গেল এবং সকলেই পেট ভরে পান করলু উক্ত গাভীর দুধ পান করে অসুস্থ সাথী দুজনও সুস্থ্য হয়ে গেল। দুধ দোহনের পর গাভিটি আস্তে আস্তে চলে গেল তারপর আর কোনদিন এমন গাভী দেখিনি।

কাফেলা এগিয়ে চলল বিরামহীন গতিতে। কত মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত পেড়িয়ে। হাট নেই বাজার নেই, নেই লোক বসতি। খাবার সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই। ক্ষুধার তাড়নায় জীবন যায় যায়। জঠর জালা নিবারন করতে লতা জাতীয় পত্র পল্লব চিবিয়ে জীবনধারনের চেষ্টা করি। মনে হয় বিষাক্ত জাতীয় পত্র পল্লবের রস পান করার কারণে সকলের পেট খারাপ হয়ে যায়। পর পর পাতলা পায়খানায় শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে পরে। পথ চলার শক্তি হারিয়ে ফেলি এক গিরি কন্দরে আশ্রয় নেই সাথীরা রুগ্ন শরীরে ঘুমিয়ে পরে আমার চোখে ঘুম নেই অঘুম নয়নে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালাম। যে হে আল্লাহ আমরা তোমার দুর্বল বান্দাহ আমাদের হেফাজত কর। এ গিরি কন্দরে যদি আমাদেরকে হালাক করে দাও তবে দিতে পার। এতে তোমার কি ফায়দা হবে? অতএব আমাদের হেফাজত করার দায়িত্ব তোমার হাতে সোপর্দ করে দিলাম তুমি হেফাজত কর। মুহুর্তের মধ্যে আমি ঘুমে আক্রান্ত হয়ে পরি এক সময় সপ্নে দেখি মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী সাহেব বলছেন রফিক! তুমি তোমার কাফেলা নিয়ে এদিকে এসো। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল আমি সাথীদের জাগিয়ে বলি তোমরা দুরাকাত নামায পরে নাও নতুন করে কোমর বাধ। এখানে রিযিকের ব্যবস্থা হবে না। আর একটু সামনে অগ্রসর হতে হবে রিযিক আমাদেরকে ডাকছে। সাথীরা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলেন ফজর হওয়ার এখনো খণ্টা খানেক বাকি। রাত ঘুট ঘুটে অন্ধকার চন্দ্র অস্ত গিয়েছে বেশ কতক্ষণ আগে। সাবধানে পথ চলছি কোন দিকে যাচ্ছি তা কেউ বুঝতে পারছি না। কি আশ্চর্য এখনো কানে বাজছে হাক্কানী সাহেবের ডাক” হে রফিক কাফেলা নিয়ে এদিকে এসো কখনো ডানদিকে ডাকছে আবার কখনো বামদিকে। ডাকের বিপরীত দিকে যেতে চাইলে আরো জোরে ধমকের সাথে ডাকে। একি জিন্নাতের ডাক না হাক্কানী সাহেবের তা বুঝতে পারিনি। কারণ কোন মানুষ তো দেখছি না। ফজরের নামায পড়েও হাঁটতে লাগলাম।

সকাল প্রায় ৮টা আমরা একটি পাহাড়ের মোর ঘুরতেই দেখি দুশমনের ঘাটি। রাশিয়ান সৈন্যরা ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে টইল দিচ্ছে। পূবের পাহাড়ের চূড়ায় মেশিনগান ও দূর পল্লার দুর্বিন নিয়ে বসা। অবস্থা বেগতিক দেখে আল্লাহুআকবার ধ্বনিতে ফায়ার করে এগিয়ে যাই। তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পরে চতুর্দিকে। দুশমন এলোপাথারি ভাবে গুলী নিক্ষেপ করতে করতে সাজোয়া জানগুলো ছুটে পালিয়ে গেল। ওরা গুলি ছোরার সময় আমরা পাথরের আড়ালে অপেক্ষাকৃত একটু নিচু জায়গায় লকিয়ে ছিলাম। এর মধ্যে ৬জন সাথী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরেছিলেন। কিছুক্ষণ পর গুলীর কোন আওয়াজ না পেয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখি লেজ গুটিয়ে দুশমন পালিয়েছে দুটি লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এখনো রক্ত ঝড়ছে। কয়েকটি তাবু খুলে নিতে পারেনি। তবে দু একটি রশী কাটা তাবুর ঝুলন্ত কোনাগুলো বাতাসের সাথে খেলা করছে।

ঘুমন্ত সাথীগুলোকে জাগিয়ে তাবুর ভিতর প্রবেশ করে দেখি গরম, রুটি, হালুয়া, গোশত ও ভুনা খিচুরি। খানে অলা কর্মীদের জন্য অপেক্ষা করছে। পার্শ্বের তাবুতে রয়েছে ঘি এর টিন, সোয়াবিন, ডালডা, চিনি, মসল্লা, চাল, ডাল ও বহু কার্টুন ডিম এবং কয়েক বস্তা চিকন চাল। তারই একটু দূরে খাদ্য বোঝাই একটি ট্রাক চালক বিহীন পরে আছে অপর এক তাবুতে ছিল বেশ কিছু বারুদ। তবে অস্ত্র ছিল না।

আমি সবাইকে নিয়ে শোকরানা হিসেবে দুরাকাত নামায পড়ে খানা খেতে বসলাম। প্রথমে খেলাম রুটি হালুয়া। জবাহ ছাড়া মুরগির গোশত খেতে মানা করি এদিকে ভুনা খিচুরি ও রয়েছে প্রচুর। সামান্য খিচুরি বর্তনে নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করি মুখের নেয়ার সাথে সাথে এমন বদবু আরম্ভ হল যে নারী ভুরি বের হয়ে আসার উপক্রম। খিচুরি আর খাওয়া হল না। সবাই রুটি খেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। নাশতা সেরে দুজন সাথীকে পাঠিয়ে দিলাম লোকালয় খোজার জন্য যদি কোন বস্তি পাওয়া যায় তবে যেন খাদ্য দ্রব্যগুলো বিতরণ করার জন্য লোক নিয়ে আসেন। দুজন দুটি রাইফেল নিয়ে লোকালয়ের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। দু তিন ঘণ্টা পর দশবারজন যুবক নিয়ে ফিরলেন। যুবকদের সাথে আলাপ

আলোচনা করে জানতে পারলাম রাশিয়ান সৈন্যরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করে মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করত অহরহ। তাছাড়া গোটা গ্রাম লুণ্ঠন করে চাল-ডাল, আটা-ময়দা খাসী-মুরগী নিয়ে আসত। কারও ঘরে এক কাপর্দকও রেখে আসেনি। ঘরে ঘরে চলছে অনাহার আর অর্ধাহারের পালা। লোকজন খুব মানবেতর জীবন যাপন করছে।

আমি যুবকদের হুকুম দিলাম তোমরা দু-এক ঘণ্টার মধ্যে এখানকার খাদ্য দ্রব্যগুলো নিয়ে যাও। আমার এক নূরস্তানী সাথী ড্রইভিং জানত তিনি ট্রাকের ভিতর বাকি মালগুলো ভর্তি করে যুবকদের সহ ট্রাকখানা গ্রামে নিয়ে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যে মাল খালাস করে গাড়িটি বহুদূরে ফেলে রেখে পদব্রজে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। ক্ষুধার্ত গ্রাম বাসি ট্রাক বুঝাই খাদ্য দ্রব্য পেয়ে আনন্দে আত্মহারা আমরাও ভুভুক্ষ জনতার মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। গ্রামবাসীরা হারাহারি মতে মালগুলো গ্রাম প্রধান থেকে বুঝে নিলেন।

আমি আমার সাথীদের একটি ব্যংকারে বসিয়ে বললাম তোমরা এখানে জিকির-আজকার করতে থাক। আমি একটু ঘুরে আসি। আমি সবগুলো স্থান ঘুরে দেখছিলাম এর মধ্যে এক পাহাড়ের এক সুড়ংগ পথ দৃষ্টিগোচর হল। কৌতুহলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভয়ে হাটু কাঁপছিল বুক করছিল ধরফর। ভয়ে আমার চলার গতি রোধ করতে পারেনি। সুরংগ পথটি প্রায় ৫০গজ দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুজন লোক চাপাচাপি করে চলা যায়। ভিতরে কে যেন অন্ধকার লুট করে এনে রেখেছে। নিজের হাত নিজের চোখেই দেখা যায় না। অমানিসার অন্ধকার মনে হয় এখান থেকেই সাপলাই করা হয়। ভয়ে গা শিউরে উঠে। এত দুঃসাহস করা ঠিক হবে না মনে করে বেরিয়ে এসে আবার টর্চ নিয়ে ঢুকলাম চেয়ে দেখি সারি সারি মাইন স্তুপাকারে সাজানো। ১টি বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান, ৫০টি পিচ গ্রেনেড, ৩টি ক্লাশিনকভ, ৫টি এল.এম.জি ৩ সেট অয়ারলেস ও কিছু বিছানাপত্র। তাছাড়া কয়েক কার্টুন গুলী এদিক ওদিক পরে আছে। আমি মেশিনগান ও এল.এম.জি কোনদিন হাতে ধরে দেখিনি ও চালাইনি। মাটির নিচে মাইন কিভাবে পুতে রাখতে হয় তাও জানিনা। অস্ত্রগুলো কয়েকবার দেখে চালানোর পদ্ধতিও আবিস্কার করলাম। আর একটি বিষয়

লক্ষ্য করলাম যে এটা এমন দুর্গ যেখানে শতবৎসর বোমিভিং করলেও দুর্গের কিছুই করতে পারবে না। এখানে বিশ্রাম নেয়াটাই অধিক নিরাপদ মনে করলাম। তাই সবাইকে ডেকে পাঠালাম। আমাদের তুর্কমেন তিনজন সাথী আমার নির্দেশ সরাসরি না মেনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল এমন সময় দুশমনের পুতে রাখা মাইন তাদের তিনজনের প্রাণ কেড়ে নিল। লুটিয়ে পরল ভুপৃষ্ঠে। অনেকেই মন্তব্য করতে লাগল আমীরের নির্দেশ না মানায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাইনটি এতই শক্তিশালী ছিল যে তিনজন সাথীর কোন অস্তিত্বই খুজে পাওয়া গেল না। নাঈম নামক এক ব্যক্তি বললেন "রফিক ভাই তুর্কমেনের সাথীরা জিকির আজকার করে একটু আগেই দোয়া করছিলেন যে হে আল্লাহ জান মাল নিয়ে তোমার রাস্তায় জিহাদের ময়দানে চলে আসছি তোমার জান তুমি নিয়ে নাও আর আমাদের বেহেশত আমাদের দিয়ে দাও। হে আল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে শহীদ করে দিও যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছরিয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকি আমাদের দাফন কাফন করতে যেন অন্য সাথীদের কষ্ট করতে না হয়। আল্লাহ তাদের দোয়া তিন চার মিনিটের মধ্যেই কবুল করেছেন।"

অঘুম নয়নে পথচলা শরীরটা খুবই ক্লান্ত। সাথীদেরকে বিশ্রাম নিতে বললে সকলেই মুহুর্তের মধ্যেই নিদ্রাপুরিতে চলে গেল। আমি বিমান বিধ্বংসী মেশিনগানটি নিয়ে দূর্গের তোরণে এনে পাহারাদারি করতে বসলাম। ঘুমে চোখ ডুলো ডুলো করছে চোখের পাতাগুলো আপছে আপ মুজে আসে। সাথীদের হেফাজতের জন্য পাহাড়া দিতেই হয় আমার গাফলতির জন্য সবেমাত্র তিনজন সাথীকে হারালাম। বাকি সাথীদেরকেও যদি.........।

দুপুর বারটা বাজার কয়েক মিনিট বাকি। বিকট আওয়াজে পাহাড় কেঁপে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কাল কাল বিমানে আকাশ ছেয়ে আছে। মনে হয় পাখপাখালিরা ডিগবাজি খেয়ে খেলা করছে। প্রায় মিনিটে মিনিটে একটি করে বোমা ফাটছে। ভয়ে গা শিউরে উঠছে। আমাদের হয়ত আর রক্ষা নেই। ভেগে যওয়া সৈন্যরা পাঠিয়েছে বিমান বহর। আমাদের ঘাটি ও আশপাশের বস্তিগুলো তামা করে দেবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলাম সাথীদের জান ভিক্ষা চাইলাম। যেখানে ট্রাক

দাড়ানো ছিল বিমানগুলো সে এলাকায়ই বোমা ফেলত। কিছুক্ষণের মধ্যে যেন সাহস বেড়ে যায় এবার অনেক নিচে নেমে এসে ফেলতে লাগল। এক ঝাক বিমান আমার মাথার উপর দিয়ে চক্কর দেয়ার সময় মেশিনগানের ট্রেগার চেপে ধরি চোখের পলকে ঝাকে ঝাকে গুলি বেরিয়ে যায়।এবং ৬টি বিমান আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। মুহুর্তের মধ্যে জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যমিনে পতিত হয়। বাকি বিমান গুলো হাওয়ায় মিশে গেল।

বিমান হামলা থেমে গেলে গ্রামের লোকজন ছুটে আসেন আমাদের খোজ নিতে। সাথে কিছু খাবারও নিয়ে আসেন ওরা আমাদের তিনজন সাথীর শহীদের খবর পেয়ে খুবই দুঃখ পেল। আলাপ করে জানতে পারলাম ওদের গ্রামেও তিনটি বোম ফেলেছে কিন্তু তেমন কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়নি। আমি গণিমতের ভাল ভাল অস্ত্রগুলো সাথীদের বন্টন করে দিয়ে বাকিগুলো গ্রামবাসীর কাছে রেখে বললাম এগুলো দিয়ে আপনারা জিহাদ করবেন। আর যদি এ এলাকায় কোন মুজাহিদ কাফেলা আসে তা হলে ওদের দিয়ে দেবেন।

সেদিন আমরা সন্ধার একটু পরেই পথ চলতে লাগলাম। কিছু পথ অতিক্রম করতে না করতেই এক পাল খেত শিয়াল হুক্কা হুয়া সুর ধরে এদিকে আসতে লাগল। এটাকে অশুভ সংকেত মনে করে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাথীরাও আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। শিয়ালের অন্য দলটি অদুরে দাঁড়িয়ে আছে আমরা আবার পথ চলার ইচ্ছে করলে ওরা কামড় দিতে আসে। এভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বাধা উপেক্ষা করে সামনে এগুতে লাগলাম হায় অপর দলটি এসে প্রথম দলের সাথে মিলে গেল শিয়ালগুলো আমাদের আগে আগে দৌড়াতে লাগল। শিয়ালের পায়ের আঘাতে অসংখ্য মাইন বিস্ফোরিত হয়ে গেল। এবার মাইনমুক্ত পথে দ্রুত বেগে চলতে লাগলাম। এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিয়ালের সুরতে নুসরত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাইন পুতা পথটুকু আমরা নিরাপদে হেঁটে গেলাম। সারারাত ও এক দুপুর হাটার পর আমরা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পরি। নিয়ে আসা খাবার ও পানীয় শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। সামনে কদম উঠছে না তাই যাত্রা বিরতি দিতে বাধ্য হলাম। আমরা পাহাড়ের এক জীর্ন খন্দকে আশ্রয় গ্রহণ করি। খানিকটা

বিশ্রাম নেয়ার পর তিনজন সাথীকে টাকা পয়সা দিয়ে খাদ্য দ্রব্য ও পানিয় সংগ্রহের জন্য বাজারে প্রেরন করি।

পথ ঘাট অচেনা নিকটে কোন হাট বাজার বা লোকালয় আছে কি না তাও জানা নেই আল্লাহর উপর ভরসা করে সাথীরা বেরোলেন। পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে এক চারণভুমি অতিক্রম করার সময় কয়েকজন রাখাল থেকে এলাকার অবস্থা জানতে চাইলে রাখাল চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল" আমাদের গ্রামের কোন লোকজন নেই যারা রাশিয়ান ফৌজের নির্যাতন ভোগ করেনি এমন মা- বোন নেই তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেনি। লুট তরাজ তো নিত্য দিনের ইতিহাস বাজারের কথ্ বলতে গিয়ে বলল বাজার এখান থেকে অনেক দূরে। তবে আমাদের গ্রামে একটি ছোট দোকান আছে সেখান থেকে আপনাদের জরুরত সামান্য মিটাতে পারেন। চাল-ডাল, আটা, নুন, গুরসহ কাচামালও রয়েছে আপনারা বাজারে না গিয়ে দোকান থেকেই এগুলো সংগ্রহ করেন। তাছাড়া এমন সশস্ত্র অবস্থায় বাজারে গেলে বিপদ হতে পারে। বাজারেও তাদের ক্যাম্প রয়েছে। আপনাদেরকে দেখে মুজাহিদ বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের খেদমত করা খুবই প্রয়োজন ছিল কিন্তু এ মুহুর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না। ফেরার পথে এদিক দিয়ে আসবেন।"

রাখালের কথা শুনে সাথীরা খুবই খুশি হলেন এবং বললেন আচ্ছা বাবা এদিক দিয়েই আসব।" বলে দোকানের দিকে পা বাড়ালেন। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই টইলরত রুশী সৈন্যদের দুরবীনে ধরা পরে গেল। ওরা দেখছে দিন দুপুরে কাধে অস্ত্র ঝুলিয়ে তাদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে তিন মুজাহিদ। নিশ্চয়ই এদের পিছনে রয়েছে বিরাটশক্তি। তাছাড়া এত সাহস হতনা ওদের এসব নিয়ে ভাবছে দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা। ওয়ারলেসে ক্যাম্পে এ সংবাদ জানালে তাদেরকে বলাহল যে যত শীঘ্রই পার তোমরা ক্যাম্পে ফিরে এসো। সাবধান এদেরকে গুলী করো না। যদিও দেখ তিনজন আসলে এদের পিছনে রয়েছে বিশাল শক্তি। এদেরকে ডিল ছুড়ে বিপদ ডেকে এনো না।

ক্যাম্পের নির্দেশ পেয়ে টইলরত সোলজারগণ প্রাণপনে পালিয়ে গেল। এদিকের ক্যাম্পের বাকী সৈন্যরাও পালিয়ে গেল। আমরা দোকান থেকে

আটা গুর ও লবন নিয়ে ফিরে এলাম। রাখালগণ তাঁদের বকরি দোহন করে পয় পত্রগুলো ভর্তি করে রেখেছে। ফিরে আসার পথে দুধগুলো মশক ভর্তি করে দিল। বিকাল তিনটায় বাজার নিয়ে আমরা ফিরে আসি এবং রুটি তৈরির কাজে লেগে যাই। আটা গুলার জন্য মশক খুলে দেখি পানির পরিবর্তে দুধে ভর্তি। অগত্যা দুধ দিয়েই আটা গুলে রুটি তৈরি করে সাথীদের নিয়ে খেলাম। তারপর বিশ্রাম নেয়ার জন্য সবাই শুয়ে পরলাম।

মাগরিবের নামায পড়ে দিনের সেকা রুটি দুধে ভিজিয়ে সকলে পেট ভরে আহার করে ছামানাপত্র নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম। ১৫ থেকে ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারলেই আমাদের গ্রামের সন্ধান মিলবে। রাতে পৌঁছতে না পারলেও সকাল ৮টা ৯টার মধ্যে অবশ্যই পৌঁছে যাব। কয়েকদিনের বিরামহীন সফরের কারণে সবাই দুর্বল ও পরিশ্রান্ত। তাই আস্তে আস্তে পথ চলছি। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্র হয়।" আমাদের অবস্থা অনেকটাই সে রকম। তিনজন সাথীর ভয়ে যে সৈন্যরা পালিয়ে এসেছিল ওরাই পাহাড়ে এসে ছাউনি ফেলেছে, আমরা তা জানতাম না। ওরা মুজাহিদদের ভয়ে কোন প্রদ্বীপে জ্বালেনি। ঘোর অন্ধকার আমরাএক সময় হেঁটে হেঁটে ওদের ছাউনিতে ঢুকে পরি অমনি গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হল অকস্মাত গুলির আওয়াজ পেয়ে ঘাবরিয়ে যাই। ওদের গুলির জবাব না দেয়া সমীচিন মনে করলাম না। কারণ ওরা আমাদেরকে দুর্বল মনে করে অনেক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। অন্য মুজাহিদদেরকেও দুর্বল ভাববে।

তাই আমরাও বেপরোয়াভাবে গুলি ছুড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলা-গুলি থেমে গেল কেন থেমে গেল তা জানতে পারিনি। তবে আমাদের সব কয়টা গ্রেনেড ও সমস্ত গুলি শেষ হয়ে গিয়েছে। একে তাই আমরা উক্ত স্থানটিকে বায়ে রেখে ভিন্ন পথে এগিয়ে যাই। উক্ত গুলির বিনিময়ে আমাদের একজন হাজারা গোত্রিয় জানবাজ সাথী মায়মুন দামলা শাহাদাত বরণ করেন। বিপক্ষে কোন হতাহতের খবর নিতে পারিনি তাদের সাক্ষাত তো ইহজগতে আর পাব না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুঃখভরা মন নিয়ে পথ চলছি।

দুর আকাশের চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। সারা দুনিয়া তিমিরে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সুবহে সাদিকের বেশি বাকি নেই। আমাদেরও পথ অনেকটা ফুরিয়ে আসছে বলে মনে হয়। এলাকাটা যেন পরিচিত মনে হচ্ছে মনে করলাম এখানে যাত্রা বিরতি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম নিয়ে প্রত্যুষে এলাকার সন্ধান নেব। আর সামনে অগ্রসর হলেও হয়ত আমাদের মহল্লা পিছে পরে যাবে, তাই নিরাপদ আশ্রয় খোঁজছিলাম। এমন সময় বিকট আওয়াজে আমাদের গতি রোধ করে দিল।" দৌর্স অর্থাৎ থামো" দস্তে খোদরা বালা কুন? নিজের হাত উপরে উঠাও তাছলিম আত্মসমর্পন কর। ওদের আওয়াজে প্রতিধ্বণিত হয়ে লুটিয়ে পরল চারিদিক। মোকাবেলা করার মত সাহস বল হারিয়ে ফেলেছি। আমরা প্রতিপক্ষের বেষ্টনিতে পরে গেলাম। বাধ্য হয়ে অস্ত্র পায়ের কাছে রেখে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন চিৎকার করে বলছে তোমরা ৫০ মিটার সরে দাড়াও।" আমরা তাই করলাম। আওয়াজ কেমন যেন মেয়েলি মনে হচ্ছে চির চেনা সুর।

একজন লোক রশী নিয়ে এগিয়ে এলো। মুখোশ দিয়ে মাথা ঢাকা চেনার উপায় নেই। হাত দুটি পিছনে নিয়ে বাধতে বললেন আমি করলাম "জনাব বাঁধতে হবে না যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যান অমনি নেকাপ খুলে অস্ত্র রেখে পায়ে লুটিয়ে পরল এবং বলল রফিক ভাইয়া এতদিন পরে এলে আমাদের সব শেষ করে দিয়েছে রুশী হায়েনারা।" এবার রফিক আবিস্কার করলেন এতো আর কেউ নয় এতো প্রিয়তমা সুফিয়া। রফিক সহস্তে সুফিয়াকে যমিন থেকে টেনে উঠিয়ে বললেন, "আজ আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পন করেছি ইস কি মজা! একজন নারীর কাছে জানবাজ মুজাহিদের আত্মসমর্পন। নাও সুফিয়া তোমার পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তোমার হেরেমে বিচার করো তোমার মনের মত। রিমান্ডে নাও ইচ্ছামত, রফিকের কথা শুনে সুফিয়া হেটে কুটপাট। তখন অনেকেই ঘুমের ঘোরে অচেতন ছিল। সুফিয়ার বাহিনীর সবাইকে একটি খিমায় নিয়ে গেল। তাদের জন্য চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করল। আমি সাথীদের নিয়ে চা পান করলাম। এদিকে নামাযের আযান হল আমাদের আগমনের খবর সুফিয়া বাহিনী ছাড়া আর কেউ

জানেনি। কয়েকটি জামায়েত ফজরের নামায আদায় হল। আমরা যে জামায়েতে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে আমাকে ইমামতি করতে হল।

নামায ও দোয়ার পর সবাইকে মাঠে জমায়েত হতে নিদের্শ দিলেন। আমরাও গিয়ে শামিল হলাম। আব্বু আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন এবং টেনে নিলেন বুকের কাছে। কয়েক মিনিট ছীনা-বিছানা নীরব ভাষায় আলাপ হল। তারপর সকলের সাথেই কুশল বিনিময় করলাম এবং এলাকার অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি নানা জনের মুখ থেকে শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের মহল্লার লোকজন অন্য কোথাও আছে কিনা। সকলেই না বলে উত্তর দিলেন অনেক পরিচিত চেহারা না দেখে নাম নিয়ে জানতে চাইলে ওরা কোথায় দেখছি না যে? উত্তরে বললে রাশিয়ান বোমায় কেড়ে নিয়েছে না দেখা মুখগুলো। আমি সবাইকে নিয়ে শুহাদাদের জন্য দোয়া করলাম। আমি আম্মুর কথা জিজ্ঞাসা করলে আব্বু হাতের ইশারা দিয়ে একটি তাবুর দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন, “যাও বাবা তোমার আম্মু তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে আঁচল ভিজাচ্ছে।

আমি আমার সাথীদের একটি তাঁবুতে বসিয়ে আম্মুরনিকট ছুটে গেলাম। আম্মু আমার সংবাদ পেয়ে তাঁবুর ফাক দিয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে পদযুগলে চুম্বন করে হাল হাকিকত জানতে চাইলাম। ছোট ভাই আরিফের কথা জানতে চাইলে আম্মু কেঁদে কেঁদে বললেন বাবা আজ বহুদিন ধরে তার কোন সংবাদ পাইনি। জানিনা আমার বুকের ধনকে আল্লাহ কোন অবস্থায় রেখেছেন।” তিনি আরো বললেন, “শুনেছি বহু মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের হায়েনারা শহীদ করে দিয়েছে। আর বন্ধ করে দিয়েছে অগনিত মসজিদ মাদরাসা। বাছা আমার................ ।

আমি আম্মুকে সান্তনা দিয়ে বললাম। আরিফ সহিসালামতে দাওরায়ে হাদীসের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ভাল রেজাল্ট করে পাশ করেছে সে নাকি কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবে। ওর ক্লাশের একজন ছাত্রের মাধ্যমে এ সংবাদ পেয়েছি আর কান্দাহারের ছাত্র শিক্ষকের কোন ক্ষয় খতি এখনো হয়নি। আল্লাহ নিরাপদেই রেখেছেন আপনি ওর জন্য দোয়া করতে থাকুন তারপর অন্যান্য আত্মিয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ নিতে বেরিয়ে

গেলাম। আমাকে দেখে খিমায় খিমায় কান্নার রোল পরে গেল। আমি সবাইকে সান্তনা দিতে গিয়ে বললাম বিপদে ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহকে স্মরণ করাই উত্তম ইবাদত। আপনারা কান্নকাটি না করে দ্বীনের জন্য ও দেশের জন্য দোয়া করতে থাকুন।

পঞ্চাশ

আরিফ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে ফজরের নামায আদায় করে খিমার অভ্যন্তরে বসে কালাম পাক তিলাওয়াত করছেন। বেদুঈন বালা আড়ি পেতে মুসাফিরের সুমধুর তিলাওয়াত শুনছে ও বাকা চোখে একটু একটু দেখছে। তিলাওয়াত শেষে এশরাকের নামাযের জন্য দন্ডায়মান হলেন জুলাইখা এক গ্লাস ছাগলের দধি কয়েকটি বাসিরুটি ও চা নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আরিফ সালামান্তে পিছন ঘুরে বসতেই চার চোখেল মিলন ঘটে গেল। একে অপরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে ওরা যেন নিরব ভাষায় কথা বলছে। আরিফের অন্তরে ভেসে উঠল আল্লাহর সেই আয়াত যেখানে মুমিনদের দৃষ্টি নত রাখতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে আরিফের দৃষ্টি নিচে নেমে এল এবং জুলাইখার দৃষ্টিও লজ্জায় নুয়ে পরল।

জুলাইখা মুখমন্ডলে ওড়না টেনে দিয়ে বলল , "ভাইজান একটু নাস্তা নিয়ে আসছি তা খেয়ে নিন। আরিফ মুচকি হেসে বললেন, "এত ভোরে রাত পোহাতে দাও না। এ বলে হাত বাড়িয়ে খাবার গুলো খেয়ে নিলেন।

জুলাইখার ঘরে বিমাতা শৈশবেই হারিয়েছে তার মাতাকে। মাতার শুন্যতা সে কোনদিন অনুভব করেনি। বিমাতা আদর সোহাগ করে লালন পালন করেছেন ওকে কোনদিন মাতার অভাব বুঝতে দেয়নি তাকে। মায়ের আদর স্নেহই সে দিন দিন বড় হতে থাকে। কাবিলার হুজুরের কাছে সে কুরআন শরীফ ও সামান্য মাসয়ালা শিক্ষা করেছে জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে মন্দ ছিল না। ভাগ্যের পরিহাস বেদুঈন কাবিলায় জন্ম না হলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারত।

বিমাতা চোখে চোখে রাখে জুলাইখাকে। চোখের আড়াল হতে দেননি কোন সময়। জুলাইখা দিন দিন মায়ের কাজে সহায়াতা করে। ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল, টুপি ইত্যাদি বানাতে পারে ও। ইদানিং যদিও আধুনিক তাবুর প্রচলন খুব বেশি কিন্তু বেদুঈনরা চর্ম নির্মিত তাবু বেশি ব্যবহার করে তাই তাবু তৈরিতে ও খুব বেশি পটু। যদিও আগে ছাগুল নিয়ে মাঠে মাঠে বেড়াত। ইদানিং তা আর করতে দেননি। আরিফ চা-নাশতা করে শয্যা গ্রহণ করলেন। শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মাথা ব্যথা চোখে জ্বলন, জ্বর জ্বর ভাব। তাই একটু বিশ্রাম নিবেন, তিনি শয্যা গ্রহণের খানিক পর শরীরে কম্পন আরাম্ভ হল। প্রচন্ড শীত অনুভব হচ্ছে, গরমের দিন থাকার কারণে কাঁথা কম্বল ও দেয় নি।

বিশ-ত্রিশ মিনিট যেতে না যেতেই জ্বর ওঠে গেল সারা শরীরে। প্রচণ্ড জ্বর, কাঠফাটা জ্বর। মাথা ব্যথায় অস্থির, শীতে থর থর করে কাঁপছে। অসহনীয় যন্ত্রনা সইতে না পেরে আল্লাহ বলে কুঁকাচ্ছে, জুলাইখার আম্মা নুরজাহান জুলাইখাকে ডেকে বললেন, "জুলাইখা! দেখতো মেহমানের কি হচ্ছে। অসুস্থকি-না, এমন করে কুকাচ্ছেন কেন?

জুলাইখা বিমাতার কথা শুনে দৌড়িয়ে মেহমানের তাবুতে গিয়ে দেখে মেহমান বিছানায় এপাশ-ওপাশ গড়া গড়ি খাচ্ছেন, আর আল্লাহকে ডাকছেন। জুলাইখা তার নরম হাতটি মেহমানের কপালে স্থাপনপূর্বক দেখল, প্রচণ্ড জ্বরে হাত পুড়ে যাওয়ার উপক্রম। জবেহ করা কবুতরের ন্যায় কাঁপছেন। জুলাইখা তার তাঁবু থেকে নিজ হস্তের তৈরি ভেড়ার লোমের নির্মিত কম্বলটি এনে আপাদমস্তক ঢেকে দিল। আর গামছা ভিজিয়ে মুখমণ্ডল ও দুটি হাত পর পর মুছতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণ পর মশক ভরে পানি এনে মাথায় ঢালতে আরম্ভ করল। বেশ কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালার পর একটু আরাম বোধ করছিলেন।

বেদুঈন সর্দার ওয়াক্কাস পশুপাল নিয়ে অনেক আগেই মাঠে চলে গেছেন। যাবার পথে জুলাইখাকে ডেকে বলে গেছেন, মেহমানের সেবা-যত্ন ও খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য। মেহমান যেন কোন প্রকার কষ্ট না পান, সে জন্য তাম্বিও করে গেছেন। তাছাড়া এও বলে গেছেন যে, "আমি ফিরে

না আসা পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করেন। মেহমানের যাওয়ার ব্যবস্তা আমিই করে দেব।

জুলাইখা আরিফের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে, ও শিরায় বাম লাগাচ্ছে। আরিফ একটু স্বস্তি ফিরে পেলে হাতের ইশারায় বারণ থাকতে বললেন। জুলাইখা একটু গোস্যা ভরে বলল, "কেন! সুস্থ হয়ে গেছেন বুঝি না বিরক্ত বোধ করছেন?"

আরিফঃ বিরক্ত হব কেন? এখন যে একটু ভাল লাগছে! জুলাইখা আব্বু চারণ ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যাবার সময় আপনার সেবা যত্নের কথা তাম্বি করে গেছেন তাই...আরিফঃ তোমাদের থেকে যথেষ্ঠ আদর আপ্যায়ন ও সেবা যত্ন পেয়েছি। যা কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি। জীবন ভর শুনে আসছি, বেদুঈনরা নাকি খুব হিংসুক ও ঝগরাটে, তোমাদের থেকে পেলাম তার উলটো। জুলাইখাঃ আমরা অনেকটা নির্দয়ই হয়ে থাকি, তবে মেহমানের বেলার নয়। মেহমানের খেদমত করা তো নবীর সুন্নত, তাই আমরা সে সুন্নত আদায় করার চেষ্টা করি, যদিও তা কুলায়ে উঠতে পারি না। আরিফঃ আমি একটু সুস্থ্য হলেই চলে যাব, জুলাইখাঃ ইসসেরে! শরীর ভরা কাঠ কাটা জ্বর, চোখ দুটি লাল টকটকে, এখনো শরীর কাপছে ও কাথা মেড়ে শোয়ে শোয়ে বাহাদুরী গল্প করছে। পুর্ন সুস্বা না হওয়া পর্যন্ত এক কদমও যেতে দেব না। কত্তবড় সাহস! আরিফঃ তুমি ঝামেলা করো না বোন। আমি যাব দূরে, বহু দূরে। এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করা আদৌ ঠিক হবে না।

জুলাইখাঃ বহু দূরে যাবে? কোথায় যাবে বল না ভাইয়্যা? আরিফ! আমি চরম সীমান্ত পেরিয়ে বেলুচস্তানে যাব। সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে ঘুরে আমার একমাত্র. বড়ভাই রফিককে খুঁজব। তাছাড়া, জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুজাহিদ হয়ে দেশে ফিরব। লাল কুকুরদের প্রতিশোধ নেব। এদেশকে শত্রুমুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব, বুঝলে?

জুলাইখাঃ আমি কি তোমার মত এক গাড়ী কিতাব পড়ে আলেম হয়েছি? যে এত কিছু বুঝব! তবে যত ওয়াজই করেন না কেন এখানে তা কাজে আসবে না। তুমি ৮ বছর পর দেশে ফিরছ। বাড়ি-ঘর বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পিতা-মাতার খোঁজ এখনো পাও নি। আমার

ধারণা হয় আপনার আত্মীয়-সজন যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সুস্থ হয়ে পিতা-মাতার খোঁজ নেয়া যাবে। তা না হয় তোমাকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য করে নেব।

আরিফঃ তোমাকে ধন্যবাদ, আমাকে মাফ কর বোন। আমাকে পৃথিবীর কোন মোহ, কোন শক্তি ও ব্যাক্তি জিহাদের পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। পারবে না আমার চিন্তা-চেতনায় কেশ পরিমাণ ফাটল ধরাতে, আমি আমার জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে চাই। আরিফ শুয়ে শুয়ে তাঁবুর দ্বার দেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথাগুলো বলছিলেন।

জুলাইখা আরিফের শিয়রে দণ্ডায়মান ও আরিফের চেহারা বরাবার মাথা ঝুকিয়ে কথাগুলো শোন ছিল। আরিফের কথা গুলো ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত, তাই জুলাইখা মনে করল যে, মুসাফিরকে কিছুতে রাখা যাবে না। হৃদয়ের ব্যথার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চোখের মাধ্যমে। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে গেল আরিফের ললাটে ও গন্ডদেশে। আরিফ পার্শ্ব পরিবর্তন করে উপরে তাকিয়ে দেখেন বেদুঈন বালার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ও গন্ডদ্বয় সিক্ত হচ্ছে।

আরিফঃ একি জুলাইখা! অমন করে কাঁদছ কেন? তুমি কি তোমার মুসাফিরকে কাঁদাতে চাও? তুমি চাও না যে, আমি সুস্থ হই। তুমি চাও না দেশ শত্রুমুক্ত হোক?

জুলাইখাঃ আমি সবই চাই, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কথা হল যে আপনার বিরহে জীবন ধারণ আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার হৃদয় কেবলই চাচ্ছে আপনাকে মনিব বানাতে, আর আমাকে বানাতে আপনার বাঁদী।

বর্তমানে আমার স্মৃতি রাজ্যে তোমাকে ছাড়া কাউকে পাই না। তুমি আমার হৃদয় সিংহাসন জয় করে স্থায়ী আসন পেতে বসেছ। তোমার সুন্দর মুখশ্রী থেকে এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি সরাতে পারছি না। অমন করে কেন তুমি এলে এ বেদুঈন বস্তিতে? কেন আশ্রয় প্রার্থী হলে এ অভাগিনীর তাঁবুতে? এটা ঠিক কর নি মুসাফির ভাইয়্যা?

আমি বেদুঈন কন্যা, বংশানুক্রমেই তোমাদের কাছে আমি ঘৃণার পাত্র। পশু পালন ছাড়া আমাদের আর কাজ নেই। থাকি চারণভুমিতে,পাহাড়

উপত্যকায় শিক্ষা-দীক্ষা নেই বললেই চলে। তোমরা আভিজাত বংশীয় তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা আদৌ শোভা পায় না বরং দন্ডনীয় অপরাধ তবে ইসলামে যেহেতু গরীব-ধনীর ভেদাভেদ নেই সে হিসেবে....। মুসাফির ভাইয়া তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর তুমি যে আমার অন্তর কেড়ে নিয়েছ চুরি করেছ এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি আমার মনকে এ বলে শান্তনা দিয়েছি তুমি হলে নিকৃষ্ট বেদুঈন কন্যা আর তিনি হলে উচ্চ বংশীয় পাঠান যুবক তুমি হলে অশিক্ষিত মুর্খ আর তিনি হলে উচ্চ শিক্ষিত আলেম ও পরহেজগার। তুমি হলে বাদী সাদৃশ্য আর তিনি হলেন রাজকুমার। তুমি হলে দুঃখিনী অনাথিনী ও হতভাগিনী আর তিনি হলে ভাগ্য প্রসন্ন সৌভাগ্যশালী পাঠান। কোন সাহসে এত দুঃসাহস দেখাচ্ছ? তোমার অভিলাষ শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে। তোমার কল্পনা শুধু কল্পনার দরিয়ায় সাঁতার কেটে হারিয়ে যাবে। বাস্তবতার জগতে তার সাক্ষাত মিলবে না। আমার অন্তর অবাধ্য হয়ে গেছে এখন বুঝতে পেরেছি সমস্ত যুক্তি তর্ক বিবেচনা ও চিন্তা চেতনার উর্ধ্বে হল প্রেম। প্রেম কারো কথা মানতে চায় না। সবকিছুর উর্ধ্বে তার শীর সে চির অম্লান চির অক্ষয় চির বিজয়ী। তাকে হার মানানো যায় না। অতীতে কেউ পারেনি ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। অযথা চেষ্টা করে লাভ কি? তাই আমিও প্রেমের নিকট আত্মসমর্পন করেছি। এখন তোমার ইচ্ছা এতটুকু বলে জুলাইখা তার বিমাতার কাজে সাহায্য করতে তাবু ত্যাগ করল।

আরিফ শুয়ে শুয়ে জুলাইখাকে নিয়ে ভাবছে। বেদুঈনের ঘরে এমন মহিয়সী নারীর জন্ম নেয়া খুবই আশ্চর্য জনক। তার কথাগুলো দিলের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে। জুলাইখার ছায়া, তারকায়া, তার মায়া হৃদয় দর্পনে ভাসতে লাগল। নিজেই নিজের দিলকে বলতে লাগলেন তুই তো একজন বেদুঈন বালার নিকট বন্দি হয়ে গেলি। তুইতো তার কাছে ঋণী।" আরিফের দিল থেকে ক্ষনিকের জন্যও জুলাইখার আলেখ্য দূর হচ্ছিলনা। তিনি আরো ভাবছেন যে ওকে তো শরীয়তের পন্থা অনুযায়ী আপন করে নেয়া যায় কাছে আনা যায় কিন্তু তাকে নিয়েতো সংসার পাতাতো আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তিনি থাকবেন রণাঙ্গণে খুন রাঙ্গা পিচ্ছিল পথে একজন পরমা সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে কোথায় কিভাবে ঘুরাফেরা করা কিভাবে

সম্ভব হবে। না এসব চিন্তা করা যাবে না। নারীর ফাঁদে পা দিয়ে জিহাদের প্রোগ্রামকে বাদ দেয়া যায় না। এখান থেকে তাকে অচিরেই ফিরে যেতে হবে। যত সময় পার হবে তত প্রেম সাগরের ঢেউ উৎলাবে। শীঘ্রই বেরিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পনা করলেন।

সূর্য তার চিরাচিরিত অভ্যাসানুযায়ী সকাল পেরিয়ে দুপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আরিফের জ্বর ও সূর্যের তালে তালে বাড়তে লাগল। ঠান্ডা পানিতে শরীর মোছা মাথায় পানি ঢালার কারণে সাময়িকভাবে একটু আরাম অনুভব করতে লাগল। এখন পূর্বের তুলনায় জর অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। অসহনীয় যন্ত্রনায় আবার ছটফট করতে ছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরিফের মুখ থেকে আহ উহ আল্লাহ শব্দ বেরহচ্ছিল। বেদনা মিশ্রিত শব্দগুলো জুলেখার কোমল হৃদয়ে শেলের মত বিধছিল। জুলাইখার বিমাতার তাবুতে মায়ের সাথে দুপুরের খাবারের যোগান দিচ্ছিল। বিমাতা জুলাইখাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন মেহমানকে তাবুতে রেখে তুমি এখানে? মেহমান তো রোগে কাতরাচ্ছে। যাও ওর খবর নাও।"

জুলাইখা ত্রস্তপদে আরিফের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় মাথায় হাত বুলাচ্ছে। আরিফ হাত ছারিয়ে দিয়ে বলল "জুলাইখা তোমাকে কষ্ট করতে হবে না শুধু দোয়া কর রোগ মুক্তির জন্য এ বলে হাতটি আলতোভাবে সরিয়ে দিল। এ ব্যবহারে জুলাইখার অন্তর চূর্ন বিচুর্ণ হতে লাগল। মুখের ভাষা হারিয়ে গেল। তার চোখ ভরে গেল অশ্রুতে।

দুপুর বারটা রাখালরা পশু পাল নিয়ে নিজ নিজ বস্তিতে ফিরছে। কেউ আসছে আর আসার পথে ঠিক এমনই সময় ৪টি জঙ্গি বিমান বিকট আওয়াজে এলাকার উপর দিয়ে চলে গেল। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। পশুপাল ভয়ে এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করতে আরম্ভ করল। দেখ দেখ করতে করতে আরো ১০/১২ টা বিমান একসাথে চক্কর দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে আরম্ভ হল বোমভিং। অনুমান করা হচ্ছে যে বোমাগুলো রামাল্লার উপরই আঘাত হানছে। বেদুঈনরাও এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে প্রাণের ভয়ে বাঁচার তাকিদে।

বোমভিং শুধু রামাল্লায়ই সীমিত রইল না আশ পাশের এলাকাগুলোও বোমের আওতায় নিয়ে নিল। বেদুঈন পল্লীকেও ওরা ক্ষমা করেনি।

বেদুঈনরা আপন আপন সন্তানাদি ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে লাগল। পশুপালও দৌড়িয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলল। কে কোথায় কি অবস্থায় আছে তার খোঁজ খবর নেয়ারও কোন সুযোগ পায়নি। জুলাইখার আব্বা ও আরো কয়েকজন রাখাল এখনো পশুপাল নিয়ে বস্তিতে ফিরে আসেনি। তিনি দূর থেকে তাকিয়ে দেখছেন আগুন আর ধুয়ার কুন্ডলিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সর্দারজী হতবুদ্ধি হয়ে পশুপাল নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেছেন।

জুলাইখার আম্মা ওকেও পালানোর জন্য তাম্বি করে অন্যান্য গ্রাম বাসীদের সাথে অতিকষ্টে পাহাড়ে পৌছেন। কে কোথায় আছে তাৎক্ষনিক ভাবে খোঁজ নিতে পারেননি। বোমার আঘাতে বেদুঈন পল্লীর অনেকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। অনেক পশুপাল দগ্ধ হয়ে গেছে। অনেক তাবু ও খাদ্য দ্রব্য পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। সন্তান হারা জননীর বুক ফাটা চিৎকার স্বামী হারাদের আর্তনাদ পিতা-মাতাহীন এতিমের কান্না গোটা এলাকা প্রলংকার পরিস্থিতির অবতারণা করল।

আরিফ জ্বরের তীব্রতায় বেহুশ প্রায়। উঠে দৌড়ানোর তাকত সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। এ সংকটময় মুহূর্তে প্রাণ নিয়ে ভেগে যাওয়ার জ্ঞানটুকু নেই। তিনি শুধু এপাশ ওপাশ কড়ট বদলাচ্ছেন আর আল্লাহ আল্লাহ যপ করছেন। জুলাইখার অন্তরে জ্বলছে প্রেমের অনির্বার প্রদীপ শিখা। প্রেমের বীজ যে অন্তরে অংরিত হয় সে অন্তরে প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। প্রেমের আগুনে প্রেমাস্পদ ছাড়া সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়। এমন কি নিজের সত্বা থেকেও সে বেখবর থাকে। যেমনঃ

এশকে আঁসুলাস্ত কুচু বর ফরখত,
হারচে জুজ মাশুকে বাকী জুমলা ছুখত।

অর্থাৎঃ এশকের দাবানলে প্রেমাস্পদ ছাড়া সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে জুলাইখা হয়ে গেছে আপন ভুলা বোমভিং হচ্ছে না কিয়ামত হচ্ছে ঝড় বইছে না ঘূর্ণিঝড় তার কোন খবর নেই। কিভাবে রোগীর সেবা করা যায় কি করলে প্রেমাস্পদ রোগমুক্ত হবে এটাই তার চিন্তা। অচেতন প্রায় আরিফের মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালছে কেদে

কেঁদে বুক ভিজাচ্ছে। তার সমবয়স্কা সখিরাও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের কথাও মনে নেই জুলাইখার।

এদিকে বস্তি বাসিরা রুশীদের ভয়ে গ্রামে আসেনি। ওরা সারাদিন পাহাড়েই কাটিয়েছে।

একান্ন

সকাল ১০টা বিশ্রাম নিয়ে সবাই এক জায়গায় সমবেত হলেন। যারা এখনো পাহাড়ে আসেননি পল্লীসর্দার ওদেরকে ডেকে পাঠালেন। সর্দারজী সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন "হে আমার পল্লীবাসী! আমরা আজ মাজলুম অসহায় উদ্বাস্তু এবং নিজ দেশে রিপুজী। রাশিয়ান সৈন্যরা আাদের উপর জুলুম করেছে। অত্যাচার করেছে আমাদের নিরিহ লোকজনের উপর নির্বিচারে বোমা ফেলে হত্যা করেছে। এর পরিস্থিতিতে শরীয়ত আমাদের উপর কি হুকুম দিয়েছে তা আমরা মাওলানা রফিকের নিকট থেকে শুনব। তাছাড়া সময় বিশেষ কর্নেল জুলফিকার থেকেও কিছু শুনব তোমরা ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শুনবে।"

বর্তমানে আফগানিস্তানের হার হার আফরাদের উপর প্রতিটি ব্যক্তির উপর রুশীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। আমি আশা করি এ ব্যাপারে অনলবর্ষি আলোচনা করবেন আমাদের নয়ন মনি, নবাগত কমান্ডার মাওলানা রফিক। তারপর দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করবেন প্রবীন সমরবিদ অবঃ জেনারেল জুলফিকার সাহেব। আপনারা ধৈর্যের সাথে বসুন।"

মাওলানা রফিক দাঁড়িয়ে বললেন (হামদ নাতের পর) আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মৌলভী আক্রাম সাহেব, বয়বৃদ্ধ আব্বাজান প্রবিন মুরুব্বিয়ানে কেরাম এবং যুবক যুবতী ,ভাই-বোন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে বর্তমানে সকলের উপরই জিহাদ

ফরযে আইন। এ ব্যাপারে আমি লম্বা চুরা আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন মনে করি। তবে এতটুকু বলতে চাই যে আমরা আমাদের সাধ্যোনুযায়ী জিহাদের কাজ চালিয়ে যাব। এতে কি কারো দ্বিমত আছে?" উপস্থিত জনতা হাত তুলে জিহাদের পক্ষে সম্মতি জ্ঞান করেন। অতঃপর তিনি বলেন" আমরা যারা (যুবকরা) আছি তারা আজ থেকেই জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব। আর অন্যান্যদেরকে বলব আপনারা এ সমস্ত মুজাহিদদের খাদ্য যানবাহন ঔষধ গোলা-বারুদ, তাবু ও পোষাকের ব্যবস্থা করে দিবেন। রসদপত্রের অভাবে যেন ওরা পিছে আসতে না হয়। তাহলে অচিরেই দেশকে শত্রুমুক্ত দেখবেন, শান্তি ফিরে আসবে প্রতিটি ঘরে ঘরে।"

হে আমার প্রিয় এলাকাবাসী! আল্লাহর নুসরত আর মদদ তো আফগানের জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে, মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, অলিতে-গলিতে, পাহাড়ে-পর্বতে ও আকাশে-বাতাসে ঝঞ্জা বায়ুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন শুধু কুরবানীর বিনিময়ে তা কুড়িয়ে নিতে হবে। বিজয় হাতছানি দিয়ে আমাদেরকে ডাকছে বিজয় পদচুম্বনের অভিলাষে পাগলা ঘোরার মত ধেয়ে আসছে এখন চাই শুধু জান মাল ও সময়ের কুরবানী। আল্লাহ চাচ্ছেন এ তিনটি জিনিস কুরবানী দিয়ে বান্দাহ আমার হয়ে থাক। বিজয় আমাদের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছেন। এ বিজয় ছিনিয়ে নিতে হবে। জান মাল ও সময়ের কুরবানীর বিনিময়ে।" এ বলে তিনি খোদায়ী নুসরত আর মদদের কাহিনীগুলো এক এক শুনাতে লাগলে। আশপাশের খিমাগুলোতে মহিলারাও হৃদয় ভরে কথাগুলো শুনছিলেন। সুফিয়া, আতিকা হালিমা ছাবেরা, তাহমিনারাও প্রাণ ভরে মজার কাহিনী শুনছে।

মাওলানা রফিক আরো বললেন, "আফগানিস্তান যদিও পাহাড় পর্বত আর টেক টিলায় বেষ্টিত বা আচ্ছাদিত প্রকৃতি প্রস্তাবে কিন্তু তা নয়। আফগানিস্তান একটি কুলহীন প্রেমসাগরে লক্ষ শহীদের খুনে ঢেউ খেলছে। খুনের উর্মিমালায় লাখো শহীদের লাশ ভেলার মত ভাসছে। আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রেমিকরা এ প্রেমসাগরে সাঁতার কাটছে। প্রেমিকরা এমন এক সুরা পান করেছে যে সুরার উন্মাদনায় বিভোর হয়ে খঞ্জর হাতে নিয়ে

দৌড়াচ্ছে। দুশমনানে ইসলাম অর্থাৎ কাফির বাহিনীকে হত্যা করার জন্য এ কোন শরাবের মত্ততায় তাকে দুনিয়া থেকে করে দিচ্ছে বেখবর?

ওহে দেশবাসী আমি দেখছি ঐসব প্রেমিকরা যারা প্রেমাস্পদের হুকুম পালনকরানার্থে প্রেমাস্পদকে রাজি করার জন্য দুনিয়ার সুপার পাওয়ার রাশিয়ার ট্যাংক বহরের সম্মুখে জংধরা কুঠার হাতে নিয়ে ছুটে চলছে তার অতি আদরের অর্ধাংগিনী ডেকে বলছে, " ওগো আমার প্রাণের স্বামী আমাকে কার হেফাজতে রেখে যাচ্ছ? আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচি না। আমাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তাকাও একবার ফিরে তাকাও শেষ বারের মত আবার দেখে নেই। স্ত্রীর ডাকে সাড়া দেয়নি।

কলিজার টুকরো, নয়নের পুতুলি সন্তান-সন্ততিরা কেঁদে কেঁদে ডেকে বলছে ওগো আমার আব্বাজান! এ রিক্ত হাতে দুশমনের দিকে যাচ্ছ? দুশমন তোমাকে ফিরে আসতে দিবে না। ও আমার আব্বাজান তুমি চলে গেলে আমি কার গলায় জড়িয়ে ধরে ঘুমাব? কাকে আব্বু বলে ডাকব? কে আমাকে আদর করবে? আব্বু ফিরে চাও। এদিকে তাকাও! সন্তানের মোহে তাকে একবারও পশ্চাতে আনতে পারেনি। প্রেমের টানে পাগল হয়ে ছুটেছে।

পিতা-মাতা অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, "বাবা! আমাদেরকে এ বৃদ্ধ বয়সে রেখে কোথায় যাচ্ছ? আমাদের রেখে যেও না কে দেখবে? যেও না আমাদের রেখে যেও না। আয় ফিরে আয়। তবুও ডাকে সাড়া দেয়নি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও জিহাদের পথ থেকে বারণ করে ব্যর্থ হয়েছে। অর্জিথ ধন সম্পদ ডেকে বলছে ওহে ভান্ডারের মালিক বহু কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি তুমি আমাকে অর্জন করেছিলে। আজ ফিরে তাকাও। এসব সুলালিত আহ্বানও তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। সে যে প্রেমের শরাব পান করেছে। সে প্রেমের উন্মাদনায় তাকে শাহাদাতের দিকে আহ্বান করছে। তাই কুঠার হাতে ট্যাংক বহরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছে।

হে প্রিয় দেশবাসী! আমিতো দেখছি সে সব প্রেমিকদের যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রেম ঢেউ খেলতে থাকে। দেখছি স্ত্রীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে

ছিনিয়ে এনে কনকনে শীতের মধ্যে আঁধারে রজনীতে ক্লানিকভ হাতে নিয়ে মুর্চা পাহাড়া দিতে। দেখেছি অট্টালিকার চাকচিক্য হতে নিজেকে সরিয়ে এনে পাহাড়-জঙ্গলে, গিরি-কন্দরে উপোষ জীবন যাপন করতে। আমি দেখেছি ঐসব নওজোয়ান প্রেমিকদের যারা নারায়ে মাস্তানা লাগিয়ে গুলাবৃষ্টির সম্মুখে ছীনা টান করে দাঁড়িয়ে থাকতে।

প্রিয় দেশবাসী! বান্দার অন্তর থেকে যখন ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা,গাড়ী-বাড়ি, নারী ও জীবনের ভালবাসা থেকে অন্তরকে একেবারে পাক-সাফ করতে পারে তখনই সে দিলে এসে যায় আল্লাহর ভালোবাসা নবীর প্রেম ও দ্বীনের মহব্বত। তখন সে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। আল্লাহর সমস্ত হুকুম-আহকাম নবীর তরিকা অনুযায়ী মানা তার জন্য আসান হয়ে যায়। জিহাদের মত এত কঠিন এবাদতকে অম্লান বদনে মাথা পেতে বরণ করে নেয়। প্রেমাস্পদের দিদারের জন্য হয়ে যায় বেকারার। তখনই সে শাহদাতের অমৃত সুধা পান করার জন্য রনাঙ্গণে ছোটা ছুটি করতে থাকে। তখন মহান রাব্বুল আলামীন বান্দার বেকারারী দেখে শাহাদাতের পিয়ালা পান করিয়ে আপন কোলে নেন। শাহাদাতই হল ফানা ফিল্লাহর সর্বোচ্চ মাকাম। আল্লাহ সাথে সাথে সে প্রশান্ত আত্মার জায়গা করে দেন জান্নাতে।

প্রিয় দেশবাসী! আমি এমন মাতা-পিতাকে দেখেছি, যারা আদরের সন্তানকে জিহাদের পোষাকে সাজিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন যাও বেটা সাব্বাস রাশিয়ান কুত্তাদের হত্যা করতে করতে শহীদ হয়ে যাও। বেটা হয়ত বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনবে না হয় শহীদ হয়ে যাবে।

এমন স্ত্রীকে দেখেছি যে স্ত্রী তার প্রাণ প্রিয় স্বামীকে গোসল করিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে নিজের গলার হার বিক্রি করে অস্ত্র কিনে স্বামীর হাতে দিয়ে বলছে স্বামীগো আমার হককে আমি উঠিয়ে নিলাম তোমাকে ছেড়ে দিলাম দ্বীনের দুশমনের সাথে লড়াই করতে দ্বীন বাচাতে দেশ রক্ষা করতে। হয়ত বিজয়ী বেশে ফিরবে না হয় শহীদ হয়ে যাবে।

আমিতো দেখেছি এমন বোনকে, যে বোন তার ভাইকে ভৎর্সনা করে বলছে ছিঃ তুমি এখনো ইস্ত্রি করা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ছিঃ।

তোমার মত যুবককেরা মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে দেশকে শক্রমুক্ত করতে ইসলামী পতাকা উত্তলন করতে করতে ময়দানে চলে গেছে। নাও ভাই ভাইয়া, এ টাকাগুলো, গলার হার, কানের দুল আর হাতের চুরি বানানোর জন্য জমা করেছিলাম এগুলো তুমি রাহা খরচে, গোলা-বারুদ ক্রয়ে খরচ কর। যাও জলদি বেরিয়ে যাও। হয় বিজয়ী হবে না হয় শহীদ হবে।

আমিতো দেখেছি এমন খেলার সাথীদের যারা খেলাধুলা ত্যাগ করে একে অপরকে আহ্বান করছে কোথায় সফিক, আবু লুবনা, আতিক, শাব্বির, কোথায় ফরিদ, বদর, আনাস, মনির, তাহের ও আবু নাঈম তোরা আয়! এবার খেলব হাতিয়ার নিয়ে রুশী ফৌজের সাথে। আর নয় জীবন দেয়া নেয়ার খেলায় উঠব মেতে। আর নয় ঘুমিয়ে গোলামীর জিঞ্জির ছিরে আযাদীর মুকুট আনব ছিনিয়ে তোরা আয়! আর বিলম্ব সয় না আর দেরি মেনে নেয়া যায় না। খেলোয়াড়রাও এবার ডাকাডাকি হাকাহাকি করে ময়দানে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরেছে।

ওহে এলাকাবাসি আমিতো দেখেছি ঐসব ছাত্রদেরকে যারা ইলম আহরণের মধ্যদিয়ে নিশিদিন কাটিয়েছিল। ওরাও আজ তাদের কিতবাদি ভাজ করে নিজের ব্যবহৃত জামা-কাপড়, চশমা-ঘরি, জুতা, কম্বল, টিফিন কেরিয়ার বিক্রি করে জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ময়দানে জীবন বাজি রেখে জিহাদ করতে।

আমি দেখেছি, কৃষক-শ্রমিক,জেলে-তাতী, কর্মকার, স্বর্নকার, কুম্ভকার, সুতারদের তারাও আজ জিহাদের কাজে পিছিয়ে নেই। প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে অস্ত্র চালনা শিখছে। আবার সপ্তাহে ২/১দিনের জন্য ময়দানে গিয়ে লড়াই করে আবার নিজ নিজ পেশায় ফিরে আসতে।

দেখেছি আফগানের ঐসব ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিদের তারা ব্যবসা বা চাকুরী করছে একমাত্র দ্বীনের খাতিরে। ওরা তাদের ব্যবসার লাভ ও বেতনের কিছু অংশ জিহাদের ফান্ডে জমা করতে। ওরাও আবার সময় সুযোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে জিহাদের জন্য তৈরি হচ্ছে। আমি শুনেছি আফগানের আবাল বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসছে মুক্তির শ্লোগান-

সাবিলুনা, সাবিলুনা=আলজিহাদ=আলজিহাদ

তারিকুনা,তারিকুনা=আলজিহাদ=আলজিহাদ

আমেরিকা-রাশিয়া=তাব্বাত=তাব্বাত

আযাদীকি তরিকা=আলজিহাদ=আলজিহাদ

আযাদী কি আওরনাম=ইন্তেকাম=ইন্তেকাম।

হে আমার প্রিয় এলাকাবাসী! আফগান নাম প্রেম সাগরে রক্তের জোয়ার বইবে। আল্লাহর সেই প্রেম সাগরে রক্তের ঢেউয়ে সাঁতার কাটবে। আমি আল্লাহর দরবারে পূর্ণ আশাবাদী আল্লাহ আমাদের কুরবানী অবশ্যই কবুল করবেন এবং বিজয় দান করবেন। আমরা অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে, আল্লাহ আমাদেরকে আফগানিস্তান দান করলে আমরা তার বিধান মতে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও হাদীস মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করব।" তিনি আরো বলেন যে, আমি অপরাহ্নে আমার মুর্চার দিকে যাত্রা করব কেননা আমার কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী সাহেব বলে দিয়েছেন যে পিতা-মাতা ও এলাকার খবর জেনে জলদি ফিরে যেতে। এখানে এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করা যাবে না। আমীরের হুকুম মানা বা ইতাআত করা ফরয। তাই অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আপনারা আপাতত এলাকায় যাবেন না আবারও বিমান হামলা হতে পারে। পাহাড় খুড়ে ব্যংকার তৈরি করে থাকার ব্যবস্থা করুন। আর আপনারা অবঃ জেনারেল জুলফিকার সাহেবকে কমান্ডার মেনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। কিভাবে বোমা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় সে সব কৌশল শিক্ষা করুন। হায়াত থাকলে আবার ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ।" এতটুকু বলে বয়ান সমাপ্ত করেন।

অবঃ জেনারেল হায়দার বললেন "বাবারা বর্তমানে আমার বয়স ৭০ এর কোটায়। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা আমাকে ঘিরে ধরেছে। সামান্যতমঃ পরিশ্রমের কাজ করা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। আমি কিছু কিছু যুক্তি পরামর্শ দিতে পারব। আমার থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করো না। সবচেয়ে ভাল হয়, তোমরা মাওলানা রফিকের সাথে চলে যাও। সে তোমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেবে। আমি তোমাদের যাবতীয় যাতায়াত খরচ বহন করব।" এতে তোমরা কে কে যেতে পারবে তারা নামের লিস্ট দাও। যুবকদের মধ্যে ১২জন, মধ্য বয়সী ৩জন , আর ৬৭ বছরের একজন দাঁড়িয়ে গেলেন। রফিক ১৬ জনের নামের লিস্ট করে

একজন আমীর বানিয়ে শাইখুল হাদীস আল্লামা আঃ হক সাহেবের নিকট একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ওদের কয়েক মাস চলার মত অর্থ-কড়ি জেনারেল সাহেব দিয়ে দিলেন।

এদিকে পল্লীসর্দার ইয়ার মুহাম্মদ আফগানী তাঁবুতে ফিরে গিয়ে পত্নীর নিকট গিয়ে বললেন, "তোমার ছেলেকে আর কাছে রাখা যাবে না সে তাঁর আমীরের ইযাযত ছাড়া থাকবে না আর থাকতেও পারবে না। আমীরের হুকুম মানা ফরয। বিকালেই সে চলে যাবে সর্দারজী পত্নী একটু চিন্তিত অবস্থায় বললেন, "স্বামীগো সে তো চলে যাবে কিন্তু সুফিয়া? আমার মনের একান্ত ইচ্ছা আজই তাদের মোবারক বিবাহ সম্পন্ন করা হোক। অতঃপর সে সপ্তাহ খানেক থেকে যাক। তারপর বউমার টানে মাঝে মধ্যে আসবে।"

বুড়ো বুড়ির আলাপ আলোচনার পার্শ্বের খিমায় বসে আতিকা, রহিমা মাহফুজারা ভালভাবেই বুঝতে পারছে। সুফিয়া অন্যমনস্ক ভান ধরে বসে আছে খিমার এক কোণে। আতিকার পেটে পেটে ছিল দুষ্টুমি! সে দু কদম এগিয়ে সুফিয়ার পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে বলল, "কিগো সখি এগুলো কি শুনছি? আজই নাকি? সুফিয়া মুখের হাসিটা একটু সামলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত ফুর্তি করছিস কেন কি হয়েছে?

আতিকাঃ তুমি কি ছোট্ট খুকী! কিছুই বুঝনা?

আবার মানুষকে জিজ্ঞেস করছে কি হচ্ছে?

সুফিয়াঃ আমি কি তোর মনের কথা জানি?

ঃ এটা আমার মনের কথা নয় তোমার মনের কথা।

ঃ সুফিয়া আপা ও খুবই দুষ্ট সে এমনই করবে আলম খানের মাশুকরা এর চেয়ে বেশি কি করবে বা বলবে? এ কথা শুনে

আতিকার চেহারা লজ্জায় নত হয়ে আসছে। "রহিমা! তুমি অনেক বেড়ে কথা বলছ। এটা তোমার জন্য মোটেই উচিত হয়নি। এ প্রসংগে কুখ্যাত আলমের কথা আসতে পারে না। আর একটা কথা মনে রেখো গুনাহ থেকে তওবা করার পর তাকে ভৎর্সনা করতে আল্লাহ মানা করেছেন।" রহিমা লজ্জাবনত মস্তকে আতিকার হস্ত ধারণপুর্বক ক্ষমা চেয়ে নিল।

মাহফুজার উষ্ঠযুগলে হাসির রেখা টেনে বললো, “আরে সময় তো বয়ে যাচ্ছে বাজে কথার সময় কই? তোমরা চল সবাই আমাদের সম্মানিত মুয়াল্লিমা সুফিয়া আপাকে নিয়ে ঝর্নায় চল। একটু পরে পশুপালের পানি সংগ্রহের জন্য ভীড় হয়ে যাবে। চল সুফিয়া আপার গোসলের কাজ সেরে নেই।

ঃ কিরে! আমি কি নিজে নিজে গোসল করতে পারি না? আর এ সময়ে আমাকে গোসল করতে কোনদিন দেখেছিস? উত্তরে মাহফুজা বলল।

ঃ মানুষের জীবনে অন্যেরা ৩টি গোসল করিয়ে দেয়। প্রথম দু গোসলে হাসে, আর শেষের গোসলে কাঁদে। যেমন ভূমিষ্ঠের পর আর বিয়ের গোসলে হাসে মৃত্যুর গোসলে কাঁদে। আপনার এটা হল দ্বিতীয় গোসল বুঝলেন আপা?

সর্দারপত্নী পরামর্শ ফাইনালে পৌঁছে, বালিকাদের তাঁবুতে এসে বললেন “কোথায় আতিকা, মাহফুজা, রহিমা তোমরা শোন! আজ বাদে যোহর, তোমাদের সম্মানিতা মুয়াল্লিমা মাওলানা সুফিয়া বেগমের শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হবে সে হবে আমার পুত্র বধু। বহুদিন আগেই সুফিয়া আমার পুত্র বধুর মর্যাদা পেত। দুঃখের বিষয় আক্দ হওয়ার মাত্র দুতিন মিনিট পূর্বে, রাশিয়ান সৈন্যরা হামলা করে বরকে অপহরন করে নিয়ে যায়। তারপর আবার কনের প্রচেষ্টায় জীবনে বেঁচে যায়। সে অনেক ইতিহাস। এখন কথা হল তোমরা জলদি যা ওকে সুন্দর করে গোসল করিয়ে দাও আর দুজনে সবুজ খিমাটি সুন্দর করে বাসর সাজে সু সজ্জিত কর। আর কয়েকজনে মিলে খানা পাকানোর ব্যবস্থা কর। উদ্বাস্তু শিবিরে সবাই খাবে। সকলের দাওয়াত আজ দুপুরে। যাও জলদি যাও।”

এদিকে পল্লীসর্দার কয়েকজন যুবককে হুকুম দিলেন, পালের বড় বড় ৫টি খাসি জবাই করে গোশত তৈরি করতে। আর একজনকে বলে দিলেন দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিতে। আজ যেন কোন খিমায় রান্না করা না হয়। তিনজনকে পাঠিয়ে দিলেন, কিছু হাট-বাজার করে আনতে। বিবাহের কাপড় চোপর, গয়না-অলংকার তো আগেরই আছে। এগুলোর আর প্রয়োজন নেই।

পুরা বস্তির পুরুষ মহিলা ও যুবক যুবতীরা হাঁকা-হাঁকি, ডাকা-ডাকি করে বিভিন্ন কাজ লেগে গেল। ১২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে খানা পিনা তৈরি থেকে নিয়ে যাবতীয় কাজ অল্প সময়ে সমাধা হয়ে গেল। মাওলানা মায়ের নিকট এসে সালাম দিয়ে বললেন "আম্মাজান আপনাদের ফায়সালার উপর আমার কোন মন্তব্য নেই। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। তবে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে যদি মাতার হুকুম হয় তাহলে মায়ের হুকুম পালন করব না। রফিকের মা বললেন বাবা! আল্লাহর কাছে আমাদের হুকুমের মূল্য নেই। আল্লাহর মর্জির বাইরে তোমার আব্বা-আম্মা কোন হুকুম দেবেন না।"

রফিক মায়ের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে বললেন, "মাগো আজ আমি আমার একমাত্র আদরের ছোট ভাই আরিফকে রেখে বিয়ে করতে যাচ্ছি এটা আমার দিলে বার বার দাগ কাটছে। খোচা লাগছে ও যদি আমার পার্শ্বে থাকত..... ।

ঃ বাবা! এমন ইচ্ছাতো আমারও ছিল কিন্তু ওরযে কোন খবর পাচ্ছি না। সে যদি ফিরে আসে তবে ওকে বুঝিয়ে বলব। যা বাবা গোসল করে আয় নামাযের সময় ঘনিয়ে আসছে।" রফিক ঝর্ণায় গোসল সেরে, খিমায় ফিরে এলেন। ৬জন মুজাহিদ সাথীরাও খুব আনন্দিত। কিছুক্ষণ পরই আযান হল। সকলেই ছুটে এল পশ্চিমের পাহাড়ের পাদদেশে, সমতল ভূমিতে। এখানে কাথা-কম্বল ও চাদর দিয়ে চাদুয়া নির্মান করেছে, রোদ থেকে বাঁচার জন্য। সবাই এসে সুন্নত নামায পড়তে লাগল। সুন্নতের পর মৌলভী আক্রামের ইমামতিতে ফরয নামায আদায় করলেন। তারপর সুন্নত পড়ে শুরু হল বিয়ের অনুষ্ঠান। সর্দারজীর উকালতীতে বিবাহ কাজ সমাধা হল। মৌলভী আক্রাম খুৎবা পাঠ করে, নব দাম্পত্তির সুখময় জীবন কামনা করে দোয়া করলেন। দোয়া করলেন সমস্ত মুজাহিদ ও দেশবাসির জন্য।

এবার খানা-পিনার অনুষ্ঠান। সকলেই নিজ নিজ থালা বাটি এনে হাজির হল। যুবকরা খানা পরিবেশনে লেগে গেল। ৬জন মুজাহিদ মেহমান ও পল্লীর বয়স্ক মুরুব্বীদেরকে এক সাথে বসিয়ে খানা খেতে দিল। মাওলানা রফিককে সবুজ রংএর তাবুতে নিয়ে বসাল। এদিকে সুফিয়াকে

বিয়ের সাজে সজ্জিত করে উক্ত খিমায় পাঠিয়ে দিল। সুফিয়া খিমায় ঢুকার সাথে সাথে সালাম দিল। রফিক সালামের উত্তর দিয়ে হৃদয়ের ভালবাসা উজার করে ললাটে একখানা চুমু বসিয়ে দিলেন। অতঃপর পৃথক পৃথক জায়গায় দাড়িয়ে শোকরানা নামায আদায় করলেন। পেশানীর উপরিভাগের চুল মুঠি দিয়ে কি যেন দোয়া পড়লেন। আতিকারা শরবৎ মধু ও একই প্লেটে করে খানা নিয়ে এল। একে অপরকে দুধ, শরবত খাওয়ালো খানা খেল।

মাওলানা রফিক জায়নামাযে বসে সুফিয়াকে প্রাণ ভরে দেখছিলেন। সুফিয়াও ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আড়ে আড়ে দেখছে তার প্রেমাস্পদকে। এক পর্যায়ে রফিক ঘোমটা সরিয়ে বলল, "আমার কাছে তোমার পর্দা কিসের সুন্দরী? তোমার মুখকানা আমাকে প্রাণ ভরে দেখতে দাও।" সুফিয়া লজ্জা ভরে তার মাথা নত করে বসে রইল। একে অপরকে মনের আনন্দে দেখতে লাগল।

মাওলানা রফিক সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, "সুফিয়া তুমিতো সেই রামাল্লা দুলালী যাকে নিয়ে আমি ছোট কালে খেলাধুলা করেছি। তুমিতো সেই সুফিয়া, রফিকার সাথে তোমার কাটত রাত দিন ২৪টি ঘণ্টা। তুমি যে হবে আমার রাজরানী, অর্ধাঙ্গীনি তা কি কোনদিন ভাবছি? তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেয়ে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। তাই হৃদয় খুলে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। সুফিয়া দু-চার মিনিটের মধ্যেই তুমি আমার হৃদয়ে জগদ্দল পাথরের মত বসে গেলে। বার বার মন চায় তোমার সৌন্দর্য অবলোকন করতে, জড়িয়ে ধরে রাখতে। দুঃখের বিষয় জামানায় তা দিচ্ছে না। দ্বীনের তাকাজায় তা পারছি না। আমার সাথীরা বিভিন্ন রণাঙ্গণে লড়াই করছে। আর আমি যদি তোমাকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মত্ত থাকি তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? আজকের দিনে তোমার আমার বিয়ে হওয়াটাই এক বিরাট পরীক্ষা। এ পরীক্ষা শুধু আমার নয় এ পরীক্ষা তোমারও আল্লাহ পরীক্ষা নিতে চাচ্ছেন, আমার অন্তরে পরমা সুন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা বেশি না দ্বীনের ভালোবাসা বেশী। স্বামীকে কাছে রেখে আনন্দ ভোগ করার জুরুরত বেশি, না না জিহাদ করার প্রয়োজন বেশী। এটা আমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা। এ পরীক্ষাতে ১০০ নম্বর পেয়ে পাশ করবে কি সুফিয়া?

সুফিয়ার চোখের পানি ফোঁটায় ফোঁটায় রফিকের উরুতে ঝড়ছে। আধভাঙ্গা সুরে বলল, "তুমি একাই পরীক্ষায় পাশ হবে, আর আমি ফেল হব তা কি করে হয় বীর পুরুষ? দ্বীনের জন্য জিহাদের সব ধরনের কষ্ট মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। আল্লাহ যেন তাওফিক দান করেন।" রফিক সুফিয়ার কথায় যারপরনাই খুশি হলেন মহানন্দে চুমা বসিয়ে দিলেন নরম স্থানে।

রফিক বিদায় বেলা বলে গেলেন। "সুফিয়া! যদি আমার চির বিদায় হয় আর যদি ফিরে না আসি বা শাহাদাতের খবর পাও, তবে আমার আদরের ছোট ভাই আরিফ ফিরে এলে, তাকে বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ ভোগ করবে। এতটুকু বলতে না বলতেই রফিকের চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। সুফিয়াও কাঁদতে কাঁদতে বলল "স্বামীগো আমি কি শুধু তোমার অপেক্ষায়ই থাকব? আমিও জিহাদ করব শহীদ তো আমিও হতে পারি!" সুফিয়ার কথা শুনে রফিক হেসে ফেললেন।

বিকালে আসরের নামায আদায় করে, সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ৬জন মুজাহিদ সহ মুর্চার দিকে ফিরে যেতে লাগলেন। রফিক বার বার ঘার ফিরিয়ে পিছন দিক তাকিয়ে দেখছেন। সুফিয়াও অপলক নেত্রে স্বামীর পথপানে চেয়ে রইল। বাসর ঘরের স্বাদটুকু কারো ভাগ্যে জুটল না।

বায়ান্ন

মাওলানা আরিফ রোগের তীব্রতায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় পরে রইলেন। বেদুঈন দুলালী আর আরিফ ছাড়া এই বস্তিতে আর কেউ নেই কোন হেকিম নেই, কোন ডাক্তার নেই। তাছাড়া বোমের আঘাতে বেশ কিছু এলাকা লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে। ঝলসে গেছে গাছ-পালা আর গর্ত হয়েছে স্থানে স্থানে। আল্লাহর অপার মহিমা জুলাইখার রোগীর তাঁবুটি অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেল। তিল পরিমানও ক্ষতি হয়নি।

জুলাইখা ঝর্ণা থেকে পানি এনে মাথায় ঢালছে ভিজা কাপরে শরীর মুছে দিচ্ছে হাতে পায়ে তৈল মালিশ করে দিচ্ছে। সন্ধার একটু আগে আরিফের জ্ঞান ফিরে এল। চেয়ে দেখে পার্শ্বে উপবিষ্ট বেদুঈন কন্যা জুলাইখা। সে কাতর সুরে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে "হে আল্লাহ গরীবের বন্ধু অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্থল ও বালা মসিবত দুর কারী মহান রাব্বুল আলামীন! আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও মুসাফিরের রোগ মুক্ত করে দাও। আপনি কুদরতী এলাজ (চিকিৎসা) করে শিফা দান করুন। আপনাকে ছাড়া সিফা দান করার আর কেউ নেই। হে আল্লাহ নিষ্ঠুর বোমায় সারা বস্তী উজাড় করে দিয়েছে হে আল্লাহ রাততো ঘনিয়ে এল পুরা এলাকায় কোন লোকজন নেই আমি তোমার অসহায়িনী, অভাগিনী, অবলা বান্দী একা একা কি করে এ আধার রজনীটি কাটাব। তোমার সাহায্য আর রহমত ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই আমি তোমার দরবারে রোগীর জান ভিক্ষা চাই। আমার জীবনের বিনিময় হলেও মুসাফিরের জীবন রক্ষা কর। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

আরিফ একজন অবলা বেদুঈন মহিলার এত দরদ মিশ্রিত প্রার্থনা শুনে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। বুক ভরা মায়া মমতা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা রোগীর শিয়রে হাজির। রোগীর সেবা করতে গিয়ে আরাম-আয়েশ ও ঘুমকে হারাম করে দিয়েছে আহঃ কত উদার কত মহত তার চরিত্র। আয় আল্লাহ এর প্রতিদান তুমি তাকে দান কর। দোয়া করলেন আরিফ। জ্বর আগের তুলনায় একটু কমে আসছে। যোহর আসর কেটে গেছে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। এখন উঠে মাগরিবের ও কাযা নামাযগুলো আদায় করবে। শোয়া থেকে উঠার চেষ্টা করলে জুলাইখা ধরে বসিয়ে দিল। বাইরে বেরুতে চাইলে ধরে ধরে বাইরে এনে একটি দরির মাচায় বসতে দিল। আরিফ সেখানে বসে অজু বানাচ্ছে। আরিফের কাছে পুরা এলাকাটা মনে হচ্ছে এযন ভুতুরে নগরী। তারপর জুলাইখার নিকট থেকে বোমভিং ও লোকজনের পালিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারলেন। আরিফ নামায পড়ে দোয়া করে জায়নামাযে বসে আল্লাহ আল্লাহ জপ করছেন।

সুর্য অস্তপারে হারিয়ে যাওয়ার প্রায় আধা ঘণ্টার পর বেদুঈনা পশপাল ও সন্তানাদি নিয়ে পল্লীতে এসে হাজির হলেন। বেদুঈনরা মনে করেছিল

জুলাইখা ও মুসাফির দুনিয়াতে বেঁচে নেই। বলাবলি করছিল যে নিষ্ঠুর বোমায় কেড়ে নিয়েছে মুসাফির আর জুলাইখার প্রাণ অনেকেই কেঁদেছে। জুলাইখার বৃদ্ধা মাতা কেদে কেঁদে অস্থির কেবলই বলছেলিনে "আয় আল্লাহ আমাকে নিয়ে জুলাইখাকে রেখে যেতে। না আমাকেও তার সাথে নিয়ে যেতে। আয় আল্লাহ তোমার কুদরত বুঝা বড়ই কঠিন।" লোকজন ফিরে এসে দেখল জুলাইখার তাঁবুতে মিট মিট করে প্রদ্বীপ জ্বলছে। সকলেই এ অলৌকিক কান্ড দেখে আশ্চর্যবোধ করলেন। দলে দলে আবাল-বৃদ্ধা বণিতারা ওদেরকে দেখতে গেল।

বিমাতা চিৎকার দিয়ে তাবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জুলাইখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছিলেন "বেটি তুই এখনো জীবিত আছিস আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন আয় আল্লাহ তুমি কত মহত তোমার কুদরতের কোন সীমা নেই। যারা বাঁচার জন্য ছুটাছুটি আর দৌড়াদৌড়ি করেছে ওদের মধ্যে অনেকেই পরপারের যাত্রী হয়ে গেছে। যারা বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে তোমার রহমতের আশায় বসে রইল তারাই তোমার খাস দয়াগুনে বেঁচে গেল। নিশ্চয়ই তোমার কুদরত আর ক্ষমতা ও রহস্য বুঝার সাধ্য কারো নেই। সত্যি তুমি কুদরতওয়ালা। বস্তির লোকজন আবার নতুন করে তাবু রচনায় লেগে গেল। মহিলারা নতুন করে উনুন তৈরি করে রান্না করতে লাগল।

আরিফের জ্বরের মাত্রা কখনো কমে কখনো বাড়ে। জুলাইখা ছাগলের দুধ গরম করে আরিফকে দিয়ে বলল "ভাইজান দুদিন যাবত তো কিছুই খাওয়া হয়নি এভাবে তো রোগ আরো বেরে যাবে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে আপনি এ দুধটুকু খেয়ে নিন।" আরিফ হাতের ইশারায় বারণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু জুলাইখা নাছোড় বান্দী। দুধ চামুচে করে মুখে উঠিয়ে দিতে লাগল। এমন করে অনেক জোড়াজুরি করে আধাগ্লাস দুধ পান করাল।

আরিফ জুলাইখার পেরেশানি দেখে নিজের কষ্ট আড়াল করে বললেন "জুলাইখা রাত তো ১২টারও অধিক হয়ে গেছে। এখন আমার অবস্থা অনেকটা ভাল। মনে হয় ভাল হয়ে গেছি ঘুমে চোখের পাতি বন্ধ হয়ে আসেছে। আর পারছি না প্রদ্বীপটা নিভিয়ে চলে যাও বিশ্রাম করগে আমার জন্য তো তুমিও রোগী হয়ে গেলে। যাও বোন আমাকে একটু ঘুমুতে দাও।

আরিফের সুললিত বচন জুলাইখার বুঝতে বাকি নেই জ্বরে চেহারায় রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে। তাই জুলাইখা একটু মুচকি হেসে বলল, "মুসাফির ভাইয়া আমার জন্য হয়ত বিরক্ত বোধ করছেন ঠিক আছে আপনি মনের আনন্দে ঘুমান। আমি চলে যাচ্ছি।" এ বলে প্রদীপটা ফু দিয়ে নিভিয়ে শিয়রের অদূরে বসে রইল। শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজটুকু গোপন করে বসল।

আরিফ ভাবছে জুলাইখা সত্যি চলে গেছে। রাতের দ্বিপ্রহর অতীত হতে চলেছে। আরিফের চোখে ঘুম নেই। জ্বরের মাত্রা দ্বিগুণ প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অনেক কষ্টে আল্লাহকে ডাকছেন আরিফ। জুলাইখা তার অস্থিরতা অনুভব করে সইতে না পেরে সে বিড়ালের মত আস্তে আস্তে এসে মাথায় হাত বুলালো। আরিফ হঠাৎ চমকে উঠে হাতটি চেপে ধরল এতো চির চেনা সেই নরম হাত। যে হাতটি দিন রাত ২৪ ঘন্টা তার দেহের উপর খেলা করেছে।

আরিফ হাতটি চেপে ধরে আস্তে বলে উঠল চোর ধরেছি চোর।" জুলাইখা আনন্দে আত্মভোলা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি চোর ধরেছেন ভাইজান?" আরিফ জ্বরের ভিতর দিয়েও একটু রসিকতা করে বললেন, "মন চোর।" জুলাইখা ঃ মন কি চুরি করা যায়?" আরিফ অবশ্যই চুরি করতে পারে জুলাইখারা। জুলাইখা ঃ নিজেই চোর আর মানুষকে চোর সাব্যস্ত করে। নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপায়।

আরিফ ঃ তুমি আমাকে চোর বললে?

জুলাইখা ঃ অবশ্যই আরো বলব, একশ বার বলব।

আরিফ ঃ মানুষকে চোর ডাকলে যদি শান্তি পাও তবে আরো ডাকো। এতে আমার আপত্তি নেই। রাতের আচরণ আর কথা-বার্তায় জুলাইখার প্রেম সাগরে বাণ ডাকল আর তুমুল বেগে বইছে ঘুর্ণিঝড়। এভাবেই রাতটি পোহায়ে ভোর হল। আরিফ তায়াম্মুম করে বসে বসে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পরলেন। জুলাইখাও তার বিমাতার তাঁবুতে শুয়ে ঘুমিয়ে গেল।

এলাকার লোকজন রাতের আঁধারে ধ্বংসলীলা দেখতে পারেনি। রাত পোহালে ছোট বড় সবাই ঘুরে ঘুরে পল্লীটা দেখতে লাগল স্থানে স্থানে

বোমার আঘাতে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। যে সব লোক প্রাণ হারিয়েছে। ওদের লাশের কোন সন্ধান মিলেনি। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

গর্তগুলোর তলদেশে পানি চিক চিক করছে। দেখতে ডালিমের রসের মত। অনেকেই সে পানিতে হাত মুখ ধৌত করছে। বেদুঈন সর্দার ধমক দিয়ে বলছেন, "সাবধান না জেনে এ পানি পান করবে না এবং রান্না-বান্নার কাজে ব্যবহার করবে না। হতে পারে বিষাক্ত।

তিপ্পান্ন

প্রভাত সমীরণ এলোপাথাড়িভাবে বইছে। পাখিরা গান ধরেছে। প্রভাত সূর্য কাঁচা কাঁচা রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটু আগে ফজরের নামায আদায় করে মুসুল্লীরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরেছেন। যুবক-যুবতী ও পৌঢ়রা ছাগল দুহনে লেগে গেছে।

পল্লীসর্দার ইয়ার মোহাম্মদ আফগানী ও অব: জেনারেল জুলফিকার সাহেব নামায সমাপন করে একটু পায়চারী করছেন। সর্দারজী জেনারেলকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজ তাঁবুতে এলেন এবং উভয়ে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। সর্দারজী এক ফাঁকে সুফিয়াকে ডেকে বললেন, "মা সুফিয়া তোমার খালুজী আসছেন, চা-নাস্তার ইন্তেজাম কর।" সুফিয়া অল্প সময়ের মধ্যে চা-নাস্তা হাজির করল। জুলফিকার সাহেব চা পান করে বলতে বাধ্য হলেন যে, এ ধরনের চা দু-চার বছরে পান করেছি বলে মনে হয় না। সর্দারজী বললেন বৌমা আমার সব কাজেই পটু, সে আমার অতি আদরের রফিকার স্থান পূরণ করেছে। ওর শাশুড়িও তার জন্য খুবই অনুরাগী। তুমিও দোয়া করবে বৌমার জন্য। নাস্তার পর্ব সমাধা করে তারা আবার পরিস্থিতির আলোচনায় ফিরে গেলেন।

সর্দারজী বলল, আমরা আর কত পাহাড়-কন্দরে বসবাস করব? পল্লীর দিকে যাওয়া দরকার, কিভাবে গ্রামে যেতে পারি তা নিয়ে চিন্তা করুন।

জেনারেল বলল, পল্লীতে যেতে হলে বা স্থায়ী বসবাস করতে হলে ব্যাংকার আরো মজবুত করতে হবে। শিশু ও মহিলাদের আপাতত না নেয়াই ভালো হবে। আমার ইচ্ছা, আমি যুবকদের নিয়ে পল্লীতে যাব, ব্যাংকার তৈরি করব এবং বোমের টুকরোগুলো সংগ্রহ করব। "জেনারেলের কথা শুনে সর্দারজী সমস্ত যুবকদের ডেকে এনে বলেন, "তোমার এক্ষুণি জেনারেল সাহেবের সাথে যাবে। তিনি যা নির্দেশ দেন তা মেনে চলবে।" এ বলে সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন।

যুবকরা দা, শাবল, খন্তা, কুঠার ও কোদাল নিয়ে জেনারেল সাহেবের পিছু পিছু চলল। আনুমানিক ১১টার দিকে এসে পল্লীতে প্রবেশ করল। জেনারেল প্রথমেই বোমার টুকরোগুলোর তালাশ করতে ও মাটি খুঁড়ে বের করে জমা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। যুবকরা তাই করতে লাগল।

জেনারেল সাহেব দুজন যুবক নিয়ে চলে গেলেন পশ্চিমের পাহাড়ে। ওদিকে বেশ বোমবিং করে ছিল। বোমের টুকরো তালাশ করতে করতে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলেন। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে, অনেক মানুষের চলাফেরা দেখতে পান। আর তাছাড়া বেশ কিছু তাঁবুও দৃষ্টিগোচর হল। জেনারেল সাহেবের কৌতূহল জাগল ওই পল্লীবাসীর খোঁজ খবর নেয়ার। তিনি যুবকদ্বয়কে সংগে নিয়ে ঐ দিক চলছেন।

বিকাল ১ টার দিকে জেনারেল সাহেব বেদুঈন বস্তিতে এসে হাজির হলেন। রোদ খাঁ খাঁ করছে। পানির পিপাসায় কলিজা ওষ্ঠাগত। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। পেশানী থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরছে। একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিতে দাঁড়ালেন। সেখানে বেশ কয়েকজন বেদুঈন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আগন্তুকের আগমনে একজন দৌড়িয়ে গিয়ে চর্ম নির্মিত বিছানা এনে বসতে দিলেন। অন্য একজন গিয়ে ছাগলের দধি ও মাঠা নিয়ে এলেন। জেনারেল সাহেব ও যুবকদ্বয় মাঠা পান করলেন তৃপ্তি সহকারে এবং আদায় করলেন আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রকাশ করলেন বিদুঈনের কৃতজ্ঞতা।

একে একে অনেকেই চলে এলো বৃক্ষের নিচে। বেদুঈন সর্দার ছিলেন একটু দূরে কাজে ব্যস্ত। জেনারেল সাহেব বস্তির গণ্যমান্য লোকদের সাথে কথা বলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, একজন যুবক সর্দারজীসহ আরো কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন। সালামান্তে একে অপরের কৌশল বিনিময় করেন। জেনারেল সাহেব প্রথমেই বস্তির ক্ষয়-ক্ষতি ও আহত নিহতের সংখ্যা জানতে চাইলে, সর্দারজী একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

আহতদের দেখার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে সর্দারজী বেশ কয়েকটি তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং ঘুরে ঘুরে সবই দেখালেন। তবে আহতদের তুলনায় নিহতদের সংখ্যা একেবারেই কম। আর যতটুকু যখমী হয়েছে তা খুবই কম। এমনকি চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে। সর্দারজী মেহমানদের নিয়ে গেলেন নিজ খিমায়। জুলাইখা তখন আরিফের শয্যা পার্শ্বে বসে চামুচের সাহায্যে দুধ পান করাচ্ছিল।

মেহমানদের সম্মানার্থে জুলাইখা উঠে দাঁড়াল এবং মেহমানদের বসতে দিল। আরিফ বিছানার এক পার্শ্বে শুয়ে আছে, দৃষ্টি তার বিপরীত। আরিফ ভেবেছিলেন এরা বস্তির লোকজন। হয়ত কোন কাজে আসছেন সর্দারজীর নিকট। মেহমানরাও তেমন একটি নজর দেয়নি শোয়া ব্যক্তিটির দিকে। সর্দারজী চা-নাস্তার হুকুম দিলে জুলাইখা ছুটে গেল চা নাস্তার জন্য। এবার চলল তাদের আলোচনা। সর্দারজী বললেন, "বাবা! আপনারা অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন আমাদের খোঁজ নিতে। তাই আপনাদের জানাই মোবারকবাদ। তাছাড়া, আরো বহু কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ কারণে যে, আপনারা পাঠান বংশীয় লোক হয়ে আমাদের মত নীচ শ্রেণীর বেদুঈনদের খোঁজ নিতে আসা, কত যে, মহত্তের লক্ষণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সত্যি আপনারা মহৎ আপনাদের আগমনে গোটা বস্তিবাসী ধন্য। আল্লাহ্ আপনাদের প্রতিদানে ধন্য করুন। সর্দারজীর আলাপ-আলোচনায় আরিফ বুঝতে পারলেন, এরা বস্তিবাসী নয়, দূর থেকে আগত। তাই তাঁদের দেখার জন্য পার্শ্ব পরিবর্তন করে মেহমানের দিকে তাকিয়ে দেখেন হায়!

এরা তো আর কেউ নয়, আপন চাচাতো ভাই ছোহায়েল ও বাল্যজীবনের খেলার সাথী আজিজ গুল। এদের পার্শ্বে উপবেশন দূর সম্পর্কিয় খালুজান অব জেনারেল জুলফিকার সাহেব।

এতক্ষণে জুলাইখা চা-নাস্তা নিয়ে খিমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চা-পাত্র রেখে দিল সকলের সামনে। নিজ নিজ মর্জিতে চা ঢেলে পান করতে লাগলেন। আরিফ জুলাইখার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। জুলাইখাও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে ইচ্ছেমত। ডাগর দুটি আঁখি মেলে সেও তাকিয়ে আছে আরিফের দিকে।

আরিফ তার কাবিলার লোকদের সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে উঠে বসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। জুলাইখা তা দেখে দু'কদম এগিয়ে তাকে সাহায্য করল। এবার আরিফ তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে সালাম দিয়ে বললেন "খালুজান! কেমন আছেন? কোত্থেকে এলেন এ বস্তিতে? আরিফের কথা শুনে মেহমান সে দিকে তাকিয়ে দেখেন আরে! এযে আরিফ! সে এখানে কেন? সে তো ছিল কান্দাহার মাদ্রাসায়। সকলেই বিস্ময়ে হতভম্ভ। আরিফ ছিল একজন টগবগে যুবক! তার স্বাস্থ্যের এত অবনতি কেন প্রশ্ন করলেন জেনারেল সাহেব তাছাড়া এখানে কোন সুবাদে আসছে তাও জানতে চাইলেন।

আপন গোত্রের লোক দেখে আরিফের দুচোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। জুলাইখা উড়নাঞ্চলে সিক্ত আঁখি মুছে দিয়ে বলল, "জনাব! আজ দু-তিন দিন হয় তিনি আমাদের এখানে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন। তিনি এখানে এসে কিতবাদি রেখে তার নিজ গ্রাম রামাল্লায় গিয়েছিলেন। সেখানে নাকি বোমভিং করে পুরো গ্রামটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেখানে নেই কোন লোকজন, নেই ঘর বাড়ি। এমতাবস্থায় পাগলের মত ছুটে আসেন আমাদের মহল্লায়। তারপর হয়ে পড়েন অসুস্থ। তাই আমাদের এখানে রেখেছি।"

আরিফের অবস্থা দেখে ছোহায়েল তার মস্তকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "আরিফ ভাই, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি এত ঘাবড়াবে না ভালো চিকিৎসা করলে অল্পদিনেই সুস্থ হয়ে যাবে। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। আরিফ পিতা-মাতা ও মহল্লার অবস্থা জানতে চাইলে জেনারেল সাহেব বললেন, "ওসব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। দু একদিনের মধ্যেই আমরা রামাল্লায় ফিরে আসব।" চিন্তার কোন কারণ নেই। যে কয়জন শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের কথাও জানালেন তিনি। আরিফ জেনারেল সাহেবের কথা শুনে স্বস্থির নিশ্বাস ছাড়লেন। আনন্দে ভরে গেল মন প্রাণ। চেহারায় ফুটে উঠল রঙ্গিন আভা। রোগ যেন তার অনেকটা উপশম হল।

জেনারেল সাহেব বেদুঈন সর্দারের সাথে মূল বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "জনাব! দেশের অবস্থা ক্রমান্নয়ে খারাপ থেকে খারাপের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে। জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর কোন নিরাপত্তা নেই। জেনারেল রশিদ

দোস্তাম আমার অনেক জুনিয়র। তার কার্যকলাপ আমি অনেক কাছে থেকে দেখেছি। সে পুরো কমিউনিষ্ট। ডঃ নাজিবুল্লাহ আমাকে অবসর দিয়ে তাকে জেনারেল পদ দিয়েছে। বর্তমানে ডঃ নাজিবুল্লাহর দক্ষিণ হস্ত। রাশিয়ান সৈন্যরা এতটুকু অগ্রসর হতে পারত না যদি তার সেনাবাহিনী গাইড না করত। এখন তো রাশিয়ানদের মিত্রবাহিনী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন নাজিবুল্লাহ সরকার। কাজেই উভয় দলকে হটানো ছাড়া দেশে শান্তি আসতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে চারিদিকে মুজাহিদরা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমন কোন দিন বাকি নেই যে, রাশিয়ান ও দোস্তামের সৈন্যরা নিহত হচ্ছে না। এখন ওরা দিশেহারা হয়ে নির্বিচারে বিমান হামলা চালাচ্ছে। নিরীহ মানুষ হত্যা করছে।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের যদি টিকে থাকতে হয় তবে জিহাদের পথ বেছে নিতে হবে। আপনাদের যুবকদেরকে ছাগল চরানোর কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দিন। তা না হয় আপনাদের পশু পালেরও হেফাজত হবে না। দেখবেন রাশিয়ান ফৌজ এসে বলে যাবে আমাদের ক্যাম্পে ৫০ টি খাসি পাঠিয়ে দাও। তখন আপনারা বাধ্য হয়ে নিজেরাই নিয়ে যাবেন পালের বড় বড় খাসি। আর যদি প্রশিক্ষণ থাকে, অস্ত্র থাকে, আর কলা- কৌশল জানা থাকে, তাহলে এদিকে নজর দেয়ার সাথে সাথে তাদের দেহ লুটিয়ে পড়বে যমিনে।"

জেনারেল সাহেবের কথাগুলো উপস্থিত মাতা-মুরুব্বীদের মনোপাত হল। তাই সবাইকে ডেকে সর্দারজী জানিয়ে দিলেন যে "তোমাদেরকে অতি সত্ত্বর জিহাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।" যুবকরাও এতে রাজি হয়ে গেল। জেনারেল সাহেব আরো বললেন। "আত্মরক্ষার জন্য আপনাদেরকেও সমতল ভূমি ত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বলছি। এতে জানমালেরর অনেকটা হেফাজত হবে কাজেই আপনারা আমাদের সাথে চলুন। আমাদের সাথেই থাকবেন। সেখানে ব্যবস্থা হবে।"

উক্ত প্রস্তাবে বেদুঈন মাতাব্বর একমত হলেন এবং সবাইকে নির্দেশ দিলেন উক্ত স্থান ত্যাগ করার জন্য। সর্দারের নির্দেশ পেয়ে কেউ তাবুগুলো গুটায়ে গাঠুরি তৈরি করছে, কেউ আসবাবপত্র জমা করে গাঠরি বানতে লাগল। বস্তির কেউ বসে নেই। সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জেনারেল সাহেব কয়েকজন যুবককে নিয়ে বোমের খণ্ডিত লোহাগুলো কুড়াতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আনুমানিক ১২ মণ লোহা জমা করলেন। মাটি খনন করলে আরো কিছু লোহা উদ্ধার করা যেত, কিন্তু সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়নি।

বিকাল তিনটা। মাল বোঝাই গাধাগুলো সারিবদ্ধভাবে পাহাড়ের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর রাখালেরা নিজ নিজ পশু পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাধার পিছু পিছু। এর সাথে চলছে লোকজন। ৪টি গাধার পিঠে লোহাগুলোর বস্তা বন্দি করে তুলে দিলেন। কাফেলা এগিয়ে চলছে। সন্ধ্যার কাছাকাছি রামাল্লায় এসে পৌছেছে। আরিফকেও একটি গাধার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলছে। এদিকে রামাল্লা থেকে যুবকরা

সংগ্রহ করেছে ৩৮ মণ লোহা। এগুলো সাথে নেয়া সম্ভব হয়নি। পরদিন নেয়ার পরামর্শ করে সবাই চলে যাচ্ছেন পাহাড়ের দিকে। এভাবে চলতে চলতে এশার নামাযের সাথে সাথে পৌঁছে গেল নিরাপদ স্থানে।

চুয়ান্ন

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মাওলানা রফিককে বললেন, বাবা! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দীনি এলেম দান করেছেন, দান করেছেন বাগ্মিতা' কথা বলার স্পীড। তোমার আগুন ঝরা বক্তৃতায় ঘুমন্ত প্রাণে সাড়া জাগাবে। তোমার বয়ানে লক্ষ জনতা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সহী ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার দিক দিয়ে আমাদের কাফেলায় অন্য আর কেউ নেই। কাজেই মুবাল্লেগ হিসেবে তোমাকেই কাজ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামে (হামলায়) তোমাকে ডাকা হবে। তাছাড়া প্রতিটি মসজিদে মসজিদে, মাদ্রাসায় মাদ্রাসায়, স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে, এমন কি প্রতিটি মহল্লায় মহল্লায় জিহাদের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। আজ প্রায় ১৪ শত বৎসর যাবৎ উম্মতে মুসলেমা জিহাদ থেকে দূরে। ইসলামের ধারক বাহক হযরত ওলামায়ে কিরামগণও জিহাদ থেকে দূরে। জিহাদের আলোচনা শুধু কিতাবের পাতায়ই রয়ে গেছে। মানুষের অন্তরে জিহাদ নেই। প্রতিশোধের বাসনা নেই। যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা একচেটিয়াভাবে মার খেয়ে যাচ্ছে। জিহাদের হাদিস পড়ানো হচ্ছে কিন্তু তার অনুশীলন নেই। নেই জিহাদের আমল ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। অনেকের ধারণা জিহাদ নবীযুগে ছিল, বর্তমানে জিহাদ নেই এবং প্রয়োজনীয়তারও অনুভব নেই। জিহাদ বুঝাতে হলে আগে হযরত উলামায়ে কিরামকে বুঝাতে হবে। তারপর দ্বীনি শিক্ষার্থী ছাত্রজনতা, তৃতীয় পর্যায়ে সর্বসাধারণ,

জিহাদ শুধু মুজাহিদদের উপরই ফরজ নয়, নারী-পুরুষ, ছেলে- মেয়ে, যুবক-যুবতী, বালেগ-নাবালেগ সকলের উপারই জিহাদ ফরজ। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলেম-গায়রে আলেম, সকলকেই জিহাদ করতে হবে। বর্তমানে শুধু নামায, রোযা, হজ, যাকাতের ওয়াজ নসিহত হচ্ছে। জিহাদের আলোচনা, কোন শিক্ষাঙ্গনে নেই, ওয়াজ মাহফিলে নেই। খানকায় নেই। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অথচ জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায-রোযা, হজ-যাকাতের মতই ফরজ। তা অনেকেই জানে না। জিহাদ করা যেমন ফরজ, জিহাদের দাওয়াত দেওয়াও একটি ফরজ। জিহাদে যাওয়া যেমন ফরয, জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়াও তেমন ফরজ। জিহাদ কখনো ফরযে কেফায়া হয়, আবার কখনো ফরযে আইন হয়। কিন্তু জিহাদের প্রশিক্ষণ সবসময়ই ফরযে আইন, এতে কোন মাজহাবের ইমামগণের মধ্যে দ্বিমত নেই। জিহাদ হোক চাই না হোক কিন্তু প্রশিক্ষণ নিয়ে তৈরি থাকা সব সময় সকলের উপর ফরযে আইন। যদি কোন পীর

সাহেব, মুহাদ্দেছ সাহেব, মুফতী সাহেব, আলেম সাহেব জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়াকে অপ্রয়োজন মনে করেন, তবে তার ঈমান চলে যাবে। কেননা নামায যেমন ফরয, জিহাদের প্রশিক্ষণ নেওয়াও তেমনই ফরয। এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলো আফগানিগণের প্রতিটি ঘরে ঘরে কানে কানে পৌঁছাতে হবে।" তিনি মাওলানা রফিককে আরো বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা যদি উম্মতকে বুঝানো যায় তবে শহীদ হওয়ার জন্য সকলেই পাগল হয়ে রণাঙ্গনে ছুটে আসবে জান ও মাল নিয়ে। কেউ তাদের ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আফগান মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে যুদ্ধের সাজে সুসজ্জিত করে ময়দানে পাঠিয়ে দিবেন। বিবি খানছা (রা) এর মত সন্তানদের উৎসাহিত করে ময়দানে নিয়ে হাজির হবেন। বিবিরা তাদের স্বামীদের উৎসাহিত করে যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে ময়দানে পাঠিয়ে দিয়ে শহীদের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। নিজের জেওরাত বিক্রি করে স্বামীকে জিহাদের খরচের ব্যবস্থা করবেন, যেমন হযরত কাসেম নানাতুবী (রহঃ) এর বিবি করেছিলেন। জিহাদের জন্য এক ভাই অন্য ভাইকে দাওয়াত দিবে, ধনীরা মালের ব্যবস্থা করবে। এভাবে ঘরে ঘরে মুজাহিদ তৈরি হবে। এক কাফেলা শহীদ হয়ে গেলে পিছন থেকে আর এক কাফেলা এসে ঝাঁণ্ডা হাতে নেবে, দুশমন কাটবে, সামনে অগ্রসর হবে এরা শহীদ হলে পিছনের দিক থেকে আর কাফেলা এগিয়ে আসবে, ওরাও জিহাদের ঝাঁণ্ডা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে, ময়দান ফাতাহ করবে, দুশমন ভাগবে, দেশ শত্রুমুক্ত হবে। আবার দিকে দিকে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম হবে। ইসলামী কানুন নাফেস হবে। ধনী, গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাসারা সকলেই ইসলামের শান্তির প্লাবনে ভাসতে থাকবে। জান মালের নিরাপত্তা, ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা ইসলামই নিশ্চিত করবে। সমস্ত বাতিল ফেতনা, অর্থাৎ কুফুরী শেরেকী, নাস্তিকী, কাদিয়ানী, বাহাই, ভান্ডারী ও মওদুদী ফিতনার অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।" মাওলানা রফিক বিনীতভাবে বললেন, হযরত আপনার উপদেশ যথার্থ, তবে আমার দিলী তামান্না এটাই ছিল যে, আমি শুধু রনাঙ্গনেই কাজ করব। সেখানেই পরে থাকব এবং সেখানেই শহীদ হব। এ ধরনের আশা-আকাঙ্খা নিয়েই আপনার চরণ মোবারকে হাজির হয়েছি। আমীর হিসেবে আপনার আদেশ নিষেধ আম্লান বদনে মেনে নেয়া। আমার উপর ফরয। তারপরও যদি আপনি বিবেচনা করেন তবে আমার উপর বহুত বড় এহসান হবে।"

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী মিষ্টি হাসি হেসে অত্যন্ত মধুমিশ্রিত ভাষায় বললেন, "বৎস! ময়দানে লড়ার মত মুজাহিদ বর্তমানে আমার নিকট অনেক মওজুদ রয়েছে। এদেরকে নিয়ে ক্ষিপ্ত ব্যঘ্রের ন্যায় হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে যাচ্ছি এবং সামনেও করব ইনশাআল্লাহ। যাদের নিয়ে প্রথমে আমি জিহাদ আরম্ভ করেছি এদের মধ্যে কজন জানবাজ মুজাহিদ আমার পক্ষ ত্যাগ করে

আল্লাহর পক্ষে চলে গেছেন (শাহাদাত বরণ করেছেন)। এদের স্থান আজও পূরণ করতে পারছি না। আফগানিস্তানের যুদ্ধটা হবে দীর্ঘ মেয়াদি কাজেই পিছনের দিক থেকে অগ্রগামী কাফেলাকে দুর্বার এগিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ণ সহযোগীতা দিতে হবে। পিতা-মাতারা সন্তানদের পাঠাবে, মাল অলারা রসদপত্র পাঠাবে। এক কাফেলার কুরবানীর পিছে পিছে আর এক কাফেলা কুরবানী পেশ করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ বিশ্বের সুপার পাওয়ার তাগুতি শক্তি রাশীয়ার যবনিকা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে। প্রিয় বৎস, আর একটি কথা তোমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, তাহল উম্মতে মুসলেমার প্রথম শ্রেনির নাগরিক হলেন হযরত উলামায়ে কেরাম। তারাই নবীর ওয়ারিছ উত্তরাধিকারী। দ্বীনের ধারক-বাহক। ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে হযরত উলামায়ে কেরামগণ যদি ভূমিকা না রাখতেন, তাহলে আজ ওরা এদেশে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকত ও মুসলমানদের রক্ত চুষে খেত। হযরত উলামায়ে কেরামগণ ছাড়া কোন আন্দোলনই সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না, আর কামিয়াবির দার প্রান্তেও পৌঁছতে পারবে না। উলামায়ে কেরামগণ কোন দিন বিকি-কিনি হতে জানে না। টাকা বা অর্থের লোভে ঈমান ও দেশ বিক্রি করে না। ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে অনেক হিন্দু মালাউন, নামদারি আলেম এবং ইংরেজি শিক্ষিত কিছু দালাল ও চাপরাশিরা ইংরেজদের ওকালতি করে সরলমনা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে। তাদের চামচামির কারণে জিহাদ বার বার বাধাগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দ জেল, জুলুম, নির্যাতন, দিপান্তর, তেপান্তরে গিয়েছেন, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, তবু কাফিরের কাছে আপোষ করেননি। তাছাড়া আলেম বেশদারি আরো কিছু মুনাফিক আছে, ওরা ইহুদী-নাসারাদের অর্থে লালিত পালিত হচ্ছে। ওরা সমাজে ইমামতির আসন দখল করে রেখেছে। পীর নাম দিয়ে মারেফতের ছবক পড়াচ্ছে। আর হাদিসেরও দরস দিচ্ছে। ইহুদি-নাসারারা খুব সুকৌশলে এদেরকে ব্যবহার করে আসছে, ওরা খুব চতুরতার সাথে কুরআন-হাদিসের বিরোধিতা করছে। কিন্তু তা বুঝা খুবই কঠিন। উলামারূপী আলেম ছাড়া মুসলমানদের ঈমান আমল আকীদা বরবাদ করার জন্য আর এক শ্রেণীকে মাজার পূজায় লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা কেউ লাল কালো, আবার কেহ কেহ সাদা কাপড় পরে। চুলঅলা, জটঅলা, শিকলঅলা, তালাঅলা, ঝাঁউলিঅলা, চিমটাঅলা, লেংটিঅলা, শিংগাঅলা, নেকড়া পেচানো লাঠিঅলা, কাঁচঅলা, বালাঅলা, খড়মঅলাসহ আরো হাজারো বেশে শহরে বন্দরে ও মাজারে মাজারে ঘুরছে। ওদের মধ্যেও রয়েছে অনেক উচ্চ শিক্ষিত। ওরা এসব বেশে ইহুদী নাসারাদের গোয়েন্দাগিরি করছে। এদের খপ্পর থেকেও দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাতে হবে।”

জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের কথা শুনে মাওলানা রফিক ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, হুজুর! তাহলে এদেরকে কিভাবে চেনা যাবে? মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী উত্তর দিলেন, "দেখ বাবা তা চেনা খুবই সহজ। পবিত্র কুরআন-হাদিসের কষ্টি পাথরে যাচাই করলেই আসল নকল প্রকাশ পাবে। দেখবে দেশে বড় বড় ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যাদের নাম শুনলে সবাই চিনে। এরা নিজের খানকা বা মসজিদ অথবা মাদ্রাসা থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশের সরকার বা অন্য কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলে, তৎক্ষণাৎ সিংহের মত হুংকার দিয়ে গর্জে উঠেন এবং রোডে নেমে আসেন তার ছাত্র বা মুরীদদের নিয়ে। মিটিং সমাবেশ করে সরকারের বিপক্ষে জনমত আনার চেষ্টা করেন। এদিকে সরকার সুকৌশলে লোক পাঠিয়ে তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাদিয়া দিয়ে বলে, "হুজুর আন্দোলন করে লাভ নেই ঘরে ফিরে যান। তখন রোগের এক খুরা অজুহাত তুলে ঐ নেতাজী চিকিৎসার জন্য লন্ডন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, বৃটেন ঐসব উন্নত দেশে চলে যান। সেখানে গিয়ে ইহুদী নাসারাদের বড় বড় নেতাদের সাথে মিটিং করেন ও জায়গা জমি রাখার ফিকির করেন। জনগণ ঐসব নেতাদের ডাকে মিছিল মিটিং ও অন্যান্য দেয়া কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সবাই মনে করেন এদেশে হক্ক কথা বলনে ওয়ালা একজনই আছেন। সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাথে সাথে প্রথম ফতোয়া দানকারী; প্রথম বিবৃতি প্রদানকারী, প্রথম হরতালের ডাক দানকারী আমাদের নেতা। এভাবে কিছুদিন পর দেখা যায় সরকার সরকারের স্থানেই রয়েছে, নেতাজীর যাবনও বন্ধ হয়ে গেছে। আন্দোলন থেকে গেছে। এসব নামদারি আলেমরা কার ওকালতি করেছেন, তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।" হক্কানী সাহেব আরো বলেন, "সঠিক মানুষ চিনতে হলে দেখবে, কথা আর কাজ এক কিনা। যদি দেখ জিহাদের হাদিস ও জিহাদের মাসআলা পড়াচ্ছেন কিন্তু নিজের মধ্যে জিহাদের প্রস্তুতি নেই। নিজের ভাই, ছেলে ছাত্র এবং তার মুরীদদেরকে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে বা জিহাদ করতে বাধা প্রদান করেন তবে বুঝতে হবে ওরাই ইহুদী নাসারাদের দালাল, গুপ্তচর বা মুনাফেক। এদের থেকেও জাতিকে সতর্ক করতে হবে। আর হক যারা তাদের দেখবেন নিজে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে নাও পারেন, তবু বিরোধিতা করবেন না বরং আফসোছ করবেন। নিজের সন্তানাদি ও ছাত্রদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং প্রস্তুতির জন্য তাকিদ দিবেন। এ সমস্ত উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে তাদের দোয়া ও পরামর্শ নিবে। তাঁদের রুহানী ফয়েজ পাওয়ার জন্য সুসম্পর্ক রাখবে। উলামায়ে হক্ক যারা তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করলে ছহী তরীকার উপর জিহাদী কার্যক্রম চলবে এবং কাজেও বরকত নাযিল হবে। মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের কথা শুনে মাওলানা রফিকের অনেক ভুল ভেঙ্গে গেল। মাওলানা রফিক মনে করতেন সবাই আল্লাহওয়ালা। এখন বুঝতে পারলেন চকচকা হলেই স্বর্ণ হয় না,

মোটা হলেই দারোগা হয় না, টাক পড়া হলেই তালুকদার হয় না। চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে কথা বললেই পীর হয় না, ছুতি নাতি বিষয় নিয়ে মঞ্চে হুংকার ছাড়লেই নেতা হয় না। হ্যাঁ এদের সঠিক পরিচয় সমাজে ধরে তুলতে না পারলে জনগণ চির দিন আঁধারেই হাবুডুবু খাবে। এদেরকে উদ্ধার করার জন্য দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

পঞ্চান্ন

শারিরীক অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে খারাপের দিকেই এগিয়ে চলছে। নৈরাশ্যের দিগন্তে একফালী আশার চাঁদ উদিত হয়নি মাহমুদার। নিঃসঙ্গ জীবনে অসারতার উর্মিমালা হাবুডুবু খাচ্ছে। কূলহীন পারাবারে পতিত নরের সম্মুখে তৃণখন্ত পেলেও বাঁচার তাগিদে হস্ত প্রসারণ করে। মাহমুদার সম্মুখে এমনটিও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথান্তরে ভর ভর তার অন্তর। আপন করে যেন অমূল্য জীবনটাকে আস্তাকুড়ে নিপতিত করেছে। সন্তান গ্রহণ করাটাই কি ডেকে এনেছে নিঃসঙ্গতা? সন্তান নেয়াটাই কি খুলে দিয়েছে অভিশাপের তোরণ? এসব প্রশ্ন এসে বার বারই মাহমুদার অন্তরে বিষবাণ নিক্ষেপ করে আহত করে তুলছে। অফিসে, ঘরে, বাইরে, কোথাও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার স্থান নেই। অনিমিখ লোচনে আলমের পথ পানে চেয়ে থাকে সারাক্ষণ। এখনো আলমের প্রতি অভিরত তার দিল। অকৃতদার জীবন ডায়েরির পাতাগুলো উল্টালেই ভেসে উঠে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতিবিজড়িত ইতিকথা। আলমের মন ভোলানো মধুর বচন, বৈজ্ঞানিক মার্কা নীতিকথা, আর কত সুখ-শান্তি ও স্বর্গ কামাইয়ের বাতুলতা। সন্তান গ্রহণের আগে কত অফিসার আর কত কর্মকর্তারা দিনরাত বাসায় এসে মাছির মত ভন্‌ভন্‌ করত, নিত্য খোঁজ-খবর নিত ও গাল-গল্প মারত। ঝরে যাওয়া উৎপল পার্শ্বে যেমন ভ্রমরের আনা-গোনা থাকে না, মাহমুদার জীবন কাননের অবস্থাও অনেকটা তদ্রূপ। এন.জি.ও গোষ্ঠিরা কেন আফগানিস্তানে এসেছে, কি তাদের উদ্দেশ্য, কি চায় ওরা, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মাহমুদার কাছে। আজ প্রায় তিনটি মাস অতিবাহিত হতে চলছে। আলমের আসার কোন নাম গন্ধ নেই। পর পর দুটি পত্র দিয়েছে মাহমুদা, কিন্তু তাঁর কোন উত্তর ফিরে আসেনি। সে কিভাবে জীবন-যাপন করছে তার খবর কারো কাছে নেই। তাই ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আলমের নিকট আবারও চিঠি লিখছে মাহমুদা।

ওগো কলিজার টুকরা, নয়নের পুতুলি প্রাণ প্রিয় স্বামী। লিপির শুরুতেই নিও তোমার অভাগিনী, দুখিনী, হতভাগিনী, অনাথিনী স্ত্রীর আশির্বাদ ও প্রাণঢালা ভালোবাসা। আশা করি আপন বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের নিয়ে মহানন্দে কর্মজীবনের দিনগুলো পাড়ি দিচ্ছ। আজ প্রায় তিনটি মাস কালের কড়াল গর্ভে বিলীন হতে চলেছে তোমার ইন্দুনিভানন দর্শন থেকে বঞ্চিত। তোমারি প্রেম

হুতাসুনে আমি দগ্ধ হয়ে আঙ্গারে পরিণত হতে চলছি। তিন, তিনটি লিপি প্রেরণ করেও কোনো উত্তর মেলেনি। কেন গো তুমি অমন করে আমাকে ভুলে-দূরে দূরে অবস্থান করছ? যখন আমার গর্ভে তোমারই সন্তান হাত পা নেড়ে খেলা করে ঠিক সে সময় আমার পঞ্চআত্মা দেহ পিঞ্জির ছেড়ে পলায়ন করার জায়গা খোঁজে। আজ সাত মাস অতিবাহিত হতে চলছে, আর হয়ত তিন মাস পরেই তোমার সোনালি ফসল ঘরে উঠবে। তখন হয়ত তোমার অন্তর আনন্দে ভরে উঠবে। ওগো আমার প্রাণের স্বামী, প্রেমের তিক্ততা ও প্রেমের জ্বালা কতযে বিষাদময় তা কোন দিন ভাবতে পারিনি। আজ তা শিরায় শিরায় অনুভব করছি। প্রসব বেদনায় যখন ছটফট করি তখন যেন তোমাকে পার্শ্বে পাই। আর যদি দেখা নাই পাই, তবে ক্ষমা করে দিও। কিছু দিনের মধ্যেই আমাকে হাসপাতালে চলে যেতে হবে। কেননা আমার সেবা করা বা দেখাশুনার মত তো কেউ নেই। কাজেই হাসপাতাল ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। তুমি যদি নাই আস আর আমার জীবন তরী ডুবে যাওয়ার সংবাদ পাও, তবে আমার সমাধিতে দু'মুঠো মাটি রেখে যেও এতে আমার বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। এটাই আমার আশা। তুমি চিরদিন সুখে থাক শান্তিতে থাক এটাই কামনা করি চিরদিন। বেশি কিছু লিখে তোমাকে বিরক্ত করা ও মূল্যবান সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে করি না। তাই এখানেই ইতির রেখা টানলাম। ইতি তোমারই প্রেমিকা অভাগিনী মাহমুদা, এন.জি.ও ভবন, জালালাবাদ আফগানিস্তান।

মাহমুদার পত্রের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে প্রেমের ব্যর্থতার এক বেদনাতুর ইতিহাস। সপ্তাহ খানেক পর ডাক হরকার পত্রটি নিয়ে আলম সাহেবের বাসায় যায়। আলম সাহেব এখনো অফিস থেকে বাসায় ফিরেনি। বাসায় তালা ঝুলানো দেখে অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক হরকার। এমন সময় আলম সাহেব আতিকার হাত ধরে অফিস বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। পিয়নকে দেখেই আলম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন কোন বার্তা আছে কি? পিয়ন উত্তর দিল হ্যাঁ স্যার একটি পত্র আছে, এ বলে অনেকগুলো পত্রের মধ্য থেকে একটি পত্র বের করে দিলেন। আলম সাহেব আতিকাকে চোখের ইশারায় পত্রটা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলে, আতিকা হাত বাড়িয়ে পত্রটা নিয়ে নিল।

আলম আতিকাকে পেয়ে অনেক পূর্ব থেকেই কেমন যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তাই পত্রের দিকে তেমন একটি নজর নেই। আতিকা মাতা-পিতা, ভাই বেরাদার ত্যাগ করে, প্রেম সাগরের তোড়ে ভেসে এসেছে আলমের প্রেমাঙ্গিনায়। এটা কি তার জীবনের ব্যর্থতা না সফলতা তা নিয়ে ভাবছে, খানিকটা বেদনা, খানিকটা আনন্দ, খানিকটা চিন্তা, খানিকটা ভাবনা নিয়ে আতিকা দুল খাচ্ছে। উভয়ে হাত ধরাধরি করে চলে এল বাসার দ্বার প্রান্তে। আলম তালা খুলে প্রেমিকাকে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফ্যান সুইজ অন করে পাশাপাশি দুটি কেদারায় মুখামুখি বসলেন। আতিকাকে একটু চিন্তা মগ্ন দেখে আলম প্রশ্ন করলেন,

“কি হে প্রিয়তমা! মেঘমুক্ত আকাশে ঘনঘটা কোত্থেকে এল? আতিকা বাতায়নে চোখ ফিরিয়ে বলল, কই! আকাশটা পরিষ্কার দেখছি, কোথাও দু’এক টুকরো মেঘ-খন্ডকে উড়ে যেতে দেখছি না। আলম বলল ও মেঘ কি বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়? এ মেঘ দেখতে হয় দর্পণে তাকিয়ে প্রেমাস্পদের চোখ দিয়ে। আতিকা বলল তুমি বুঝি বিদ্রূপ জুড়ে দিলে মোর সনে, তাই না? আলমঃ আরে আমি যা বলছি তা ঠিকই বলছি, এক চুল এদিক বলছি না। দেখনা দর্পণের দিকে তাকিয়ে তোমার মুখশ্রী খানা! কত সুন্দর দেখা যায়। মনে হয় প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসছ অশান্তি নগরীতে। তা না হয় এত চিন্তা, এত ভাবনা কিসের? আমাকে পেয়ে তো চাঁদ হাতে পাওয়ার আনন্দ অনুভব হওয়ার কথা ছিল। তা না হয় এত মলিন দেখাচ্ছে কেন তোমার মুখশ্রী খানা? আতিকা একটু মুচকি হেসে বলল, কই কার মুখ এত বিশ্রী দেখছ। চশমা পরে দেখ মিয়া। মনে হয় তোমার চোখে পর্দা পড়েছে। এ ধরনের হাসি মজাকের মধ্য দিয়ে কোথায় যে মুখ থুবড়ে লুকিয়ে গেল দিন মণি। তা কেউ ঠাহর করতে পারেনি। গৃহ পরিচালিকা খানা পাকানোর আয়োজন করছে। আলম হাত পা ধুয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন। আতিকা একটু বাইরে পাঁয়চারী করে পাক ঘরে গিয়ে রান্না বান্নার কাজে সামান্য সহযোগিতা করছে। আলম ওঘরে বসে মুচকী মুচকী হাসছেন আর বলছেন, কি হে গৃহিণী! তুমি কি পাক করতেও শিখেছ? বেশ ভালো তো! আজ হয়ত অনেক সুস্বাদু খাবার তৈরি হবে। নতুন মানুষের পাক নতুনই হবে। খাব আজ অনেক মজা করে। পাশের মেয়েটি বলল, স্যার, ইনি কি ম্যাডাম? না সহযোগী কর্মচারী? না গার্লস ফ্রেন্ড? যাই হউক না কেন আপনার জন্য খুবই মানানসই তাই না কি? জিজ্ঞেস করলেন আলম।

আলম মনে কল্পনার জাল বুনছেন, আজ রাত্রেই আতিকাকে নিয়ে যাবে নাইট ক্লাবে। এন.জি.ও দের নাইট ক্লাবে হয়ত কোন দিন প্রবেশ করার সুযোগ হয়নি আতিকার। সেখানে পান করা হবে পিয়ালা পূর্ণ কাদম্বরী, বাজনার তালে তালে নাচবে, গানে মুখরিত হবে দশদিক। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে করবে ফুর্তি ও আনন্দ। আনন্দে আনন্দে ভরে যাবে দর্শকদের অন্তর কানায় কানায়। ডিশের মাধ্যমে যখন দেখানো হবে পাশ্চাত্য জগতের নেংটা ছবি, দেখানো হবে যৌন চাহিদা মেটানোর সবগুলো আইটেম, তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যখন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খেতে থাকবে, তখন কত মজাটাই না হবে! আতিকা হয়ত আমার সাথে এমনটাই করবে। প্রথম বারে যদি এমনটা নাই হয় তবে এতটুকু তো হবে যে, সে এদিকে কিছুটা ধাবিত হবে। তারপর আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।

রান্না শেষ করে চাকরানী খাবারগুলো যথা স্থানে রেখে চলে গেল। আতিকা আলমের পার্শ্বে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, অফিসার সাহেব! এতসব কি চিন্তা করছেন? খানাপিনার দরকার আছে কি? না খেয়ে তপস্যা কিসের? আতিকার

কণ্ঠ শুনে যেন প্রেম সাগরের ঢেউয়ের তলদেশ থেকে ভেসে উঠলেন আলম সাহেব। এক ফালী বাঁকা চাঁদের হাসির রেখা ওষ্ঠযুগলে টেনে বললেন, আরে! তপস্যা যদি করেই থাকি তবে তোমাকে নিয়ে করছি।” আতিকা বলল তাই তো! আমি ক্ষুধায় মরি পেট খাই খাই করছে, আর তুমি নাকি আমাকে নিয়ে তপস্যা করছ! ইস কি তাপস পুরুষ! আলম বললেন “ঠিক আছে চল খানাপিনা সেরে নেই; তারপর আরও অনেক কাজ আছে। রাত্রে কাজ করতে হয় নাকি? না ওভার টাইম? আরে না, অফিসিয়াল কাজ নয়, চিত্ত বিনোদন! আজ অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম আছে নাইট ক্লাবে। আমেরিকা ও কুরিয়া থেকে লাল চামড়ার পিংগল বর্ণের চক্ষু বিশিষ্ট নতুন নতুন তরুণ তরুণীরা এন.জি.ও কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য আসছে। ওরা সাথে নিয়ে আসছে অনেকগুলো ফিল্ম। এগুলো নাইট ক্লাবে দেখানো হবে। তারা ওসব মেহমানরাও আমাদের নাচ-গান আরো অনেক কিছু দেখাবে। কাজেই আগেভাগে গিয়ে সামনের আসন দখল করতে হবে। আজ লোক হবে প্রচুর, হলরুম ভরে যাবে কানায় কানায়। পল্লী অঞ্চলের ইউনিটগুলোর সদস্যরাও আসছে। চল খানাদানা সেরে আগে ভাগেই চলে যাই। এই বলে উভয়ে খানা পিনা সেরে খানিকটা বিশ্রাম নিচ্ছে।

আতিকা একটু অনুযুগের সুরে প্রশ্ন করল, “আলম ভাইয়া! মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি নাইট ক্লাবে নাকি অসামাজিক ও অশালীন কাম কাজ হয়, তাহলে ওখানে যাবেন কেন?

ঃআলম অসামাজিক ও অশালীন বলতে কি বুঝাতে চাও তা খুলে বল?

ঃ আমি তো কোন দিন যাইনি আর দেখিওনি, এর চেয়ে বেশি কি আর বলব?

ঃ তাহলে আগে দেখ পরে মন্তব্য করগে। তবে এতটুকু বলতে পারি যে সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে মনের। মন যদি খারাপ থাকে তবে সবগুলো কাজেই ব্যাঘাত ঘটবে। কোন কাজই সুচারু রূপে করা যাবে না। তাই অবসর সময়ে একটু ড্রিংক ও একটু বিনোদন চাই। তাহলে মনটা অনেক চাঙ্গা হয়ে উঠে ও কাজে মন বসে, অলসতা দূর হয়। তাছাড়া এন.জি.ওদের দরকারি একটি দিক, প্রায় বাধ্যতামূলক। একাধারে তিনদিন যদি কেউ ক্লাবে না যায় তাহলে অফিসারদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। আর এটাও ঠিক দুএক দিন যদি ধারাবাহিক প্রোগ্রামগুলোর কিছু অংশ দেখে তবে বাকিগুলো না দেখে থাকতে পারে না। এগুলো দেখার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। বুঝলে প্রিয় তমা?

রাত দশটা পেরিয়ে যাওয়ার পথে। প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে রাত এগারটায়। একটু আগে না গেলে জায়গা নেয়া কঠিন। তাই আর দেরি না করে উভয়ে বেরিয়ে গেল বাসায় তালা ঝুলিয়ে। হাত ধরাধরি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাবাঙ্গিনায় পৌঁছে গেলেন আলম সাহেব। হরেক রকম বাতিতে ক্লাবের উজ্জ্বলতা অন্য দিনের চেয়ে উন্নত করেছে। গিজ গিজ করছে নারী পুরুষ। পৌঢ়দের আগমন নেই বললেই

চলে। যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও বালক- বালিকাদের সংখ্যাই বেশি। ওরা সবাই এন.জি.ও দলভুক্ত। সবাই নিজ নিজ আসন দখল করে বসেছে। আসন ছাড়াও অনেকে দাঁড়িয়ে আবার কেউ কেউ ঢালাও বিছানায় অধির আগ্রহে বসে আছে।

স্থানীয় এন.জি.ও কর্মকর্তারা অল্প সময় কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন। অতঃপর টিভির পর্দায় দেখানো হল, কিভাবে আফিম, গাঁজা, হিরোইনের চাষ করতে হয়। কি ধরনের মাটিতে কিভাবে চাষ করতে হয়। বীজ বুনন থেকে নিয়ে, সেচ, সার কি পরিমাণ ব্যবহার করতে হয়। কিভাবে চোরাই পথে বাজারজাত করে করতে হয় এবং কিভাবে হিরোইন চাষীরা রাতারাতি ধনি হয়, ও বাড়িঘর পাকা করে, এসব চিত্র দেখাল। এন.জি.ওরা হিরোইন চাষিদেরকে কি পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে তাও দেখানো হল। অত:পর চলছে দেশি-বিদেশি নারী-পুরুষ আর যুবক-যুবতীদের নাচ গানের আসর। নাচে নাচে অনেকের অঙ্গ ভূষণ দূরে ছিটকে পড়তে লাগল। কৃত্রিম উপায়ে কখনো বাতি জ্বলছে, আবার কিছুক্ষণের জন্য নির্বাপতি হচ্ছে। প্রায় সারারাত চলছে কুক্‌কুর নাচ। এরই মধ্যে যা ঘটে গেছে তা বর্ণনা করতে লেখকের কলম থেমে গেল। আতিকা এসব কর্মকান্ড অবলোকন করে মনে মনে পতিজ্ঞা করল যে, সে আর জীবনে কোন দিন এন.জি.ও চাকুরী করবে না এবং কলেজের লেখা পড়া করবে না। সে বাড়ি ফিরে সুফিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আলেমা হবে এবং সুফিয়ার কাছে থেকে বাকী জীবন কাটাবে। অবশেষে সে তাই করে ছিল।

ছিয়ান্ন

সুফিয়া কিছু দিন তালিম দেয়ার পর শিক্ষার্থীদেরকে দু ভাগে বিভক্ত করে যথা, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা। বিবাহিতা নারীদেরকে শুধু মুখে পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, শিরক, কুফর, বেদআত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্ত াহাব, স্বামী ও পিতা-মাতার হক্ক, সন্তান লালন-পালনের নিয়ম ও সন্তানের হক এবং মহিলা সাহাবাদের জীবন চরিত্র কিরূপ ছিল ও নামাযের জন্য ১০টি সূরা সহীশুদ্ধভাবে শিক্ষা দেয়া এবং কিছু মাসনুন দোয়া শিক্ষা দেয়ার উপর তিন মাসের একটি কোর্স চালু করে। তিন মাসে প্রায় অধিকাংশ মহিলারাই এতটুকু তালিম নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। এতটুকু জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়। তারপর যদি কেউ কুটির শিল্পে ভর্তি হতে চায় তাদের জন্যও রাস্তা খোলা রেখেছে।

এভাবে তালিম গ্রহণের তিন চার মাস পরই এলাকায় এক নতুন জাগরণ এসে গেল। স্বামীরা স্ত্রীদের আচার ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি। কোন দিন স্বামীরা স্ত্রীদের পক্ষ থেকে সালাম পেত না, পেত না এত খেদমত। স্বামীর দেয়া জিনিসের প্রতি ছিল না কদর। এখন ওরা স্বামীর পক্ষ থেকে যা পায় তাই সাদরে গ্রহণ করে। অল্পে তুষ্ট হয়। তারা এখন ভদ্র, বিনয়ী, পর্দানশীল ও এন.জি.ও বিদ্বেষী। স্বামীদের গৃহে এক নতুন আনন্দের মাতামাতি। দাম্পত্য জীবনের

মধুরতা. মনমুগ্ধকর আচার-ব্যবহার। এতে প্রতিটি ঘরে বিরাজ করছে শান্তি আর শান্তি।

দ্বিতীয় জামাত অবিবাহিতা এদেরকে আবার দু জামাতে বিভক্ত করেছে। এক সাবালিকা, দুই নাবালিকা, (প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা) এদেরকে আক্ষরিক জ্ঞান দান করে পাঠ্যপুস্তক হাতে দিয়ে শিক্ষাদানের কাজ চালু করে। নাহু ছরফের কিতাবাদি খুব ভালোভাবে মুখস্ত করায়, যেন পবিত্র কুরআন-হাদিসের সঠিক জ্ঞান পায়। দশ-বারজন মেধাবী ছাত্রীদের লিস্ট করে তাদেরকে আবাসিক নিয়ে আসার চেষ্টা চালায়। ছাত্রী গার্জিয়ানগণ অতি সাদরে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেন। এদিকে কুটির শিল্পও দিন দিন উন্নত হতে লাগল। তিন মাসের মধ্যেই অনেকে টুপি, মুজা, মাফলার বুনন শিক্ষা করেছে। এদের হাতে তৈরি পণ্য বাজারজাত করতে লাগল। আবার কেহ সেলাই মেশিনে ছায়া, স্যালোয়ার, ব্লাউজ, বোরকা অর্থাৎ সহজ সহজ কাজ শিখে নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় পোশাকাদি তৈরি করা শিখেছে। কেহ কেহ ছাগল বিক্রি করে সেলাই মেশিন খরিদ করে ঘরে তুলেছে। পারিবারিক পোশাকাদি ছাড়াও প্রতিবেশীদের পোশাকাদি সেলাই করে খানিকটা আর্থিক চাহিদা পূরণ করছে।

নারী সমাজে সাড়া জাগানো পদক্ষেপে চারিদিকে মানুষের মুখে মুখে রব পড়ে গেল। দিন দিন ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। এন.জি.ওমনা মহিলারা বোরকার কালো আবরণের নিচে শান্তির নীড় খুঁজে পেল। এ সমস্ত মহিলাদের দাওয়াত পেয়ে অন্যান্য এন.জি.ও মহিলারা দল ছেড়ে সুফিয়ার মাদ্রাসায় এসে ভর্তি হতে লাগল। সবগুলো জামাত একা চালানো সম্ভব নয় বিধায়, যেসব মহিলারা উপরে উঠেছে, এদের মধ্যে যারা মেধাবী, বেছে বেছে তাদেরকেও তালিমের কাজে লাগিয়ে দিল। পল্লী সর্দারের বড় ঘর ও করিডোর ভরেও উঠানে বসতে হয়। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ছাত্রীরাই পরামর্শ করে নিজেরা চাঁদা দিয়ে বিশাল একটি টিন সেট ঘরের ব্যবস্থা করল। এখন আর ঘরের কোন সমস্যা রইল না। সুফিয়া তার মামা মাওঃ আকরাম সাহেবকে অনুরোধ করে কঠিন কঠিন কয়েকটি কিতাব পাঠদানে রাজি করালো। এতে যেন সোনায় সোহাগা।

সুফিয়ার গঠনমূলক সামাজিক ও ধার্মিক কর্মকান্ড দেখে এন.জি.ওদের মধ্যে হই-হোল্লর পড়ে গেল। বড় বড় অফিসাররা মিলে সুফিয়ার কার্যক্রম বন্ধের পরামর্শ করেন। একজন অফিসার বললেন, "আফগানিস্তানের লোকেরা যতই গরীব হোকনা কেন, আসলে ওরা ধার্মিক। অর্থের লোভে ওরা ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে না। ধর্মের বাতাস পেলেই ওরা সব ভুলে গিয়ে ধর্মের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আফগান মহিলারা হাসের বাচ্চার মত। হাসের ডিম মুরগি তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। মুরগির বাচ্চার সাথেই লালিত-পালিত হয়। একটু বড় হলেই তার ভাই সম পার্টিদের ছেড়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাল-বিল-নদী-নালায় ভেসে বেড়ায়। এমন কি খরস্রোতা

নদীতে সাঁতার কেটে কেটে হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। ওরা তো কোকিল সানার মত; যে কাকের ছানার নিচে লালিত পালিত হয়ে কিছু দিন পরে তার বিমাতা কাকের কা-কা ডাক ছেড়ে কুহু-কুহু ডাকে শ্রোতাদের মন আনন্দে আনন্দে ভরে তুলে। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা ওদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তায় নামিয়ে আনি আর একদিন ওয়াজ শোনে ওরা ঘরে ফিরে যায়। এ পর্যন্ত যে সব মায়েদেরকেই আমরা ঋণ দিয়ে মাঠে নামিয়ে ছিলাম, ওরাই মৌলভীদের ওয়াজ নসিহত শুনে ঘরে ফিরতে লাগল। এখন আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সুফিয়া ফিৎনা। এ ফিৎনার মূলৎপাটনের জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে নারী যন্ত্র। আমাদের বোরকা পরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা নারীদেরকে যদি সুকৌশলে ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তবে হয়ত এদের জোয়ারে বাঁধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হব। তাছাড়া অন্য কোন রাস্তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।" অফিসারের কথাগুলো অন্যেরা খুব মনোযোগের সাথে শুনছিল। পুরো কক্ষ জুড়ে তখন নিরবতা বিরাজ করছিল। সকলেই একটু চিন্তা করে নিয়ে প্রায় একই সাথে বলে উঠলে, আমরাও এ ব্যাপারে একমত পোষণ করছি। আমাদের নিকটও অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

সকলের সলা পরামর্শ অনুযায়ী দুজন সুচতুর মহিলা, যারা বৃটেন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এন.জি..ও লেবাস পরে, গায়ে কালো বোরকা লাগিয়ে; মহিলাদেরকে বেঈমান ও দীন বিদ্বেষী বানানোর বজ্র শপথ নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে। এমন দুজন মহিলাকে দায়িত্ব দেয়া হল সুফিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য। তাদের নির্বাচিত দুজন মহিলা বোরকা পরে সকাল ৮টার দিকে সুফিয়ার মাদ্রাসায় এসে হাজির হল। সুফিয়া তখন বয়স্ক মহিলা গ্রুপে তালিম দিচ্ছিল ওরা গেইটের ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুখমন্ডলের আবরণ খুলে ফেললো। অন্যান্য ছাত্রীরাও এ দুজনকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ছিল। এমন সময় ছাত্রীদের মধ্য থেকে একজন, (যে ইতিপূর্বে এন.জি.ও সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিল) সে তাদের দুজনকে চিনে ফেলল। অন্য একজন ছাত্রী এগিয়ে এসে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করল এবং আগমনের কারণ জানতে চাইলে বললো "আমরা তোমাদের দেখতে এসেছি। পছন্দ হলে ভর্তিও হতে পারি।" তাদের, কথোপকথন শুনে অন্য একজন ছাত্রী সুফিয়ার গোচরে দিলে, সুফিয়া সতর্ক হয়ে গেল এবং ওদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য একজন চৌকসা মহিলাকে (যিনি কোন এক সময় এন.জি.ও তে চাকুরি করতেন) দিল। উক্ত মহিলা তাদেরকে মেহমান খানায় বসিয়ে চা বিস্কুট, সির্কা, ছাগলের মিষ্টি দধি, গরুর কাবাব ও নান রুটি এনে হাজির করল। তাদের আদর আপ্যায়নে ওরা মুগ্ধ গয়ে গেল।

সুফিয়া পাঠদান সমাপ্ত করে ফিরে আসে অফিসে। নবাগত মেহমানদের সাথে কৌশলাদী বিনিময় করে সুফিয়া মেহমানদের আচমকা আগমনের কারণ জানতে চাইলে একজন বলল "আমরা দুজন এন.জি.ওতে চাকুরি করি। আমরা আপনার

স্কুলের সুনাম শুনে দেখতে এলাম।” সুফিয়া বলল, আমার এটাতো স্কুল নয় এটা একটি দ্বীনি বালিকা মাদ্রাসা। এখানে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি কুটির শিল্পও রাখা হয়েছে। মহিলারা যেন বেকার না থাকে। তাদেরকে নিরক্ষরতা ও নিষ্কর্মার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করে দ্বীনের উপর যেন চলতে পারে আর সমাজের বোঝা না হতে হয়, এরই ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস মাত্র।” মহিলা বলল স্কুল আর মাদ্রাসা তো একই জিনিস । নাম দুই, কাজ এক ও অভিন্ন। সুফিয়া বলে উঠল “না হতেই পারে না,পাঠদান হিসেবে যদিও প্রায় একই রকম দেখায়, আসলে অবস্থান দু’ মেরুতে। স্কুলগুলোতে শুধু জাগতিক জ্ঞান দান করা হয়। আর মাদ্রাসা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতে পৌঁছায়। বর্তমান স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটি গুলোতে যে সব শিক্ষা চালু হয়েছে এর মধ্যে দ্বীন নেই, পর্দা নেই। আছে বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা। সেখানে ছেলে মেয়ে এক সাথে এক ব্রেঞ্চে বসে লেখা পড়া করে। পর্দার কোন বালাই নেই। সামনা সামনি বসে করে চোখা-চোখি, হয় দস্তা-দস্তি, তারপর চলে পত্র দেয়া-দেয়ী। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হাতেই প্রেমের ক্লাশে রূপান্তরিত হয়। প্রেম বিনিময় হয় পানির দামে। সব যুবক যুবতীদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় বহু দূরে। এক সময় প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ভাসতে থাকে পুরা প্রতিষ্ঠানটি। এটা হল পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণ কেরামতি। মহিলা অদরে কুটনী বুড়ির হাসির রেখা টেনে বলল, “আপা! আপনার আলোচনা খুবই গুরুত্ববহ ও দিকনির্দেশনামূলক। আপনাকে জানাচ্ছি মোবারকবাদ। আপনার কাছে দুটি প্রস্তাব নিয়ে আসছি। আশাকরি কবুল করবেন, প্রস্তাব দুটি এই (ক) আমরা আপনার মাদ্রাসার নিয়মিত ছাত্রী হওয়ার আশা রাখি যদি দয়া করে কবুল করেন। (খ) আমরা আপনার এ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কিছু অনুদান দিয়ে যাব। আমরা যা দেখলাম তাতে গোসল খানা, টয়লেট, ক্লাশরুম ছাত্রীবাস ও পানির সমস্যাটাই বেশি অনুভব করলাম। তিন লক্ষ টাকা হলে আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।” উক্ত মহিলা আরো বলল, “আপা! আমাদের ভর্তি ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন এবং আমাদের করণীয় কি তা অবহিত করুন।

সুফিয়া মনে মনে ভাবতে লাগল, এত গরজ কেন? ওরা তো দীনের দুশমন। সাহায্যের হাত এদিকে বাড়ানোর মতলব ভালো হতে পারে না। ওরাই তো গরীব কৃষকদেরকে লোভ দেখিয়ে অর্থকড়ি দিয়ে তাদের স্থাবর সম্পত্তিগুলো কন্টাকে নিয়ে নিয়েছে। এখন ঐসব জমিনে ভূট্টা, গম ও আলুর চাষ করে প্রচুর অর্থ বানিয়ে নিচ্ছে। সেসব জমিগুলো এখনো কৃষকরা ফিরে পাচ্ছে না। ওদের টাকা গ্রহণ করে মাদ্রাসার জরুরত পুরা করলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে। এসব ভেবে চিন্তে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল যে, আমরা কারো কোন অনুদান গ্রহণ করি না আর আপনারা যদি ভর্তি হতে চান তবে প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলি মেনে ভর্তি হতে পারেন। শর্তাবলিসমূহ। (ক) বয়স্কা মহিলাদের জামাতে ভর্তি হতে

হবে। (খ) শরয়ী পর্দা পালন করতে হবে। (গ) শিক্ষা গ্রহণকালীন সময়ে অন্য কোন কাজ করা যাবে না। (ঘ) মাসে তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে বহিষ্কার করা হবে। (ঙ) এ মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালীন কোন চাকুরি করা যাবে না। (চ) প্রতিষ্ঠান বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকা প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ শর্তগুলো পূরণ করে প্রতি শাওয়াল মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে পারবেন। অর্থাৎ এখন থেকে ৯ মাস পর। মহিলা শর্তাবলি ও ভর্তির তারিখ শুনে ঘাবড়িয়ে গেল। বিবেচনা করার কথা বলে, মলিন মুখখানা বোরকার তলে লুকিয়ে পদাতিক সার্ভিসে বিদায় নিল।

সাতান্ন

রাত আর বেশি বাকি নেই। নিশাচরেরা ঝোপ-ঝাড়ে দল বেধে আত্মগোপন করতে লাগল। ভোরের পাখিরা কুঞ্জবনে সুমধুর তানে গান ধরেছে। দোয়েলেরা ডালিম ডালে নাচানাচি করছে। সমীরণ দিকে দিকে ভোরের আগমনী বার্তা নিয়ে ছুটে চলছে। বধুরা স্বামীর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে নিচে নেমে আসতে লাগল। নামাজীরা তাহাজ্জুদের জায়নামাজে বসে আযানের এন্তেজার করছেন। তাপস প্রবর মুরাকাবা-মুশাহাদায় মস্তকাবনতাবস্থায় বসে আছেন। ঠিক এই মুহূর্তে নাইট ক্লাবের মদ্যশালার অনুষ্ঠান ভঙ্গ হল। আলম আতিকাকে নিয়ে ফিরে এল বাসায়। চোখ দুটি ঘুমে ডুলু ডুলু করছে। আলম ঘরে ঢুকেই খাটপৃষ্ঠের সাথে নিজ পৃষ্ঠের সম্পর্ক স্থাপন করল। আতিকা নাইট ক্লাবের বর্বরতা কুকুর-কুকুরীর ও বন্য হায়েনাদের ব্যবহার নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে এন.জি.ওদের পূর্ণ পরিচয় পেয়ে গেল। এখানে চাকুরি নিলে টাকা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু সমাজ থেকে হতে হবে বিচ্ছিন্ন। নিত্য দিন লুণ্ঠিত হবে সম্ভ্রম। কাজেই যে করেই হোক এ ক্ষুধার্ত পশুপাল থেকে গা ঢাকা দিতে হবে। তাই আলম ঘুমানোর সাথে সাথে সে তার সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে এল।

সরুয়ার মসজিদে ফজরের নামায পড়ে বাসায় এসে দেখেন আতিকা তার ভাবীর সাথে বসে গল্প করছে। সরুয়ার অফিস থেকে বাসায় ফিরে যখন জানতে পারলেন যে, আতিকা এখনো কলেজ থেকে ফিরেনি। তখন সামান্য খোজা খুঁজি করে ধারণা করেছেন যে, এন.জি.ওতে চাকুরি নেয়ার ব্যাপারে কথা কাটাকাটির কারণে মনে ব্যথা নিয়ে হয়ত কোন বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছে। তাই তেমন একটা খোজা খুঁজি করেন নি। ভোরে বাসায় ফিরে আসতে দেখে অতটা রাগ না করে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "আতিকা! গতকাল কলেজ থেকে কোথায় গিয়েছিলে? আতিকা বিনীত কণ্ঠে বলল "ভাইয়া! আমাকে মাফ করে দাও। তোমার ও ভাবীর সাথে রাগ করে আমার বান্ধবী শীলাদের বাসায় গিয়েছিলাম। প্রতিদিন টানাটানি করে ওদের বাসায় যাওয়ার জন্য তাই গিয়েছিলাম। শীলাদের বাসায়

যাওয়ার পর অন্তরে অনুসূচনা আসছে যে, হায়! একি করলাম, না বলে আসা মোটেই উচিত হয়নি।" তার কথা শুনে সরুয়ার শুধু এতটুকু বললেন, "আতিকা! এখন তুই ছোট খুকি নস। এদিক ওদিক চলাফেরা করা ঠিক নয়। তুই ভালো ভাবেই জানিস তোর বাল্যকালের বান্ধবী মাহমুদার কথা। সে এ ভাবেই লাগামহীন ঘোরাফেরা করতো আজ চার/পাঁচ মাস পর্যন্ত তার কোন সন্ধান মেলেনি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই খোজা-খুঁজি করে এখন নিরাশ হয়ে বসে গেছে। আহালো কত ভালো মেয়েটাই না ছিল।

সরুয়ারের কথা শুনে আতিকার চোখেও বান ডাকল। ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসল দীর্ঘশ্বাস। তারপর আতিকাকে সরোয়ার ক্ষমা করে দিলেন। আতিকা ভাবীকে ডেকে বলল, ও ভাবী আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। খাবার কিছু আছে কি? ভাবী বলল কেন সখের বান্ধবী শুধু সারারাত গল্পই করেছে? খাওয়ায় নাই কিছু? আতিকা বলল তোমাকে রেখে এত কিছু কি পেটে যায়? সারারাত ছটফট করে কাটিয়েছি, তোমার ও ভাইয়ার চিন্তায় অন্তরে ব্যথা, মনে চিন্তা, পেটে ক্ষুধা, চোখে অনিদ্রা, অতগুলো অশান্তির নিয়ে নিয়ে কি পেটে খানা যায়? না সুনিদ্রায় যাওয়া যায়? এবার বুঝতে পারছি রাগ করার কি মজা। আর জীবনে কারো সাথে রাগ করব না। ভাবী রুটি, গোস্তের কাবাব ও চা নিয়ে এসে বললেন, এবার খেয়ে পেট ঠান্ডা করে ঘুমিয়ে পড়। গরম খাবার তৈরি হলে ডেকে দিব।" আতিকা খাবারগুলো খেয়ে তার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল, হঠাৎ মনে হলো পিয়নের দেয়া চিঠির কথা। আলম তো আতিকাকে পেয়ে চিঠির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। আর আতিকারও মনে ছিল না। এবার বেনেটি বেগটি টেনে নিকটে এনে চিঠিখানা বের করে ঠিকানাটা পড়লে দিলের মধ্যে কে যেন হাতুড়ী দিয়ে পিটাতে আরম্ভ করল। চিরচেনা সেই লেখাটি যা মাহমুদার কলমের অগ্রভাগ থেকে বেরিয়ে আসত। ক্লাশের মধ্যে হস্তলিপির জন্য ৫ নম্বর সব সময় মাহমুদা বেশি পেত। যা অন্য কারো ভাগ্যে জুটত না। এটাতো অবশ্য অবশ্য মাহমুদার লেখা চিঠি। ছাতি কাঁপছে পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণ পাখি উড়ে যেতে চায়। আতিকা আস্তে আস্তে খামের লিপিটি বের করে পাঠ করতে করতে থেমে গেল। স্পন্দন থেমে গেল। বুক ভেঙ্গে গেল, চোখের বাঁধ ছুটে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল, হৃদয় ফেটে গুমরিয়ে বেরিয়ে এক আর্তনাদ। প্রতিধ্বনিত হল দেয়ালে। বুক ফাটা আর্তনাদের সুর ধরে ও ঘর থেকে ভাবী দৌড়িয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে আতিকা? কাঁদছিস কেন? আতিকা পত্রটি বালিশ চাপা দিয়ে বলে উঠল, "এই মাত্র ঘুমের ঘোরে মাহমুদাকে স্বপ্নে দেখেছি, সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। চেহারায় তার দুশমনের ভয় ভীতির রেখা ফুটে আছে। সে যেন মুক্তির পথ খোঁজছে। কিন্তু সে তা পাচ্ছে না।" ভাবী বলল "আরে স্বপ্ন তো স্বপ্নই। এর আবার বাস্তবতা আছে নাকি। ওযে রসিক মাগী হয়ত কোন ছোকরার হাত ধরে পালিয়ে গেছে। অন্য কিছু নয়।

একদিন না একদিন খবর অবশ্যই পাবে। ইসঃ মাতা-পিতা কতই না কেঁদেছে, পাগল হয়ে খোজা-খুঁজি করেছে। হয়ত একদিন এ ভুলের অবসান ঘটবে। তখন আর আফসুস করে লাভ হবে না জানিস! যুবতী মেয়েদের এত রং ঢং করে সেজে গুজে চলতে হয় না। দুনিয়ার সব মানুষ এক রকম নয়।"

মুসলমান মহিলারা রাস্তায় বেরুলে আপদ মস্তক ঢেকে বেরোনোর হুকুম দিয়েছে। পর্দা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। বর্তমানে প্রতিটি ঘরে ঘরে পর্দা নামক ফরজ বিধানকে কতল করে চলছে। মাহমুদাকে পর্দার কথা বললে মাগী চোখ দুটো কপালে তুলে মুখ ভেংচিয়ে বলত, "তোমার মত বিয়ে হলে আর বুড়ি হলে বোরকার ভিতর যাব, এর আগে নয়। ফুল যদি ঢেকে রাখা হয় তাহলে কি মৌমাছিরা ছুটে আসবে? বাগানে কি কোন দিন মৌমাছির গুন গুন গান শুনবে? আমরা বাগানের অঝরা মুকুল। আমরা একদিন ফুটব। সুভাস ছড়িয়ে মৌমাছিদের আমার কাছে ডাকব।" এগুলো ছিল মাহমুদার উক্তি। জানি না কোন ভ্রমর মাহমুদা নামক ফুলে চুমুক দিয়েছে। যাও বোন, আজে বাজে চিন্তা না করে নিজের চিন্তা কর। যাও ঘুমাওগে। এই বলে ভাবী রন্ধন শালায় চলে গেলেন।

আতিকা আবার পত্রটি খুলে পাঠ করতে লাগল। কোন শিকারী যেন তার অজান্তে বিষ মাখা তীর বক্ষদেশ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। মাহমুদা অন্তসত্তা। একাকী জীবন যাপন করছে। দেখাশোনা করার মত কেউ নেই। প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন। আতিকা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করল, মাহমুদার সংবাদ যেভাবেই হউক নিতে হবে। কিভাবে সে আলমের ফাঁদে বন্দি হল, আলম কেন আজ তার অন্তিম সময়ে দূরে সরে গেল। কেন তাদের প্রেমের মধ্যে ভাটা পড়ল, আজ সে সন্তানের মা হতে চলেছে, দুর্গম পথ পাড়ি দিতে যাচ্ছে। তবে দেখাশুনা করার মত কেউ নেই কেন। আগে এত লোকজন এরা কারা ছিল। এখনই বা ওরা দূরে সরে যাচ্ছে, এসব কিছু রহস্য জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল আতিকা। সর্বশেষ স্থির করল প্রথমে একটি পত্র দিয়ে দেখা যাক কোন উত্তর মিলে কি না। আগে তো কলেজ বন্ধ হলে সবাই বাড়ি ফিরে যেতো। তখন একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাত হত। আজ প্রায় ১ বৎসর যাবত দেখা সাক্ষাত ও কথা-বার্তা থেকে বঞ্চিত, বাড়ি গেলেও তো আর সাক্ষাত হয় না। তাই পত্র দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় আতিকার কাছে উপস্থিত নেই। ভাগ্য ভালো থাকলে উত্তর মিলবে। এসব চিন্তা করে আতিকা মাহমুদার নিকট পত্র লিখে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

মাহমুদার শারিরীক দুর্বলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসছে। হাসপাতাল বা ক্লিনিকের বেডে, ডাক্তার ও নার্সদের তত্ত্বাবধানে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। নিষ্ঠুর স্বামীর সাথে হয়তবা আর দেখা হবে না। বার বার পত্র দেয়ার পরও উত্তর ফিরে এল না। মাহমুদার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। এক এন.জি.ও মহিলা অফিসারের সাথে মাহমুদার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ দিন যাবৎ। উক্ত মহিলা একজন

গাইনি বিভাগের মহিলা ডাক্তারের কাছে মাহমুদার সব কিছু বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলে তিনি মাহমুদাকে সেই ক্লিনিকে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন এবং বলেন আমরা যথাসাধ্য বিপন্না মাহমুদাকে কম খরচে চিকিৎসা দেয়ার চেষ্টা করব। মাহমুদা মহিলা ডাক্তারের আশ্বাস বাণী শুনে যার পরনাই আনন্দ প্রকাশ করল। উক্ত ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমেই কিছু আগাম ঔষধ সেবন করতে লাগল। গর্ভপাত হওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। মাহমুদা অফিসার মহিলাকে নিয়ে ক্লিনিকে চলে গেল। সে এখন হাসপাতাল বেডের অধিবাসী।

পিয়ন আতিকার পত্র নিয়ে এন.জি.ও অফিসে গেলে জানতে পারলেন, মাহমুদা বেশ কদিন যাবৎ ছুটিতে আছে। পিয়ন বাসার ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল তালা ঝুলানো। পিয়ন বিরক্ত হয়ে প্রেরকের ঠিকানায় পত্রটি ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। চিঠি ফেরত পেয়ে মাহমুদার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। খামের উপর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে মালিক না পাওয়ায় ফেরত পাঠানো হলো। ভাবনার শেষ নেই আতিকার। নিরাশ না হয়ে আতিকা আবারও পত্র প্রেরণ করল। এন.জি.ও মহিলা অফিসার (মাহমুদার বান্ধবী) অফিস রুমে কর্মরত। পিয়ন এসে পত্রটা বের করে অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই এই অফিসে মাহমুদা নামে কোন মহিলা কাজ করে? তার একটি পত্র আসছে। মাহমুদার নাম শোনা মাত্র মহিলাটি তার আসন ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "পত্রটি আমার কাছে দিন পৌঁছে দেব। তিনি অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন।" পিয়ন পত্রটি মহিলার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। মহিলার আনন্দের সীমা নেই, তিনি ভাবছেন হয়ত আলমের পক্ষ থেকে উত্তর আসছে। পত্রটি সযত্নে রেখে দিয়ে অফিসের কাজ ঘুচিয়ে, অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেল পত্রটি নিয়ে। মাহমুদা হাসপাতাল বেডে কাতরাচ্ছে। বান্ধবীকে পেয়ে একটু সুস্থতা বোধ করছিল। মহিলা পত্রটি মাহমুদার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার প্রেমাস্পদের চিঠি। মাহমুদা আনন্দে লাফিয়ে উঠল, তাহলে এত দিন পর প্রিয় স্বামীর পক্ষ থেকে পত্র আসছে। হায়! হায়! খামের লেখা দেখে বুঝতে পারল এ আলমের পত্র নয়। লেখার মিল নেই। এটা যে আতিকার পত্র তা চিন্তাও করতে পারেনি। কারণ মাহমুদার কোন খবর আতিকার কাছে নেই। সে কোথায় কিভাবে আছে তা কেউ জানে না। কাজেই এটা আতিকার দেয়া পত্র তা কল্পনার বাইরে। কিন্তু লেখা যে আতিকার স্ব আগ্রহে পত্রটি খুলে পাঠ করতে গিয়ে তার ভ্রম দূর হল। সত্যিই তো এটা আতিকার প্রেরিত পত্র। পত্র পাঠে সে খুব রোদন করল। মহিলা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তার বাল্যজীবন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ইতিকথার পুন:আবৃত্ত করল। মাহমুদার করুণ কাহিনী শুনে মহিলার চোখও ভিজে গেল। সে উক্ত মহিলাকে বলল, "আপা! দু:খের দিনে আপনাকে ছাড়া কেউ তো আমার পার্শ্বে নেই। আর না থাকারই কথা। প্রচলিত প্রেমের ফাঁদে বা যৌবনের উন্মাদনায় যারাই প্রেমে পড়েছে, তাদের জন্য এমনটা

হওয়াই বাঞ্চনীয়। আপা! আপনি যদি কষ্ট করে আমার বান্ধবীকে এ অন্তিম সময়ে আমার কাছে এনে দিতেন, তবে অনেক উপকার হত। যাবেন কি আপা আতিকাকে আনতে? ছুটি ছাড়াতো যাওয়া যাবে না। দেখি ছুটি নেয়া যায় কি না। মহিলাটি একদিন পর মাহমুদার হস্তলিপি নিয়ে বাগরামে চলে গেলেন। ঠিকানা মত বাসায় গিয়ে হাজির। ভাবী মহিলার বসার ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন আতিকা কলেজে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় ফিরবে। আপনি আহারাদি সেরে বিশ্রাম করুন।

আটান্ন

দিন দিন অবস্থা খারাপ থেকে খারাপের দিকেই যাচ্ছে। রুশী ফৌজেরা এখন শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে লাগল। হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, বন্দি এগুলো নিত্য দিনের ঘটনা। হযরত উলামায়ে কেরাম, মিছিল, মিটিং, পথসভা, জনসভা হরতাল ধর্মঘটসহ যতগুলো রাস্তা ছিল প্রতিবাদের, তার কোনটিই বাদ দেননি। সব ধরনের প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু এগুলোর দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার হয়নি। বরং বড় বড় আলেমদেরকে ধরে ধরে নির্বিচারে শহীদ করতে লাগল। এলাজুক পরিস্থিতিতে অল্প সংখ্যক উলামায়ে কেরাম কিছু কিছু স্থানে জিহাদ আরম্ভ করে দিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী সাহেবও তাদেরই একজন। উলামায়ে কেরাম জিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চারিদিকে প্রচারাভিযান চালাতে লাগলেন। মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানী মুবাল্লেগ হিসাবে মাওলানা রফিককে পূর্বেই নির্বাচন করে ছিলেন, কারণ মাওলানা রফিক এলেম ও আমলের দিক দিয়ে পাকা। তরুণদের মধ্যে অনন্য। চেহারা সুরতে অতুলনীয়। বক্তৃতা ও বাগ্নিতার দিক দিয়ে নজিরবিহীন। তার জালাময়ী বক্তৃতায় হাজার হাজার যুবক দাঁড়িয়ে যায়। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদ। মাওলানা রফিক গোপনে গোপনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল, কলেজ ঘুরে ঘুরে জিহাদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এতে শত শত যুবকরা জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করতে লাগল। মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের দল ভারী করতে লাগলেন। নিয়মিত চলছে রাশিয়ান সৈন্যদের উপর আক্রমণ।

মাওলানা রফিক যেহেতু দাওয়াতী কার্যক্রম নিয়ে দেশ জুড়ে ছুটাছুটি করেন, সেহেতু রাশিয়ান ফৌজের টারগেট হল মাওলানা রফিককে যেভাবেই হউক গ্রেপ্তার করা। তাই কয়েক ডজন গোয়েন্দা লেলিয়ে দেয়া হয় রফিকের সন্ধানে। ওরা হাট-বাজার শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জ ক্ষুধার্ত কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগল। মাওলানা রফিক আঁচ করতে পারেননি তার পিছনে যে শত শত গোয়েন্দা কাজ করছে। তবু সতর্কতার সাথে তিনি প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। মাওলানা রফিক পাকতিয়া প্রাদেশিক শহরে অবস্থিত মাদ্রাসায়ে নূরীয়ার ছাত্র শিক্ষকদের সাথে তিন

ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে উক্ত মাদ্রাসার মুতাওয়াছছাত দরজার একজন ওস্তাদ, মাওলানা রফিক সাহেবের সাথে তর্কে লিপ্ত হন। উক্ত শিক্ষক জিহাদের বিরোধিতা করে শত শত প্রশ্ন করতে লাগলেন। মাওলানা রফিক প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা আবার কোনটা হাদিস দ্বারা দিতে লাগলেন। উপস্থিত ছাত্র শিক্ষকগণ উক্ত ওস্তাদের একগুয়েমী প্রশ্ন ও ধৃষ্টতা বুঝতে পেরে রাগে ফুলতে লাগলো। মাওলানা রফিকের সাথে তর্কে জিততে না পেরে অন্য ভাষায় গালি গালাজ আরম্ভ করে দিলেন।

মোহতামিম সাহেব তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "জিহাদ একটি ফরজ ইবাদাত, ইহা কখনো হয়ে থাকে ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন। এর নিচে আসে না কোনদিন। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তো ঈমান ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তো আপনার সবগুলো প্রশ্নের উত্তর কুরআন হাদিসের দ্বারা দিয়েছেন, আপনার মত মনগড়া কোন কথা বলেনি। মেহমানের সাথে ঝগড়া করা ঠিক নয়। উক্ত শিক্ষক মোহতামিমের সাথে চটে গিয়ে বললেন, "আপনি আবার বাড়াবাড়ি করবেন না। এলোক হুকুমতের বিরোধিতা করছে, উস্কানিমূলক বক্তব্য দ্বারা সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, এসব বক্তব্য দ্বারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। ফেৎনা ফাসাদ আরম্ভ হবে এবং দেশের শান্তি বিনষ্ট হবে। আপনি একজন রাষ্ট্র দ্রোহীর ওকালতি করছেন। আপনিও সাবধান হয়ে যান।" মোহতামিম সাহেব উক্ত শিক্ষকের অশালিন ব্যবহারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ ধরনের ব্যবহার করার কথা নয়, তাহলে...? তিনি কথা না বাড়িয়ে নিরবতার ভূমিকা পালন করলেন। উক্ত শিক্ষকের নাম মাওলানা আযাদ। এলাকার লোকজন তাকে বেজাত বলেই ডাকেন। উক্ত ওস্তাদজীর মেজাজ, অনেকটাই লেজ বিশিষ্ট দারোয়ানের মত। সময়ে অসময়ে খেও-খেও, ঘেউ-ঘেউ করে থাকেন। কথা কাটাকাটি বন্ধের পর ওস্তাদজী চলে গেলেন মাদ্রাসার গেটের বাইরে। এমন সময় মেশকাত জামাতের ছাত্র জিয়া এসে মোহতামিম সাহেবের কানে কানে বলল, "হুজুর! আপনার সাথে খুব জরুরি আলাপ আছে। দয়া করে একটু নিরব সময় দিতে হবে।" মোহতামিম সাহেবের মেজাজ তর্ক-বিতর্কের কারণে খারাপ ছিল। তাই একটু রেগে বললেন "যাও এখন সময় নেই পরে এস।" মোহতামিম সাহেবের কথা শুনার সাথে সাথে ছেলেটির হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। চোখ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর ধারা। কিছুই বলতে পারছে না ও। মোহতামিম সাহেব তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটির অন্তর যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তিনি বললেন, "বাবা কি বলতে চাচ্ছ বলো" তখন ছেলেটি বললো হুজুর কথা বলার আগে আগন্তুক মেহমানকে বিলম্ব না করে এক্ষুনি অন্যত্র সরিয়ে দিন। নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিন, তা না হয় মহাবিপদের আশঙ্কা আছে।" ছেলেটির কথা শুনে , মোহতামিম সাহেবের অনুভূতি জাগ্রত হল। তিনি আর কোন প্রশ্ন না করে আকিল নামক এক ছাত্রকে ডেকে বললেন, "বাবা

মেহমানকে তোমাদের বাসায় নিয়ে যাও। তার হেফাজত কর ও সেবা করতে কমতি করো না।" এই বলে মাওলানা রফিক সাহেবকে আকিলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। আকিল খুবই বুদ্ধিমান ও চতুর ছেলে। বয়স প্রায় ১৩ বৎসর। নাহবেমীর জামাতের ছাত্র। সে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির কথা খবর খুব ভালোভাবেই জানে। মেহমানের পরিচয়ও সে আগেই পেয়েছে। মেহমানকে হেফাজত করা যে ঈমানী দায়িত্ব সে মাসআলাও তার জানা।

আকিল মেহমানকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে তার আম্মার নিকট মেহমানের পরিচয় দিল। উম্মে আকিল ছেলের কথা শুনে বললেন, "যাও একে মেহমান খানায় নিয়ে বিশ্রাম করতে দাও।" তখন রাত ৮ ঘটিকা। মসজিদে এশার নামাযের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। মুসুল্লিরা দলে দলে মসজিদ পানে ছুটে চলছে। আকিল মাওলানা রফিককে লক্ষ্য করে বলল, "মুসাফির ভাইয়া! আমরা ঘরেই নামায পড়ে নেব। এখন আর মসজিদে যাব না। এই বলে মেহমানের ওযু এস্তেঞ্জার ব্যবস্থা করে দিল। জিয়া মোহতামিম সাহেবকে নিয়ে অফিস রুমে গিয়ে বলল, হুজুর বেজাত হুজুর কিন্তু রাশিয়ানদের গুপ্তচর।" হুজুর বলল বেজাত হুজুর মানে। জিয়া বলল নাউযুবিল্লাহ। আযাদ হুজুর। মোহতামীম সাহেব মুচকী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, " তুমি কিভাবে জানলে? জিয়া বলল, তিনি নিজেই আমাকে ডেকে বলেছেন যে,মাদ্রাসায় কোন ছাত্র শিক্ষক মুজাহিদ দলে যোগ দেয় কিনা তা খবর রাখতে। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের কোন সংবাদ দিতে পারলে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে। এমন কি গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কয়েকজন আলেমের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, উনারাও নাকি গুপ্তচরের কাজে লিপ্ত। কেউ কেউ বাড়ি গাড়ির মালিকও হয়ে গেছেন ইদানিং। ওস্তাদজী গতকাল বিকেলে বলেছেন, মাওলানা রফিক নামে এক ব্যক্তি (যিনি জিহাদের দাওয়াত দেন) তাকে ধরে দিতে পারলে নগদ তিন লক্ষ টাকা দিবে। সে কোথায় কিভাবে থাকে তার সঠিক সংবাদ দিতে পারলে তাকেও দেয়া হবে এক লক্ষ টাকা। এই টাকার পাওয়ার আশায় অনেকেই সুযোগ খুঁজছে। জিয়ার কথা শুনে মোহতামিম সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন জিয়া মিথ্যা বলার ছেলে নয়, সে মিথ্যা বলতে পারে না। মাওলানা আযাদের হুমকি ধমকি ইদানিং একটু বেড়েই গিয়েছে তিনি ভাবতে লাগলেন কিভাবে একজন আলেম দ্বীনকে, একজন মুসলমানকে, দ্বীনের মুজাহিদকে, আল্লাহর মেহমানকে অর্থের লোভে রুশীদের হাতে তুলে দিতে চায়। আলেম হয়ে কিভাবে রুশীদের চাকর হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারে। জিয়া আরো বলল, হুজুর! তিনি আমাকে বলেছেন, ছাত্রদের মধ্যে কে কে জিহাদ ভাবাপন্ন তাদের নামের তালিকা দিলে একটি হোন্ডা দিবে। তিনি আরো বলেছেন, প্রতিটি মাদ্রাসায় নাকি এক একজন ওস্তাদ নিযুক্ত রয়েছেন। ওরা সবাই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জিহাদের বিরোধিতা করবেন, জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবেন এবং কারা

জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয় ও জিহাদের কথা বলেন তাদের ধরিয়ে দিবেন। মোহতামিম সাহেব এসব কথা শোনে আর স্থির থাকতে পারলেন না।

তিনি মনে মনে এরাদা করলেন এমনি তো মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। আলেমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, মা বোনদের ইজ্জত হরণ করছে। এসব জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র শরয়ী বিধান হল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। জিহাদের বিরোধিতা যারা করে তারা মুসলমান নয়। এসব মুনাফেকদের হত্যা করা শরীয়ত বৈধ করেছে। ওদের মাধ্যমে মাদ্রাসা বন্ধ করার আগে আমিই বন্ধ করে দেব এবং সব ছাত্র শিক্ষককে জিহাদের প্রশিক্ষণ নিতে এবং সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিবো। আগে মৌলভী মার্কা মুনাফেকদের হত্যা করে মনের জ্বালা মেটাব। তারপর আসল শত্রুর মোকাবেলা করব। এসব ভাবতে ভাবতে এশার আযান ধ্বনিত হল। মোহতামিম সাহেব জিয়াকে নিয়ে চলে গেলেন মসজিদে।

নামায আদায় করার সাথে সাথে পোশাক পরিহিত একজন অস্ত্রধারী যুবক দাঁড়িয়ে বলল, প্রিয় দেশবাসী আপনারা স্ব স্ব স্থানে বসে থাকুন। এক কদম এদিক ওদিক নড়াচড়া করবেন না। যদি কথা অমান্য করেন তবে মসজিদ রক্তে রঞ্জিত হবে। কেউ বাঁচতে পারবেন না। মুসুল্লীরা এ কথা শুনে ভয়ে কবুতরের বাচ্চার মত কাপতে লাগল। কারো মুখে কোন ভাষা নেই। লোকটি দরজায় দাঁড়ানো তারই পার্শ্বে দন্ডায়মান ওস্তাদ বেজাত (আযাদ) মাওলানা আযাদ রফিককে ধরিয়ে দেয়ার জন্য নাজিবুল্লার অনুগত গুয়েন্দা বাহিনী তলব করে এনেছেন। ওরা সংখ্যায় মাত্র তিন জন। একজন দর্জায় দাঁড়িয়ে মুসুল্লীদের চেক করছে। আর বাকি দুজন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাইরে দাড়িয়ে আছে। আযাদ মেহমানের চেহারা তালাশ করছে। জিয়া মনে মনে ভাবল আর ভয় নেই একটি কিছু এখনই করতে হবে তাই সে আঃ করিমকে ডেকে বলল, "আমি সবার পিছনে বের হব। আমি যখন দরজার নিকটবর্তী হব তখন তুমি দেয়ালে স্থাপিত মেইন সুইজটি বন্ধ করে দিবে। জিয়া দর্জার নিকট গেলে আঃ করিম সুইজ অফ করে দিল। জিয়া সাথে সাথে এক ধাক্কায় দুজনকে ফেলে দিয়ে অস্ত্র নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আযাদ মিয়ার সামনের ৪টি দাঁত খসে গেল আর গোয়েন্দা চাচার ললাট কেটে জামা কাপড় রক্তে সিক্ত হতে লাগল।

উনষাট

আতিকা কলেজ থেকে আসলে পত্র বাহক মহিলার সাথে সাক্ষাত হয়। মহিলা আতিকার হাতে মাহমুদার পত্রটি বের করে দেন। আতিকা মাহমুদার লিখা পত্র পাঠ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং ভাবীকে ডেকে বলল, "ভাবী গো। আমার বাল্য জীবনের বান্ধবী মাহমুদার সন্ধান পেয়েছি বটে কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে

আজ মৃত্যুর বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।" এই বলে পত্রটি ভাবীর হাতে দিয়ে বলল, দেখ ভাবী! আমার বান্ধবীর হৃদয় বিদারক কলিজার খুনে লেখা। ভাবী পত্রটি নিয়ে পড়তে পড়তে চোখ ভিজে গেল হাসি মিলিয়ে গেল। কর্ম স্পৃহা থেমে গেল। বুকের স্পন্দন আর হাতের কম্পন ক্রমশই বাড়তে লাগল। রাতের রান্না একটু আগেই শেষ করেছিল। তা না হয় পত্রটি আগে পেলে হয়ত রান্নাই হত না। সবাই মিলে মাহমুদার কথাই আলোচনা করছে। পত্র বাহক মহিলাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "কিভাবে কোথায় আলমের সাথে মাহমুদার বিয়ে হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি বদলি হয়ে বর্তমান অফিসে আসলে তাদের সাথে পরিচয় হয়। আলম সাহেব ছিলেন আমাদের বস। দেড় মাস আমি উনার অধীনে চাকুরি করেছি। দেড় মাস পর আলম সাহেব বদলি হয়ে বাগরামে চলে আসেন। বাগরাম আসার আগে উভয়ের মধ্যে খুবই ভালোবাসা ছিল। কোন দিন তাদের মধ্যে মন কষাকষি দেখিনি শুনিনি। বাগরাম আসার পর প্রথম সপ্তাহে একবার, তারপর মাসে ২/১ আর, আবার কিছু দিন পর ২/১ মাসে একবার বাসায় যেতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। বর্তমানে কয়েক মাসেও একবার বাসায় যেতে দেখি না। বার বার পত্র দিয়ে মাহমুদা উত্তর পান না। আজ কয়েকমাস যাবৎ এমনটিই হচ্ছে।" পত্রবাহক মহিলাটি আরো বললেন, "আমি মাহমুদার জবান থেকে এতটুকু শুনেছি যে, ওরা নাকি একে অপরের প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কেউ কাউকে ছাড়তে পারেনি। অতঃপর মাহমুদা প্রেমের উন্মাদনায় পিতা-মাতা, ভাই-বোন পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবদের অগোচরে প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলমের অববাহিকায় এসে কূল পায়। তারপর বেশ কিছু দিন আলমের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করে। আলম তাকে এন.জি.ও চাকুরী দেয়। অতঃপর মাহমুদার খুব পীড়াপিড়িতে কোর্টের মাধ্যমে তাদের শুভ পরিণয় সম্পূর্ণ হয়। এতে আলমের খুব একটা সম্মতি ছিল না। কারণ এন.জি.ও ওরা সন্তান নেওয়াটাকেও আয়েব (দূষণীয়) মনে করে। ওরা আমেরিকার তৈরি সব ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন মহিলা যদি সন্তান গ্রহণ করে তবে হয়ত চাকুরিই চলে যায়, তা না হয় বেতন উঠাতে খুব হয়রানী পোহাতে হয়, এবং ঠাট্টা, বিদ্রূপ ভৎর্সনার গ্লানি বরদাস্ত করতে হয়। আলম সাহেবও নাকি সন্তান না নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মাহমুদাকে, কিন্তু সে তা মেনে নেয়নি। মনে হয় এসব কারণেই তাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে।"

বেগম সরুয়ার কথা শুনে এন.জি.ওদের উপর তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। কিন্তু এতো অরণ্য রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু অগ্নিশর্মা ধারণ করে গদগদ কণ্ঠে বললেন, "এন.জি.ও গোলামের বাচ্চারা সেবার ধ্বজা উড়িয়ে এদেশে আসছে মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য। এদেশের যুবক ও পুরুষরা বেকার ঘুরে, কাজ না পেয়ে রাস্তা-ঘাটে পথিকের পকেট হাতায়। নিরীহ মানুষের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে

সব কিছু হাতিয়ে নেয় । এদের যদি কর্মসংস্থান থাকত তাহলে এদের দ্বারা এ ধরনের অপকর্ম হত না। পথিকরা টাকা-পয়সা নিয়ে নির্ধিধায় চলাফেরা করতে পারত। মহিলারা যতই অসহায় হোকনা কেন, ওরা অর্থের লোভে রাস্তায় নামার সাহস পেত না। পুরষরা চাকুরি পেলে মহিলাদের মাঠে নামতে হত না। পুরুষরা অর্থ যোগাত আর মহিলারা ঘরে বসে বাচ্চা-কাচ্চাদের লালন ও গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করত। এসব বলাবলি করছিলেন বেগম সরুয়ার। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। এসময়ে অন্য কারো আগমন হতে পারে না। নিশ্চয়ই সরুয়ার বাসায় ফিরছেন। আতিকা দৌড়িয়ে ফটকের কাছে গিয়ে ছিটকারী খুলে দিল। সরুয়ার ভিতরে প্রবেশ করতেই পত্রবাহক মহিলাটি আঁখি নামক ক্যামেরা দর্পণে ভেসে উঠল, পুরা কক্ষটা যেন পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। চোখগুলো যেন বারি বর্ষণে সিক্ত হয়ে আছে। কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না সরুয়ার সাহেব।

আসন গ্রহণ করে উক্ত মহিলার পরিচয় জানতে চাইলে বেগম সাহেবা তার পরিচয়সহ আগমনের কারণ বর্ণনা করল। আতিকার মুখ থেকে মাহমুদার মর্মান্তিক কাহিনী শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "তাহলে এ সংবাদটি কাল বিলম্ব না করে মাহমুদার আব্বুর গোচরে দেয়ার দরকার। এ অন্তিম সময়ে হয়ত মেয়ের পার্শ্বে এসে দাঁড়াতে পারেন।" সরুয়ারের কথা শুনে আগন্তুক মহিলাটি বিনীত কণ্ঠে বললেন "ভাইজান! আপনার ধারণা ঠিক, কিন্তু মাহমুদার পক্ষ থেকে পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে অবগত করানো একে বারে হারাম করে দিয়েছে। আমারও অনুরোধ এটাই। আপাতত এ নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে জানাজানি না করা। যেহেতু তাদের পরিণয়টা শুভ হয়নি, এভাবে করা আদৌ উচিৎ হয়নি তাই এখন না জানিয়ে আর কিছুদিন পর জানালেই ভালো হবে। আলম সাহেবের ভুল ভাংলে এক সময় স্বামী ও স্ত্রী গিয়ে পিতা-মাতার পায়ে পড়লে, সন্তান নানা-নানির কোলে তুলে দিলে হয়ত ক্ষমা পেতে পারে। এখন কি করবেন তা চিন্তা করে দেখুন।" মহিলার কথা শুনে আতিকা ও বেগম সরুয়ার এই কথার উপরই একমত হয়ে গেলেন। সরুয়ারও তাদের যুক্তি গ্রহণ করে নিলেন।

বেগম সরুয়ার স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, "একজন বিপন্না নারীকে সহায়তা করা পূণ্যের কাজ। যেহেতু অনেক আপন মনে করে আমাদের নিকর্ট বার্তা প্রেরণ করেছে, সে হিসেবে এগিয়ে যাওয়া জরুরি মনে করি। এ সময়ে ঔষধ পত্র ও পথ্যের খুবই দরকার হতে পারে, তাই কিছুটা আর্থিক সহায়তা করাও দরকার।" পত্রবাহক মহিলা বললেন, "ভাইজান! আসার সময় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছিল "আপা! আপনি জলদি আসুন, আতিকাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। হয় এটাই হবে আখেরী দেখা। আপনার পায়ে ধরি মিনতি করি ওকে রেখে আসবেন না, যে ভাবেই হোক সাথে নিয়ে আসবেন। আর বিলম্ব যেন না হয়।" বেগম সরুয়ার অনুনয় বিনয় করে বললেন ,"স্বামীগো আপনাকে গেলেই ভালো হবে কারণ

আতিকা মেয়ে মানুষ, সে হয়ত তার পার্শ্বে থাকতে পারবে কিন্তু অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি গেলে ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তাই আপনাকে যাওয়াটা অবশ্যই ভালো মনে করি।" সরুয়ার বললেন, "হ্যাঁ আমি যেতে পারতাম, কিন্তু তিন চারদিন কোথাও নড়াচড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অফিসে অডিট চলছে। আমার বিভাগের হিসাব আমাকেই দিতে হবে। তাই তিন চারদিন কোথাও যেতে পারব না। কাজেই মহিলার সাথে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আতিকাকে পাঠিয়ে দেই। আমি পাঁচ সাত দিন পর যাব।"

আতিকা যাওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া। বলতে দেরি, চলতে দেরি নেই। ভাইয়া তাকে যাওয়ার জন্য এজাজত দিলেন। আতিকা একটি চেইন বের করে বলল "ভাইজান! এ চেইনটি এক সময় মাহমুদার গলা থেকে খুলে স্নেহের নিদর্শন হিসেবে আমার গলায় পরিয়ে দেয়। আজ তার দুর্দিনে চেইনটি বিক্রি করে তার প্রয়োজনে খরচ করা যাবে।" অত:পর সকলেই আহারাদী সেরে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে গেলেন। ভোরে গোসল করে আতিকা তৈরি হচ্ছে মাহমুদার কাছে যাওয়ার জন্য। বেগম সরুয়ার নাস্তা তৈরির কাজে লেগে গেলেন। সরুয়ার আতিকাকে যাতায়াত ভাড়া হিসেবে আটশ, আর মাহমুদার ঔষধ ও পথ্যের জন্য একহাজার, মোট আঠারশত টাকা দিলেন এবং বললেন, "টাকা তো আরো দেয়ার দরকার ছিল, কিন্তু হাতে তো আর টাকা নেই এ দিয়ে চল পরে টাকা নিয়ে আসতেছি। আতিকা বলল, "ভাইয়া যা দিয়েছ তাতেই হবে। চেইনটি বিক্রি করলে হয়ত আর পনেরশ টাকা পাওয়া যাবে।" বেগম সরুয়ার নাস্তা এনে হাজির করলে আতিকা মেহমানদেরকে নিয়ে খানা শেষ করল। অত:পর উভয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ফটকের কাছে এসে ভাবীকে ডেকে বলল, রোগীনীর অবস্থা ভালো দেখলে তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসব, আর যদি বেশি খারাপ দেখি, তাহলে ফিরতে একটু বিলম্ব হবে। এই জন্য যেন খোঁজা-খুঁজি না হয়। এই বলে দুজন গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি হর্ন বাজিয়ে উল্কা বেগে সমীরণের অগ্রভাগে দৌড়াতে লাগল। বন বাদার, মাঠ-ঘাট ও মরু প্রান্তর পেরিয়ে গাড়ি চলছে তো চলছেই। আতিকা খোলা তাবায়নে অপলক নেত্রে বাইরের দৃশ্যাবলি প্রাণভরে অবলোকন করছে। উঁচু-নিচু টেক-টিলা, মাঝে মধ্যে রয়েছে মেলেরিয়া বিথীকা। বাড়ি ঘরগুলো অধিকাংশই মাটির নির্মিত। পাকা ইটের তৈরি বাড়িঘরের সংখ্যা খুবই নগন্য। মাঠে মাঠে চাষিরা মনের আনন্দে চাষাবাদ করছে, ফসল ফলাচ্ছে। মাঠে মাঠে গম, ভুট্টা, আলু, শশা, খরবুজা ও বাংগীর বিপুল সমাহার। দূরে দূরে মসাকৃতির পর্বতমালা এবড়ো-থেবড়োভাবে শীর তুলে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় দানবেরা হা করে গগন ছোঁয়া আকৃতিতে ভয় দেখাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দু একটি পাহাড় থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সুমিষ্ট

ও সুশীতল বারীবিন্দুর ফল্গুধারা। বাহঃ কি চমৎকার। বিকাল দুটি বাজার এখনো অল্প সময় বাঁকি। বাসটি তাদেরকে নিয়ে জালালাবাদ টার্মিনালে প্রবেশ করল। শত শত বাস আসছে যাচ্ছে। আবার কোনটা ছাড়ার অপেক্ষায়। অন্য যাত্রীদের মত আতিকারাও লাকেজ পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল। সেখান থেকে কিছু ফল ফ্রুট ক্রয় করে টেক্সী নিয়ে চলে গেল হাসপাতালে। মাহমুদা ২য় তলায় খোলা বাতায়নে অনির্মিখ নেত্রে তাকিয়ে আছে আতিকার পথ পানে। আতিকারা যখন টেক্সী থেকে নামছিল, তখনই মাহমুদার নজরে পড়ল দুটি মহিলাকে। তার সহকর্মীকে প্রথমেই চিনতে পেরেছে, কিন্তু সাথের ব্যক্তিটি কে এনিয়ে রীতিমত ফাঁপরে পড়ে গেল মাহমুদা। তাহলে কি আতিকা আসেনি? এ বুড়িকে নিয়ে এল কোত্থেকে? আতিকা আসলে তো বোরকা পরে আসত না। বড়জোর স্কন্ধদেশে জর্জেট মার্কা উড়নাটা থাকতো। অমন তো অবশ্যই হত না। না ধর্মের বর্ম পরেছে। এসব মনে মনে ভাবছে মাহমুদা। এরই মধ্যে ওরা বেবী অলার পাওনা পরিশোধ করে সোজা চলে এলেন দুতলায় ৫নং ওয়ার্ডে এবং ১৭ নং বেডে। মাহমুদা এখনো তাকিয়ে আছে বাইরে। এখনো সে আতিকাকে নিয়ে ভাবনার সাগরে সাঁতার কাটছে। আতিকা মসাকৃতি বোরকার আবরণ মুখমন্ডল থেকে সরিয়ে বেডের পার্শ্বে দন্ডায়মান। মাহমুদা বাহির থেকে চোখ ফিরে চেয়ে দেখে তার চিরচেনা ও কাঙ্খিত মুখটি। চলল চার চোখের মিলন দৃশ্য। মধুর মিলনে চার চারটি চোখই রূপায়িত হয়েছে ফল্গুধারায়। প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুর শ্রোতধারা।

আতিকা মাহমুদার দিকে তাকিয়ে দেখছে যে তার মুখমন্ডল ফেকাশে হয়ে গেছে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বেরুচ্ছে। স্বস্তিতে বসে থাকতে পারছে না। বার বার এপাশ ওপাশ করছে। তার ওষ্ঠ যুগল কেবলই শুকিয়ে যাচ্ছে। কখনো বসে আবার কখনো শোয়ে আরাম তালাশ করছে। উভয়ে নির্বাক। একটু পর আতিকা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করল মাহমুদা! কেমন লাগছে বোন? তুই কেমন আছিস? দেশ গ্রামে যাস কি না? কে কেমন আছে তা জানতে চাইলো মাহমুদা। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করে খুবই কাঁদল এবং আফসুস করতে করতে বলল, "আমাদের মধ্যে সুফিয়ার জীবনই উত্তম। ইহকালের ও পরকালের কামিয়াবী তারই প্রাপ্য। আমরা প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ভেসে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে এসে হাজির হয়েছি। আর সুফিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। মাহমুদার অন্তরে ভেসে উঠল সেদিনের কথা, যেদিন সুফিয়াকে স্কুলে আনার জন্য তার বাড়ি গিয়েছিল, তখন সুফিয়ার আম্মা-আব্বারা স্কুলে পড়ার বিরোধিতা করে বলেছিলেন "তোমরা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হও। এতে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হবে। অনইসলামী শিক্ষা শয়তানী শিক্ষা। স্কুল কলেজ পড়ু

য়া ছাত্র ছাত্রীরা নামাজ-রোজা, পর্দা-পুশিদা খুব কমই পালন করে থাকে। তোমরা ফিরে যাও, সুফিয়া আর স্কুলে যাবে না। সে মাদ্রাসায় পড়বে।"

আলী বর্দীর একথাগুলো মাহমুদার অন্তরে এখনো অনুরনিত হচ্ছিল। এখনতো আফসুস করলে আর লাভ নেই। আতিকা আনার ভেঙ্গে দানাগুলো বের করে মাহমুদার সামনে দিলে, মাহমুদা সকলকে নিয়ে খেতে লাগল। মুখে রুচি না থাকায় বেশ কদিন যাবত কিছুই খেতে পারত না। আজ হারানো বান্ধবীকে পেয়ে মনে হয় দুর্বলতার অবসান ঘটেছে, রুচি ফিরে আসছে। তাই বেশ কিছু ফলফ্রুট খেয়েছে।

বাহক মহিলার সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আসছেন। সব রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজ পত্র দেখে অবস্থা জানতে লাগলেন। ডাক্তার মাহমুদার কাছে এসে ওকে দেখে নার্সকে বললেন, এ রোগীর স্বাভাবিকভাবে প্রসবের সম্ভাবনা কম, হয়তবা অস্ত্র পাচার করতে হবে। রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া যায়। অতঃপর কিছু ঔষধ পরিবর্তন করে ডাক্তার চলে গেলেন।

রাত তিনটায় রোগীর অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে গেল। অসহ্যনীয় যাতনায় ছটফট করতে করতে জ্ঞান লোপ পেল। সাথে সাথে নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাকে নিয়ে গেল অস্ত্র পাচার রুমে। আতিকা একা একা রয়ে গেল ৫নং ওয়ার্ডে। একজন মহিলা ডাক্তার আতিকার পরিচয় নিলেন অতঃপর তার থাকার ব্যবস্থা করলেন। ভোর ৫টায় অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করাল। রোগী এখনো জ্ঞান ফিরে পায়নি। বিকাল ৩টার দিকে রোগীর জ্ঞান ফিরল। আতিকার কাছে খবর এল, মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে। সুন্দর চেহারা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। মাহমুদাকে সন্ধ্যার একটু আগে স্থানান্তরিত করে নিয়ে গেল ৬নং ওয়ার্ডের ৫নং বেডে। সেখানে সব নবযাতক। এখানে মা ও সন্তান লালিত পালিত হয়। আতিকা উক্ত ওয়ার্ডের সব স্থানে ঘুরে দেখতে লাগল। নবযাতকদের দেখে তার মনে হচ্ছিল সে যেন কোন পুষ্পকাননে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত মায়েরা সন্তানের চাঁদ মুখ দেখে দুঃখ-কষ্ট ভুলে গেছে। সন্তান বুকে জড়িয়ে অতীতের ব্যথা বেদনার কথা ভুলে গেছে। সবগুলো বেডের পার্শ্বে রোগীদের আপনজনরা গিজ গিজ করছে, সন্তান কোলে নিয়ে গাল ভরা চুমু খাচ্ছে, পিতার কোলে সন্তান তুলে দিয়ে মায়েরা আনন্দে হারিয়ে যাচ্ছে। হায়! একমাত্র একজন নারী অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। তার পার্শ্বে নেই সন্তানের জনক। নেই আত্মীয়-স্বজনের ভীড়। সব দিক থেকেই সর্বশান্ত। মাহমুদা ঐ রোগীদের দিকে তাকিয়ে অশ্রু ফেলছে আর নির্গত করছে ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মধ্যে অপলক নেত্রে সন্তানের সোনামুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, হায়! এ সুন্দর ফুটফুটে মুখটি যদি তার পিতার কোলে একবার তুলে দিতে পারতাম। পিতা যদি তাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে আদর করত,

চুমু খেত, তাহলে কত মজাটাই না হতো। মাহমুদা এসব চিন্তা করছে আর অশ্রু ঝরাচ্ছে। আতিকা মাহমুদার মনের ভাব বুঝতে পেরে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে।

সে বলল, "মাহমুদা আপা! এসব চিন্তা করে রোগ আর বৃদ্ধি করবেন না। আপনার নবজাত সন্তানের ললাটে আমি রাজ টিকা দেখতে পাচ্ছি। সে রূপবতি ও ভাগ্যবতি হবে। এমন একদিন আসতেও পারে যে ভেগে যাওয়া পিতা সন্তানের কাছে ফিরে আসবে। ভেগে যাওয়া স্বামী আসবে আপনার কদম তলে। এখন অতীতের সব অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। সন্তানের দিকে তাকিয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। শরীয়তের বিধান অমান্য করাটাই এ দুর্দশার মূল কারণ। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমা কম ছিল না। আপনার স্বাস্থ্য বডি ও গঠন প্রণালীর দিক দিয়ে ছিল না কোন জুড়ী। এত রূপলাভন্যের অধিকারিনী হয়ে অবৈধ প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া ঠিক হয়নি। আপনার জন্য তো উচ্চ শিক্ষিত ছেলেরা ভীড় জমাত। আপনাকে বধূ বানানোর জন্য কত ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, বুদ্ধিজীবীরা গিজ গিজ করত। আজ আপনার পার্শ্বে কেউ নেই। আজ কোথায় আপনার সুদিনের বন্ধুরা? ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে যুবক ভ্রমরেরা বাগান ত্যাগ করেছে। আজ ফিরেও তাকায়নি ওরা। বিলাপ করার সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন কান্নাকাটি আর রোনাজারির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন।" আতিকার উপদেশ শুনে মাহমুদা বলল "আমার মত তুই ত প্রেমে মজিসনি, ধৈর্য ধারণ করে থাক ভাগ্যের সোনালি হরিন একদিন না এক দিন ধরা দেবে"। আতিকা মৃদু হেসে বলল, আপা! আমিও কিন্তু আপনার মত পা রেখেছিলাম। আর এমন হবে না প্রতিজ্ঞা করছি। অতঃপর লম্পট আলমের কিছু অসামাজিক আচরণের কথা বলতে লাগল। আলমের কথা শোনা মাত্র মাহমুদা বলল, "আরে তোমার হাতের লেখার মত একটি পত্র আলমের কাছে পেয়ে সন্দেহ হয়েছিল। আলম তা অস্বীকার করেছে। আতিকা রোগীর সেবায় হাসপাতালে কাটিয়ে দিল ৮ দিন। এর মধ্যে আতিকা ভাইকে টেলিফোনে বলে ছিল সব ঘটনা। মাহমুদা এখন একটু চলাফেরা করতে পারে। সরুয়ার রোগী দেখতে ও হাসপাতালে আসেন। তিনি ঔষধের জন্য কিছু টাকা দিন এবং আবার আসার কথা দিয়ে আতিকাকে সংগে নিয়ে বাগরামে চলে গেলেন।

ষাট

বলা বাহুল্য, সুফিয়া তার বাহিনীকে সুসংগঠিত করে গড়ে তুলছে। আবাসিক দশজন মেধাবী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারিনী মেয়েদেরকে বেশ কটি অস্ত্র চালানো শিক্ষা দিয়েছে। বাকি মহিলারাও জিহাদ কি? জিহাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু কাদের সাথে কখন কিভাবে জিহাদ করতে হবে, কাফেরদের সাথে কি ধরনের আচরণ

করতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। জিহাদ করলে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কি লাভ হবে, মুজাহিদের মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে কতটুকু, শাহাদাতের ফযিলত, শহীদ হলে কি কি পুরস্কার পাওয়া যায়, একজন শহীদ বিচার দিবসে কতজন ওয়াজিবুল জাহান্নামীকে সুপারিশ করে বেহেস্তে নিতে পারবেন, শহীদের জন্য কয়টি মর্যাদার দরজা উন্মুক্ত করা হয়। শহীদের পিতা মাতা কতটুকু সম্মানের অধিকারী হবেন, এসব বিষয়ে নিয়মিত তালিম দিতে লাগল।

এ ধরনের তালিম পেয়ে ঐ সমস্ত মহিলারা নিজের স্বামী নিজের ভাই, নিজ সন্ত ানদের জিহাদে প্রেরণ করার জন্য, সেসব হাদীস শোনায়ে উৎসাহিত করেন। অনেক মেয়েদের খাহেস তার বিয়েটি যদি, কোন মুজাহিদের সাথে হত। কারো দিলের তামান্না, সে যদি শহীদের জননী হতে পারত। কেউ কেউ নিজের অলংকারাদী খুলে স্বামীর নিকট পেশ করে বলেন, "স্বামী গো আমার এই জেওর বিক্রি করে অস্ত্র খরিদ করুন, দীনের এ দুর্দিনে জেওয়র পরে বধূ সেজে ঘরের কোনে আর বসে থাকতে চাই না। লক্ষ কোটি মাবোনের ইজ্জত বাঁচাতে, মসজিদ-মাদ্রাসা হেফাজত করতে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে, আমার খুনকে ব্যবহার করতে চাই। আগ্রাসী বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে চাই। আফগান থেকে দুশমনদের হটায়ে এখানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে চাই। স্বামী গো, এ জেওয়র পরলে কি হবে? আল্লাহর দ্বীন যদি মিটে যায়? এ অর্থ সম্পদ দিয়ে কি লাভ হবে? অর্থের অভাবে দ্বীন যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব? ধন-সম্পদ, হায়াত-মওত সবইতো আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এখানে কেন বখীলি করব? জিহাদের জন্য জানমালের ও ইজ্জতের যদি নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা যায়, তবে কেন আমরা পিছিয়ে থাকব? শোনেছি, মুজাহিদরা নাকি খাদ্যের অভাবে গাছের পাতাকে আহার বানিয়েছে। ওদের খাদ্য নেই, ঔষধ নেই, পোশাক নেই অস্ত্র নেই। অনেক দুঃখ -কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এ টাকা-পয়সা-ধন-দৌলত ও অলংকারাদী দিয়ে কি হবে? যান বাজারে গিয়ে এগুলো বিক্রি করে অস্ত্র খরিদ করুন। স্বামী-স্ত্রী একসাথে মিলে যুদ্ধ করব, কাফির মারব, হানাদারদের তাড়াব, দেশ শত্রুমুক্ত করব। আমরাও শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাব। যান এখনই যান জেওয়র বিক্রি করে অস্ত্র নিয়ে আসুন, বাকি টাকা জিহাদের ফান্ডে জমা দিয়ে দিন।'

সুফিয়ার মাদ্রাসার মহিলাদের মধ্যে এধরনের জিহাদী মনোভাব অনেকের মধ্যে পয়দা হয়েছে। ছেলেদের পাশাপাশি মহিলারাও জিহাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কেউ নিজের ভাইকে, কেউ স্বামীকে, কেউ নিজ সন্তানকে আবার কেউ তার পিতাকে যুদ্ধের জন্য তাশকীল করতে লাগল। এন.জি.ও মহিলা প্রাথমিক পর্যায়ে কোন সুফল অর্জন করতে পারেনি। তিন লক্ষ টাকার লোভ

দেখায়েছে, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ভর্তি হতে চাইল, এতেও ৯ মাস পিছিয়ে দিয়েছে। এবার চলল এন. জি. ওদের নতুন যাত্রা।

ওরা খুব সু-কৌশলে গ্রামের অন্য এক শিক্ষিতা মহিলাকে ৫০. হাজার টাকার বিনিময়ে হাত করে নেয়। উক্ত মহিলাটি এক সময় এন. জি. ও সদস্য ছিলেন, পরে সুফিয়ার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে এন. জি.ও কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসে। উক্ত মহিলাকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটি টেপ রেকটার ও একটি দূর পাল্লার ওয়ারলেছ দিয়ে বলল "আপনি যখন ক্লাশ করবেন তখন টেপ চালু করে ক্লাশ করবেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন আমার স্মরণ শক্তি ও মুখস্ত শক্তি কম। তাই পরবর্তীতে বাসায় টেপ চালু করে পাঠোদ্দার করতে পারব। তারপরও যদি বাধা দেয় তবে বগলের নিচে অথবা ছায়ার নিচে, কোথাও রেখে ক্লাশ করবেন। দেখবেন সবই সে সংগ্রহ করে দিবে। ক্যাসেটপূর্ণ হলে আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিলে আমরা তা শোনে বিচার বিশ্লেষণ করব। আর প্রতিদিন বিকাল ৫ ঘটিকায় আমার সাথে ওয়ারলেছে আলাপ করলে সব খবরই পাব। যে মহিলা গুপ্তচর সেজেছে তার নাম মায়মুনা বিনতে খলিল। মায়মুনা যদিও মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে আসলে কিন্তু তেমন ধর্মভীরু নয়। অর্থের টানে অনেক কিছুই করতে পারে সে।

মায়মুনাদের বাসায় দুজন এন.জি.ও মহিলা এসে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছে তা পার্শের বাড়ীর এক মেয়ে দেখেছে। উক্ত মেয়েটি সুফিয়ার আবাসিক ছাত্রী। এন.জি.ও মহিলাকে মায়মুনাদের বাড়ি আসতে দেখে তার মনে কৌতুহল জাগল কেন ওরা এ বাড়িতে আসছে? এর মধ্যে হয়ত কোন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সেদিনতো এরাই মাদ্রাসায় তিন লক্ষ টাকা অনুদান দিতে চেয়েছিলন সুফিয়া তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেয়েটি বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিদ্র পথে ঘরের অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখছে এবং কি বলে তা শুনছে।

মেয়েটির নাম নাঈমা বিনতে ফাতেমা। খুব চালু মেয়ে। একটা শব্দ শুনলে পুরা বাক্যটি কি বলেছে তা বুঝতে পারে। নাঈমা চুপি চুপি তাদের সব কথাই শুনছে। টেপ রেকর্ডার ওয়ারলেছ ও ৫০ হাজার টাকার বান্ডিল গ্রহণের পর্ব নিজ চোখে অবলোকন করেছে। মহিলারা যখন বিদায় হবে তখন মায়মুনা টাকা, ওয়ারলেছ ও টেপ রেকর্ডার ঝুলানো বেনেটি ব্যাগে রেখে ওদেরকে এগিয়ে দেয়ার জন্য বাড়ির বাইরে চলে গেল। নাঈমা এ সুযোগে কয়েক কদম এগিয়ে ঘরে ডুকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে গা ঢাকা দেয়।

এ সময় মায়মুনাদের বাড়ির লোকজন বাড়িতে ছিল না। কেউ মেষপাল নিয়ে ছিল চারণভূমিতে, আর কেউ কেউ ছিল গম ক্ষেতে। আশপাশেও ছিল না কোন লোকজন। তাই খুবই সংগোপনে কাজ সমাধা করে ফিরে এল নাঈমা। বাসায় বিলম্ব না করে সোজা চলে এল মাদ্রাসায়। অতঃপর সুফিয়াকে ডেকে নিবৃত কুটুরীতে নিয়ে এন.জি.ওদের সুক্ষ্ম চক্রান্তের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলল, "আপা

মায়মুনাকে আর বিশ্বাস করবেন না কিন্তু। সে হারামজাদী মাগী এখনো এন.জি.ও প্রীতি ভুলতে পারেনি। অর্থের লোভে সে ঈমানকে বিক্রি করে দিয়েছে। সে সেজেছে ঈমানের পাইকার, সেজেছে ঈমানের ডাকাত। বোরকার নিচে ইট। এ শয়তান মাগীকে আর আশ্রয় দিবেন না। ৫০ হাজার টাকা, ১টি টেপ রেকর্ডার ও একটি দূর পাল্লার ওয়ারলেছ পেয়েছে। আপনি কি করেন না করেন, কি বলেন না বলেন, এসব কিছু রেকর্ড করে নিয়ে এন.জি.ও দের দেবে। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হলো, প্রতিদিন বিকাল ৫ ঘটিকায় সারাদিনের প্রোগ্রাম ওয়ারলেছে জানাবে। হারামজাদী আমাদের ভেতরে ঘুরে ঘুরে এসব সংবাদ সংগ্রহ করে। আজকে মাদ্রাসায় আসার সাথে সাথে তাকে বের করে দেয়া হোক সে যেন কোন ছাত্রীর সাথে কোন ধরনের কথাবার্তা না বলে এবং অন্য ছাত্রীরাও যেন তার মিষ্টি কথায় না ভুলে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হোক।" এই বলে ৫০ হাজার টাকার বান্ডিলটা সুফিয়ার হাতে সোপর্দ করল। সুফিয়া এতগুলো টাকা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। এক সাথে এত টাকা দেখেনি কোনদিন। টাকার বান্ডিলটা হাতে তুলে নিয়ে মুচকী হাসি অধরে ফুটিয়ে বলল "সাবাস! বীরঙ্গনা নাঈমা! সে গাল ভরা হাসি হেসে বলল জী আপা! গণিমত নিয়ে আসছি, হালাল মাল, অত্যন্ত পবিত্র মাল। সুফিয়া জিজ্ঞেস করল এগুলো আমার কাছে কেন নিয়ে এলে নাঈমা? নাঈমা উত্তর দেয় কেন আপনার মনে নেই আল্লাহ নিজেই গনিমতের মালের বন্টন পবিত্র কালামে বলে দিয়েছেন। ৫ ভাগের এক ভাগ হামলাকারী মুজাহিদদের, আর বাকি চারভাগ জমা হবে বাইতুল মালে। তা কি ভুলে গেছেন আপা? সুফিয়া হাসতে হাসতে বলল "আরে পাগলিনী! তোর এটাতো গণিমতের মাল নয়, আবার মালে ফায়ও নয়। কারণ যুদ্ধ করে কাফেরদের মাল ছিনিয়ে আনা হল মালে গণীমত। আর ওদের ফেলে যাওয়া মাল হস্তাগত হলে একে বলে মালে ফায়। এ হিসেবে তোমার এ মালের নাম হতে পারে মালে চুরী।" এ বলে সুফিয়া খিল খিল করে হেসে ফেলল।

নাঈমা ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলল "একি বলেন আপা! দীনের চরম ধ্বংস সাধনের জন্য এ মাল খরচ করছে। এগুলো আনা আমার জন্য অন্যায় হয়েছে? তবে এমাল ভাগ বাটুরা করার দরকার নেই, আপনাকেই দিয়ে দিলাম।" সুফিয়া মাথা নেড়ে বলল "আচ্ছা আমি গ্রহণ করলাম দেখি কি করা যায়।" অতপর সমস্ত ছাত্রীদেরকে এক জায়গায় জমা করে সুফিয়া দাঁড়িয়ে বললো "হে আমার মা ও বোনেরা! মুসলমানরা অপরাজয়ের জাতি। পরাজয় শব্দটি তাদের অভিধানে নেই। কিন্তু পরাজয়ের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা মুনাফেকদের চক্রান্তেই হয়েছে। যুগে যুগে মুনাফিকরা মুসলমানদের ভিতরে ঢুকে মুসলমানদের সর্বনাশ করে গেছে। সে পথ ধরে এন.জি.ওরাও আমাদের ভিতরে গুপ্তচর হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে সাবধান! তোমাদের মধ্যে যদি কারো মাঝে এমনটি

ধরা পরে বা অসৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকো, তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তা নাহলে আমাদের হাতে ধরা পরলে অবশ্যই প্রাণ হারাবে। দেখ বোনেরা ঈমান নিয়ে যদি ছিনিমিনি করা হয়, তাহলে এ ফায়সালার জন্য আমরা মুফতী তালাশ করব না। আমরাই ফায়সালা করব। তোমরা সব সময় লক্ষ্য রাখবে কেউ যেন অর্থের লোভে পরে মোনাফেক হয়ে না যায় এবং এন.জি.ওদের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক না রাখে। আমার কথাগুলো বুঝে আসছে কি বোনেরা?" সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল হ্যাঁ জ্বী- হ্যাঁ বুঝেছি। এসব নসিহতের সময় মায়মুনা মাদ্রাসায় ছিল না।

মায়মুনা মেহমানদেরকে আগায় দিয়ে আনন্দের ঘোড়া দৌড়িয়ে ঘরে ফিরে বেগটি নামিয়ে দর্জা বন্ধ করে বসল। বেগে হাত দিয়ে দেখে সোনার হরিণ রশি ছিড়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আবার ঘরের অন্যান্য স্থানগুলোতে তালাশ করে কোন হদিস মিলেনি। সে ভাবছে দুচার মিনিটে এখানে কেউ আসার কথা নয়। আসতেও পারে না। কেউ চারণ ভূমিতে মেষ চরাচ্ছে, আবার কেউ গম কাটছে। আম্মু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তা অবলোকন করছে। অত অল্প সময়ে অন্য কেউ আসার প্রশ্নই উঠে না। আম্মু আম্মুখে যেখানে দেখেছি এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে শুধু টাকা গেল কোথায়? ওয়ারলেছ ও টেপ রেকর্ডার তো ঠিকই আছে। এগুলোর দামতো কম নয়। যদি চুরি হতো তবে এগুলোও নিয়ে যেত। ৫০ হাজার টাকার চিন্তা ও পেরেশানিতে মায়মুনার অন্তর ভেঙ্গে চুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। প্রসব বেদনায় চঞ্চল হরিণী যেমন বন সুদ্ধা দৌড়া দৌড়ি করে, মায়মুনার অবস্থাটাও অনেকটা সে রকম। কখনো ঘরে কখনো বাইরে, আবার কখনো গাছতলায় ছুটাছুটি করতে লাগল। আবার মনে মনে ভাবছিল যে, প্রতারক বা যাদুকরেরা তো অমন করে টাকা দেখিয়ে আবার নিয়ে যায়, আমার বেলায় কি এমনটি ঘটেছে? এসব চিন্তা করতে করতে তার মাকে এ সব ঘটনা জানালে তিনিও সব কিছু পেরেশানির গহীন তলায় হারিয়ে গেলেন।

সারাদিন খাওয়া-নাওয়া কিছুই হয়নি। সব কিছু একে বারেই ভুলে গেছে। দিন গেল রাত এল। গভীর রাত। ঘুম পালিয়ে গেছে কোন সুদূরে। এক অসস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাত পোহাল। যখনই একটু নিদ্রা এসে চোখে আশ্রয় নিতে চায়, তখনই ভেসে উঠে চকচকে ৫০ হাজার টাকার বান্ডিল। হাত বাড়িয়ে দেখে নেই। এবার মনে মনে স্থির করল এন.জি.ওদের কাছে আর ৫০ হাজার টাকার দাবি করবে। এতে রাজী না হলে গোয়েন্দাগিরী পরিহার করবে। আবার এও চিন্তা করছে যে সবে মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়েছে, কিছু কাজ না দেখায়ে যদি আবার টাকা দাবি করি, তাহলে হয়ত অন্যদের কাছে দায়িত্ব চলে যেতে পারে। তাই সংবাদ সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং সকাল সকালই মাদ্রাসায় চলে গেল।

নাঈমা বিনতে ফাতেমা মায়মুনাকে দেখেই দৌড়য়ে কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মায়মুনা আপু! আপনার কি অসুখ ছিল নাকি? গতকাল যে মাদ্রাসায় দেখিনি? মায়মুনা একটু নিরবতা ভূমিকা পালন করে বলল, "শরীরটা তেমন ভালো না, দুদিন যাবত কিছুই ভালো লাগছে না, শুধু জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে।" নাঈমা কপালে হাত দিয়ে বলল জ্বর বলে তো মনে হয় না, তবে একটু গরম গরম লাগছে।" নাঈমা মায়মুনার হাত ধরে নিয়ে গেল অফিস রুমে। সেখানে সুফিয়া ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। সালাম বিনিময়ের পর কৌশলাদি জানতে চাইল সুফিয়া। সে মিছামিছি সাত পাঁচ বুঝানোর চেষ্টা করল মাত্র। সুফিয়া তার মিথ্যা কথাগুলোর উপরই হ্যাঁ হ্যাঁ করে কৌশল বিনিময়ের পর্ব পাড়ি দিল। নাঈমা সুলালিত কণ্ঠে মায়মুনাকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমার জন্য কি এনেছেন আপা? এই বলে বেনেটি বেগ থেকে একটি টেপ রেকর্ডার ও কয়েকটি খালি ক্যাসেট বের করল এবং বলল" বাঃ আপুতো অনেক সুন্দর ও ছোট্ট টেপ কিনেছেন। এত ছোট্ট টেপ পেলেন কোথায়? আপনিতো ভারি রসিক মানুষ দেখছি।

মায়মুনা একটু কাচু মাচু করে বলল, বাজার থেকে ক্রয় করেছি। টেপ করে নিলে সবই ইয়াদ হবে। মাদ্রাসা থেকে বাড়ি গেলে রাস্তায় সব খেয়ে ফেলি।" নাঈমা বলল, খুব সুন্দর বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন আপা।

ক্লাশ আরম্ভ হল। সবাই চলে গেল ক্লাশে। সুফিয়া মায়মুনার গতিবিধি আর চেহারায় দেখছে মলিনতার ছাপ। উদাস মন। চাঞ্চল্যের আভা ফুটে আছে চেহারায়। ছবকে মন নেই। দেহ আছে ক্লাশে মন ছুটে বেড়াচ্ছে তেপান্তরে। মায়মুনাকে কোন প্রশ্ন করলে উত্তর আসে কি যেন বলছেন আপা? সবাই খিল খিল করে হেসে উঠে, আর মায়মুনা লজ্জা পায়। ক্লাশ শেষ, সবাই বাড়িতে ফেরার আয়োজনে ব্যস্ত। আবাসিক ছাত্রীরা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বই কিতাব গুছিয়ে আমতলায় এসে মুক্ত বাতাসে গল্প গুজব করছে।

সুফিয়া মায়মুনাকে নির্জন কক্ষে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে তোমার কি হয়েছে মায়মুনা? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? মনে হয় কোন দুশ্চিন্তায় ভোগছ। সত্যি করে বল বোন, দেখি কিছু উপকার করা যায় কিনা? সুফিয়ার কথা শুনে মায়মুনার অন্তর থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘশ্বাস। অতঃপর মিছামিছি বুঝানোর চেষ্টা করল। আসল রহস্য উৎঘাটন করতে না পেরে সুফিয়া বলল, "তোমার মনের রোগ-টাকার শোক। তাই না মায়মুনা? শোন বোন! ঈমান টাকায় খরিদ করা যায় না, কিন্তু টাকায় বিক্রি করা যায়। দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবনের শেষ নেই। যখন আফগানিস্তানের মা-বোনেরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। তখন তুমি এন.জি.ওদের খপ্পরে পড়ে দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদ্ধত হচ্ছ। আমার এখানকার গোপন তথ্য নিয়ে ওদেরকে দিয়ে ধন সম্পদের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছো। এসব মোমেন-মোমেনার পক্ষে আদৌ তা সম্ভব নয়। প্রিয় মায়মুনা। তুমি যা করতে চাচ্ছ

তা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে মনে রেখ, এগুলি করে দ্বীনের সাময়িক ক্ষতি করতে পারবে কিন্তু শেষটায় দ্বীনই বিজয়ী হবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে তুমি। দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হবে।" এই বলে ৫০ হাজার টাকার বাণ্ডিল এনে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল "এই নাও তোমার টাকা।" মায়মুনা এ দৃশ্য দেখে বেহুশ হওয়ার উপক্রম। এ টাকা কি করে এখানে এল তা খোঁজে পাচ্ছে না। লজ্জাও অনুসূচনায় ভরে গেল তার অন্তর। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বলল, "সুফিয়া আপা! আমাকে ক্ষমা করুন। ভুল করেছি বুঝতে পারিনি। শয়তান আমাকে ভুল পথে পরিচালনা করেছে।" সুফিয়া বলল, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কোনদিন অর্থের লোভে ঈমান হারা হবে না। দেখনা তিন লক্ষ টাকাকে পদাঘাত করেছি। মায়মুনা ইসলামের চরিত্র দেখে সুফিয়ার ভদ্রতা, উদারতা, মানবতা দেখে তওবা করল এবং বলল, "বোন মাফ করে দিন আর এ টাকাগুলোতো ফিরিয়ে দেয়া যাবে না তাই দয়া করে সবগুলো টাকা আপনাকে দেয়া হল, তা দ্বীনের কাজে খরচ করুন। এর প্রতি কোন দাবি নেই।" সুফিয়া একটু চিন্তা করে বলল "মায়মুনা এ টাকা আমি খরচ করব না। তবে তোমাকে ২০ হাজার টাকা দিচ্ছি তা তুমি খরচ কর আর ৩০ হাজার টাকা মুজাহিদদের তহবিলে দান করে দাও। শুনেছি মুজাহিদরা নাকি ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য না পেয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন বাঁচায়। আহ! কি কষ্ট। দেখবে মায়মুনা! মুজাহিদ ভায়েরাই একদিন এদেশ শত্রু মুক্ত করবে। জুলুম, নির্যাতন, উৎপীড়ন, ধর্ষণ বন্ধ করে শান্তির প্লাবন বয়ে দিবে। কুরআন হাদিসের শাসন কায়েম করবে। মলিম মুখে হাসি ফুটাবে। সন্ত ানহারা মায়ের আর স্বামীহারা বিধবা নারীর আহাজারী বন্ধ হবে।" মায়মুনা সুফিয়ার কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠল।

একষট্টি

মাওলানা রফিক সাহেব মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী সাহেবের নির্দেশক্রমে পাকতিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গিয়ে হাজির হন। উক্ত জামে মসজিদের খতিব ছিলেন মাওলানা আফতাব আল ওয়ারেসী। তিনি ছিলেন সাইখুল ইসলাম মুজাহিদ মিল্লাতে হযরত হুসাইন আহম্মদ মাদানী (রহঃ) এর একজন সুযোগ্য সাগরেদ। এখনো তাকে আশেকে মাদানী লকবে ভূষিত করেন।

মাওলানা রফিক আশেকে মাদানী সাহেবের নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হুজুর! আমি বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটে আপনার দোয়া নেয়ার জন্য আসছি। আর আপনার অনুমতি পেলে মসজিদে কিছু কথাবার্তা রাখার চেষ্টা করব। মাওলানা রফিক তরুণ যুবক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, রাজপুত্রের মত চেহারা যে কেউ ঘাড় ফিরিয়ে আবার না তাকিয়ে পারে না। চেহারা থেকে যেন এলেমের আলোকচ্ছট বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ললাটে বাহাদুরীর ছাপ লেগে আছে। শক্ত বাহু, সুদর্শন-সুপুরুষ। তাকে ইমাম

সাহেব কাছে ডেকে বসালেন এবং তার পরিচয় সহ আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিলেন। ইমাম সাহেব বার্ধক্যজনিত কারণে অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছেন। তিনি এলেমে, আমলে বজুর্গীতে ও ওয়াজ নসিহতে ছিলেন অন্যদের তুলানায় বহু উর্ধ্বে। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জিহাদের উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করে প্রায় জুমায়ই বয়ান রাখেন। তার জ্বালাময়ী বয়ানে সকল মুসুল্লীদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা দানা বেঁধে উঠেছে। কোথায় কিভাবে যাবে তার কোন রাস্তা জানা ছিল না। ঐ এলাকায় সর্বপ্রথম আশেকে মাদানী সাহেবই ডঃ নজিবুল্লাহকে ওয়াজেবুল কতল (হত্যা করা অপরিহার্য) ফতোয়া দিয়েছিলেন। সেদিন থেকে ইমাম সাহেবও নজিবুল্লাহ্ সরকারের হত্যার তালিকাভুক্ত হন। গ্রেপ্তারির পরোয়ানা অনেক আগেই জারি করা হয়েছে কিন্তু বহুল জনপ্রিয়তার কারণে গ্রেপ্তার বিলম্বিত হচ্ছে। কারণ তাকে গ্রেপ্তার করলে গোলযোগ বেঁধে যাবে পুরা শহরে, তা নিয়ন্ত্রণে আনা খুবই কষ্ট হবে বা প্রচুর রক্ত ঝড়বে। এ কারণেই গ্রেপ্তার করার সাহস পায়নি। তবে গ্রেপ্তার করবে না এমনটি নয়। এমন সময়ে গ্রেপ্তার করবে, তখন প্রতিবাদ জানানোর কেউ থাকবে না। হযরত ইমাম সাহেব জিহাদের প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করতে ছিলেন। জিহাদ ছাড়া ঈমান, আমল, দেশ ও জনগণ রক্ষা পাবে না, তা তিনি কয়েক জুমায় বয়ানও করেছিলেন। কিন্তু শক্তি সাহস নাই বিধায় শুধু ঠোঁট কামড়াচ্ছিলেন।

আবার কিছু কিছু লোক মুখে এও শুনেছেন যে, কে বা কারা কিছু কিছু স্থানে রুশী কৌমের উপর আক্রমণও করতেছে তার সত্যতা যাচাইয়ের কোন মাধ্যম খুঁজে পাননি তিনি। ইমাম সাহেব মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের নাম শোনেছেন কিন্তু পরিচয় পাননি। এবার মাওলানা রফিককে পেয়ে সব কিছু বিস্ত ারিত জানতে পারলেন। ইমাম সাহেব অনেক চিন্তা করে মাওলানা রফিককে বললেন, “বাবা! আমভাবে বয়ান না করে খাছভাবে করো, এতে ফায়দা বেশি হবে। শুধু বয়ান পর্যন্তই সীমিত নয়, তোমার সাথে যেন বিশ পঞ্চাশ জন যুবক দিয়ে দিতে পারি সে ব্যবস্থা করা হবে। আমি কিছু সামজদার লোকজন দাওয়াত করি, ওরা রাত ১১ টায় আমার বাসায় আসবে, সেখানেই আলোচনা হবে। প্রকাশ্যে যা বলার তা প্রতি শুক্রবার ছাড়াও অন্যান্য নামাযের আগে পরে কিছু না কিছু বয়ান করে থাকি, এখন আর ওসব বয়ানের দরকার নেই। রফিক এতেই রাজি হলেন।

ইমাম সাহেব ৩০ জন যুবক, ২০ জন ব্যবসায়ী ও ২০/২৫ জন শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণীদের নাম লিস্ট করে মুয়াজ্জিনের হাতে দিয়ে বললো “ এসব ব্যক্তিদেরকে রাত ১১ টায় আমার বাসায় আসতে বলবে। এদের সাথে দ্বীনি ব্যপারে খুব জরুরি পরামর্শ আছে। সাবধান দাওয়াতী লোকজন ছাড়া যেন অন্য কেউ না আসে ও না জানে।

মুয়াজ্জিন সাহেব ইমাম সাহেবের কথা মত প্রত্যেকের কানে কানে দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। রাত ১১ টার মধ্যেই ৫০/৬০ জন লোক ইমাম সাহেবের বাড়ি চলে আসেন। ইমাম সাহেব তাদের বাসর ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে আজকের মিটিং সমস্পর্কে অবগত করলেন এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এ নাজুক অবস্থায় মুসলমানদের করনীয় কি? পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দিকনির্দেশনা কি তা দলিল প্রমাণ সহকারে বর্ণনা করলেন। উপস্থিত জনতারা একাগ্রচিত্তে কথাগুলো শোনতে ছিলেন।

এক পর্যায়ে ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমার প্রিয় এলাকাবাসি। আমাদের মধ্যে আজ এমন এক ব্যক্তি আগমন করেছেন, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মধ্যে অনেক সুসংবাদ রয়েছে। আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি তাশরীফ আনয়ন করেছেন, যার আগমনে মহানবী (সাঃ) এখানে হলে আসন ছেড়ে এস্তে কবাল করে এগিয়ে আনতেন, আর বিদায় হলে মসনদ ছেড়ে শহরের বাইরে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। আজ আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দান করেছেন। যাকে ইহকালের ও পরকালের সফলতা দান করেছেন। যাদের আমলে অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটে, মানুষ শান্তি পায়, ইসলামের সবগুলো কাজ সুচারু রূপে পালন করা যায়। ইনসাফ কায়েম হয়, অন্যায় অবিচার দূরিভুত হয়। আমাদের মাঝে আজ এমন ব্যক্তি উপস্থিত, যাদের শরীরের নির্গত ঘাম মেশকের চেয়েও কিমতি, যাদের পায়ের ধুলাবালির তারীফ নবী (সাঃ) করেছেন। সে মহান ব্যক্তি আমাদের মাঝে নসিহতের বাণী শোনাবেন, আশাকরি আমলের নিয়তে এক ছুয়ীয়াতের সাথে ও একাগ্রচিত্তে তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করবেন;" এই বলে ইমাম সাহেব মাওলানা রফিককে নিয়ে আসনে বসিয়ে দিলেন।

মাওলানা রফিক সালামান্তে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, "প্রিয় এলাকাবাসী! আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ রয়েছি। আমরা কাফের কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিজ দেশে অবরোদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করছি। প্রিয় দেশবাসি, আপনারা জানেন ডঃ নজিবুল্লাহ সরকারের আমন্ত্রণে গত ডিসেম্বর মাসে ১৯৭৯ ইং সালে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার রাশিয়ান সৈন্য পবিত্র আফগানিস্তানের সীমানা পেরিয়ে শহর বন্দর ও গ্রামগঞ্জে প্রবেশ করে। ওরা ওলামায়েকেরাম ছাত্র সমাজ ও আম জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শত শত মানুষকে শহীদ করে চলছে। মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত করছে অকাতরে। লুটতরাজ অগ্নি সংযোগ থেকে নিয়ে এমন কোন অত্যাচার নেই যা ওরা করেনি। সংবাদ মাধ্যমগুলো সবই তাদের নিয়ন্ত্রণে, ফলে আপনাদের কাছে সংবাদগুলো পৌঁছেনি।

প্রিয় দেশবাসি, কমিউনিস্টরা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি ওরা নাস্তিক। আল্লাহপাক অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন দলিল প্রমাণ সহকারে। সমস্ত নবীগণই কলমার দাওয়াত দিয়েছেন। যেন সব, মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেয় এবং রাসূলগণের অনুসরণ করে। এদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক দ্বীন কবুল করেছে, বাকিরা করেনি। যারা কুফুরি এখতিয়ার করবে তাদের উপরে হুকুম হল ওরা মুসলমানকে কর দিবে, মুসলামানদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে এবং দুনিয়াতে কোন ফেতনা ফাসাদ করবে না। এই শর্তে ওরা আল্লাহর জমিনে বসবাস করার এজাজত রয়েছে।

প্রিয় বন্ধুরা, কাফেররা এতসব শর্ত মানার পরিবর্তে দেশ জায়গা জমি একের পর এক দখল করে নিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কুফুরি ফেৎনা ছড়িয়ে দিয়ে নাপাক করে তুলেছে। তাই সর্বশেষ আমাদের নবীকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তলোয়ার দিয়ে এবং নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করবে (সূরা বাকারা- আয়াত ১৯১।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা আনফাল-৩৯)

উক্ত আয়াতে ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্য মহাপ্রলয়ের শিংগা ধ্বনিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। ও প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা! আমাদের হাত পা থাকতে কেন তাদের মোকাবেলা করব না? আর কত দিন ওরা আমার বোনকে লেংটা করবে? কতদিন পর্যন্ত আমরা মাইর খেয়ে যাব? আমাদের সব কিছু থাকতে কেন কাপুরুষের পরিচয় দেব। সিংহ শাবকের মত তাকবীর দিয়ে যদি এগিয়ে যাই তবে ওরা ভাগতে থাকবে।

মাওলানা রফিক আরো বললেন, "প্রিয় বন্ধুরা, আল্লাহ তাআলা বখিলকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন। ছখি বা দানশীলকে খুব ভালবাসেন। সবচেয়ে বখিল ঐ ব্যক্তি যে মাল ও জান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। অর্থাৎ যুদ্ধ করে না। মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুণ হল ভীরুতা বা কাপুরুষতা। সবচেয়ে বড় কাপুরুষ যারা আল্লাহর পথে লড়াই থেকে পিছিয়ে থাকে। ভাবার্থ আবুদাউদ ১ম খণ্ড-৩০৪ পৃঃ তারিখুল বুখারী ছহিহুল জামেছগীর হাদিস ৩০,৩৬)

তিনি আরো বলেন, জিহাদ দু প্রকার। যথাঃ (ক) ইকদামী জিহাদ (আক্রমণমূলক) অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কুফুরী স্থানে, (কাফের রাষ্ট্রে) প্রবেশ করে ওদেরকে খুঁজে বের করে আক্রমণ করা। যদিও ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি নেয়নি এবং পরিকল্পনাও করেনি। এমতাবস্থায় ওদের বিরুদ্ধে বৎসরে কমপক্ষে একবার হলেও যুদ্ধ করা ফরজ। এটা ফরজে কিফায়া। এর নিম্নতম স্তর হল; মুজাহিদ দারা কুফরী বা রাষ্ট্রের সীমানা অবরুদ্ধ করে রাখা। এটা

এই জন্য যে, কাফেররা যেন সব সময় মুসলমানদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। অতএব মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হল বৎসরে একবার হলেও কাফের রাষ্ট্রে আক্রমণ করা আর জনগণের কর্তব্য হল রাষ্ট্র প্রধানকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা। আর যদি তা না করেন তবে ফরজ তরকের গুণাহ হবে। (ফতোয়ায়ে শামী ৩য় খণ্ড ২৩৮ পৃঃ)

(খ) দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরক্ষামূলক) অর্থাৎ কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়ন- জুলুম নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মুসলিম দেশ থেকে অমুসলিম হানাদার বাহিনীকে বিতাড়ণ করা। দিফায়ী জিহাদ সবসময়ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন। এতে কোন ইমামগণের দ্বীমত নেই। চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ পাওয়া গেলেই সকলের উপর জিহাদ-নামায রোযা-হজ-যাকাতের মতই ফরযে আইন হয়ে যায়। উক্ত কারণগুলো হল–

১। কাফেররা লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশে প্রবেশকরলে।

২। উভয় পক্ষে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলে।

৩। মুসলিম শাসক যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালে।

৪। কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দি হলে।

উক্ত কারণগুলি পাওয়া গেলে সকলের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর এজাজত ছাড়া, সন্তান পিতা-মাতার এজাজত ছাড়া, গোলাম মনীবের এজাজত ছাড়া এবং ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি পাওনাদারের এজাজত ছাড়াই জিহাদে যেতে পারবে। ইহা পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী, সকল মাজহাবের ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসীর গণের অভিমত। অতএব বর্তমানে রুশী বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকল আফগানবাসির উপর ফরজে আইন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইময়া বলেন, মুসলমানদের ইজ্জত আবরু, সম্ভ্রম রক্ষা করা এবং দীনের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সর্বসম্মতক্রমে ফরজে আইন। ঈমানের পরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান হল কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। নিঃশর্ত জিহাদ ফরজে আইন। রশদ পত্র, কাপড়, ঔষধ, খাদ্য ও সাওয়ারী (বাহন) থাক চাই না থাক, তবু জিহাদ ছাড়া যাবে না। জিহাদ করতেই হবে। হানাফীসহ সব মাযহাবের অভিমত এটাই (ইখতিয়ারাতুল ইলমিয়্যাহ, ফতোয়ায়ে কুবরা সংযুক্ত, ৪র্থ খণ্ড ৬০৮পৃ:)

অতএব বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন। আসুন, আমরা পুরাতন অতীতকে ভুলে গিয়ে যার যা আছে তা নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিজয় দান করবেন। হে আমার মালদার ভাইয়েরা আপনারা আর্থিক সাহায্য নিয়ে যুবকদেরকে সাজিয়ে দিবেন, এতে আপনারা ঘরে বসে জিহাদের ছোয়াব পাবেন।

মাওলানা রফিকের তেজদীপ্ত ভাষণে প্রায় ২৫ জন নওজোয়ান ও চার পাঁচজন বৃদ্ধ লোক নাম লিখিয়ে ছিলেন এবং ধনীরাও প্রতিমাসে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। পরদিন ৩০ জন নওমুজাহিদ হক্কানী সাহেবের নিকট পৌছায়ে দিলেন।

বাষট্টি

ডাক্তার মরিয়ম উবায়দী একজন দ্বীনদার মহিলা ডাক্তার, বাড়ি পাঞ্জাবে। স্বামী-স্ত্রী একই হাসপাতালে চাকুরি করেন। মাহমুদা ডাক্তার মরিয়ম উবায়দীর ওয়ার্ডে, তারই চিকিৎসাধীন আছে। তিনি মাহমুদার হৃদয় বিদারক কাহিনী ও মর্মান্তিক ইতিহাস শুনে খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি মাহমুদার সার্বিক দেখাশুনা করেন এবং চিকিৎসায়ও কোন অবহেলা করেননি। তিনি যখন না থাকেন তখন উক্ত ওয়ার্ডের নার্সদেরকে ডেকে মাহমুদার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখার নির্দেশ দেন। মাহমুদা রুগ্ন অবস্থায়ই আলমের প্রতি একটি বার্তা প্রেরণ করে। বার্তায় উল্লেখ করে "হে আমার প্রাণের প্রিয় স্বামী কেন আজ তুমি অমন করে ভুলে রইলে? আমি কি তোমার অন্তরে বেঁচে নেই? কি ছিল আমার অপরাধ? তুমি ফিরে এসো, দেখে যাও তোমার নবযাতককে। তার সুন্দর মুখের দিকে যদি একবার তাকাও তবে আনন্দে ভরে যাবে তোমার মনপ্রান। দূর হয়ে যাবে মনের কালি। ফুটন্ত কুসুমের মত তার কোমল মুখশ্রী খানা। এদিক ওদিক যখন মাথা ঘুরিয়ে টগবগ করে তাকায় তখন মনে হয় সে যেন তার জনককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বামী গো একটিবার হলেও এসে তোমার আদরের দুলালীকে দেখে যাও। তোমার সুন্দর মুখখানা সবসময়ই আমার চোখের সামনে ভেসে থাকে। তোমার হাসি, তোমার চাহনি, তোমার মান-অভিমান আজো আমার হৃদয় সরোবরে ভেসে বেড়ায়। জীবনের কত কথা, কত ইতিহাস না বলাই রয়ে গেল। স্বামী গো আমার শয্যা পার্শ্বে আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে না দেখে কোন কোন মহিলারা আমার কলিজার টুকরা, নয়নের পুতুলী, বুকের ধনটাকে, অবৈধ সন্তান মনে করে। ফুলের মত পবিত্র বৈধ সন্তানের প্রতি যদি এমন ধারণা করে তাহলে, মা হয়ে কিভাবে তা বরদাস্ত করব? অন্য রোগীদের আত্মীয়-স্বজনরাও আমার মেয়েটিকে দেখে যায়। আসবে কি একটি বার? ইতি তোমার হতভাগিনী মাহমুদা।

ডাক্তার মরিয়ম উবায়দী, মাহমুদার শয্যা পার্শ্বে বসে খুটিয়ে খুটিয়ে তার বংশ পরিচয়, নিবাস, পিতা-মাতা বেঁচে আছেন কিনা, ভাই-বোনের সংখ্যা, লেখাপড়ার যোগ্যতা, শুভ পরিণয় কিভাবে সম্পূর্ণ হল, এন.জি.ও তে চাকুরির বয়স কত? এর আগে কোথাও চাকুরি করেছে কি না। স্বামীর সাথে মন কষাকষির কারণ কি, কত দিন যাবত তাদের প্রেমের মধ্যখানে বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। আলম যদি ফিরে না আসে, বা তাকে না নেয়, তবে সে কি করবে? এ ধরনের আরো অনেক কিছু

জানতে চাইলেন ডাক্তার মরিয়ম। মাহমুদা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর খুব ধীরস্থীরে দিতে লাগল। মাহমুদা, মান-অভিমান সব ভুলে গিয়ে সত্য সত্য উত্তর দিয়ে চলল। মাহমুদার বিগলিত অন্তরে প্রেম সাগরের ঢেউয়ের উত্থান পতনের চিহ্ন তার চেহারায় ফুটে উঠেছে। আঁখি যুগল অশ্রুতে ভিজে গিয়েছে, এমন কি ফোটায় ফোটায় বারি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। দয়ালু ডাক্তার তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন। অন্তরের পূর্ণ অবস্থাটা মাহমুদার চেহারায় ফুটে উঠেছে।

ডাক্তার মরিয়ম উবায়দী মাহমুদার কথা শুনে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন। তাদের বিচ্ছেদ, মিলন সেতু পেরিয়ে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এন.জি.ওদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আগেই জানতেন মরিয়ম। এন.জি.ওদের খপ্পরে পড়ে কত নিরীহ পিতা তাদের মেয়েদেরকে তুলে দিয়েছিল এন.জি.ওদের হাতে। আবার কত জেনারেল শিক্ষিতা মেয়েরা অর্থের লোভে ওদের হাত ধরে বেরিয়ে গিয়েছে মাতা-পিতার অগোচরে, তার কোন হিসাব নেই। এ ধরনের শত শত পরিবারে আজ বিচ্ছেদের পাবক শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাহমুদার ভাগ্যাকাশের শিশু সুধাংশু অস্ত গিয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ স্বপ্ন আর দেখা হল না। মিলনের অতিশয় স্পৃহা হৃদয়ে নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? কারণ এ পর্যন্ত তার কোন নজির নেই। ডাক্তার এসব ভেবেচিন্তে মাহমুদাকে বললেন, "মাহমুদা! জাগতিক প্রেমের ফলাফল এমনই হয়। এটা শধু তোমার হয়েছে তা নয়। অনেকের বেলায়ই হয়েছে। আলম আর ফিরে আসবে না, আসতেও পারে না। এটাই এন.জি.ও কর্মকর্তাদের ধর্ম। তোমার বেলায় হৃদয় পিঞ্জর থেকে আলম নামক পাখিটি সুদূরে ডানা মেলেছে। কোন দিন আর তার পাখার পতপত ধ্বনি শুনবে না। তোমার হৃদয় মন্দির থেকেও তাকে সরিয়ে দাও। নিঃস্বঙ্গ জীবন বেছে নাও। এখন আলমের জন্য হা হুতাস করা অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর। এসব নিয়ে চিন্তা যত বেশি করবে, রোগ মুক্তিও তত বিলম্ব হবে। শরীর নষ্ট হবে। এখন থেকে ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ কর, নামায রোযা কর, আল্লা ভালো করবেন। আমি হাসপাতালেই তোমার চাকুরির ব্যবস্থা,করে দেব। তুমি যেহেতু একজন শিক্ষিতা মহিলা। তাই ভালো বেতনেই চাকুরির ব্যবস্থা করা যাবে।

মাহমুদা ডাক্তার মরিয়ম উবায়দীর কথা শুনে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখল যে, তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে সন্দেহ করা জুলুম হবে। এন.জি.ওদের সংসারে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ায়, তার কাছেও ওদের চরিত্র ধরা পড়েছে। সে আল্লাহর কাছে তওবা করে অন্তর থেকে আলমের ভালোবাসা দূরে নিক্ষেপ করেছে। আসলে তো এটা ভালোবাসা ছিল না। এটা ছিল ভালোবাসার পোশাকে আবৃত ধোঁকাবাজী, দান্দালী ও হটকারিতা। মাহমুদা এখন ওসব কিছু থেকে পবিত্র।

প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ দিন পরে মাহমুদার অসুখ অনেকটা আরোগ্যের দিকে এগিয়ে চলছে। খানা-পিনা ঠিকমত চলছে। নব জাতককে বুকে নিয়ে ওয়ার্ডের

অন্যান্য রোগীদের নিকট গিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছে, ঘুরাফেরা করছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য আবার পূর্ণ স্বাস্থ্যে পরিণত হল। ডাক্তার মরিয়ম উবায়দী, মাহমুদাকে ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজ বাসায়। সেখানেই তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। মাহমুদার মেধা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে তিনি তার স্বামী ডাঃ ওয়াজেদকে বললেন যে, মেয়েটা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমত্তা ও নেহায়াত বিপন্না। তাকে যদি কমপাউন্ডার প্রশিক্ষণে ভর্তি করানো হয় তবে অল্প সময়েই ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারবে বলে মনে হয়। তারপর যদি আমাদের সাথে রেখে কিছুদিন ব্রিপিং দেই তবে চলার মত ব্যবস্থা হবে।

ডাক্তার ওয়াজেদ (এম.বি.বি.এস) স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, "সে কি এতে রাজি আছে কিনা তা ভালোভাবে জেনে নাও। তাহলে দু একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে দেব। বেগম ওয়াজেদ আলী সাথে সাথে মাহমুদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে মাহমুদা সর্বাত্বকরণে তা খুশি মনে মেনে নিল। ডাক্তার ওয়াজেদ পরদিনই তাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। চিকিৎসার পরও মাহমুদার হাতে কিছু টাকা ছিল। তাছাড়া নিজের অর্জিত গহনাপত্র মিলে বেশ কয়েক হাজার টাকা ও মালামাল ছিল। মাহমুদা ভাড়াটে বাসা থেকে, তার আসবাবপত্র ভ্যানে করে নিয়ে এল ডাক্তার মরিয়মের বাসায়। তারপর মাহমুদার গহনাপত্র ও টাকা পয়সা ডাঃ ওয়াজেদের সামনে পেশ করে বলল, "স্যার! এগুলো আমার অর্জিত সম্পদ। এখন থেকে এ সম্পদের মালিক আপনারা।" ডাঃ তার কথা শুনে বললেন, "মা! আমাদের এসবের প্রয়োজন নেই। তোমরাই তা ব্যবহার করবে।

মাহমুদা ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। তার ফলাফল দেখে ডাক্তার ওয়াজেদ; ও বেগম ওয়াজেদ খুবই খুশি হলেন। অতীতে কোন দিন কেউ এত বেশি নাম্বার পায়নি। উভয়ের আনন্দের সীমা নেই। দুএক সপ্তাহেই ওয়াজেদ ও বেগম ওয়াজেদের অন্তর কেড়ে নিয়েছে মাহমুদা। একবার কিছু জামা-কাপড় ধুইতে দেখে ডাক্তার ওয়াজেদ বললেন "বেটি! ঝি এর কাজ করার জন্য তোমাকে রাখা হয়নি। চাকরানীর কাজ চাকরানী করবে, এতে তুমি যাবে কেন? তুমি আমাদের সম্মানিতা মেহমান। আর কোন দিন এমনটি যেন না দেখি।" মাহমুদা ক্লাশ শেষ করে নিয়মিত ডাক্তার মরিয়ম উবায়দীর সাথে হাসপাতালে কাটায়। রোগীদের দেখাশোনা এবং অস্ত্র পাচার রুমে অপারেশনের সময় ভালোভাবে দেখে কিভাবে সেলাই ও কাটাছেড়া করে। প্রয়োজনে এটা ওটা এগিয়ে দেয়। এভাবে অল্পদিনের মধ্যে ছোট-খাটো সার্জারি খুব সুন্দর ভাবে সে করতে পারে। অন্যান্য ডাক্তাররাও মাহমুদার কাজের প্রতি খুব সন্তুষ্ট। কোন কোন সময় মাহমুদাকে ডেকে প্রশ্ন করা হয় "দেখতো মাহমুদা! এই রোগীটার অপারেশন কিভাবে করলে ভালো হয়। মাহমুদা সব কিছু দেখে পরামর্শ দেয়, "স্যার! আমার মনে হয় এভাবে করলে ভালো হয়। ডাক্তাররাও তার কথার উপর সমর্থন জানায়।

এভাবে ৬ মাস যেতে না যেতেই ডাক্তার ওয়াজেদ তাকে প্রধান নার্সের চাকুরি দেন। সরকারি বেতন ৪ হাজার টাকা। কোন কোন সময় রোগীর অভিভাবকগণ তার কাজের প্রতি খুশি হয়ে কিছু কিছু টাকা বখশিস দেন। মাহমুদা ওসব টাকা গ্রহণ করে না। তবে একান্ত জোরাজোরীতে যারা কিছু দেয় এতে প্রায় মাসে দু তিন হাজার টাকা হয়ে যায়। নামায, রোযা, এবাদত বন্দেগী কোনটাই বাদ দেয়নি। শরয়ী পর্দার ভিতর থাকার জন্য ডাক্তার মরিয়মও বেশ কড়া নজর রাখেন। এভাবে অতিবাহিত হতে লাগল মাহমুদার দিনকাল।

তেষট্টি

সুফিয়ার মিশন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সাফল্যের বাহনে সোয়ার হয়ে। যে কোন সাফল্যের পিছনে ধাওয়া করে ব্যর্থতা। সত্যের পিছনে ধাওয়া করে অলীক অসত্য। হকের পিছনে ধাওয়া করে বেড়ায় বাতেলরা। শান্তির পিছনে, অশান্তি আবার সুখের পিছনে দুঃখ। এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। সুফিয়ার চলার পথে যে বাধা বা পরীক্ষা আসবে না এমনটি ভাবা ঠিক নয়। জয়কে কেন্দ্র করে পরাজয় ঘুরতে থাকে জয়কে পরাজিত করার জন্য। আমাদের আদি পিতা আদম (আ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মানুষ রূপী দুশমন অর্থাৎ মুনাফেকদের দ্বারা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ওরা কিয়ামত পর্যন্তই হকের লেবাস পরে হকের ভিতর প্রবেশ করে বিরোধিতা করতে থাকবে। সুফিয়ার বেলায়ও এমনটি হল। কয়েকদিন পর বোরকা পরিহিতা এন.জি.ও মহিলারা মায়মুনার সাথে যোগাযোগ করলে মায়মুনা বলে "তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ব্যাপকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে এখনও খারাপ কোন রিপোর্ট পাইনি। শিক্ষানবিস যারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কুটির শিল্প যেমন, সুই সুতার কাজ, মাফলার, জামপার, টুপি, মুজা, নকশী কাঁথা, সেলোয়ার, ব্লাউজ, কামিজ, ছায়া ইত্যাদি তৈরি করা শিখছে। অনেক মহিলাদের এন.জি.ও ঋণের চাপে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ঐসব মহিলারা সেলাই মেশিন কিনে নিজ ঘরে কাজ করে প্রচুর অর্থ আয় করছে। ঋণের বোঝা বহন করার গ্লানি তাকে আর বহন করতে হচ্ছে না। কাজেই বিনা দাওয়াতে বা বিনা প্রচারণায় মহিলারা এখানে এসে ভীড় জমাচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি যে কয়দিন ক্লাশ করেছি সে কয়দিন সুফিয়ার জবান থেকে রাষ্ট্র দ্রোহী কোন আলোচনা, এবং আমাদের এন.জি.ওর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখতে শুনিনি। তারপরও লেগে আছি। পর্যবেক্ষণ করছি, দেখি আপত্তিকর কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না।

মায়মুনার কথায় এন.জি.ও মহিলারা কোন দিক দিয়েই আশ্বস্ত হতে পারেনি। ফিরে গেল ওরা। পরদিন এন.জি.ওদের অফিসে ডাকা হল মায়মুনাকে। মায়মুনা সুফিয়ার কাছে পরামর্শ করে এন.জি.ওদের ডাকে সাড়া দিল। এন.জি.ওরা

মায়মুনাকে ছাড়াও বেশ কয়েকজন মহিলাকে সুফিয়ার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। এদের মাধ্যমে কিছু সংবাদ ওরা আগেই সংগ্রহ করেছিল। মায়মুনার রিপোর্ট আর অন্য মহিলাদের রিপোর্ট ছিল পরস্পর বিরোধী। তাই মায়মুনার প্রতি তাদের সন্দেহের সূত্রপাত হল। ৫০ হাজার টাকা ও অন্যান্য ছামানা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরও সে সুফিয়ার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করছে। কাজেই তাকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এজন্যই মায়মুনাকে অফিসে ডেকে নিয়েছে।

মিটিং চলছে। বড় বড় কর্মকর্তারা ছাড়াও ব্রাঞ্চগুলোর কর্মকর্তারা শরীক হয়েছে। এক একজন এসে এক এক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে মায়মুনাকে। মায়মুনা সাহসিকতার সাথে উত্তর দিয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় এক কর্মকর্তা চোখ দুটি কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "মায়মুনা! তুমিতো প্রায় তিন বৎসর যাবৎ আমাদের সংস্থায় কাজ করছ। তোমার প্রচেষ্টায় কয়েকটি গ্রামের মহিলারা সংবদ্ধ হয়ে আমাদের থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। বর্তমানে তুমি কাজ না করার কারণে সে সব গ্রুপগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। ওরা আমাদের থেকে কোন ঋণ নিচ্ছে না। এজন্য তোমাকেই আমরা দায়ী করব। এদিকে তোমাকে ৫০ হাজার টাকা, ওয়ারলেছ ও টেপ রেকর্ডার দেয়া হয়েছে, বার্তা সংগ্রহ করে, প্রেরণের জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বার্তা প্রেরণ করনি। এতেই তোমার উপর আমার সন্দেহ দিবালোকের মত সুপ্রকট। তোমাকে অবশ্যই গঠনমূলক জবাব দিতে হবে।" মায়মুনা তার ভাগ্যাকাশের উদিত রবিকে অস্তপারে দণ্ডায়মান দেখে মনের দিক থেকে অনেকটা ভেঙ্গে পড়ে। তিন বছর কাল এন.জি.ওতে কাজ করায় মায়মুনার নিকট তাদের চেহারা উন্মোচিত হয়েছে অনেক আগেই। তাদের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও হটকারিতার পরিচয় অজানা নেই মায়মুনার।

অনেক কিছু ভেবেচিন্তেই মায়মুনা অফিসারকে উত্তর দিল যে, "অভাবের নির্মম কষাঘাতে নিষ্পেসিত হয়ে আপনাদের সেবাগ্রহণ করেছিলাম। আপনাদের সহানুভূতি এতটুকু পেয়েছিলাম, যার দরুণ দিন রাত শুধু গ্রুপের টাকা যোগানোর ফিকিরেই কাটিয়েছি অঘুম নয়নে। সাপ্তাহিক কিস্তি না দিতে পেরে কত বোনেরা আপনাদের কাছে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অপমানিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান কারো জানা নেই। তাছাড়া টাকা পরিশোধ না করায় ইজ্জত কেড়ে নিয়েছেন কত অবলা নারীর তার সঠিক হিসাব আপনারাও দিতে পারবেন না। সবগুলো গ্রুপ সদস্যগণ ঋণের বোঝা মস্তকে ধারণ করে দিনাতিপাত করছে। ঋণ পরিশোধের চিন্তায় তাদের ঘুম, আরাম ও খানা-পিনা হারাম করে দিয়েছে। আপনারা তাদেরকে টিনের ঘর আর টয়লেটের ব্যবস্থা করেছেন বটে, কিন্তু টয়লেটে রাখার মত কোন মাল তাদের উদরে নেই। কেননা পেটে তিন বেলা আহার ঢুকছে না। আপনাদের ঋণ নিয়ে যারা ব্যবসায় নেমেছে, তারা সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তির টাকা, সুদে আসলে দিতে দিতে সবই

আপনাদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমি জোর গলায় একথা বলতে পারি যে, জনগণ আপনাদের অর্থে ব্যবসা করে আপনাদেরকেই দিচ্ছে, তাদের কোন ফায়দা নেই। এ সমস্ত কারণে মহিলারা আপনাদের গোপনীয় জুলুম থেকে রক্ষা পেতে চায়। ওরা অনেকেই জমি বন্ধক দিয়ে, গরু, ছাগল বিক্রি করে, আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। ওরা আর আপনাদের নীরব জুলুমের স্বীকার হতে চায় না। চায় না তারা সুদ খেয়ে মোটাতাজা হতে। তাই আস্তে আস্তে আপনাদের সর্বনাশী প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে চায় এবং ইসলামী বিধানের মাধ্যমে নিজেদেরকে চালাতে চায়।

এন.জি.ও কর্মকর্তারা মায়মুনার বক্তব্য শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। একে অপরের সাথে মন্তব্য করছেন যে, "এ মহিলা অত্যন্ত দুর্দান্ত। সামনা সামনী এন.জি.ওদের বদনাম করার সাহস কোথায় পেল? কোন শক্তির জোরে এত সব মন্তব্য করার সাহস পেল? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন মৌলবাদী জঙ্গী গ্রুপের আঁতাত থাকতে পারে। তা না হয় এত শক্ত কথা বলতে পারত না।" অন্য একজন কর্মকর্তা বললেন "আমাদের অর্থ বৃথা যেতে দেব না। ওর সাথে করিমন নেছার মত ব্যবহার করতে হবে, তাছাড়া আসল সংবাদ পাওয়া যাবে না। (করিমন নেছা ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে ওকে রুমে আটকিয়ে বেদম প্রহার করে ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিল এখনই তাকে আটকিয়ে রাখা হোক। উক্ত অফিসারের উক্তি শুনে মায়মুনাকে অন্ধকার রুমে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। উক্ত ঘটনা মায়মুনার বাড়ির পার্শ্বের অন্য এক মহিলা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে গ্রামে ফিরে মায়মুনার আম্মার গোচরে দেয়। এদিকে কানে কানে গুঞ্জরিত হতে হতে মহল্লা থেকে গ্রাম পর্যন্ত পৌছে গেল। ঠিক তেমনিভাবে সুফিয়ার নিকটও পৌঁছল।

সুফিয়া মায়মুনার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, "হে প্রভু! আমরা বড় গুনাহগার তোমার অবলা নাফরমান দাসী। আমাদের ক্ষমা কর। তোমার হুকুমত ও অনুকম্পা যদি আমাদের পক্ষে থাকে তবে আমাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। হে প্রভু! তোমারই অনুগ্রহে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছি। তোমার রাহাবারী ছাড়া অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন। ওগো অনাথের নাথ! আমরা তোমার পরীক্ষার উপযুক্ত হতে পারিনি। তারপরও যদি পরীক্ষা নিতে চাও তবে দয়াকরে পাশ নাম্বার দিয়ে দিও। হে আল্লাহ! আমরা তোমার উপর ভরসা করে মায়মুনার মুক্তির জন্য চেষ্টা করব। তখন কিন্তু আমাদের ভুলে যেও না। সে সময় তোমার ভরপুর সাহায্য কামনা করি। আর আল্লাহ! অসহায় বোন মায়মুনা আজ তাদের হাতে বন্দি। তাকে ছিনিয়ে আনার জন্য আমাদের সাহায্য কর।"

সুফিয়া মোনাজাত শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আবাসিক মেয়েদের নিয়ে, একান্ত নির্জন কক্ষে মিটিং-এ বসল। মায়মুনার মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলল

“আজ রাত্রে আমরা আমাদের বোন মায়মুনাকে যেভাবেই হউক উদ্ধার করে আনব ইনশা আল্লাহ। এতে যদি দুচার জনের জীবন কুরবানও করতে হয় তাও করব। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত ব্যক্ত কর।” এক তরুণী দাঁড়িয়ে বলল, “আপা! এ নিয়ে লম্বাচূড়া বক্তৃতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আপনি ফমূলা তৈরি করে আমাদেরকে বলুন, নিশ্চয়ই পার্শ্বে পাবেন। এন.জি.ও নামক দানবের হাত থেকে বোনকে উদ্ধার করতে হবে। বোনকে বাঁচাতে গিয়ে এবং বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে যদি নিহতও হতে হয় তবু কিন্তু পিছপা হব না। জিল্লতির জিন্দেগীর অবসান ঘটাতে চাই।” সুফিয়ার অন্তর শিক্ষানবিস তরুণীর কথা শুনে যারপরইনাই আনন্দে নেচে উঠল। সুফিয়ার সামান্য প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে চলছে। সাতজন তরুণীকে বেছে নিয়ে এ্যাকশন গ্রুপ রচনা করল। সাত জনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর তরুণী রাবেয়াকে বলল “তুমি সুন্দর পোশাকে তৈরি থাকবে। তোমার কাজ হল, তুমি গেটের দারোয়ানের নিকট এক জন বিপন্না নারী পরিচয় দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং ভাব জমাবে। তারপর যতটুকু সম্ভব কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করবে। এমন ব্যবহার করবে সে যেন চোখের পলকেই তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। অত:পর সময় বুঝে তার হাতিয়ারটি হাতে নিয়ে বেগে বসবে। আমরা কজন সশস্ত্র অবস্থায় তোমার পার্শ্বেই থাকব। প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে আমরা তার জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকব। তারপর বাকি ছয়জনকে বলল, তোমরা থাকবে আমার পার্শ্বে। আমি কখন কি হুকুম দেই তার প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যদি শহীদও হতে হয় তবু পিছপা হবে না। বন্দি অবস্থায় কাউকে রেখে আসবে না। এ অঙ্গিকার সকলকেই দিতে হবে।” সুফিয়ার কথা শুনে সকলেই বলে উঠল, জনাবা! যা উপদেশ দিয়েছেন, বাস্তবে তাই পাবেন। তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম হবে না। ইনশা আল্লাহ।

অন্য দিনের মত এশার নামায আদায় করে খানা খেল পেট ভর্তি করে। অতঃপর উক্ত ছয়জনের মধ্যে ছয়টি অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণ করে বলল, “রাবেয়া থাকবে অস্ত্রমুক্ত, সে পাবে দারুয়ানের অস্ত্র। রাবেয়া ধবধবে দাঁতগুলো বের করে হাসতে লাগল। অত:পর সবাই নিজ নিজ রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সুফিয়া শোয়ার আগেই বলে দিল রাতের যে কোন মুহূর্তে ডাকা হতে পারে তখন কেউ অলসতার পরিচয় দিও না। এবার সবাই সুখের নিদ্রায় হারিয়ে গেল। রাত দুইটা অতিবাহিত হল। তামাম দুনিয়ার মানুষ ঘুমের ঘোরে অচেতন। সুফিয়া আস্তে আস্তে তাদেরকে জাগিয়ে দু’রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দেয়। সবাই নামায আদায় করে এন.জি.ও অফিস অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফেলা অফিস প্রাঙ্গণে চলে আসল। সুফিয়া ছয়জনকে নিয়ে পার্শ্বের মেহগনী নার্সারির ভিতর আত্মগোপন করল। আর রাবেয়া সোজা চলে গেল ভাব জমাতে গেট রক্ষীর নিকট।

জু হুকুম তু কাজ। প্রথম দর্শনেই দারোয়ান কাবিজ হয়ে গেল। এ সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। সময়ে সদ্ব্যবহার করতে হবে। দারোয়ান রাবেয়াকে বলল "বোন আমার জীর্ণ কুটিরে কি তুমি থাকবে? তোমরা হলে মডার্ন নারী, তোমাদের সম্মান কি করে করব বোন? রাবেয়া বলল, জনাব! এত কিছুর প্রয়োজন নেই একটু মাথা গোজার ঠাই হলেই চলবে। তারপর রাবেয়া হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করল, স্যার ঐসব পাকাপুক্ত এমারতগুলো কি কাজে ব্যবহার করে? দারোয়ান বলল ঔগুলো সবই অফিসিয়াল কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন লোকজন থাকে না। তবে ঐঘরে ৪ জন লোক রয়েছে। তিনজন আমাদের কর্মকর্তা আর অপর একজন মহিলা। ঋণ পরিশোধ না করার অপরাধে মহিলাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সে এন.জে.ওদের টাকা পয়সা আত্মসাত করেছে। টাকা আদায় না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না।

দারোয়ানের কথার ফাঁকে অস্ত্রটি হেচকা টান দিয়ে নিজের আয়ত্বে এনে তার দিকে তাক করে বলল "সাবধান! একটু টু শব্দ করলে আর রক্ষা নেই। ব্রাশ ফায়ারে সমস্ত দেহ ঝাঝরা করে দেব।" দারোয়ান করজোড় অবস্থায় অসহায় বেশে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে সুফিয়া তার বাহিনী পশ্চাত দিক থেকে সামনে এসে বলল সাবধান! একচুল এদিক সেদিক হবে না। এ ঘর খুলে দে, না হয় চাবি দে। দারোয়ান ঘর খুলে দিল। সুফিয়া বাহিনী নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে মায়মুনাকে উদ্ধার করে বলল, জলদি বেরিয়ে যাও। মায়মুনা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে দারোয়ানসহ চারজনকে হত্যা করে, তাকবীর ধ্বনি দিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। মায়মুনা রাস্তায় এসে আল্লাহর শোকর আদায় করে বলল, "আমার অন্তরে একটি বিশ্বাস ছিল যে, আমার বোনেরা সংবাদ পেয়ে আমাকে মুক্ত করতে ছুটে আসবে। আমার চিন্তার বাস্তবতা এখন হাতে হাতে পেলাম।" সবাই ভোরের আগেই ফিরে এল মাদ্রাসায়। পরদিন পুরা এলাকায় ফোর মার্ডারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। থানায় সংবাদ পৌছলে পুলিশ এসে লাশসহ সন্দেহভাজন তিনজন এন.জি.ও কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

চৌষট্টি

মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানী সাহেব ত্রিশ চল্লিশ জন নতুন সাথী পেয়ে মহানন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, "হে আমার প্রাণ প্রিয় নতুন মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা! আজ আমাদের পবিত্র অন্তরীপে রাশীয়ার জারজ অপত্যেরা অবিহিতভাবে অনুপ্রবেশ করে, আধিপত্য বিস্তারের নীল নকশা অংকন করছে। ওরা আমাদের তাহযিব, তামাদ্দুন ও অতীত ইতিহাস বিলীন করতে তীব্র হয়ে উঠেছে। আমাদের অপূর্ব স্পর্শ বোনদের অমূল্য সম্পদ ইজ্জত লুণ্ঠস করছে। আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখ, আইনজীবী ও বুদ্ধিজিবীদেরকে অন্তর্ভেদী নির্যাতন ও উৎপীড়ন করতে

তিলাকারেও কসুর করেনি। এই তো দুদিন আগে কয়েকজন অনূঢ়া সুন্দরীকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে জীবনের যবানিকা সীমান্তে পৌঁছিয়েছে। হে আমার অবিশস্ক টগবগে যুবক বন্ধুরা! এখন থেকে তোমাদের অনুদারমনার ভূষণ ছিন্ন করে বাহাদুরীর পরিচ্ছে ধারণ, শক্তি সাহস সঞ্চয় করে, ভীম আহবে ঝাঁপিয়ে পরতে হবে। দুশমনরা দুশমনী করে আমাদের অভিগ্রহে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হবে। প্রিয় সাথীরা! তোমরা মুসলমানের প্রতি হবে উদার আর কাফেরদের প্রতি হবে অনুকম্পাহীনা। অনুব্রত থাকবে আল্লাহর প্রতি প্রত্যয়ী।" তিনি আরো বলেন "ভূমানচিত্রের তৃতীয়াংশ জায়গা দখল করে সেখানে তারা কুফুরী তন্ত্র চালু করেছে। অনেকগুলো মুসলিম দেশকে তাদের শাসানাধীনে এনে কুফুরী স্থানে রুপান্তরিত করেছে। তারপরও তাদের ক্ষুধা নিবারণ হয়নি। এখন তাদের কালো হাত আফগানিস্তানের দিকে প্রসারণ করছে। তাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে পিংগল বর্ণ অক্ষির চাহনিতে আফগান জাতিকে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটাতে পারবে না। হে আমার তরুণ ভাইয়েরা! ওদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন মোটেই বৈধ নয়। কিছু কিছু উলামায়ে "ছু" (পথভ্রষ্ট আলেম) নষ্ট বুদ্ধিজিবী ও স্বদেশি দালালরা পঞ্চমুখে তাদের স্তুতিবাদ গেয়ে বেড়ায়, এরা আসলে মুনাফেক। এরাই দীনের শত্রু। দেশের দুশমন ও কাফেরদের দোসর। এদের প্রতি সদাসর্বদা কড়া নজর রাখতে হবে। আমি মনে করি সাতটি কাফেরকে হত্যা করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, তার চেয়ে দেশি একজন মুনাফেককে হত্যা করলে সে সওয়াব মিলবে। এরা যদি আশ্রয় না দিত, পথ না দেখাত, তবে এদের সাহস ছিল না আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এত ক্ষতি সাধন করতে। কাজেই দুশমন হিসেবে দেশি-বিদেশির মধ্যে কোন ফ'রাক নেই। ওরা হোক না আমার ভাই। হোক না আমার বন্ধু বা অন্য কোন নিকটাত্মীয়। এদেশ আমাদের। এ দেশেই থাকতে হবে ঈমান আমল নিয়ে। দেশ ত্যাগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমাদের নেই। মহানবী (সা) এরশাদ করেন মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নেই। কিন্তু জিহাদ এবং জিহাদের নিয়ত অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা যুদ্ধে শরীক হবে। (বুখারি, মুসলিম)

মুসলমানদের পাঁচটি জিনিস সংরক্ষণ করা সর্বাবস্থায় সকলের উপর ফরযে আইন। পাঁচটি জিনিস হল মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জত, এলেম ও দ্বীন। উক্ত পাঁচটি জিনিষের উপর আক্রমণ কারীকে প্রতিহত করা, ইসলামে বৈধতা দান করেছেন। (জামেউল আহকাম ৮ম খণ্ড-১৫০ পৃঃ) (ক) ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী যদি মুসলমানও হয়, তবু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা প্রতিহত করা সমস্ত ফকীহগণের নিকট ফরজ। প্রতিহত করতে গিয়ে যদি হত্যাও করতে হয় তবে তাই করবে। তবু প্রতিরোধ ফরয। (মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতামতও তাই) নিজের জান, মাল, দীন ও সস্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে যদি প্রাণ

হারায় তবে সে ব্যক্তি শহীদ। (ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খন্ড ৩৮৩ পৃঃ, যায়লাঈ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৪, আলইবকনা ৪র্থ খণ্ড ২৯০ পৃঃ রওযাতুল বাহিয়্যা ২য় খন্ড, ৩৭১ পৃঃ আল বাহরয্যাখার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ তাজুল উরুস, সহীহুল জামিউসসাগীর লিল আলবানী, হাদীসন ৬৩২১ এবং আহমদ, আবুদাউদ তিরমিজী ও নাসায়ী)

ইমাম জাস্‌সাস বলেন- কেউ যদি কাউকে হত্যার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করে তবে সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয হয়ে যায় আক্রমণকারীকে হত্যা করা, এতে কারো দ্বিমত আছে বলে জানা নেই। (আহকামুল কুরআন ২৪০৩ পৃঃ) এমতাবস্থায় আক্রমণকারী নিহত হলে সে হবে জাহান্নামী আর মজলুম হলে জান্নাতী। উক্ত মাসআলা মুসলমান মুসলমানের উপর আক্রমণ করলে তার হুকুম।

আর যদি কাফিররা মুসলমানের উপর আক্রমণ করে তবে তাদের উপর আক্রমণ করা নিঃসন্দেহে ফরযে আইন। প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা! তোমরা আরাম আয়েশের জিন্দেগীকে পরিহার করে জীবনের মায়া মমতাকে পদাঘাত করে, ঘর সংসারকে পশ্চাতে রেখে, আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কায় কারবার বন্ধ করে দিয়ে, চাষাবাদকে বাদ দিয়ে, মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত থেকে সাময়িক ভাবে ফারেগ হয়ে, জান এবং মাল নিয়ে ছুটে আসছ এমন এক বিয়াবানে, যেখানে খাবার নেই, পানীয় নেই, আরামের বিছানা নেই, ফ্যান এর ব্যবস্থা নেই, নিয়মিত গোসল নেই, সময় মত ঘুমের ব্যবস্থা নেই। পেরেশানী, অনিদ্রা, ভয়-ভীতি, অনাহার হলো নিত্য দিনের সাথী। যেখানে তোমাদের সাথীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখবে, তোমার সহযোদ্ধাকে রক্তরাঙ্গা অবস্থায় দেখবে, তোমার সাথীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হতে দেখবে। নিহতদের গড় গড় শব্দ আহতদের গগন বিধারি চিৎকার নিজ কানে শুনবে, যেখানে তোমার ভায়ের লাশকে রক্তাক্ত অবস্থায় বহন করতে দেখবে এমন জায়গায় এসেছ।

প্রিয় সাথীরা তোমরা যে জায়গায় এবং যে ময়দানে আসছ সে ময়দানের ধুলা-বালি সম্পর্কে তোমাদের রাসূল (সা) খোশখবরী দিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তার ধুলায় যে ব্যক্তির পাদদ্বয় ধূসরিত হবে আল্লাহপাক তাকে দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (ইবনে হাব্বান)। প্রিয় বন্ধুরা তোমরা যে রাস্তায় বেরিয়ে আসছ এই রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করলে তোমাদের শরীর থেকে যে ঘাম বের হবে, সে ঘাম অন্য কোন আমলের সমান হতে পারে না। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা) এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমকক্ষ। উত্তরে মহানবী (সা) বলেন, "জিহাদের সমতুল্য কোন আমল পাচ্ছি না।" সে ব্যক্তির বার বার পীড়াপীড়ির পর তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ জিহাদে বের হওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তে থাকবে এবং এতে কোনরূপ দুর্বলতা ও অলসতা স্পর্শ করবে না। আর রোযা রাখবে মুজাহিদ জিহাদ থেকে

ফিরে না আসা পর্যন্ত। (মাসকে মাস, বৎসরকে বৎসর একাধারে নামায পড়বে আর রোজা রাখতেই থাকবে) পারবে কি সেরূপ? লোকটি বলল, "কার সাধ্য আছে এমন কঠিন কাজ পালন করা। আবু হুরইরা (রা) আরো বলে, (জিহাদের নিয়তে পালিত ঘোড়া) ঘাস খাওয়ার সময় যদি রশিটা একটু লম্বা করে দেয়া হয় এতেও মুজাহিদদের জন্য সওয়াব লিখা হয়। (বুখারি ১ম খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ)

হে আমার মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা। জিহাদের ফাযায়েল বয়ান করলে কয়েক সপ্তাহেও শেষ করা যাবে না। কাজেই আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আরো কিছু জরুরি কথা আলোচনা করতে চাই। তোমরা তা মন দিয়ে শুনবে। অতঃপর তিনি বললেন জিহাদ করতে হলে প্রথমেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। জিহাদের পূর্ব শর্ত হল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। জিহাদ যেমন ফরয জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ঠিক তেমনই ফরয। অযু ছাড়া যেমন নামায হয় না, ঠিক তেমনিভাবে প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদ করা যায় না। অতএব প্রশিক্ষণের জন্য তোমাদেরকে সীমান্ত প্রদেশে (পাকিস্তানে অবস্থিত) পাঠিয়ে দেব। সেখানে কমপক্ষে ১ মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরবে। তারপর তোমরা ময়দানে জিহাদ করতে পারবে। আর একটি কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। তোমরা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এসে নিজ নিজ কাজে লেগে যাবে, যেমন কৃষকরা চাষাবাদে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য। চাকুরীজিবীরা চাকুরিতে ছাত্ররা লেখাপড়ায়, আর মসজিদ মাদ্রাসার ইমাম ও ওস্তাদগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কাজে লেগে যাবেন। আর সব সময় মনের দিক থেকে তৈরি থাকবেন। যেন যেকোন মুহূর্তে ডাক আসলে চাষিরা-চাষাবাদ ছেড়ে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা রেখে, চাকুরীজিবীরা চাকুরি থেকে ছুটি নিয়ে অর্থাৎ যার যার কাজ রেখে দিয়ে ময়দানে চলে আসতে হবে। যুদ্ধের ছামানাগুলো সব সময় ঘুচিয়ে-ঘুচিয়ে নিজের হাতের কাছে রাখতে হবে। ডাকের সাথে সাথে যেন লাব্বাইক বলা যায়। এমন যেন না হয় আগে জানানো হয়নি, হঠাৎ করে কিভাবে যাই। মনে রাখবেন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমীর সাহেব যা করতে বলেন, তাই যদি করা হয় তবে জিহাদের ময়দানে না গিয়েও জিহাদের পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়। যখন যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয় তখন সে সব দায়িত্বই পালন করবে। এমনকি কাউকে যদি বলা হয় তুমি রাস্তার অলিতে গলিতে দুশমনের এলাকায় ও মুর্চায় ঘুরে ঘুরে জুতা পালিশের কাজ করবে তবে সে কাজ করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং জিহাদের সোয়াব পাবে। অতঃপর জনাব হক্কানী সাহেব সকলের থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজন রাহবার দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করেন।

কাফেলা বিদায় হয়ে গেল অনেকক্ষণ। রাত্রের মধ্যেই সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় রয়েছে রুশি ফৌজের ঘাঁটি। দিনের বেলা পথচলা নিরাপদ নয়। তাই আঁধার রজনীতে নিশাচরের মতই চলতে হয়। নিঝুম রাত। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। পাখ-পাখালিরাও কল কাকলী বন্ধ করে নিজ নিজ নীড়ে ঘুমে

অচেতম। তবে মাঝে মধ্যে খেকশিয়ালের হুক্কা হুয়া কলরবে রাতের নিরবতা ভঙ্গ করছে। পক্ষীকুলের মধ্যে একমাত্র বাদুরই পাখা মেলে রিযিকের অন্বেষণে ফলদার বৃক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাহবার মুজাহিদ সাথীদের নিয়ে চরাই-উতরাই পেরিয়ে কঙ্করময় প্রান্তর পাড়ি দিয়ে, দুশমনের অলক্ষ্যে অগ্রে চলছে। নিশাকরমুক্ত যামিনিতে কে যেন মসিভান্ড উপুর করে ঢেলে দিয়েছে। কে যেন এক পুছ কালিমা লেপন করে দিয়েছে রাতের গায়। দমকা হাওয়া বালুরাশি উড়িয়ে কেবলই বিরক্ত করে তুলছে। দুশমনের ছাউনিগুলো এড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাফেলা। চলার পথে অতিবাহিত হয়ে গেল তিন দিন। বেশ কয়েকটি ছোট বড় পাহাড় পারি দিয়ে এমন এক নির্জন স্থানে এসে দাঁড়াল, যেখানে দিক নির্ণয় করতে পারছে না রাহবার। অন্যদের তো চেনার প্রশ্নই আসে না। কোন দিকে যাবে, কি করবে, নিকটে কোন দুশমনের ঘাঁটি আছে কি না ,তা সম্পূর্ণ বেমালুম। পথ হারা পথিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্ষুধা পিপাসায় কাঁতর। রাত শেষ হয়ে গেলে হয়ত দুশমনের হাতে বন্দি বা নিহত হওয়া অবধারিত।

রাহবার সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে মুজাহিদ সাথীরা আমরা বর্তমানে মহাবিপদে গ্রেপ্তার। কোন দিকে যাব সে পথ জানা নেই, দিক হারিয়েছি অনেকক্ষণ। আল্লাহর রাহবারী ছাড়া এক কদম চলার সামর্থ্য আমার নেই। কাজেই আপনারা সবাই তায়াম্মুম করে দু'রাকাত ছালাতুল হাজত নামায আদায় করে নিন। তারপর দোয়া করুন। আল্লাহ যেন আমাদের পথ দেখিয়ে দেন। রাহবারের নির্দেশে সবাই তায়াম্মুম করে দুরাকাত ছালাতুল হাজত নামায আদায় করে দোয়া করতে লাগলো। রাহবার অবনত মস্তকে মহান রাব্বুল আলামীনের দরগাহে প্রার্থনা জানালেন। হে প্রভু! আমরা নিঃসন্দেহে গুনাহগার, তুমি গাফ্‌ফার ও ছাত্তার। অতএব আমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। ওগো আমার মাওলা! তুমিই তো যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করে পথ ভোলা বান্দাদের পথ প্রদর্শন করেছে। আজ তোমার পথের একদল মুজাহিদ পথহারা, দিক হারা ও দিশেহারা। রাহবার হয়ে গেছে বেরাহ। তুমি ছাড়া উদ্ধার করার আর কেউ নেই। অতএব আমাদের উদ্ধার কর। সরল পথের দিকে রাহবারির। তোমার করুণা বিনে কোন উপায় নেই। ওগো পথের দিশারি মাওলা। আমি অক্ষম, দুর্বল, দিকহীন। আমার ভুল রাহবারীতে যদি এতগুলো মুজাহিদের জানমালের ক্ষতি হয়, তবে তোমার কাছে হাজির হতে পারব না। ফিরে যাওয়ার রাস্তাও জানা নেই। আর ফিরে যাওয়াতো জায়েজ নয়। তোমার হাবিব (সা) জিহাদের পোশাক পরে ঘর থেকে বের হলে কোন অসুবিধায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারত না। আমরাও অসুবিধার কারণে ঘরে ফিরে যেতে চাই না। অতএব তোমার খাছ রহমতে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দাও। রাহবারের চোখের পানির নজরানা পেশ করে দোয়া সমাপ্ত করতে না করতে এক পাহাড় উপত্যকা থেকে মাওলানা জালালুদ্দিনের কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এলো ওহে

মুজাহিদ সকল এদিকে এসো। এ আওয়াজ সকলের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করছিল। কয়েকবার ডাকা ডাকির পর রাহবার কাফেলা নিয়ে সে আওয়াজের সুর ধরে এগিয়ে চললেন। আহ্বানকারী লোকটির পরনে ছিল সবুজ পোশাক। মাথায় আমামা উচ্চতা স্বাভাবিক। লোকটি একটু আগে আগে চলছেন যে তার পশ্চাত থেকে আবছা দেখা যেত। কিন্তু অনেক হেঁটেও তার নাগাল পাওয়া যেত না। এভাবে পথ চলতে চলতে কখন যে সীমান্ত পেরিয়ে কাফেলা গন্তব্যের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনিত হলেন তা কেউ অনুমান করতে পারেনি। অকস্মাৎ সামনে তাকিয়ে দেখেন লোকটি নেই, কিন্তু ট্রেনিং সেন্টার সম্মুখে। সবেমাত্র ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। এত অল্প সময়ে এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌছে গেলেন তা কেউ ভাবতে পারেনি। তারপর সকলেই জামাতে নামাজ আদায় করে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

পয়ষট্টি

আল্লাহর অকুতভয় মুজাহিদ সৈনিকরা আফগানিস্তানের পাহাড় পর্বত, মাঠ-ঘাট, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কোন এলাকা বা শহর নেই যেখানে মুজাহিদগণের পদচারণা ঘটেনি। শত শত রাশিয়ান ক্যাম্পগুলোতে উপর্যুপরি আক্রমণ করে শত শত ফৌজকে হত্যা করতে লাগলেন। রাশিয়ানরা দিশেহারা হয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। অনেকে ক্যাম্প ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ভাগতে লাগল। মুজাহিদরা তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের উপরই আক্রমণ করতে লাগল।

রাশিয়া সুনিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশের পা চেটে চুক্তির ব্যবস্থা করে। মিস্টার গর্বাচেভ লজ্জা ঢাকার জন্যই এ কৌশল বেছে নিচ্ছিল। আমেরিকা এবার মোড়ল সেজে, তার পরাজিত বন্ধুর (রাশিয়া) মান ইজ্জত রক্ষা করতে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৮ ইং সালের ২৮শে এপ্রিল জেনেভায় শান্তি চুক্তি নামক এক চুক্তি করে। উক্ত চুক্তিকে আমেরিকা, পরাজিত রাশিয়া ও তার দোস্ত আফগান শাসনকর্তা মিস্টার নজিবুল্লাহ সরকার স্বাক্ষর করেন। পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করায় পাকিস্তানও স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। উক্ত চুক্তির ৮ মাস ৬ দিন পর অর্থাৎ ১৯৮৯ ইং সালে রাশিয়া বহু সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র বিমান, সাঁজোয়া যান, হেলিকপ্টার, ট্যাংক, কামানসহ বহু জাতীয় অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী মারণাস্ত্র হারিয়ে তার হাণ্ডি-পাতিল ও তল্লা-তল্পি ঘুটিয়ে পালিয়ে যায়। জেনেভার শান্তি চুক্তি নামক কালো চুক্তির কিছু শর্তাবলি শেষ খণ্ডে উল্লেখ করেছি বিধায় এখানে উল্লেখ করা সমীচিন মনে করিনি।

রাশিয়া পালিয়ে যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া পালিত পুত্র ও পদ লেহি সেবা দাস নজিবুল্লাহ পিতৃহারা বা প্রভুহারা হয়ে পড়েন। তার পরও তিনি মরণ

কামড় দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেন। নজিবুল্লাহ ভেগে যাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না বিধায় যে কয়দিন সম্ভব ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহারের পর নজিবুল্লাহর নিয়মিত ও আনুগত্য বাহিনী চোখে সরিষা ফুল দেখতে লাগল। পরিশেষে নিরুপায় হয়ে অস্ত্র-শস্ত্রসহ দলে দলে মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে লাগল। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে নজিবুল্লাহ কাবুলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার চেষ্টা করেন। তাতেও কোন কাজ হল না। এভাবে দু'বৎসর সাড়ে তিন মাস ক্ষমতা কামড়ে রেখে অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ১৫ই এপ্রিল মুজাহিদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মুজাহিদগণের ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহপাক আফগানিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার মুজাহিদদেরকে দান করেন।

এ বিজয় মুজাহিদের নয়, এ বিজয় ইসলামের। এ বিজয় মুজাহিদের নয়, এ বিজয় মুসলমানদের। এ বিজয় আফগানিস্তানের নয়, এ বিজয় বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতের। হাজার হাজার বছরের পরাজিত ইসলাম আজ মুজাহিদদের রক্ত নদী পেরিয়ে বিজয় উল্লাসে হাসছে। মুজাহিদদের তপ্ত খুনের সেচ পেয়ে ইসলাম নামক বৃক্ষটি সবুজ শ্যামল রূপ নিয়ে ফুলে ফলে সুসোভিত হচ্ছে। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইসলাম সারা দুনিয়ায় সফর করে আফগানিস্তানে এসে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলল। বিজয় গর্বে শীর উঁচু করে বিশ্ব মুসলিমের দিকে তাকাল।

সেদিন বিজয় উল্লাসে আফগানিস্তানের আকাশে বাতাসে লতায়-পাতায়, তরু-পল্লবে পোলক শিহরণ লেগেছিল। নদ-নদী, খাল-বিল ও নির্ঝরনী বিজয় গর্বে স্বাধীনতার সুর তুলে কলকল তানে বইতে ছিল। নদী-নালা ও ঝর্ণা ধারা গুলো সুমিষ্ট পানিতে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। কাননে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের ভারে ডালগুলো নতশীরে স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। স্নিগ্ধ সমীরণের ছুটাছুটিতে পত্র-পল্লবেরাও নাচতে ছিল। গায়ক পাখিরা নতুন সুরে কিচির মিচির গান গেয়ে বন বাদারে উজালা করে দিচ্ছিল। প্রজাপতি তার রঙ্গিণ ডানা মেলে ফুলে ফুলে নাচতে ছিল। দুম্বা শিশুরা লেজ তুলে মহানন্দে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছিল। বন্য পশুরাও শিকার ধরতে ভুলে গিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারারাও স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। সে দিন আফগানের ঘরে ঘরে খুশির তুফান বইতে ছিল। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা দিল। মরি মরি আহ কি আনন্দ আবাল, বৃদ্ধ-বনিতার অন্তঃপুরে বিরাজ করছিল!

অণুতে পরমানুতে স্বাধীনতার খুশীর দোলা লেগেছিল। বেদুঈন বালারা দফ বাজিয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ উল্লাসে ভরে দিয়েছিল। আফগান মায়েরা শহীদ সন্তানের মর্মব্যথা ভুলে গিয়ে মহল্লায় মহল্লায় মিষ্টি বিতরণ করছিল। তাদের তাজা বুকের রক্তের বিনিময়ে ইসলামকে একটি ভূখণ্ড দিতে পেরে শহীদ পরিবাররা

উল্লাসে গর্ব করছিল এবং গোত্রে গোত্রে চলছিল এক কানাকানি ও জানাজানি। সেদিন আফগানের এমন কোন মস্তক বাকি ছিল না যারা শুকরিয়ার মস্তক ঝুকায়নি। সকলেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পড়েছিল। এমন কোন গোত্র বাদ যায়নি যে বিজয় উল্লাসে মাতোয়ারা হয়নি। পশ্তুন, তাজিক, হাজারা, উজবেক, আইমাক পার্সিয়ান, তুর্কমেন, ব্রাহুই, বালুচী ও নুরস্তানী এসব গোত্রগুলোর বালক বালিকারাও মুঠি মুঠি আনন্দ বিলাচ্ছিল। অন্ধ, আতুর, লেংড়া, কানা, বোবা, হাটকাল ও পিড়াগ্রস্থরাও সেদিন পূর্ণতা অনুভব করছিল। কি আনন্দ আফগানের দিকে দিকে ঢেউ খেলতেছিল যা বর্ণনা করাতে কবি সাহিত্যিক ও উপন্যাসিকরা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিল। সেদিন দিকে দিকে শোনা যাচ্ছিল মুজাহিদদের গগন বিধারি তাকবির ধ্বনী। গর্জে উঠেছিল লক্ষ কোটি অস্ত্র আর হাতিয়ার। মুহুমুহু তুপ ধ্বনিতে আফগানের আকাশ বাতাস ছিল প্রকম্পিত। মুজাহিদরা রৌশনী ও আতসী গোলার মাধ্যমে ফায়ারে ফায়ারে অংকন করেছিল আল্লাহর নাম। আকাশ তলে শোভা পাচ্ছিল হরেক রকম আনন্দোৎসব।

যুদ্ধের ময়দানে যেমন আকাশ থেকে নূরের ফেরেস্তারা নেমে আসছিল ধুলায় ধরায়। যুদ্ধ করছিল মুজাহিদদের কমান্ডিংয়ে। মুজাহিদদের কদমগুলো মজবুত করে জমিয়ে দিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। আজ সে নূরের ফেরেস্তারারাও বিজয় ও আনন্দ মিছিলে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশালাকারের দেহ বিশিষ্ট ফেরেস্তা দেখে অনেক রাশিয়ান ফৌজ পেশাব করে দিচ্ছিল এবং আত্মসমর্পণ করছিল। এসব আলোচনা বহুবার বহু মুজাহিদদের যবান থেকে শুনেছি। বান্দা যখন আল্লাহর রাজি খুশি করার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ আর কুরবানী পেশ করতে থাকে, অকাতরে জানমাল আর সময় দিতে থাকে তখন আল্লাহর প্রেম সাগরে তুফান আরম্ভ হয়ে যায়। সে সময় বান্দাকে খুশি করার জন্য খুলে দেন রহমতের সবগুলো দ্বার। বান্দার কুরবানীর উপর নির্ভর করে গায়েবী নুসরত পাওয়া। আফগানিস্তান সে সত্যের সাক্ষী বহন করছে।

আফগান স্বাধীন শত্রুমুক্ত বিশ্বের দরবারে তারা বিজয়ী ও গর্বিত। দুনিয়া বাসি সবাই মুজাহিদদের কুরবানী ও তাদের ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছে। রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসন থেকে কিভাবে তারা দেশটিকে রক্ষা করেছে তা সকলেরই জানা। দুখের বিষয় এ দেশটির স্বাধীনতা বা বিজয়কে দুনিয়ার অন্যান্য পরাশক্তি বনাম কুফুরী শক্তিগুলো মেনে নিতে পারেনি। দু' তিনটি দেশ ছাড়া অন্য কোন মুসলিম দেশ তাদেরকে স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। আমেরিকাসহ সমস্ত কুফুরী শক্তিগুলো এক জোট হয়ে চিন্তা করল যে, মোল্লারা ঠিকমত জামা-কাপড় পড়াতে পারে না। ঢিলা-কুলুক নিয়ে সময় ব্যয় করে, সে মোল্লারা আজ আমাদের মোড়লগিরির ধার না ধারে রাষ্ট্রের মালিক হতে চলেছে। তারা যদি দুচার বছর টিকে যেতে পারে তবে ওমর (রা) এর মত সারা দুনিয়ার শাসনভার তাদের হাতে চলে

যাবে। আমরা আগের মত গোলামের জাতিতে পরিণত হব। এসব ভেবে চিন্তে অতি সুকৌশলে আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দানে বাধা সৃষ্টি করল এবং মুজাহিদদের বিজয়কে তারা হাইজ্যাক করে নিল।

আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেনসহ সবগুলো কুফুরী শক্তি এক হয়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরিন বিষয়ের উপর খোদ গরজে নাক গলাতে লাগল। জাতিসংঘ বনাম জারজসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠানের নামে চেপে বসল। ১৪ বৎসরের জিহাদের ফসলকে পায়মাল করতে লাগল। সরকার গঠন ও দেশকে পুনঃগঠন নিয়ে অনেক কুবুদ্ধি দিতে লাগল। তখন ইংরেজি শিক্ষিত মুজাহিদ নেতারা তাদের শলা-পরামর্শ মানতে বাধ্য হলেন। এ পথ ধরে পশ্চিমারা শাসক গোষ্ঠিকে গৃহ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। উক্ত গৃহ যুদ্ধে বা ক্ষমতার লড়ায়ে আমেরিকা বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষকে পরোক্ষভাবে মদদ দিত। তা খুনরাঙ্গা প্রান্তর পাঠককে বহুবার জানিয়েছি। পরস্পর সংঘর্ষ বাধার আগেই বিবিসি ও বয়েজ অব আমেরিকা থেকে উস্কানিমূলক সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়াতে লাগল। এমনও দেখা গেছে তাদের সংবাদের ৪/৫ দিন পর ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে কিভাবে ওরা সংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছিল?

এমন বহুবারই হয়েছে যে, মুজাহিদ ক্যাম্প বা কারো বাড়িতে মেহমান আসছে। তখন মেহমানের সম্মানার্থে হাজার রাউন্ড গুলি ছুড়ে, কয়েকবার তুপ ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। কোন ঘরে সন্তান হলে তুপ ধ্বনি দিয়ে গুলি ছুড়ে আনন্দ ফুর্তি করত। এ গুলোর শব্দ পেয়ে ওসব নষ্ট প্রচার মাধ্যমগুলো সংবাদ দিত যে, উমুক স্থানে মুজাহিদ দু' দলের মধ্যে তুমুল গোলা-গুলির শব্দ পাওয়া গেছে। এসব সংবাদ পেয়ে আশপাশের জেলাগুলোর জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হত। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠত। এমন এমন মিথ্যা বানোয়াট ও জঘন্য সংবাদ ছড়িয়ে সারা বিশ্বে মুজাহিদদেরকে ঘৃণিত করে তুলেছিল। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে যা মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল তার চেয়ে বেশি প্রাণহানী হচ্ছিল আপোসে গৃহ যুদ্ধে। অশান্তি আর অরাজকতায় দেশের জনগণ এক শ্বাসরোদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিল। শান্তি নামক কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে দু:খিত অন্তর মেনে নিতে পারেনি। আমেরিকা দুনিয়া ব্যাপী মুজাহিদ আর জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

ছেষট্টি

ড: নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর এন.জি.ও সংস্থাগুলোর মাথা নত হয়ে গেল। তাদের অগ্রযাত্রা ব্যহত হল। পালাই পালাই মনোভাব তাদের অন্তরে বিরাজ করছিল। এন.জি.ওরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আগেই সু কৌশলে কাজ

করছিল। অবশেষে রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে সরাসরি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিল।

এসব কারণে সুচতুর এন.জি.ওরা, তাদের হান্ডি-পাতিল ও তল্পা-তল্পি ঘুটিয়ে ভাগার পথ খোঁজছিল। অনেকে বকেয়া বেতনের দাবি ছেড়ে চাকুরিকে তালাকে মুগাল্লাজা জানিয়ে দেশে ফিরে গেল। দেশীয় চাকুরিজীবীরা রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগির মত কাম-কাজ ও খানা-পিনা ছেড়ে দিয়ে ঝিমাচ্ছিল। অনেক এন.জি.ওরা দরিদ্র বিমোচনের জন্য গরীবদের মধ্যে চড়া সুধে যে সব ঋণ বিতরণ করছিল, সেসব অর্থ তুলে আনার জন্য ভয়ে গ্রামাঞ্চলে যেতে সাহস পেত না। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা অনাদায় ফেলে রেখে বাড়ির পথ ধরছিল। কোন কোন চতুর অর্থলোভী অফিসাররা লক্ষ লক্ষ টাকা অনাদায়ী দেখিয়ে আত্মসাত করে বড় লোক হয়েছিল। মিষ্টার আলমখানের অবস্থাও ছিল সেরূপ। হাজার হাজার টাকা বেতন ছিল অনাদায়ী। ভেবেছিলেন অনেকগুলো টাকা একসাথে উঠায়ে বড় ধরনের একটি কাজ করবে। হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। তার সংস্থা শত শত কর্মীদের বেতন আটকিয়ে রেখে, অফিসগুলো বন্ধ করে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। আলমের জীবনের অর্জিত সম্পদ অর্থাৎ চাকুরি জীবনের কয়েক লক্ষ টাকা জমা রেখেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংক নামক এন.জি.ওদের ব্যাংকে। হাজার মানুষের একাউন্টের টাকা পরিশোধ না করে ওরাও পালিয়ে যায়। ফলে আলম হয়ে যায় পথের ভিখারি। সারা জীবনের অপকর্মের জন্য জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে নিয়মিত তিরস্কার পেতে লাগলেন। তালেবান সরকার আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এন.জি.ওদের কার্যক্রম খুব মনস্থর গতিতে চলছিল। কিছু কিছু এন.জি.ও বন্ধ হলেও বাকি এন.জি.ওরা খুব সাবধানে কার্যক্রম চালাচ্ছিল।

১৯৯৬ খৃিস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালেবানদের হাতে কাবুলের পতন হলে এন.জি.ওরা কোথায় জানি মিশে যায়। ওদের কেন্দ্রীয় বিশাল বিশাল অফিস থেকে নিয়ে আঞ্চলিক ব্রাঞ্চ অফিসগুলো পর্যন্ত একযোগে বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে বিনা কারণে সিনেমার হলগুলোও হয়ে যায় দর্শকশূন্য। ঐ সমস্ত পরিত্যক্ত এন.জি.ও অফিস ও সিনেমার হলগুলোকে তালেবানরা মাদ্রাসা মক্তব ও হেফজখানাতে রূপান্তরিত করেন। যেমন মাওঃ জালালুদ্দিন হক্কানী সাহেবও ঐ ধরনের ৪০টি মাদ্রাসার মোহতামিম (মহাপরিচালক) ছিলেন। আর কিছু কিছু অফিসগুলো তালিবানরা নিজেদের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত করেন। তালিবানরা ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সংসদে যে সব আইন পাশ করেন তা হল- ১। ব্যাভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপ। ২। চুরি ডাকাতির দণ্ড হাত-পা কর্তন। ৩। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতের সাথে মসজিদে পড়া। ৪। আযান হলে দোকান পাট বন্ধ করে, গাড়ি পার্কিং করে নিকটতম মসজিদে গিয়ে

জামাতের সাথে নামায পড়া। ৫। মহিলাদের পর্দা করে চলাফেরা করা। ৬। ৪৫ দিনের মধ্যে দাড়ি রাখা। ৭। গান-বাজনা, সিনেমা না দেখা, টিভি না চালানো ও বেহুদা খেলাধুলায় সময় খরচ না করা ইত্যাদি।

ইসলামী আইন ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে রাজধানী কাবুলের দশ লক্ষ বাসিন্দা থেকে আড়াই লক্ষ বাসিন্দা পালিয়ে যায়। তারা ভাবছে যে, আর ইতরামী করা যাবে না, বা অতীতের অপকর্মের বিচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পলায়ন করে। ফলে দেশের অনইসলামিক কার্য ও অসামাজিক কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এতে কোন আইন প্রয়োগের দরকার হয়নি।

ঠিক তেমনিভাবে এন.জি.দের যাবতীয় কর্মকান্ড, ভণ্ডামী, শয়তানী, ফাজলামী ও ইতরামী বন্ধ হয়ে যায়। ওরা নিজেরা দাড়ি রেখে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে অতীতের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করে। কিন্তু এত ছল-চাতুরীর পরও কিছু কিছু এন.জি.ওরা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না। কারণ ওরা অফিস বন্ধ করে দিয়ে মুসলমানদের লেবাস পরে তলে তলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে তালিবান সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আর যে সব কমজোর এন.জি.ওরা ছিল ওরা সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে। তাই ওরা তওবা করে সুপথে ফিরে আসে। বড় বড় এন.জি.ও গোষ্ঠিগুলো এদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সেসব লেবাস পরিয়ে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল। এরা তত দোষি ছিল না। তাছাড়া তাদের কাজ-কামও তত জঘণ্য ছিল না। হিংস্র কুকুর বৃদ্ধ হলে যেমন বুজুর্গীর ভান ধরে, মিস্টার আলম খান সাহেবের অবস্থাও অনেকটা সে রকম। এখন তার নেই চাকুরি, নেই টাকা পয়সা। নেই আগের ফাংফুং, নেই জাঁকজমক। রাস্তায় হেঁটে গেলে কেউ তাকে সালাম দেয় না। সেলুট দেয় না, আর স্যার বলে কেউ ডাকে না। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। শত শত নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনকারী, শত শত দাম্পতির সোনার সংসার ইজারকারী, অনেক অসহায় পরিবারকে খৃস্টধর্মে দাখেলকারী, মুসলিম নামের কলঙ্ক জনাব আলম খান বাগরাম থেকে ছদ্দবেশে জালালাবাদে পালিয়ে যায়। ভেবেছিলেন যে, জালালাবাদে চাকুরি জীবনে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে ছিলেন। সেখানে কোন বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নিয়ে কোন চাকুরির সন্ধান করবেন। এ আশা নিয়ে আলম পুনরায় জালালাবাদে আসেন। সেখানে এসে জুনায়েদ নামে তার এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নিয়ে চাকুরি খুঁজেন। অনিদ্রা ও দুঃশ্চিন্তায় আলম সাহেব খুব অশান্তি ভোগ করছিলেন। একদিন বসা থেকে দাঁড়ানোর সময় স্টোক করে মেঝের উপর পড়ে যান। বাসার লোকজন দৌড়িয়ে এসে কেউ চেহারায় পানি ছিটাচ্ছে, কেউ নাক বরাবর উপরে চোখের দু পার্শ্বে টিপে ধরছে। আবার কেউ মাথায় পানি ঢালছে। এতে উপশম না হওয়ায় জুনায়েদ স্থানীয় ডাকারের পরামর্শ নিলেন। ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিলেন।

জুনায়েদ কালবিলম্ব না করে এম্বুলেন্সে করে জালালাবাদ সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দেন। ডাক্তারগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্যারালাইসেন্স এর রিপোর্ট দিলেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৮ নং বেডে তার চিকিৎসা চলল উক্ত ওয়ার্ডের প্রধান ডাক্তার হচ্ছেন মরিয়ম ওবায়দী (ডাক্তার ওয়াজেদের পত্নি) তার প্রধান সেবিকা নার্স হচ্ছেন নিষ্ঠুর আলমের পত্নি মাহমুদা। ডাক্তার মরিয়ম উবায়দী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করেন এবং জরুরি চিকিৎসা দিতে লাগলেন।

মাহমুদা দৌড়িয়ে এসে অক্সিজেন লাগিয়ে স্যালাইন পুশ করল। মাহমুদা একজন সুনামধন্য নার্স। তার ওয়ার্ডের প্রতিটি রোগীর অন্তর জুড়ে মাহমুদা বিরাজ করছে। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার জন্য প্রতিটি রোগী ও গার্জিয়ানরা খুবই অনুরাগী। রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে অনেক উপঢৌকন দিয়ে যায় মাহমুদাকে।

মাহমুদা তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী একটু পর পরই রোগীদের দেখছে। এবার আলম সাহেবের বেডের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাত ধরে শরীরের স্পন্দন পরখ করতে গিয়ে চেহারার দিকে নজর পড়ছে। হায়! এযে তার হারামী স্বামী আলম! এর আগে সে একটুও লক্ষ্য করেনি কার সেবা করছে। আলম এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। আলম সাহেবকে আবিষ্কার করার পর মাহমুদার অতীতের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোর কথা হৃদয়ে উদয় হয়ে এক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল। মুষলধারে অশ্রু বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। নিজকে সংবরণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল মাহমুদা।

পার্কের নির্জনতার ইতিহাস, কলেজ ফাঁকি দিয়ে আলমের হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর ইতিহাস, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে প্রেম সাগরে ভেসে যাওয়ার ইতিহাস, হৃদয় উজার করে আলমকে আপন করে নেয়ার ইতিহাস। মাহমুদার সামনে অন্য মেয়েদের নিয়ে অশালীন আড্ডা দেয়ার ইতিহাস। হাসপাতালের বেডে একা একা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ইতিহাস। তাছাড়া আর কতশত ঘটনা এক এক করে মাহমুদার অন্তরে শিউলির মত ভেসে বেড়াচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের গভীর থেকে দলিত মথিত করে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। আলম এখনো প্রকৃত সুস্থ হননি। স্যালাইন চলছে অক্সিজেন দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া হচ্ছে। মাহমুদা আড় চোখে আলমের দিকে তাকিয়ে তার বর্তমান চেহারার অবস্থা দেখে মনে মনে ভাবছে হায়! যে ব্যক্তি ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী। ফুটন্ত কুসুম সাদৃশ্য ছিল যার চেহারা। যার ছিল শত সহস্র বন্ধু-বান্ধব। যাকে দেখলে অনেকেই মনে করত রাজকুমার বা রাজ দুলাল। যার পোশাক পরিচ্ছদের পোচপাচ ছিল অবর্ণনীয়। সে ব্যক্তি আজ একা। যার বন্ধু-বান্ধবের কোন কমতি ছিল না। সে আজ নি:সঙ্গ অবস্থায় খাটিয়ায় নিঃসাড় অবস্থায়

শুয়ে আছে। সব রোগীদের কাছে দু-একজন হলেও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আর হতভাগার পার্শ্বে কেউ নেই।

মাহমুদা একবার মনে মনে ভাবছিল জ্ঞান ফিরে পেলে আমি আমার পরিচয় টুকু দেব। তার ঔরষজাত ফুটফুটে চাঁদের মত সন্তানটিকে এনে পরিচয় করিয়ে দেব। মেয়েটিও তার পিতাকে চিনে নিবে। মেয়েটির বয়স ৭ বৎসর। নাম সামসুন্নাহার। চেহারা সুরতে পিতা-মাতার মতই সুন্দরী। তবে চেহারা অনেকটা পিতার সাথে মিলে যায়। অপরিচিত যে কেউ দেখলে বিনা কষ্টে চিনে নেবে তার সন্তান।

সামসুন্নাহার প্রতিদিন ভোরে মক্তবে যায়। পবিত্র কালামে পাকের অর্ধেকেরও বেশি পড়েছে। মধুর সুরে নির্ভূলভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে। জরুরি মাসআলা-মাসায়েলও বেশ কিছু মুখস্ত করেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মায়ের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আদায় করে ও। মক্তব থেকে এসে গোসল ও নাস্তা সেরে নিয়মিত স্কুলে যায়। সে ক্লাশ থ্রির ছাত্রী। ক্লাশের মধ্যে তার রোল (১)। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে সবাই সামসুন্নাহারকে আদর করে। মাহমুদা এসব ভাবতে গিয়ে শেখ শাদী (রহ) এর কবিতার চরণ মনে পড়ল।

ঃ মাশুকে হাজার দোস্তরা ছিল না দেহী।
দর মিদেই আঁ দিল বজুদায়ী বনেহী।

অর্থাৎ এ নশ্বর ধরাধামে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু দেখিনি। যদিও দেখেছি ওরা সবাই নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর।" স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে ভুলে যায়।

মাহমুদার চোখে ভালো লেগেছিল একমাত্র আলমকে। মনের মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছিল আলমকে। দুনিয়ার সব কিছু ভুলে গিয়ে একমাত্র আলমের প্রেম সাগরে ঝাপ দিয়েছিল। এর বিনিময়ে আলমের পক্ষ থেকে পেয়েছে নিষ্ঠুরতা, অভদ্রতা। পেয়েছে খানিকটা দুঃখ-কষ্ট, খানিকটা বেদনা, খানিকটা যাতনা। আর পেয়েছে তাকে ফেলে রেখে অন্য মেয়ের হাত ধরে ভেগে যওয়ার যাতনা। নিজ সন্ত ানকেও একটি বার দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। মাহমুদা এখন আর আগের মাহমুদা নেই। ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি থেকে সে তওবা করেছে। পর্দাকে বানিয়েছে অঙ্গ ভূষণ। এবাদত বন্দেগী তার হৃদয়ের শান্তি। যদিও সে এখন বাঁচার তাগিদে নার্সের চাকুরি করে। কিন্তু অন্যসব নার্সের মত নয়। সে পুরোপুরি পর্দার ভিতর থেকে চাকুরী করার চেষ্টা করে। ডাক্তার মরিয়ম উবায়দীও মাহমুদাকে দ্বীনদারীর উপর চলার পক্ষে সহযোগিতা করেন।

মাহমুদা সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে আলমের কাছে পরিচয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আনুমানিক বিকাল ৪টার দিকে আলমের জ্ঞান ফিরে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন আলম হাসপাতালের বেডে শায়িত। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব পার্শ্বে কেউ নেই। বন্ধুরা আলমকে হাসপাতালে ভর্তি করে অনেক আগেই কেটে পড়েছে। মাহমুদা কিছু পুষ্টিকর খাবার এনে খেতে দিল। আলম তা থেকে সামান্য কিছু

আহার্য গ্রহণ করে বাকিগুলো ফিরিয়ে দিলেন। ডাক্তারের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সবগুলো ঔষধ হাসপাতালে নেই। বেশ কিছু ঔষধ বাহির থেকে কিনে আনতে হবে। মাহমুদা রোগীকে বললো যে, আপনার ঔষধ ক্রয়ের জন্য বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন। সব ঔষধ হাসপাতালে নেই। তাই বাহির থেকে ঔষধ আনতে হবে। সে অর্থ আপনার কাছে আছে কি? মাহমুদার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলম সাহেব অসহায়ের মত কাঁদতে লাগলেন। পরিশেষে কান্নাকে সংবরণ করে অস্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আমি একজন অসহায়! অর্থকড়ি কিছুই নেই।" হাতের আংটিটা দেখিয়ে বলল, "এই আংটিখানা আমার সর্বশেষ পুঁজি। এটা বিক্রি করে আমার জীবন বাঁচান।" এ বলে আংটিখানা খুলে টেবিলে রাখলেন।

মাহমুদা আংটিখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখল এটা তো সেই আংটি যে আংটিটি বিয়ের আগেই ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ নিজের হাত থেকে খুলে আলমকে দিয়েছিল। মাহমুদা কোন এক ঈদের দিনে অভিমান করেছিল সে ঈদ করবে না। মায়ের কাছে বায়না ধরেছিল আংটির। মাতা তার অভিমান ভাংতে গিয়ে খাঁটি সোনা দিয়ে ৪ আনি ওজনের একটি আংটি তৈরি করে দেন। আংটির মধ্যখানে কারুকার্য খচিত M লেখা আছে। মাহমুদার নামের প্রথম অক্ষরটি সে নিজেই চয়ন করেছিল।

মাহমুদা আংটিখানা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি আপনার? না অন্য কারো? উত্তর দিতে গিয়ে আলমের যবান একমত থেমে যায়। কি বলবে না বলবে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্থির করতে পারেনি। খানিকটা কি যেন ভেবে সে উত্তর দেয় এটা আমারই আংটি খুবই প্রিয় আংটি। কয়েকটি ছাগল বিক্রি করে তা তৈরি করেছিলাম। আজ আমার দুর্দিনে তা বন্ধুর মত কাজে আসবে।

মাহমুদা আলমের কথা শুনে মনে মনে ভাবতে লাগল হায়! কত হারামী মৃত্যুর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অনর্গল মিথ্যা বলে যাচ্ছে। এমন সব মিথ্যা যা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। শরীরের এক অংশ অবস কথা অস্পষ্ট। আজরাঈল তার চারিপার্শ্বে ঘুরাফেরা করছে। তারপরও যে অমন করে মিথ্যা বলতে পারে তা মাহমুদার জানার বাইরে। সে মনে মনে ভাবছে সে আর ভালো হবে না আর সংশোধন হবে না। আংটির বিষয় নিয়ে আরো কিছু জানতে প্রশ্ন করল মাহমুদা।

ঃ আপনার আংটির মধ্যখানে কারুকার্য খচিত M লেখা দেখতে পাচ্ছি এ M দ্বারা কিসের সংকেত বহন করছে বলবেন কি?

ঃ (আলম ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে উত্তর দিলেন) "এটা আমার নামের সংকেতই বহন করছে অর্থাৎ আমার নামের শেষে M রয়েছে। তাই নামের শেষের অক্ষরটি চয়ন করেছি।"

ঃ সবাইকে দেখেছি নামের প্রথম অক্ষর বেছে নিয়ে সংক্ষেপ আকারে কিছু বুঝায়। আর আপনাকে দেখছি তার উল্টা।

ঃ হ্যাঁ আমি একটু ব্যতিক্রম।

ঃ প্রথম অক্ষর দিয়ে যদি কোন নামের সংকেত নেয়া হয়, তবে উক্ত M দ্বারা নেয়া যেতে পারে মাহমুদা, মরিয়ম, মনির, মোবারক আরও অনেক।

মাহমুদা নামটি শুনে একটু বিচলিত হয়ে নার্সের দিকে তাকালেন। হায় একি আজব নার্স, আপাদমস্তক বোরকা পরিহিতা, চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু দেখা সম্ভব নয়। হাতে পায়ে মোজা পরা। আলমের চাহনী ব্যর্থ হয়ে নিচে নেমে এল এবং বেরিয়ে এল আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

ঃ আপনার সংসারে স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, পিতা-মাতা আছেন কি? থাকলে তো ওদের সংবাদ পৌঁছানোর দরকার।

ঃ না সংসারে আমার কেউ নেই। ছোটকালেই পিতা-মাতা ইন্তেকাল করেছেন। আমার আম্মা আমাকে ছাড়া কোন সন্তান প্রসব করেননি। বিবাহ করিনি।

ঃ লেখাপড়া করেছেন কি?

ঃ হ্যাঁ বইপুস্তক দেখে দেখে পড়তে পারি তবে কোন ডিগ্রি নিতে পারিনি।

ঃ আপনার পেশা কি?

ঃ আমি একটি হোটেলে ছিলাম বর্তমানে কোন চাকুরি নেই। চাকুরির সন্ধানে এখানে এসেছিলাম।

আলমের মিথ্যা বানোয়াট কথা শুনে মাহমুদার অন্তরে ব্যথা পেল। ভেবেছিল যদি দরদ মিশ্রিত সত্য ও অনুতাপের কোন বাণী আলমের মুখ থেকে বের হয়, তবে অতীতের সবকিছুকে ভুলে গিয়ে পরিচয় দেবে। তারপর যদি সে মাহমুদাকে গ্রহণ করে তবে স্বামীর খেদমত করবে। কিন্তু সে ধরনের কোন আচরণ বা মনোভাব না দেখে পরিচয় দেয়া থেকে একেবারেই বিরত রইল মাহমুদা।

মাহমুদা সবগুলো তিক্ততা হজম করে নিয়ে ইসলাম ও মানবতার চরম পরিচয় দিতে গিয়ে সে নিরলসভাবে আলমের সেবা করতে লাগল। তার দুমাসের বেতনের টাকা দিয়ে বাহির থেকে ঔষধ কিনে এনে দিল। অন্যসব রোগীর চেয়ে বেশি সময় মাহমুদা দিতে লাগল হারামী ও ধোঁকাবাজ স্বামীর পার্শ্বে। ডাক্তার মরিয়ম উবায়দীর নিকটও ঘটনাটা গোপন করেছে মাহমুদা।

দীর্ঘ ৪৫ দিন চিকিৎসার পর ডাক্তারগণ বোর্ড বসে আলোচনা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আলম এর চেয়ে আর ভালো হবে না। শরীরের এক সাইট চিরদিনের জন্য অবশ হয়ে গেছে। তবে বগল লাঠি ব্যবহার করে একটু একটু হাটাচলা করতে পারবে সে। ডাক্তার আলমকে হাসপাতালের বেড ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। ৪৫ দিনে মাহমুদা নিজের তহবিল থেকে আট হাজার টাকা খরচ করেও রোগীকে সুস্থ করতে পারল না। অবশেষে একটি বগল লাঠি উপহার দিয়ে আলমকে বিদায় দিল।

সাতষট্টি

আরিফের আগমন বার্তা মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল এক খিমা থেকে অন্য খিমায়, এক ব্যাংকার থেকে অন্য ব্যাংকারে, আর এক গুহা থেকে অন্য গুহায়। ছুটে এল বড় ছোট অনেকেই। ৭/৮ বৎসরের ছেলেমেয়েরা আরিফের নাম শুনেছে কিন্তু দেখেনি। সকলেই দেখতে এল নবাগত কাফেলা ও মাওলানা আরিফকে।

আরিফের বাহনের রশী টেনে এনেছিল বেদুঈন দুলালী জুলাইখা। অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল যে আরিফ একা আসেনি। সে হয়ত শাদী করে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। এমন কি পিতাও তাই মনে করেছেন। তরুণীরা দলে দলে এসে আফগান প্রথানুযায়ী নববধুকে সাদর সম্ভাষন জানাতে লাগলেন। শাশুড়িও বয়স্কা মহিলারা এসে বধুবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। আরিফ-খিমার বাইরে কি হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারেনি। তিনি ভাবছেন বেদুঈন দেখে হয়ত উল্লাসে মেতে উঠেছে।

তরুণীরা জুলাইখাকে নিয়ে রীতিমত টানাহেচরা আরম্ভ করে দিচ্ছে। কেউ হাত ধরে টেনে বলছে মোদের খিমায় চল। কেউ আঁচল ধরে টেনে বলছে চল আমাদের জীর্ণ কুটিরে। কেউ বলছে এদিকে যেতে, কেউ বলছে ওদিক। কেউবা এসে মস্তক থেকে উড়নি সরিয়ে বলছে "ইসরে এটা মানবীয় নয়, এ যেন ডানাকাটা পরী। আবার কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে এ যেন কল্পপুরীর রাজকুমারী। নানাজনের মন্তব্যে জুলাইখার চেহারায় লজ্জার মলিনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে আদৌ বুঝতে পারেনি কেন তাকে নিয়ে এমনটি হচ্ছে। বেদুঈন মহিলারা গাধার পৃষ্ঠদেশ থেকে ছামানাগুলো নামাচ্ছে। পুরুষেরা নিজ নিজ পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে তাবু তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যুবতী মহিলারা চাকার সাহায্যে গম পিষে রাতের আহারের ব্যবস্থা করছে। কেউ কেউ ছাগল দুহন করে শিশুদের খাদ্যের যোগার করছে। কিন্তু জুলাইখাকে নিয়ে ওদের এত মাথা ব্যথা নেই। ছোট ছোট মেয়েরা শামাদান মুছে তৈল ভরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর এন্তেজাম করছে। জুলাইখা ওদের টানাটানির হেতু বুঝতে না পেরে একটি তাবুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সুফিয়া তাকে লজ্জাবনত অবস্থায় দেখে মিষ্টি ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "আপা! আপনাকে তো অনেক চিন্তিত মনে হচ্ছে তার কারণ কি? অ------গরীব বলে? তাই না?"

জুলাইখার ওষ্ঠ যুগলে মুচকী হাসির রেখা টেনে বলল "আমরা বেদুঈন যাযাবর ও নীচ বংশের সন্তানি। আর আপনারা হচ্ছেন উচ্চ বংশীয় কন্যা, পাঠান সম্প্রদায়ের। আপনাদের সাথে কি অভিমান করা শোভা পায় বোন? আমাদের মাঝে অত দেমাগ নেই।"

সুফিয়া জুলাইখার কথায় লজ্জা পেয়ে বলল, "মাফ চাই, বোন আমি অন্তর থেকে বলিনি। ইসলামে ছোট, বড়, ধনী, গরিবকে দু চোখে দেখে না। সবাই এক সমান। যার আমল যত বেশি সুন্দর হবে সে আল্লাহর নিকট তত বেশি প্রিয়

হবে। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে অভেদ জ্ঞান। এই বলে হাত ধরে নিয়ে গেল তাঁবুতে।

সুফিয়া লজ্জাবনত মস্তকে ছোট্ট একটি সালাম দিয়ে আরিফের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইল। আরিফ উত্তরে বললেন, এখন অনেকটা ভালো। অতঃপর আরিফ তার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন আম্মা! এ মেয়েটি কে? আমার অবস্থা জানতে চাচ্ছে? উত্তর দিলেন, "তুমি কি ওকে চিনতে পারনি? সে তোমার আলীবর্দী চাচার মেয়ে সুফিয়া। বর্তমানে সে তোমার ভাবী।"

ঃ আমার ভাবী!

ঃ হ্যাঁ সে তোমার রফিক ভাইয়ার বউ।

ঃ ভাইয়া বিয়ে করেছেন! কবে আম্মা?

ঃ হ্যাঁ তোমার ভাইয়াকে কদিন আগে বিয়ে করিয়েছি।

ঃভাইয়া এখন কোথায়, দেখছি না যে।

ঃ তোমার ভাইয়া জিহাদের ময়দানে চলে গেছেন।

ঃ জিহাদের ময়দানে? তিনি আবার ট্রেনিং করলেন কবে?

ঃ ওতো দাওরায়ে হাদিস পাশ করে পুরা এক বৎসর ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে। সে অনেক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে, সফল অভিযান। শুনতে শুধু মন চায়। সে আল্লাহর নুসরত আর মদদ পেয়েছে যথেষ্ট। সময় সময় তা শুনবে।" এতটুকু বলে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের মাদ্রাসায় কি জিহাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নেই?

ঃ ব্যবস্থা আছে তবে বাধ্যতামূলক নয়। আমি মাত্র কয়েকদিন ট্রেনিং করেছি। তারপর কষ্ট লাগে বিধায় আর যাইনি। এখনতো হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি অলসতা করা ঠিক হয়নি। এ ভুলের খেসারত দিতে হবে। আল্লাহ আমাকে একটু ভালো করলেই চলে যাব প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কাফির হত্যা করব। ইস কি মজাটাই না হবে।

ঃ যাও বাছা! তোমাকে ছেড়ে দিলাম ভালো হয়ে জিহাদে চলে যাও। সুফিয়া ও জুলাইখা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। মহল্লারই অন্য একজন মহিলা রফিকের আম্মাকে লক্ষ্য করে বলল, "বুবুজান! দুই জালকে কত সুন্দর মানিয়েছে। যেমন দুটি বোন।"

জুলাইখা লজ্জায় তাবু থেকে বেরিয়ে গেল। আরিফের আম্মা এর কোন উত্তর দিতে পারেনি। আরিফ উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল "কি বলছেন চাচীমা? এ আবার বৌ হল কবে? উক্ত মেয়েটির নাম জুলাইখা। বেদুঈন বালা। আমার শয্যা পার্শ্বে সেই ছিল একমাত্র সেবাদাত্রী। মনে হয় জুলাইখার উসিলায় আমি এখনো বেঁচে আছি। তাকে না পেলে হয়ত " আরিফের চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। কান্নাটা একটু সামলিয়ে নিয়ে আবার বললেন, "আম্মা! ওরা যদিও বেদুঈন কিন্তু মুসলমান। ওদের প্রতি মানুষ অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করে। এসব ঠিক নয়। সমস্ত

নবীগণ ছাগল চরিয়েছেন। ছাগল পোষেছেন। ওরাওতো সেই কাজই করে। ওরা অত্যন্ত মেহমান নেওয়াজ। বিনয়ী, ভদ্র ও দয়ালু। মাগো আমি হয়ত আরোগ্য লাভ করে চলে যাব রণাঙ্গনে। তুমি তাকে তোমার হারানো রফিকার মত আদর সোহাগ দিয়ে রাখবে। জুলাইখার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত বেদুঈনরা যত দিন আমাদের সাথে থাকবে, ততদিন যেন মেহমানের মর্যাদা পায়।" আরিফের কথা শুনে সকলের ভ্রম দূর হল। জুলাইখা যে আরিফের স্ত্রী নয় তা বুঝতে পারল। সুফিয়া তাঁবুর আড়াল থেকে বলে উঠল, আরিফ ভাইয়া! তোমার এত চিন্তা করতে হবে না জুলাইখাকে নিয়ে। ওর ব্যাপারে চিন্তা করতে আমাদেরকেও একটু সময় দাও। ওকে আমরা শুধু রফিকার মর্যাদা দেব না,

ঃ ওকে রাজরানীর মর্যাদা দেব, বুঝলে ভাইয়া। রাজরানীর মর্যাদা? এ আবার কেমন?

ঃ একে আমার সাথী বানাব। আমার ছোট্ট একটি অসুস্থ ভাই আছে ওকে দিয়ে শাদী করাব।

ঃ অ তোমার বড় ভাই সুফিয়ানকে বিয়ে করিয়ে ভাবী বানাতে চাও, তাই না ভাবী?

ঃ ওকে ভাবী বানাব না, আমি ওর ভাবী হব। সুফিয়ান এখন আর দুনিয়াতে নেই। পাষণ্ড অক্কা পেয়েছে। ওর পরিবর্তে আমার আর একজন ছোট্ট ভাই আছে। নাম তার হযরত মাওলানা আরিফ আফগানী।

ঃ ভাবী! তুমি বড় দুষ্ট। রোগীর সাথে এমন দুষ্টামি করতে নেই। এসব শুনে জুলাইখা কষ্ট পাবে।

ঃ জুলাইখা কষ্ট পাবে ওতো আমার পার্শ্বেই দাঁড়ানো। আমি তো দেখছি সে খুব খুশি। তার অন্তরে প্রেম সাগরের ঢেউ। তুমি মিছামিছি অন্যের উপর খারাপ ধারণা কর। তুমি ভালো হও তারপর দেখব কে হারে কে জেতে। এবার আমিই জিতব। দেখব নে। সব সময় পুরুষরাই জিতে নেয়, এবার আমি জিতব ইনশা আল্লাহ।

জেনারেল জুলফিকার পাকিস্তানের কিছু কিছু লোহা ব্যবসায়ীর সাথে চুক্তি পত্র করে কুড়ানো লোহাগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। দু-এক দিন পর পর ব্যবসায়ীরা লোহার জন্য আফগানিস্তানে আসে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬শ টাকা দরে লোহা বিক্রি করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এর অর্ধেক অর্থ বেদুঈনসহ সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে পাকিস্তান থেকে কিছু অস্ত্র ক্রয় করেন। জেনারেল সাহেবের এ কৌশল আগে জানা ছিল না। এখন ছোট বড় সবাই লোহা সংগ্রহে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়।

জেনারেল সাহেব বোম থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সবাইকে দিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় সুরক্ষিত ব্যাংকার খনন করেন। এখন সকলের অন্তর থেকে বিমান আক্রমণের ভয় দূর হয়ে যায়। অনেক সময় কিশোরীরা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দোয়া করতে থাকে আয় আল্লাহ! একটি বিমান দে, আয় আল্লাহ!

বোমা ফালা। এভাবে দোয়া করতে থাকে। কোন একটি বিমানের শব্দ পেলে খুশিতে হাততালী দিয়ে নাচতে থাকে। বিমান নিচের দিকে আসলে দৌড়িয়ে গর্তে লুকায়। বোমা ফেলে বিমান চলে গেলে ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। বোমের টুকরাগুলো লাল হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। ওরা টুকরাগুলো সাদা, লাল ও কালো খয়েরী পাথর দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখে। টুকরোগুলো ঠাণ্ডা হলে যার যার চিহ্নিত টুকরোগুলো কুড়িয়ে নেয়। এখন বোম ফেলানোকে অনেক লাভজনক মনে করে। বোমের মধ্যে আফগানিদের রিজিক এর ব্যবস্থা হয়। অনেক সময় আফগানিরা বলাবলি করে যে, বোমের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত রহমত, আর বোমের মধ্যে রয়েছে হালাল রিযিকের ব্যবস্থা।

আরিফ এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন বিছানায়, এখন রোগ আরোগ্যের পথে। ঘুম খানা-পিনা আগের চেয়ে বেড়েছে। একটু একটু করে হাঁটাচলা করতে পারেন। প্রতিটি তাবু ঘুরে ঘুরে সকলের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন।

সুফিয়া শশুরকে বলল, "আব্বা! আমি একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আশা করি আমার আবেদন না মঞ্জুর করবেন না। অতীতেও কোনদিন আবদার করলে ফিরিয়ে দেননি। এবারও এমনই আশা করি।"

সর্দার মুচকি হেসে বললেন "মা!। কোন দিন তুমি কি আবদার করেছ, আর আমি তা পুরা করেছি, এমনতো মনে পড়ে না। আচ্ছা ঠিক আছে কি বলতে চাও বল। আমি তা বিবেচনা করে দেখব।"

ঃ না আব্বা! আপনি মুরুব্বি মানুষ বিবেচনা করার কষ্ট আপনাকে দেব না। বিবেচনার কাজটি আমিই সেরে নিয়েছি। আপনি শুধু অনুমতি দিয়ে আমার প্রস্তাবকে মোবারকবাদ জানাবেন।" সর্দারজী সুফিয়ার সাজানো ঘোচানো কথা শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, আরে পাগলীনি! বলবে তো কি প্রস্তাব দিতে চাও?

সুফিয়া মস্তক অবনত করে আস্তে আস্তে বলল, "আব্বা আপনার আদরের পুত্র আরিফ, মাওলানা পাশ করে দেশে ফিরেছেন। তাকে দেখে শোনে বিবাহ করানো আপনার জিম্মায়। সন্তানের উপর মাতা-পিতার ৩টি হক থেকে দুটি হক আদায় করেছেন। একটি ভূমিষ্ট হলে ৭ম দিনে সুন্দর নাম রাখা আর তাকে সুশিক্ষা দান করা। তাতো আদায় করেছেন। বাকি হল বিবাহের উপযুক্ত হলে বিবাহ দেয়া। এটা এখনো বাকি রয়ে গেছে। তিনি তো এখন পূর্ণ যুবক, বিবাহের পূর্ণ সময় এখনই। তাই বেদুঈন কন্যাকে ছোট ভাইয়ের জন্য ঠিক করেছি। এতে আম্মাও রাজী। মেয়েও হাজারের মধ্যে একজন। কত সুন্দর মানাবে। তারিখটা এখনই জানিয়ে দিলে ভালো হয়।

ঃ দেখ মা! সমাজ কি তা মানবে? একজন অভিজাত গর্বিত ও আলেম ছেলে হয়ে বেদুঈন কন্যাকে গ্রহণ করবে সে? তা কি ভেবে দেখেছ? ওদের মধ্যে নেই দ্বীনদারী, পরহেজগারী, নেই সুশিক্ষা। ওরা এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে পশুপাল

নিয়ে ছুটাছুটি করে। লেখাপড়ার সময় কোথায়? তাই ওরা যুগ যুগ ধরে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে। এ প্রস্তাবটা যেন একেবারেই বেমানান।" সুফিয়া কুরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের মধ্যে যে ভেদাভেদ নেই, এ জিনিসটি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে।

সুফিয়ার পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিল এক ঝাঁক তরুণী, আতিকা, রহিমা, মায়মুনারা। ওরাও এক বাক্যে সুফিয়ার কথা সমর্থন করে বলে উঠল বাহঃ কত সুন্দর প্রস্তাব! মোবারক প্রস্তাব। আমরা সবাই এতে একমত। সর্দারজী নতশীরে মাচায় বসে ভাবছেন। সুফিয়া শশুরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "কি ভাবছেন আব্বা? আমি ওকে হৃদয় উজার করে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেব। আশা করি অল্পদিনেই সে একজন মাওলানা হয়ে যাবে। আমি তার মেধা যাচাই করে দেখেছি, প্রতিভা রয়েছে যথেষ্ট। আমি তা কাজে লাগাব।"

সুফিয়ার সুলালিত কথায় সর্দারজী রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন, আরিফ যদি এতে রাজি হয়, আর ওর মা যদি খুশি থাকে তুমি তাকে নিজ হাতে গড়ে নিতে পার, তবে আপত্তির কিছুই নেই।" এ বলে তিনি বেদুঈন সর্দারকে ডেকে পাঠালেন এবং বিয়ের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা জুড়ে দিলেন। বিদুঈন সর্দার বললেন" জনাব! আপনাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করা আমাদের জন্য হবে শক্ত বেয়াদবি ও বোকামী। আপনারা হলেন শরীফ খান্দানের লোক, আবার ছেলে উচ্চ শিক্ষিত আলেম। এমন প্রস্তাব পাগল ছাড়া উপেক্ষা করতে পারে না। আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে আর একটি যাযাবর পাত্র ছাড়া কোন পাত্র আমরা জুটাতে পারব না। বেশ কয়েকটি প্রস্তাব এ পর্যন্ত আসছে। আমরা ওদের কোন কথা দেইনি। আপনি যদি দয়া করে আপনার ছেলেন জন্য আমার মেয়েকে পছন্দ করে থাকেন, তবে আমি আর কিছু চাই না। মেয়েও আমার চড়া মোহর দাবি করবে না।" জেনারেল সাহেব বললেন, "এখন বর-কনের দিক থেকে মতামত জানা দরকার। সর্দারজী সুফিয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "মা"! বর কনের পক্ষ থেকে কিছু জানতে পেরেছ কি? জানলে বল।" সুফিয়া উত্তরে বলল-

"আব্বাজান! মেয়ের কোন দ্বিমত নেই বরং খুশি। আর ছেলের পক্ষ থেকেও অমতের কোন লক্ষণ পাইনি। তবে এতটুকু বলেছেন যে, "মুরুব্বীগণ যদি একমত হয়ে থাকেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু এতটুকু ভাবছি, আমি তো দু একদিনের মধ্যেই চলে যাব যে, রণাঙ্গনে। ফিরে আসি কিনা কে জানে? এমতাবস্থায় একজন মেয়ের জীবন নিয়ে এমনটি করা কতটুকু ঠিক হবে?

জুলাইখা আরিফের কথাগুলো শুনে বললো যে, "দুনিয়ার জিন্দেগী তো অল্প দিনের। আমি যদি হতে পারি শহীদের স্ত্রী! শহীদের বাঁদী! তবে এর চেয়ে উত্তম চাওয়া পাওয়ার আর কি থাকতে পারে? হয়ত দাম্পত্য জীবনের সুখটুকু পাব না,

কিন্তু পরকালের সুখটুকু তো সবটিই আমার। আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব। আজীবন দিয়ে যাব চরম ধৈর্যের পরিচয়।”

সর্দারজী উভয় পক্ষের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং পরামর্শক্রমে বিয়ের তারিখ ঠিক করে নিলেন। উক্ত বৈঠকেই উমর ফারুক, সাইফুল ও মাহমুদকে বিয়ের হাট বাজার করা ও মেহমানদের মেহমানদারী করার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। মহর হিসেবে ধার্য করেন এক লক্ষ আফগানী মুদ্রা। নির্দিষ্ট সময়ে বিবাহের যবতীয় এন্তেজাম সুসম্পন্ন করে উভয় গোত্রে অলিমার দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিল। তারপর জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে মৌলভী আক্রাম বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পাঠান আর বেদুইনদের মধ্যে আত্মীয়তা এটা একটা নতুন সংবাদ। যা যুগ যুগ ধরে কেউ শুনেনি। ঠোটে ঠোটে একই গুঞ্জন। একই রব। জুলাইখার বিবাহটা উভয় গোত্রের মধ্যে স্থাপিত হল এক সেতু বন্ধন। মিটে গেল হানাহানি ও রেশারেশি।

সুফিয়া তার ছাত্রী ও সখীদের নিয়ে ছোট্ট একটি তাঁবু রচনা করে পত্র পল্লবে সাজিয়ে বাসর ঘর তৈরি করে দিল। আশে পার্শ্বে কোন পুষ্প কানন না থাকায় এক আঁচল বনফুলও সংগ্রহ করতে পারেনি। ওরা তাই নানা প্রজাতির পাত্রেই তাঁবুর শোভা বর্ধন করার চেষ্টা করেছে। সুফিয়া নব দম্পতিকে নিয়ে গেল উক্ত তাঁবুতে। উভয়ে শোকরানা নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন। আয় আল্লাহ আমাদের শুভ পরিণয়কে বরকতময় কর। এ বিবাহকে বানাও নাযাতের উসিলা। আমাদেরকে সুন্নতের উপর চলা আসান করে দাও। দান কর নেক সন্তান, বীর পুরুষ। হে আল্লাহ আমাদেরকে পরহেজগারী ছবর ও ধৈর্যের পোশাক পরিয়ে দাও। আমীন।

আটষট্টি

যৌবনের পাগলা ঘোড়ায় সোওয়ার হয়ে আলম সাহেব অনেক ছুটাছুটি করছিলেন। শরীয়তের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন। এন.জি.ও মহিলা কর্মীদের সাথে যে ধরনের জুলুম অত্যাচার ও ইজ্জত হরণ করেছিলেন তা পশুজগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কুকুরকেও হার মানিয়েছিল। তার অপকর্মের জন্য শয়তানও লজ্জা পেত।

শত নারীদের কণ্ঠচিড়ে বেরিয়ে আসা আহঃ শব্দ, সতিত্ব হরণে বেদনা ভরা কুমারী বোনের চাপা দীর্ঘশ্বাস, পাশবিক অত্যাচারে কাপিয়ে উঠা ললানাদের আত্ম চিৎকারে, আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। আল্লাহ মজলুমের ফরিয়াদ ফিরিয়ে দেন না।। পাপিষ্ট আলমের জীবদ্দশায়ই মানুষকে দেখিয়ে দিলেন আল্লাহর শাস্তি। সে এখন দুটি বগল লাঠিকে পুঁজি করে হাসপাতালের

ফটকের পার্শ্বে দেবদারু বৃক্ষমূলে বসে জনে জনে হাত পেতে ভিক্ষা চায়। আলমের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে।

"এক পয়সা গার কুই বান্দা দান করে-
এক বদলে মে উসকু দশ মিলে।"

অর্থাৎ, একটি পয়সা যদি কোন বান্দা দান করে, তবে তাকে এর বদলে দশটি পয়সা দানের সওয়াব দেয়া হয়। কখনো জিকির, কখনো দুরুদ তার মুখে শোনা যায়। আলমকে কখনো হাসপাতালের প্রধান ফটকের পার্শ্বে আবার কখনো হাসপাতালের অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে বসতে দেখা যায়।

জনবহুল বা ব্যস্ততম সড়কের মোড়ে বসার কারণে অনেকেই আলমকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আলমের পরিণতি দেখে অনেকেই খুশি ও প্রশান্তির নিশ্বাস ফেলল। মানুষ দেখলেই হাত প্রসারণ পূর্বক গাইতে থাকে "সাল্লাল্লা অয়ালা মোহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু অয়ালা হুসাল্লাম-----তার ভণ্ডামী দুরুদ পড়া শোনে অনেকেই ভৎর্সনা করে আলমকে সাল্লাল্লা স্টেডার্সের মালিক বলে ডাকে।

মানুষ যখন গুনাহকে গুনাহ হিসেবে মনে না করে, তখন তার তওবা নসীব হয় না। কোন ফাসেক যদি গুনাহ করার পর মনে করে যে, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। তাহলে কোন না কোন সময় তার তওবা নসীব হতেও পারে।

গুনাহ সাধারণত দু প্রকার ১। হক্কুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর হক, যথা-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত । ২। হক্কুল ইবাদ। অর্থাৎ বান্দার হক্ক। যথা-কারো অর্থ সম্পদ নষ্ট করা। আমানতের খিয়ানত করা। তুহমত অপবাদ দেয়া। কারো গীবত বলা। অন্যায়ভাবে গালি দেয়া, আঘাত দেয়া। অথবা ঝগড়া করা। কাউকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

তওবাকারীর জন্য করণীয় হলঃ ১। গুনাহকে গুনাহ মনে করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ২। দৃঢ়তার সাথে অঙ্গিকার করা যে, আমি আর গুনাহ করব না। ৩। আল্লাহর হক আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া আর বান্দার হক বান্দার কাছে মাফ চাওয়া। ৪। আল্লাহর হক কাযা করা আর বান্দার হক আদায় যোগ্য হলে আদায় করা তা না হলে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এভাবে তওবা করলে আল্লাহ অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

আমার মনে হয় জিহাদ তরক করা উভয় প্রকার গুনাহ। কেননা কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আল্লাহর হুকুম। সে হিসেবে জিহাদ তরক করলে হক্কুল্লাহ, আল্লাহর হক নষ্ট করা হল। আর হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার অর্থ হল জিহাদ করলে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় তাই জিহাদ তরক করার কারণে বৃদ্ধ নারী শিশুসহ সকল মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা থাকে না, এমনকি ইসলামের সমস্ত শাখা প্রশাখা অচল হয়ে পড়ে। এর দ্বারা সবাই কষ্ট

করতে থাকে। অতএব আমার মতে জিহাদ তরক করলে হক্কুল্লাহও হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার গুনাহ হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন)
আয় আল্লাহ আমার ধারণা ভুল হলে ক্ষমা করে দিন।

মিস্টার আলম সাহেব ছিলেন কমিউনিস্টদের দোসর। এন.জি.ওতে চাকুরি করে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন। সব ধরনের গুনাহ নিজে করতেন এবং অন্যদেরকেও করার জন্য বাধ্য করতেন। তিনি উভয় প্রকার গুনাহে গুনাহগার। তাই তওবা করার প্রয়োজনও মনে করেননি। বর্তমানে তিনি জিকির আর দুরুদকে ব্যবসার মূলধন বানিয়ে ভিক্ষা করেন। অর্থাৎ তিনি হলেন সাল্লাল্লাহ স্টেডার্সের মালিক।

মাহমুদা প্রতিদিন সকালে একমাত্র কলিজার টুকরা, নয়ন মণি সাত বৎসরের সামসুন্নাহারকে নিজ হাতে গোসল করিয়ে, শরীরে তৈল মেখে, কুকড়ানো কৃষ্ণ চুলগুলোকে সুন্দরভাবে আচড়িয়ে, সুন্দর জামা কাপড় ও জুতা-মুজা পরিয়ে বই পুস্ত ক ও খাতা কলম ব্যাগে ভরে হাত ধরে প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যায়। আবার ক্লাশ শেষে নিজেই নিয়ে আসে। বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব পায়ে হেঁটে মাত্র দু থেকে তিন মিনিটের পথ। স্কুলে আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই আলমকে দেখা যায় রাস্তার পার্শ্বে বসে সাল্লাল্লার সুর টেনে ভিক্ষা করতে। মাহমুদা আসা যাওয়ার পথে প্রতিদিনই দু-চার টাকা আলমকে ভিক্ষা দেয়। আবার মাঝে মাঝে সামসুন্নাহারের টিফিন বক্সে দু-চারটি রুটি বেশি ঢুকিয়ে দেয়। আলমের কাছে এসে সামসুন্নাহারকে বলে আম্মু তোমার বক্স থেকে দু একটি রুটি ভিক্ষুককে দাও। আবার কখনো দু-তিনটি টাকা হাতে দিয়ে বলে "মা" টাকা কয়টা ভিক্ষুককে দিয়ে আস। সামসুন্নাহার তা নিয়ে ভিক্ষুকের হাতে দেয়।

আলম একসাথে এতগুলো টাকা কোনদিন কারো কাছে পায় না। তাই প্রতিদিনই মহিলার আগমনের পথ পানে তাকিয়ে থাকেন মিস্টার আলম। এক দিন সামসুন্নাহার পড়ার ফাঁকে মায়ের গলা ধরে জিজ্ঞেস করল "আম্মু ! আদনান ভাইয়া ও সুপ্তি আপুর তো (ডাক্তারের ছেলেমেয়ে) আব্বু আছে। দেখছ না কত আদর করে। আমার আব্বু কি নেই? আমার আব্বু কই? আমার আব্বুকে এনে দাও না।" মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে মাহমুদার যবান থেমে গেল। চোখ সাগরে বান ডেকেছে, ঝরছে আঁখি জল। মাহমুদার কয়েক ফুটা অশ্রু সামসুন্নাহারের গণ্ডদ্বয় সিক্ত করল। মাহমুদা নীরব।

সামসুন্নাহার মায়ের গলায় ঝাকি দিয়ে আবার একই প্রশ্ন করল। এবারও মাহমুদা নীরব। সামসুন্নাহার বার বার পিড়াপিড়ি করার কারণে মাহমুদা উড়নার আঁচলে অশ্রু মুছে নিয়ে বলল। আম্মু! তোমার আব্বু----।"

এতটুকু বলার পর মাহমুদা আর বলতে পারলো না কিছু। সামসুন্নাহার নাচড় বান্দি। উত্তর আদায় করেই ছাড়বে। নিরুপায় হয়ে কান্না সামলিয়ে মেয়েকে

মিছামিছি বোঝানোর চেষ্টা করছে। মেয়েকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, মামণি তোমার আব্বু তোমাকে ছোট্ট রেখে দূর দেশে গিয়েছেন। এখনো ফিরে আসেনি।”

ঃ কবে আসবেন তিনি?

ঃ জানি না কবে সে আসেন।

ঃ আব্বু বাড়ি আসলে আমার জন্য কামিজ, সেলোয়ার ও জুতা মোজা নিয়ে আসবেন। না আম্মি?

ঃ কেন আমি কি তোমাকে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় দেইনি?

ঃ এগুলো তো সব পুরান হয়ে গেছে। আব্বু এর চেয়ে কত সুন্দর কাপড় নিয়ে আসবেন, দেখবে ক্ষণে।

ঃ হ্যাঁ আনবে, এখন পড় মামণি!

ঃ আমি তো সব পড়া শিখে ফেলেছি। আব্বু আমার আরও অনেক কিছু আনবেন। ঠিক না আম্মু?

ঃ তুমি কিন্তু পড়া ছেড়ে আজে বাজে কথা বলছিস। পড়া ইয়াদ না হলে কাল কিন্তু বুঝবি। পড় মা পড়।” সামসুন্নাহার একটু চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করল ঃ রাস্তার পার্শ্বে যে সাল্লাল্লা লোকটি পয়সা চায়, তাকে তুমি পয়সা দাও কেন আম্মি?

ঃ ওবেটা দেখছ না হাঁটতে পারে না, কাজ কামও করতে পারে না। তাই পয়সা ও খাবার দিচ্ছি। এতে অনেক ছোয়াব হবে। যে কোন ভিক্ষুককে পয়সা দিলে আল্লাহ খুশি হন, তাই সব সময় ভিক্ষুককে পয়সা দিতে হয়। এখনই বই নিয়ে বস মা। না হয় কিন্তু---------সামসুন্নাহার আবার পড়তে বসল।

মাহমুদার কাজের চাপ থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সামসুন্নাহারকে স্কুলে পাঠায়। একদিন মাহমুদা স্কুলে যেতে পারেনি। সামসুন্নাহার তার সহপাঠিদের সাথে বাসায় ফিরছে। ভিক্ষুকের নিকট এসে থেমে গেল সামসুন্নাহার। সুর ধরে দুরুদ পড়ে আলম ভিক্ষা চাচ্ছেন। সুর ধরে দুরুদ পড়াকে সামসুন্নাহারের নিকট ভালো লাগে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরুদ পড়া শুনছে। সামসুন্নাহার সেদিন টিফিন করেনি। ভিক্ষুককে সবকয়টি রুটি ও হালুয়া দিয়েছিল। ভিক্ষুক পেট ভরে আহার করে সামসুন্নাহারকে কাছে ডাকলেন। সামসুন্নাহার কাছে আসলে তিনি তাকে আদর করে জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি?

ঃ আমার নাম সামসুন্নাহার।

ঃ কোন ক্লাশে পড়?

ঃ আমি ক্লাশ থ্রিতে পড়ি।

ঃ তোমার আব্বুর নাম কি?

ঃ সামসুন্নাহার একটু চুপ থেকে উত্তর দেয় আমার আব্বুর নাম আব্বু।

ঃ তোমার আব্বু কি করেন?

ঃ আমার আব্বু বিদেশ থাকেন। আমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ও নতুন নতুন জামা কাপড় ও জুতা-মুজা আরও কত জিনিস আনবেন।

ঃ তোমার আম্মুর নাম কি?

ঃ আম্মুর নাম মাহমুদা। তিনি হাসপাতালের সেবিকা।

মাহমুদার নাম শুনে আলমের শিরা-উপশিরার স্পন্দন অনেকটা বেড়ে গেল। মাহমুদাকে এক নজর দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি?

কৃষ্ণবর্ণের আঁখি দুটি ছাড়া দেখার সাধ্য আছে কার? মহিলাকে জিজ্ঞাসা করাতো ঠিক হবে না। কে আবার কি মনে করে বসে? কিন্তু গোপন-গোপনই রয়ে গেল। পরিচয় নেয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে।

সামসুন্নাহার বাড়ি ফিরে এক এক করে মায়ের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। মেয়ের কথা শুনে মাহমুদার অন্তরে আবার বিরহ অনল জ্বলে উঠল। সে ভাবছে হায়রে হতভাগা! নিজের মেয়ের কাছে নিজেরই পরিচয় জানত চাইল। আহ! কি করুণ ইতিহাস মাহমুদার কণ্ঠচিরে বেরিয়ে আসল গানের কলি----

তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়
দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়।

উনসত্তর

পৃথিবী এমন কোন নেশাগ্রস্থকে দেখেনি যে নেশার কারণে যৌবনের উন্মাদনার তিমির পেরিয়ে অন্য পথে সফর করেছে। এমন কোন নও জোয়ানকে দেখেনি। যে তার পরমা সুন্দরীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে।

পৃথিবী একমাত্র দেখেছে ঐসব মর্দে মুজাহিদ হানজালাদের, যারা ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য নিজেরা পরমা সুন্দরীকে পশ্চাতে রেখে জান আর মাল নিয়ে খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে খেলা করতে। লাশের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে রুপালি দন্তপাটি প্রকাশ করে খিলখিল করে হাসতে। পৃথিবী একমাত্র অবলোকন করেছে ঐসব মর্দে মুজাহিদদের, যারা দুনিয়ার ভালোবাসাকে পদাঘাত করে অর্থ ও নারীর লোভকে পরাভূত করে, আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে, নিজকে আল্লাহর রাস্তায় সপে দিতে। তাদেরই একজন মর্দে মুজাহিদ মাওলানা আরিফ। দাম্পত্য জীবনের মধুর রজনীগুলো পশ্চাতে রেখে পাকিস্তানের চমন সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেলেন মাওলানা সামিউল হক্কের কাছে। সেখান থেকে জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসবেন মাতৃভূমি আফগানিস্তানে। লড়াই করে রাশিয়ানদের বিতাড়িত করে আফগানিস্তানে কায়েম করবেন খোদার রাজ।

আরিফ বিদায়ের প্রাক্কালে আর একটি বার জুলাইখাকে দেখে নেয়ার জন্য খিমায় প্রবেশ করলেন। সুফিয়া তড়িৎ গতিতে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে খিমার ঝুলন্ত পর্দাটি ফেলে দিয়ে তস্তপদে সরে আসল। আরিফ সুফিয়ার চালাকী বুঝতে

পেরে না হেসে পারল না। পর্দা টেনে নিরবে আলাপ করার সুযোগ করে দিল সুফিয়া। আরিফ জুলাইখাকে আলিঙ্গন করে আঁখিযুগলে বসিয়ে দিলেন ভালোবাসার কয়েকটি চুমু। জুলাইখা প্রাণ ভরে তা উপভোগ করল। এ যেন অপূর্ব ভালোবাসার আখেরী নির্যাস। জুলাইখাও তার ঋণ পরিশোধ করতে বা প্রতিদান দিতে কোন দিকে কসুর করেনি।

আরিফ জুলাইখাকে কাছে টেনে এনে বসিয়ে বললেন, "তোমার সাথে আমার মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়। আমি তোমাকে কাছে পেয়ে আপন ভোলা হয়ে গেছি। তোমার অনুপম দেহবল্লীরী সব সময় আমার কাছে পেতে চায়। তোমার দর্শনে আমার ক্ষুদ-পিপাসা নিবারণ হয়। তোমার পরশে ক্লান্তি দূর হয়। তোমার বাঁকা চোখের চাহনী আর ওষ্ঠযুগলের হাসির রেখা বারবারই অবলোকন করতে মন চায়। তোমার নরম হাতের স্পর্শে চোখ ছেয়ে ঘুম আসে। সত্যিই তুমি আমার জন্য আল্লাহর এক নেয়ামত। তুমিও তোমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে আমাকে বরণ করে নিয়েছ। সত্যিই তুমি এক সৌভাগ্যশালীনী ও অপূর্ব সুন্দরী বেদুঈন বালা।" তিনি আরো বলেন-
"জুলাইখা! তোমার আমার মিলন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আর দুজনের জুদায়ীও একমাত্র আল্লাহর জন্য।

যে মহাসত্তা তোমাকে আমাকে প্রেম সাগরের ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছে। সে সত্ত্বা তোমার আমার হৃদয়ে ভালোবাসার নদী বহিয়েছে। সে সত্ত্বার আহ্বানে তার একটি ফরয বিধান পালন করণার্থে তোমার তুলতুলে নরম বিছানাকে শূন্য করতে চাচ্ছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে তোমার ভালোবাসা নেহায়াত নগণ্য। তাই তোমাকে কিছু দিনের জন্য আল্লাহর হাওলা করে অজানার পথে পাড়ি জমাচ্ছি। কষ্ট হলেও তা মেনে নেয়া তোমার জন্য কর্তব্য। হয়ত বিজয়ী বেশে তোমার বুকে আবার ফিরে আসব, আর না হয় শাহাদাতের অমৃত শুধা পান করে নেয়ামত প্রাপ্তদের দলভুক্ত হব। এমনটি যদি হয় তবে পরকালে সাক্ষাত হবে। আর যদি স্বামীর আদর-সোহাগ পেতে চাও, তবে আমার পরমা শ্রদ্ধেয় বড় ভাই রফিককে বিয়ে করে পরম সুখে দিন যাপন করো।" বিদায় লগ্নে তিনি আরও কয়টি উপদেশ দিয়ে গেলেন, "হে আমার প্রাণ প্রিয় জুলাইখা! দুনিয়ার জিন্দেগী একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর আখেরাতের জীবনের শেষ নেই। কাজেই দুনিয়ার প্রতি মন দিও না। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হলে শিখতে হবে ইলমে দ্বীন। তুমি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া ভাবীর কাছে ইলমে দ্বীন শিখবে। তোমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও শশুর-শাশুড়ির খেদমত করবে। পর্দা আল্লাহর ফরয বিধান, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। হালাল-হারাম ও পাক-নাপাকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এ এলাকায় মুজাহিদ আসলে ওদের খানা

পাকাবে। ময়লাযুক্ত কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা), বিবি খাদিজা (রা) ও উম্মে জিয়াদ (রা) মত জিহাদ করবে। এটাই আমার আখেরী নসিহত।"

জুলাইখা প্রতিপার্শ্বে বসে কথাগুলো শুনছিল এবং অশ্রুতে জামা ভিজাচ্ছিল। স্বামীর কথার ইতি টানলে সে বলল, "হে আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী! আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন আপনার প্রতিটি হুকুম গুরুত্বের সাথে ও ইখলাসের পোশাকে আচ্ছাদিত করে পালন করতে পানি। স্বামী গো বিয়ের মেহেদীর রংটুকু মুছতে না মুছতেই আপনাকে হারাতে বসেছি। আজীবন আমি তোমার আগমন পথ পানে চেয়ে থাকব। দোয়া করি আল্লাহ যেন বিজয়ী বেশে তোমাকে আমার কোলে ফিরিয়ে আনেন।" এই বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল জুলাইখা। আরিফ যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে খিমার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আঙ্গিনায় সবাইকে বিদায় সালাম জানিয়ে ও পিতা-মাতার পায়ে চুমু খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। মা কিছু আহায্য ভর্তি পুটলী নিয়ে আরিফের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "আরিফ! ক্ষিধা পেলে রাস্তায় এগুলো খেয়ে নিস। সতর্ক অবস্থায় পথ চলিস। তোর ভাইয়ার সাথে দেখা হলে আমার সালাম দিস। মাঝে মধ্যে পত্র লিখে কৌশল বিনিময় করিস। খোদা হাফেজ।" সকলেই অপলক নেত্রে আরিফের বিদায় পথে তাকিয়ে রইল। আরিফ কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেলেন।

অবঃ জেনারেল জুলফিকার সাহেব তিন দিনের সময় নিয়ে চলে গেলেন দূর অজানায়। উক্ত সফরের উদ্দেশ্য ছিল মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাত ও সলাপরামর্শ করে নিজ নিজ এলাকায় জিহাদের কাজকে জোরদার করা। তিনি বেশ কিছু স্থানে ঘুরে ঘুরে জানতে পারলেন আরগুনে মুজাহিদদের তৎপরতার কথা। তাই অতি কষ্টে পৌঁছলেন আরগুনে। সেখানে কমান্ডার আঃ রহমান ফারুকীর সাথে সাক্ষাত করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার, তামিম আদনানী, খালেদ জুবায়ের, আমজাদ বেলাল ও মনযুর হাসানসহ আরো অনেক।

আঃ রহমান ফারুকীর নাম শুনেনি এমন মুজাহিদ খুব কমই আছে। তাঁর আখলাক দেখলে সাহাবী (রা) আয়মাঈনদের কথা মনে পড়ে। জুলফিকার সাহেব নিজ এলাকার পরিস্থিতি আলোচনা করলে, ফারুকী সাহেব তিনজন মুজাহিদকে ট্যাংক বিধ্বংসী, শক্তিশালী মাইন ও বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান দিয়ে বলেন, "জনাব জেনারেল সাহেব! আমার এখানে মুজাহিদের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের সম্মুখে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার গ্রুপের মুজাহিদ মাত্র ৯০ জন। অস্ত্রের দিক দিয়েও আমরা নেহায়াত দুর্বল। এ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই বিশাল শক্তির সাথে লড়তে হচ্ছে। তা না হয় ১০/১২ জন মুজাহিদ আপনাকে দেয়া যেত। ফারুকী সাহেবের কথা শুনে জেনারেল সাহেব বললেন "২৫ হাজার বিশাল বাহিনীর সাথে মাত্র ৮৭ জন মুজাহিদ নিয়ে কিভাবে

লড়াই করবেন?" উত্তরে আব্দুর রহমান ফারুকী সাহেব বললেন, "আমরা অস্ত্র ও জনবল নিয়ে জিহাদ করি না, আমাদের প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আর আমরা যতই দুর্বল হই না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। জিহাদ আল্লাহর হুকুম, তা পালন করতেই হবে। আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের রব বড়ই শক্তিশালী। তিনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। আমরা পদে পদে আল্লাহর নুসরত পাচ্ছি। আল্লাহ সব সময় দুর্বলের সাথে থাকেন। দুর্বলরা সাধারণত মাজলুমই হয়ে থাকে। আর সবলরা হয়ে থাকে জালেম। তাই আল্লাহ থাকেন মজলুমের পক্ষে। আমাদের সামনে নবী নেই। সাহাবাদের মত ঈমান ও আমল নেই। সব দিক দিয়েই আমরা অসহায় ও দুর্বল। ও সে হিসেবে আল্লাহর নুসরতের হকদার আমরা। তাই আল্লাহপাক আমাদেরকে প্রচুর নুসরত করছেন।" আব্দুর রহমান ফারুকী সাহেবের কথা শুনে জেনারেল সাহেবের ঈমান অনেকটা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর তিনজন মুজাহিদ ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যে কোন পথে চলা যায় না, তাই পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা দুর্গম পথে চলতে হয়। কুঁচিশীলা আর লতা-গুল্মের প্রতিকন্ধকতা মাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া দুর্সাধ্য। এভাবে পথ চলছে আল্লাহর পথের ৩ মুজাহিদ। লাগাতার দুদিন এক রাত পথ চলার পর, ঘুম ও ক্ষুধা-পিপাসায় কাঁতর হয়ে এক পাহাড় উপত্যকায়, ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে বিশ্রাম নেয়ার জন্য গ্রাউনশীট বিছিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এদের মধ্যে একজন পাহারাদারীর কাজ করছিলেন। ঘুমের তীব্রতায় কখন যে তাকে কুপোকাত করে দিল তা টের পায়নি। সকলেই ছিলেন ঘুমে অচেতন।

অপর পাহাড়ের চূড়ায় ছিল রাশিয়ান ফৌজের ছাউনি। ওরা দূরবীনের সাহায্যে এ ক্ষুদ্র কাফেলার সন্ধান পেয়ে ভারী অস্ত্র দিয়ে ১০-১২ জনের একটি গ্রুপ পাঠিয়ে দিল। ওরা অতি সন্তপর্নে পাহাড় থেকে নেমে আসতে লাগল।

মুজাহিদরা বিভোর ঘুমে অচেতন, কেউ জেগে নেই। এমন সময় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে এসে ঘুমন্ত লোকগুলোকে কামড়িয়ে জাগিয়ে দিল। ওরা অতিষ্ট হয়ে শয্যা ছেড়ে বসে গেলেন। এমন সময় একজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন দুশমন অতি নিকটে এসে গেছে। একে অপরকে চোখের ইশারায় বিপদের কথা অবগত করালেন। সকলেই নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে দুশমনের দিকে ফায়ার আরম্ভ করে দিলেন। উভয় পক্ষে চলল গুলি বিনিময়। এক পর্যায়ে মুজাহিদ আসগরের কণ্ঠচিরে বেরিয়ে এল কালেমা শাহাদাতের বাণী। লুটিয়ে পড়লেন পাহাড় উপত্যকায়। অপর দিকে ১২ জন দুশমনও লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ের গা বেয়ে নিম্ন দেশে। পর্ব শৃংগের দুশমনরা মুজাহিদদের ভয়ে নেমে গেল পাহাড়ের অপর দিকে। কিন্তু একটি ফায়ার করার সাহসও পেল না। মুজাহিদগণ কি করবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না।

আসগর তপ্ত খুনে স্নান করে শান্ত হয়ে গেলেন চির দিনের জন্য। মুখে তার মুচকি হাসির রেখা ফুটে আছে। তিন জনে লাশটির জানাযা পড়ে গণিমতের অস্ত্রগুলো নিয়ে আবার হাটতে লাগলেন। তারা বন্য প্রাণীর মত কত না জানা বৃক্ষের পত্র পল্লব ভক্ষন করে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ঝর্নার প্রবাহিত পানিই ছিল একমাত্র সুপেয় পানিয়। এভাবে অতি কষ্টে প্রায় এক সপ্তাহ হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে রমাল্লা নগরীর অদূরে পর্বত বেষ্টিত আশ্রয় শিবিরে এসে হাজির হলেন।

পল্লীর ছোট বড় সকলেই তাদের আগমনকে জানালেন খোশ আমদেদ। যুবতীরা তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করলেন। সকলেই খানা খেয়ে একটি খিমায় বিশ্রামে গেলেন।

সত্তর

আরিফ চড়াই উৎরাই, মাঠ-ঘাট, বন-বাদার পেরিয়ে চমন সীমান্ত দিয়ে কোয়েটা গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে খোলা হয়েছিল মুজাহিদদের দপ্তর। পুরো কোয়েটা জুড়ে বসবাস করছিল আফগান সরণার্থী। অলিতে-গলিতে ছিল আফগানদের অগণিত দোকান-পাঠ। দেখলে মনে হয় এটা যেন আফগানেরই একটি অংশ। সেখানে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। আরিফ ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করে মুজাহিদ দপ্তরে আশ্রয় নেন। দুদিন কেটে গেল মুজাহিদ দপ্তরে।

তৃতীয় দিবসে মুজাহিদদের এক জরুরি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং তার মন্ত্রিপরিষদের বেশ কজন মন্ত্রী ও জেনারেলগণ। তাছাড়া ছিলেন বড় বড় আলেম ও পীর মাশায়েখগণ। আর মুজাহিদদের মধ্যে ছিলেন মাওঃ জালালুদ্দিন হক্কানী, পীর মোহাম্মদ রুহানী, বুরহানুদ্দীন রাব্বানী, হেকমতিয়ার, ক্বারী সাইফুল্লাহ আক্তার লেংড়িয়াল, আব্দুল কাইয়ুম, আব্দুর রহমান ফারুকী, মনযুর হাসান, বদর ইসলাম ও আরো অনেকে।

উক্ত কনফারেন্সে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মত বিনিময়ের মধ্যদিয়ে আফগানিস্তানের যুদ্ধকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন। এরাও প্রায় দু বছর আগে যে যুদ্ধ চলছিল, সেটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদ বলে মেনে নিতে পারেন নি। এদের মধ্যে ছিল অনেকটা মতবেধ। এবার আর কারো পক্ষে এটাতে জিহাদ না বলার অবকাশ রইল না। উক্ত কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেব সামরিক সহযোগিতা ও সরণার্থীদের আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

পাকিস্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের মত এমন ধার্মিক ও খোদা ভীরু প্রেসিডেন্ট আর হননি। তিনি ছিলেন মুসলমানদের পরম বন্ধু। আলেম উলামাগণ ছিলেন তার শ্রদ্ধার পাত্র তো অনেকেই মনে করেন। জিয়াউল হক সাহেব আঁড়াল থেকে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা যদি না হত

তবে আফগান জিহাদ এতটুকু এগিয়ে যেতে পারত না। একমাত্র তার মাধ্যমেই অস্ত্রের চালান আসত আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ থেকে। তখন থেকেই আমেরিকা জিয়াউল হক সাহেবকে টারগেটে নিয়ে আসে। ওরা ভাবছে এ সিংহ পুরুষটি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আমাদের মোড়ল গিরি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমরা আবার মুসলমানদের টেক্স দিয়ে থাকতে হবে। সে দিন থেকেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবকে মারার জন্য আমেরিকা ও ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে দেয়। খরচ করতে থাকে কোটি কোটি মার্কিন ডলার। শেষ পর্যন্ত তাদের মিশন কামিয়াব হয়। আয় আল্লাহ মুসলমানদের পরম বন্ধু প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবকে উচ্চ মাকাম দান কর। আমীন।

উক্ত কনফারেন্সের পর থেকে পাকিস্তানের খাদ্য ভাণ্ডার ও অস্ত্রের গোডাউন আফগান মুজাহিদদের জন্য খুলে দেয়া হয়। এদিকে উলামায়ে কেরামগণও আফগান জিহাদের পক্ষে বয়ান ওয়াজ-নসিহত করতে লাগলেন। মাওলানা রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী। জাস্টিজ তকী, উসমানী, সামিউল হক, আবদুল হক, মুফতী আহামাদুর রহমান। মাসউদ আযহার, আবদুল্লাহ দরখাস্তি ও হাকিম আখতার সাহেব প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীন চারিদিক থেকে আর্থিক সহযোগিতাসহ মুজাহিদ তাশকিলের কাজ ব্যাপকভাবে আনজাম দিতে লাগলেন। তাছাড়া দোয়া পরামর্শ দিতে লাগলেন। তখন থেকেই সারা আফগানিস্তানের পাহাড়-কন্দরে মুজাহিদরা ছড়িয়ে পড়লেন। পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, আরব দেশগুলো সহ আফ্রিকা, চেচনিয়া, বসনিয়া থেকে নিয়ে বহু দেশের তরুণরা আফগান জিহাদে শরিক হতে লাগল। এভাবে সরকারি সমর্থন ছাড়াই যুবকরা নিজ দেশ থেকে পালিয়ে আসতে লাগল আফগান মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে ও দ্বীনের হেফাজত করতে। কোথাও জিহাদ সংঘটিত হলে, তাদের সাহায্যে জান-মাল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া শুধু মানবতার দাবি নয়, এটা ঈমানেরও দাবি। পৃথীবীর সমস্ত মুসলিম দেশগুলো থেকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য প্রেরণ করা আল্লাহর নির্দেশ।

দেওবন্দ দারুল উলুম ও পাকিস্তানের প্রতিটি মাদ্রাসায় আফগান জিহাদের নীরব দামামা বেজে উঠল। যুবকরা প্রতিটি বন্ধের মধ্যে জিহাদের তাশকিল করে, উৎসাহ দিয়ে, গোরাবা তহবিল থেকে ছাত্রদের যাতায়াত ও খানা খরচ দিয়ে পাঠাতে লাগলেন। তবে সব মাদ্রাসাই দু একজন ওস্তাদ এমন ছিলেন যে, তারা জিহাদের কথা শুনলে তাদের অন্তরে আগুন ধরে যেত। এরা শুধু তালিমকে প্রাধান্য দিতেন। এরা জিহাদকে শরীয়তের ফরয বিধান থেকে বাদ দিয়েছিলেন। যারাই জিহাদের বিরোধিতা করছিলেন তাদের থেকে ছাত্রদের নজর নেমে গেল। এক সময় ওদের মুখ দেখাবার জায়গাটুকু ছিল না। জিহাদের বিরোধিতা একমাত্র মুনাফিক যারা, তারাই করতে পারে। সমাজে ওরা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হলেন। তাছাড়া শিয়া, ক্বাদিয়ানী ও খোমেনী বিপ্লবে বিশ্বাসী একটি দল তারাও জিহাদের বিরোধিতা

করছিল। পরবর্তীতে যখন মুজাহিদের বিজয় দুনিয়াবাসী দেখছিল তখন খোমেনী-পন্থি ইসলামী দলের দাবিদাররা, পরামর্শ করে কিছু কিছু যুবককে আফগানিস্তানের প্রেরণ করেন। ওরা প্রকৃত পক্ষে জিহাদের জন্য মুজাহিদদের সাথে থাকেনি। তাদের মতলব ছিল খারাপ। মুজাহিদরা যুদ্ধ করতে করতে বিজয় উল্লাসে সামনে এগিয়ে যেত, আর ওরা গণিমতের অস্ত্র লুট করত। বিজয় নিশান উড়িয়ে ছবি তুলত আর ভিডিও করত। ওদের নেতারা ঐসব ছবি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আরব দেশগুলো সফর করে বলতেন, আমার ছেলেরা আফগানিস্তানে জিহাদ করতেছে। তাদের রসদপত্রের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। এভাবে নেতাজিরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার রিয়াল আর দিনার নিয়ে দেশে ফিরছেন। এভাবে আফগান জিহাদকে ওরা মার্কেটে রূপান্তর করেছিলেন। এরা জাতীয় মুনাফিক মার্কা মুসলমান। তাদের মুখে বলে ইসলামের কথা, আর অন্তরে লালন করে আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র মতবাদ। ওদের দাড়ি খাটো, টুপি থাকে পকেটে, পরনে থাকে পেন্ট আর গায়ে সেন্টু গেঞ্জি ও ডান্ডিকাটা পাঞ্জাবী। পেন্ট পরে মাটি ছুঁয়া। গণতন্ত্র দলগুলোর মধ্যে এরাই সবচেয়ে জঘন্য।

আরিফ বেলুচিস্তানের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিতে লাগলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে বহু সংখ্যক অস্ত্র চালানো শিখে ফেলেন। কমান্ডার তার আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে আর্টিলারিতে নিয়ে যান। সেখানে তাকে আরো ৬ মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ একজন মুজাহিদ বানিয়ে তার সাথে ২০ জন মুজাহিদ অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে আফগানিস্তান প্রেরণ করেন।

তিনি শোলাং পাশ গিরিপথ দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। সীমান্ত পেরিয়ে কাফেলা উত্তর পশ্চিমের দিকে চলল। সামীন্ত থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এক অনুচ্চ টিলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে দুশমনের ফায়ারে তিনজন সাথী লাশ হয়ে ধরাতলে লুটিয়ে পড়ল। কেড়ে নিল তাজা তিনটি প্রাণ। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি। বাকিরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে মুয়ানেকা করলেন যমিনের সাথে। আশ্রয় নিলেন প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে।

আরিফ গুলি ছুড়ার হুকুম দেন নি অন্যদেরকে। অনেকেই বক্ষদেশে অস্ত্র ঠেকায়ে হুকুমের অপেক্ষা করছিলেন। আরিফ ভাবছিলেন দশ বার জনের ওপর আক্রমণ করা কাপুরুষতা ছাড়া কিছু নয়। আক্রমণ যদি করতেই হয় তবে করব তাদের ঘাঁটিতে। জাহান্নামী হবে শত শত। অল্প সংখ্যকের ওপর গুলি চালালে কয়েকজনই মরবে। বাকিরা সতর্ক হয়ে যাবে। তাই তিনি গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেন নি। সবাই পজিশন নিয়ে প্রস্তুত।

দুশমনে ইসলাম গুলি ছুড়ছে ছুড়তে পিছু হটে গেল। পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ওপারে উঠে গেল। আরিফ সাথীদেরকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। সবাই

ক্রলিং করে একত্রে জমা হলেন। তিনি চুপি চুপি বললেন, "বন্ধুরা! আমাদের যাত্রা অত্যন্ত মোবারক। আমাদের তিনজন সাথী আমাদের আগেই জান্নাতে আশ্রয় নিয়েছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক তাঁদের রক্তকেই কবুল করেছেন। আমরাও চাই দ্বীনের পথে আমাদের জান কুরবান করতে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।"

তিনি আরো বলেন, "আপনাদের সামনের পথ কন্টকাকির্ণ। প্রতিটি কদমে কদমে দিতে হবে পরীক্ষা। তোমরা হীনবল হয়ো না। মনে হয় দুশমনরা পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাইন বিছিয়ে রেখেছে। অতএব আমাদের চলতে হবে সাবধানে।" এই বলে তিনি ৩ জন মাইন বিশেষজ্ঞকে মাইন চেক করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাকিরা ক্রলিং করে তাদের পিছনে চলতে লাগল।

ছয়শ' মিটার পথ চলতে ৬৩ টি মাইন উদ্ধার করা হয়। অতঃপর কাফেলা সন্ধ্যার খানিক পরে, পাহাড়ের বিপরীত দিক দিয়ে চূড়ার সন্নিকটে এসে বিশ্রাম নেয় এবং পরামর্শ করেন ক্যাম্প আক্রমণের। মাওলানা আরিফের সমসাময়িক কমান্ডার সাবাস গুল বললেন, "আমরা আক্রমণ করব এতে সন্দেহ নেই। তবে একটু জরিপ করে নেয়া দরকার। আমাদের গোলা-বারুদ পর্যাপ্ত নয়। কাজেই অল্প খরচে সামান্য মেহনতে যেন কার্যোদ্ধার করতে পারি, তা চিন্তা করতে হবে।"

সাবাস গুলের কথায় আরিফও একমত হলেন এবং তিনজনকে জরিপ করার নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া, সতর্কতা অবলম্বনের জন্য খুব কড়া হুঁশিয়ারী জানালেন। তিনজন অতি কষ্টে সাবধানতার সাথে, প্রায় দুঘণ্টা ব্যাপী জরিপ করে আরিফের নিকট রিপোর্ট পেশ করলেন। আক্রমণের নকশা তৈরি করে তা বুঝিয়ে দিলেন। আরিফ নক্সা হাতে নিয়ে বললেন, যে, প্রথমে পাহারাদার চৌকিতে আক্রমণ করতে হবে, তারপর ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি মুর্চায় গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলি ছোঁড়তে হবে।

পরামর্শঅনুযায়ী ক্ষুদ্র মুজাহিদ গ্রুপটি, গগনবিধারি তাকবীর ধ্বনি দিয়ে, একযোগে ৪ টি পাহারা চৌকিতে আক্রমণ করে বসল। এককে চৌকিতে ৪ জন করে পাহারা দার ছিল। প্রথম আক্রমণেই চৌকিগুলো মুজাহিদের দখলে চলে এলো। বার জন পাহারাদার নিহত হলো আর ৪ জন আত্মসমর্পণ করলো। মুজাহিদগণ এদেরকে বন্দি করে ফেলেন।

রুশী জেনারেল মিস্টার ফার্নিডোর ভাবল যে, আমাদের সুরক্ষিত ঘাঁটির ভিতর ঢুকে যাওয়া এত সহজ ব্যাপার ছিল না। চারিদিকে শত শত মাইন বিছিয়ে অনেক ব্যাংকার খনন করে আমরা দুর্গ তৈরি করেছি। মুজাহিদরা সবগুলো বাধা আর প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে আমাদের সবগুলো চৌকি দখল করে ঢুকে পড়েছে কেল্লার ভিতর। এরা সামান্য শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেনি, এদের সাথে মোকাবেলা করে

কিছুই করা যাবে না। এত দুঃসাহস না দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। তাই আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। সকলেই খালি হাতগুলো আকাশের দিকে উচিয়ে ধরে, উচ্চ শব্দে রুশী ভাষায় শান্তি শান্তি বলতে লাগলেন।

কমান্ডার আরিফ পাহাড়ের এক শৃংগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, "হে রাশিয়ান সৈনিকরা! তোমরা আস্তে আস্তে সামনে অগ্রসর হও এবং পেরেড গ্রাউন্ডে এসে সমবেত হও। সাবধান কোন অস্ত্র যেন সাথে না আনা হয়। আর জেনারেটর অপারেটর সৈনিকটিকে বললেন, "সব কয়টি লাইট জ্বালিয়ে দিবালোকের মত আলোকিত করে দাও। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবে।" ঘোষণার সাথে সাথে শত শত বাল্ব এক যোগে জ্বলে উঠল এবং পুরা এলাকা দিবসে পরিণত হয়ে গেল।

ঘোষণা অনুযায়ী সৈন্যরা দলে দলে পেরেট গ্রাউন্ডে এসে সমবেত হল। মুজাহিদগণ এক এক করে ৬০ জন সৈন্যকে বন্দি করলেন। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত হল। সবগুলোর নিয়ন্ত্রণ ভার মুজাহিদরা হাতে নিলেন। উক্ত হামলায় মুজাহিদরা গণিমত হিসেবে পেলেন ৩টি থ্রি নাট থ্রি রাইফেল ৪টি S.K.S চিনাই রাইফেল A.K.47 ক্লাশিনকভ ৬৪ টি R.P.D মেশিনগান ১টি P.K মেশিনগান ১টি গ্রেনাফ খফিফ মেশিনগান ১টি R.R.42 রকেট ১টি R.P.G একটি। তাছাড়া গ্রেনেড, ডিনামাইট, গোলা-বারুদ ও ওয়ারলেছ সহ বেশ কিছু।

মুজাহিদগণের নিকট যেসব গণিমত আসছে এর মধ্যে বেশ কয়টি অস্ত্র তাদের জন্য একদম নতুন। চালানো তো দূরের কথা নামই জানতেন না। আরিফ রুশী জেনারেল মিস্টার ফার্নিডোরকে বললো "এ কয়টি অস্ত্রের নাম, কার্যকর ক্ষমতা ও চালানো পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দেন।" মিস্টার ফার্নিডোর আরিফের কথা শুনে হেসে বললেন, "তোমরা কি এগুলোর প্রশিক্ষণ নাও নি?" আরিফ বললেন না। অতঃপর নতুন নতুন অস্ত্র চালানো শিক্ষা দিলেন। জেনারেল ফার্নিডোর জিজ্ঞাসা করলেন," তোমাদের অন্য সব মুজাহিরা কোথায়? যারা পাহাড়ের চারিদিক থেকে তাকবীর দিয়েছিলেন? "আরিফ বললেন, আমরা ২০ জন ছিলাম, ৩ জন শহীদ হয়ে গেছেন। বর্তমানে আমরা সতের জন জীবিত আছি।" জেনারেল বললেন, "হাজার হাজার কণ্ঠের তাকবীর ধ্বনী শুনে আমরা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করেছি। যদি ১৭ জন জানতাম তবে তো যুদ্ধ চালিয়ে যেতাম। তাহলে কি আমরা ভুল শুনেছি? আরিফ বলল, "আসমানের ফেরেশতারাও আমাদের তাকবীরে শরীক ছিলেন। যার ফলে তাকবীর ধ্বনি এত বুলন্দ হয়েছে।"

পরদিন আরিফ সকল রাশিয়ান সৈন্যকে একত্রিত করে বললেন, "তোমরা একটি স্বাধীন দেশে প্রবেশ করে আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছ। নিরাপরাধ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছ। মসজিদ মাদরাসার ভবনগুলো ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছ। বাড়ি-গাড়ি জ্বালিয়ে ভস্ম

করে দিয়েছ। অতএব তোমরা জালেম। আমরা তোমাদের হত্যা করে মনের জ্বালা মেটাব।"

আরিফের কথা শুনে একজন সৈন্য বলে উঠল, "স্যার! আপনি যা বলেছেন তা সত্য। তবে আমার একটি কথা শুনুন, সরকার আমাদেরকে জোরপূর্বক পাঠিয়েছেন। তাছাড়া আপনাদের সরকার আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন। আমাদের ১৫ দিনের ট্রেনিং দিয়ে এদেশে পাঠাচ্ছে। আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী। আমরা কোন নিয়মিত,সৈন্য নই।" সৈন্যটির কথা শুনে ওর নিকট জানতে চাইলেন, এদের মধ্যে এ ধরনের কত জন আছে? সৈন্যটি হাতের ইশারায় ৩ জনকে দেখিয়ে বললেন, "এরা আসল সৈনিক। আর বাকি সব ব্যবসায়ী, ছাত্র ও চাষীর ছেলে।"

আরিফ বললেন, "যাও বাবারা, এখন থেকে তোমরা আযাদ। নিজ নিজ দেশে ফিরে যাও।" আরিফের অমায়িক ব্যবহার দেখে ওরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর একজন বলেন "আমরা দেশে ফিরে গেলে আবার পাঠিয়ে দেবে। তাই আপনাদের সাথেই থাকার ইচ্ছা করি, যদি আপনার অনুমতি পাই। আরিফ সবাইকে থাকার জন্য অনুমতি দিলেন। বাকি তিনজনকে এক ফায়ারে হত্যা করে দেন। অতঃপর উক্ত ঘাটি থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন।

একাত্তর

পরদিন সকাল ১০টায় একটি চোরা বিমান এসে, অনেক ওপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল। মহল্লার লোকজন নিয়ে দুজন মুজাহিদ পাহাড় বেষ্টিত চত্তরে ট্রেনিং করাচ্ছিলেন। সুফিয়া সকালের নাস্তা সেরে মেয়েদেরকে তালিম দিচ্ছিল ১টি গুহার অভ্যন্তরে।

চোরা বিমানটি বেশ কয়েকবার চক্কর দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ কমান্ডার সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমাদের মাথার উপর দিয়ে যে, বিমানটি চক্কর দিচ্ছিল এটা আমাদের জন্য অশুভ লক্ষণ। এটা বিমান হামলার ইংগিত বহন করছে। হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমভিং আরম্ভ হতে পারে। আপনারা বাইরে ঘোরা-ফেরা না করে মুর্চায় মুর্চায় আশ্রয় নেন। পশুপালগুলো যথাসম্ভব ব্যাংকারে ব্যাংকারে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।" কমান্ডার বেলাল এ নির্দেশ দিয়ে কয়েকটি পুরাতন তাঁবু ও পলিথিন নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় দুজনকে বলে দিলেন যে, তাঁবুগুলোর রশি কেটে সব একত্রে জমা করার জন্য। একটি তাবুও যেন দাঁড়ানো না থাকে।

কমান্ডার বেলাল পাহাড়ের ওপারে গিয়ে এলোমেলোভাবে ৫/৭ টি তাঁবু রচনা করে ফিরে এলেন ঘাঁটিতে। অতঃপর সবাইকে নির্দেশ দিলেন ব্যাংকার ও গুহায় আত্মগোপন করতে। কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে অনেকেই ব্যাংকারে আশ্রয় নিচ্ছে।

কেউ কেউ পশুপাল সামলাতে না পেরে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই হল বেদুঈন।

বেলা ১২টা বাজার এখনো ১০ মিনিট বাকি। কালো রংয়ের বিমান এসে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বিমান ছুটাছুটির আওয়াজে অনেকেই মনে করেছে এই বুঝি কেয়ামত সংঘটিত হচ্ছে। কয়েক মিনিট ছুটাছুটির পর আরম্ভ হল একের পর এক বোমাবর্ষণ। বোমাগুলো যেখানেই পতিত হয়, সেখানেই গর্তে পরিণত হয়। প্রথমে বোমভিং হচ্ছিল কমান্ডার বেলালের রচিত পরিত্যক্ত খিমাগুলোতে। এক পর্যায়ে বোমভিং এর পরিধি আরো বৃদ্ধি করল। যার ফলে উক্ত ঘাঁটি ও আশ পার্শ্বের এলাকা বোমভিং এর আওতায় এসে যায়। বোমভিং আরম্ভ হলে, দুটি বোম পশুপালের উপর পতিত হয়। এতে কয়েকশ ছাগল ভেড়া প্রাণ হারায়। বেদুঈন সর্দার ও পল্লী সর্দার যে ব্যাংকারে আশ্রয় নিয়েছিলেন সে ব্যাংকারসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকার ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। উভয় সর্দারসহ বেশ কজনের প্রাণ কেড়ে নিল।

সুফিয়া ৪/৫ জন তরুণীকে নিয়ে যে গুহায় আশ্রয় নিচ্ছিল এবং পবিত্র কুরআনের তালিম দিচ্ছিল সে গুহাটি ছিল খুবই মজবুত ও দুর্বেধ্য। তাই এটাসহ আরো কতগুলো ব্যাংকার ও গুহা অক্ষত অবস্থায় রয়েগেল। সুফিয়া এ ধ্বংসলীলা সহজে মেনে নিতে পারল না। সে সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, “তোমরা সকলেই সেজদায় পড়ে দোয়া করতে থাক। আর কেয়ামত হলেও গুহা ত্যাগ করবে না।” এই বলে আতিকাকে সংগে নিয়ে একটি হালকা মেশিনগান ও বেশ কিছু গুলিসহ বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। অতি কষ্টে ও সন্তর্পনে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। অতি কষ্টে মাঝারি ধরনের একটি শৃংগে সুবিধাজনক স্থানে মেশিনগান স্থাপন করে বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমানগুলো ডিগবাজী খেয়ে বোমভিং করছিল।

সুফিয়া আল্লাহর নাম ইয়াদ করে একের পর এক ফায়ার করতে লাগল। চারিদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধুঁয়ার ভিতর থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল আগুনের লেলিহান। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য অনেকেই দেখেনি। আর দেখলে অকাল জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। সুফিয়া ফায়ারে ফায়ারে বিমান নামাতে লাগল। একাধারে ৪ ঘণ্টা বোমভিং হচ্ছিল এর মধ্যে ১২ টি বিমান একই সাথে বাজপাখির মত ভুপতিত করল। এর আগে এতগুলো বিমান একসাথে মারতে পারেনি। ভূপাতিত বিমান গুলোর মধ্যে ছিল, গানশীপ হেলিকপ্টার ২টি 29 টি বোমভিং ফাইটার ২টি , A. 16 বোমভিং ফাইটার ৩টি E, D 130 বোমভিং ফাইটার ২টি, E. 52 বোমভিং ফাইটার ১টি, আফাচি হেলিকপ্টার ২টি।

বিকাল ৪টার দিকে বোমভিং ফাইটারগুলো উজবেকিস্থানের দিকে উড়ে যেতে দেখলেন। উক্ত বিমান বহর থেকে, মুজাহিদরা আরো ৪টি বিমান ভূপতিত করার

সংবাদ পেয়েছে। আতিকা গুলির আঘাতে আগুন ধরে বিমানগুলো পতিত হওয়ার দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দিত হল। তার আনন্দ রাখার জায়গা নেই।

বিমান বহর চলে গেলে সুফিয়া ও আতিকা পাহাড় থেকে নেমে এসে ধ্বংশলীলা অবলোকন করছে। ওদেরকে দেখে কিছু .কিছু লোক সাহসে ভর করে বেরুতে লাগল। অনেক লাশ কিছু চেনার কোন উপায় ছিল না। কারণ লাশগুলো টুকরা টুকরা হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। আর অন্যান্য লাশগুলো বিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তালাশ করে দেখা গেল, কারো পিতা নেই, কারো মাতা নেই। কেউ হারিয়েছে তার স্বামীকে আবার কেউ হারিয়েছে তার আদরের সন্ত ানকে। বেদুঈনসর্দার ওয়াক্কাছ পল্লী সর্দার ইয়ার মোহাম্মদ আফগানী অবঃ জেনারেল জুলফিকার সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শাহাদাত বরণ করেন।

রাশিয়ান সৈন্যরা ভেবেছিল এখানেই মুজাহিদদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। বোমভিং এর সাথে সাথে বেশ কিছু রকেটও ছুড়ছে ওরা। এর মধ্যে R.P.G.7 রকেট, S.P.G.9 রকেট এবং R.R.75 রকেটও আছে। ওসব রকেট প্রতিরোধ করার মত কোন অস্ত্র মুজাহিদদের কাছে ছিল না। তাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি। আবার অন্য কোন দিকে তাকালে দেখা যায় মুজাহিদদের তুলনায় রাশিয়ানদের ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি। যেমন-৩৬ ডজন পাইলট, ১২টি ফাইটার বিমান, তাছাড়া কোটি কোটি ডলারের গোলাবারুদ। ওদের এ যুদ্ধকে বলা যায় মশার সাথে কামান নিয়ে যুদ্ধ। এখানে মাত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২/৩জন লোক। সবাইতো ছিলেন সাধারণ জনগণ। এটাকে চূড়ান্ত বিজয় বললে মোটেই ভুল হবে না। সুফিয়া নিজেই শোকর আদায় করতে গিয়ে বলল যে, "ফাইটারগুলো ভূপতিত করার পিছনে আমার কোন কৃতীত্ব নেই, কে যেন মেশিনগানের বেরেলটি ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। কোন ঐশ্বী শক্তি যেন কাজ করছিল। এটা নিশ্চয়ই মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য।

জীবিত লোকজন লাশগুলোকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হল। কার কে নেই। এ হিসেবে একটি জরিপ করা হল। এ ধ্বংসলীলা দেখে অনেকেই ভয় পেল। এখানে পুরুষের সংখ্যা ছিল কম। কারণ যুবকরা তো প্রশিক্ষণের জন্য আগেই চলে গিয়েছিল। বড়দের মধ্যে প্রায় সবাই শহীদ হয়ে গেছে তাই নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। তবে বেদুঈনের মধ্যে বেশ কজন যুবক রয়েছে।

কমান্ডার বেলাল সবাইকে একত্রে বললেন, "ভাইসব! দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই বরং আমরা গর্বিত কারণ, আজ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন তাঁরা সবাই বর্তমানে জান্নাতে আছেন। আমরাও যেন তাঁদের পথের পথিক হতে পারি সে জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করব।"

শোহাদাতের লাশগুলো খুবই সম্মানিত তাই সম্মান প্রদর্শন করতেই হবে। এ বলে লাশগুলো বিভিন্ন ব্যাংকারের নিকট রেখে জানাযা পড়ে দাফন করে দেয়।

এত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির পরও কোন কণ্ঠ থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়নি। আগেই বলা হয়েছে যে, আফগানিরা এমন জাতি, তারা লাশের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে হাসে। কাপুরুষের মত বিছানায় মৃত্যুবরণ তারা করাকে খুব লজ্জাজনক মনে করে। তাদের মধ্যে কারো স্বামী , ভাই বা ছেলে যদি ঘরে শুয়ে মারা যায় তবে তারা রাস্তায় বেরুতে বা অন্যের নিকট চেহারা দেখাতে লজ্জা বোধ করে। আর যদি শহীদ হয় তবে লোকজন ডেকে বিরাট মেহমানদারী করে। আজ তাদের চেহারায় শুধু ভয়ের মলিনতার ছাপাই ফুটে উঠেছে।

কমান্ডার বেলাল তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে এবং সামনে বিপাদাশংকা মনে করে বললেন "আমি বুঝতে পরছি আপনারা খুবই শংকিত। তবে আফগানিস্তানের এক ইঞ্চি জায়গাও নিরাপদ মনে করবেন না। সবখানেই আক্রমণ আসতে পারে। এখানে থাকা আর নিরাপদ মনে করি না। দুশমনরা এ স্থানকে তামা করে দেবে। কারণ এত শক্ত মাইর তারা অন্য কোথাও খায়নি। তাই আমার পরামর্শ হল আপনারা যেখানে নিরাপদ মনে করেন সেখানে চলে যেতে পারেন। লোকজনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এরা এমন হুকুমের প্রতীক্ষায় ছিল। বেদুঈনরা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অন্য দিকে চলে গেল। পল্লীবাসী পাঠানরাও পাহাড় বেষ্টিত স্থান ত্যাগ করে পল্লীর পথ ধরল। বেঁচে থাকা পশুপালগুলো তাড়িয়ে নিল।

সুফিয়া ও তার চার পাঁচজন ছাত্রীকে আপনজনদের সাথে চলে যেতে নির্দেশ দিল। তরুণীরা সবাই চলে গেল। কিন্তু জুলাইখা ও আতিকা সুফিয়ার সংঘ ত্যাগ না করে তার সাথেই রয়ে গেলেন। আতিকা বলল, মরি-বাঁচি এক সাথেই থাকব। এক মন এক চিন্তা ও এক ফিকির নিয়ে ৩জন এক সাথে রয়ে গেল।

বাহাত্তর

সকলেই চলে যাওয়ার পর কমান্ডার বেলাল তার সহযোদ্ধা ইকবালকে নিয়ে সবগুলো ব্যাংকার মুর্চা ও গুহাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সুফিয়াদের গুহার সম্মুখে দাঁড়াতেই মানুষের ফিস ফিস শব্দ কানে এল। কমান্ডার বেলাল সহজেই বুঝতে পারলেন এ গুহায় মানুষ রয়েছে। তিনি ভাবছিলেন, হয়ত সবাই চলে গেছেন। আর কোন মানুষ নেই। বেলাল উচ্চ আওয়াজে বললেন, "ওহে গুহাবাসী! তোমরা কারা? এখনো গুহা ত্যাগ করনি কেন? তোমাদের পরিচয় দাও।"

সুফিয়াও ভাবছিল সবাই চলে গেছে। কেউ আর নেই, তাই ওদের সাথে আলাপ আলোচনা করছিল। কমান্ডার বেলালের ডাক শুনে সবাই নীরব হয়ে গেল। বেলাল আবার ডেকে বললেন, তোমরা কারা? গুহা থেকে বেরিয়ে আস, তা নাহলে গ্যাস ছাড়া হবে।' বেলারের কণ্ঠ সকলের কাছেই ছিল অপরিচিত। সম্মুখে যাওয়া ঠিক হবে না। মনে করে আতিকাকে পাঠিয়ে বলে দিল যে, তুমি গুহার মুখে গিয়ে বলে আস, আমরা অবলা নারী, আমাদের আশ্রয়স্থল নেই বিধায় এখানেই রয়ে

গেছি। আপনারা এখান থেকে চলে যান।” আতিকা চাইনিজ রাইফেলটি হাতে নিয়ে গুহার মুখে এসে বলল আপনারা কে তার পরিচয় তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দেব। কমান্ডার বেলাল নারী কণ্ঠ শুনে আড় চোখে গুহায় প্রবেশ পথে তাকালেন। এরই মধ্যে চার চোখের মিলন ঘটে গেল। যদিও চোখ পড়ার কারণে উভয়ে দৃষ্টি নিচে নামিয়ে আনছে কিন্তু এতে সবাইর বেগ পেতে হচ্ছে।

আতিকা মনে মনে ভাবছে, “হায়! এমন টগবগে যুবক সুঠাম তার দেহ শক্তিশালী সুন্দর সুপুরুষ তো আর কোনদিন দেখিনি। কেমন মায়ের আদরের দুলাল সে, তা কে জানে? কোন রাজপুরীতে লালিত পালিত হয়েছে তা কে বলবে? সে যে কত ভাগ্যবান, কত যে সুভাগ্যশালী। জীবনের মায়া ত্যাগ করে অস্ত্র কাধে রাখতে এ বয়সেই বেরিয়ে আসছে রনাঙ্গণে আতিকা এসব ভাবতে ভাবতে আর একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে দেখল। এবারও চার চোখ এক সাথে মিলিত হল।

বেলাল মনে মনে ভাবছেন, শুনেছি পাহাড়-কন্দরে গুহায় পরী ও দৈত্য দানবরা নাকি লুকিয়ে থাকে। আজ বোধ হয় এমনটি ঘটে গেল। তা না হয় অপূর্ব গিরী গুহায় কোত্থেকে এলো! কি সুন্দর তার অবয়ভ! কি চমৎকার তার টানা টানা দু চোখের চাহনী! এত সুন্দর মানুষ আছে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

কমান্ডার বেলাল খুবই সুন্দর সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপামণি! আপনারা কয়জন এখানে বসবাস করছেন? আপনাদের সাথে কোন পুরুষ লোক আছে কিনা?” উত্তরে আতিকা বলল,“না ভাইজান আমাদের নিকট কোন পুরুষ লোক নেই, আমরা মাত্র তিনজন মহিলা। আমরা সবাই একসাথে বাকি জীবন কাটানোর চেষ্টা করছি।”

বেলাল আমরাও দ্বীনের মুজাহিদ, আল্লাহর সৈনিক। আমাদের কাজ হচ্ছে মা- বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা। বঞ্চিতদের অধিকার আদায় করা, নির্যাতন বন্ধ করা, সন্তানহারা জননীর আর্তনাদ ও বিধবা নারীর চিৎকার বন্ধ করা। তাদের মুখে মলিন হাসি ফুটানো, মানব রচিত বিধান পদদলিত করা, কুরআন হাদিসের আইন বাস্তবায়ন করা। আফগানিস্তানকে শত্রু মুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যই শপথ নিয়েছি এবং জীবন বাজি রেখে জিহাদ করে যাচ্ছি। কাজেই তোমাদেরকে বিপন্না অবস্থায় রেখে আমরা কোথাও যেতে পারি না। তোমাদেরকে যে কোন আশ্রয়ে রেখে যেতে পারলে দিল শান্ত হবে।”

ঃ ভাইজান! আমাদের জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য আল্লাহ হাত পা দিয়েছেন, জান, মাল দিয়েছেন। জান, মালের হেফাজতের জন্য জিহাদের সাধ্যানুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। প্রয়োজনীয় অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি। কোন বেঈমান বা পাপিষ্ট আমাদের ইজ্জত

লুণ্ঠন করা তো দূরের কথা, চোখ তুলে তাকানোর সাহসও পাবে না। কাজেই আপনারা আপনাদের কাজে চলে যান। আমরা আমাদের চিন্তা নিয়ে থাকি।

ঃ বাহ! তুমি তো অত্যন্ত বুদ্ধিমতি মেয়ে। যেমন চেহারা তেমন স্বাস্থ্য ও দুর্দান্ত সাহসী। তোমাকে জানাই অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা আপা! আপনার নামটি কি বলবেন?

ঃ আমার নাম আতিকা, গ্রাম পশ্চিম রামাল্লা। আমি পিতা-মাতার আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত। কদিন আগে মহল্লায় বোমভিং এ যে কজন শহীদ হয়েছেন, তার মধ্যে আমার পিতা-মাতাও শামিল। ভাই সরোয়ার বাগরাম শহরে বিদ্যুৎ অফিসে চাকুরি করেন। বর্তমানে বেঁচে আছেন কি না তা জানি না। আমি আই এ পাশ করে মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পবিত্র কুরআন হাদিসের এলেম হাসিল করেছি। এটাই আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আপনার পরিচয়টা জানাবেন কি?

ঃ আপনি সুন্দর পরিচয় দিয়ে আমাকে খুশি করেছেন, তাই জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার পরিচয় হলো, মানুষ আমাকে বেলাল হিসাবে ডাকেও চেনে। বাড়ি জামখুলা, জাতিতে পশতুন। পিতা-মাতা ৬মাস আগে শাহাদাত বরণ করেছেন। দাওরায়ে হাদিস পাশ করে একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতাম। জাতির এ ক্লান্তিলগ্নে পবিত্র কুরআন আমাকে অধ্যাপনা থেকে টেনে এনেছে জিহাদের ময়দানে। আজীবন জিহাদ করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরো বললেন, “আতিকা! আমার একটি প্রস্তাব হল তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট চলে যাও। আমরা তোমায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব।

ঃ আমি পুরুষকে আর কোনদিন বিশ্বাস করব না। পুরুষেরা নারীদেরকে উপভোগের সামগ্রী হিসেবে মনে করে। কাজেই একা একা থাকব। একা চলব এবং একাই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাব।

ঃ আতিকা! যুদ্ধ করতে হলে একজন আমীরের দরকার হয়। আমীরের নির্দেশ মেনে কাজ করে মারা গেলে সে শহীদ হবে। আর যদি আমীরের নির্দেশ না মানে, তবে তার সব এবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। কাজেই তোমরা কোন আমীরের এজাজত নিয়ে কাজ কর, তাহলে সোয়াব পাবে।

ঃ কেন আমরা কি আমীর ছাড়া আছি? আমাদের আমীর বা কমান্ডার হলেন সুফিয়া আপা। আমরাও তার কমান্ড মেনে চলি।

ঃ সুফিয়া তোমাদের কমান্ডার ? তিনি বর্তমানে কোথায়?

ঃ গুহাভ্যন্তরে। তার সাথে জুলাইখাও রয়েছে। আমরা তিনজনই এখানে আছি। বাকি জীবন একসাথে থাকব।

ঃ যদি স্বামীর তত্বাবধানে চলে যাও তবে-----------?

ঃ সেটা পরে দেখা যাবে।

ঃ তোমাদের কি বিয়ে হয়েছে?

ঃ সুফিয়া আপার বিয়ে হয়েছে মাওলানা রফিকের সাথে আর জুলাইখার বিয়ে হয়েছে তারই ছোট ভাই মাওঃ আরিফের সাথে। ওদের স্বামী সবাই মুজাহিদ। তারা দূর দেশে জিহাদ করছেন।

ঃ তাহলে তুমিই একা তাই না? (আতিকা নীরব) তুমি কি কোন মুজাহিদকে বিয়ে করবে?

ঃ আমার মত বেহুদা মেয়েকে কে গ্রহণ করবে? পিতা-মাতা নেই। বাড়ি-ঘর নেই। কে দুঃখীনির বোঝা ঘাড়ে নেবে? আর আমিই বা কার বোঝা হয়ে থাকব? আতিকার বিলম্বের কারণ জানার জন্য সুফিয়া বিড়ালের মত চুপি চুপি পা ফেলে তার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে, তাদের কথোপকথন শুনছিল। সুফিয়ার আগমনের কথা কেউ টের পায়নি।

ঃ আতিকা! আমি নিজেই তোমার প্রার্থী হয়ে প্রস্তাব দিচ্ছি। অবহেলা ও ঘৃণা না করে যদি আমাকে তোমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চাও, তবে তোমার কমান্ডার সুফিয়ার সাথে পরামর্শ কর। আতিকার কণ্ঠচিরে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘশ্বাস। অতঃপর বেলালের প্রস্তাবে সম্মত জানিয়ে বলল, আপা যদি রাজি হন তবে আমিও এতে একমত। দেখি তিনি কি বলেন। এ বলে কয়েক কদম পিছিয়ে দেখে সুফিয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মান। আতিকা লজ্জাবনত কণ্ঠে বলল আপা! আপনি এখানেই?

ঃ হ্যাঁ তোদের বিয়ের আলাপে অংশ নিতে এসেছি।" এ বলে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, সবাই মিলে পরামর্শ করে বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। জুলাইখা বললো আমাদের কপালে এমনটিই লেখা রয়েছে। স্বামীরা বিয়ে করে রণাঙ্গনে চলে যাবে। আর আমরা পর্বত গুহায় বসে তাদের জন্য কাৎরাব।

তার কথা শুনে সুফিয়া আরো বলল আমাদের স্বামীরাতো আমাদের আশ্রয়ে রেখে গেছেন। নিরাশ্রয়ে রেখে যায়নি। বর্তমান অবস্থা তারা জানেন না। যদি জানতেন তবে আমাদের হেফাজতে অবশ্যই ছুটে আসতেন।

অতঃপর ৫০ হাজার আফগানী মুদ্রা মহর হিসেবে দিয়ে সুফিয়া, জুলাইখা ও বেলালের সহযুদ্ধা আমজাদের সম্মুখে বিয়ের কাজ সমাধা হল। গণীমতের অর্থ থেকেই মহরের টাকা পরিশোধ করলেন। এখানে বেশী সময় অবস্থান করা সমিচিন নয় বিধায় যুদ্ধের সরাঞ্জামাদী ঘুটিয়ে নিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ করলেন। পরামর্শের এক পর্যায়ে মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে কমান্ডার বেলাল বললেন, "আপনারাও আমাদের সাথে চলেন। আমি রফিক ও আরিফ ভাইয়ের সন্ধান নেব। যে কোন গ্রুপেই থাকুক না কেন খোঁজে অবশ্যই পাব।" এতে সবাই একমত হয়ে পথ ধরল। একটানা তিনদিন হেঁটে মাওলানা

জালালুদ্দীন হক্কানী সাহেবের আশ্রয় শিবিরে এসে হাজির হলেন। সেখানে মহিলাদের থাকা খাওয়া ও পর্দা পুশিদার সুব্যবস্থা রয়েছে। সুফিয়া জুলাইখাকে নিয়ে মহিলাঙ্গনে চলে গেল। আতিকাও এদের সাথে, তবে আতিকা বেলালের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারে। মাওলানা রফিক ছিলেন উক্ত স্বরনার্থী শিবিরের জিম্মাদার। সেখানে তার ছদ্দনাম ছিল জামাল জঙ্গি। মাওলানা রফিক নামে তাকে কেউ চিনতো না, কিন্তু জামাল জঙ্গি হিসেবেই সবাই চিনতো।

কমান্ডার বেলাল ছিলেন আঃ রহমান ফারুকী সাহেবের শিষ্য। আর মাওলানা রফিক ছিলেন জালালুদ্দিন হক্কানী সাহেবের গ্রুপের উচ্চ পর্যায়ের কমান্ডার। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও নিচের মুজাহিদরা অনেকেই চিনতেন না। শুধু নাম শুনেছেন। এতটুকু দূরত্বের কারণে মাওলানা রফিককে চিনতে পারেননি। তাছাড়া জামাল জঙ্গি একজন উচ্চ পর্যায়ের কমান্ডার, আর বেলাল হলেন সাধারণ গ্রুপ কমান্ডার। এত বড় ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলা সমীচীন মনে না করে গ্রুপ কমান্ডারগুলোর নিকট মাওলানা রফিক ও আরিফ এর খোঁজ নেন। একজন কমান্ডার বললেন, "আরিফ নামে একজন কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদের সঙ্গে আছেন। আর এ নামে বড় ধরনের কোন কমান্ডার আছে কি না তা জানা নেই। তবে থাকতে পারে।"

বেলাল নিরাশ হয়ে পাঞ্জেশিরি দিকে পা বাড়ানোর চিন্তা করলেন। উক্ত স্বরনার্থী শিবিরে নির্যাতিত মুসলমানরা এসে প্রাথমিক পর্যায়ে আশ্রয় নেয়। তারপর সেখান থেকে পাকিস্তান পাড়ি জমায়। বেলাল ওদের নিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন।

একদিন গভীর রাতে স্বরনার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য মাওলানা রফিক বেরুলেন। প্রতিটি তাঁবুর পার্শ্বে একটু সময় অবস্থান করে কেহ কোন কষ্টে আছে কি না, কেউ রোগে কাতরাচ্ছে কি না, তার খোঁজ নিতেছিলেন। তিনি কয়েকটি তাঁবু পার হয়ে ছোট্ট একটি তাঁবুর পার্শ্বে এসে দাঁড়ালে শুনতে পেলেন নারী কণ্ঠের মিহিন আওয়াজ, কে যেন কেঁদে কেঁদে গভীর রজনীতে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। শব্দগুলো ছিল খুবই অস্পষ্ট। তাই তাঁবুর একদম নিকটে বসে কান লাগালেন। এক পর্যায়ে শুনতে পেলেন, মহিলাটি দোয়া করতে গিয়ে বলছে "আল্লাহ! অল্প বয়সেই পিতা-মাতার আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করে অন্যের ঘরে লালন পালন করলে। সে আশ্রয় স্থলটুকু কেড়ে নিলে। আমাদের আশ্রয় নেয়ার কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না। সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়ার মত কেউ নেই। হে প্রভু! তোমার আশ্রয় আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তুমিই আমাদের একমাত্র অভিবাবক।

হে আল্লাহ! ঈমানী পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আরো কঠিন পরীক্ষা যদি নেও তবু রাজি আছি। কিন্তু দয়া করে পাশ হওয়ার তওফিক দান করো। ওগো আমার মাওলা! আমার প্রাণের স্বামীকে তুমি হেফাজত করো। স্বামীকে বিজয়ী বেশে আমার নিকট ফিরে আসতে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! তোমার তো ক্ষমতার কোন কমতি নেই। আমার প্রাণের স্বামী বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে স্বপ্ন যোগে হলেও দেখিয়ে দাও এবং আমার বিগলিত আত্মাকে সান্ত্বনা দান কর। আমি চাই না তোমার হুকুম বাদ দিয়ে, আমার কাছে চলে আসুক। আমি শুধু তার নূরানী চেহারাটুকু একবার অবলোকন করে শান্তি পেতে চাই। হে আল্লাহ! তুমিতো জানো বিবাহের পর বাসর রজনীটুকু একসাথে কাটাতে পারিনি। এর আগেই তিনি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে চলে গেছেন। হে প্রভু! পরীক্ষায় ফেল করে ঈমানহারা যেন না হই। ধৈর্য ধারণ করার তওফিক দাও। ছবরে জামিল এখতিয়ার করার ক্ষমতা দাও।" অতঃপর মিহিন সুরে কুকিল কণ্ঠে গাইতে লাগল-

দুঃখ যদি দাও হে প্রভু, বলবো না কিছুই তোমারে।
কিন্তু যেন সইতে পারি, এই মিনতি তোমার দ্বারে।
আমায় যদি দুঃখ দিয়ে, তোমার প্রাণে সান্ত্বনা পাও।
দাও যাতনা, দাও বেদনা, শান্তি আমার ছিনিয়ে নাও।
শুনতে যদি ভালো লাগে-কান্না আমার ওগো প্রভু।
হাসব না আর এই জীবনে-থামবে না মোর কান্না কভু।
পথে পথে ফিরলে যদি, তোমার কাছে ভালো লাগে।
ফিরব পথে কিন্তু দিলে-দুনিয়ার যে সাধনা জাগে।
নিত্যই যদি তুমি প্রভু-রাখো আমায় অনাহারে।
তবু আমি করবো না গো-শেকায়াত তোমার দরবারে।
দেখতে যদি ভালো লাগে-ছিন্ন ভূষণ আমার গায়ে
শান্তি যদি পাওগো প্রভু-চলবো আমি নগ্ন পায়ে।
রোগ, মছিবত, দিতে যদি- ইচ্ছা জাগে তোমার মনে।
সবই বরণ করে নেব-বিনা দিধায় সংগোপনে।
জাহান্নামে দিয়ে যদি প্রভু তুমি খুশি থাক।
তবু আমি রাজি আছি-যদি তুমি সাথে থাক।
নাই কোন ক্ষমতা আমার-সব ক্ষমতা তোমার হাতে।
চালাও তোমার এদাসিরে-চালাও তোমার ইশারাতে।

নারী কণ্ঠের বেদনার সুর লহরী শুনে মাওঃ রফিক মনে মনে ভাবছেন যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু আসে, তা অম্লান বদনে মেনে নেয়ার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, এমন ছাবেরা নারী কে হবে? কণ্ঠটা যেন চিরচেনা মনে হচ্ছে। তাহলে কি এ সুফিয়া? এখানে আসবেই বা কেন? যুদ্ধবিগ্রহ দেশ, কত অঘটন চোখের পলকে ঘটে যাচ্ছে। কত উত্থান পতন ঘটছে, অসম্ভবই বা কি? গভীর রজনীতে একটি অবলা নারীকে ডাকা বা তার সাথে কথা বলা কি করে জায়েজ হবে? কেউ দেখলে বদনামের সীমা থাকবে না। এতে সব মুজাহিদের বদনাম হবে। জিম্মাদার হিসাবে তো খোঁজ খবর নেয়য়া বৈধ। কিন্তু মানুষতো তা বুঝবে না। রফিক একা একা এসব নিয়ে ভাবছেন।

তার দিলে কে যেন হাতুড়ী পিটাতে লাগল। এযে সুফিয়া, এযে তারই কণ্ঠ তা সত্য। রফিকের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। রফিক রাত পোহানোর এন্তেজারে সারা রাত অঘুম নয়নে কাটিয়ে দিলেন। সকালে ফজরের নামাযের পর স্বরনার্থীরা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। তাই সবাই মিলে ছামানা গোছানোর কাজে ব্যস্ত। সুফিয়ারাও তাই করছিল।

রফিক কমান্ডার বেলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার সাথে যে তিনজন মহিলা আসছে, তারা আপনার কি হয়? বেলাল নির্ভয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। রফিকের গা শিউরে উঠল। বিদায়ের পথে সুফিয়া আহার্য বেঁধে যে রুমালটি দিয়েছিল, রফিক সে রুমালটি দিয়ে কয়েকটি রুটি বেঁধে বেলালের হাতে দিয়ে বললেন, "যাও এ রুটি ও হালুয়া আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া। তা মহিলাদের খেতে দাও।" বেলাল খাবারের পুটলিটা নিয়ে আতিকার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো কমান্ডার জামাল জঙ্গি সাহেবের পক্ষ থেকে হাদিয়া। তোমরা সবাই মিলে এগুলো খেয়ে নাও। তারপর আমরা পাঞ্জেশিরের দিকে চলে যাব।"

আতিকা সুফিয়া ও জুলাইখাকে নিয়ে রুটি খেতে বসলেন। সুফিয়ার নজর কেড়ে নিল রুমালে। এযে তার হাতের তৈরি কারুকার্য খচিত রুমাল, তা চিনতে বাকি রইল না। এ রুমালের জীবনে অনেক ইতিহাস লুকায়িত রয়েছে। এ রুমালের প্রতিটি সুতার পেচে পেচে রয়েছে অনেক গোপনীয় কাহিনী, তা সুফিয়ার মানসপটে ভেসে বেড়াচ্ছে। দু এক টুকরা রুটি মুখে দিয়ে ভাব সাগরে ভাসতে লাগল।

কমান্ডার বেলাল তাবুর বাইরে বসে রুটি ভক্ষণ করছিলেন। সুফিয়া বেলালকে বলল, "ভাইজান! এ রুমালটি কমান্ডার সাহেব কোথায় পেলেন তা জিজ্ঞাসা করুন।" বেলাল উত্তরে বললেন রুমালে কি আসে যায়। একটা হলেই হল। এত বড় ব্যক্তিকে আজে বাজে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। সুফিয়া অনুনয় বিনয়

করে আবার জিজ্ঞাসা করতে বললে, নিরুপায় হয়ে তিনি কমান্ডার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর! আপনার এ রুমালটি কার? কোত্থেকে পেলেন তা জানতে চাচ্ছেন আমার পত্নির ওস্তাদ ও বান্ধবী। দয়া করে বলবেন কি?"

এ রুমালের মালিক রুমালটি আমাকে দিয়েছিল। আমি আজ সে ঋণ পরিশোধ করেছি। বেলাল তার অর্থ বুঝেনি। তাই আবার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "তোমার বুঝতে হবে না, যে প্রশ্ন করেছে তাকে গিয়ে বল হয়ত বুঝতে পারবে।"

বেলাল খিমায় গিয়ে বললে, "এ রুমালের মালিক নাকি উনাকে রুমালটি হাদিয়া দিয়েছিল। তিনিও নাকি সে ঋণ পরিশোধ করেছেন। সুফিয়া চিৎকার দিয়ে বলল, "আমি রুমাল চাই না। রুমালটি যার কাছে গচ্ছিত ছিল তাকে চাই।

আতিকা জুলাইখা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল "একি বলছেন আপা? মাথা খারাপ হচ্ছে না তো? আপনি একজন গায়রে মাহরুমকে চাচ্ছেন, এ কি করে হয় আপা? খামুশ থাকুন।" কমান্ডার বেলালও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এসব কথাতো সুফিযার মুখ থেকে বেরুবার নয়। বেলাল অগত্যা জামাল জঙ্গিকে ঘটনা অবগত করালে তিনি বললেন, "যাও মেয়েটিকে পর্দা করে আমার খিমায় নিয়ে এসো।" বেলাল সুফিয়াকে কমান্ডারের খিমায় নিয়ে এলেন।

সুফিয়া খিমায় প্রবেশ করে বোরকার ফাঁকে ফাঁকে কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এতো আর কেউ নয়। এযে তারই পলাতক স্বামী মাওলানা রফিক। সুফিয়া নিজেকে সামলাতে না পেরে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। রফিক বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সকলের অন্তরে প্রেম সাগরের ঢেউ খেলতেছিল।

মাওলানা রফিক বেলাল ও অন্যদেরকে তার হেফাজতে রেখে বললেন "আপনারা এখানেই অবস্থান করুন, এটা খুবই নিরাপদ স্থান। আর জুলাইখাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "জুলাইখা! চিন্তা করো না, তোমার স্বামী আরিফকে খুঁজে আনব।"

আরিফ অধিকৃত ঘাঁটি থেকে আশ-পার্শ্বে ছোট খাটো ২/১ টি অভিযান পরিচালনা করেছেন বটে, কিন্তু এ স্থানটি ধরে রাখার মত শক্তি একজন মুজাহিদ দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ একটি ঘাঁটি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হল-

১। পার্শ্ববর্তী এলাকার রাস্তা-ঘাট সম্পূর্ণ রূপে পরিচিত হওয়া।

২। একাধিক রাস্তা থাকা, যেন আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে সাথীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া যায়।
৩। পশ্চাৎ দিক থেকে যেন প্রয়োজনীয় রসদপত্র সরবরাহ করা যায়। যেমন খাদ্য, ঔষধ, গোলা-বারুদ ও পোশাক-পাতি।
৪। দুশমন আসার সম্ভাব্য রাস্তায় মজবুত পাহারাদারীর ব্যবস্থা করা।
৫। পর্যাপ্ত পরিমাণ ভূমি মাইন বিছিয়ে রাখা।
৬। বিমান বিধ্বংসী কিছু অস্ত্রপাতি মওজুদ রাখা বা বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মজবুত ব্যাংকার তৈরি করা।
৭। মার্কাজ বা ঘাটি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখা।
৮। বিভিন্ন ক্যাম্পের সাথে যথা যথ যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা থাকা।
৯। ঘাঁটি থেকে ৩/৪ মাইল দূরে গোয়েন্দা নিযুক্ত রাখা।
১০। রসদপত্র সরবরাহের জন্য পশ্চাতে বাহিনী নিযুক্ত রাখা। একটি ঘাঁটি বা মার্কাজ সংরক্ষণের জন্য এগুলো ছাড়াও খুঁটি-নাটি অনেক বিষয় রয়েছে যা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি না।

আরিফ যদিও হামলা করে দুশমনের ঘাঁটি দখল করে নিচ্ছেন, তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ১৬/১৭ জন মুজাহিদ দ্বারা ক্যাম্প টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় বিধায় ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা করলেন। আরিফের মনোভাব বুঝতে পেরে তারই সহযুদ্ধা ও গ্রুপ কমান্ডার হাসান বিন জামিল বললেন, “মোহতারাম আমীর সাহেব! মার্কাজ ধরে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তা ঠিক। তবে আমাদের খুব গভীরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোথায় যাব এবং কিভাবে যাব। মুস্তাকেল গ্রুপ নিয়ে থাকব, না অন্য কোন শক্তিশালী গ্রুপের বাহু মজবুত করব। অন্য দলে যোগ দিতে হলে সে দলের নেতৃবৃন্দের নিকট অবশ্যই আলাপ আলোচনা করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হল, আমরা পৃথক গ্রুপে না থেকে কোন একটি গ্রুপে মিশে শক্তিশালী হয়ে যাই। বাকি হযরতের মর্জি।” আরিফ খানিকটা চিন্তা করে বললেন, “আপনার পরামর্শ যথার্থ। সে হিসেবেই কাজ করা হোক।”

কমান্ডার শেরখান বললেন, “জনাব! আমরাও এতে একমত, তবে আমার পরামর্শ হল, আমাদের পক্ষ থেকে তিনজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হোক। তাঁরা বিভিন্ন এলাকা সফর করে বিভিন্ন দলের সন্ধান নিয়ে নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে আসুক। তারপর আমরা এক সাথে স্থান ত্যাগ করব।”

আমীর সাহেব (সেনাপতি আরিফ) বললেন, “সুন্দর পরামর্শ। আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে কমান্ডার দাউদ, শেরখান ও সলিম বেগ যাবেন। তিন দিনের

মধ্যে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ করে রিপোর্ট পেশ করবেন। তারপর আমরা পদক্ষেপ নেব।" আমীর সাহেব আরো বললে, "তিন দিন আমরা এখানে অবস্থান করতে পারব না। আজকের মধ্যেই এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। কেননা এখানে আশু বিমান হামলার সম্ভাবনা সু-প্রকট।

অন্য একজন বললেন মার্কাজ ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া খুবই কঠিন। এক তো উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় কি না তা কে জানে? তাছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য, পানীয় ও প্রয়োজনীয় তাঁবু বা অন্যান্য মাল-ছামানা বহন করা এত সহজ নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক ছাড়া এগুলো টানা হেচড়া করা সম্ভব নয়। তিনজন চলে গেলে মাত্র ১৪ জন মুজাহিদ থাকবে। এ ১৪ জনের দ্বারা এ কাজ করা খুবই কষ্ট হবে। এ দিকে লক্ষ্য করে শেরখান বললেন, হুজুর! তিন দিন পর আমরা চলে যাব। কাজেই এখন কষ্ট করা দরকার নেই। কষ্ট এক সাথেই হোক। উক্ত প্রস্তাবে সকলেই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে সম্মতি জানালেন। আমীর সাহেবের প্রস্তাবের সমর্থন না পাওয়ায় আমীর সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু আসন্ন বিপাদাশংকায় খুবই অস্থির।

আমীর সাহেব কমান্ডার দাউদ, শেরখান ও সেলিম বেগকে পাঠিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র সংগে দিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে আমীর সাহেব জরুরি নসিহত ও দোয়া করে কাফেলাকে এস্তেকবাল করে কিছু পথ এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

আমীর সাহেব মুর্চায় প্রত্যাবর্তন করে উপস্থিত মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "ভাইসব! গণিমতের অস্ত্র-শস্ত্রের হেফাজত ও রক্ষণা বেক্ষণ করা হলো ঈমানী দায়িত্ব। এগুলো মুসলমানদের সম্পদ। বাইতুল মালে (সরকারি কোষাগার) জমা দেয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের হেফাজত করতে হবে। অবিলম্বে আমরা বিমানবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারি। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এগুলোর হেফাজতের দরকার। আপনারা হেফাজতে লেগে যান।"

আমীর সাহেবের নির্দেশে কেউ গুরুত্ব দিল না, দু একজন ছাড়া। এ দু একজনই কিছু কিছু অস্ত্র কাঁধে বহন করে একটু দূরে নিয়ে রাখতে লাগল। এরই মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে অগনিত নাম না জানা পাখি কিচির-মিচির রবে আকাশে উড়তে লাগল। আরিফ পাকিস্তানি এক মুজাহিদের মুখে শুনেছিল যে, বিমান আসার আগে নাকি পাখিরা বিপদ সংকেত নিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। তারপর মুজাহিদরা সতর্ক হয়ে যায়। পাখি দেখে আরিফের অন্তরে সে কথা উদয় হল। তাই সবাইকে ডেকে বললেন, "ভাইসব! আপনারা মুর্চা বা ব্যাংকার ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিন। পাখ-পাখালির কলরবে মনে হয় এখনই বিমান বহর এসে যাবে।"

আমীর সাহেব এগুলো বলতে না বলতেই বিমান এসে বোমভিং আরম্ভ করল। বিমানগুলো অনেক উপর থেকে বোম ফেলতে ছিল যে, এত উপর থেকে ভূপাতিত করার মত কোন বন্দুক ছিল না। তাই ওদের ইচ্ছেমত বোমভিং করতে লাগল। বোমবিং এর কালো ধুঁয়ায় পুরো এলাকা জুড়ে সূর্যের কিরণ দৃষ্টি গোচর হয়নি। ধূম্র কুণ্ডলী আর তার মাঝে রক্তিম আভা মিশ্রিত হয়ে এক ভয়ংঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। কর্ণ বিদীর্ণ করা প্রলয় নিনাদে সকলেই শাহাদাতের প্রমাদ গুণছে।

একটানা দেড় ঘণ্টা বোমভিং করে বিমান নিরাপদে ফিরে গেল। অতঃপর তালাশ করে দেখা গেল ১৪ জন মুজাহিদের মধ্যে আটজনই শাহাদাত বরণ করেছেন। আর বাকি আছেন ৬ জন। তাছাড়া অনেক ব্যংকার ও মুর্চার কোন চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রইল না। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে উপুর্যপরি বোমভিংএ। এ ধ্বংসলীলার কারণ একমাত্র আমীরের আনুগত্য না করা এবং অলসতা করা। কষ্ট করে যদি আগেই সরে পড়ত তবে এমনটি হত না।

কমান্ডার দাউদ, শেরখান ও সেলিম বেগ পাহাড়ের পর পাহাড় পাড়ি দিয়ে ছুটে চলছেন মুজাহিদ নেতার সন্ধানে। দু'রাত ও একদিনের পথ চলার পর সন্ধার একটু আগে এসে হাজির হলেন মাওঃ রফিক সাহেবের আশ্রয় শিবিরে।

পাহারাদারগণ দূর্বীনের সাহায্যে অনেক দূর থেকেই কমান্ডার দাউদকে আবিষ্কার করছিলেন। পাহারাদার ইলিয়াস কমান্ডার দাউদকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন। সে কারণে তাদের চলার পথে কোন বাধা বিপত্তি ঘটেনি। আনায়াসেই শিবিরে প্রবেশ করলেন।

মাওঃ রফিক A.K 47 অস্ত্রটি একটি প্রস্তর খণ্ডে হেলান অবস্থায় রেখে মাগরিবের অজু করছিলেন। আগন্তুক তিন ব্যক্তিকে অস্ত্রশস্ত্র অবস্থায় এদিকে আসতে দেখে চমকে গেলেন এবং অস্ত্রটি হাতে তুলে নিয়ে ফায়ার পজিশনে প্রস্ত র আড়ালে চলে গেলেন। কমান্ডার দাউদ তা বুঝতে পেরে হস্তদয় উঁচিয়ে উচ্চ আওয়াজে সালামুন, সালামুন শব্দ উচ্চারণ করতে করতে সামনে এগুতে লাগলেন।

মাওঃ রফিক বুঝতে পারলেন যে, এরা দুশমন নয়, বন্ধু। তিনি শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে সালাম, মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করে হাল পোরস্তি করলেন। অতঃপর সবাই এস্তেঞ্জা সেরে জামাতের সাথে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হতে না হতেই আপ্যায়নের জন্য আনা হল চা-বিস্কুট ও কাবাব। সকলেই নাস্তা সেরে আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন।

কমান্ডার দাউদ তাদের আগমনের উদ্দেশ্য পুংখানো-পুংখানোভাবে বর্ণনা করলেন। মাওঃ রফিক তাদের বললেন, "আমরা এখানে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন

করেছিলাম এজন্য যে, অনেক শার্থী এসব রাস্তাঘাটে লাঞ্ছিত হত। তাদেরকে সহি-সালামাতে পাকিস্তান পৌঁছে দেয়া এবং এখান থেকে ছোট-খাট হামলা পরিচালনা করা। বর্তমানে শরণার্থী সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য একটু বিলম্বিত হচ্ছে। তা না হয় এতদিনে চলে যেতাম।"

ঃ তাহলে কি আমাদেরকে আপনার সাথে নেবেন না?

ঃ নেব না সে কথা বলিনি। আমাদের বর্তমান মনোভাব ব্যক্ত করলাম এতে যা বুঝেন।

ঃ আপনারা যদি আর তিন চার দিন এখানে অপেক্ষা করেন তবে আমরা গিয়ে আমাদের অন্যান্য সাথী ও গোলা-বারুদ নিয়ে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারব। তা না হলে কোন একটি জায়গার কথা বললে, সেখানে গিয়ে একত্রিত হব।

ঃ আপনারা এখানে না এসে বামিয়ানের ৩০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে জামুদ পাহাড়ে চলে যাবেন। সেখানে আমাদের সাথে সাক্ষাত হবে। আলাপ আলোচনা শেষ করে নামায আদায় করে রাতের খানাপিনা সেরে ঘুমিয়ে গেলেন। পরদিন ভোরে ফজরের নামায জামাতে আদায় করে কিছু নাস্তা খেয়ে কমান্ডার দাউদ চলে গেলেন।

মাওঃ রফিক একদিন অপেক্ষা করে কয়েকটি সওয়ারির ব্যবস্থা করে জামুদে চলে গেলেন। আল্লাহর খাস রহমতে রাস্তায় কোন অপ্রতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়নি।

কমান্ডার দাউদ দুদিন পর বিকাল ৫টার সময় মার্কাজে এসে পৌঁছে আরিফের সাথে ঘটনা খুলে বললেন। আরিফ সব কিছু শুনে পরদিন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বেঁচে যাওয়া গণিমতের মালগুলো ৯ জন বহন করে নেয়া খুবই কঠিন ছিল। তবু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মালামাল রাত্রেই পৃথক পৃথক গাঠুরি বেঁধে সাজিয়ে রাখলেন। সোবহে সাদিকের সময় গাঠুরিগুলো বহন করে চললেন। একদিন পথ চলার পর সওয়ারির ব্যবস্থা হওয়ায় এক সপ্তাহে কাফেলা জামুদে এসে পৌঁছল।

নতুন কাফেলা আগমনে মুজাহিদগণ হাজার হাজার গুলি ছুড়ে স্বাগত জানালেন। আকাশে রোশনী গোলা ছুড়ে আল্লাহর নাম অংকন করবেন। রোশনী গোলার আলোতে পুরো এলাকা আলোকাজ্জ্বল হয়ে গেল। তাদের আনন্দ দেখে আরিফ ভাবছিলেন এই মাত্র বুঝি আফগান ফাতাহ হয়েছে। মুজাহিদরা বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে।

রাতে মসাল জেলে পেরেট করাচ্ছিল। পেরেটের তালে তালে তাড়ানা গেয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। মেহমানদেরকে একটি বড় তাঁবুতে বিশ্রাম

নিতে দিলেন। রাত ৯টায় এশার নামায অনুষ্ঠিত হল। অতঃপর খানা-পিনার জন্য দস্তরখানা বিছানো হল। কয়েকজন মুজাহিদ দৌড়াদৌড়ি করে খানা পরিবেশন করছিলেন। সকলেই মুখোশ পরা। কেউ কাউকে চেনার উপায় ছিল না। আরিফ খানা খেয়ে মেহমান খানায় গিয়ে সাথীদের সাথে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় কমান্ডার মাওঃ রফিক নবাগত মেহমানদের হাল-পোরস্তি র জন্য মেহমান খানায় গেলেন।

রফিক তাঁবুতে প্রবেশ করতে করতে সালাম দিলেন। মেহমানগণ সালামের জবাব দিয়ে সেদিক তাকালেন। আরিফ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে প্রায় দু-তিন মিনিট বুকে বুক লাগিয়ে ভালোবাসা বিনিময় করছিলেন। দুই ভাইয়ের অপূর্ব মিলন তৃপ্তিতে চোখ থেকে অবিশ্রান্তভাবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। বক্ষদেশ সিক্ত হল উভয়ের।

অন্যান্য মুজাহিদগণ তাদের মিলন ভঙ্গি দেখে বিস্মিত হলেন। রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি কেউ। মিলন পর্ব সমাপন করে একে অপরের হস্ত ধার ধরে বিছানার এক প্রান্তে বসে এলাকার পরিস্থিতি, দেশের অবস্থা ও পারিবারিক দিক আলাপ করছিলেন। এবার অন্যেরা পরিচয় পেলেন এদের আন্তরিকতার কারণ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

আরিফ রফিকের যবান থেকে সুফিয়া, আতিকা ও জুলাইখার কথা শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কয়েক রাকআত নামায আদায় করে জুলাইখার সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে তাঁবু ত্যাগ করলেন। রফিক তাদের জন্য একটি নিরিবিলি তাঁবুর ব্যবস্থা করেছিলেন।

দীর্ঘ দিনের বিরহ যাতনা অবসান ঘটিয়ে আজকের রজনীটা আল্লাহ মিলন রজনী ও মধুময় রজনীতে পরিণত করলেন। এ যেন এক নতুন আরাফাত। রফিক পেলেন তার আদরের স্ত্রী সুফিয়াকে, আরিফ পেলেন তার প্রাণ প্রিয় পত্নি জুলাইখাকে। আর বেলাল পেলেন তার সহধর্মীনী আতিকাকে। প্রেম সাগরের কানায় কানায় ভরে গেল প্রেম জোয়ারে। যারা ছবর আর ধৈর্য দ্বীনের খাতিরে এখতিয়ার করে, তাদের যাবতীয় অসুবিধা আল্লাহ গায়েব থেকে মিটিয়ে দেন। আল্লাহর তারাই প্রিয় যারা দ্বীনের খাতিরে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, সহায়-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ করেন।

বৃটিশ সাংবাদিক ইয়োভনি রিডলির ইসলাম গ্রহণ ও ইহুদী-নাসারাদের গোপন ষড়যন্ত্রের ঘোম্‌টা উন্মোচন

বৃটিশ সাংবাদিক ইয়োভনি রিডলি শুধু একজন সাংবাদিকই নন, একদিকে তিনি একজন পর্যটক, অপরদিকে একজন উঁচু পর্যায়ের গুপ্তচর। পৃথিবী নামক গ্রহে তার পদচারণা ছিল খুবই বেশি। তার পদধূলি পড়েনি এমন দেশ খুব কমই আছে। এমনও দেশ রয়েছে, যেখানে তার সফল হয়েছে একাধিক বার। বহুদেশের বহু সাংবাদিকদের সাথে রয়েছে তার মাখামাখি, জানাজানি ও গোপন আঁতাত। পশ্চিমা দেশগুলো এক বাক্যে তাকে চেনে ও জানে। উন্নতশীল দেশগুলের অভিজাত হোটেল মালিকরা পর্যন্ত সংবাদিকদের আগমনের পথপানে চেয়ে থাকতেন। কারণ, দু-এক মাস যদি তাকে হোটেলে রাখা যেত, তবে দু'-এক বৎসরের কামাই হয়ে যেত। তা ছাড়া রিডলির সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভীড় লেগেই থাকত সারাক্ষণ। তদুপরি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথেও ছিল গলায় গলায় ভাব। কারণ, তার কলমের তীক্ষ্ণধারে কখন কি ঘটে যায়, তারা এ নিয়ে থাকত শংকিত। তাই সকলেই রিডলির সাথে রাখত সুসম্পর্ক ও মিতালী। সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাকে উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। তার জ্ঞান-গরীমা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে সবাই হার মানত। তিনি অনেক প্রশিক্ষণ শিবির থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অর্জন করেছেন অনেক ডিগ্রি। যে কোন সময় যে কোন দেশে প্রবেশ করা তাঁর জন্য ছিল খুবই সহজ। জাতিসংঘ থেকেও নাকি সনদ পেয়েছিলেন তিনি।

বয়স ২৮ এর কোঠায়। গায়ের রং ফর্সা। গোল-গাল চেহারা। লম্বা সাড়ে ৬ ফুট। স্বাস্থ্য মাঝারী ধরনের, শুভ্র তার অলক গুচ্ছ। চোখ দু'টি পিংগল বর্ণের। গায়ে হাওয়াই শার্ট, পরনে হাফ প্যান্ট, মাথায় ক্যাপ, কাঁধে শোভা পেত একটি ক্যামেরা ও একটি ব্যাগ। চোখে শোভা পেত গগলস্‌। যে কোন যুবক তার প্রতি না তাকিয়ে থাকতে পারত না। সকলের সাথেই অতি সহজে ভাব জমাতে পারতেন তিনি। তিনি যে কথার জাদু জানতেন, তা বললে ভুল হবে না। তিনি প্রায় ২১টি ভাষায় কথা বলতে পারেন। যে কোন ভাষায় কথা বললে সবাই মনে করত তিনি সে ভাষা-ভাষীর লোক। তাই অতি সহজে মানুষকে বশে আনতে পারতেন।

সাংবাদিক ইয়োভনি রিডলি গোয়েন্দা গিরীর উদ্দেশ্যে সাংবাদকি সেজে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তালেবান সরকারের অনুগত বাহিনী গোয়েন্দা সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করে। দশ দিনের বন্দী জীবনে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সত্যের সন্ধান। তিমিয়ে হারিয়ে যাওয়া জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখেন আলোর ঝলক। পথহারা পথিক পেয়েছেন পথের দিশা। তাই তালেবানদের আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল পবিত্র কালিমার সু-মধুর সুর লহরী।

"আশহাদু আল্‌-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

আমানতু বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রাসূলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল কাদরিহী খাইরিহী, ওয়া শাররিহী, মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বাছি, বা'দাল মাউত।

তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে নিজের যবানে ইহুদী-নাসারাদের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা নিজ ভাষায় প্রকাশ করেন–

* আমি বেশ কয়েকবারই ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছি এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি। দু'হাজার সাল পুরাটাই আমি ফিলিস্তিনে অবস্থান করেছিলাম। ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাতের সাথে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতা। ছিল মিতালী। অনেক কাজ-কর্মে আমি তার সহযোগিতা পেতাম। আমার সাথে দৈহিক মিলনে তাঁর ছিল অভিলাষ। আমিও সুযোগ দিতে কৃপণতা করতাম না। যে হোটেলে আমি অবস্থান করতাম, সেখানে সপ্তাহে দু-তিন বার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হতই।

* একদিন রাত ১২টায় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানের কাছে নিতেই শুনতে পেলাম আমার সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশ বাণী। তিনি আমাকে তিনদিনের মধ্যে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে বৃটেনে চলে যেতে নির্দেশ দেন। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, আমার উপর এর চেয়েও কঠিন কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হবে। আমি আমার সবকিছু গুছিয়ে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে বৃটিশ অভিমুখে যাত্রা করলাম। নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগেই বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার হেডকোয়ার্টারে এসে হাজির হলাম। সেখানে সপ্তাহব্যাপী গোপনীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিংয়ে আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্সসহ বেশ কয়েকটি দেশের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিটিংয়ে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়, তা নিম্নরূপ–

* ফ্রান্স থেকে আগত প্রতিনিধি বললেন, "১৯৭৯ ইং সালের প্রথম দিকে তেলআবিবের মিটিং এ আফগান মুজাহিদদেরকে আমেরিকার মাধ্যমে এই মর্মে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাশিয়া আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তান, ভারত ও বার্মা (মায়ানমার) পর্যন্ত তার শাসনাধীনে নিয়ে যাবে। তখন পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্বমুখী গণতন্ত্রের দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে। তাই মুজাহিদদেরকে সামরিক সাহায্য দিয়ে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা রুখতে হবে। অতঃপর আমরা সু-কৌশলে আফগানিস্তানে বহুজাতিক সরকার অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার বসিয়ে দিতে পারলেই দেশটি আমাদের গোলাম বনে যাবে। তারপর তারা কোনদিন গোলামীর জিঞ্জির ছিড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

আমাদের পরামর্শানুযায়ী আমরা মুজাহিদদেরকে সব ধরনের সাহায্য দিয়ে রাশিয়াকে পরাভূত করেছি। তারপর আস্তে আস্তে মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে বিভক্ত করে রেখেছি।

আমরা সু-কৌশলে মুজাহিদ নেতাদের গণতন্ত্রের ট্যাবলেট খাইয়েছি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীকে ৫ মাসের জন্য ক্ষমতায় রেখে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক বুরহান উদ্দীন রব্বানীকে প্রেসিডেন্ট ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। এদিকে উজকেবদের অন্যতম নেতা আঃ রশিদ দোস্তাম ও তাজিক গোত্রীয় মুজাহিদ নেতা প্রকৌশলী আহাম্মদ শাহ্ মাসউদকে গণতন্ত্রের শরবৎ পান করিয়ে পৃথক পৃথক প্লাট ফরমে

দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আমরা চেয়েছিলাম, তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে, মুজাহিদদের দ্বারা পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি করিয়ে, তাদের শক্তি খর্ব করে, বিশ্বব্যাপী জিহাদের বদনাম করে, মুসলমানদেরকে জিহাদ বিমুখ করে আমরাই মোড়ল সেজে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা আমাদের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম।

* কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হল, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে তালেবানরা বুরহান উদ্দীন রব্বানী, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার, আহাম্মদ শাহ্ মাসউদ ও আঃ রশীদ দোস্তাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে যায়। ২২ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তালেবানরা সামরিক বাহিনী গঠন করে পরপর আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক প্রদেশগুলো দখল করে নেয়। এদিকে বুরহান উদ্দীন রব্বানী, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, নিরূপায় হয়ে ১৯৯৬ সালে শান্তি চুক্তি করেও রেহাই পাননি। অতঃপর কাবুল থেকে পলায়ন করে উত্তরাঞ্চলে চলে যান। সেখানে আঃ রশিদ দোস্তাম ও আহাম্মদ শাহ মাসউদের সাথে গোপন আঁতাত করে তালেবানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বর্তমানে তালেবানরা ২৬টি প্রদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। আর বাকীদের দখলে রয়েছে ৬টি প্রদেশ। যে কোন মুহূর্তে এ ৬টি প্রদেশও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। তালেবানরা কট্টর ইসলাম পন্থী। এরা গণতন্ত্রের কবর রচনা করে সারা দুনিয়ায় ইসলামী নেযাম কায়েম করবে। তাই যে কোন মূল্যে তাদের অগ্রাভিযান বন্ধ করতে হবে। তাই এখনই সময় আমরা আফগানিস্তানের প্রতিটা হাট-বাজার, শহর-বন্দরে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার চালিয়ে তাদের (তালেবান) অগ্রযাত্রা বন্ধ করব। এ মর্মেই জরুরি ভিত্তিতে আপনাদেরকে তলব করা হয়েছে। মিস্ ইয়োভনি রিডলিরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।" একথাগুলো বলছিলেন ফ্রান্সের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। উক্ত মিটিংয়ের পর পরই আমরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করি।

আমি যেভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছি, তার কিঞ্চিত বর্ণনা নিম্নরূপ–

* আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে ২০০১' সালের এক শুভলগ্নে আমি বৃটিশ ত্যাগ করে ইরানে এসে আশ্রয় নিই। তেহরানের এক অভিজাত হোটেলে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। এবার নিয়ে আমি ৩ বার ইরানে প্রবেশ করেছি। ইরানীদের কৃষ্টি-কালচার আমার পূর্ব থেকেই জানা। শিয়াদের সাথে ছিল পুরাতন খাতির। প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাদের সাথে ছিল পুরানো ভাব। তাই তারা প্রায়ই আমার সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য ছুটে আসতেন হোটেলে। মুসলিম নামধারী শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু কার্যকলাপে বন্য পশুরাও হার মানবে। লজ্জায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব হল না। তেহরানে অবস্থানকালে তাদের এক ধর্মীয় নেতা ফজলে হক আমেনী এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর মাধ্যমে জানতে পারলাম, আফগান নেতা বুরহান উদ্দীন রব্বানী (তিনি ছিলেন শিয়াপন্থী) তেহরানে সরকারের হেফাজতে আছেন। আমার কৌতূহল জন্মিল রব্বানী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে। তা ফজলে হক আমেনী সাহেবের নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, "আপনাকে যেতে হবে না। আগামীকাল সন্ধ্যায় আমি নিজেই তাকে নিয়ে আসব। এতে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। পরদিন বিকাল ৫টায় টয়োটা যোগে রব্বানী সাহেবকে আমার হোটেলে নিয়ে আসলেন। তাঁর সঙ্গে আরো ২ জন আফগানী ছিলেন।

* জনাব ফজলে হক আমেনী সাহেব রব্বানী সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর কুশল বিনিময় করে আফগানিস্তানের পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানলাম। রাব্বানী সাহেবের কথায় একটা জিনিস স্পষ্ট ফুটে উঠছিল যে, আফগানের জনসাধারণ তালেবানদেরকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসে। নিজে না খেয়ে তালেবানদেরকে খাওয়ায়, আশ্রয় দেয় এবং সব ধরনের সহযোগিতা করে। তিনি এও বলেছিলেন যে, তালেবানরা পূর্ণ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কিঞ্চিত নমুনা দেখেই জনগণ তাদেরকে ভালবাসতে লাগল। যে সব জায়গা তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে, সেসব জায়গায় ইসলামী শাসন চালু করেছে, ফলে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে, যা আমরা গণতন্ত্র পদ্ধতিতে ৪ বৎসরেও আনতে পারিনি। আমি রাব্বানী সাহেবের কথা শুনে প্রশ্ন করলাম, তাহলে কি আপনারা ইসলাম চান? না গণতন্ত্র? তিনি উত্তরে বললেন, "আমরাতো আমেরিকার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম, গণতন্ত্রের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। তাই তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা আর হচ্ছে না। এখন তো গণতন্ত্রের নাম নেয়া যাচ্ছে না।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আপনি গণতন্ত্র চান না ইসলাম? এক কথায় উত্তর দিলেন। তিনি উত্তর দিলেন "গণতন্ত্র"। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আপনিই বলেছেন ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে। তা হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান কেন? রব্বানী সাহেব উত্তর দিলেন, "আমি যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি। তবে মুশকিল হল ৪ বৎসরে আমরা যা করেছি, তা দেশের ও দশের জন্য হিতকর নয়। কাজেই এখন যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে আমাদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। তালেবানরা আমাদের ক্ষমা করবে না। দেখলেন না ডঃ নজিবুল্লাকে হত্যা করা আমাদের কাছে ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই তাকে জাতিসংঘের মেহমান খানায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলাম। আর তালেবানরা এসে জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে কত নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছে। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, ওরা আমাদেরকে রেহাই দিবে না। আমরা তো আমেরিকার পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনা ছাড়া কোন কাজই করতাম না। বর্তমানে তালেবানরা কাউকেই মুরুব্বী মানে না। যে কোন কাজ করতে হলেই ওরা কুরআন ও হাদীসে তালাস করে সমাধান বের করে। এতে যা পায়, তার উপরই চোখ বন্ধ করে আমল করে।"

* আমি ফজলে হক আমেনী ও বুরহান উদ্দীন রব্বানীর সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্তানের চলমান পরিস্থিতির মুটামুটি সংবাদ পেলাম। তা ছাড়া রব্বানী সাহেব যে শিয়াদেরই একজন, তা বুঝতে বাকী রইল না। জন্মগতভাবে শিয়া না হলেও চাল-চলন ও চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অভিন্ন এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ইসলাম নিয়ে যতটুকু গবেষণা করেছি সে আলোকে বলতে পারি, শিয়ারা মুসলমান নয়। মুসলমান ও শিয়াদের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সে বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

আমি মাওঃ ফজলে হক আমেনী ও বুরহান উদ্দীন রাব্বানী সাহেবকে বললাম, "আমি বৃটিশ, ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইসরাইলের পরামর্শক্রমে এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছি। তালেবানের উত্থান প্রতিহত করে বহুদলীয় সরকার তথা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে আপনারাও জানে বেঁচে যাবেন। এছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই।

আমার কথাগুলো উভয়ে মন দিয়ে শুনছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনারা আমাকে মাজার-ই-শরীপ ও পাঞ্জেশীয়ে নিয়ে চলুন! আমি সেখানে আহাম্মদ শাহ্ মাসউদ, আঃ রশিদ দুস্তাম, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে শলা-পরামর্শ করে পদক্ষেপ নেব। তারা আমার কথার খুবই মূল্যায়ণ করে, পাঞ্জেশীর ও মাজার-ই-শরীফ ভ্রমণের একটি তারিখ ধার্য করেন।

আমি মাজার-ই-শরীফ যাওয়ার আগে ইরানের সরকার ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সাথে একটি বৈঠক করা জরুরি মনে করলাম। তাই মাওঃ ফজলে হক আমেনীকে ব্যবহার করতে চাইলে তিনি খুশী মনে রাজি হলেন। তিনি সব ধরনের যোগাযোগ সুসম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে মিটিং এর ব্যবস্থা করলেন। উক্ত মিটিংয়ে জনাব রাফসানজানী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রস্তাব আকারে একটি বিল পেশ করলাম। তা হল, "তালেবান সরকার যদি বাকি ৬টি প্রদেশও দখল করে নেয়, তবে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে যে সব শিয়ারা বসবাস করে, তারা হয়ত তালেবানদের হাতে জবাই হবে, না হয় হিজরত করে ইরানে পাড়ি জমাবে। কাজেই আমার প্রস্তাব হল উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে যদি আপনারা আশ্রয় দেন, তবে এখান থেকে জোট তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে। তাহলে আপনারাও নিরাপদে থাকতে পারবেন। আমরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ অর্থাৎ, সামরিক সরঞ্জামাদি আপনাদের মাধ্যমে সরবরাহ করে যাব।"

আমার প্রস্তাবে ইরান সরকার একমত প্রকাশ করে বললেন, "আপনার পরামর্শ যথার্থ। আমরা আপনার প্রস্তাব সর্বান্তকরণে মেনে নিলাম। এখন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাব। এ ব্যাপারে একটি চুক্তিও সাক্ষতির হয়।

* উক্ত মিটিং এর অল্প ক'দিন পর আমি মাওঃ ফজলে হক আমেনী ও বুরহান উদ্দীন রব্বানী সাহেবকে নিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। আমাদের গাইড হিসেবে রব্বানী সাহেবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমাকে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয পাঞ্জেশীর পর্বতমালার উঁচু শৃঙ্গে। সেখানে সাক্ষাত হয় আহাম্মদ শাহ মাসউদ ও আঃ রশিদ দোস্তামের সাথে। তা ছাড়া আরো বড় বড় জেনারেলদের সাথেও। পাঞ্জেশীর পর্বতমালা জুড়ে রয়েছে তাদের হাজার হাজার সৈন্য ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র। তা ছাড়া রয়েছে শতাধিক মোর্চা। দুর্গম পথ। বন-বনানীর সমাহার। লোকালয় শূন্য প্রান্তর। কোন বেদুঈনও অত্র এলাকায বসবাস করার মত সাহস পায় না।

আমি আঃ রশিদ দোস্তাম, আহাম্মদ শাহ্, মাসউদ বুরহান উদ্দীন ও গুলবদ্দীনের সাথে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলাম, দোস্তামের মাধ্যমে রাশিয়াও তাদেরকে সাহায্য দিচ্ছে। তাছাড়া আহাম্মদ শাহ মাসউদ আমেরিকা সফর করে সেখান থেকেও সাহায্য-সহানুভূতির আশ্বাস পেয়ে দেশে ফিরছেন। আমি তাদের কথাবার্ত শুনে আমার সফরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি খুবই খুশী হলেন। আমি তাদেরকে ৫০ হাজার ডলার অনুদান দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে অন্যান্য প্রদেশ ভ্রমণে বের হলাম। গাইড হিসাবে রব্বানী সাহেব যেতে অস্বীকৃতি জানালে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। মাসউদ সাহেব পাকতিয়া প্রদেশের একজনকে গাইড হিসেবে সঙ্গে দিলেন, তার নাম রহিম দাদ। রহিম দাদ তার পোশাক পাল্টিয়ে ঢিলে-ঢালা জামা পরে, মাথায় আমামা বেঁধে আমাকে নিয়ে

বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন। তিনি নিজেই ড্রাইভিং করে আমাকে সফর করান। রহিম দাদের নিজস্ব গাড়ী থাকায় চলাফেরায় তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি আমাকে হেলমান্দ, তাখার, খোস্ত, কাবুল, জালালাবাদ, বাগরাম, হেরাত, অরগুন, পাকতিয়া, সামান গান, কন্দুজ, যাউযান, ফারিয়াব ও বলখ সহ বেশ ক'টি প্রদেশ ভ্রমণ করা। তালেবান শাসিত এলাকাগুলো ভ্রমণ করে যা দেখলাম ও জানলাম তার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

* "তালেবান শাসিত এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করতেছিলাম। যদিও বারুদের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল, তবু যেন এক আনন্দঘন পরিবেশ ও পুলক শিহরণ লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে, পত্র-পল্লবে কানায় কানায় ভরপুর। আফগানের মাঠে-ময়দানে, চারণ ভূঁয়ে বিচরণ করছে লক্ষ লক্ষ ছাগল, ভেড়া ও দুম্বারা। মেষ শিশুরাও আনন্দে ছুটাছুটি ও দৌড়া-দৌড়ি করছে। মাঠে-মাঠে এত শ্যামলিমা ছড়িয়ে দিল কে? কেন বা এত স্বর্গ-শান্তি অনুভূত হচ্ছে, তা খুঁজে পাচ্ছি না। কল কল তানে মহানন্দে বয়ে চলছে হেলমান, ফারারুদ, ফরিরোদ, কুনার ও লোগার নদীরা। তাদের মধ্যেও যেন এক পুলক শিহরণ। এত শান্তি, এত আনন্দ এত স্নিগ্ধ সমীরণ পৃথিবীর কোথাও দেখিনি ও অনুভব করিনি। অনেক পরিবারকে আমার নিজ চোখে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তারা সমাজের সবচেয়ে গরীব, দু'বেলা পেট ভরে আহার করতে পারে না ওরা। তবু গালভরা হাসি দেখে নয়ন জুড়ায়। তাদের দিকে তাকালে বুঝা যায় তাদের যেন দুঃখ নেই, বেদনা নেই, চিন্তা ও পেরেশানী নেই। যদিও এসব পরিবারের একাধিক সদস্য শহীদ হয়ে গেছে এবং একাধিক সদস্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। ওদেরকে দেখলে মনে হয় অভাব, অনটন, উপোস-কাপুস তাদের গৌরবের বস্তু ও নিত্য দিনের সাথী।

* আফগানিরা ধর্মানুরাগী, স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। যা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা দয়ালু, বিনয়ী, কর্মঠ, জেদী ও অন্যায়ে আপোষহীন। দেশ প্রেমের কিঞ্চিত নমুনা হাটে বাজারে গেলেই সহজে দেখা যায়। তা হল, বাজারের অলিতে-গলিতে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে রয়েছে বড় বড় দান বাক্স। বাক্সের গায় লেখা রয়েছে আফগান জিহাদে সাহায্য করুন। আফগানের জনসাধারণ সারা সপ্তাহে অতি কষ্ট করে যা রোজগার করে তা নিয়ে বাজারে যায় বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও মাসুম বাচ্চাদের জন্য হাট বাজার করতে। ঐ সব হাটুরে লোকেরা কেনা-কাটা কম করে পয়সা বাঁচিয়ে দান বাক্সে ফেলে। নিজেদের প্রয়োজনের মত জিহাদকেও পারিবারিক সমস্যা বানিয়ে নিয়েছে। যার কারণে মুক্ত হস্তে সবাই দান করেন।

* আফগানিস্তানের গ্রাম-গঞ্জেও আমি চষে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথাও কোন অন্যায় অপরাধ হতে দেখিনি। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, বেপর্দাগীরি, গান-মদ ও জুয়ার আড্ডা চোখে পড়েনি। দেখিনি কোন দেয়ালে লগ্ন পোস্টার আর শুনিনি কোন গানের আওয়াজ। বর্তমান বিশ্বে এমন একটি দেশ রয়েছে যার কল্পনা করা যায়না।

* আফগান জাতির মত এত ধর্মানুরাগী এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে নেয়ার যোগ্যতা অন্য কোন দেশের মুসলমানকে দেখিনি। আজান ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে দোকানিরা বেচা-কেনা বন্ধ করে, মসজিদ পানে ছুটে যায়। গাড়ী-ঘোড়া থেকে নিয়ে মিল ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা আজানের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি রাস্তা-ঘাটে, হাটে বাজারে কোন লোকজনকে চলাফেরা করতে দেখিনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন তার নিজস্ব নেযামের

উপর পরিচালিত হয়; ঠিক গোটা দেশটাকেই যেন আমার কাছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে হল।

* আফগানিস্তানের কোন অফিস-আদালতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমন কি পথে-ঘাটেও মহিলাদের আনা-গোনা পরিলক্ষিত হয়নি। হাঁ, মাঝে-মধ্যে যদিও দু'একজন মহিলা নজরে পড়েছে, তারা সবাই আপাদ-মস্তক কালো বোরকায় আচ্ছাদিত। চোখ দু'টি ছাড়া শরীরের তিল পরিমাণ অংশও দেখার সুযোগ নেই। অনেক মহিলার সাথে ভাব জমানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সালাম ছাড়া একজন মহিলার সাথেও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। এমন কি কোন প্রশ্ন করেও উত্তর পাইনি।

* আমি শুনেছি, তালেবানরা ক্ষমতা দখলের পর ৪৫ দিনের মধ্যে দাড়ি রাখার হুকুম দিয়েছে। এর মধ্যে সবাই দাড়ি মুণ্ডানো বন্ধ করে দিয়েছে। সারা দেশ জুড়ে দাঁড়ি ছাড়া একজন লোকেরও সাক্ষাত পাইনি। আমি একবার কয়েকজন সংখ্যালঘু উপজাতিকে দেখে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের পরনে দেখি মুসলমানদের ঢিলে-ঢালা পোশাক, মাথায় পাগড়ী আর মুখ ভরা লম্বা লম্বা দাড়ি। তাহলে কি তালেবানরা তোমাদেরকে তাদের পোশাক পরার জন্য, তাদের বেশ ধরার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করে? উত্তরে তারা বললেন, "না! তালেবানরা খুব ভাল মানুষ। ওরা আমাদের উপর কোন টর্চারিং করেন না। আমাদের ধর্ম-কর্ম করতে বাঁধা দেয় না। এমন কি কোন কোন সময় উৎসাহিতও করে থাকে। আমরা ইচ্ছা করে তাদের পোশাক এই জন্যই ধরেছি যে, আমরা রাস্তায় বেরুলে সবাইকে দেখি দাড়িওয়ালা। সবাই ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিহিত; তখন আমাদেরকে উলঙ্গ বলে মনে হয়। আমাদের কাছে খুবই লজ্জা লাগে। তাই আমরা নিজ ইচ্ছায় মুসলমানদের বেশ ধরেছি।

* পনের বিশ দিন পর আমার গাইড রহিম দাদ জানালেন যে, আমি আর আপনাকে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে পারব না। কারণ তালেবানরা যদি সন্দেহ করে বসে, তবে আর রক্ষা নেই। কাজেই আমার পাওনা পরিশোধ করুন। আপনি আপনার পথ ধরুন, আর আমি আমার পথ ধরি।" আমি লোকটিকে বুঝিয়ে বললাম, আমার কাছে জাতিসংঘের সনদ রয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে আমার রয়েছে পরিচয় পত্র। কাজেই অত সহজে আমাদেরকে কিছু করার সাহস পাবে না। এসব বলার পরও রহিমদ দাদ আমার কথায় কর্ণপাত না করে গাড়ী নিয়ে চলে আসলেন।

* এখন আমি সঙ্গী ছাড়াই সফর করতে লাগলাম। একবার জালালাবাদ থেকে কাবুল যাওয়ার পথে তালেবানরা এক চেক পোস্টে আমার গাড়ীর গতি রোধ করেন। আমি গাড়ী থেকে অবতরণ করে গুড-আফটারনুন বলে তাদের সামনে দাঁড়ালাম। আমার পরনে ছিল হাফ প্যান্ট, গায়ে সুর্মা রং এর হাতা কাটা মোটা গেঞ্জি। চোখে গগলস্ মাথায় ক্যাপ, কাঁধে ঝুলানো ছিল একটি ব্যাগ ও একটি ক্যামেরা। আমি যে একজন বিদেশী তরুণী তা তারা বুঝতে পেরেছেন। দু'জন তালেবান বয়সে আঠার থেকে বিশের কোঠায়। ওরা আমার গাড়ী তল্লাশী করলেন। তারপর পশ্তু ভাষায় আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। পশ্তু ভাষা অনেক আগেই আমি রপ্ত করেছিলাম। তাই পশ্তু ভাষায়ই জবাব দেয়ার চেষ্টা করলাম। এক পর্যায়ে আমি যে একজন সাংবাদিক তার প্রমাণাদি তলব করলেন। আমি আমার পরিচয় পত্র ও সনদ তাঁদের সামনে পেশ করলাম। আমার প্রমাণপত্র ছিল ইংরেজিতে লেখা। তারা ইংরেজি কিছুই বুঝে না। তাই কাগজ পত্র নিয়ে হাসাহাসি

করছিলেন। একজন পশ্‌তু ভাষায়ই আমাকে বললেন যে, "আমরা তোমার কাগজ-পত্র কিচ্ছুই বুঝি না কি লেখা রয়েছে এতে তা বুঝিয়ে বল।"

আমি আমার প্রমাণাদী পশ্‌তু ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলাম। ওরাও সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিলেন।

অতঃপর তারা আমাকে একটু দূরে রেখে ৫/৭ মিনিট কি যেন পরমার্শ করলেন। তারপর আমাকে নিয়ে চলে গেলেন তাদের আস্তানায়। তখন ছিল সন্ধার পূর্ব মুহূর্ত। সূর্য অস্ত যাওয়ার আর বেশি বাকি নেই। আমি মনে মনে ধারণা করলাম, নিকটে কোন হোটেলে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু হাট-বাজার নিকটে না থাকায় তাদের আমন্ত্রণে মুজাহিদ ক্যাম্পে রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

রাত্রে মুজাহিদরা পৃথক একটি তাঁবুতে আমার থাকার এন্তেজাম করলেন। খানা-পিনার জন্য করলেন সাহী ব্যবস্থা। বকরি জবাই করে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খানা পাকানো হল। আমি বুঝতে পারলাম, এ আয়োজন শুধু আমাকে কেন্দ্র করে। অন্যথায় ওরা এসব খাবারের ব্যবস্থা করতেন না। ৪/৫ জন মিলে একই প্লেটে আহার করতে আর কোনদিন দেখিনি। এবার আমি নিজেও তাদের সাথে বসে খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তা আর ভাগ্যে জুটেনি। মনে হয় মেয়ে হিসেবে ওরা আমাকে সঙ্গে নেননি। আমি একাই এক প্লেটে খানা খেলাম।

খানা পিনা শেষ করে আমরা এক জায়গায় বসলাম। খানার পরে মদ পান করা ছিল আমার চিরাচরিত অভ্যাস। ওদের সামনে মদ পান করলে হয়ত রক্ষা নেই। তাই চিন্তা করছিলাম, কি করা যায়? হঠাৎ মনে মনে কল্পনা করলাম যে, গাড়ী চেক করার সময় তো মদের বোতলটিও নড়াচড়া করেছেন, কিন্তু কিছুই বলেননি, তা হলে নিশ্চয় তারা তা চেনেন না। তাই ঔষধ বলে তাদের সামনে পান করলে ওরা বুঝতে পারবে না। এসব চিন্তা করে গাড়ী থেকে বোতলটি এনে ওদের সামনেই পান করতে লাগলাম। তালেবানরা মনে করেছেন, হয়ত সীরাপ পান করছি। একজন মুজাহিদ বলে উঠলেন, "তুমি কি ঔষধ পানর করছ? আমাকেও একটু দেবে?" আমি চিন্তা করে বললাম, না দেয়া যাবে না। কারণ এ কোর্স আমাকেই শেষ করতে হবে। অন্যদেরকে দিলে কোর্স পুরা হবে না। তারাও বিনাবাক্যে কথাটা মেনে নিল। এ ঘটনাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, তালেবানরা কত সরল। কোন কপটতা, ধোঁকা দেয়া বা মিথ্যা বলা তাদের দ্বারা অসম্ভব। এত সরল-সোজা ও কপটতাহীন মানুষ অন্য কোন রাষ্ট্রে আছে বলে মনে হয় না।

অতঃপর বিশ্রামের জন্য নির্বাচিত খিমায় যেতে চাইলে রাসূল খান নামক এক মুজাহিদ বারণ করে বললেন, "আপনার সাথে আমাদের কিছু আলোচনা আছে। আলোচনার পর বিশ্রাম করবেন।" আমি সম্মতি জানালে তিনি বললেন, "জনাবা! আপনি আমাদের ভিনদেশী মেহমান। ইসলামী এমারতে আপনি বেইজ্জতীহন, তা আমরা চাই না। তবে এদেশে থাকাকালীন আমাদের কিছু নিয়ম-নীতি আপনাকে মেনে চলতে হবে। এটা আপনার জন্য হবে খুবই হিতকর। "আপনি এদেশে চলতে হলে আপনার পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, আপনি একজন সুশ্রী যুবতী। এ ধরনের নগ্ন পোশাকে আপনাকে দেখলে যে কোন যুবকের অন্তরে যৌন সুড়সুড়ি আরম্ভ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। গোনাহ্ করা বা গোনাহের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার মত কোন কাজ করাও বৈধ নয়। কাজেই আপনাকে আবারও বলব, আপনার এ পোশাক পরিহার করে ইসলামী

লেবাস পরিধান করুন। ২য় নসিহত এই যে, আপনি যা দেখছেন বা দেখবেন, তা সত্য সত্য দুনিয়াবাসীকে জানাবেন, মিথ্যার কোন আশ্রয় নিতে পারবেন না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যা লিখবেন বা সংবাদ পাঠাবেন, তা যদি তালেবানদের বিরুদ্ধেও হয় তবু কোন মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না। আর তৃতীয় নসিহত হল, ইসলাম সত্য ধর্ম, মানবতার ধর্ম, ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম। কাজেই ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ইসলামের পক্ষে কাজ করুন, এতে দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের ফায়সালা হবে।

* তালেবানদের অমায়িক ব্যবহার ও মনোমুগ্ধকর আচরণ সত্যি আজীবন ভুলতে পারব না। আমি মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম যে, যিশু তো একথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি সত্য কথা বলতে, মিথ্যা পরিহার করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তা হলে কেন আমি মিথ্যার আশ্রয় নেব? কেন আমি একটি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করব? এসব করলে তো প্রভু যিশু আমার প্রায়শ্চিত্ত করবেন না। এসব ভেবে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন মিথ্যার আশ্রয় নেব না। তালেবানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করব না। অতঃপর আমি পোশাক পরিবর্তনে রাজি হয়ে গেলাম। তালেবানরাও খুব খুশী হলেন।

গভীর রাত। বিশ্রামের জন্য তারা আমাকে এক নিবৃত খিমায় নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে নিদ্রা যাওয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলাম। দু'জন তালেবান সারারাত আমার হেফাজতের জন্য খিমা পাহারা দিলেন। কোন সময় এরা তাঁবুর ভিতর উঁকি দিয়েও তাকাল না। রাতের শেষ প্রহরে নিদ্রা ভঙ্গ হলে আমি খিমা থেকে বাইরে আসি। প্রহরীরা দৌড়িয়ে এসে আমার কি প্রয়োজন তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, না-কিছুর প্রয়োজন নেই। একটু পায়চারী করতে বের হলাম। সে সময় এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখি, বেশ কয়টি তাঁবুতে মিটমিট করে প্রদীপ জ্বলছে আর তারই অভ্যন্তরে ওরা উপাসনায় লিপ্ত। নিঝুম রাতের শেষ প্রহরে প্রভুর সমীপে মস্তক অবনত করে প্রার্থনা করছে। এমন দৃশ্যও অতীতে আমি কোন ধর্মাবলম্বীর নিকট থেকে পাইনি। মনে মনে ভাবলাম, সত্যিকার অর্থে এরাই যীশু খৃষ্টের অনুসারী। আসলে আমরা মিথ্যা দাবীদার।

সত্য কথা বলতে কি, পৃথিবীতে যত সব ধর্ম প্রচলিত আছে, প্রায় সব ধর্মের লোকদের সাথে আমি চলাফেরা করেছি। তাদের আচারানুষ্ঠান অবলোকন করেছি। কিন্তু তালেবানদের মত এত সভ্য, ভদ্র ধর্মানুরাগী, অন্য কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি। অন্যসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নারী আসক্তি খুব বেশি, জাত ভেদ জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই। অনেক ধর্মাবলম্বীদেরকে আমার সাথে দৈহিক মিলনে পেয়েছি আর তালেবানদেরকে পেয়েছি তার উল্টো। তারা ধর্মীয় অনুশাসনের খুবই অনুরাগী।

আমি ভোরে চলে আসার আয়োজন করছি। তালেবানরা আমাকে নাস্তা না খাইয়ে ছাড়েন নি। তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়ে বিদায় দিলেন। আমার গাড়ীটি ছিল ভাড়া করা, ড্রাইভিং নিজেই করেছি। গাড়ীতে জ্বালানী ছিল কম। নিকটে কোন পেট্রোল পাম্প আছে কি-না, তা জানতে চাইলে একজন বললেন, "৭০/৮০ কিলোমিটারের আগে কোন পাম্প পাবেন না।" এই বলে তাঁরা আমার জ্বালানীর ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু বিনিময়ে কিছু ডলার দিতে চাইলে গ্রহণ করেননি।

* আফগানীদের মত মেহমান রেওয়াজী অন্য কোন দেশের মধ্যে আছে কিনা, আমার জানা নেই। সৌদী আরবেও মেহমানদারীর রেওয়াজ আছে, তবে আফগানীদের তুলনায় খুবই কম। আমি ৭০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে গিয়ে ১০/১২ স্থানে

গাড়ী থামাতে হয়েছে। কারণ গাড়ীর আওয়াজ শুনেই ছোট বালক-বালিকারা এসে রাস্তা আগলিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গাড়ী থামানোর ইঙ্গিত করে। আমি ভাবলাম হয়ত সাহায্য চাওয়ার জন্য হাত নাড়ছে এবং গাড়ী থামাচ্ছে। তাই গাড়ী থামিয়ে নীচে নেমে এসে ব্যাগ খুলে কিছু ডলার বের করে দিতে চাইলাম। কি আশ্চর্য, তারা একটি ডলারও গ্রহণ করেনি। আমি অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। তারপর জানতে পারলাম, ওরা মেহমানদারী করানোর জন্য আমার গাড়ীর গতি রোধ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন বাড়ী থেকে নিয়ে এল রুটি, ভুনা গোস্ত, কাবাব, খিচুরী, ছাগলের দধি ও শরবত। আফগানী বালক-বালিকাদের এ আচরণ আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। বেশ কয়েক জায়গায়ই আমি এ ধরনের আচরণের সম্মুখীন হয়েছি। ইস! কতই না সভ্য জাতি ওরা!

* সেখান থেকে বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে একটি মহল্লায় এসে উপস্থিত হলাম। উক্ত মহল্লায় অনেক লোকজনের ভীড়। বিরাট উৎসব। দেখেই মনে হয় ওরা যেন বড় দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করছে। কিন্তু মুসলমানরা তো বড়দিন পালন করেন না, আর এটা তো সে মাসও নয়! তা হলে.....?

তারপর বড়দের হাঁকা-হাঁকি, ডাকা-ডাকি, কানাকানি আর ছোটদের হৈ-হুল্লোড় দেখে মনে হল নিশ্চয় এটা বিয়ের অনুষ্ঠান। আমি কৌতূহলে গাড়ী থামিয়ে ক্যামেরাটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সম্ভব হলে দু'একটি ফটো নেবো। হায়! একি আশ্চর্য! একটু এগিয়ে দেখি পাশপাশি তিন তিনটি লাশ, রক্তমাখা অবস্থায় শুয়ে আছে। এখনো খাটিয়া থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে। এরা তিন সহোদর। রণক্ষেত্র থেকে মুজাহিদরা তাদের সহযোদ্ধাদের নিয়ে এসেছে। কি অপরূপ এ দৃশ! পাগল করা সুঘ্রাণে পুরো এলাকাটাই যেন সুরভিত। পৃথিবীতে এমন কোন নাসিকা নেই, যা অতীতে কোন দিন এমন সুঘ্রাণের সাথে সাক্ষাত হয়েছে।

লাশ পেয়ে মহোল্লাসে গোটা এলাকা ভেঙ্গে পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে একজন মধ্যবয়সী শ্মশ্রুমণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তি বললেন, এ তিন যুবক আমেরিকান বাহিনীর ক্রুজ মিজাইলে শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এরা সবাই জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন। তাই সবাই আনন্দিত, গর্বিত ও প্রশান্ত। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির কথা শুনে আমি আর একটু এগিয়ে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় করলাম। তারপর নিহত ব্যক্তিদের মাতা-পিতার অবস্থা দেখে মনে হল, এরা যেন সবচেয়ে বেশি খুশী ও আনন্দিত। পরপর আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, "এ তিন যুবক যদিও আমাদের পরিবারের সদস্য নন, কিন্তু এরা আমাদের প্রতিবেশী, তাই আমরা গর্বিত। আমাদের এ গ্রামের ৩ যুবক শহীদ হয়েছেন।" অন্য এক ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আমাদের আত্মীয় শহীদ হয়েছেন বলে আমরাও গর্বিত। এমনিভাবে একেক জন একেক সূত্র ধরে আনন্দিত। এ দৃশ্য অবলোকন করে মনে মনে ভাবলাম, যে জাতি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ও স্বাগত জানায়, সে জাতির সামনে অন্য কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। পৃথিবীর মধ্যে এরাই হবে চির উন্নত মম শীর। চলার পথে এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে দেখলাম, রাস্তার দু'ধারে রয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সমাধি। কেউ যদি আফগানিস্তানের নামকরণ করে 'কবরস্থান', তবে ভুল হবে না। তার উক্তি যথার্থই প্রমাণিত হবে।

* বিকাল ৪টায় আমি রাজধানী কাবুলের সন্নিকটে এসে হাজির হলাম। শহরে প্রবেশ পথে রয়েছে চেক পোস্ট। আমার গাড়ী থামিয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলেন শ্মশ্রুধারী,

পাগড়ী পরিহিত ৪/৫ জন তালেবান। হাতে তাছবীহমালা, কাঁধে ক্লাশিন কভ ও পায়ে জঙ্গল পাদুকা। প্রথমে এরা আমার গাড়ী চেক করলেন। তারপর আমার কাগজ পত্র দেখলেন। আমার মনে হল, এরাও আমার কাগজ বুঝেন নি। তাই ঊর্ধ্বতন একজন তালেবান নেতার নিকট সবগুলো কাগজ নিয়ে গেলেন। তিনিও কাগজ পত্র ভাল ভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলেন। একজন আমাকে পশ্‌তু ও ফারসি মিশ্রিত ভাষায় আমার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আমি আমার সুবিধামত উত্তর দিলাম। আমার উত্তর শুনে অপর একজন বললেন, "আচ্ছা, আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন, তবে সাবধান! মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না।" তিনি আরো বললেন, এ পোশাকে কিছুতেই আপনি কাবুলে ঢুকতে পারবেন না। অবশ্যই ইসলামী পোশাক পরতে হবে এবং আপাদ মস্তক বোরকায় আবৃত করতে হবে। তাদের কথা শুনে আমি ওজরখাহী করে বললাম, শহরে প্রবেশ করে আমাকে পোশাক খরিদ করার সুযোগ দিন। আমার প্রার্থনা শুনে খুবই শান্ত মেজাজে, নম্র ভাষায় বললেন, না আমরা দিতে পারি না। আমাদের আমিরুল মুমেনীন ফরমান জারী করেছেন, ৪৫ দিনের মধ্যে দাড়ি রাখতে হবে। সারা দেশব্যাপী এর উপরই আমল হচ্ছে। কোন মহিলা কোন প্রয়োজনে রাস্তায় বের হলে তাকে অবশ্যই বোরকা পরে বেরোতে হবে। মহিলারাও এর উপর যথাযথভাবে আমল করে উক্ত ফরমানের উপর সম্মান-প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজনকে শহরে পাঠিয়ে আমার পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি আমার পোশাক পরিবর্তন করে শহরে প্রবেশ করলাম। তখন রাত ৮টা। একযোগে মসজিদগুলো থেকে আযান ধ্বনিত হচ্ছে। সাথে সাথে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ করে দলে দলে মানুষ মসজিদ অভিমুখে ছুটে চলল। আমি হোটেল তালাশ করতে গিয়ে বেশ কয়টি অলি-গলি প্রদক্ষিণ করছিলাম। পুরো শহরটাই ভূতুরে নগরী হিসেবে মনে হল। অনেক দোকান-পাট খোলা রেখেই মসজিদে চলে গেছে। এ ধরনের আশ্চর্য ঘটনা কোনদিন শুনিও নি আর দেখিও নি।

একাধিক বড় বড় তালা ঝুলিয়ে মার্কেট গেইটে অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করার পরও চুরি-ডাকাতী ও লুট হচ্ছে। আর কাবুলে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবে তা কল্পনাও করা যায় না। হাঁ, মাঝে মধ্যে দু'চারজন অস্ত্রধারীকে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। এক পর্যাযে দু'জন পথিককে গ্রেপ্তার করতে দেখলাম। অতঃপর আমার কাছে এসে ঘুরাফেরার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, আবাসিক হোটেল তালাশ করছি। তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে থানায় নিয়ে গেলেন। আর জামাতে নামাজ না পড়ার অপরাধে দু'জনকে কিছু প্রহার করে ছেড়ে দিলেন। থানার ওসি আমার পরিচয় জেনে সরকারি মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে গাড়ী পার্কিং করে রাত্র যাপনের ব্যবস্থা নিলাম। মেহমানখানায় থাকা, খাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। অনেক মানুষই মেহমানখানায় রাত যাপন করেছেন। মহিলা হিসেবে আমাকে ভিন্ন কামরা দেয়া হল। আমি সেখানে নিরাপদে রাত্রি যাপন করি।

* আমি পৃথিবীর বহুদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। অনেক ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কোথাও এমন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিনি। এমন কোন রাত অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে দু'চারজন পুরুষ আমার কাছে যায়নি। কিন্তু আফগানিস্তানে তার বিপরীত। কোন পুরুষ কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। আমাদের ধর্মমতে যুবক-যুবতীর সম্মতিতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাই বৈধ। তা ছাড়া আমরা যখন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি, তখন একটি কথা বার বারই বলা হত, তা হল, নারীরা মধু মক্ষিকার ন্যায় মধু লোভী, ফুল পেলেই ঝাপিয়ে

পড়ে। ঠিক তেমনটি পুরুষরা নারীলোভী। তারা নারীদের পেলেই মিলনের চেষ্টা করে। তাই তোমাদের দেহ বিলিয়ে হলেও গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করবে। পুরুষের সাথে যদি ভাব জমাতে পার, তবে মনের গভীরে পৌঁছে গোপন তথ্যের সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। আর বাস্তবে তার প্রমাণও পেয়েছি যথেষ্ট। পুরুষরা গোপন তথ্য উদ্ধার করতে যতটুকু অবদান রেখেছেন, আমরা মহিলারা তার চেয়ে শত গুণ বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছি। তথ্য সংগ্রহে বৃটিশ পুরস্কার মহিলারাই বেশি পেয়েছে। কিন্তু তালেবানরা তার ব্যতিক্রম। ওরা বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর গায়ে হাত দেয়া জঘন্যতম অন্যায় মনে করে। এটা নাকি তাদের ধর্মমতে অবৈধ বা হারাম।

* তালেবান সরকারই নারী সমাজের স্বাধীনতা ও অধিকার দান করেছেন। নারীদেরকে রাণীর আসন দান করেছেন। নারীরা অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতেন। নারীরা যত্রতত্র পুরুষের হাতে হত লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা। ছিল না তাদের কোন নিরাপত্তা। ঠিক সে সময় তালেবান-সরকারই নারীদেরকে হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট ও কল-কারখানা থেকে রাজ-রাণীর মত ঘরে তুলে বেকার ভতা দিতে আরম্ভ করলেন। তার পাশাপাশি নারীদের কর্ম-সংস্থানের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা আরম্ভ করলেন।

* নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির দাবী নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো বিশ্বব্যাপী আওয়াজ তুললেন। সে আওয়াজের সাথে সুর মিলিয়ে অন্যসব দেশের বুদ্ধিজীবী ও নারী সংগঠনগুলো বিলাপ জুড়ে দিলেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলোও কম লাফা-লাফি করেনি। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের জন্য স্বর্গ রাজ্য কায়েম করে দিবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এখন মহিলারা পুরুষের পাশাপাশি বসে অফিস করতে পারছে ঠিকই কিন্তু এসিডদগ্ধ, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, অপহরণ থেকে কি রেহাই পেয়েছি? ছিঃ নারী স্বাধীনতা, ধিক নারী মুক্তি আন্দোলনের। সে সমস্ত নারীমুক্তি আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা কতই না আইন করেছে, সে সব আইন গোল্লায় গিয়েছে।

* আমি গত দু'মাস আগে ভারত, বাংলাদেশ সফর করে এসেছি। সেখানে দেখেছি "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" সে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হিন্দু-মুসলিম অল্প, মাজারী ও বৃদ্ধা বয়সী নারীদেরকে বেলচা, কুদাল আর টুকরী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগিয়েছে। তা ছাড়া হাজার হাজার মহিলাদেরকে ২০/২৫ তলা বিল্ডিং নির্মাণের কাজে লাগিয়েছে। কেউ ইট, কেউ পাথর ভাংছে। কেউ এগুলো বহন করছে। আঃ কি করুণ দৃশ্য! গতর খাটা কাজের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি কষ্ট মাটি কাটা, ইট ভাঙ্গা ইত্যাদি। আর এসব হতভাগীদের ভাগ্যে এ কঠিন কাজগুলোই জুটল। কোথায় মানবাধিকার সংস্থাগুলো? কোথায় নারী মুক্তির প্রবক্তারা? তোমরা আজ মুখ থুবড়ে অন্ধের ভান ধরে আছ কেন? দেখনি ও সব মা-বোনদেরকে, কেমন করে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে? তোমরা দেখে যাও তালেবান সরকার আর তাদের শাসন পদ্ধতিকে। কেমন করে নারীদেরকে দান করেছে উচ্চ আসন।

* বর্তমান মানবাধীকার সংগঠনগুলোর উচিত আল্ মাগরিবী বা ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চক্ষুর চিকিৎসা নেয়া। বোবা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে জিহ্বা অপারেশণ করে সত্য কথা বলার চিকিৎসা করা। তথাকথিত মানবাধীকারী ধ্বজাধারীরা দেখেনি ঐ সব মা-বোনদেরকে, যারা শহরের ড্রেইনগুলো দিনরাত পরিষ্কার করে চলছে,

আর ঝাড় দিচ্ছে হাট-বাজারের অলি-গলি ও পথ-ঘাটগুলো। মেথরের কাজে মহিলাদেরকে লাগানো হয়েছে। এটা সভ্য জগতের নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতা! মেথররা প্রমোশন পেয়েছে। আর নারীরা হয়েছে তাদের স্থলাভিষিক্ত।

* আমি আফগানিস্তানের প্রায় প্রতিটি শহরে শহরে চষে বেড়াচ্ছি। আমেরিকানদের গোলার আঘাতে সবগুলো শহর লণ্ড-ভণ্ড দেখতে পেলাম। যেন সবেমাত্র কাল-বৈশাখীর ছোবল থেকে দেশটি রক্ষা পেয়েছে। কোন ঘরের ছাদ, কোন ঘরের বেড়া কোন ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছে রাক্ষুসী গোলারা।

এমন কোন পরিবার আফগানিস্তানে আছে বলে আমার জানা নেই, যে পরিবারের একজন সদস্যও শহীদ হয়নি। অনেক পরিবার এমন রয়েছে, যে পরিবারের মাত্র একজন সদস্য এখনো জীবিত রয়েছে। বাকী সবাই শহীদ হয়ে গেছে। আবার এমন পরিত্যক্ত বাস্তু ভিটা অবলোকন করেছি, যেখানে নিষ্ঠুর গোলায় কেড়ে নিয়েছে পরিবারের সব সদস্যদেরকে। পরিত্যাক্ত ঘর দরজা ও বাগ-বাগিচাগুলো স্বজন হারা বেদনায় নীরব ভাষায় আর্তনাদ করছে। আমেরিকা, বৃটিশ, ইসরাইল ও ফ্রান্সের এ কর্মকাণ্ড। এসব দেশ বর্বরতার সোপান পেরিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছে। নিজ চোখে এসব ধ্বংসলীলা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

* তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্ববাসী তিরস্কার দিবে তালেবানদেরকে, এমন লেখা-লেখির জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আফগানিস্তানের মানচিত্র বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার জন্য সব ধরনের কূটনৈতিক চাল অব্যাহত রাখার জন্যই আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু তালেবানদের আচার-আচরণ দেখে, রাষ্ট্র পরিচালনার নিখুঁত কার্যক্রম দেখে আমার আত্মা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা বা কিছু লেখার সাহস-বল সবই লোপ পেয়ে গেছে। মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করা আমার নিকট জঘন্য অপরাধ হিসেবেই মনে হল। তাই আমার কলম উল্টো দিকেই চালাতে লাগলাম। আমার মানবেতার নিকট বার বার এ প্রশ্ন জাগতে লাগল যে, আফগানরা তো অন্য কোন দেশের উপর হস্তক্ষেপ করেনি। অন্য কোন রাষ্ট্রের এক ইঞ্চি ভূমি দখল করেনি। অন্য কোন দেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আক্রমণ করেনি। তারা তো নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেনি। তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা লেখালেখি করে বিশ্ববাসীকে উস্কে দেব। তাদের তো বাঁচার অধিকার রয়েছে। দেশ রক্ষার অধিকার আছে। এ যুদ্ধ তো তাদের ধর্ম টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ, এ যুদ্ধ তো বাঁচার যুদ্ধ। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ। শতকরা ৯৯ জন জনগণ চায় ইসলামী শাসন। আর এতে তারা শান্তির মুখ দেখেছে। শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। তাহলে আমরা (আমেরিকা, বৃটিশ, ইসরাইল) কেন অবৈধভাবে আমাদের মতাদর্শ তাদের ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেব। তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের জন্য অমার্জনীয় ও জঘন্য অপরাধ।

* ভদ্রতা, সভ্যতা, মানবতা, উদারতা, বদান্যতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, পর দুঃখে কাতরতা ও খোদাভীরুতার সবক যদি কেউ পড়তে চায়, তবে তালেবানদের নিকট পড়তে হবে। তাদেরকে উস্তাদ হিসেবে মেনে নিতে হবে। আমি দুনিয়াবাসীকে আহ্বান করব, তোমরা সভ্যতা শিখে যাও তালেবানদের নিকট থেকে। তালেবানরা যে এসব গুণের অধিকারী। কয়েকটি ঘটনা থেকেই তার পরিচয় মিলবে।

* বাসের মধ্যে দেখেছি, কোন বয়স্ক লোক উঠলে তার সম্মানার্থে নিজের সীট ছেড়ে দিয়ে তাকে বসিয়ে দেয়। আবার এও দেখেছি, কারো কাছে ভাড়া কম থাকলে বা একেবারে না থাকলে, বাস কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কোন ধরনের দুর্ব্যবহার করে না। আবার পার্শ্ববর্তী যাত্রীরা তা জানতে পারলে নিজের পকেট থেকে পয়সা বের করে ভাড়া পরিশোধ করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাস কর্তৃপক্ষ বলেন, "আমরাই উনাকে ভাড়া ছাড়া নেব, আপনাদের দিতে হবে না।" এমন কোন দেশ আছে কি, যেখানে এমন উদারতার নজির পাওয়া যাবে?

* আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি গোলার আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট-ফট করছে। তাঁকে বাঁচানোর জন্য পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে মানুষ রক্ত দেয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইস্ একে অপরের জন্য কী দরদ, কী ভালবাসা! আমি আহ্বান করব, জাতিসংঘ নামক বর্বর সংগঠনের চেলা-চামুণ্ডা ও মানবাধিকার সংস্থার পাতি নেতা ও ডেংগা নেতাদেরকে। তোমরা আফগানিস্তানে এসে মানবাধিকারের সংজ্ঞা জেনে নাও। তারপর তোমরা মানবাধিকারের শ্লোগান উচ্চারণ কর। তা না হয় বিশ্ব সভ্যতা তোমাদের মুখে জুতো এঁটে দিবে।

* আমি দেখেছি, আফগানিস্তানের পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে অগণিত পঙ্গু নারী ও পুরুষদেরকে, যাদের হাত পা কেড়ে নিয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়ার নিক্ষিপ্ত গোলায়। কেউ মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে আবার কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আহ্! কত করুণ দৃশ্য! আমি ওদেরকে ভিক্ষা দিতে চাইলে ওরা গ্রহণ করেনি। ওরা তাদের ভাষায় বলে দিয়েছে। ভিক্ষা করা মহা পাপ। ভিক্ষা করা ভাল না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে, যে দেশে ভিক্ষুক নেই? স্বয়ং আমেরিকাতেও প্রতিদিন মানুষ না খেয়ে মরছে। পশ্চিমা দেশগুলোতেও আমি হাজার হাজার ডলার ভিক্ষা দিয়েছি।

* আমি আমার দেশ (বৃটিশ) ও পার্শ্ববর্তী দেশ অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলোর কথা বলছি। সেসব দেশের নারী-পুরুষদের মধ্যে কোন বাছ-বিচার নেই। নিজের বোন, নিজের মা, পর স্ত্রী, নিজের স্ত্রী সকলেই সমান। কুকুর কুকুরীদের মত তাদের আচরণ। ঠিক তেমনিভাবে মধ্যপ্রাচ্য, সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, আবুধাবী, দুবাই, আরব আমীরাত, ফিলিস্তিন মিশরসহ বেশ কয়টি দেশে বহুবার গিয়েছি। সেসব দেশেও জিনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপাদ-মস্তক বোরকা পরে বের হয়। দেখলে মনে হবে, হয়ত এরা তপস্যা থেকে বেরিয়ে আসছে। দুঃখের বিষয়, এসব মহিলাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ চলে যায় হোটেলে বা নাইট ক্লাবে। সেখান থেকে যৌন চাহিদা পূরণ করে আসে। প্রতিটি বাসায় বাসায় রয়েছে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাজের মেয়ে। এরাও নিরাপদে নেই। পিতা-পুত্র মিলে এদেরকে ব্যবহার করে। আমার মনে হয়, তালাশ করলে রাজ পরিবারেও এমন সদস্য পাওয়া যাবে (!) হ্যাঁ, তবে ভাল মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়।

আমি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও বহুবার সফর করেছি। সেসব দেশের অবস্থাও এ ধরনের। বাংলাদেশে দেখেছি, বড় বড় হোটেল গুলোতে রাত ৮ টার দিকে মেয়েরা হাতে পয়ে মুজা লাগিয়ে, আপাদ-মস্তক বোরকা পরে আসে। আলাপ করে জানতে পারলাম, এদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ে কলেজ-ভার্সিটিতে লেখাপড়া করে এবং হোস্টেলে থাকে। আর কিছু আছে, তাদের স্বামী দেশের বাইরে চাকুরী নিয়ে চলে গেছে।

আর কিছু আছে, ওরা ভদ্র ফ্যামেলির মেয়ে। বিবাহ না হওয়ায় এরা হোস্টেলে যাতায়াত করে। আর বাকিরা দেহ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এসব হোস্টেলে যারা যাতায়াত করে, এদের মধ্যে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সে সব হোটেলের অভ্যন্তরে মদ, গাজা, বিয়ার, হেরুইনের ব্যবসা করে। কোন কোন সময় পত্র-পত্রিকায় এসব সংবাদ ছাপা হয়।

পৃথিবীতে একমাত্র দেশ আফগানিস্তান, যেখানে জিনা-ব্যভিচারের বালাই নেই। নেই এ ধরনের কোন হোটেল। তালেবানরা এগুলোকে প্রথমে উৎখাত করে দিয়েছে।

বর্তমানে টিভি-কম্পিউটারের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জিনা-ব্যভিচারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বুড়া-বুড়ি, ছেড়া-ছেড়ি, যুবক-যুবতী সবাই এক সাথে বসে জিনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। টিভির মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে সে সব যুবক যুবতীরাই একে অপরের হাত ধরে বেরিয়ে যায়, পার্কে, ক্লাবে ও সমুদ্র সৈকতে। এমনিভাবে একদিন ওরা হারিয়ে যায়।

পৃথিবীতে একমাত্র দেশ আফগানিস্তান, যেখানে সমস্ত ডিস ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। টিভি চলে তবে অশ্লীলতা নেই। নেই বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা। তাই সেখানে জিনা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, চোখ খুলে নেয়া, এসব বর্বরতা নেই। হে সভ্যতার ধ্বজাধারীরা! তোমরা আফগানিস্তানে এসে সভ্যতা কাকে বলে দেখে যাও।

* কোন পিতা যদি মেয়েকে বিবাহ দিতে না পারে, চাই অর্থের অভাবে হোক কিংবা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, তখন এলাকাবাসী মিলে তাদের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করে দেয়। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে প্রশাসন তার জিম্মা নিয়ে নেয় এবং বিবাহ দিয়ে দেয়।

আমি দেখেছি, পৃথিবীর বহুদেশে যৌতুকের বিরুদ্ধে আইন পাশ করা হয়েছে। আসলে আইনের জায়গায় আইন রয়েছে। আর যৌতুকের জায়গায় যৌতুক। কিন্তু গোপনে গোপনে যৌতুক ছাড়া কোন বিবাহই হচ্ছে না। ঘটক এমন ভাবে কথা বলে, যা অন্যেরা টেরও পায় না। আর আফগানিস্তানে যৌতুক দেয়া-নেয়ার সংবাদ প্রশাসনের গোচরে গেলে আর রক্ষা নেই। যার ফলে সেখানে বিবাহ খুবই সহজ কাজ।

* আমি একাধিকবার আফগানিস্তানের আদালতে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি, মামলা-মোকদ্দমার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় একেবারে নগণ্য। যে কোন কঠিন থেকে কঠিন মামলা তিন মাসের মধ্যেই মীমাংসা করা হয়। তাছাড়া বেশির ভাগ মামলাই ১০/১৫ দিনের ভিতর নিষ্পত্তি করা হয়। সেখানে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া কাউকে বন্দী করে রাখা হয় না।

আমি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোর্ট-কাচারী ও আদালতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দেখেছি কারাগারসমূহকে। কত নিরাপরাধ মানুষ নিষ্ঠুর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তিলে তিলে, ধুঁকে ধুঁকে মরছে। টাকা-পয়সার অভাবে কেস পরিচালনা করতে পারছে না। এসব বন্দীরা প্রকৃতপক্ষে দোষী না নির্দোষ, তার কোন প্রমাণ নেই। কোন বিচারকের টেবিলে তাদের ফাইল নেই। বিচার ছাড়াই তাদেরকে পশুর মত বন্দী করে রাখা হয়েছে। ধিক্কার এ আইনের প্রতি আর লাথি সেসব আইনের কপালে। কেউ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে কেইস করে দিলে এবং টাকা ঢাললেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাল মন্দ যাচাই করা হয় না। দোষী হোক চাই নির্দোষ, টাকা খরচ করলেই তাকে ছাড়ানো যায়। আবার টাকা খরচ করলেই খুনী আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায়। এসব কালো আইনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে বিশ্বের জনগণ। মানবাধিকারীর চেলা-চামুণ্ডা

ও বদমাইশরা এসব দেখছে না। এসমস্ত মজলুম ও নিরাপরাধী মানুষের পার্শ্বে কেউ দাঁড়াচ্ছে না।

আফগানিস্তানের আদালতে ঘুষ তো দূরের কথা, কেউ যদি গোপনেও ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করে, তবে তারও রক্ষা নেই। কত সুন্দর ইনসাফ, কত ন্যায় বিচার। অতি সহজে জনগণ ন্যায়বিচার পাচ্ছে। তাই আফগানবাসী তালেবান ও কুরআনী শাসনকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন।

* আফগানিস্তানের দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলো আমি বহুদিন পর্যন্ত খুব ভালভাবে দেখেছি। পরস্পর বিরোধী কোন সংবাদই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়টা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। হেড লাইনে একটু এদিক-সেদিক দেখতাম। আসল সংবাদ ছিল একই। পৃথিবীর কোন দেশের পত্র-পত্রিকা এ ধরনের দেখেনি। পত্রিকার সংবাদ পেয়ে বহু স্থানে আমি নিজে গিয়ে যাচাই করে দেখিছি, প্রকাশিত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য।

আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে যে সত্য উদ্ঘাটন করেছি, তা হল আফগানিস্তানে তালেবান ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল নেই। প্রতিপক্ষ না থাকলে মিথ্যার আশ্রয় নেবে কোন দুঃখে? অন্য সব দেশে রয়েছে শত শত পার্টি। অপরাধী ব্যক্তি যে কোন পার্টির সদস্য অবশ্যই হবে। তাই সে পার্টির সমর্থিত পত্রিকাগুলো দোষ আড়াল করে দোষী ব্যক্তির সাফাই গাইতে থাকে। সাফাই গাইতে গাইতে তাকে ফেরেস্তার কাতারে নিয়ে দাঁড় করায়। আর প্রতিপক্ষকে দাঁড় করায় কাঠ গড়ায়। বর্তমানে পত্র-পত্রিকাগুলোর সংবাদ সত্য-মিথ্যা নির্বাচন করতে খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। জনগণও যে যাকে ভালবাসে, সে পক্ষকেই গ্রহণ করে নেয়। ফলে সত্য নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে। আফসোস এ সমাজের! আফসোস বিশ্ব বিবেকের!

* আমি মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (যিনি আমীরুল মুমেনীন নামে খ্যাত, যিনি আফগানিস্তানের ধর্মীয় নেতা ও শাসনকর্তা) সাহেবের বাসভবনে তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ ইসলামী লেবাসে। ভেবেছিলাম, যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, তার সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, জাঁক-জমক, দাস-দাসী ও চাকর-নওকরের অভাব নেই। কিন্তু আমার ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। কল্পনা করতেও অবাক লাগে। আমি কাবুল থেকে কান্দাহারে মোল্লা ওমরের আঙ্গিনায় এসে গাড়ী থামালাম। সাথে সাথে অল্প বয়স্ক ৫/৭ জন অস্ত্রধারী মুজাহিদ এসে গাড়ীসহ আমাকে চেক করে আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আমি মোল্লা ওমরের সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য প্রার্থনা জানালে অন্য একজন মুজাহিদ এজাজতের জন্য ভিতরে প্রবেশ করলেন। একটু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনি ক্যামেরা ও ব্যাগ রেখে আমার সাথে আসুন।" অতঃপর খাতা কলম নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা জানালে অনুমতি দিলেন, আমি খ্রিস্টীয় নিয়মে সম্মান প্রদর্শন করে কক্ষের এক কোণে আসন গ্রহণ করলাম।

কক্ষে ১০/১২ জন লোকের সংকুলান কঠিন হবে। এ ছোট্ট কক্ষটি মোল্লা ওমরের অফিস। তার সম্মুখে সাধু প্রকৃতির ৬ জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নীরবে ধ্যানমগ্ন বসে থাকতে দেখলাম। দেয়াল সংলগ্ন আলমীরাতে রয়েছে বড় বড় কিতাব। এত বড় বড় কিতাব এর আগে আমি কখনো দেখিনি। চেয়ার-টেবিল সোফা বলতে কিছুই নেই। চাটাই এর উপর রয়েছে একটি গালিচা। তাও মাঝে মধ্যে ছেঁড়া। সামনে ডেস্কের মত একটি বস্তু। নেই কোন ফুলদানী, নেই কোন সাজ-সজ্জা। সকলের গায়ে মামুলী পোশাক। মাথায় পাগড়ী ও

হাতে তছবীহ্। গোফ-দাড়ী ও চুল লম্বা। সকলেই একটু চিন্তামগ্ন। মোল্লা ওমরের গায়ের জামাটি পুরাতন। তাক থেকে কিতাব নামানোর জন্য দাঁড়ালে জামাটিতে কয়েকটি তালী লাগানো দেখলাম। প্রায় ৩০ মিনিটের মত প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। এর মধ্যে তাঁকে বা অন্য নেতাদেরকে আমার দিকে একটি বার চোখ তুলে তাকাতে দেখিনি। কি আশ্চর্য মানুষ এরা! আমি পশ্‌তু ভাষায় আলোচনা করেছি।

আমাদের আলাপের ফাঁকে নাস্তার ট্রে চলে আসল। বিশাল আকারের একটি প্লেট। তার মধ্যে স্তরে স্তরে সাজানো সেমাই, বিস্কুট, শরবৎ, চা, নানা প্রকার ফল, রুটি, ভুনা গোস্ত, কাবাব, মুরগীর রোস্ট, দধি, দুধ ও আর নাম না জানা বেশ কিছু খাবার। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সবাইকে খাওয়ার জন্য হুকুম করলেন। সবাই হাত বাড়িয়ে রুচীমত খাবার খেতে লাগলেন। চাকর ছেলেটি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে পরিবেশনের জন্য। মোল্লা ওমর চাকর ছেলেটিকে ডেকে নিজের সাথে এনে বসালেন এবং খুব আদরের সাথে হাত বুলিয়ে খাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। ছেলেটি একটু কুণ্ঠিত হয়ে মোল্লা ওমরের সাথেই খেতে লাগল। মোল্লা ওমরকে শুধু একটি রুটি চায়ে ভিজিয়ে খেতে দেখলাম। দামী দামী সুস্বাদু খাবার না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার দেশের জনগণ দু'বেলা পেটপুরে ভাল খাবার আহার করতে পারে না। ওদেরকে রেখে আমি যদি উদর ভর্তি করে আহার করি, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে কী জবাব দেব? যে দিন সকলের মুখে দু'বেলা গোস্ত রুটি তুলে দিতে পারব, সে দিন আমিও ভাল খাবার খাব। এর আগে কোনদিন ভাল খাবার মুখে তুলব না।

আমার প্রশ্ন, আছে কি পৃথিবীতে এমন শাসক যে জনগণের জন্য ভাল ভাল খাবার বর্জন করেছে? আছে কি এমন কোন শাসক যিনি কুঁড়ে ঘরে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। সম্মুখের ৬ জন সাধকের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, "এরা আমার উপদেষ্টা। আমি কোন সমস্যায় পড়লে এরা কিতাবাদী ঘেঁটে আমাকে সমাধান বের করে দেন।

তারপর এর উপরই আমল করা হয়। অতঃপর তিনি আমাকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়ে বিদায় দেন।

* আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আমাকে বিদায় দান কালে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি আমার ধর্মমতে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়ীতে এসে বসি। গাড়ী স্টার্ট দেয়ার সাথে সাথে তাকিয়ে দেখি, সম্মুখ থেকে হাই-ফাই কয়েকটি প্রাইভেট কার এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত কোন বিদেশী মেহমানরা আসছেন। গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে তাদেরকে দেখার ও খোঁজ নেয়ার জন্য গাড়ী থেকে নেমে এলাম। এদিকে অপর গাড়ীগুলো এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে এল ভিক্ষুক সদৃশ কয়েকজন লোক। গায়ে তালীযুক্ত মলিন কাপড়, মাথায় পাগড়ী, হাতে তছবী, কাঁধে ক্লাশিনকভ ও জায়নামাজ, মুখ ভরা দাড়ী। দামী দামী গাড়ী এদের! আমি খুবই আশ্চর্য হলাম যে, গাড়ীর সাথে লোকগুলোর কোন মিল নেই। সাক্ষাত করে জানতে পারলাম এরা হলেন তালেবান সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা। কান্দাহারের প্রধান নির্বাহী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান, তালেবান সামরিক বিষয়ক প্রধান মোল্লা আঃ রাজ্জাক, তালেবান নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ গাউস প্রমুখ নেতৃবন্দৃ আমীরুল মুমেনীনের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন।

এদেরকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম এই জন্য যে, একটি দেশের সরকার, যাদের নিয়ন্ত্রণে একটি দেশ পরিচালিত হচ্ছে, এমন ব্যক্তিবর্গ, আর্মি ফোর্স ছাড়াই নিজেরা গাড়ী চালিয়ে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে নেতার কাছে মিটিং করতে আসলেন। এমনটি কী করে হয়! কোন দেশের একজন মন্ত্রী বা এম, পি যদি কোথাও সফর করেন, তবে তার নিরাপত্তার জন্য শত শত পুলিশ, আর্মি, অস্ত্র-শস্ত্র ও গাড়ী ঘোড়া নিয়ে দু'একদিন আগে থেকেই টহল দিতে থাকে। তারপর কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পতাকা উড়িয়ে শোঁ করে চলে যান। কেউ দেখে কেউ দেখে না। একজন মন্ত্রী দেশের কোন স্থানে সফর করলে তার পিছনে খরচ হয় হাজার হাজার ডলার। আর তালেবান নেতারা নিজেরাই গাড়ী চালিয়ে এক এলাকা থেকে অপর এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জনগণের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, কিন্তু তাদের নিরাপত্তার জন্য ৫জন পুলিশেরও দরকার হয় না। তাঁরা জনগণের সুখে-দুঃখে যে কোন সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এমন মহৎ নেতা পৃথিবীর কয়টি দেশে আছে?

আমি বলি, যে সব রাষ্ট্র প্রধানরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন না, তারা জনগণের নিরাপত্তা বিধান করবেন কি করে? আসলে এরা জনগণের বন্ধু নয়।

এ বৈষম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি এটাই পেয়েছি যে, আফগানিস্তানে তালেবান ছাড়া অন্য কোন পার্টি নেই। যে কারণে তাদের শত্রুও নেই। সবাই এ সরকারের অনুগত। আর যদি কয়েক গণ্ডা পার্টি থাকত, তবে ক্ষমতাসীন পার্টির বিরুদ্ধে অন্য সব পার্টিরা কাজ করত। ক্ষমতাসীন পার্টিকে যেভাবেই হোক পরাস্ত করার জন্য দেশব্যাপী প্রোগ্রাম চলত। আমি আজ পৃথিবীর সরকার প্রধানদের আহ্বান করব, সত্যি যদি তোমরা জনগণের সুখ-শান্তি চাও, চাও দেশের উন্নতি, তবে তালেবানদের থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি শিখে যাও। তারপর দেশ পরিচালনা কর। তোমরা যে কোন ধর্মের অনুসারী হওনা কেন, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করে সমস্ত মতাদর্শকে পায়ে মাড়িয়ে মহা বিজ্ঞানী মুহাম্মদের (সাঃ) রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ কর। তবে অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির মুখ দেখাতে পারবে।

* আমি একবার আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা ও সাংবাদিকদের এক মিটিংএ অংশ নেই। মিটিংটা হয়েছিল আফগানিস্তানের কোন একটি হোটেলে। গোপন মিটিং। শুধু আমরাই (পশ্চিমারা) ছিলাম উক্ত মিটিংএর সদস্য ও সদস্যা। আমি একান্ত নিরপেক্ষভাবেই সকলের মতামত জানতে চাইলাম। আফগান সফরে আমরা কি পেয়েছি? নিরপেক্ষভাবেই অনেকে তার উত্তম প্রদান করলেন। সকলেই তালেবান প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে আপনারা তালেবানদের বিরুদ্ধে কি করে লেখালেখি করবেন? একজন সাংবাদিক বললেন, "প্রশ্নের উত্তর খুবই জটিল। তবে তালেবানরা তো গণতন্ত্রের শত্রু, আমাদেরও শত্রু। আমরা যাদের নুন-নেমক খাই, তারা তো আমাদেরকে তালেবানদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে বিশ্ববাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই প্রেরণ করেছেন। আমাদের পিছনে খরচ করতেছেন মোটা অংশে অর্থ। নেমক হারামী করা কি উচিৎ হবে?"

আমি বললাম, তা হলে কি আমরা আজীবন মিথ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকব? চোখে ধুলা ছিটিয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে ঘোর-অন্ধকারেই রাখব? মিথ্যার কুয়াশা কাটিয়ে কি সত্যের রবী কোনদিন উদিত হবে না? এ কি ছিল প্রভু যিশুর শিক্ষা? চরম সত্যকে মিথ্যার

কাঁথা দিয়ে ঢেকে দেয়া কোন ধরনের সভ্যতা? আমার কথা শুনে আমারই সহকর্মী ও বান্ধবী মিস্ ফ্লোজিটনী হাসতে হাসতে বললেন, "আরে! ইসলামের রবি উদিত হলে গণতন্ত্র নামক পায়রার পালক জ্বলে যাবে। মিথ্যার অন্ধকার দূর হয়ে সত্যের আলো জ্বলে উঠবে। বিশ্ববাসী আলোর দিকে ছুটে আসবে। তখন আমেরিকার বস্তা পঁচা গণতন্ত্রের দুর্গন্ধে জগৎ ভরে যাবে। জনগণ গণতন্ত্রকে গলিত লাশের মত মৃত্তিকাগর্ভে দাফন করবে। আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশের জনগণকে বিশ্ববাসী তিরস্কার করবে। দুনিয়া তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করবে। দুনিয়াবাসীর হাত কাটা যাবে। অনেকেই প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাবে। তাই যে ভাবেই হোক তালেবানদের উত্থান স্তব্ধ করে দিয়ে আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটিশসহ দুনিয়াকে বাঁচাতে হবে।"

ফ্লোজিটনীর কথাগুলো আমার কাছে একদম পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হল। আমি বললাম, তোমার কথাগুলোর ব্যাখ্যা দিব কি? তাহলে বুঝতে সহজ হবে। ফ্লোজিটনী এবারও হাসতে হাসতে বললেন, মোটা কথা বুঝবি কেন? তারপরও সাংবাদিক সেজে সংস্থার টাকা অপচয় করছিস! এবার শোন আমার কথার ব্যাখ্যা।

ইসলামী শাসনের সৌন্দর্য যদি একবার প্রকাশ হয়ে যায়, তবে গণতন্ত্রকে মানুষ পরিহার করে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে। গণতন্ত্রের মত এমন জঘন্য সমাজনীতি দুনিয়াতে আর কয়টা আছে বল? আমেরিকার মোড়লগিরী ধুলায় মিশে যাবে, যদি গণতন্ত্র না থাকে। তাই যে করেই হোক, গণতন্ত্রকে জোর করে হলেও বিভিন্ন দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে আমরা পদ্ধপরিকর; লাখো মানুষ খুন করে হলেও।

ইসলামী শাসন প্রচলিত হলে বিশ্বের সমস্ত শাসকগোষ্ঠীর হাত কাটা যাবে। কারণ, শাসক গোষ্ঠী সবাই চোর। তবে দু'একজন ভালও থাকতে পারে। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য। এর সাথে জনগণেরও হাতকাটা যাবে। চোরের হাত কাটা হল শরীয়তের বিধান। এ হিসাবে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের হাত থাকবে না। বাকী চারভাগের এক ভাগ প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাবে, তার অর্থ হল, ইসলামী শরীয়তে জিনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি হল, প্রকাশ্যে পাথর মেরে শেষ করে দেয়া। এদণ্ডে দণ্ডিত পৃথিবীর চারভাগের এক ভাগ মানুষ। এতে পশ্চিমা দেশগুলোর কোন মানুষই জীবিত থাকবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশেরও কয়েকজন ছাড়া অন্যদের হাত থাকবেই না। কাটা যাবেই যাবে। সে দেশে সাউদের সংখ্যা খুবই কম। জালিয়তী, ধোঁকাবাজী, মালে ভেজাল, মালে কম, মিথ্যা, প্রতারণা এসব অন্যায় অনেকেরই। তালেবানরা এত বিচার করবেই বা কিভাবে? কাজেই দুনিয়া যেভাবে চলতে চায়, সেভাবে চলতে দাও।"

ফ্লোজিটনীর কথা শুনে আমি দীর্ঘক্ষণ থ হয়ে বসে রইলাম। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, বান্ধবীর জরিপ তো একশত ভাগ সত্য। নিখুঁত তার চিন্তা। তাই তো দুনিয়াবাসী তালেবানদের সইতে পারে না। তালেবানদের স্বীকৃতি দেয় না বা সমর্থন করে না। চোর, ডাকাত, লুইচ্চা আর বদমাশরা কেন তাদের মেনে নিবে?

* বান্ধবীর কথাগুলো নীরবে চিন্তা করে দেখলাম, সত্যিই তো, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মন্ত্রী-মিনিস্টারদের কোন একটি মন্ত্রণালয় দিলে তার ৩২টি দাঁত দিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ের বক্ষদেশে এমনভাবে একটি কামড় বসিয়ে দেয়, এক কামড়ে রক্তগুলো চুষে নিয়ে ৫ বৎসর পর ছেড়ে দেয়। উদর ফাটে ফাটে। এর মধ্যে কামড় ছেড়ে জনগণের মাঝে যাওয়ার সুযোগ পান না। ৫ বৎসর পর কামড় ছেড়ে বুড়িগঙ্গা বা অন্য কোন নদীতে মুখ

ধুয়ে, গোসল করে, পবিত্র হয়ে আবার ভোট ভিক্ষার জন্য জনগণের মাঝে ফিরে আসে। ছিঃ কি বেহায়া!

সরকারি অফিস-আদালতে চলে ঘুষের মহড়া। কর্মে ফাঁকী দেয়া তাদের দুষিত রক্তের বহিঃপ্রকাশ। সরকারি আমলারা চুরি করে আর কাজে ফাঁকি দেয়। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা করে ঔষধ চুরি। অফিস ফাঁকি দিয়ে নিজ চেম্বারে দেখে রুগী। কন্ট্রাকটররা করে ডাকাতী। রাস্তা-ঘাট, পুল, কালভার্ট নির্মাণে মাল মেটারিয়ালস দেয় কম। অফিসারদেরে কিছু পাইয়ে দিলে সব খাতা-কসুর মাফ করে দেয়। ব্যবসায়ীরা ভেজাল মাল সরবরাহ্ করে জনগণের কাছ থেকে ভাল মালের পয়সা আদায় করে নেয়। বাসওয়ালারা লেখে সিটিং বা গেইট লক। 'এ' লেভেল লাগিয়ে জনগণকে শোষণ করে সিটিং বা গেইট লকের ভাড়া আদায় করে নেয়। আসলে লোকাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রীতিমত টিসিং না দেয়ার কারণে ছাত্রদের প্রাইভেট মাস্টার রেখে পড়তে হয়। তা না হয় পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। শিক্ষার নামে মোটা অংকের বাজেট দেখিয়ে নিজেরাই ভাগাভাগী করে খায়। পত্র-পত্রিকার গায়ে লেখা হয় এবার আর অশিক্ষিত কেউ নেই। নিরক্ষরমুক্ত দেশ গঠন করা হয়েছে। অথচ গ্রামগঞ্জের কোন বয়স্ক ব্যক্তির নাম দস্তখত চাইলে বৃদ্ধ আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়। দোকানে সাইন বোর্ড টানানো হয় 'এখানে যাবতীয় মালামাল পাইকারী ও খুচরা অল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়। সেসব দোকানে তালাশ করলে অনেক মালই পাওয়া যায় না। মনে হয় এসব মিথ্যা আর ধোঁকাবাজী ছাড়া ব্যবসায় বরকত হয় না। কোন না কোন দিক দিয়ে মিথ্যা বলবেই। অপরাধ দমনের জন্য রয়েছে পুলিশ বাহিনী। আর সে পুলিশের তাণ্ডবলীলা দেখলে শয়তানও হেসে মরে। আমি একজন খ্রিস্টান মেয়ে হয়ে এসব গীবত শেকায়েত লিখতেও কলম থেমে যায়। বিবেক নিস্তেজ হয়ে যায়। লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে। ছিঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এসবই হল গণতন্ত্রের পরিচয়। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে চৌকিদার পর্যন্ত ও বিচারপতি থেকে নিয়ে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত মিথ্যা ঘুষ আর চুরির সাগরে সাঁতার কাটে। হ্যাঁ, তবে হাজারে দু'একজন আছেন, যারা সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক। কিন্তু সংখ্যায় খুবই নগণ্য। এ দু'একজনের পক্ষে সম্ভব নয় দুর্নীতি বন্ধ করার। এরা প্রশাসনের কাছে জিম্মি। মুখ খুলতে গেলে চাকুরী খোয়া যায়। তাই তারাও নীরব।

* দু'দিনব্যাপী মিটিংয়ে যা দেখলাম, তা হল, ভিতরে ভিতরে সবাই তালেবানদের প্রতি অনুরাগী। ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তালেবানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে আর কোনদিন মিথ্যা লেখালেখি করবেন না বলে অঙ্গিকারাবদ্ধ। তাদের মনোভাব দেখে আমি খুবই খুশী ও আনন্দিত। এ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে যতটুকু অধ্যায়ন ও গবেষণা করেছি এর মধ্যে একমাত্র ইসলামকেই শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম, ঐক্যের ধর্ম, ন্যায় বিচারের ধর্ম, সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে পেয়েছি। অন্যসব ধর্ম যে খোদা প্রদত্ত নয়, মানব রচিত এর মধ্যে অণু পরিমাণ সন্দেহ নেই। কাজেই এখন থেকে খ্রিস্ট ধর্মকে পরিহার করে মনে-প্রাণে ও স্বজ্ঞানে ইসলামকে গ্রহণ করলাম ও বুকে স্থান দিলাম। আমার স্পষ্ট ঘোষণার সাথে সাথে অন্যরাও আমার কথায় এক মত হয়ে গেলেন। কিভাবে এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে প্রবেশ করতে হয়, সে নিয়ম কারও জানা নেই। কোন বই-পুস্তকেও পাই নাই। আমরা বললেই তো হবে না। ইসলাম ধর্মের ধর্ম গুরু যারা একমাত্র তারাই পারবেন এ সমস্যার সমাধান দিতে। তাই একজন ইমাম সাহেবের নিকট

গিয়ে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি কিছু নসিহত করে ইসলামের পবিত্র ৫টি কালিমার তালিম দিয়ে ইসলামে দিক্ষীত করালেন। অতঃপর আমরা মুসলমান হওয়াটাকে গোপন করেই চলতে লাগলাম।

বৃটিশ সরকার ও আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে বার বার চাপ সৃষ্টি করা হয় বার্তা প্রেরণের জন্য। আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক বার্তা প্রেরণ করতে লাগলাম যে, আফগানিস্তানে মানবতা বিরোধী কাজ হচ্ছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। এ দু'টো কথার কোন ব্যাখ্যা আমরা দেইনী। তার সঠিক ব্যাখ্যা ছিল এটাই যে, ইঙ্গ-মার্কিনীরা আফগানের নিরীহ ও নিরপরাধা মানুষকে পাখির মত গুলি করে নির্বিচারে হত্যা করছে। জাতিসংঘের শয়তানেরা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো মুখ থুবড়ে ছায়ার নীচে মুখ লুকাচ্ছে। পশ্চিমা শক্তি অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিনীরা আসল ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে বা সঠিক ব্যাখ্যা আড়াল করে, আমাদের সংবাদটা এমনভাবে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে, যাতে বিশ্ববাসী তালেবানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। ওরা বলেছে, মহিলাদেরকে চাকুরীচ্যুত করে এবং পর্দা করার আইন চালু করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন ভুল ধরতে পারেনি।

উক্ত মিটিং এর পর থেকে আমরা পরোক্ষভাবে তালেবান সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি। ইন্টারনেটে কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি। কিন্তু কৌশলগত কারণে আমাদেরকে লুকিয়ে থাকতে হল বেশ কিছুদিন।

* ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তালেবানরা আমাকে গোয়েন্দা মনে করে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করেন। ভেবেছিলাম অন্যান্য দেশের মত ওরাও আমার উপর শারিরীক মানসিক নির্যাতন করবেন। কারণ, আমি আমাকে গোপন রাখতে চেয়েছি কৌশলগত কারণে। গোপন থাকলে ইসলামের আরো কিছু খেদমত করতে পারব। প্রকাশ হলে হয়ত তা আর সম্ভব হবে না। অপর দিকে আশংকাও করছিলাম যে, তালেবানদের বিচার খুবই কঠিন। এদের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য যদি সত্য কথা অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের কথা বলি, তবে হয়ত তারা বিশ্বাস করবে না, বরং ভাববেন যে, বাঁচার জন্য ইসলাম গ্রহণের কথা বলছি। আমি তখন উভয় সংকটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। আমি বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হইনি। বরং সবদেশের সরকারই আমার প্রতি নজর রাখতেন। ভয়ে ছাতি দুরুদুরু কাঁপছে। মনের গহীনে চলছে আশা-নিরাশার তুমুল লড়াই। কে হারবে আর কে জিতবে, তা বলা ছিল খুবই কঠিন।

আমাকে এক জনহীন কুটিরে রাখা হল। প্রায় এক ঘণ্টা পর একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একা একা কি ভয় পাচ্ছেন? উত্তরে কি বলব তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে আরো দু'জন মহিলা কয়েদীকে আমার সেলে ঢুকানো হল। এবার ভয় অনেকটা কমে গেল। মহিলাদ্বয় হিন্দিতে কথোপকথন করছে। ওরা ভাবছে, আমি বৃটিশ মেয়ে, হিন্দি বুঝি না। তাই ওরা দু'জনে মন খুলে আলাপ করছে। আমিও না বুঝার ভান ধরে নীরব রইলাম।

ওদের আলাপালোনায় বুঝতে পারলাম, একজন ভারতীয় অপরজন পাকিস্তানী। উভয়ে চাকুরি করত এন.জি.ওতে। চেহারা সুরত পরীদের মত। বাক্যালাপে খুব পটু। নায়িকা-গায়িকাও বলা চলে। মহিলাদেরকে এন.জি.ওতে ঢুকানো এবং দেহ দিয়ে ছেলেদের চরিত্র নষ্ট করাই তাদের আসল কাজ। তাছাড়া উভয়েই হিরোইন ব্যবসায়

জড়িত। আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার জন্য দু'মাস আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন তালেবান সরকার। কিন্তু গোপনে থেকে দেশের মধ্যে অশান্তি ছড়াচ্ছে। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে এ দু'জনকে।

নীরব থেকে এবার আমি একটু মুখ খুলতে লাগলাম। আমি হিন্দিতে প্রথমে আমার পরিচয় দিলাম। একজন বলে উঠল, "আমরা আগেই বুঝতে পেরেছি আপনিও আমাদের এমত একজন চর। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আটকা পড়ে গেছেন।" তাদের ধারণা প্রকাশ করায় আমার রাস্তা সুগম হয়েছে, এদের মনের ভিতর ঢুকার। আমি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, হ্যাঁ, বোন! তোমাদের মতই আমার অবস্থা। বল কি করে তালেবানদের দৃষ্টি এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারি? আছে কি কোন উপায়? একজন বললেন, "তালেবানদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। তবে আপনার কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। কারণ, গত দু'মাস আগে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন তালেবান সরকার। তারপর আমাদের ফটো রেখে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, চলে যাওয়ার পরও আমাদের কর্মকর্তারা আমাদেরকে আবার প্রেরণ করেছেন। আমাদের ফটো দেখেই গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমাদের বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ।

আমি তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে ইন্ডিয়ান মহিলাটি বললেন, "আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব ছিল। কাজও করেছি প্রচুর। এর মধ্যে একটি হল হিরোইন ব্যবসা। আমরা আমেরিকার একটি সংস্থা থেকে কোটি কোটি ডলার পেতাম সীমান্ত এলাকার উপজাতীদের মাধ্যমে হিরোইন চাষ করাতাম। আবার আমেরিকার কাছে বিক্রি করতাম। এ অর্থগুলো এন.জি.ওর মধ্যেই আদান-প্রদান হত। তালেবান সরকার আসার পর প্রথমে এক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'যারা হিরোইন, গাজা ও আফিম চাষ করবে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হবে। উক্ত ঘোষণা পত্র প্রকাশের পর আমরা আমাদের ব্যবসাকে গুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু ব্যাপক থাকার কারণে কিছু কিছু চাষ গোপনে গোপনে করেছি। তবু তালেবান সরকারকে ফাঁকি দিতে পারিনি। ফলে ৪/৫ জন হেরোইন চাষীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন। আমাদের কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার দেশ জুড়ে চড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এগুলো উদ্ধার করার জন্যই দ্বিতীয়বার এসেছিলাম। এখন তো ধরা খেয়ে গেলাম।"

পাকিস্তানী মেয়েটি বললেন, "আমি ইরান ভিত্তি একটি এন.জি.ওতে চাকুরি নিয়েছিলাম। আমাদের কাজ ছিল জনগণকে ঋণ দিয়ে দরিদ্র মুক্ত করা। তারই আড়ালে ছিল কট্টরপন্থী জনগণকে উদারপন্থী হিসাবে গড়ে তোলা। অর্থাৎ, তালেবানরা কুরআন-হাদীস ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ওরা দুনিয়ার সাথে তালমিলিয়ে চলে না। নবী যুগের ইসলাম চায় বর্তমানেও চালাতে। তাই আমাদের কাজ হল আফগান যুবশ্রেণীকে অর্থ আর নারীর লোভে ফেলে জিহাদ থেকে বিরত রাখা এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়া। যুবশ্রেণীকে যদি এদিকে ধাবিত করা যায়, তবে তারাই সব সময় তালেবান শাসনের বিরোধিতা করবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংস্থায় সাড়ে চারশত ইরানী ও তিনশত পাকিস্তানী সুন্দরী সুন্দরী তরুণীদেরকে নিয়োগ দিয়েছে। সাড়ে সাতশত মহিলা কর্মী আর ৫০ জন পুরুষ কর্মী মোট ৮ শত কর্মী বাহিনী মিলে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তিন চারটি

জেলায় আমাদের কার্যক্রম চলছিল। প্রায় ৫০টির মত ছিল আমাদের বড় অফিস। তাছাড়া ছোট-খাট ছিল আরো ৫০টির মত। যুবকদেরকে এসব অফিসে এনে দেখানো হত ব্লুফিল্ম আর শোনানো হত এন.জি.ও গায়িকাদের গান, দেখানো হত নাচ। পান করানো হত মদ, গাজা, হিরোইন ও আফিম। ঋণ দিয়ে আদায় করতাম চড়া দামে শোধ। আমরা ভেবেছিলাম, এভাবে যুবসমাজের ঘোড়াটি চিত্তবিনোদনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে এদের দ্বারা জিহাদ চলবে না। তা হলে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে। রব্বানী সাহেবের ছত্রছায়ায় যতদিন ছিলাম, ততদিন আমরা ভালই ছিলাম। জনগণকে নাইটে তেমন একটা না পাওয়া গেলেও সরকারি চাকুরীজীবি ও আমলাদেরকে পাওয়া যেত প্রচুর। কামাই ও হত বেশ।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে তালেবান সরকার এসে আমাদের অসৎ উদ্দেশ্য জেনে ফেলেছেন। এক দিনেই শতাধিক অফিসকে ভেঙ্গে-চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। শত শত কর্মীকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার শত শত কর্মীকে নাকে খত দিয়ে পালাতে হয়েছে। এতে আমাদের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে। জনগণের মধ্যে যেসব ঋণ দিয়েছিলাম, একটি পয়সাও ফেরৎ পাইনি। এত চরম ক্ষতি সাধন হবে, তা যদি জানতে পারতাম, তাহলে অনেক আগেই ব্যবস্থা নিয়ে নিতাম।

তিনি আরো বললেন, "রাব্বানী সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা কোটি কোটি ডলার দিয়েছি। দিয়েছি অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ। তাছাড়া লোকজনও কম দেইনি। এখন হারামজাদা (রব্বানী) ছোট ছোট বাচ্চাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা তালেবানদের উৎখাতের জন্য সবকিছুই করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। জানি না, ভাগ্যে কি আছে!"

আমি তালেবানদের চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, "তালেবানরা জড় পদার্থের মত। মনে হয় শুকনো কাষ্ঠে নির্মিত। কখনো এরা আমাদের দিকে ফিরে তাকায়নি। মস্তকাবনত অবস্থায় প্রশ্ন করে। আমরা বহুবার চেষ্টা করেছি আমাদের দিকে আকৃষ্ট করানোর জন্য। অভিনব সাজে তাদের সামনে হাজির হয়েছি। ভেবেছিলাম, কোন না কোন একজন আমাদের সাজ-সজ্জা ও অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে আকৃষ্ট হবে। ভেবেছিলাম, আমাদের সুন্দর দেহরত্নকে তাদের জন্য উজার করে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও এসব নিরাসক্ত কাষ্ঠ পুতুলকে আকৃষ্ট করতে পারিনি। এদের দিল কঠিন শীলার মত। হাতুড়ী ফিরে আসবে, কিন্তু এদের কঠিন দিলে সামান্যতম ফাটল ধরবে না। এরা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা। তা ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি না। নারীর লোভ বিন্দুমাত্র নেই। কাজেই এরা কঠিন শীলা।

* দু'দিন পর উক্ত দু'তরুণীকে তালেবানরা গাড়ীতে তুলে কোথায় যেন নিয়ে গেলেন। আমি একাই রয়ে গেলাম। দিন গেল রাত এল, চিন্তা ও পেরেশানীতে আমি অস্থির। রাত ৮ টার সময় অস্ত্রধারী দু'জন তালেবান আসলেন। এর মধ্যে একজনের বয়স ১৮ থেকে ২২ বৎসর হবে। আর অপরজনের বয়স হবে ২৫ থেকে ২৮ বৎসর। গায়ে ইয়া বড় কোর্তা, মাথায় কালো পাগড়ী, মুখভরা দাড়ি। গোঁফ দু'টি ব্যাঘ্রের মত, এক কাঁধে জায়নামায, অপর কাঁধে ক্লাশিনকভ। হাতে হাজার দানার তসবীহ। চুলগুলো উস্‌কু-খুস্‌কু, ঘাড় পর্যন্ত বাবরী। শরীর জীর্ণ-শীর্ণ। জাতিতে পাঠান। ভাষা পশ্‌তু। অনবরত তাসবীহ পাঠ করছেন। মনে হয় এরা যেন তাপসপ্রবর।

আমার সেলে প্রবেশ করেই কৌশল জানতে চাইলেন, কি অবস্থায় আছি, খানা-পিনা ঠিক ঠিক মত পাচ্ছি কি না, কোন চিন্তা ও পেরেশানী ভোগ করছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অত্যন্ত বিনয়ী সুরে আদবের সাথে যথাযথ উত্তর দিতে লাগলাম। তারপর সে সাধক পুরুষ আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আজ বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন প্রদেশে এমন কি গ্রামগঞ্জেও আপনার পদচারণা লক্ষ্য করছি। আপনার মত আরো কয়েকজনকে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। আমরা ঐসব লোকদেরকে স্বসম্মানে নিজ দেশে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছি। আপনি আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের সাথেও দেখা করেছেন। বেশ কয়েকবার চেকও করেছি। সাংবাদিকতার দোহাই দিয়ে রক্ষা পেয়েছেন।"

"বর্তমানে আপনার উপর আমাদের সন্দেহ হল, আপনি বৃটিশের একজন উচ্চ পর্যায়ের চর। আপনি সাংবাদিকতার পোশাক পরে আমাদের গোপন সংবাদগুলো পাচার করছেন। বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টির পায়তারা করছেন। তাই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

আমি খুব নম্র ভাষায় আরজ করলাম, জনাব! আপনাদেরকে দেখলে কলিজার পানি শুকিয়ে যায়। যেন উত্তপ্ত মরুভূমি। আবার আপনাদের মানবতা, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতার দিকে চোখ বুলালে হৃদয়ে সৃষ্টি হয় শান্তি ও আশার ফল্গুধারা। সেখান থেকে প্রবাহিত হয় শান্তির স্রোতধারা। আমি আপনাদেরকে কি বলব, খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে অভয় দিলে কিছু কথা বলার ইচ্ছা রাখি। আমার কথা শুনে তিনি অভয় দিয়ে বললেন, "দেখ, তোমরা হলে ভিনদেশের লোক ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া তোমরা মহিলা। অপরদিকে, তোমরা আমাদের মেহমান। তাছাড়া দুশমনও হতে পার। তোমরা যদি সত্য সংবাদ পরিবেশন করে থাক, তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই। অতীতে প্রায় সব সাংবাদিকদের দেখেছি, ওরা ডাহা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আর একটা কথা খুব ভালভাবেই জেনে রাখ যে, আমরা জালেম নই। নিরপরাধ মানুষকে আমরা কোন ধরনের হয়রানী বা টর্চারিং করি না। এগুলো করা ইসলামী শরীয়তে নেই। তুমি যদি কোন অপরাধ করে থাক এবং এখন থেকে তওবা কর যে, বাকী জীবন আর কোনদিন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে পরিবেশ খারাপ করব না, তাহলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেশে ফিরে যেতে সাহায্য করব। আর যদি তোমার কথার মধ্যে একটু এদিক-সেদিক পাই, তাহলে ব্রাশ ফায়ারে উড়িয়ে দেব। তখন আমরা কোন দেশের সুপারিশও কবুল করব না।

তালেবান সৈন্যটির কথাগুলো আমার নিকট খুবই ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কূলহীন পারাবারে যেন একটি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড পেয়েছি। মনে হল, নিদারুণ পিঁপাসায় পেয়েছি পানির পিয়ালা। যেন নৈরাশ্যের দীগন্তে এক ফালি আশার চাঁদ উদিত হল। আমি বললাম, স্যার! আপনাদের ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এতে বিন্দু-মাত্র মিথ্যা নেই। আমাকে বৃটিশ, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইসরাইল থেকে পাঠানো হয়েছে। আমার গ্রুপে নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন। আমরা সবাই সাংবাদিকতার লেবাস পরে গোয়েন্দার কাজ করেছি।

আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয় তেহরান থেকে। আমরা সেখানে বুরহানুদ্দীন রব্বানী, রাফসানজানী ও মাওঃ ফজলে হক আমেনী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মিটিং করেছি। উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে রাজনৈতিক আশ্রয় ও সামরিক সাহায্যের চুক্তি করেছি। তারপর

সেখান থেকে পাঞ্জেশীর গিয়ে জেনারেল আঃ রশীদ দোস্তাম, প্রকৌশলী আহাম্মদ শাহ মাসউদও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে সাক্ষাত করে মিটিং করেছি। পশ্চিমা জগতের সাহায্য-সহানুভূতির আশ্বাস বাণী শুনিয়েছি। তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে এটুকু করেছি। তারপর যখন আমরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন শহর, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জ সফর করে নিজ চোখে বিভিন্ন স্থান ও তালেবান সরকারের কর্মকাণ্ড, এলাকার সাধারণ মানুষের মনোভাব ও বিগত সরকারের কার্যাবলির ইতিহাস ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছি, তখনই আমাদের ভ্রম ভেঙ্গে যায়। তখন থেকে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও প্রপাগাণ্ডা বন্ধ করে দিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছিলাম।

তবে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের চাপের মুখে বার্তা প্রেরণ না করে থাকতে পারিনি বিধায়, আমার মিশন বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন আংগিকে সংবাদ দিয়েছে যে, আফগানিস্তানে মানবতা ও মানবাধিকার লজ্জিত হচ্ছে। এ কথাটির কোন ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করিনি। এতটুকু সংবাদ থেকে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে পশ্চিমা মিডিয়া নানা ধরনের সংবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। এর উর্ধ্বে আমরা কিছু জানি না।

আপনাদের আচার-আচরণে ও কর্মকাণ্ডে যা পেয়েছি, তা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাইনি। আমরা যখন প্রশিক্ষণ নিয়েছি, তখন বিভিন্ন ধর্মের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছি। সেখান থেকেই ইসলামের প্রতি সামান্য ধারণা পেয়েছি। বহু ভাষার উপর আমাদের কে পি.এইচ.ডি নিতে হয়েছে। তার মধ্যে ইংরেজি, আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, চায়না অন্যতম। আমরা পৃথিবীর বহুদেশে গিয়েছি, বহু ধর্মাবলম্বী ও বহু ভাষাভাষী মানুষের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা করেছি। দেখেছি তাদের ধর্ম-কর্ম ও আচারানুষ্ঠান। আপনারা ঐসব জাতি থেকে অনেক উত্তম। সৌদী আরবের ইসলামের সাথে ইরানের ইসলামের কোন মিল নেই। ইরানের ইসলামের সাথে মিশরের ইসলামের কোন মিল নেই, আবার মিশরের ইসলামের সাথে বাগদাদের ইসলামের মিল নেই। তেমনিভাবে মিল নেই লিবিয়ার ইসলামের। আমার প্রশ্ন ছিল, ইসলাম তো এক, তাহলে একেক দেশে একেক ধরনের ইসলাম কেন? তা হলে সঠিক ইসলাম কোনটি? সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, আবুদাবী, ইয়ামান, দুবাই এসব দেশে ইসলাম রাস্তা-ঘাটে আর কাপড় চোপড়ে। হেরেমখানায় অর্থাৎ অন্দরমহলে কোন ইসলাম নেই। চেহারা-সুরতে বুযুর্গ। পেটে পেটে রয়েছে শয়তানী ও কুফরী। সেসব শাইখদের হেরেমে বহুবার গিয়েছি। তাদের থেকে যে সব আচরণ পেয়েছি, তা কলমে প্রকাশ করতে অন্তর কেঁপে উঠে। আর লজ্জায় চোখ বন্ধ হয়ে যায়। যাক ওসব কথা। এখন প্রশ্ন ছিল, তাহলে আসল ইসলাম কোন্‌টি বা প্রফেট মোহাম্মদের আনীত ইসলাম কোন্‌টি। তবে সব দেশের কুরআন-হাদীস উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখেছি এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। তবে শিয়া মুসলমান ও কাদিয়ানী মুসলমানরা কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক স্থান ভুল, অনেক স্থানে অতিরঞ্জিত, অনেক খানে অপব্যাখ্যা করেছে। তাছাড়া সবই ঠিক।

তাহলে আচার-অনুষ্ঠানে, চিন্তা-চেতনায়, কৃষ্টি-কালচারে, এত আকাশ-পাতাল ব্যবধান কেন? তাহলে কি সত্য ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি আফগানিস্তানে এসে পেয়েছি। পেয়েছি সঠিক ইসলামের পরিচয়। দেখেছি সত্য ইসলামের চেহারা। এ ইসলাম কুরআন-হাদীসের ইসলাম। এ ইসলাম প্রফেট মোহাম্মদের আনীত ইসলাম। সোনালী যুগের ইতিহাসকে আপনারা পুনর্জাগরিত করেছেন। দুনিয়াবাসী যদি ইসলামের সুন্দর নমুনা একবার দেখত, তবে পাগল হয়ে চলে

আসত ইসলাম নামক বৃক্ষের সুশীতল ছায়া তলে। মুখ থুবড়ে আস্তাকুঁড়ে লুকাত আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা। লুকাত সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের প্রবক্তারা।

নষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীরা আঁচ করতে পেয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে, কোমড় বেঁধে, লেংটি কষে মাঠে নেমেছে। আফগানিস্তানে ইসলামের মশাল জ্বলে উঠলে বিশ্ববাসী তাদের পথের দিশা পেয়ে যাবে। ঐসব তন্ত্র-মন্ত্রের কপালে পদাঘাত করে আলোর পথে চলতে আরম্ভ করবে। এজন্যই তাদের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই ওদের আস্ফালন দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আমি এ মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে সহকর্মীদের নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। বাকী জীবন ইসলামের উপর অটল থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি।

* রাত দশটা। সৈন্য দু'জন অযু করে আমার কক্ষেরই এককোণে দাঁড়িয়ে গেলেন নামায আদায় করতে। আমি একটা জিনিস দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। তা হল, আমি ছিলাম বন্ধনমুক্ত, কক্ষের অর্গল ছিল উন্মুক্ত। এদিকে মোটেই লক্ষ্য নেই সৈনিকদ্বয়ের।

দু'তিন দিন যাবৎ ছিলাম অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তালাবদ্ধ। বাইরের জগতের সাথে ছিল না কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক। আমার মন কেবলই ছুটছিল পাহাড়-পর্বতে, শহর-বন্দর, হাট-বাজার ও মুক্ত প্রান্তরে। বাতায়নের ছিদ্র পথে দিন মান চেয়ে থাকতাম উদাস মনে নীলাকাশের দিকে। ভাবতাম, অতীত জীবনের কত কথা। স্মৃতিরা এসে বার বার অন্তরে নাড়া দিয়ে যেত। বিশাল পৃথিবীটা আমার জন্য হয়ে গেল সংকীর্ণ। তালেবানদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অত সহজ নয়। আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে গেছে দু'জন কয়েদীকে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটছে, তা কে জানে? আমি যতই সাফাই গাই না কেন তা যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে তো কিছুই করার নেই। আমি যে একেবারে নির্দোষ তা তো নিজেই বলতে পারি না। যদিও এখন আমি মুসলিম। যদিও এখন আমার মিশন থেকে কেটে পরেছি, তা তো ওদেরকে বুঝানো মুশকিল। আমি তো আমার পক্ষে কোন সাক্ষী পেশ করতে পারব না। কাজেই ওরা আমার সাথে যে আচরণই করুক না কেন তা মাথা পেতে নিতে হবে। জীবন বাঁচানোর আর কোন পথ আমার সম্মুখে উপস্থিত নয়। হতে পারে এটাই আমার শেষ রজনী। হয়ত আর কোন রজনী আমাকে পোহাতে হবে না। এ অন্তিম সময়ে যদি কিছু এবাদত করে নিতে পারতাম, তবে আত্মার তৃপ্তি হত। এবাদতই বা কিভাবে করব? নিয়ম-কানুন তো কিছুই শিখিনি। এখন তো খ্রিস্টধর্মের অর্চনা করা যাবে না। মিথ্যা ধর্মের নাম নেয়া তো ঠিক নয়। এসব চিন্তা করতে করতে হৃদয়ের গভীর থেকে কে যেন ডেকে বলছে, "হে রিডলি! এবাদত শিখনি তা ঠিক। নিরাকার আল্লাহ্ তো তোমাকে যবান দিয়েছেন, দিয়েছেন ভাষা। তুমি তো তোমার ভাষায় এক প্রভুর নিকট প্রার্থনা করতে পার। তিনি তো সকলের ভাষা বুঝেন, সকলের কথা শুনেন।"

মনে হল গায়েব থেকে কে যেন আমাকে পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। আমি এদিক-ওদিক চিন্তা না করে বেরিয়ে এলাম কক্ষ থেকে। হাত-পা ধুয়ে করিডোরের এক পার্শ্বে পশ্চিম দিকে মুখ করে নতজানু অবস্থায় বসে হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষায় আমার প্রার্থনা জানাতে লাগলাম মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

'হে আমার মাওলা! অতীতের পাপরাশি থেকে আমি তওবা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি অনুগ্রহ করে আমার অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত

করেছ। এ আলো যেন চিরদিন প্রজ্বলিত রাখতে পারি। নির্বাপিত যেন না হয়। সে তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ্! তুমিই আমাকে সুপথ দেখিয়েছ। সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক দান কর। বিগলিত হৃদয়ে আমি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলাম। আর অশ্রুগুলো গণ্ডদেশ বেয়ে বক্ষদেশ প্লাবিত করছিল। দুনিয়ার কোন খেয়াল আমার অন্তরে ছিল না। হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার শান্তি, মনের আনন্দে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম কোন এক সুদূরে। মনে হচ্ছে, আল্লাহ্র সম্মুখে আমি মস্তকাবনত রয়েছি। আল্লাহ্ যেন তার অনুগ্রহের চাদরে আমাকে ঢেকে দিয়েছেন। এমন শান্তি জীবনে আর কোনদিন অনুভব করিনি। এভাবে কেটে গেল অনেক সময়। নামায সমাপ্ত করে সৈনিকদ্বয় তাকিয়ে দেখলেন অর্গল উন্মুক্ত। বন্দি কক্ষে নেই। একে অপরকে বলতে লাগলেন, "এ কি সর্বনাশ অর্গল উন্মুক্ত। বন্দি পালিয়েছে! একি সর্বনাশ কাণ্ড ঘটে গেল। এদের ব্যাপারে কি জবাব দিব জেনারেলদেরকে?" অপরজন বললেন, "অর্গল বন্ধ করতে হবে তা তো ভাবিনি! এখন উপায়?

ওদের কথোপকথনে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ওদের নির্বুদ্ধিতার জন্য মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে ভাবছি, ইস! কত সরল সোজা এরা! কপটতা ও মিথ্যার লেশ মাত্র ওদের মাঝে নেই। নামাযের সময় হলো, আর অন্য কোন চিন্তা না করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। কি প্রভুভক্ত ওরা। সব সময় যেন ওদের অন্তর তড়পাতে থাকে আল্লাহর হুকুম পালন করতে। আমি ইচ্ছা করলে পালাতে পারতাম। কিন্তু পালাইনি এজন্য যে, চারিদিকে রয়েছে তালেবান মোর্চা। ৫শ গজ যেতে না যেতেই ধরা পড়তে হবে। রাত গভীর। চলাফেরা করতে দেখলে হয়ত গুলি চালাবে। তাই পালাবার চেয়ে বন্দিশালায় থাকাই নিরাপদ। তাই বেরোলাম না।

ওরা নামায শেষ করে বন্দির জন্য আফসোস করতে করতে কক্ষের মধ্যেই জায়নামাযে শুয়ে গেলেন। করিডোরে, আঙ্গিনায় বা আশ-পাশ বন্দিকে তালাশ করবে, তাও করেননি। আমি ভেবেছিলাম, অবশ্যই খোঁজা-খুঁজি করবে! কই! খুঁজছে না যে...?

বেশ কিছুক্ষণ পর ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। আমি আবার প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলাম।

লা শরীক প্রভুর অর্চনা যে এতমধুর, এত আরামদায়ক, এত প্রশান্তির, তা যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা জানত, তবে পাগল হয়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিত। এবাদতে এত স্বাদ এত মজা থাকার কারণেই তালেবানরা তুমুল লড়াইয়ের সময় অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে রণক্ষেত্রে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। একদল নামায আদায় করে দিলের প্রশান্তি লাভ করে। অন্য দল যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আবার এ দল নামায আদায় করে, অপর দল নামায সমাপ্ত করে যুদ্ধ করতে থাকে। ইস্! কি সমতা, কি সাম্য, কেউ কাউকে ঠকায় না। সমভাবে ভাগ করে নেয় ওদের এবাদতে মজা।

লড়াই চলছে। তুমুল লড়াই। এর মধ্যে খানাভর্তি বড় বড় প্লেট হাজির হল। তারা একে অপরকে ডেকে খানা খাচ্ছে। ২/৩ জনের খানা ৮/১০ জনে মিলে খাচ্ছে। কোন অভিযোগ নেই, শেকায়েত নেই। নেই কোন সমালোচনা। একে অপরের হিতৈষী বন্ধু। আপন-পর এক সমান। সাধারণ সৈনিক আর জেনারেলের মাঝে কোন তফাৎ নেই। আমি ভেবে আশ্চর্য হলাম যারা বন্ধন মুক্ত কয়েদীকে দরজা খোলা রুমে রেখে নামায দাঁড়িয়ে যায়, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায়, যারা নিজের কাপড়-চোপড় সুন্দরভাবে পরতে পারে

না। যাদের মাথার চুলগুলো উস্‌খু খুস্‌কু, চিরুণী ব্যবহার করতে মনে থাকে না, যারা এক হাতে অথবা দাঁতে কামড়িয়ে পায়জামার নেয়ার ধরে অপর হাতে গুলি ছুড়ে। পায়জামার নেয়ার গিরা দিতে মনে থাকে না। এত সরল-সোজা মানুষ হয়ে এত সুন্দরভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন কিভাবে? তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় তো সমস্ত বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের কোন রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তিল পরিমাণ ভুল ধরতে পারছে না। স্বরাষ্ট্র নীতি, পররাষ্ট্র নীতি। আন্তর্জাতিক নীতি, সামাজিক অর্থনৈতিক কোনদিক দিয়ে ছিদ্র পাওয়া যাচ্ছে না।

সারা বিশ্ব আফগানিস্তানকে আমেরিকার চাপে বয়কট করেছে। তার পরও মোল্লা ওমর মাথা নত করছেন না। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। তা না হয় অবরোধের বক্ষে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করছেন, "হে দুনিয়াবাসী! তোমরা জেনে রাখ, আমার রব আল্লাহ্! আমার রাজ্জাক আল্লাহ্! আল্লাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন আর যমিন থেকে শস্য উৎপন্ন করবেন। এ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব। তোমাদের (গায়রুল্লাহর) সাহায্যের প্রয়োজন নেই। একজন পাক্কা ঈমানদার, মর্দে মুমিন না হলে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করতে পারতেন না।

আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন খুঁত না পাওয়ার কারণ হল, এ সংবিধান তো মানব রচিত সংবিধান নয়। যেসব আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে, এ আইন মদ-গাজা, হিরোইন পান করে সংসদে বসে বানানো নয় মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোট চুরি করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে, সংসদে বসে আইন বানানো, আইন বাতিল এসব অপকর্মকালীদের রচিত নয়।

তালেবানরা যে আইন চালু করেছে সে আইন সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষ থেকে দেয়া আইন। এ আইন রদ-বদল করা অসম্ভব। এ আইন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি সম্পর্কে ভাল জানেন-কি তার দরকার, কি দরকার নয়। কোন্‌টি মঙ্গল আর কোন্‌টি অমঙ্গল। সে সব বিষয় একমাত্র স্রষ্টাই ভাল জানেন। তাই কিভাবে শাসন ব্যবস্থা চালালে, জিন, ইনসান এমন কি পশু-পাখী ও কিট-পতঙ্গের ফায়দা হবে, সে হিসাবেই তাঁর দূত জিব্রাঈলের মাধ্যমে প্রফেট (রাসূল) মোহাম্মদের (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছেন। এক সংবিধান (পবিত্র কুরআন) এর মধ্যে রয়েছে দিক-নির্দেশনা। মানুষ কি করলে দুনিয়াতে ও আখেরাতে শান্তি পাবে, কোন্ অন্যায় করলে দুনিয়ায় কি পরিমাণ শাস্তি পাবে। আবার আখেরাতে কি পরিমাণ সাজা পাবে অর্থাৎ ভাল মন্দ, বৈধ-অবৈধ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এ সংবিধান বা মূলনীতি যে কেউ যদি মেনে চলে, তবে দুনিয়াবাসী তথা সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিরাজ করবে শান্তি আর শান্তি। শুধু তালেবানরাই নয় এ সংবিধান যদি ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ও বৌদ্ধরাও মেনে চলে বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে সেখানেও জনগণ শান্তির মুখ দেখতে পারবে।

উদাহরণত বলা যেতে পারে যে, কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, "চোরের হাত কেটে দাও।" এখন যদি চোরের হাত প্রকাশ্য দরবারে কেটে দেয়া হয়, তবে অন্যরা এতে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ভাল হয়ে যাবে। এভাবে চোর যদি না থাকে, তবে শুধু মুসলমানরাই শান্তি পাবে তা নয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কারো ঘরে চুরি হবে না। মালের নিরাপত্তা হবে। সবাই শান্তি পাবে।

ভোট চোর, মদ খোরেরা সংসদে বসে যে যে আইন করেছে, এতে চোরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। অল্প কদিন পর টাকা-পয়সা দিয়ে পাক্কা চোরের সনদ নিয়ে বাড়ী ফিরে। তারপর চুরি মাত্রা আরো বেড়ে যায়। মালের কোন নিরাপত্তা থাকে না।

তেমনিভাবে ডাকাতী করলে হত্যা, খুনের পরিবর্তে খুন, জিনা করলে পাথর মেরে হত্যা। মিথ্যা বললে ৮০টি বেত্রাঘাত এগুলো হল কুরআনের ফায়সালা। ডাকাতী ও খুনের বদলে যদি প্রকাশ্যে খুন করা হত, তবে খুনের বাজার এত সস্তা হত না। পথে-ঘাটে, ডোবায়, নর্দমায় আর পানির ট্যাংকিতে লাশ পড়ে থাকত না।

জিনার অপরাধে যদি ছঙ্গেছার করা হত, তবে মা-বোনদের ইজ্জত পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে, হোস্টেল আর পার্কে লুণ্ঠিত হত না। সোনার মত মুখ এসিডে দগ্ধ হতো না। কোর্টকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে অপহরণ করে হাত ধরে নিয়ে আসে, তবে বিয়ের কাজ সমাধা করে দিতে। তাই জিনা করতে করতে এক সময় যখন প্রকাশ হয়ে যায়, তখন কোর্টের আশ্রয় নেয়। মাতা-পিতার প্রয়োজন নেই কোর্ট সমাধান করে দেয়।

তেমনিভাবে মিথ্যার জন্য যদি ৮০টি বেত্রাঘাত করা হত, তবে সংসদ সদস্যরা জনগণের কাছে মিথ্যা ওয়াদা করতেন না। যদি প্রতিটি জনসভায় এককেটা মিথ্যার জন্য ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হতো তাহলে হাজার হাজার মিথ্যা কথার বিচার করার আগেই অক্কা পেতেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা। তাহলে তৃণমূল পর্যন্ত মিথ্যা বলা বন্ধ হয়ে যেত। ইস্ কত সুন্দর বিচার! কত সুন্দর এ সংবিধান!

আমার চিন্তায় ধরা পড়েছে যে, তালেবানরা শুধু আইন প্রয়োগ করেন, আইন বানান না। তাই তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা এত নিখুঁত। এক সরকার এসে সংসদে বসে। জনগণের কল্যাণের জন্য আইন বানান ও পাশ করেন। তারপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপর আইন প্রয়োগের নির্দেশ দেন। পাঁচ বৎসর পর এ সরকার জুতা পেটা খেয়ে বিদায় নিলে আসে অন্য সরকার। তারপর সংসদে বসে বিগত সরকারের আইন জনগণের জন্য অকল্যাণ বা বেকার আইন বলে ফতোয়া জারি করেন, তারপর আবার উনারা জনগণের কল্যাণের আইন বানান এবং প্রয়োগ করেন। সবাই চায় জনগণের কল্যাণ। তা হলে যে আইন ৫ বৎসর আগে ছিল জনগণের কল্যাণের এখন ৫ বৎসর পরে কি করে সে আইন হয় অকল্যাণের? জনগণ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পান না। যতদিন গণতন্ত্র থাকবে, ততদিন এ দ্বন্দ্ব থাকবে। এ দ্বন্দ্ব গণতন্ত্রের অর্থাৎ জারজ তন্ত্রের ফসল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে কোন দল, যে কোন সম্প্রদায় আসুক না কেন, সবাই যদি রবের মূলনীতি বা সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করত, তাহলে এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটত। জনঘন শান্তি পেত।

আইন প্রণয়নকারী বা আইনদাতা বা বিধানদাতা, একমাত্র তিনিই যিনি রব, যিনি, খালেক, যিনি মাকে। যিনি সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী। অন্য কেউ আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। বর্তমান সংসদ সদস্যগণ রবের দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে রবের আসনে সমাসীন। অর্থাৎ, তারা সংসদে বসে আইন প্রণয়ন করেন। এত বিশাল আইন বই থাকতে, এত মহৎ সংবিধান থাকতে তারা এটাকে বাদ দিয়ে নিজেরা নিজ নিজ মতে আইন বানান এবং প্রয়োগ করেন। এ কারণেই চারিদিকে শুধু সংঘাত আর সংঘাত। এসব নব্য ফেরাউনদের ঈমান আছে কিনা সে ব্যাপারে আমি একজন নওমুসলিম হয়ে ফতোয়া দিতে পারব না। বিজ্ঞ আলেম সমাজ সে ফতোয়া দিবেন।

* আমি শান্তির পারাবারে আকাশচুম্বি উর্মিমালায় মহানন্দে সাঁতার কাটছি। এভাবে কেটে গেল রাতের দুই-তৃতীয়াংশ। তালেবান দু'জন শেষ প্রহরের এবাদতের জন্য কামরা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। দরজার করাঘাতে বিস্মিত হয়ে তাকালাম। বারান্দার লাইট আলো দিচ্ছিল। যুবকদ্বয় আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে গেলাম। উড়নাঞ্চলে চোখে পানি মুছে একটু এগিয়ে এলাম ও পূর্বের ধর্ম মতে সম্মান প্রদর্শন করে জিজ্ঞাসা করলাম, জ্বী স্যার! কিছু বলছেন কি? যুবকদ্বয় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে একজন বললেন, "কি হে রিডলি! এখনো ভাগিসনি? সারা রাত কি করিডোরেই কাটাচ্ছিস? ঘুমাসনি বুঝি," অপরজন খুবই আদর মিশ্রিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস কেন? চোখ দুটি তো ফুলে লাল হয়ে গেছে। মৃত্যুর ভয়ে সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালি বুঝি? আয় বোন এদিকে আয়, ভয় পাসনে।"

সে সময় আমার অন্তরে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। হৃদয়ের এক তোরণ দিয়ে প্রবেশ করেছে আনন্দ মিছিল আর অপর তোরণ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। দুঃখ বেদনা, চিন্তা, পেরেশানী ও মৃত্যুর ভয়। তাই অধরে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললাম, না ভাইয়্যা ভয় পাচ্ছি না। তাহলে সারা রাত বাইরে কেন, আর ঘুমাসনি কেন?

প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, ভাইজান! বাসর রজনীতে কি প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুম যেতে পারে? রাত যতই বড় হোক না কেন তবু মনে হয় চোখের পলকে পোহায়ে গেছে। মনে হয় মধুর মিলনে রাত সইতে না পেরে অল্প সময়েই পোহায়ে গেছে। অনেক কথা না বলাই রয়ে যায়। অনেক কাহিনী না শোনাই থেকে যায়। তবু রাত কেটে এসে যায়। আজ আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

মোল্লা ইয়ার, মায়াভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি হে রিডলি! তুই কি স্বপ্নে দেখছিস? না স্বপ্নে পরে আবোল-তাবোল বকছিস! বন্দীশালা আবার বাসর ঘর হয় কি করে?

আমি বললাম, ভাইজান! প্রেমিক যদি তার হারানো প্রেমিকাকে কাছে পায়, তাহলে মিলনের স্থান জান্নাত হোক চাই জাহান্নাম হোক সবই তার কাছে এক সমান। ইসলাম গ্রহণের পর কোন এবাদত বন্দেগীর সুযোগ পাইনি। কিভাবে করতে হয় তাও শিখিনি। আজ আমার আত্মা চিরবাঞ্ছিত, চির কাঙ্ক্ষিত পরম রবের সাথে মিলিত হয়েছে। সারারাত প্রেমাস্পদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। মহান প্রভু আমাকে দাসী হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। আমার অর্চনা, আরাধনা, প্রার্থনা কবুল করেছেন। আমার আত্মার প্রেম সাগরে সাঁতার কেটে প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়েছে। এমন মধুর রজনী জীবনে কোনদিন পাইনি। আজ নিরাকারের সাথে মিলিত হয়েছি। আলাপ-আলোচনা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া গোলাম তার মালিকের কাছে ফিরে এসেছে। হারিয়ে যাওয়া সন্তান মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। তাই বলছি, এ রজনী, বাসর রজনী। এটা মোদের আরাফাত। অপলক নেত্রে তালেবানরা আমার দিকে তাকিয়ে একাগ্রচিত্তে আমার কথাগুলো শুনছিলেন।

অতঃপর আমাকে গৃহাভ্যন্তরে ডেকে পাঠালেন। তালেবানরাও অযু করে কক্ষে প্রবেশ করলেন। উভয়ে বসলেন জায়নামাযে। একজন বললেন, "রিডলি! এখন থেকে তুমি মুক্ত, তুমি আযাদ, তুমি স্বাধীন। যে দিকে খুশী, সেদিকে যাও, যা করতে মন চায়

তা কর। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এতটুকু বলে একটি স্বপ্নের কথা জানালেন। তিনি বলেন, "আজ রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন ডেকে বলছেন, "বুলেট সাবধান! বুলেট সাবধান!" একটু পরে অন্য আর একজন যেন বললেন, মোল্লা ইয়ার! রিডলি তোমাদের বোন! তার হেফাজত করো। এ কথাটা তিনবার বলছেন। আমার মনে হল এ যেন কোন মহাপুরুষের কথা। অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখনো সে সুর আমার কানে অনুরণিত বা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।" মুক্তির পয়গাম আমাকে আনন্দ দিতে পারেনি। কারণ, আমি চেয়েছিলাম তালেবানদের পবিত্র হাতে আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটুক। তাদের ব্রাশ ফায়ারে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমি তো চেয়েছিলাম, এ পাপময় দুনিয়া থেকে এই মুহূর্তে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে যাই। আমার মন চাচ্ছিল না আবার আমি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যাই। সাগরের ওপারে বাস করে ডাইনী। বাস করে নরখেকো। সেখানে রয়েছে মানুষরূপী হায়েনা। আর শয়তান। একেক যামানায় একেকজন পণ্ডিত এসে পণ্ডিতী করে যিশুখৃস্টের দেয়া ইঞ্জিল শরীফে। কাট-ছাঁট করতে করতে সে আসমানী কিতাবের ১২ টা বাজিয়েছে। যিশুখৃস্টের কোন একটা বাণী অক্ষত নেই। বর্তমানে তা মিথ্যা রচিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। নাসারাদের চেয়ে শতগুণে বদমাইশ হল ইহুদীরা। ওরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বিলুপ্ত করেছে। গোটা পৃথিবীতে এরাই অশান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে। তালেবানরা যদি আমাকে হত্যা নাই করেন, তাহলে কোথায় যাব? কোথায় আশ্রয় পাব? সে পবিত্র ভূমি তো একমাত্র আফগানিস্তান। যেখানে অন্যায়ভাবে মারামারি, কাটাকাটি নেই। নেই মিথ্যার লেশ। যেখানে একে অপরের হিতৈষী বন্ধু। যেখানে বিদ্বেষ আর হানাহানি। নেই চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ, নেই মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা। এদেশে যদি তালেবানরা আমার মত পাপীকে আশ্রয় না দেন? তা হলে....

মুক্তি বাণী শোনার সাথে সাথে কে যেন আমার কুসুম সাদৃশ চেহারায় এক পোচ কালি মেখে দিয়ে পালিয়েছে। আমার অবস্থা দেখে মোল্লা ইয়ার বললেন, "কি হে রিডলি! মুক্তির বাণী শুনে মনে হয় ঘাবড়ে গেলে? তুমি কি মনে করেছ তোমার সাথে বিদ্রূপ করছি? না, আসলে বিদ্রূপ নয়, সত্যই বলছি।" আমি সিক্ত নয়নে বললাম, না ভাইজান! ঘাবড়াইনি, তবে চেয়েছিলাম, আপনাদের পবিত্র হাতে আমার সমাধি রচিত হবে। তা আর ভাগ্যে জুটেনি। তাই একটু বিচলিত হলাম।

তিনি বললেন, "না এমনটি আশা করো না। তুমি আমাদের সম্মানিত মেহমান। আমাদের বোন। মুসলমানদের রক্তে মুসলমানদের হাত রক্তিম হয় না। এটা আমাদের ধর্মে নেই।" এই বলে আমাকে ধর্মীয় তালিম দিতে লাগলেন। আমি গোয়েন্দা প্রশিক্ষণের সময় আরবী ভালভাবেই পড়েছি। আরবী লিখতে পারি, বলতে পারি, পড়তে পাড়ি, কোন অসুবিধা হয়না। তবে ইসলামী পরিভাষাগুলো বুঝতে একটু কষ্ট হয়। উনারা ফেকাহ্ শাস্ত্রের কয়েকটি কিতাব আমাকে দিলেন। নূরুলইযাহ, কুদুরী, কাঞ্জুদ্দাকায়েক, হেদায়া ইত্যাদি। এগুলো পাঠ করতে বললেন এবং যেখানে না বুঝি সেখানে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে বললেন। ভোরের নামায আদায় করে উভয়ে চলে গেলেন। আমি বন্দী শিবিরেই রয়ে গেলাম। অন্য দিনের মতই খানাপিনা আসছে। আমি কিতাবাদী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলাম। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পেলাম আলার দিশা। সকাল ১০টার দিকে এলেন অপর এক তালেবান। তিনি আমাকে কিতাবগুলোর চিহ্নিত স্থান অর্থাৎ, যেখানে

পাঠোদ্ধার করতে পারিনি, সেসব স্থান বুঝিয়ে দিলেন। এভাবে কিতাবাদী পড়ার মধ্যদিয়ে কেটে গেল ১০ দিন। এ দশদিনই ছিলাম কারাগারে।

* তালেবানদের বন্দী শিবিরে দশদিন থাকা কোন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধানে দশ বৎসর কাটানোর সমান। আমাকে যদি তালেবানরা আজীবন বন্দী করে রাখত, তবে কতই না মঙ্গল হত!

পৃথিবীর এমন কোন কারাগার আছে, যেখানে অপরাধীদেরকে নিয়মিত পাঠ দান করা হয়? শেখানো হয় নীতি কথা? তালেবানদের কারাগার এমনই এক প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রবেশ করে খারাপ মানুষ, আর বের হয়ে আসে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে, বেরিয়ে আসে একজন তাপসপ্রবর ও সাধু, সন্ন্যাসী হিসাবে। ইস্ কত সুন্দর তার ব্যবস্থাপনা!

পৃথিবীর অন্যসব কারাগারে চলে মদ, জুয়া, গাঁজা, হিরোইন, তাস, দাবা, লুডু জিনা, ব্যভিচারের আড্ডা। ভিতরে চলে গ্রুপিং। চলে মস্তানি। এসব কারাগারগুলো থেকে বেরিয়ে আসে সন্ত্রাসীর, চুরির, ডাকাতির ও হাইজাকারদের উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে। কারাগারে কারাগারে এত বৈষম্য থাকার একমাত্র কারণ হল, তালেবানদের কারাগারগুলো পরিচালিত হয় আসমানী সংবিধান পবিত্র কুরআনের আলোকে, আর অন্যসব কারাগারগুলো চলে আমাদের বৃটিশের রচিত আইন-কানুনে। তাই এত ব্যবধান।

উক্ত দশদিনে আমি যেসব কিতাবাদী পাঠ করেছি, এতে দেখলাম– একজন মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে নিয়ে মৃত্যুর পর পর্যন্ত করণীয় বিষয়াদী স্ববিস্তারে বর্ণনা করা, অর্থাৎ বিবাহ-শাদী, স্ত্রীর সাথে মিলন, সন্তান ধারণ, সন্তানের নাম রাখা, সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা, সন্তানের বিবাহ-শাদী, সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কি হক। প্রতিবেশীর কি হক। পরস্পর আচার-ব্যবহার, পরস্পর কেনা-বেচা, লেন-দেন, সমাজনীতি, অর্থনীতি রাজনীতি, সমরনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি কোনটি হালাল, (স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য উপকারী) কোন্‌টি হারাম (নিজের ও সমাজের জন্য অপকারী) কোন্‌টি পাক, কোন্‌টি নাপাক। কোন্‌টি বৈধ, কোন্‌টি অবৈধ। কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয় স্বাস্থ্যনীতি, কূটনীতিসহ সব ধরনের বিষয়াদীতে ভরপুর। তা ছাড়া কোন ধরনের অন্যায়ের কি ধরনের ও কতটুকু বিচার হবে এবং রয়েছে সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের জীবনে যা যা দরকার তা সবই রয়েছে। এমন কোন সমস্যা নেই, যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তো বলা হয়েছে ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, মোল্লারা এত সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন কিভাবে? রাষ্ট্রনীতির উপর তো তাদের কোন ধারণাই নেই। তাহলে.....?

এ ভুল ধারণার নিরসন হয়েছে হেদায়া নামক গ্রন্থ পড়ে। হেদায়া একটি জ্ঞানের মহা সাগর। যে ব্যক্তি হেদায়া নামক গ্রন্থ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি হতে পারবে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। সে হবে একজন ন্যায়বিচারক, সে হবে একজন সেনানায়ক। পৃথিবীর কোন ধর্মেই এসব আলোচনা করা হয়নি, যা ইসলাম করেছে। আর আসলে তো ধর্ম গ্রন্থ আর নেই। ইঞ্জিলকে ধ্বংস করেছে পাদ্রীরা। তওরাতকে ধ্বংস করেছে রাহেবরা। কুরআন ছাড়া নির্ভেজাল আর কোন আসমানী গ্রন্থ দুনিয়াতে উপস্থিত নেই।

আজ আমি উদাত্ত ভাষায় আহ্বান করব, হে ইহুদী, নাসারা ও প্রতিমা পূজারীরা! হে রাহেব পল, পাদ্রী ও ঠাকুরেরা! হে অশান্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা! তোমরা আস, কুরআনের নিকট মাথা নত কর, আত্মসমর্পণ কর, তাহলে দুনিয়াবাসী শান্তির মুখ দেখবে।

* যারা গণতন্ত্রের প্রবক্তা বা গণতন্ত্রমনা তাদের মধ্যে রয়েছে শোষণনীতি। এদের মধ্যে প্রজাপালননীতি নেই। এদের ভিতরে রয়েছে শয়তানী ও দুর্নীতি। তা না হলে কুরআন, হাদীস ও ফেকাহর কিতাবাদী মওজুদ থাকতে সংবিধান রচনা করতে যায় কেন? এদেরকেই বলে "আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ নেয়। ছিঃ এরাই জাতীয় গাদ্দার। বেঈমান, দুর্নীতিবাজ, টাউট, বাটপার, লম্পট ও চোর, ডাকাত।

পবিত্র সংসদ ভবন হল আইন তৈরির ফ্যাক্টরী। উক্ত কারখানার মালিক হল প্রধানমন্ত্রী আর আইন বানানোর কারিগর বা কর্মকার হল সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা। আইনের কারিগররা সিগারেট খেয়ে খেয়ে, আইন ফ্যাক্টরীতে (সংসদে) বসে আইন তৈরি করে মার্কেটে (সচিবালয়ে) পাঠান। সেখান থেকে রপ্তানী করে ক্রেতাদের (জনগণ) কাছে। যে কারখানায় বসে আইন তৈরি করেন, সে কারখানার প্রতি মিনিটের খরচ হাজার হাজার টাকা। এ অর্থ জনগণের রক্তচোষা অর্থ। এ অর্থ জনগণের বুকের রক্ত পানি করা অর্থ।

এক সরকার এসে জনগণের স্বার্থে (আসলে নিজ দলের স্বার্থে) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করে। লেট্রিন থেকে ডাস্টবিন পর্যন্ত কর আদায় করে। এভাবে শোষণনীতি চলে ৫ বৎসর। তার পর অন্য সরকার এসে জনগণের স্বার্থে (আসলে নিজ দলের স্বার্থে) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আর এক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। এতে নিজ পার্টির পকেট গরম হয়। (রাতারাতি গড়ে উঠে মনোরম স্থানে ৫ তলা বিশিষ্ট ভবন।

সংসদ ভবন মানে মাননীয় এম,পি মহোদয়ের বাণিজ্য কেন্দ্র। বিপনী বা দোকান। এখানে একবার ঢুকতে পারলেই হয়। জীবনে তার আর কোন অভাব থাকে না। ৫ বৎসরে হাতিয়ে নেয় ১৪ গোষ্টি আজীবন বসে খাওয়ার মত সম্পদ। এটা বরকতের ঘর। সে কারখানার কারিগররা (এম,পি) পায় মাসে হাজার হাজার টাকা বেতন। উপরি ও বোনাস পায় তার চেয়ে ২০ গুণ বা আর বেশি। গাড়ী, বাড়ী, গ্যাস, বিদ্যুতের বিল দিতে হয় না। টেলিফোন ও মোবাইল থাকে কারিগর পরিবারের সকল সদস্যের হাতে। বিল দিতে হয় না এ ৫ বৎসর। দরকার হলে পরবর্তী সরকার এসে তা পরিশোধ করবে। প্রিয় পাঠক! দেখছেন সংসদ নামক আইন কারখানায় চাকুরী নিলে কি মজা? আইন কারখানার কারিগরদের ছেলে-মেয়েরা যদি আকাম-কুকাম করে ধরা পড়ে, তবে একটা টেলিফোনই যথেষ্ট। আর কিছু করা লাগে না। পুরিশরা বাবা ডেকে, হাতে পায়ে ধরে, বগা সিগারেট খাওয়ায়ে, গাড়ী করে বাসায় এনে দিয়ে যায়। দেখছেন এক টেলিফোনে কি কেরামতি। উক্ত কারিগরদের ভাই-ভাতিজা ও ভাগ্নেরা যদি খুন করে, মেয়ে ধরে নিয়ে যায়, ব্যাংক লুট করে, তবু তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। কারণ, পুলিশ যদি এদেরকে ধরতে যায়, তবে তাদের জান খোয়া যেতে পারে। তা না হয় চাকুরী যে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এম, পি, সাহেবদের পিছে যারা সারাক্ষণ ঘুরাফেরা করে, তাদেরকে বলা হয় চেলা-চামুণ্ডা বা চাটুকার। আধুনিক বাংলায় বলা হয় ক্যাডার। এদের কোন বেতন নেই বা বেতন দিতে হয় না। এদের জন্য অঘোষিতভাবে বরাদ্দ দেয়া হয় লঞ্চ টার্মিনাল, বাস স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, হাট-বাজার ও পাবলিক টয়লেট। সেসব ক্যাডাররা সে সব স্থান থেকে চাঁদা তুলে নিজেরাও চলে এবং বন্ধু-বান্ধবও চালায়। আবার এরই আয় থেকে ক্লাবগুলোও চলে যায়। একজন এম, পি,র পুত্র হতে পারলে তার জন্য ৭ খুন মাফ। এম, পিদের ফয়েজ-বরকত ও নেক নজর থাকলে যত আকাম-কুকামই করুক না কেন সবই মাফ হয়ে যায়।

ঈদ, পূজা ও বড়দিনগুলোর প্রায় তিন সপ্তাহ আগে গরীব জনগণ মার্কেটের আশেপাশে ঘেঁষতে পারে না। মার্কেটগুলো অলিখিত বা অঘোষিতভাবে ভাবীদের (এম,পিদের বউ) দখলে চলে যায়। মনে হয় আইন ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লিজ নিয়ে নিয়েছে। ভাবীরা চাকর-বাকর ও গাড়ী-ঘোড়া নিয়ে মার্কেটে ঢুকে। একদিক থেকে মার্কেট করতে থাকে। কাপড়-জুতা, গয়নাপত্র, কসমেটিক থেকে নিয়ে কাঁচাবাজার পর্যন্ত থাকে ভাবীদের দখলে। গরীবরা শুধু হা করে চেয়ে থাকে। ভয় হয় হা করে চেয়ে থাকার জন্য কবে নাকি কোন সরকার ট্যাক্স বসিয়ে দেয়।

আমার আলোচনায় অনেকে মনে করতে পারেন যে, বাংলাদেশের কথা বলছি। আসলে তা নয়। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে বাংলাদেশ অনেক অনেক গুণে ভাল। অনেক দেশে বাংলাদেশের প্রশংসাও করেছে। যেসব দেশের শাসকরা গণতন্ত্র আমদানী করেছে, সেসব দেশের চাল-চিত্রের কথা বলছি বাংলাদেশের নয়। প্রশ্ন জাগে, গরিবরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঈদ-পূজা ও বড়দিন উদযাপন করার মত চাল, ডাল, গম, আটা, নুন, তেল কেনার মত পয়সা পায় না। তাহলে ভাবীরা অতটাকা পায় কোথায়? ভাইয়্যাদের কি টাকা তৈরির মেশিন আছে? তার জবাব কে দেবে?

তালেবান মন্ত্রী, মিনিস্টারের কোন বেতন ধার্য নেই। তারা অফিস টাইমের বাইরে রোডে গাড়ী চালায়, দোকানদারী করেন, আবার কেউ কেউ চাষাবাদ করেন, আবার অনেকেই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। কারো কারো ভাই ও ছেলেরা রোজগার করেন। এ দিয়ে তাদের সংসার চলে যায়। তাদের নেই খাট-পালঙ্ক, নেই সোফা সেট। প্রয়োজন হয় না তোষক, জাজিম ও কার্পেটের। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র নেই ওদের ঘরে।

এ,সি, তো দূরের কথা বি,সিও নেই তাদের বাসা-বাড়ী ও অফিসে। ফ্রিজ কি ঘোড়ার ডিম না বাতাসা তা তারা নামই জানে না। তাদের নেই কোন চাকর বাকর। নিজেরাই ছালার ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার করতে বের হন। নিজেরাই মাথায় বহন করে বাজার বাড়ীতে পৌঁছে দেন। অনেক মন্ত্রীদেরকে ছাগল নিয়ে মাঠে চড়াতে দেখেছি। কে আমীর, কে ফকির, কে চাকর, কে নফর তার কোন ভেদাভেদ তালেবানদের মাঝে নেই। এক বৃদ্ধের গমের বোঝা একজন মন্ত্রীকে বহন করে নিয়ে যেতে দেখেছি। নিজ হাতে সেবা করতে দেখেছি একজন মন্ত্রীকে হাসপাতালে। এরা জনগণের সরকার, জনগণের নয়নমণি। তারাই জনগণের রক্ষক ও খাদেম। এরা বেতনভুক্ত কর্মচারী নন। তাদের হাতেই নেয়া উচিত পৃথিবীর শাসন ভার। কোন মন্ত্রির কোন অসুবিধা হলে অন্য একজনকে বলেন ভাই তুমি ১ সপ্তাহ আমার দায়িত্ব পালন কর, আমি ঐ কাজটি করে আসি। আমীরুল মুমেনীন তাদের অবস্থান অনুসারে বায়তুল মাল থেকে কিছু কিছু ভাতা দেন। তাও মাঝে মধ্যে।

হে দুনিয়াবাসী! তোমরা আফগানিস্তানে এসে ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তি নিজ চোখে দেখে যাও, আস্বাদন করে যাও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাদ।

* বন্দী শিবিরে দশ দিন অতিবাহিত করার দিন সকাল ৮ টায় আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আমাকে কান্দাহার ডেকে পাঠান। বন্দী শিবির থেকে আমার অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এখানে থেকে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করব এটাই ছিল আমার ইচ্ছা। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এখানে থাকতে দেয়া হল না।

তালেবানরা আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার সমস্ত জিনিস-পত্র জব্দ করে নিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল একটি প্রাইভেট কার (ভাড়া করা) একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা।

একটি রেডিওসহ টেপরেকর্ডার। একটি বড় ব্রিফকেস, একটি টর্চ লাইট, ঘড়ি, চশমা, ব্যবহারের অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় এবং নগদ ৪০ হাজার ডলার। তাছাড়া ব্যাংকের কাগজ পত্র ও আমার রিপোর্ট বুক।

আমাকে কান্দাহার নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ীর কাগজপত্র দেখে একজন তালেবানের মাধ্যমে গাড়ীটি মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল। হিসাব করে তারা গাড়ী মালিকের টাকাও দিয়ে দেয়।

বিকাল ৩ টায় আমাকে আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের বাসভবনে অর্থাৎ তাঁর কার্যালয়ে পৌছান। সে সময় আমীরুল মুমেনীন তালেবানদের গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদরদের নিয়ে জরুরি মিটিং করছিলেন। আমাকে মেহমানখানায় রাখা হল। আমাকে দেখার জন্য ১২/১৩ বছরের কয়েকটি বালক মেহমানখানায় ছুটে এল। ছেলেগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। লাজুক লাজুক ভাব, মায়াভরা চাহনী। গায়ে লম্বা জুব্বা। মাথায় কালো পাগড়ী, কাঁধে ঝুলানো ক্লাশিনকভ। হাতে একটি করে কিতাব। মনে হয় এরা সবাই ছাত্র।

আমার রেডিওটি নিয়ে যাওয়ার কারণে ১০/১২ দিন যাবৎ কোন সংবাদ শুনতে পারছি না। বিশ্ব সংবাদ জানার জন্য মন ছট-ফট করছিল। মেহমানখানায় এক পার্শ্বে একটি ডেক্সের উপর একটি পত্রিকা পেলাম। অধির আগ্রহে পত্রিকাটি খুলে পড়তে লাগলাম। কাগজটির নাম জরবে মোমেন। এটা তালেবানদেরই মুখপত্র। আমি শুধু পত্রিকাটি হেড লাইন দেখছিলাম।

প্রথম পৃষ্ঠার শেষের দিকে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ শিরোনাম দেখে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। রেডিও তেহরান, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, "বৃটিশ সাংবাদিক ইয়োভনি রিডলির ইসলাম গ্রহণ।" আমি প্রথম থেকে সবটুকু পড়লাম। রেডিও তেহরান ও বিবিসি লন্ডন সাংবাদটা মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে পরিবেশন করেছে। জরবে মুমিন সংবাদটির মধ্যে টীকা-টিপ্পনী এঁটে দিয়েছে। ঘঁষে-মেজে মিথ্যা দূর করে সত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, একই বয়সের আরো কয়েকটি ছেলে এসেছে এবং আমাকে দেখছে। একই ধরনের পোশাক ওদের গায়ে।

আমি ভাবলাম, ওরা হয়ত আমার পরিচয় জেনেছে। তাই জরবে মুমিনের সংবাদ পড়ে আমাকে দেখার কৌতূহল জন্মেছে। আমি আমার বোরকার নেকাব টেনে মুখমণ্ডল আবরণ মুক্ত করলাম। এদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলব এ খেয়ালে। একটি ছেলেকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম। ছেলেটি দু'চার কদম এগিয়ে এসে লজ্জাবনত অবস্থায় দাঁড়াল। তার সাথে আসল আরো দু'জন।

আমি একজনকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে ছেলে! তোমার নাম কি? সে উত্তর না দিয়ে হাসছে। এ হাসিটা যে কত মধুময়, কত আকর্ষণীয় তা বুঝাবার ভাষা আমার নেই। বুঝতে পারলাম, ছেলেটি ইংরেজি বুঝে না। পুনরায় পশ্‌তু ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর এল, "আমার নাম ফরিদ।" তুমি কি কর? "আমি নাহবেমীর জামাতে লেখাপড়া করি।" কোন মাদ্রাসায়? "কান্দাহারে আমীরুল মুমেনিনের মাদ্রাসায়।"

ঃ তোমার ভাই বোন কত জন?

ঃ আমরা ৩ ভাই ১ বোন, বড় দু'ভাই শহীদ হয়ে গেছেন।

ঃ অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

ঃ আমার নাম ওৎবা।

ঃ তুমি কোন ক্লাশে পড়?

ঃ "কাফিয়া জামাতে।"

ঃ তোমরা ভাই-বোন কতজন? পিতা মাতা আছে কি?

ঃ আমরা ভাই-বোন ৩ জন, বড় ভাই শহীদ হয়ে গেছেন। বোনকে রাশিয়ান সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে। আব্বু এক লড়াইয়ে দু'টি পা হারিয়েছেন। আম্মা মানসিক রোগী।

অপর একজনকে তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল, আমার নাম ফুয়াদ। পড়ি শরহেজামী। আমার সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। আমার পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও বাড়ী-ঘর নিষ্ঠুর মিসাইল কেড়ে নিয়েছে। গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঘর-বাড়ী। ১০/১২ টি ছেলের মধ্যে প্রায় ৪/৫ জনই পঙ্গু। এদের অবস্থা দেখে আমার চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল। তাদের পরিচয় জেনে হৃদয় দুঃখে ভারী হয়ে গেল। আর কারো পরিচয় নেয়ার আগ্রহ দূর হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয় আমাকে ডেকে বলছে, "হে রিডলি ওদের পরিচয় জেনে আর কাঁদাসনে।" মুখাবরণ খুলে ফেলার কারণে একজন বলছে। "আপা! আপনি আমাদের থেকে পর্দা করুন। মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখুন। অন্যথায় গুনাহ হবে।" ছেলেটির কথা শুনে সাথে সাথে আমি নেকাব টেনে দিলাম।

এদের মধ্যে ১৭/১৮ বৎসরের এক যুবক এসে প্রথমে সুন্দর করে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপা! আপনি কি বৃটিশ সাংবাদিক?

ঃ হ্যাঁ, আমি বৃটিশ সাংবাদিক ছিলাম। বর্তমানে আমি মুসলিম সাংবাদিক।

ঃ সত্যিই কি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

ঃ কেন? তুমি কি মনে কর?

ঃ আমি শুনেছি, আপনি নাকি মুসলমান হয়েছেন।

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই মুসলমান হয়েছি।

ঃ আপনি এর পূর্বে কোন্ ধর্মে ছিলেন?

ঃ আমি ছিলাম নামেমাত্র ঈসায়ী।

ঃ ঈসায়ী ধর্ম থেকে মন উঠার কারণ কি?

ঃ বাপু! সে অনেক কথা। তবে এতটুকু বলতে পারি, পুরো ধর্মটাই আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মিথ্যা আর মিথ্যা। বাটপারী, ধোঁকাবাজীই হল এ ধর্মের বুনিয়াদ।

ঃ কেন? আপনাদের তো নবী ছিলেন, কিতাব ছিল। তা হলে এমনটি হল কেন?

ঃ তা সত্য। সবই ছিল, কিন্তু ধর্মযাজক পাদ্রিরা ইঁদুর সেজে আসমানী কিতাব ইঞ্জিল শরীফ খেয়ে ফেলেছে। এখন নিজেরাই তা মনমত মনগড়া রচনা করেছে। ১০ বৎসর আগের বাইবেলের সাথে ১০ বৎসর পরের বাইবেলের কোন মিল নেই। এই হল আমার পুরাতন ধর্মের অবস্থা। বর্তমানে খ্রিস্টানরা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। ইহুদীদের চক্রান্তের শিকার হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইহুদী ও খ্রিস্টানরা জোঁট বেঁধেছে। এ জোটে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইহুদীরা। হাজার চেষ্টা করেও ইহুদীদের রাহুগ্রাস থেকে বা ইহুদীদের বাহুবন্ধন থেকে ছুটে আসতে পারবে না।

উক্ত জোটের কর্মসূচি একটাই। তাহল বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন। এরাই খুব সু-কৌশলে দাঙ্গা লাগিয়ে রক্ত ঝরিয়ে মোড়ল সেজে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে। গভীর ষড়যন্ত্র

এদের। অন্যেরা তা সহজে বুঝতে পারে না। আর বুঝতে পারলেও উপায় নেই তাদের হাতে পায়ে ধরা ছাড়া। কোন একটি দেশে গোপনে অস্ত্র দিয়ে অপর দেশের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। এ সুবাদে তার অস্ত্র বিক্রি করে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার কামাই করে নেয়। ইস্ কত নোংরা ষড়যন্ত্র ওদের। তারা চায় পৃথিবীর সবগুলো দেশ তাদের গোলামী করুক। আর হচ্ছেও তাই। মধ্যপ্রাচ্যকে তারা হাত করে নিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের শাইখগণ তাদের গোলামী বরণ করে নিয়েছে। প্রভুদের কথা ছাড়া শাইখরা নিজ মর্জিতে কোনকিছুই করতে পারে না। কোন কথা বলতে হলে আগে ওয়াশিংটন, তেল আবিবের গোচরে দিতে হয়। এজাজত মিললে বলতে পারে। অন্যথায় চুপ থাকতে হয়।

এদেরই ইঙ্গিতে সারা বিশ্বে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। সন্তান ও স্বামী হারা হচ্ছে মুসলিম মা-বোনেরা। ইজ্জত হারাচ্ছে মুসলিম মা-বোনেরা। ভিটে-বাড়ী হারা হচ্ছে মুসলমানেরা। রিপুজি হচ্ছে একমাত্র মুসলমান। মুসলমানদের ভূখণ্ড কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ইহুদী, নাসারা ও মূর্তি পূজারীরা। এজন্য তাদের মাথা ব্যথা নেই। নেই কোন দরদ। মুসলমানদের আহাজারী, শিশুদের কান্না আর মা-বোনদের চিৎকার তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। তাদেরই মুখ থেকে বের হয় মানবতার শ্লোগান। আরাকান, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আলজেরিয়া, কসভো, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনা, পূর্ব তিমুর, জিংজিয়ান ও জাকার্তায় যে সব নারকীয় ঘটনার সূত্রপাত, তা তাদেরই অশুভ ইঙ্গিত। তাদেরই ফর্মূলা।

ছিঃ আরব শাইখদের। ধিক্কার তোমাদের ঈমানদারীর। তোমরা মুসলমান নামের কলংক। তোমরা আবু জেহেলের দোসর। তোমরা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার উত্তরসূরী। তোমাদের দেশে তেলের খনি, পেট্রোল খনি, স্বর্ণ ও হীরার খনি রয়েছে। এগুলো তোমাদের বাপ-দাদার সম্পদ নয়। এগুলো মুসলমানদের সম্পদ। মুসলমানের পবিত্র ভূমির সম্পদ দিয়ে পশ্চিমারা মৌজ করে। ওহে আরব শাইখরা! ওরা কি তোমাদের বাপ-দাদা? কেন ইসলামের দুশমনের সাথে এত মাখা-মাখি, কোলা-কুলি আর ডলা-ডলি? নবী মোহাম্মদের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অসহায় মুসলমানদের দরদ ভুলে গিয়ে কি করে তোমরা ইহুদী নাসারাদের মুরুব্বী বানালে? এই কি ছিল তোমার প্রভুর শিক্ষা! এটাই কি তোমার নবীর শিক্ষা? ইহুদী নাসারা তো মুসলমানের চির শত্রু, প্রকাশ্য দুশমন। সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

হে আরবের শাইখরা! আপাদমস্তকে তোমাদের মাঝে নবীর সুন্নত নেই। লাল রুমালে ঘোমটা দিয়ে মাগী সেজে বসে আছ। তোমার ঢাল-তলোয়ার, তীর, বল্লম, বর্শা, ঘোড়া কোথায়? নবীর এ সম্পদগুলো তোমার কোন বাপ-দাদাকে লিজে দিয়ে দিয়েছ? তোমার নাকের ডগায় ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে, তুমি একটুও নড়াচড়া করছ না কেন? তোমার বাপ-দাদারা তো লড়াই করেছে। তোমার বাপ-দাদার ঘোড়া তো সুদূর আফ্রিকার বন-জঙ্গলের ঘাস খেয়েছে পান করেছে নির্ঝরিনীর পানি। তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নবীর সুন্নত খুঁজে পাই না। কোন্ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে নবীর সুন্নতকে?

হে আরবের শাইখরা! তেল বিক্রয়ের টাকার কামড় সইতে না পেরে তুমি যে অপচয় করছ, মাটি ছোঁয়া জুব্বা পরছ, এটা হারাম। তোমার জুব্বাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে তীর বেশ ধর। লাল উড়নার ঘোমটা ছুঁড়ে ফেলে হেলমেট শীরস্ত্রাণ পরিধান কর, যা নবী ব্যবহার করেছিলেন যুদ্ধের ময়দানে।

হে তেলের বেপারীরা! ১৫ শত বৎসর পরে কি তোমরা আবার বরবর জাতিতে পরিণত হয়ে গেলে? যখন সারা দুনিয়ায় মুসলমানের রক্ত নিয়ে ইহুদী-নাসারারা হলি খেলছে এমনই এক করুণ মুহূর্তে তুমি দুশমনানে-ইসলাম ও কাফেরদের বড় বড় নেতাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সৌদীতে এনে স্বর্ণের মেডেল গলায় পরাও। করমর্দন কর আর হাত তালি দিয়ে সংবর্ধনা জানাও। এ স্বর্ণ কি তোমার বাবার ছিল না মুসলমানের? হে ফাহাদ! তোমার কি লজ্জা হয়না? শরম লাগে না?

হে ফাহাদ! তুমি শুনে রাখ, এক টুকরা রুটির জন্য, এক লোকমা ভাতের জন্য, এক গ্লাস পানির জন্য, এক ব্যাগ রক্তের জন্য, দু'চারটি বুলেটের জন্য, কিছু শীত বস্ত্রের জন্য, আহতদের ঔষদের জন্য যখন মুসলমানরা কাঁদছিল, তখন ক্লিনটন, কফি আনান, ব্লেয়ার, শ্যারনদেরকে দাওয়াত করে এনে মাগী পোলা ১৪ গোষ্ঠীকে নিয়ে তোমার বাসায় মেলা বসিয়েছিলে। তাদের পিছনে কোটি কোটি ডলার খরচ করেছিলে। তোমার বৌ ও মেয়েদের নিয়ে এক সাথে বসে চা-নাস্তা খেয়েছিলে, তা টিভির পর্দায় দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। মনে রেখেছে তোমার কর্মকাণ্ড। হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাকবে চিরদিন। মনে রেখো! তোমার পরিবারের লোকেরাই একদিন সিরিঞ্জের মাধ্যমে তোমার রক্ত খুলে ব্রাড ব্যাংকে বিক্রি করবে, যদি আল্লাহ্ চান। শুনেছি তোমার বাপ-দাদার সময় নাকি শত শত আলেমকে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে?

হে আরবের শাইখরা! ঘরে ঘরে টিভি, ভিসিআর, ডিশ, নর্তকী, গায়িকা। সুদান ও ইন্দোনেশিয়া থেকে মেয়ে এনে খাদেমা নামে জিনা করার প্রচল কোথায় পেলে? কে শিখিয়েছে এ বর্বরতা? তেলের পয়সার কামড়ে অবকাশের নাম নিয়ে বেরিয়ে যাও দেশের বাইরে, প্যারিস ও বোম্বাইয়ে। সেখানে খাও মদ ও কর মাগীবাজী। এসব ইতিহাস কার না জানা? তোমাদের আচরণে বিজাতীরা মুসলমান নাম শুনলে ঘৃণায় থুথু নিক্ষেপ করে।

হে শাইখরা! তোমাদের হাতে ধরি পায়ে ধরি। মুসলমানের মান ইজ্জত আর নষ্ট করো না। ফিরে আস, কুরআনের পথে ফিরে এসো নবীর পথে। মানবতা ও সভ্যতার পথে। তাহলে ইহকালে ও পরকালে শান্তি পাবে। বাঁচতে পারবে মজলুমের আহঃ শব্দ থেকে। ফিরে এসো! ফিরে এসো!

* এতক্ষণে সূর্য রক্তিম আভা ছড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে অস্তাচলে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। প্রশ্নকারী ছাত্ররা হয়ত আমার উত্তর শুনে অনেকটা বিরক্তি বোধ করছে। এ প্যাচাল পাড়ার ইচ্ছা ছিলনা আমার। সারা দুনিয়ার অশান্ত পরিস্থিতি যখনই আমার মানসপটে ভেসে উঠে, তখনই আমার বিবেক নামক পাগলা ঘোড়া এলো পাথারী দৌড়াতে থাকে। তাই এসব বাস্তবতার কিছু নমুনা বালকদের কাছে তুলে ধরতে বাধ্য হলাম। যেন ওরা এদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ও সতর্ক থাকতে পারে। ছেলেরা চলে গেল মাদ্রাসায়।

মুয়াজ্জিন সুমধুর সুরে আযান দিলেন। সে সুর লহরিতে কান্দাহারের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। মুসল্লীরা নিজ নিজ কাজের সমাপ্তি টেনে মসজিদ পানে ছুটে চলছে। কে কার আগে যাবে, কে আগের কাতারে দাঁড়াবে এনিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। আমি হতভাগিনী পূর্বের ন্যায় হাত-পা ধুয়ে মেহমানখানার এক কোণে মস্তকাবনত অবস্থায় কায়োমনোবাক্যে নিরাকার মাওলার গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতে লাগলাম। আমার মনে হয় আমার এ পাগলামী, অর্চনা, প্রার্থনা সবই আল্লাহ কবুল করে নিচ্ছেন। আমি যদিও নামায শিখিনি, নামায পড়তে পারিনি, তবু যেন আমাকে আমার মাওলা হাতছানী দিয়ে ডাকছেন।

মসজিদে নামায শেষ হল। মুসল্লীরা নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমীরুল মোমেনীনও মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিজ কামরায় প্রবেশ করলেন। এমন সময় একজন তালেবান এসে বললেন, "মিটিং শেষ হয়ে গেছে। তারা নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিজ নিজ স্থানে চলে গেছেন। এখন কামরা খালি অন্য কোন লোক নেই। এ নিরিবিলি সময়ে আমীরুল মোমেনীন আপনাকে তলব করেছেন।" ভয়ে আমার পা কাঁপছে। অন্তর দুরু দুরু করছে। এ পাপ নিয়ে কি করে মুখ দেখাব আমীরুল মোমেনীনের সামনে? তাই খুবই লজ্জা বোধ করছিলাম। যেতে তো হবেই, অযথা চিন্তা করে সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গেলাম মোল্লা ওমরের কক্ষে। প্রথমেই আমি ইসলামী কায়দায় সালাম দিলাম। গুরুগম্ভীর সুরে উত্তর বেরিয়ে এল "ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালাম, ওয়া রাহমা তুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।"

আমীরুল মোমেনীন হাতের ইশারায় বসতে বললেন। তিনি তখন মালা হাতে কি যেন জপ্ করছিলেন। আমি নতজানু হয়ে দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে বসে গেলাম। আমীরুল মোমেনীন একবার আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন-

ঃ তুমি কি বৃটিশ সাংবাদিক ইয়োভনী রিডলি?

ঃ আমি উত্তরে বললাম, "ইয়েস স্যার। আমিই ইয়োভনি রিডলি। অনেকে শুধু ডলি হিসাবেই চেনে ও জানে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন-

ঃ শুনেছি তুমি নাকি খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে আশ্রয় নিয়েছ?

ঃ জ্বী হুজুর! আমি মুসলমান হয়ে গেছি।

ঃ তুমি নাকি একজন বৃটিশ সাংবাদিক?

ঃ জি স্যার।

ঃ আফগানিস্তানে আসার কারণ শুধু সংবাদ সংগ্রহ করা, না আর কিছু মতলব আছে?

ঃ সাংবাদিকতার লেবাসে গুপ্তচরের কাজ করা।

ঃ তুমি একা না আর কোন লোক আছে?

আমার মিশনে প্রায় ৪০ জন লোক আছে। আফগানিস্তানে প্রবেশ করে আপনাদের রাষ্ট্র পরিচালনা, সুখ-শান্তি, নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছি। আমার মিশনের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ঃ তারা কোথায়?

ঃ মনে হয় তারা দেশে ফিরে গেছেন। আমার গ্রেপ্তারির পর থেকে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। দেশে ফিরে যাওয়ার এক আভাস পেয়েছিলাম।

ঃ তোমার মিশনের কিছু সংক্ষিপ্ত কারগুজারী শুনাও।

ঃ আমরা একসাথে আফগানিস্তান প্রবেশ করিনি। আমরা পর পর প্রবেশ করেছি। আমাদেরকে প্রেরণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, বৃটিশ ও ফ্রান্স। জাতিসংঘের ইঙ্গিতও রয়েছে এতে। তালেবান উত্থান বন্ধ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, পাশ্চাত্য জগত ভালভাবেই অনুধাবন করেছে যে, পৃথিবীর কোথাও ইসলামী শাসন নেই। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সুফল দুনিয়াবাসী দেখেনি। ইসলামের মাতৃভূমি সৌদী আরব থেকেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তাড়ানো হয়েছে। এত বৎসর পর আফগানিস্তানে আবার ইসলাম মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআনী শাসনের সুফল দুনিয়াবাসী দেখতে আরম্ভ করেছে। মুসলিম জগত আফগানিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আফগানিস্তানের জিহাদকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর নুয়ে পড়া মুসলিম দেশগুলো মাথা তুলে

উঠতে শুরু করেছে। দিকে দিকে জিহাদের দামামা বেজে উঠছে। স্বাধীনতা ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করার দাবী উঠছে। আর যদি ৭/৮ বৎসর তালেবানরা টিকে যায়, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াবে। পশ্চিমা জগতের মোড়লগিরীর গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। আমাদের তৈরি করা গণতন্ত্র আটলান্টিক মহাসাগরে নিক্ষেপ করবে। গণতন্ত্রের দাফন করে ইসলামী নেজাম চালু করবে। আমার জন্য তখন দুনিয়া সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। হাজার বছরের অন্যায় অপরাধের জন্য, বিশ্বব্যাপী গণহত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তালেবানদের বিচারের কাঠগড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। আমাদের অপকর্মের হিসাব তিলে তিলে দিতে হবে। আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। মোড়লগিরী ছুটে যাবে। গোলামে পরিণত হতে হবে।

এসব চিন্তা করে পশ্চিমা জগত আপনাদের উৎখাতের জন্য খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করছে। বহু মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরকে লোভ দেখিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। অর্থ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে ওরা আমেরিকার গোলামে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণ আপনাদের পক্ষে থাকলেও সরকারকে খরিদ করে নিয়েছে। পাকিস্তান সরকার জনগণকে কি কথা বা কি যুক্তি দেখিয়ে ঠাণ্ডা করবে এবং বিশ্ববাসীকে কি জবাব দেবে সে পরামর্শ শিখিয়ে দিয়েছে।

যেমন, মোশারফ বলবে, আমি যদি এই মুহূর্তে আমেরিকাকে পাকিস্তানে আশ্রয় না দেই, তাহলে পাকিস্তানের শক্তিকে ধ্বংস করে দেবে। পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করে দেবে। পাকিস্তান শক্তিশালী থাকলে দুনিয়ার মুসলমানরা শক্তিশালী থাকবে। পাকিস্তান টিকলে আফগানিস্তান টিকবে। পাকিস্তান না থাকলে আফগানিস্তান থাকবে না। আর একটি জবাব শিখিয়েছে যে ইঙ্গ-মার্কিনরা দূরে থাকলে আমরা কিছু করতে পারব না। তাই লোভ দেখিয়ে কাছে আনা হচ্ছে। একবার ঢুকাতে পারলেই হয় কাউকে আর পাকিস্তান থেকে ফিরে যেতে দিব না। এসব মিথ্যা বানোয়াট যুক্তি দিয়ে পাকিস্তানের জনগণ বিশ্ব বিবেককে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। মার্কিনীরা ইরানকে এই বলে হাত করেছে যে, তালেবানদের ইসলাম আর আপনাদের ইসলাম এক নয়। তালেবানরা কট্টর পন্থী আর আপনারা উদার পন্থী। তালেবানরা যদি আর কিছুদিন টিকতে পারে, তবে আপনাদেরকে মজা দেখিয়ে দিবে। ওরা হল সুন্নী মুসলমান আর আপনারা হলেন শিয়া মুসলমান। এ দু'কিছিমের মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আপোষহীন সংঘাত। এক সময় তালেবানরা ইরানের উপর আক্রমণ করে ইরান দখল করে নেবে। তখন আর আপনাদের কিছুই করার থাকবে না। তাই আসুন আমাদের সাথে একমত হয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের দোহাই দিয়ে আফগানিস্তান ধ্বংস করে দেই। ইরান এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে রাজী হয়ে গেল। ইরান আমেরিকার মধ্যে যতই মৌখিক বিরোধ দেখেন না কেন, আসলে এক। শিয়ারা মুসলমান নয়, এরা জাতিগতভাবে ইহুদী। মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যই ইহুদীরা চক্রান্ত করে শিয়া মুসলমানদের জন্ম দিয়েছে। শিয়ারা মুসলমান নয় বরং শত্রু। আর ইহুদীদের দোসর। ইহুদীদের সন্তান।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি হয় অবগত নন বা অবগত থাকতেও পারেন, রাশিয়া যখন অবৈধভাবে আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং তুমুল লড়াই করছিল, তখন উসামা বিন লাদেন ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক শহীদ (রহঃ)-এর মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র আফগানিস্তানে বিক্রি করে। এতে আমেরিকা, ইসরাইল ও ফ্রান্স অনেক লাভবান হয়েছে। সৌদী আরবের ধনাঢ্য শাইখদেরকেও

উৎসাহিত করেছে আফগানিস্তানের জন্য অস্ত্র খরিদ করে দিতে। সৌদী আরব কুয়েত, কাতার, আবুদাবী, দুবাই, বাহরাইন আরব আমীরাতও এ সমস্ত দেশ সেদিন আপনাদেরকে অস্ত্র খরিদ করে দিয়েছে।

এ সাহায্যের পিছনে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ দু'টি। এক. চড়াদামে অস্ত্র বিক্রি করা। দুই. বিশ্বের পরাশক্তি রাশিয়াকে পরাস্ত করে আফগানিস্তানকে নিজের ব্লকে নিয়ে আসা অর্থাৎ, গণতন্ত্রে ভর্তি করা। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আমেরিকা বুরহান উদ্দীন রব্বানীর সাথে গোপন চুক্তি করেছিল যে, যুদ্ধের অবসান ঘটলে বুরহান উদ্দীন রব্বানীকে ক্ষমতায় বসাবে। আর বুরহান উদ্দীন রব্বানী দেশটাকে আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবে।

১৪/৪/১৯৯২ ইং সালে ডঃ নজিবুল্লাহ পতনের মধ্য দিয়ে মুজাহিদদের যাত্রা শুরু হয়। ডঃ নজিবুল্লার পতনের ১২ দিনের মাথায় অর্থাৎ, ২৮/৪/৯২ ইং খ্রিস্টাব্দের সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদীকে ক্ষমতায় বসায়। মুজাদ্দেদীর ৫ মাস যেতে না যেতেই অর্থাৎ, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রফেসর বুরহান উদ্দীন রব্বানীকে প্রেসিডেন্ট ও গুলবদ্দীন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবে আস্তে আস্তে দেশটা গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। এর পিছনে আমেরিকা ও ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল বেশি। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধে যখন হাজার হাজার মুজাহিদরা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছিল, তখন মোড়ল বাড়ীর এরা দূরে বসে হাততালি দিচ্ছিল। দেশটা যখন অরাজকতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হল। তখন পশ্চিমা মিডিয়া বিশ্বব্যাপী হাঁক-ডাক আরম্ভ করে দিয়ে এই বলে যে, দেখ ধর্মযুদ্ধের ফলাফল বা পরিণতি কি তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে পবিত্র জিহাদকে কলুষিত করতে লাগল। জিহাদের মুখে লেপে দিল এক পোচ কালি। সেদিন খবরের কাগজের হেড লাইনেই আপনাদের অর্থাৎ, আফগান মুজাহিদদের বদনাম ছাপা হত। সি.এন.এন খুবই ব্যস্ত ছিল আফগান মুজাহিদদের নিয়ে। যে কোন সময় টি.ভি অন করলেই ভাসত মুজাহিদরা নিজেরা নিজেরা লড়াই করছে। এ লড়াই ক্ষমতার লড়াই। এ লড়াই ভাগাভাগির লড়াই।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি যখন ছাত্রদেরকে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন এবং বিনা রক্তপাতে বা বিনা প্রতিরোধে বিভিন্ন শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে এনে পুরোপুরি শরয়ী আইন চালু করেন। অতঃপর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বরে কাবুল দখল করে এমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তান ঘোষণা দেন, তখন থেকেই আমেরিকা, বৃটিশ, ইসরাইল, ফ্রান্সের মাথা গরম ও পায়জামা ঢিলা হতে লাগল। একমাত্র আপনার মাধ্যমে এতদিনের লালিত স্বপ্ন ধূলিস্যাত হতে চলছে। সেদিন থেকেই যে কোন মূল্যে ইসলামী এমারতকে ধ্বংস করার জন্য শপথ নিয়েছে।

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর খুবই ধৈর্যর সাথে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। এদিকে এশার নামাযের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানলে, তিনি নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলেন। আমি চলে আসলাম মেহমান খানায়। মেহমানখানায় অযু-গোসল ও পেশাব-পায়খানার সুব্যবস্থা রয়েছে। মেহমানখানার এক খাদেম আমাকে একটি নির্জন কক্ষ দেখিয়ে বললেন, "আপা! এ কামরাটি আপনার জন্য নিরাপদ। আপনি এ কামরায় রাত যাপন করবেন। আপনার জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই প্রায় ৩০ মিনিট পর খানা হাজির করা হল। আমি খানা খেয়ে কক্ষে গিয়ে শুয়ে পরলাম।

* রাত পোহাল, ভোর হল। কান্দাহারের পথ-ঘাট ক্রমশঃই লোক-জনে ভারী হয়ে উঠল। মুখে মুখে একই গুঞ্জন, একই কথা, একই রব। ইঙ্গ-মার্কিন আফগানিস্তানকে আক্রমণ করবে। উসামা বিন লাদেনকে ধরে নিয়ে যাবে। টু-ইন টাওয়ার ও পেন্টাগন ধ্বংসের প্রতিশোধ নেবে। ইঙ্গ-মার্কিনের হাঁক-ডাক ও আস্ফালনে আফগানিদের চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। নেই কোন ভীত, নেই সংশয়। চেহারায় চোখ বলালেই মনে হয় এরা নির্ভীক ও সাহসী জাতি।

একটু পায়চারী করার জন্য মেহমানখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তায় পার্শ্বে এক দোকানীকে একা বসে থাকতে দেখে তার নিকট এগিয়ে গেলাম এবং প্রশ্ন করলাম, "চাচা! উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়াটাই ভাল ছিল। একজনের জন্য তো পুরো দেশটাই ধ্বংস হতে যাচ্ছে!

দোকানী অগ্নিশর্মা হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি বলছ নেমক হারাম! কাফিরদের হাতে একজন মুমেন মুসলমানকে তুলে দেয়া! এত বড় জঘন্য কথা বলতে পারলে তুমি? তুমি কি মুসলমান না অন্য জাতি? যদি আমেরিকা প্রস্তাব দেয় যে, উসামার পরিবর্তে আফগানিস্তানের কোন বেওয়ারিশ কুকুর আমার হাতে তুলে দাও, আমি সে কুকুরের উপর বিচার করে মনের ক্ষোভ মিটাব। তবু আমরা ইসলামী এমারতের একটি কুকুরকেও আমেরিকার হাতে তুলে দেব না।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী কুখ্যাত সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরিনকে ওরা আশ্রয় দিয়েছে এটাকি অন্যায় নয়? এ ব্যাপারে তো আমরা নাক গলাই না।

এক উসামার পরিবর্তে যদি আফগানের সমস্ত জনগণ শহীদ হতে হয়, তো হব। ক্ষমতা যায় তো যাক, দেশ যায় যাক। তবু আমরা আমাদের একজন মোয়াজ্জাজ মেহমানকে তাদের হাতে তুলে দেব না, না। ইসলামী এমারত হল প্রজাদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করার নাম। যে ইসলামী একজন মানুষের হেফাজত করতে ব্যর্থ হয়, সেটা কেমন ইসলাম? এক উসমানের (রাঃ) রক্তের বদলা নিতে নবীসহ ১৪শত সাহাবী মওতের বাইয়্যাত নিয়েছিলেন।

হুজুর (সাঃ)-এর একজন দূত যায়েদ বিন ওমায়ের (রাঃ)-কে মুতা নামক স্থানে কাফেররা শহীদ করে দিলে, মহানবী (সাঃ) তা সইতে পারেননি। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দুইলক্ষ কাফেরদের মোকাবেলায় তিন হাজার সাহাবীর এক কাফেলা প্রেরণ করনে। সে যুদ্ধে জায়েদ বিন হারিসা (হুজুরের পালক পুত্র) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, জাফর বিন আবি তালিবসহ আরও কত সাহাবা প্রাণ দিয়েছিলেন। সে ইতিহাস ও নবীর শিক্ষা কি আমরা ভুলে গেছি? আমরা তা ভুলি নাই ভুলব না।

আমেরিকা বিশ্ব সন্ত্রাসী। উসামা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করেছেন এ পর্যন্ত কোন একটা প্রমাণ বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করতে পারেনি। আমাদের আমীরুল মুমেনীন বলেছেন, "তোমরা যদি প্রমাণ দিতে পার, তবে আফগানিস্তানে শরয়ী আদালতে তার বিচার করা হবে। বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ করবে শরয়ী বিচার কাকে বলে।" একজন টাউট, বাটপার, মিথ্যুক, দাগাবাজ ও শয়তানের কথায় আমরা উসামাকে কাফেরদের হাতে তুলে দিতে পারি না। সাবধান শরীয়ত বিরোধী উক্তি পরিহার কর।"

দোকানীর ঈমান দীপ্ত প্রত্যয় দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। সত্যিই তারা ঈমানের বলে বলিয়ান। মাথা যায় যাক, তবু পাগড়ীর অবমাননা সইবে না। দেশ যায় যাক, মানুস মরে মরুক, তবু উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে না।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "চাচা! একজনের জন্য নিরপরাধ হাজার হাজার নারী-শিশু মৃত্যুবরণ করবে। এ ভুলটি করতে যাবেন কেন? দোকানী উত্তর দেন, "উসামাকে দিলেই যে দেশ রক্ষা হবে, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। ইসলামী শাসনই হল তার গাত্রদাহ। উসামাকে যদি দিয়েও দেয়া হয়, তবু সে অন্য এক মিথ্যা অজুহাত চাপিয়ে দিয়ে আক্রমণ করবে এবং ইসলামী এমারত ধ্বংস করবে, এতে সন্দেহ করা ঠিক নয়। আজ চাচ্ছে উসামাকে, কাল চাবে মোল্লা উমরকে, তারপর অন্যজনকে, এভাবে তার সাহস বাড়বে। ইসলামী রাষ্ট্র একজন মুমিনের হেফাজত করতে ব্যর্থ হয়ে কাফেরের হাতে তুলে দেবে, আর কাফের নিজ হাতে, তিলে তিলে, পলে পলে শাস্তি দিবে আর বিশ্ববাসী টিভিতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে, তা কিছুতেই হয় না। এতে ইসলামী এমারতের কলঙ্ক। আল্লাহ্ তা সইবেন না। এ মিথ্যা অজুহাতে যদি আমাদের উপর আক্রমণ করেই বসে তবে আমরা হব মজলুম আর ইঙ্গ-মার্কিনীরা হবে জালেম। এতে যদি আমাদের জনগণ প্রাণ হারায়, তবে তারা হবে শহীদ, ঠিকানা হবে জান্নাতে। আর মার্কিনীরা হবে জালেম, ঠিকানা হবে জাহান্নামে। ইতিহাস তাদেরকে আখ্যায়িত করবে জালেম হিসেবে। আমাদেরকে আখ্যায়িত করবে বীরের জাতি হিসাবে, যে এরা কাফেরদের কাছে মাথা নত করেনি। একজন দোকানীর যবান থেকে এমন ঈমানদীপ্ত আলোচনা শুনে আমি বড়ই আশ্চর্য হলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, চাচার কথাগুলো তো সম্পূর্ণ সত্য। আর বাস্তবেও তাই। তাহলে তালেবানদের সিদ্ধান্তই সঠিক। এ সিদ্ধান্তই যথার্থ।

সকাল ৯ টা পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। মেহমানখানার দায়িত্বশীল এসে জানালেন, "নাস্তা আপনার অপেক্ষা করছে। আর অপেক্ষা করছেন আমীরুল মুমেনীন। আমি চমকে গিয়ে সাথে সাথে ফিরে আসলাম মেহমান খানায়। এখানে আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছেন। একদিকে একটি পর্দা ঝুলানো, তার আড়ালে আমার খানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাগলের গোস্ত, রুটি, দই, দুধ, চম্চম্ ও হালুয়া। এত আয়োজন, এত মেহমানদারী আর কোনদিন দেখিনি। ও পার্শ্বের মেহমানদের সাথে দু'জন তালেবান শুধু চায়ে ভিজিয়ে রুটি খাচ্ছেন। গোস্ত না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "সব জনগণ যেদিন গোস্ত রুটি পাবে সেদিন আমরা গোস্ত দিয়ে রুটি খাব।

* নাস্তা খাওয়ার পর আমীরুল মুমেনীন আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর দপ্তরে। আমি সালাম দিলে কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমীরুল মুমেনীন সালামের জবাব দিয়ে কর্নারে বসতে নির্দেশ করল আমি বসে গেলাম। কক্ষে আরো তিনজন খাতা-কলম নিয়ে বসা ছিলেন। আমীরুল মুমেনীন পিতৃ স্নেহে, আমাকে লক্ষ্য করে অতি নরম ভাষায় বললেন–

"মা! তুমি পরদেশী মেহমান! সুদূর বৃটিশ থেকে এসেছ। তোমার আনাগোনা দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ করে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বন্দী জীবনের গ্লানি অতীতে হয়ত কোনদিন তোমাকে স্পর্শ করেনি। অনেক তকলিফ দিয়েছি মা, মার্জনার চোখে দেখো। এখন থেকে তুমি মুক্ত, তোমার দেশে ফিরে যাও। এই নাও তোমার অর্থ-কড়ি ও মাল-ছামানা। তবে ক্যামেরাটি তোমার হাতেই ভেঙ্গে ফেল, ছবি তোলা ভাল নয়।" এই বলে আমার ডলার, ঘড়ি, চমশা, ব্রিফকেস, ব্যাগ, টেপ রেকর্ডার ও লাইট দিলে দিলেন। আমি এসব গ্রহণ করে ক্যামেরাটি সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করি। ক্যামেরাটি ঠাস্ করে এক চিৎকার দিয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

অতঃপর আমি আরজ করলাম, জনাব! আমার ইচ্ছা ছিল বাকী জীবন ইসলামী রাষ্ট্রে কাটিয়ে দেই। এখানে থেকে দ্বীনি এলেম হাসিল করি। কুফুরী মুলুকে ফিরে যাওয়ার

ইচ্ছা আমার নেই। আমি বহুদেশ ভ্রমণ করেছি, এত শান্তির দেশ পৃথিবীতে আর নেই। বুরহান উদ্দীন রব্বানী ক্ষমতায় থাকতেও এসেছিলাম। তখন চারিদিকে বিরাজ করছিল হাহাকার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য কোন স্থান ছিল না। দুই দুইবার করে আমার আসবাব চুরি হয়েছিল।

এবার আসার পর পেলাম তার উল্টোটা। পরীক্ষার জন্য আমার ঘরে ও সোনার আংটি কয়েক বার কয়েক শহরের চৌরাস্তায় ফেলে রেখেছিলাম। ৬ ঘণ্টা পরে এসেও তা ঐ অবস্থায় পেয়েছি। কেউ হাত দিয়েও নড়াচড়া করেনি। এই তো গত ১৫/২০ দিন আগে জালালাবাদের এক হোটেলে বসে চা নাস্তা করছিলাম। সেখানে আমার ভ্যানেটি ব্যাগটি ভুলক্রমে ফেলে এসেছি। কোথায় রেখেছি বা ফেলেছি তা মনে ছিল না। দু'দিন পর মনে হল হয়ত হোটেলে রেখে এসেছি কি না? ব্যাগে ছিল আমার পাসপোর্ট, জরুরি কাগজ পত্র ও বেশ কিছু ডলার। সন্দেহের উপর দু'দিন পর উক্ত হোটেলে গেলাম। গিয়ে দেখি ম্যানেজারের টেবিলের এক পার্শ্বে ব্যাগটি দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছে। হোটেল বয় আমাকে দেখেই চিনে ফেলল এবং বলল, "আপা! আপনি মনে হয় ব্যাগ রেখে গেছেন। দেখেন তো এটা আপনার কি না?" আমি ছেলেটিকে ৫০ ডলার বখশিস দিতে চাইলে বলল, "মালিক জানতে পারলে চাকুরী যাবে।" ইস কত সভ্য এদেশের মানুষ। হুজুর! এদেশে থাকতে আপনার অনুমতি কামনা করি।

* আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বললেন, "মা! আমি তোমার হৃদয়ের আকুতি শুনেছি এবং বুঝেছি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ মুহূর্তে তোমাকে থাকতে দিতে পারছি না। কারণ, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক অচিরেই আমার দেশ আক্রান্ত হবে। ফলাফল কি দাঁড়ায় আল্লাহ্ই তা ভাল জানেন। মোকাবেলা করার জন্য আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমতাবস্থায় তোমাকে থাকার এজাজত দিতে পারছি না। তার পরেও যদি একান্ত থাকতে চাও, তবে তোমার জিম্মায় থাকতে পার। এমনটি আমি শাইখ উসামাকেও বলে দিচ্ছি। তবে চলে যাওয়াটাই বেশি ভাল মনে করি। দোয়া করি, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করুন। আর বাকী জীবন ইসলামের উপর চলার তওফিক দান করুন। দ্বীনের স্বার্থে কাজ করার তওফিক নসিব করুন।" আমি দেখলাম, বিদায় ঘণ্টা বাজছে, আর থাকা যাবে না। বিদায় লগনে কিছু গোপন কথা বলে যাওয়া ঈমানী দায়িত্ব মনে করে আরজ করলাম, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি তো পিতৃসুলভ আচরণে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। আমাকে তো চলেই যেতে হবে। জীবনে আর কোনদিন সাক্ষাত পাব কিনা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে আমার ইচ্ছা ইহুদী-নাসারাদের গোপন কিছু ষড়যন্ত্রের কথা আপনাকে জানিয়ে যাই। এজাজত হলে বলতে পারি। ধৈর্যের সাথে সম্রাট আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আমাকে এজাজত দিলে বলতে লাগলাম—

* হে আমীরুল মুমেনীন! পৃথিবীর সমস্ত তাগুতি শক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলমানদেরকে ব্যবহার করছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। মুসলমান তা টের পাচ্ছে না এক শ্রেণীর অসাধু ফকিরদেরকে মাজারে বসিয়ে দিচ্ছে। এরা লেংটা শাহ্, জট্টা শাহ্, বট্টা শাহ্, লেংটি শাহ্, মাক্কু শাহ্, দাঁতাল শাহ্, কানা শাহ্, বোবা শাহ্ ইত্যাদি নাম ধারণ করে জায়গায় জায়গায় আস্তানা গড়ে তুলেছে। এরা কিন্তু পশ্চিমা এজেন্ট। এরা সু-কৌশলে সরলমনা মুসলমানদের ঈমান লুণ্ঠন করছে। হক্কানী ওলামাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের পিছনে খরচ হয় লক্ষ লক্ষ

ডলার। আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো এ খরচ বহন করছে। এসব ফকিররাও দেশ চালানোর স্বপ্ন দেখছে।

* কাদিয়ানী নামক এক শ্রেণীকে এমনভাবে ফিট করেছে, তারা মুসলিম সমাজটাকে ইঁদুরের মত কেটে শেষ করে দিচ্ছে। তাদেরকে যদি কেউ দুর্বল মনে করে, তবে নেহায়েত ভুল হবে। তারা অতি গোপনে গ্রাম-গঞ্জে তাদের এজেন্টদের পাঠিয়ে দেয়। সেখানে অর্থের লোভ ও চাকুরীর লোভ দেখিয়ে তাদের দলে ভিড়ায় ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাই এ দলের সদস্য বেশি। যে কোন দেশে সরকারি অফিস-আদালতে সম্মানিত চেয়ারগুলোতে এরাই বসে আছে। সচিব পর্যায়ে ওদের সংখ্যা কম নয়। এক সময় ওরা তাতারিদের ভূমিকা পালন করবে। তাদেরকে দেয়া হয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র। সময় মত তা ব্যবহার করবে। কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় অফিস তেল আবিবে। তাদের যাবতীয় অর্থ ইসরাইল একাই বহন করে।

* হে আমীরুল মুমেনীন! ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু দেশে এমন কিছু অধ্যাপক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদেরকে গণতন্ত্রের ছবক পড়িয়ে রাজনীতি মাঠে ছেড়ে দিয়েছে। তারা ইসলামের ও জিহাদের কথা বলে। আসলে দু'টির একটিও এদের মধ্যে নেই। এরা ইরানের খোমেনীর বিপ্লবে বিশ্বাসী। এরা নিউ মডেল ইসলামের বিশ্বাসী। তাদের ধর্মীয় পোশাক হল, গায়ে খাট পাঞ্জাবী ও শার্ট, পরনে টাখনুর নিচ পর্যন্ত অর্থাৎ, মাটি ছোঁয়া প্যান্ট। হাতা কাটা গেঞ্জি, মাথার চুল লম্বা অর্থাৎ, মস্তানী টাইপের। তাদের টুপী থাকে প্যান্টের পকেটে। সময় মত উঠে মাথায়। ওরা দাড়ী দুই তরিকায় রাখে। (১) হয়ত প্রতিদিন সেভ করবে। (২) না হয় ১ থেকে দেড় ইঞ্জি রাখবে। ওদের ধর্মে টাখনুর উপর জামা, প্যান্ট বা লুঙ্গি পড়া মাকরূহ তাহরিমী। আর দেড় ইঞ্চির চেয়ে লম্বা দাড়ী রাখা হারাম। তাদের কাছে খোমেনীর মর্যাদা আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ)-এর চেয়ে বেশি। তাদের ইসলামের সাথে আপনাদের ইসলামের মিল নেই। তাই তারা আপনাদেরকে সাপোর্ট দেন না। তাদের কোন সদস্যও আফগান জিহাদে অংশ নেয় না। এ দলটি গণতন্ত্রের অর্থাৎ, আমেরিকার এজেন্ট। অর্থাৎ, এরা আমেরিকার ইসলামী এজেন্ট। এদের পিছনে আমেরিকা প্রচুর অর্থ খরচ করছে, কিন্তু তারা নিজেরাও জানে না, এ অর্থগুলো অতি গোপনে এবং অতি সরু পথে (ইরান ও সৌদী আরবের মাধ্যমে) তাদের হাতে এসে পৌঁছে। আল্লাহ্ তাআলা এ ফেৎনার জামানায় হক না হক বুঝার তাওফিক সবাইকে দান করুন।

* হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি বিশ্বাস করুন চাই না করুন, আর একটি বাস্তব সত্য হল এই যে, তাবলীগ জামাত বাস্তবে একটি হক জামাত। সমস্ত নবী-রাসূলগণই দাওয়াতের কাজ করেছেন। এটা একটা ফরজ আমল। চাই অধ্যাপনার মাধ্যমে হোক। চাই লিখনীর মাধ্যমে হোক। চাই ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে হোক চাই পীর মুরিদীর লাইনে হোক বা প্রচলিত নিয়মে হোক। কিয়ামত আসার আগ পর্যন্ত দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ্র অসংখ্য শোকরিয়া যে, দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পথ হারা মুসলমান পথের দিশা পেয়েছে। সুন্নতের উপর চলছে। হুজুর! অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হল, দাওয়াতে তাবলীগকেও ইহুদী নাসারারা বরদাস্ত করতে পারছে না। কি করে এ মহান জামাতটিকে বে-রাহ করা যায়, গোমরাহ করা যায়, সেজন্য যুগ যুগ

ধরে সাধনা করছে। তাবলীগের প্রতি ইহুদী-নাসারাদের গাত্রদাহ দুই কারণে (১) দাওয়াতে তাবলীগের মেহনত প্রতি বছর শত শত খ্রিস্টান মুসলমান হচ্ছে। (২) দাওয়াত তাবলীগ বিশ্বব্যাপী যে কাজ করছে, যে ভাবে দ্বীন বুঝছে এমনিভাবে যদি আর ৫০ বছর চলতে থাকে আর ইহুদী, নাসারাদের অপকর্মের প্রতি যদি রুখে দাঁড়ায় বা জিহাদ ঘোষণা দেয়া হয়, তবে তাদের জন্য দুনিয়াতে টিকা হবে মহা কঠিন।

তাই বর্তমানে অতি গোপনে ও সুকৌশলে তাদের প্রশিক্ষণ পাপ্ত কিছু এজেন্টদেরে তাবলীগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আর কেউ প্রফেসর। এরা তাবলীগের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে চিল্লার পর চিল্লা, সালের পর সাল এবং জীবন চিল্লা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সফর করছে। এরা এ পবিত্র জামাতে ঢুকে খুব সূক্ষ্মভাবে ঈমান আকিদার উপর আঘাত হানছে। এরা সবাই তর্কশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত। যুক্তি, ওয়াজ, বয়ান, বক্তৃতায় খুবই পটু। তাদের যুক্তির সামনে নত না হয়ে উপায় নেই।

ঐ সমস্ত নও মুসলিম মুবাল্লেগগণের প্রধান দায়িত্ব হল, একটি ফরযকে প্রাধান্য দিয়ে আসমানে নিয়ে পৌঁছাবে আর অন্য এক ফরযকে পাতালে নিয়ে ঠেকাবে। শুধু তাই নয়, সে ফরযকে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ধারণা দিবে বা ঘৃণা জন্মাবে। যেমন দাওয়াতকে তারা একমাত্র দ্বীনের কাজ মনে করে। আর তাযকিয়া, তালিম ও জিহাদকে কোন কাজই মনে করে না। উলামা-মাশায়েখগণ তাবলীগে সময় না লাগালে খুব হেকারতের নজরে দেখে।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। আর নওমুসলিম মুবাল্লেগগণ বলেন, নবীযুগে জিহাদ ছিল, বর্তমানে সে জিহাদ নেই। জিহাদ করতে হলে ঈমান মজবুত করতে হবে। ঈমান মজবুত করতে হলে বেশি বেশি তাবলীগে সময় লাগাতে হবে। ৩১৩ জন ঈমানদার হয়ে গেলে এরা জিহাদে নামবে। নবী মক্কাতে ১৩ বৎসর দাওয়াতের কাজ করেছেন। মক্কী জিন্দেগীতে জিহাদ ছিল না। বর্তমানে মক্কী জিন্দেগী চলছে। জিহাদের প্রশ্নে এরা এসব খোড়া যুক্তি পেশ করে সরলমনা মুসলমানদেরকে জিহাদের মত একটি ফরয ইবাদত থেকে দূরে রাখছে। উটপাখীকে যদি বলা হয় আকাশে উড়, তখন সে জবাব দেয় "আমি উট, আকাশে উড়তে পারি না। যদি বলা হয় বোঝা বহন কর, তাহলে উত্তর দেয়, আমি পাখী বোঝা বহন করতে পারি না। ঠিক তেমনিভাবে তাবলীগী ভাইদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা বলে, এক চিল্লা লাগিয়ে ঈমান শিখেছি বা ঈমান পেয়েছি। তাদেরকে যদি জিহাদের দাওয়াত দেয়া হয়, তবে বলে "জিহাদ করতে হলে মজবুত ঈমানের দরকার।" যদি বলা হয় তুমি তো চিল্লা দিয়ে ঈমানদার হয়েছ। তখন বলে ঈমান মজবুত হয় নাই। ঈমান ছাড়া কোন এবাদতই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে জিহাদের জন্যই শুধু ঈমানের দরকার আর অন্য এবাদতের জন্য ঈমানের প্রয়োজন হয় না?

নওমুসলিম মুবাল্লেগগণ সু-কৌশলে জিহাদের সমস্ত আয়াত ও জিহাদের সবগুলো হাদীস দাওয়াতে তাবলীগের জন্য বেছে নিয়েছে। ইদানিং অনেকেই তাদের কথার উপর পুরোদমে আমল করে চলছে এবং তাবলীগকে জিহাদ বলে চালিয়ে যাচ্ছে। জিহাদের সমস্ত ফাজায়েলগুলো নিয়ে তাবলীগে ব্যবহার করছে। এতে সরলমনা মুসলমানগণ মনে করেন, তাবলীগ করলে যদি জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে জিহাদ করব কেন? মারামারি, কাটাকাটি করতে যাব কেন? অর্থাৎ জিহাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে।

ঈমানের হেফাজত ও ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্য (দ্বীনকে বিজয়ী করা) বাড়ী-ঘর, সহায় সম্পদ ও দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় হিজরত

বলে। হিজরতের অনেক ফযিলতের কথা কুরআন হাদীসে আছে। মক্কা বিজয়ের পর হিজরত না করে জিহাদ করার জন্য নবী নির্দেশ করেছেন।

পবিত্র হিজরত শব্দটিকেও তাবলীগি ভাইরা চুরি করতে ভয় করেননি। এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় গেলেই তারা হিজরত বলে। অথচ তাদের বিবি-বাচ্চা, ঘর সংসার সবই ঠিক আছে, কেউ তাদেরকে জুলুম অত্যাচার করে, বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে, গ্রাম থেকে বের করেনি। গাশ্‌ত শেষে অর্থাৎ, ৩/৪ ঘণ্টা পর আবার গোশত-পোলাও খেয়ে বাড়ী ফিরে যাবেন। এ অল্প সময়ে ঘর থেকে বের হওয়াটাকেই তারা হিজরত বলছে এবং হিজরতের সোয়াবের বয়ানও করছেন। এগুলো ঐসব সুচতুর নওমুসলিম মুবাল্লিগগণের ফর্মূলা। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ্ পবিত্র কালামের মধ্যে নামাযের জন্য যে কয়টি আয়াতের প্রয়োজন মনে করছেন, সে কয়টিই নাযিল করেছেন। কম-বেশ করেননি। তেমনিভাবে সব এবাদতের জন্যই পৃথক পৃথক আয়াত নাযিল করেছেন। জিহাদের জন্যও তাই। দাওয়াতকে বুঝানোর জন্য জিহাদের আয়াত কর্জ করে আনার পরামর্শ তাদেরকে কে দিয়েছে? যা নবী সাহাবিরা করেননি। কোন ইমামগণও করেননি। কুরআন হাদীসের মধ্যে যে এবাদতের জন্য যে আয়াত বা হাদীস বলা হয়েছে। সে এবাদতের জন্য সেগুলো ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। নবী যে এবাদত যেভাবে করেছেন, সে এবাদত সেভাবে করাই দরকার। মনগড়া এবাদত শয়তানের এবাদত। হ্যাঁ, তাবলীগের মধ্যে যে সব আলেম রয়েছেন তাঁরা খুব সতর্কতার সাথে কথা বলেন। হে আল্লাহ্! ইহুদী-নাসারাদের চক্রান্ত থেকে পবিত্র ও মহৎ তাবলীগকে হেফাজত কর।

* হে আমীরুল মুমেনীন! ইহুদী-নাসারাদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে কওমী মাদ্রাসাগুলোও নিরাপদে নেই। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ২/১ জন মুফতী এবং ২/১ জন পীরকে এরা হাত করে নিচ্ছে। এদের কাজ হল জিহাদের বিরোধিতা করা। এরা যে আসলে আমেরিকা বা ইসরাইলের এজেন্ট, তা তারা নিজেরাই জানে না। এ সমস্ত মুফতী আর পীরদের অনুসারীরা একচেটিয়া জিহাদের বিরোধিতা করবে। মুজাহিদদের যত বদনাম, তা তারা গেয়ে ফিরবে। আয়াতের অপব্যাখ্যা করবে।

এদের কথা বা উক্তি শুনে অপরিপক্ক কিছু আলেমও এদের বরাত দিয়ে জিহাদ বিরোধী উক্তিগুলো প্রকাশ করতে থাকে। কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলে বলে দেন, অমুক দামাত বরকাতুহুম, অমুক মাদ্দাজিল্লুহুল আলী কম বড় আলেম নাকি এরা কি কম বড় বুজুর্গ? তারা কি কুরআন-হাদীস কম বুঝেন? ইনারা একথা বলেছেন।

* হে আমীরুল মুমেনীন! ইহুদী-নাসারারা আর লিঙ্গ পূজারীরা এক জোট হয়ে পবিত্র জিহাদের গায়ে কালিমা এঁকে দেয়ার জন্য, মুজাহিদ ও জিহাদের বদনাম রটানোর জন্য গত কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে একটি কনফারেন্স হয়েছে। উক্ত কনফারেন্সে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারাও মুজাহিদ দল গঠন করবে। অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ, টাকা-পয়সা যা প্রয়োজন সবই তারা দেবে। সে সব মুজাহিদ গ্রুপগুলোর কাজ হল মুসলিম দেশে নাশকতামূলক কাজ চালাবে। যেমন সিনেমা হল উড়িয়ে দেয়া, ভণ্ডপীরের আস্তানায় বোম ফাটিয়ে মানুষ মারা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বাগে ফেলে গুপ্ত হত্যা করা ইত্যাদি। সিনেমা দেখা, মাজারে মদ-গাজার আসর জমানো। এসব কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বটে। তাই বলে নারী-শিশুসহ ধ্বংস করাও ইসলামে হারাম। এসব হত্যাকাণ্ডে যে কেউ মনে করবে এগুলো মোল্লা মৌলভীদের কাজ। মুজাহিদদের কাজ। এরা ছাড়া সিনেমায়, গির্জায়, পান্তাভাতের মেলায়, মাজারে কে বোম ফাটাবে? নিশ্চয় এগুলো এদেরই কাজ।

এসব ঘটনাকে ভিডিও করে, সারা দুনিয়ার মানুষকে দেখাচ্ছে এবং বলছে, দেখ, নারী-শিশুদেরকে মুজাহিদরা কিভাবে হত্যা করছে। দর্শকরা যখন ভিডিও দেখবে যে হায় মায়ের পা উড়ে গেছে। শিশু সন্তানের হাত নেই, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। পার্শ্বে বেশকিছু লাশ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আত্মীয়-স্বজনরা মাটিতে গড়া-গড়ি দিয়ে কাঁদছে। এ দৃশ্য যারাই দেখবে, তারাই মুজাহিদদের গালি দিবে, ধিক্কার দিবে। তাদের অন্তরেই মুজাহিদদের প্রতি গৃণার ভাব জন্মিবে। পশ্চিমা মিডিয়া চোখের পলকে এ সংবাদ সচিত্রে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেবে। এভাবে মুজাহিদ ও জিহাদকে কলুষিত করছে।

* আমীরুল মুমেনীন! দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আপনি একাগ্র চিত্তে আমার কথাগুলো শুনছেন এবং অপর ভাইয়েরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করছেন। তাই আপনাদেরকে আমর সহস্র ধন্যবাদ!

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, তা না বলে পারছি না। তাহল, পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক মাদ্রাসা রয়েছে। তার মধ্যে ১৭টি মাদ্রাসা প্রধান। এর মধ্যে ৯টি রয়েছে ইসরাইলে আর ৮টি আমেরিকায়।

সেসব মাদ্রাসার ছাত্র প্রায় অর্ধেকের কাছাকাটি মিডিলেস্টের। সৌদী আরব, মিশর জর্দান, আরব আমীরাত, দুবাই, কাতার, আবুদাবী, বাহরাইন ও কুয়েতের। আর বাকী অর্ধেক, হল ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের। তবে লিবিয়ারও আছে কিছু। সেসব মাদ্রাসায় ছাত্র সংগ্রহের পদ্ধতি হল কলেজ, ভার্সিটি ও আলীয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা (কওমীর সংখ্যা খুবই কম) থেকে বাছাই করে মেধাবী ছাত্রদেরকে উচ্চতর শিক্ষার অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে আনা হয়। তারপর উক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। শিক্ষানবীস অবস্থায় তাদের বেতন দশ হাজার ডলার থেকে ২৫ হাজার ডলার পর্যন্ত দেয়া হয়।

সেসব মাদ্রাসায় বিভিন্ন ভাষার উপর জ্ঞান দেয়া হয়। এর মধ্যে কুরআন হাদীস তো বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়। এসব ছাত্ররা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের অনুসারী। কিন্তু মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য অন্য কোন ধর্মের প্রাধান্য থাকে না। তাদের জন্য লম্বা জামা গায়ে দেয়া, লম্বা দাড়ী রাখা, টুপী ও পাগড়ী পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। দু'তিন বৎসরের মধ্যে এরা ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে যায়। সে সব মাদ্রাসা থেকে তৈরি হয় বড় বড় লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মুবাল্লেগ, ওয়ায়েজ, ইমাম, খতীব, পীর, ব্যবসায়ী, হিসাব রক্ষক ইত্যাদি। এরা সবাই ইসলামের লেবাস ধরে, মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে। অর্থাৎ, ইসলামকে ঘায়েল করাই তাদের প্রধান কাজ।

এদেরকে শিকারী কুকুরের ন্যায় ইচ্ছামত প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। কেউ এসে কলেজ ভার্সিটিতে অধ্যাপনার এবং লেখালেখির কাজে লেগে যায়। কেউ এসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করে দেয়। ব্যবসার লেবাসে সারা দেশ সফর করে তাদের কাজ হাসিল করে। আবার অনেকে মসজিদ মাদ্রাসায় বা খানকায় কাজ চালু করে। মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ১০টি মসজিদের ইমাম ইহুদী (?) এলাকা ও বর্ণ হিসাবেই তাদেরকে ফিটকরা হয়। যেন কেউ ধরতে না পারে। তাদের জানা থাকে বহু ভাষা। যে ভাষায়ই কথা বলবে, মনে হবে সে সেই ভাষা-ভাষীর লোক।

হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, তৃতীয় বিশ্বে অনেকগুলো এন,জি,ও কাজ করছে। সে বার ব্যানার লাগিয়ে তাদের মিশন এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের

কাজ হল মসজিদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা। গরীবদের মধ্যে কুরবানীর গরু-ছাগল বণ্টন করা আর রমজানে মসজিদে মসজিদে ইফতারীর আয়োজন করা। এগুলো হল তাদের সেবামূলক কাজ।

তাদের নির্মিত মসজিদগুলোতে প্রয়োজনের বাইরে ফ্যান, লাইট, এ.সি, মোজাইক এমন কি বাথরুমগুলো পর্যন্ত মোজাইক করা হয়। এতে নামাজিদের সুবিধা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন হল একটি মসজিদের টাকা দিয়ে তিনটি মসজিদ অনায়াসে নির্মাণ করা যায়। তাহলে একটির পিছনে বেহুদা অর্থ ব্যয় কেন? প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনেক মসজিদ রয়েছে অর্থের অভাবে টিনসেড পর্যন্ত করার সামর্থ তাদের নেই। গমের নাড়া, তাল পাতা, গোল পাতা দিয়ে ছাউনীর কাজ চালায়। রোদ বৃষ্টি মুসল্লীদের চির সঙ্গী। ওদের নজর সেদিকে যায়নি কেন?

মসজিদ নির্মাণ করা খুবই সোয়াবের কাজ তা মানি, কিন্তু মসজিদের মুসল্লী বাড়ানো তো কম গুরুত্ব রাখে না। তা ছাড়া মসজিদ সংরক্ষণ করা তো প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। মসজিদুল আকসা, মুসলমানদের প্রথম কিবলা এখনো ইহুদীদের দখলে। সেখানে আযান, ইকামত ও জামাত হচ্ছে না। তাছাড়া পৃথিবীর বিবিন্ন এলাকায় মসজিদগুলো কাফের-বেঈমানদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কেঁদে কেঁদে আহ্বান করছে।

হে মুসলিম যুবকেরা! হে খালিদ বিন অলিদের সন্তানেরা! কোথায় তারিক, মুসা ও জিয়াদের বাহিনীরা! কোথায় সুলতান মাহমুদের রূহানী ছেলেরা, কাফের কর্তৃক আমরা আক্রান্ত হচ্ছি, আমাদের বক্ষদেশে তারা শাবল চালাচ্ছে, আমাদের ইটগুলো খুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে দিচ্ছে না। মুসল্লীদেরকে পাখীর মত গুলী করে হত্যা করছে। তোমরা যে যেখানেই থাকনা কেন, জলদি ছুটে এস। আমাদেরকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা কর। বাঁচাও বাঁচাও। মসজিদগুলোর বুকফাটা আর্তনাদ ইসলামী এন,জি,ও গুলোর কানে প্রবেশ করছে না। যারা ঐসব মসজিদ রক্ষার জন্য জিহাদ করছে। তাদেরকে এক পয়সা অর্থ দিয়েও সাহায্য করছে না। এর পিছনে হাত রয়েছে ইহুদী-নাসারাদের। ঐ সব এন,জি,ও গুলোর পরিচালকগণ ঐ মাদ্রাসারই স্বনাম ধর্ম ছাত্র। ওদের সেবা, কুরবানীর পশু আর ইফতারী বিতরণ এবং মসজিদ নির্মাণ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? মাদাসা নির্মাণ এবং মাদ্রাসায় অর্থ খরচ করা কি কম সোয়াবের কাজ? তাহলে মাদ্রাসার দিকে তাদের নজর যায় না কেন?

আর একটি কারণ। তা হল, মাদ্রাসা পড়া ছাত্ররাই বর্তমানে জিহাদের ময়দানে ছুটে যাচ্ছে। এরাই দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মাদ্রাসাগুলোকে তারা সেনানিবাস হিসাবে মনে করে। তাই তাদের উপর শক্ত নির্দেশ রয়েছে যে, তাদের অর্থ যেন মাদ্রাসায় ব্যয় না করা হয়। যেখানে জিহাদের সামান্যতম গন্ধ আছে, সেখান থেকেই বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ রয়েছে। যদিও দেখা যায় জুব্বাওয়ালা শাইখরা এসব এন,জি,ও পরিচালনা করতে। আসলে নাটাই ইহুদী-নাসারাদের হাতে। তাদের নির্দেশ ছাড়া এক চুল এদিক ওদিতক করার ক্ষমতা নেই।

* হে আমীরুল মুমেনীন! ইসলামী এন,জি,ও ছাড়াও নামে-বেনামে অসংখ্য এন,জি,ও রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে তাদের পদচারণা বেশি। এরাও দারিদ্র বিমোচন ব্যানার নিয়ে কাজ করছে। ঐ সমস্ত এন,জি,ওদের কেন্দ্রীয় কর্ম-কর্তাগণ ঐ মাদ্রাসারই ছাত্র। যে মাদ্রাসার কথা পূর্বে বলে এসেছি তাদের কর্মসূচীর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটা বলছি।

(১) মহিলাদেরকে ঋণ দান। এ অর্থ দিয়ে ব্যবসা করবে এবং প্রতি সপ্তাহে কি কি হিসাবে ঋণ পরিশোধ করবে। প্রতি সপ্তাহে যে সুদ নেয় তা চক্রবৃদ্ধি সুদের চেয়েও অনেক বেশি। আর পর্দানশীন মহিলাদেরকে টেনে বাইরে আনছে। সেসব মহিলাদেরকে ইসলাম ও আলেম বিদ্বেষী হিসাবে গঠন করছে। স্বামীর সাথে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে। অনেকে আবার স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হচ্ছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নারীদের চরিত্র নষ্ট করা, যাতে এসব নারীর পেট থেকে কোন মুজাহিদ জন্ম না নিতে পারে।

(২) মিল-ফ্যাক্টরী ও কল-কারখানা স্থাপন করে মানুষকে চাকুরী দেয়া। শ্রমিকদের থেকে অল্প পয়সায় শ্রম নিচ্ছে, আর উৎপাদিত জিনিস-পত্র চড়া দামে বিক্রি করে বেশি মুনাফা নিচ্ছে। তাদের কর্মচারীদেরকে দ্বীন-বিদ্বেষী করে গঠন করছে।

(৩) গরীব মুসলমান ও গরীব উপজাতিদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে তাদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করে। তারপর আস্তে আস্তে তাদেরকে মহামূল্য ঈমান থেকে দূরে সরিয় নিয়ে আসে। এভাবে অনেক উপজাতি ও গরীব মুসলমানগণ তাদের প্ররোচনায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে।

(৪) সরকারি খাস জমি লিজ নিয়ে সেখানে গরু-ছাগল ও হাস-মুরগী পালন, বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করা হয়। লিজকৃত সম্পত্তি খাল, বিল, পুকুর বা অন্য জলাশয় হলে তাতে করা হয় মৎস চাষ। তা ছাড়া কচ্ছপ ও ব্যাঙের চাষও করা হয়। এলাকার গরীব মহিলাদেরকে এসব প্রজেক্টে চাকুরী দিয়ে তাদের থেকেও অল্প পয়সায় শ্রম নিচ্ছে। এভাবে ব্যবসা করে মোটা অংকের মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। তাদেরকে সুকৌশলে মুর্তাদ বানানো হয়।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাদেরই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে শিক্ষাদানের কাজ করায়। ঐসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও বেঈমানী শিক্ষা দিয়ে বেঈমান বানাচ্ছে।

(৬) নার্সারী প্রতিষ্ঠা করে ফল ও কাঠের চারা উৎপাদন করে টাকা দিয়ে লালে লাল হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার মত কোন লোক তৈরি হচ্ছে না। অর্থাৎ, এ ধরনের হাজার হাজার প্রকল্প চালু করে বিশ্বব্যাপী চষে বেড়াচ্ছে।

(৭) কিছু এন.জি.ও আছে, তারা হাসপাতাল স্থাপন করে রোগী ভর্তি করে। তারপর ভুয়া ঔষধ দিয়ে রোগীদের বলে বিছমিল্লাহ বলে খাও। এভাবে কিছুদিন ঔষব সেবনের পর রোগ আরো বেশি বেড়ে যায়। তারপর রোগীদের বলা হয় এতদিন তো আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঔষধ খেয়েছ; কিন্তু রোগ ভাল হয়নি বরং বেড়েছে। এখন যিশু খ্রিস্টের নাম নিয়ে খাও দেখবে রোগ সেরে গেছে। তারপর ভাল ভাল ঔষধ দেয়া হয়। রোগীরা আরোগ্য লাভ করে, তখন রোগীদেরকে বলা হয় কেমন? আল্লাহ্র নাম নিয়ে খেয়েছিলে রোগ বেড়েছে, এমন যিশু খৃস্টের নাম নিয়ে খেয়েছ রোগ সেরেছে। এতে বুঝা যায় আল্লাহ্র চেয়ে যিশুখৃস্টের শক্তি বেশি। একমাত্র যিশু খ্রিস্টই পারে রোগ মুক্তি দিতে। এভবে সরল ও অশিক্ষিত মানুষের ঈমান হরণ করছে।

হে আমীরুল মুমেনীন! এসব কার্যকলাপ করে হাজার হাজার মানুষের ঈমান কেড়ে নিচ্ছে। আপনি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান। দেখবেন, আল্লাহ্ আপনাকে মদদ ও নুসরত করবেন। জিহাদ ছাড়া তাগুতি শক্তি দমন করা যাবে না।

আমীরুল মুমেনীন আমার কথা শুনে খুবই খুশী হলেন এবং বললেন, “মা! তুমি যা বলেছ সবই সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলমান চির অপরাজেয়। নির্ভীক, সাহসী,

অকুতোভয়। পৃথিবীতে এমন কোন তাগুতি শক্তি নেই, মুসলমানের উন্নত শীর নোয়াবে। কিন্তু সামরিক বিপর্যয় যা দেখা যায়, তা একমাত্র নামধারী মুসলমান ও মুনীফকদের কারণেই হচ্ছে। তাও ক্ষণিকের তরে। তা ছাড়া আর একটি কারণ হল আল্লাহ্ পাক বালা-মুছিবতের মাধ্য ঈমানী পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এতে যদি ধৈর্য ও ছবর একতিয়ার করা যায়, তাহলে সুফল বয়ে আনে। গুনাহ্ মাফ হয় দরজা বুলন্দ হয়।" আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সাহেবকে বললাম, হুজুর! আপনার নিকট থেকে আরো দু'একটি বিষয় জানতে ইচ্ছে করে, যদি আপনার মর্জি হয়। তিনি বললেন, "বল, কি জানতে চাও?" তখন আমি আরজ করলাম, হুজুর! মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে তো বিশ্বব্যাপী এক তুলকামাল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। তাদের আস্ফালন তো থেমে নেই। আমার ধারণা ছিল যে, প্রাচীন আমলের যে মূর্তিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাস বহন করে আছে, তাতে তো ইসলামের কোন ক্ষতি হচ্ছিল না। তা ছাড়া এ মূর্তিগুলোকে তো লাত-মানতের মত পূজাও করা হয় না। প্রস্তরের মত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলো না ভাংলে তো চলে। এসব প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার করা না হলে তো বিধর্মীরা এত উঠেপড়ে লাগত না। আমার মতে এগুলো না ভাংগারই দরকার ছিল। তাছাড়া ওরা তো প্রস্তাবও দিয়েছিল। এগুলো না ভেঙ্গে তাদেরকে দিয়ে দিলে প্রচুর অর্থও পাওয়া যেত। একাজটা করা কতটুকু ঠিক হয়েছে তা জানতে চাই। নির্যাতিত, নিপিড়ীত ও অসহায় মানুষের মুক্তিকামী। মুসলমানদের অভিভাবক, গাউস, কুতুব, অলী, আবদালদের রাহবর। সুন্নতে নববীর মূর্ত প্রতীক। বর্তমান শতাব্দীর মহামনিষী। ইহুদী-নাসারা ও লিঙ্গ পূজারীদের আতংক। কুফুরী মতবাদ ও গণতন্ত্রের জানাযার ইমাম, সোয়াশ কোটি মুসলমানদের নয়ন মণি। বিশ লক্ষ তালেবানের সর্বাধিনায়ক। বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ সমর বিশারদ। আফগানিস্তানে খালেছ ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা, আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। (যাকে তৃতীয় ওমর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়) অতি স্নেহমাখা সুরে বললেন–

মা! আমেরিকা আমাদেরকে যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই সন্ত্রাসী বলে। সে একটি প্রাণীর মত ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করে দিয়েছে। যেন আমাদের ব্যাপারে বিশ্বাবাসী জাগ্রত হয় এবং ক্ষেপে যায়। দেখ মা, যে দেশটি বিশ্বের সুপার পাওয়ার বা পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছে, যে দেশটি ২৩ বৎসরের মধ্যে গোলাগুলী-বোম্বিং ঝাঁকে ঝাঁকে ফাইটার বিমানের প্রলয়ংকরী আওয়াজ আর আহতদের চিৎকার ছাড়া অন্য কিছুর আওয়াজ শুনতে পায়নি। যে দেশটির পরতে পরতে পুতে রাখা স্থল মাইনে প্রতিনিয়ত বনি আদমের সন্তানদের কেড়ে নিচ্ছে। যে দেশটির কল-কারখানা, সরকারি ভবন, অফিস-আদালত, খাদ্য গুদাম, স্কুল কলেজ, মসজিদ মাদ্রাসা, হাসপাতালসহ দুই তৃতীয়াংশ বোমার আঘাতে মাটির সাথে মিশে দিয়েছে। ৬০ লক্ষ মানুষ এখনো পর্যন্ত রিপুজি অবস্থায় ভিন দেশে বসবাস করছে। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারছে না। যে দেশে পুষ্টির অভাবে ৭শত মায়ের বুক খালি করে সাত শত শিশু পরপারে যাত্রা করেছে। যে দেশের ৪ শত শিশু শীত বস্ত্রের অভাবে শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এমন একটি গরীব অসহায় দেশকে আমেরিকা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে ফতোয়া দিয়েছে। আমেরিকা পা চাটা গোলাম, বিশ্বের কলংক, মানুষ মারার যাঁতাকল জাতিসংঘ। (জঘন্যসংঘ) আমাদের উপর সন্ত্রাসী কায়দায় সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অবরোধ আরোপ করেছে। যে দেশটি এখনো চুল কামানোর একটি

ব্লেড পর্যন্ত বানাতে পারছে না, সে দেশটি নাকি সন্ত্রাসী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। এর পাল্টা কোন জবাব দিতে পারেনি। তারপরও এদেশটিকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী।

যে দেশে ৮৬টি পারমাণবিক কারখানা রয়েছে। যে দেশে নিত্য নতুন তৈরি হচ্ছে নাপাম বোম, হাইড্রোজেন বোম, কার্পেটিং বোম, গুচ্ছ বোম, মাইন, গ্রেনেড, স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র, স্কাট ক্ষেপণাস্ত্র, পেট্রিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, মর্টার, ট্যাংক, কাপটার, গানশীপ কাপ্টার। বিমান ও জাহাজ সহ আর কতশত মারণাস্ত্র। যারা এসব তৈরি করে, যারা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মালিক। যাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে অস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার। যারা এসব অস্ত্র বিক্রি করে মাগী পোলাদের রুটি-নেমকের যোগান দেয়। আর যারা তাদের অস্ত্রগুলো পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করে মুসলিম দেশসমূহের উপর, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয় না। এ ব্যাপারে বিশ্ব বিবেক নীরব। যে সব ডাকাতেরা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী স্যটানিক ভারসেসের লেখক সালমান রুশদী এবং ফ্রী সেক্সের দাবীদার, স্বামী থাকা সত্ত্বেও বহু পুরুষের সাথে সঙ্গমকারিণী, ধর্মদ্রোহী বই পুস্তকের লেখিকা তাসলিমা নাসরিনকে স্থান দিয়ে সোয়াশ কোটি মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিয়েছে, এদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নয়?

মা! যে দিন এ দেশে হাজার হাজার শিশু পুষ্টির অভাবে মৃত্যুদূতের অপেক্ষা করছিল, হাজার হাজার রোগী ঔষদ বিহনে হাসপাতালের বেডে গড়াগড়ি করছিল। যেদিন শীত বস্ত্রের অভাবে শত শত মানুষ রাস্তা-ঘাটে প্রাণ দিচ্ছিল। যেদিন খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ছিড়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সুদূর ইউনেস্কো এবং সুইডেন থেকে আসা এক এন,জি,ও বামিয়ানে বৌদ্ধমূর্তি সংস্কারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে এসেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দেশের জনগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল যে, প্রস্তর নির্মিত মূর্তিরাতো ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে না। শীত বস্ত্রের অভাবে কাঁপছে না, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুদূত খুঁজছে না। তা হলে ইউনেস্কো ও সুইডেনের এন,জি,ও গোষ্ঠীরা কেন মূর্তি মেরামতের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের আহাজারী, আফগানিস্তানের বুভুক্ষ জনতার চিৎকার আর মাসুম শিশুদের আর্তনাদ কি তাদের কানে পৌছেনি? কেন কৃষ্ণশীলার প্রতি এত দরদ। তাই জনগণ এন,জি,ও গোষ্ঠীর নিকট প্রস্তাব দিয়েছিল যে, আমাদের শিশুরা খাদ্যাভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আর তোমরা আসছ আযর সেজে মূর্তি মেরামতের জন্য। মূর্তির পিছনে অর্থ খরচ না করে, তা দিয়ে আমাদের শিশুদের বাঁচাও।"

মূর্তিপ্রীতি আযর গোষ্ঠী এন,জি,ওরা নিষ্ঠুরভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, এ অর্থ তোমাদের শিশুদের জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। এ অর্থ প্রতিমা সংস্কারের জন্য। তাদের কথা শুনে আফগান জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তারা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, তাহলে এদেশে মূর্তি নির্মাণ বা মূর্তি সংস্কার করতে দেয়া হবে না। বরং যে সব মূর্তি অতীতের ইতিহাস বহন করে এখনো স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, সে সব মূর্তিগুলো ধুলার সাথে মিশিয়ে দেব। তারপর কেইছ আকারে সুপ্রিম কোর্টে দেয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ জারি করেন। অতঃপর আমি মূর্তি ভাঙ্গার কথা ঘোষণা করি।

আমার ঘোষণার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এক ঝড় আরম্ভ হয়ে যায়। এমন কোন দেশ ছিল না, যে দেশের উপর দিয়ে এ ঝড়ো হাওয়া উল্কা বেগে বয়ে যায়নি। সৌদী আরব

থেকে ও,আই,সি (লাত্ মানত, উয্যা, হুবালদের পূজারী ও আমেরিকার দোস্ত) নেতৃবৃন্দগণ সহ আর কয়েকটি দেশের মূর্তি প্রতিনিধিরা মূর্তি না ভাঙ্গার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ঐ সমস্ত মূর্তি প্রিয় নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবও পেশ করেন যে, "আফগানিস্তানে যদি মূর্তি নাই রাখেন, তাহলে আমাদেরকে দিয়ে দেন। আমরা চড়া মূল্যে তা খরিদ করে নিয়ে আমাদের দেশে স্থাপন করব।"

দু'টি প্রস্তাব থেকে দ্বিতীয়টির জবাব এই দিয়েছি যে, আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা নই যে, মূর্তির ব্যবসা করব। মূর্তি গড়ার জন্য কোন পয়গাম্বরকে প্রেরণ করা হয়নি। বরং মূর্তি ধ্বংসের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। আর তারা তাই করেছেন।

১ম প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। তাহল এই যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান মিঃ আদভানী, শান্তি ও সম্প্রীতির ধ্বজাধারী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুসলমানদের কলিজার টুকরা দেড় শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ হঠাৎ করে নয়, দু'এক দিনে নয় দীর্ঘ দেড় বৎসর পর্যন্ত দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে জানিয়ে, দেখিয়ে, দেখিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় শহীদ করে দিয়েছে। এমন তরতাজা একটি মসজিদ যেখানে ৫ ওয়াক্ত আযান একামত হত। জামাত কায়েম হত। জুমা পড়া হত। সব সময় তালিম যিকির ও তিলাওয়াত হত। এমন একটি তাজা মসজিদকে শহীদ করে দিয়েছে। সেখানে রামমন্দির নির্মাণে যাবতীয় মালামাল আনা হয়েছে। তখন কি আপনারা মসজিদ না ভাঙ্গার প্রস্তাব নিয়ে ভারত সফর করেছেন? এ ব্যাপারে আদভানীকে মসজিদ ভাঙ্গা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন? আমার প্রশ্ন শুনে সবাই মুখ থুবড়ে বোবা শয়তানের মত চুপটি করে বসে রইলেন। তখন আমি বলেছিলাম, মসজিদ ভেঙ্গে, রামমন্দির তৈরির জন্য যখন কেউ প্রতিবাদ করেনি। আমিও তার প্রতিশোধ নিয়ে সোয়াশ কোটি মুসলমানদের মুখে হাসি ফুটাব।

২য় প্রশ্ন করলাম যে, পৃথিবীর দিকে দিকে ইহুদী-নাসারারা যে মুসলমানদের পশুর মত জবাই করছে, নির্মম ভাবে হত্যা করছে, বাড়ী-ঘর থেকে বঞ্চিত করছে, এদের জন্য কিছু করার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন? মূর্তি কাঁদতে পারে না তারপরও তার জন্য আপনারা এত কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। আর যারা বুক ফেটে চিৎকার করছে তাদের জন্য কিছু করছেন না কেন? মূর্তির পক্ষে ওকালতী করার জন্য ও,আই,সি সহ যত উলামায়ে কেরাম তাশরীফ এনেছিলেন তাদেরকে বললাম, হুজুর! আপনারা মূর্তি না ভাঙ্গার সুপারিশ করেছেন, এর সাথে যয়ীফ একটি হাদীস উপস্থাপন করেন।

কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "হে ওমর! ৬ বৎসরকাল তুমি মুসলিম জাঁহানের খলিফা ছিলে। এত শক্তি সামর্থ্য থাকার পরও কেন মূর্তিগুলো ধ্বংস করনি। তখন আমি আপনাদের দেয়া হাদীসটি আল্লাহ্র সামনে পেশ করে বলব, "ইয়া আল্লাহ্! এ হাদীসের আলোকে মূর্তি ধ্বংস করিনি। তখন আল্লাহ্র সমীপে এ হাদীস পেশ করে বাঁচব।

হযরত ওলামায়ে কেরামগণের বিশাল কাফেলা একেবারে নিরব ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর মুয়াজ্জাজ মেহমানগণের উপস্থিতিতে প্রথম মূর্তির গায়ে ফায়ার করা হয়।"

আমি আবার আমীরুল মুমেনীনকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনি তো মূর্তি ভাঙ্গার কাজটি আরো ১০ বৎসর পরে করতে পারতেন। এর আগে দেশের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো গুটিয়ে নিতে পারতেন।

উত্তরে আমীরুল মুমেনীন বললেন, "দেখ মা! তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার কথা ঠিক তবে আমরা সরকার পরিচালনা করি শুরার মাধ্যমে (সুপ্রীম কাউন্সিল) যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা কুরআন হাদীস, এজমা ও কিয়াসের শরণাপন্ন হই। কুরআন-হাদীস যে ফায়সালা দেয়, আমরা শুধু তা বাস্তবায়ন করি। আর তুমি যে ১০ বৎসর পর মূর্তি ভাঙ্গার কথা বলেছ, তার উত্তরে বলতে চাই, আমাদের ধর্ম মতে মূর্তি ভাঙ্গা সওয়াবের কাজ। নেককাজ যত তাড়াতাড়ি সমাধা করা যায়, তত ভাল। আমি যে ১০ বৎসর বেঁচে থাকব বা ইসলামী এমারত দশ বৎসর টিকে থাকবে এর নিশ্চয়তা কে দেবে। আমি যদি তিন মাস খিলাফত পরিচালনা করে থাকি তবে এই তিন মাস কি ধরনের শাসন করেছি, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ্ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলে, তোমার ক্ষমতা থাকতে মূর্তিগুলো ভাঙ্গনি কেন? তখন আমার জবাব দেয়ার কোন পথ থাকবে না। তাই সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী মূর্তি ভাঙ্গার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি।

রিডলি ঃ বাহ্! বহুত সুন্দর জবাব ও তার সমাধান আপনার পবিত্র যবান থেকে শুনেছি। এতে আমার হাজার প্রশ্নের সমাধানও পেয়েছি। আচ্ছা হুজুর! আর একটি বিষয় জানতে চাই যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জোয়ার বইছে। পৃথিবীর বহু দেশ গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে। অনেক মুসলিম দেশে গণতন্ত্র পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অনেক দেশের পীর-মাশায়েখগণ এবং শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ গণতন্ত্র আন্দোলন করছেন। তাহলে গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা চালু করলে তো আমেরিকার মদদ পেতেন। তাতে শরীয়তের কি ক্ষতি হত?

আমীরুল মুমেনীন ঃ মা! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে রাত পোহায়ে ভোর হয়ে যাবে। তবু উত্তর দেয়া বাকিই থেকে যাবে। তবে অতি সংক্ষেপে দু'একটি পয়েন্ট তোমাকে বলব, যা ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে আপোষহীন সংঘাত।

(১) গণতন্ত্র শব্দের অর্থ হল মানুষের আইন বা মানব রচিত শাসন। এ শব্দটিই কুফুরি। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা সসীম। মানুষের চিন্তা-চেতনায় রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা বা সংঘাত। যেমন– প্রাচীন আমলের বিজ্ঞানীদের থিওরীর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীদের থিওরির কোন মিল নেই-বিপরীত। মানুষের চেহারা পরিবর্তে চিন্তা-চেতনা ও রুচির পরিবর্তন হয়ে থাকে। একজনের কাছে একটা জিনিস খুবই ভাল লাগে, খুবই পছন্দ সই। আবার এ জিনিসটাই অন্যের কাছে হয় বিষতুল্য। বহুজাতীয় খাবার রয়েছে। একেক জনের কাছে একেকটা ভাল। অনেক কালার আর অনেক রংএর কাপড় রয়েছে। একেকজন একেকটা পছন্দ করে। দুনিয়া সৃষ্টি নগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এ সংঘাত চলতে থাকবে। কাজেই সীমিত চিন্তা-চেতনা নিয়ে যা করবে তা সীমিত থাকবে। মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে সাঁতার কাটে। তাই মানুষের তৈরি আইন কোনদিন নিখুঁত হতে পারে না। তাই আমরা গণতন্ত্র পরিহার করেছি।

(২) গণতন্ত্র সমাজের ঐক্য বিনষ্ট করে। সৃষ্টি করে দলাদলি ও মতানৈক্য। এক দলের মত অন্যদলের সাথে মিল থাকে না। এক দল বিজয়ী হলে তাদের মতাদর্শ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে সৃষ্টি হয় সংঘাতের। এতে মারামারি ও খুন খারাবী পর্যন্ত হয়ে যায়। একে অপরকে কিভাবে ঘায়েল করতে পারে। আর বিজয়ী দল কিভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে এ নিয়ে চলথে থাকে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কেন্দ্র থেকে নিয়ে মাঠ

পর্যায়ে ছড়িয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে বিজয়ী দল সংসদে গিয়ে মনমত আইন পাশ করে। এ আইন বিরোধী দলের মনোপুতঃ হয় না বলে গালা-গালি, লাঠা-লাঠি ও জুতা ছোড়াছুড়ি করে সংসদ থেকে বেরিয়ে আসে রাজ পথে। দিতে থাকে একের পর এক কর্মসূচি। হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল, অনশন ধর্মঘট, অবরোধ, ওয়াকআউট, অফিস বর্জন, কর্মবিরতী ছাড়াও হাজার ফর্মূলার আন্দোলন। এতে গাড়ী ভাংচুর, দোকানপাট লুট, অগ্নি সংযোগ, ও মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে যায়।

(৩) গণতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন হয়। প্রতিটি প্রার্থী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নির্বাচনে খরচ করে। পাশ হওয়ার পর এ টাকা উঠানোর জন্য করে চুরি, খায় ঘুষ। রাখতে পারে না জনগণের খবর। এ কোটি কোটি বিলিয়ন টাকা অপ্রচয় না করে যদি ইসলামী পদ্ধতিতে সরকার গঠন হত, তা হলে কোটি কোটি বিলিয়ন টাকার অপচয় থেকে দেশ রক্ষা পেত। জনগণও শান্তি পেত।

রিডলি ঃ টাকা ছাড়া নির্বাচন, এ আবার কি করে হয়। মিছিল, মিটিং, মাইকিং, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ট্রাক, বাস, হোন্ডা ও রিক্সা নিয়ে মিছিল। অফিসিয়াল খরচ কর্মীও ক্যাডার খরচ, ভোট ক্রয়, অস্ত্র ক্রয়, অস্ত্র ও গুণ্ডা ভাড়া, এসব খরচ ছাড়া কি নির্বাচন করা সম্ভব?

আমীরুল মুমেনীন ঃ শোন মা রিডলি! ইসলামী শাসন ব্যবস্থা খুবই সুন্দর! খুবই সুন্দর! যদি কেউ তা মানে, তবে খুবই আহসান ও সহজ। আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ সারাদেশ থেকে বেছে বেছে আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৬ সদস্য নিয়ে মজলিশে শুরা নামকরণে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির পরামর্শক্রমে নিযুক্ত করা হয় আমীরুল মুমেনীন এবং উজিরে আযম (প্রধানমন্ত্রী) উজিরে মালিয়াত (অর্থমন্ত্রী) অর্থাৎ সরকার পরিচালনা করতে যে কয়জন লোকের প্রয়োজন সে কয়জনকে মজলিশে শুরায়ই নিযুক্ত করে দেন। এভাবে সরকার গঠন করা হয়। এখানে একটি কথা জেনে রেখো যে, একজন কৃষক সে কৃষিকাজ জানে। এ ব্যাপারে সে পরামর্শ দিতে পারে। অন্যকাজে তার থেকে পরামর্শ চাওয়া বা দেয়া ঠিক হবে না। তেমনিভাবে একজন ডাক্তার সে শরীর সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন। একজন মিস্তুরী সে তার বিদ্যা সম্পর্কে অবগত আছে, অন্য ব্যাপারে সে নির্ভুল পরামর্শ দিতে পারবে না।

দেখ গণতন্ত্র পদ্ধতিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কামার, কুমার, মেথর, কুলি, রিক্সাওয়ালা, দিনমুজুর, ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ সকলের ভোটের মূল্য এক। একজন মেথর লেখাপড়া জানে না, সে কি করে একজন সরকারকে নির্বাচন করতে পারে? কে যোগ্য কে অযোগ্য কে উপযুক্ত কে অনপোযুক্ত তা বিচার করার শক্তি রাখে না। কাজেই শরীয়তে ফাসেক ফুজ্জার, চোর, ডাকাত, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, মদখোর, গাজাখোর এ সমস্ত মানুষের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। এদের ভোটেরও কোন মূল্য নেই। ভালমন্দ জিনিস এরা নির্বাচন করতে পারবে না। তা ছাড়া এসব মানুষ, এক প্যাকেট বিড়ি, এক বোতল মদ, দশটি টাকার বিবিময়ে মূল্যবান ভোটকে কুপাত্রে দিয়ে দেয়। এ কারণে এ ধরনের নির্বাচন শরীয়তে জায়েয রাখে না। ইসলাম নারী নেতৃত্বের বিশ্বাসী নয়। তাই আমরা গণতন্ত্র পছন্দ করি না।

(৪) গণতন্ত্র পদ্ধতিতে ৫ বৎসর পর পর নির্বাচন করতে হয়। ইসলামে এমন বিধান নেই। ইসলামী সরকার যতদিন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করবে,

ততদিনই সে সরকার থাকবে, এর বিরোধিতা কেউ করতে পারবে না। এভাবে যুগ যুগ চলে যেতে পারে নির্বাচন লাগবে না। হ্যাঁ, তবে সরকার যদি না থাকে মারা যায় বা কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনা করে,তবে পুনরায় শুরার মাধ্যমে সরকার নির্বাচন করা হবে।

এখানে একটি কথা জেনে রাখ, তা হল-ইসলামী সরকার নিজে কোন আইন তৈরি করে না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যা আছে, তার উপরই ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এতে কারো কোন আপত্তির অধিকার নেই। কারণ, এ আইন সরকারের তৈরি নয় যে, এর মধ্যে ভুল আছে। এটা রবের পক্ষ থেকে। সরকার শুধু তা বাস্তবায়ন করে। কাজেই ৫ বৎসর পর ইলেকশনের কোন প্রশ্নই উঠে না। মুসলমান আল্লাহ্‌র অনুগতশীল। কাজেই ইসলামী আইনের প্রতি সবাই আস্থাশীল। তাই এক বাক্যে সবাই তা মেনে নেয়। কুরআন-হাদীস এর মাধ্যমে যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করে আর কেউ যদি বিরোধিতা করে, তবে তাকে বলা হয় বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহী। আর এদের বিচার হল মৃত্যুদণ্ড। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের ব্যাপারে কোন চুঁ-চেরা হয় না। আইনের প্রতি সকল নাগরিকই হয় শ্রদ্ধাশীল এবং আইন বাস্তবায়ন করাও হয় এবাদত।

রিডলি ঃ হুজুর! আপনার কথাগুলো বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র যে একটি মূর্খ সমাজের বরবর শাসন ব্যবস্থা এতে আমার মধ্যে আর কোন দ্বিমত নেই। তবে অধিকাংশের রায়ে তা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। এ সংখ্যা গরিষ্ঠতার কি কোন মূল্য ইসলামে নেই?

আমীরুল মুমেনীন ঃ শোন মা! তোমার দাবী আসলে ঠিক নয়। গণতন্ত্র পদ্ধতিতে যে সরকার গঠিত হয়, তা আসলে সংখ্যা লঘিষ্ঠের সরকার। সংখ্যা গরিষ্ঠের নয়। যেমন মনে কর একটি দেশের ভোটারের সংখ্যা ৫০ হাজার। পার্টির সংখ্যা হল পাঁচটি। উক্ত পাঁচটি পার্টি থেকে সবাই একজন করে প্রার্থী দিল। এতে দেখা গেল প্রথম জন পেলেন ১০০৯০ ভোট। দ্বিতীয় জন পেলেন ৯৯৮৫ ভোট। তৃতীয় জন পেলেন ৯৯৮০ ভোট। চতুর্থ জন পেলেন ৯৯৭৫ ভোট। আর ৫ম জন পেলেন ৯৯৭০ ভোট। উক্ত পাঁচ লক্ষ ভোটের মধ্যে প্রথম জন বা দল ১০০৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। আর পরাজিত দলগুলো মিলিয়ে পেয়েছে ৩৯৯৩০ ভোট।

তুমি আরো একটি কথা বলেছিলে যে, সংখ্যাধিক্যের মতামতের মূল্যায়নের ব্যাপারে। শোন, ইসলামের সংখ্যাধিক্যের মূল্যায়ন অবশ্যই আছে, তবে উপযুক্ত হতে হবে। একজন পরহেজগার মুত্তাকীন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির মূল্য হাজার হাজার মূর্খ, জাহেল, অশিক্ষিত, চোর, ডাকার ও বদমায়েশ থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি। মনে কর তুমি একটি স্বর্ণের টুকরা নর্দমা থেকে উদ্ধার করে হাজার হাজার মানুষকে দেখিয়েছ। সবাই এটাকে দেখে মন্তব্য করেছে যে, এটা পিতল বা দস্তা। স্বর্ণ কি যথায় তথায় পড়ে থাকে? নিশ্চয়ই এটা পিতল বা দস্তা।

অতঃপর তুমি এটাকে নিয়ে কোন প্রামাণিককে দেখালে। প্রামাণিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছে এটা খাঁটি সোনা, ওজন অত এবং মূল্য অত হাজার টাকা। এখন বল, হাজার হাজার লোকের কথা ঠিক? না একজন প্রামাণিকের কথা ঠিক? এখানে একজনের কথাই ধর্তব্য। বাকী হাজার হাজার লোকের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম জ্ঞানী-গুণী, সৎ ও শিক্ষিত মানুষের মূল্যায়ন করে অর্থাৎ, ভোটের দাম দেয়। অন্যদের ভোটের কোন মূল্য নেই।

রিডলি ঃ আপনার যুক্তি তো অকাট্য। এর মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার মানুষের কল্যাণ। মিথ্যায় রয়েছে অকল্যাণ। গণতন্ত্র যে মিথ্যা, অলিক, কাল্পনিক ও বানোয়াটি বিধান এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আহ্ঃ সারা বিশ্বে যদি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা হত, তবে কতই না সুন্দর হত। আচ্ছা হুজুর! আরো একটি প্রশ্ন জাগে। তাহল, হাক্কানী ওলামায়ে কেরামগণও তো বর্তমানে গণতন্ত্র নিয়ে ইলেকশন করেন। তারা বলেন, "গণতন্ত্র কুফুরী তা ঠিক। আমরা বিজয়ী হয়ে সংসদে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব। আসলে কি এভাবে করা সম্ভব হবে না? আমার তো মনে হয় পারবেন।

আমীরুল মুমেনীন! শোন মা! যতদিন সূর্য কিরণ দিবে, পাখীরা গান গাইবে, নদীরা কল কল তানে বয়ে যাবে, ততদিন অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। তার কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

সমস্যা (১) ঃ নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, দেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভাল মানুষের (ভোটারের) সংখ্যা খুবই কম। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, কাদিয়ানী, বাহাই ও শিয়ারা খোদাভীরু সৎ ও ন্যায়পরায়ণ প্রার্থীকে ভোট দিবে না। কারণ, তারা ইসলাম চায় না। আর চোরেরা দিবে না, হাত কাটবে। ডাকাতরা দেবে না, মেরে ফেলবে। মিথ্যুক, গিবতকারী ও তুহমতদানকারীরা দেবে না বেত্রাঘাত খাবে। ব্যভিচারীরা দেবে না ছঙ্গেছার করবে। মদখোর ও গাঁজাখোরেরা দেবে না একশত বেত্রাঘাতের ভয়ে। সুদখোর ও ঘুস খোরেরা দেবে না, পিটুনীর ভয়ে। মাজারীরা দিবে না মাজার পূজা, জট রাখা, সালুলাল কাপড় পরা, শিকল, তালা ও চিমটা নিয়ে ঘুরতে পারবে না তাই রুজী-রোজগার কমে যাওয়া ও মাইর খাওয়ার ভয়ে। সিংহভাগ মহিলারা দিবে না পর্দা করা, চাকুরী করা ও পার্কে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। অন্যান্য পার্টির লোকেরা দেবে না নিজ পার্টিকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে কাজেই একক সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন অবশ্যই পাবে না।

* সমস্যা (২) ঃ ভোট চুরি, ভোট ক্রয়, ব্যালট পেপারে জোরপূর্বক সিল মারা। ভোট ডাকাতী বাক্স ছিনতাই ইত্যাদি কর্মকাণ্ড হুজুরগণ করতে পারবেন না বিধায় পাশের হার থাকবে খুবই নগণ্য।

* সমস্যা (৩) ঃ এম, পি, নিযুক্ত হওয়ার পর যে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়, সে শপথ বাক্যে কুফুরী সংবিধানকে সমুন্নত রখার, সংবিধান বিরোধী কোন কাজ না করার জন্য শপথ নেয়া হয়। অথচ গণতন্ত্র দেশের সংবিধানই কুফুরী। পবিত্র কুরআনের শত শত আয়াতের বিরুদ্ধে সে সংবিধান। কুফুরী সংবিধান সংরক্ষণ করার ওয়াদা করলে ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা একশ ভাগ। মুখে শপথ নেয় একটি আর ভিতরে থাকে অন্যটা। তাহলে এটা হবে মুনাফেকী ও ধোঁকাবাজি।

* সমস্যা (৪) ঃ গণতন্ত্র পদ্ধতিতে ইলেকশন করলে মহিলা প্রার্থী দিতে হবে, মহিলা নেতৃত্ব মানতে হবে, মহিলাদের ভোট দিতে হবে, চাইতে হবে। ইসলাম মহিলা নেতৃত্ব সমর্থন করে না। কাজেই ওলামাগণ হয়ত এ হারাম পন্থা মেনে নিতে হবে, না হয় পরিহার করতে হবে। যদি হারাম পন্থা মেনে নেন, তাহলে সর্ব মহল থেকে ধিক্কার, সমালোচনা ও থুথু আসবে। আর যদি মেনে না নেন তাহলে গণতন্ত্রের কিছু মানল আর কিছু ত্যাগ করল। এ উভয় সংকট নিরসনের কোন বিকল্প রাস্তা নেই।

সমস্যা (৫) ঃ ইসলামী কোন দল বা পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়া কখনো সম্ভব নয়। তার পরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, বিজয়ী হয়েছে। এ বিজয়ী ইসলামী দলটি সংসদ পর্যন্ত পৌঁছার পথে যারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে তারা হল-

(১) সাময়িক জান্তা ঃ গণতন্ত্র দেশের, আনসার, পুলিশ, সীমান্ত রক্ষী, মিলিটারী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এরা দ্বীনদার নয় বিধায় তারা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দেবে। ওরা মনে করবে, আমরা নামাজ পড়ি না, রোযা রাখি না, দাড়ী রাখি না, আকাম-কুকাম সবই করি। মোল্লাদেরকে না ঠেকালে আমাদেরও মোল্লা হয়ে যেতে হবে। তাই তারা বন্ধুকের নল বাগিলে ইসলামের বিজয়কে ঠেকাতে চেষ্টা করবে।

(২) সরকারি আমলা ঃ টি.এন.ও ই.এন.ও থেকে আরম্ভ করে সচিব পর্যন্ত যতগুলো সরকারি আমলা আছে, সবাই এক যোগে খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কারণ, ওদেরও একই সমস্যা, সুদ, ঘুষ খেতে পারবে না, দাড়ি রাখতে হবে, ৫ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়তে হবে। সময় ফাঁকি দেয়া, কাজ বিলম্বে করা যাবে না। তা ছাড়া যে চেয়ারগুলো ছিল তাদের দখলে, সে চেয়ারগুলো চলে যাবে মোল্লাদের দখলে, কারণ, ইসলামী আইন তো ওরা জানে না। ওরা তো গণতন্ত্র পদ্ধতিতে খুব পাকা। তাই বাধ্য হয়ে সেসব আমলাদের চেয়ারগুলো ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই সেসব আমলারা আইন প্রয়োগ করে, মিথ্যা মামলা ও কারচুপির দোষ দেখিয়ে বা এরচেয়ে আরো বড় ধরনের দোষ চাপিয়ে মোল্লাদেরকে হটানোর চেষ্টা করবে।

(৩) বিরোধী দল ও তার উপদল ঃ নির্বাচনে যারা বেইজ্জতি হয়ে ফেল করেছে বা অল্প আসন পেয়েছে উভয়েই বিজিত দলের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আবার ইসলামী দল। কাজেই এরাও সেদিন ইসলামী পার্টির বিজয় ঠেকানোর জন্য আস্ফালন আরম্ভ করে দিবে।

(৪) বিদেশী এজেন্ট ও তার দোসর ঃ প্রতিটি দেশেই রয়েছে অন্য সব দেশের দূতাবাস। তা ছাড়া রয়েছে অন্যসব দেশের সমর্থক। তারা সব সময় সে সব দেশের হাজারো দোষ-ত্রুটিকে কাঁথায় ঢেকে সে দেশের গুণ গায়। এরাও চাইবে না ইসলামী দলের বিজয়। সেদিন তারা লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন ডলার বিরোধী দলকে দেবে মোল্লাদের ঠেকানোর জন্য।

(৫) বুর্জুয়া ও উর্ধ্বপতি বুর্জুয়া ঃ সমাজে শিল্পপতি, কোটিপতি ও লক্ষপতি। এদের মধ্যে অনেকেই গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ১০/২০ তলা ভবনের মালিক হয়েছে। দেশে-বিদেশে বাড়ী বানিয়েছে। টয়লেটে পর্যন্ত এসি লাগিয়েছে। গাড়ী ছাড়া চলতে পারে না। দেশী-বিদেশী ব্যাংকে যারা টাকার পাহাড় জমিয়েছে। এদের মধ্যেই খুঁজলে পাওয়া যায় হিরোইন ব্যবসায়ী। মদখোর, সুদখোর, মুনাফাখোর ও কালোবাজারী। এসব বুর্জুয়ারাও মোল্লাদের বিজয় ঠেকানোর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করবে। কারণ, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হলে মালের হিসাব দিতে হবে। এত টাকার মালিক কোত্থেকে হয়েছে তার জবাব দিতে হবে। প্রয়োজনের বেশি মাল হলে বাইতুল মালে ক্রোক করে নিয়ে যাবে। পাই পয়সারও যাকাত আদায় করে নিয়ে নেবে। তাই তারা মোল্লাদের বিরুদ্ধে জোড়ালোভাবে অবস্থান নেবে।

(৬) এন.জি.ও ফোরাম ঃ

এন.জি.ওরা পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় যেভাবে সুদের লেন-দেন করে মানুষের অন্তর নষ্ট করেছে সরলমনা জনগণের ঈমান লুণ্ঠ করছে। মা বোনদের বেপর্দা করছে ও

ইজ্জত হরণ করছে। এ সুযোগ আর তখন পাবে না। মোল্লারা সংসদে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের তল্পা-তল্পি ও হাণ্ডি-পাতিল গোটায়ে সে প্রাণীর মত লেজ নুয়ায়ে দেশ ছাড়তে হবে। তাই এরাও করবে ইসলামী শাসনের বিরোধিতা।

(৭) মহিলা সমাজ ঃ

অল্প সংখ্যক মহিলা ছাড়া বাকী মহিলারাও এজন্য বিরোধিতা করবে যে, পর্দা করতে হবে। পর পুরুষের সাথে বসে অফিস করতে পারবে না। এরা সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। ভার্সিটির গেইট পেরিয়ে বড় বড় হোটেলে গিয়ে রাত্র যাপন করতে পারবে না। তাই ওরা সেদিন পিছিয়ে থাকবে না। এসব বাঁধা অতিক্রম করে সংসদে যাওয়া খুবই কঠিন। তারপরও যদি যায় এবং মন্ত্রি পরিষদ গঠন করে, তবু ইসলামী কানুন জারি করতে পারবে না। মনে কর, ইসলামী সরকার পর্দা সম্পর্কে বিল এনে এমপি, মন্ত্রিদের সমর্থন চাইল। সংসদে সব এমপি, ইসলামী দলের নয়, তা ছাড়া সামনেই বসা রয়েছে ৩০ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা এম,পি। তখন এরা সবাই পর্দার আইন পাশ হতে দিবে না। কিন্তু কেউ যদি ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তবে ইসলামী সরকারের উপর ফরজ হল তাকে হত্যা করা। এ হিসাবে সেদিন ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হবে সংসদে বসে যারা পর্দার আইন করতে বাঁধা দিয়েছে, তাদের ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা। এটা কি ইসলামী সরকারের পক্ষে সম্ভব? যারা বিরোধিতা করেছে, তারা জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে সংসদে আসছে। এভাবে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে কোন একটি ইসলামী আইন পাশ করতে পারবে না। তখন নিজেরাই আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে ব্যর্থ হবে। এমনকি ঈমান হারা হবে। কাজেই যারা গণতন্ত্র পদ্ধতিতে সংসদে গিয়ে ইসলামী কায়েমের স্বপ্ন দেখেন, এগুলো ধোঁকা, মরিচীকা। কিছুদিন সরকারি সম্পদ লুটপাট করে খেতে পারবে। এছাড়া অন্য কিছু নয়। এসব আলেমদের রাজনীতি হল খাওয়ার রাজনীতি। এদের দ্বারাই ইসলামের ১২টা বাজবে।

আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আরো বললেন, আমাদের গণতন্ত্রকে অপছন্দ করার আরো অনেক কারণ রয়েছে, যা বলতে গেলে এক দু'দিনের শেষ হবে না। তবে আরো দু'একটি কারণ বলছি, শোন—

(১) মিথ্যা আশ্বাস। ভোট ভিক্ষুকেরা (প্রার্থী) নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে বলেন, "আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের জন্য এই করব, সেই করব, উল্টিয়ে দেব আর কত কিছু করে দেবে। নির্বাচিত হলে আড়াই বৎসর যায় নির্বাচনী খরচ উঠাতে, আর আড়াই বৎসর যায় আগামী নির্বাচনের খরচ সংগ্রহে। এর মধ্যে সামান্য কিছু কাজ এলাকাতে করে বটে, তাও সরকারী অর্থ চুরি করার জন্যে। জনগণের প্রয়োজনের অর্থকড়ি খরচ করেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে না।

(২) নিজের বড়াই প্রকাশ করা, গীবত বলা ও অন্যের উপর অপবাদ আরোপ করা। অর্থাৎ ভোট প্রার্থীরা নিজেকে বড় মনে করে। নিজেই নিজের সাফাই গাইতে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা খুবই দূষণীয়। গীবত হল দোষী ব্যক্তির দোষ অগোচরে বয়ান করা। এটা গুনাহে কবীরা (বড় গুনাহ)। ভোট প্রার্থীরা অন্য পার্টির বদনাম গেয়ে বেড়ায়। তোহমত হল, নিরপরাধ ব্যক্তির উপর দোষের অভিযোগ উত্থাপন করা। অর্থাৎ, যার মধ্যে যে দোষ নেই, সে দোষ তার মধ্যে আছে, তা বলে বেড়ানো। ভোট প্রার্থীরা অপর পার্টির বিরুদ্ধে অপবাদ তুলে সারা দেশে গেয়ে বেড়ায়। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হল গণতন্ত্রের শিক্ষা। এগুলো যে শুধু প্রার্থীগণ করে, তা নয় পৃথক পৃথকভাবে এক দল অন্যদলের বিরুদ্ধে,

এক পার্টি অন্য পার্টির বিরুদ্ধে বকাবকি, গালা-গালি হাতা-হাতি, মারা-মারি করে। এগুলো ইসলামী বিধানুযায়ী বৈধ নয়। তাই আমরা গণতন্ত্র পছন্দ করি না।

(৩) ইসলামের প্রবর্তক হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ)। আর গণতন্ত্রের প্রবর্তক হল আব্রাহাম লিংকন। যিনি পিতার পরিচয় জানার জন্য তার মাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মা! আমার পিতা কে? মা উত্তরে বলেছিলেন, ৪০ জনের মধ্য হতে কোন একজন। এ কারণে আমরা আল্লাহ্‌র পুতঃপবিত্র নবীর বিধান ছেড়ে একজন হারামজাদার বিধান মেনে নিতে পারি না। নবীর বিধান ছেড়ে যে আলেমগণ হারামজাদা আব্রাহাম লিংকনের তরীকা বা বিধানের পিছনে জীবন ব্যয় করছেন, কাল কিয়ামত দিবসে যদি নবী বলেন, "তোমরা তেমাদের নবী আব্রাহাম লিংকনের কাছে যাও।" তখন সেসব ওলামাগণ কি উত্তর দেবেন?

মহানবী (সাঃ) যখন আরববাসীদের কলেমার দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন কুফ্‌ফারে আরব তা বরদাস্ত করতে পারেনি। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশন বন্ধ রাখার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেছে। অনেক বুঝিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। তবু নবী দমে যাননি, ভয় পাননি। দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্ষণিকের তরে দাওয়াতী কাজ বন্ধ রাখেননি। পরিশেষে কুফ্‌ফারে মাক্কা কন্‌ফারেন্স ডেকে তথায় মোহাম্মদ আরাবীকে (সাঃ) হাজির করল। সেদিন কুফ্‌ফারে মক্কার বড় বড় পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী নেতারা উপস্থিত ছিল। সকলের পরামর্শক্রমে আবু জেহেলরা প্রস্তাব দিচ্ছিল, "হে মোহাম্মদ! তুমি পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে, বাপদাদার ধর্মের বিরুদ্ধে যে মিশন পরিচালনা করছ, তা কুরাইশদের জন্য খুবই লজ্জাজনক। হে মোহাম্মদ! তুমি যদি চাও আরবের সবচেয়ে ধনি ব্যক্তি হতে, তবে আমরা আমাদের সম্পদের কিছু অংশ তোমাকে দিয়ে দেব। দেখবে তুমিই হবে আরবের সবচেয়ে বড় ধনি। তুমি যদি চাও আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে, তাহলে আরবের সুন্দরী যুবতীদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দেব। যাকে তোমার পছন্দ হয়, যাকে তোমার ভাল লাগে, যে কয়জনকে চাও সে কয়জন নারীকে তুমি নিয়ে নাও। আর যদি তোমার আরবের নেতা হওয়ার খায়েশ থাকে, তাহলে বল, আজ থেকে তোমাকে আমাদের নেতা হিসাবে মেনে নেব। নেতা হিসাবে বরণ করে নেব। তবু তুমি একত্ববাদের দাওয়াত পরিহার কর।" মোহাম্মদে আরাবী (সাঃ) কাফেরদের দেয়া তিনটি প্রস্তাবকেই নাক বরাবর ছুঁড়ে মেরেছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বা রাসূলগণের অন্তরে নারী ও অর্থ লিপ্সা থাকে না। এগুলো থেকে তাঁরা পবিত্র। তাই তাদের প্রস্তাব অকাতরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নেতৃত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এ জন্যেই যে, কাফের, মুশরেক ও ফাসেক, ফুজ্জারদের সমর্থন বা ভোট নিয়ে নির্বাচিত হলে, তাদের কথা মতই চলতে হবে। তাদের মনমত না চললে সবাই একযোগে নবীকে চাপ সৃষ্টি করবে। এমন কি নেতৃত্বের মাল্য ছিনিয়ে নেবে। যেমন চোরের ভোটে যদি কেউ মেম্বার নির্বাচিত হন, তবে তিনি চোরের বিরুদ্ধে কোনদিন যাবেন না বরং চোরের পক্ষ হয়ে কাজ করবেন। কিছু বলতে গেলেই মেম্বারী হারাবে। তাই মহানবী (সাঃ) সেদিন কাফেরদের প্রস্তাব মেনে নেননি। তাদের প্রস্তাব মেনে নিলে তাদের কথামত চলতে হবে। না চললে নেতৃত্বের মুকুট ছিনিয়ে নেবে। তা ছাড়া নবী (সাঃ) আরো একটি দিক চিন্তা করে ছিলেন যে, নবীর হাতে সেই সামরিক শক্তি। কাফেরদের বিরুদ্ধে করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। শক্তি ছাড়া নেতা

হওয়ার অর্থই হল অনিষ্টের লালন করা। এসব দিক লক্ষ্য করেই তিনি নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেননি।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, নবী কাফেরের ভোট গ্রহণ করেননি। তিনি তো বর্তমান যুগের গণতন্ত্রপন্থী উলামাগণের মত চিন্তা করতে পারতেন যে, একবার নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে ফেলব। নবী ভালভাবেই জানতেন, তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়ে তাদের মতের বাইরে কোন আইনই বাস্তবায়ন করা যাবে না। বরং ৪/৫ বৎসর পরে এরাই আমাকে বেইজ্জতী করে সংসদ থেকে নামাবে। যেমনটি বর্তমানে হয়ে থাকে। নবীর সে আদর্শ সকল মুমিনের অনুস্মরণীয়। কাজেই বর্তমানে যে সব আলেম সংসদে গিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন, তা স্বপ্নই থেকে যাবে। আমীরুল মুমেনীনের কথাগুলো সত্যিই খুব যুক্তিযুক্ত। তাঁর কথায় পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, গণতন্ত্র পদ্ধতিতে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। এমনটিই তো হয়েছিল আল্‌জেরিয়ায়। শতকরা ৮৫ ভাগ ভোট পেয়েও ইসলামী পার্টি ক্ষমতায় যেতে পারেনি। উলামায়ে কেরাম যুগের পর যুগ আন্দোলন করে সরকারের কাছ থেকে একটি দাবীও আদায় করতে পারেননি। অতঃপর আমি আমীরুল মুমেনীনকে প্রশ্ন করলাম, গণতন্ত্র পদ্ধতিতে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে কোন পদ্ধতিতে তা করা সম্ভব তা জানাবেন কি?

আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় বললেন, "দেখ রিডলি! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা এবং হুকুমত পরিচালনা করার নীতিমালা আমরা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ থেকে নিতে পারি। যেমন তিনি মক্কাবাসীর জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহ্‌র যমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নিজের ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের থেকে পৃথক হলেন, অর্থাৎ হিজরত করলেন। প্রবাসী জীবনের দিনগুলোতে তিনি শুধু বাড়ী বাড়ী দাওয়াত আর খতম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সাহাবীদেরকে যুদ্ধের কলা-কৌশল শিখিয়েছেন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। মসজিদে নববীতে নিয়মিত সাহাবীদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। তিনি যুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি জোগাড় করেছেন। কাফেরদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করেছেন। সাহাবাদেরকে কাফেরদের নিকট প্রযুক্তি সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন। যুগোপযোগী অস্ত্র তৈরি ও অস্ত্র চালনার জন্য উৎসাহিত করেছেন। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের ভাণ্ডার মওজুদ করেছেন। উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সংগ্রহ ও পালা-পোষার জন্য উৎসাহিত করেছেন। লোহার বর্ম থেকে নিয়ে যাবতীয় যুদ্ধের পোশাক তৈরি ও ক্রয় করার কথা বলছেন। তাছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধের ফাযায়েল ও মাসায়েল, মুজাহিদদের মর্যাদা, শহীদের মর্তবা, মুজাহিদদের ঘর-সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব সম্পর্কে এবং যুদ্ধের ময়দানে কিভাবে নামায আদায় করতে হয়। গনিমতের মালের বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে এতবেশি আলোচনা করছেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পবিত্র কালামে ও হাদীস গ্রন্থগুলোতেও অন্যান্য এবাদতের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব দেয় হয়েছে খুব বেশি আলোচনা করা হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনী তালাশ করলে দেখা যায়, এমন একজনও সাহাবা ছিলেন না, যিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রবাসী জীবনের ৮টি বৎসর মদীনাতে দাওয়াতের কাজের পাশাপাশি মুজাহিদ তৈরি করেছেন এবং ৮ম হিজরীতে তার মুজাহিদ বাহিনীকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা দখল করেন। সেদিন মুসলমানদের অস্ত্রের সম্মুখে কোন কাফের এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। বিনা বাঁধায় বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন। সেদিন নবীজী (সাঃ) একজন ফিল্ড মার্শাল হিসাবে কয়েকজন কাফির ছাড়া সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সেদিন নবী বিনা ভোটে। বিনা সমর্থনে বিনা বাঁধায় আরবের সম্রাট হয়েছিলেন। কাউকে খোশমোদ, তোষামোদ করাতে হয়নি। মোহাম্মদে আরাবী যা বলতেন, তাই আইন হয়ে যেত। আইন মানবে না, এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যেত না। কাফেররা নিয়মিত জিজিয়া দিতে বাধ্য ছিল। ওশর, খিরাজ, যাকাত নিয়মিত আদায় হত। দেশের পর দেশ বিজয় হচ্ছিল। নবীয়ে দুজাঁহার ওফাতের পরও সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের আমল জারি রেখেছিলেন। সেদিন অর্ধ দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে ছিল। ঠিক আমরাও নবী (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জিহাদের মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে দখলদার বাহিনী দূর করে ইসলামী হুকুমাত অর্থাৎ, কুরআনী শাসন কায়েম করেছি। দুনিয়াবাসীকে শান্তি দিতে হলে ইসলামী শাসনের বিকল্প নেই। আফগানের জনগণ সে শান্তি পেয়েছে। শান্তির মুখ দেখেছে। আফগানের শান্তির হাওয়া দুনিয়াব্যাপী প্রবাহিত হচ্ছে, তাই পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া জাগছে। পশ্চিমাদের গণতন্ত্রকে আটলান্টিকের ওপারে নির্বাসন দিতে চাচ্ছে। গণতন্ত্র গলাটিপে হত্যা করার জন্য লোক তৈরি হচ্ছে।

প্রিয় রিডলি! ইসলামী এমারতকে লাল কুকুররা বরদাস্ত করতে পারছে না বলেই ঘেউ ঘেউ ও এত আস্ফালন আরম্ভ করেছে। আফগানের জনগণ আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর লাল চক্ষুর ভয় পায় না। জীবন দিয়ে হলেও দেশকে হেফাজত করবো।”

আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম এজন্য যে, এত দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে একটিবারও তিনি আমার দিকে তাকাননি। এত ধৈর্যের সাথে ও মার্জিত ভাষায় আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করেছি। অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। রাতের পর রাত হোটেলে ঐসব কর্মকর্তাদের সাথে কাটিয়েছি। কিন্তু এমন ভদ্র ও বিনয়ী রাষ্ট্রনায়ক আর দেখিনি। তার দু'জন সহকর্মী তারও সামনে নতজানু অবস্থায় বসা ছিলেন। তাদের অবস্থাও সেরূপ। আমাদের কথোপকথনে রাতের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে। এবার আমীরুল মুমেনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বললেন, “মা! তুমি মেহমান খানায় চলে যাও।” এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আমি ফুটন্ত ফুলবাগিচায় সুরভিত পরিবেশে, অনাবিল শান্তিতে বসে উপদেশের মণি-মাণিক্য কুড়াচ্ছিলাম। সে রাতটা ছিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে যখন মেহমানখানায় চলে যাওয়ার নির্দেশ হল, তখন আমার চোখ থেকে মেনে এল অশ্রুর ঝর্ণাধারা। তাঁর থেকে পৃথক হওয়াটা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বিদায় শেলটি এসে আমার বক্ষদেশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

আমীরুল মুমেনীন আমার অবস্থা অতি সহজেই উপলব্ধি করে বললেন, “মা! আমার কিছু কাজ বাকী রয়ে গেছে। ফজর হওয়ার আগেই কাজটি সারতে হবে।” আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এখন এবাদতে মশগুল হবেন। এখন আর বসে থাকা আদৌ ঠিক হবে না।

আমি বিদায় লগনে আরজ করলাম, হুজুর! আপনি যে কক্ষে বসে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন এমন কক্ষ একজন দারোয়ানও ব্যবহার করে না। যে কার্পেটটি রুমে বিছানো রয়েছে, তা অনেক স্থানেই ছিঁড়ে গেছে। তাছাড়া ধর্মীয় কিতাবাদী রাখার শেলফ কয়টি খুবই জীর্ণ-শীর্ণ। যেখানে প্রতিদিন শত শত আলেম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। সে ঘরটি আরো উন্নত হওয়া চাই। তাই আপনার জন্য আমি আধুনিক প্রযুক্তিতে একটি কক্ষ বা কার্যালয় তৈরি করে দিতে চাই যদি আপনার অনুমতি হয়।

আমার কথা শুনে আমীরুল মুমেনীন মুচকি হেসে বললেন, "মা! সাহাবায়ে কেরাম অর্ধ দুনিয়া শাসন করেছেন খেজুর তলায় বসে। তখন দুনিয়াবাসী মহা শান্তিতে দিন যাপন করেছে। তাদের ছিল না কোন শান-শওকত, ছিল না জাক-জঁমক। বর্তমানে চাক-চিক্য অনেক বেড়েছে; কিন্তু শান্তি হিজরত করেছে। আমার দেশের জনগণ সাধারণ কুঁড়ে ঘরে বাস করবে আর আমি অট্টালিকায় থাকব, তা কক্ষনো হতে পারে না। যেদিন আফগানের জনগণের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারব, সেদিন আমিও প্রাসাদে থাকাকে অন্যায় মনে করব না। আমি দৈনিক লাল চা দিয়ে রুটি খাই। যেদিন সবার মুখে গোস্ত-রুটি তুলে দিতে পারব, সেদিন আমার পরিবারের জন্যও তা জায়েয মনে করব। তুমি যদি কিছু করতে চাও, তাহলে শহীদ পরিবারের জন্য, দুখী মানুষের জন্য, এতিম-বিধবার জন্য করতে পার। এটাই তোমার জন্য মঙ্গল হবে। আমীরুল মুমেনীনের কথা শুনে আমি ২৫ লক্ষ টাকার একটি চেক হাতে দিয়ে বললাম, হুজুর! দয়া করে এটা গ্রহণ করুন। তিনি সাদরে চেকটি গ্রহণ করলেন। এবং বললেন, "তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইহকাল ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আগামীকাল ভোরেই এ আমানতগুলো যথাযথভাবে অসহায় শহীদ পরিবারের হাতে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ্।

রাতের শেষ প্রহর। কারো চোখে ঘুম নেই। একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে আমার মত সাধারণ মানুষের জন্য এত সময় নষ্ট করবেন, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রনায়ক দ্বিতীয়জন আর নেই। এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি খুব বিনয়ের সাথে আরজ করলাম, হুজুর! আমি তো সকালে চলে যাব, জীবনে আর দেখা হবে কিনা তা জানি না। তবে আমার আর দু'চারটা কথা এখন মনে হল, যদি এজাযত হয় তবে বলব। আমীরুল মুমেনীন মুচকি হেকে বললেন, ঠিক আছে বল। একটু পরে আমার অন্য কাজ আছে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা কর।

আমি বললাম, হে আমীরুল মুমেনীন! রাশিয়ার যুদ্ধের সময় আমরা আপনারদেকে সামরিক সহযোগিতা দিয়েছিলাম, তা আপনারা অবশ্যই জানেন। আগেও এ ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করেছি। তারপরও একটু না বলে পারছি না। তাহল আপনাদের দ্বারা বিশ্বের হুমকি ও পরাশক্তি রাশিার গর্বকে খর্ব করে দেয়া। আমরা শুধু আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে বসেছিলাম তা নয়, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কাজ করেছে সমান তালে যেমন সি,আই,এ মোশাদ। ওদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

আমাদের বহুমুখী কর্মকাণ্ড থেকে প্রধান কাজ ছিল মুজাহিদদের মধ্যে আপোসে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া ও প্রধান প্রধান নেতাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া। আমরা আপনাদের ভিতর ঢুকে গিয়ে প্রত্যেকের মনোভাব বুঝে চিহ্নিত করে আমরা কোটি কোটি টাকা তাদের পিছনে ব্যয় করেছি। এতে আমাদের মিশন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। একটি ঘটনা থেকে অনেকটা আঁচ করতে পারেন।

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আফগানিস্তানে যেসব গ্রুপ জিহাদ করেছে, তাদের মধ্যে দেওবন্দের আলেমদের সংখ্যাই বেশি। এরাই বিভিন্ন ফ্রন্টে সীনা টান করে লড়াই করেছে। এদেরকে রুশী সৈন্যরা যমের মতো ভয় পায়। এদের প্রত্যেক মুজাহিদই ছিল ঈমান আমলের দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত ও সুন্নতের পাবন্দ। যিকির-আযকার, নামায-রোযা, তাছ্বীহ্-তাহলীল, তিলাওয়াত ও রোনাজারী ছিল তাদের নিত্যদিনের আমল।

সে সময় যদিও আমরা আপনাদেরকে অর্থাৎ মুজাহিদদেরকে সার্বিক সহযোগতিা করেছি, কিন্তু এদের প্রতি ভয় ছিল প্রচুর। কারণ, এদের মধ্যে আলেমের সংখ্যা ছিল অন্যান্য দল থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া ভয়ের আরো একটি কারণ এটাও ছিল যে, এরা সবাই দেওবন্দীয়াতের বিশ্বাসী। এদেরকে কোন সময় অর্থের লোভ দেখিয়ে ক্রয় করা যাবে না।

তাই আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করতাম যে, মুজাহিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের মাঝে কে বেশি ভীতু আর কে রাশিয়ানদের সাথে গোপনে বন্ধু ভাব পোষণ করে। এদের মধ্যে আমরা কয়েকজনকে নির্বাচিত করেছিলাম। তারা হলেন ঃ (১) আহাম্মদ শাহ্ মাসউদ (২) আঃ রশীদ দোস্তাম (৩) ফজলুর রহমান খলীল।

আফগানিস্তান স্বাধীন হলে যদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়, তবে এদের মাধ্যমে আমরা তা ঠেকাব। এদের মাধ্যমে কাজ হাছিল করব।

তাদেরকে গাইড করার জন্য আমরা সৌদী নাগরিক শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাম আল্ তারক্কাবীকে নিযুক্ত করি। শাইখ আব্দুল্লাহ ছিলেন আমেরিকার নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চর। তাঁর মাধ্যমে আমরা লক্ষ লক্ষ ডলার প্রতিমাসে বিতরণ করতাম। ফলে এসব নেতারা আব্দুল্লাহর কথার অনেক গুরত্ব দিতেন। আর তাকে মূল্যায়নও করতেন যথেষ্ট।

নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর নজিবুল্লাহসহ আঃ রশীদ দোস্তাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা যুদ্ধাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও, ক্ষমা পাওয়ার পিছনে হাত ছিল শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাম আল তারকাবীর। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ও আমলাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন কোটি কোটি ডলার।

মোহতারাম আমীরুল মুমেনীন! আমরা ফজলুর রহমান খলিলকে সেদিন নির্বাচিত করেছি, যেদিন রাশিয়ার সাথে গোপন আঁতাত করে, অনেক টাকা উপঢৌকন হিসাবে পেয়ে, নিজের আমীর ও সঙ্গী-সাথীকে দুশমনের দিকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন মিস্টার খলিল গা ঢাকা দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ) যিনি হরকাতুল জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলুম করাচীর ফারেগীনদের মধ্য থেকে একজন। তিনি ছিলেন খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)-এর উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী, নূরউদ্দীন জঙ্গী, তারিক বিন যিয়াদ, মোহাম্মদ বিন কাসিম, সুলতান মাহমুদ গযনবী, বখ্তিয়ার খলজী, হাসানুল বান্না, হাজী ইমদাদুল্লা মুহাজিরে মক্কি, কাসিম নুনতুবী, রশীদ আহাম্মদ গাঙ্গুহী ও হুছাইন আহাম্মদ মাদানী (রহঃ) প্রমুখ বীর সেনানীর উত্তরসূরী।

মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ) ছিলেন হারকাতুল জিহাদের আমীর। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও বার্মা থেকে যেসব নবাগত মুজাহিদ হারকাতুল জিহাদের ব্যানারে যেতেন, তিনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন ও রণাঙ্গনে নিয়ে যেতেন। শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে সাথীদের নিয়ে লড়াই করতেন।

প্রতি রমযানে পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হলে উস্তাদগণ ছাত্রদেরকে পাঠিয়ে দিতেন রণাঙ্গনে। তা ছাড়া ছাত্ররাও নিজ ইচ্ছায় থালা বাটি, কম্বল, কিতাব বিক্রি করে চলে যেত আফগান রণাঙ্গনে। মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ) তাদের থাকা খাওয়া, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিতেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করাতেন।

পাকিস্তান থেকে আগম অকুতোভয় মুজাহিদ সাথীরা একমাস রণাঙ্গনে অবস্থান করে ঈদের পর পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করবেন। এর মধ্যে কতিপয় বীরসেনানী তরুণ মুজাহিদগণ মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ সাহেবের নিকট আরজ করলেন, "হুজুর! আমরাতো তালেবে এলম। অনেক কষ্ট করে এসেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বেশ কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার তাওফীক দিয়েছেন। এখন তো আমাদের মাদাসা খোলা হয়ে যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে যেতে হবে। মন চায় আপনার সাথে আরো একটি লড়াই করে দেশে ফিরতে। জীবনে এমন সুযোগ পাই কিনা তা কে জানে। দয়া করে ব্যবস্থা করুন। সাথীদের অনুরোধে মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ) এক হামলার পরিকল্পনা হাতে নেন। তিনি সে সময় অবস্থান করছিলেন পাকতিকা প্রদেশের উরগুন সমরাঙ্গনে। সেখানে তিনি হামলার সুযোগ করতে না পেরে, কাকতিকারই অন্য একটি এলাকা শারানা নামক স্থানে আফগান কমান্ডার মাওঃ ফরিদুদ্দীন সাহেবের সাথে পরামর্শ করেন। মাওঃ ফরিদুদ্দীন উক্ত প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করলেন। যৌথভাবে রাশিয়ান ছাউনির উপর আক্রমণ করার তারিখ ধার্য করেন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুন।

মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ) ৪৫ জন মুজাহিদকে নিয়ে শারানা অভিমুখে যাত্রা করলেন। উক্ত মুজাহিদগণকে ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছেন রণাঙ্গনে। উক্ত কাফেলার আমীর ছিলেন মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ শহীদ (রহঃ)। নায়েবে কমান্ডার ছিলেন মাওঃ ফজলুর রহমান খলিল। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কারী সাইফুল্লাহ আক্তার ও আঃ সামাদ সাইয়্যাল প্রমুখ।

সম্ভবত উক্ত হামলার পরিকল্পনা মাওঃ ফজলুর রহমান খলিলের মাধ্যমে দুশমনরা অবগত হয়। কারণ, তিনি নায়েবে আমীর হওয়া সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি যে কখন কিভাবে পালিয়ে পাকিস্তান চলে গেছেন, তা কোন মুজাহিদ জানতেন না।

ট্রলি মুজাহিদগণকে নিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে, চড়াই-উৎরাই পারি দিয়ে শারানার দিকে এগিয়ে চলছে। দুশমনরা মুজাহিদদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে এক পাহাড় উপত্যকায় এসে জড়ো হল। রাস্তার দু'পার্শ্বে শক্তিশালী মাইন পুঁতে ওরা ভারী ভারী অস্ত্র নিয়ে দু'দিকের পাহাড়ে এ্যামবুশ লাগাল। ট্রলি প্রথম মাইনে যাওয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। আগুন দেখে তিন দিক থেকে গোলা আসতে থাকে মুজাহিদদের দিকে। মর্টার শেল, কামানের গোলা, গ্রেনেড, রকেট আসতে লাগল অগণিত।

মুজাহিদগণ এতে ভীত হননি। তাক্বীর ধ্বনি তুলে সামনে এগিয়ে চললেন। প্রথমবারের ফায়ারে মাওঃ ইরশাদ আহাম্মদ সাহেব মারাত্মকভাবে জখম হন। তিনি গাড়ীর লক খুলে ক্লাশিনকভ হাতে নিয়ে ফায়ার করতে করতে সামনে এগিয়ে চললেন। শত শত দুশমনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তিনি ঢলে পড়লেন যমিনের উপর। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। এক ফোটা রক্ত শীরে অবশিষ্ট থাকতে তিনি অস্ত্র ফেলেননি। উক্ত লড়াইয়ে ২২ জন মুজাহিদ শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন।

উক্ত লড়াইয়ে ট্রলি থেকে রকেটে আগুন লেগে নিজে নিজেই দুশমনের ঘাটিতে গিয়ে পতিত হয়। এতে দুশমনের ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় ও বহু দুশমন মারা যায়। সেদিন এমন একজন মুজাহিদ ছিল না, যিনি আহত হননি বা রক্ত ঝরেনি। একমাত্র ব্যক্তি ফজলুর রহমান খলিলই কেরামতির গুণে উধাও হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন।

ফজলুর রহমান খলিলের এ মুনাফেকী দাবানলের মত সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। মাদ্রাসার উস্তাদ, আলেম-ওলামা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও ছাত্র জনতা ফজলুর রহমান খলিলকে ধিক্কার দিতে থাকে।

সেদিন থেকে আমরা (পশ্চিমারা) ফজলুর রহমানের চরিত্রকে চিহ্নিত করি এবং তার পিছনে লোক নিযুক্ত করি। আস্তে আস্তে তাকে মোটা অংকের টাকা পয়সা দিয়ে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেখিয়ে হাত করে নেই। তিনি বর্তমানে এক জন সি,আই,এর (মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা) উচ্চপদস্থ এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। হারকাতুল জিহাদ ছিল বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও শক্তিশালী জিহাদী সংগঠন। এ শক্তিশালী জিহাদী সংগঠন হারকাতুল জিতাদকে ভেঙ্গে হারকাতুল মুজাহিদীন ও হারকাতুল আনসার গঠন করার পিছনে জনাব ফজলুর হমান খলিলের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনকে দুর্বল করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানেও তিনি সি,আই,এর এজেন্ট হিসাবে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও বার্মাভিত্তিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

* ফজলুর রহমান খলিলের কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১। জিহাদের নামে যুবকদেরকে সংগঠিত করে তাদের ব্রেইন ধোলাই করা। জিহাদের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করা। সত্যিকার জিহাদকে আড়াল করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শিক্ষা দেয়া। বারূদ বানানো, বোম বানানো ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে যথায় তথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়া, গাড়ী উল্টিয়ে দেয়া সিনেমার হল ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি। এসব কর্মকাণ্ডে দেশে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। এতে আমাদের লাভ হল ঃ (১) মুজাহিদদেরকে কলংকিত করা। (২) জিহাদের উপর মানুষের ঘৃণার সৃষ্টি করা। (৩) সত্যিকার অর্থে মুজাহিদদের তৎপরতা ও কার্যক্রম বন্ধ করা। (৪) জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে মুজাহিদদের উপর ক্ষেপিয়ে উঠা। (৫) এভাবে জিহাদকে সন্ত্রাসী বোরকা পরিয়ে বিশ্বব্যাপী জিহাদী কার্যক্রম বন্ধ করা। বর্তমানে খলিল সাহেবের মিশন লক্ষ্যপানে অনেকটা এগিয়ে আছে।

হে আমীরুল মুমেনীন!

আমরা যখন (পশ্চিমা শক্তি) মুজাহিদদের বিজয় সুনিশ্চিত অনুমান করলাম এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেলাম, তখন রাশিয়াকে নিয়ে শলা-পরমর্শ করি। অতঃপর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল জেনেভা চুক্তি করি। উক্ত চুক্তিনামায় যুক্তরাষ্ট্র, আফগানিস্তান ও রাশিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সাক্ষর করেছিল। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এক রকম জোর করেই সাক্ষর নেয়া হচ্ছিল। জেনেভার শান্তিনামক কালো চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। আফগানিস্তান থেকে রাশয়ান সৈন্য চলে গেলে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বহুজাতিসরকার গঠিত হবে।

২। উক্ত সরকার আমেরিকা পরিচালিত করবে। আবার রাশিয়ার নিকট সে সরকার হবে গ্রহণযোগ্য।

৩। মুজাহিদগণ বিজয় ছিনিয়ে নিলেও সরকার গঠন করতে পারবে না এবং ইসলামী হুকুমত চলবে না।

৪। আমেরিকা ইচ্ছা করলে মুজাহিদদেরকে সাহায্য দিতে পারবে।

৫। পাকিস্তান কোনক্রমেই মুজাহিদদেরকে সাহায্য দিতে পারবে না।

৬। কোন মুজাহিদ পাকিস্তানে অবস্থান নিতে পারবে না।

৭। যারা পাকিস্তানে অবস্থান নিয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিতে হবে।

৮। উক্ত সরকারের সাথে পাকিস্তান কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

৯। পাকিস্তান মুজাহিদদের পক্ষে কোন সংবাদ পরিবেশন করতে পারবে না। এমনকি মুজাহিদদের পক্ষে কোন বই-পুস্তক লিখতে পারবে না। কোন সভা-সমিতিতেও মুজাহিদদের প্রশংসা করতে পারবে না।

১০। পাকিস্তানের কোন লোক আফগান জিহাদে শরীক হতে পারবে না। শরীক হলে তাকে আন্তর্জাতিক আদালতে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১১। যুদ্ধরত কোন সৈন্য মুজাহিদদের হাতে ধরা পড়লে বা আত্মসমর্পণ করলে তার উপর কোন টর্চারিং বা নির্যাতন করতে পারবে না। তাদের থাকা খাওয়া, চিকিৎসা ও বিনোদনের পূর্ণ সুবিধা দিতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হলে তাদেরকে স্ব সম্মানে দেশে ফেরৎ পাঠাতে হবে। এ হল জেনেভা চুক্তির নমুনা।

হে আমীরুল মুমেনীন!

বিশ্বের কুফুরী শক্তিগুলো আজ ইসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ইসলামের জাগরণকে তারা গলাটিপে হত্যা করতে চায়। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে চায় দাফন করতে। চায় ইসলামের উত্থানকে বলি দিতে। অতএব, আপনাদের (মুসলমানদের) উচিত যুগোপযোগী সমর শক্তি অর্জন করে এদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

মোহতারাম আমীরুল মুমেনীন! আমেরিকার কুখ্যাত রক্তপিপাসু নরখাদক বর্তমান বিশ্বের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব, জর্জ ডব্লিউ বুশ আফগানিস্তানে নগ্ন ও সন্ত্রাসী আক্রমণ করতেই বসবে। তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করে ফেলেছে। বর্তমানে কোন কূটনীতি চাল চাললেও কাজ হবে না। পৃথিবীর কোন শক্তিই আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারত না যদি মুনাফেকরা চক্রান্ত না করত।

হে আমীরুল মুমেনীন!

আপনার প্রতিবেশী ও বন্ধুপ্রতিম দেশ পাকিস্তান আজ আপনার বিপক্ষে দাঁড়াবে। অনেক অর্থের বিনিময়ে এবং সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে পারভেজ মোশাররফকে খরিদ করা হয়েছে। সি,আই,এর পূর্ণ সহযোগিতায় নেওয়াজ শরীফকে হটিয়ে পারভেজ ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। পারভেজ কখনো মুসলমানের বন্ধু নয়। সে হল আমেরিকারই পুতুল সরকার। পারভেজ একজন আস্ত মুনাফেক। তার দ্বারা মুজাহিদ ও মুসলমানের চরম ক্ষতি সাধন করবে। এ ব্যাপারে আপনি খুব সতর্ক থাকবেন। মুসলমান তো পরাজয় বরণ করার জাতি নয়। যুগে যুগে মুনাফেকদের দ্বারা মুসলমান মার খেয়েছে। মোহতারাম! আপনি ধৈর্যের সাথে প্রায় সারারাত আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেছেন বলে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।

আমার কথা শেষ হলে আমীরুল মুমেনীন বললেন, 'মা! তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন। তুমি অনেক গোপন কথা শোনালে। এতে দ্বীনের বহু উপকার হল। তোমার ঈমানকে আল্লাহ্ তা'আলা আরো মজবুত করুন। মা! রাততো অনেক হয়ে গেছে। এখন যাও, মেহমান খানায় তোমার শয্যা তোমার এন্তেজাম করছে। এই বলে আমীরুল মুমেনীন ও দু'জন সহচর আসন ত্যাগ করে উঠে গেলেন। বাইরে গিয়ে অযু-এস্তেঞ্জা সেরে শেষ প্রহরের নামাযে দণ্ডায়মান হলেন। আমি চলে গেলাম মেহমান খানায়। আমি মেহমান খানায় চলে গেছি বটে; কিন্তু ঘুম হচ্ছিল না। কখনো ঘরে, কখনো বাইরে পায়চারী করছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই মুয়াজ্জিনের সু-মধুর আযানে রাতের নীরবতা ভেঙ্গে গেল। পূর্ব আকাশ ক্রমশই রাঙ্গা হতে লাগল। ছোট বড় সবাই মসজিদ পানে ছুটে চলল। ইস! কি মনোরম দৃশ্য।

ভোর সাতটায় আমার জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা হল। সকাল ৮ টায় সুস্বাদু খাবারের এন্তেজাম করা হল। আমি উদর পূর্ণ করে আহার করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম রাতের ঘুমটুকু এখন পুরা করে নেব। তা ভাগ্যে হল না। দু'জন তালেবান এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার আসবাব-পত্র যা জব্দ করা হয়েছিল তা কি ফেরৎ পেয়েছেন? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ উচ্চারণ করলাম। তারপর বললেন, "আমীরুল মুমেনীনের নির্দেশ আপনাকে এখই দেশ ত্যাগ করতে হবে। এখন কোন্ দেশে যাবেন তা বলুন! আমি একটু চিন্তা করে বললাম, এখন পাকিস্তানে যাব সেখান থেকে লন্ডনে। তালেবান দু'জন বললেন, "আপনার ছামানা-পত্র এক্ষুণি গাড়ীতে উঠান, আপনাকে পাকিস্তান সীমান্তে পৌছে দেব।"

আমি আমার লাকেজসহ গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ীটি আমাকে নিয়ে পাকিস্তানের দিকে ছুটে চলছে। এদিনটি ছিল আমার জীবনের বেদনাদায়ক এক অধ্যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আমাকে চলতে হচ্ছে। কিন্তু সেসব দিনগুলো আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে আফগান থেকে বেরিয়ে আসার দিনটি। গাড়ীর কাচ খুলে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলাম কান্দাহারের জনপদ। এত সুন্দর! এত মনোরম! এত মায়াবিনী দেশ। যেখানে নেই অবিচার, ব্যভিচার, সন্ত্রাস, রাহাজানী, চুরি, ডাকাতি এত সুন্দর আইন-শৃঙ্খলা। এত শান্তি, এত ভালবাসা এত মনভুলা, যা অন্য কোন দেশে নেই। উঁচু-নীচু পাহাড়-পর্বত আর টেক-টিলার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে বলছিলাম-

হে পবিত্র আফগান ভূমি! তোমার বুকে আমার মত পাপীকে জায়গা দিলে না। হে আমার প্রিয় আফগান! চেয়েছিলাম তোমার বক্ষদেশে আমার কবর রচিত হোক। তোমার কোলে চির নিদ্রায় শায়িত হই। তাও তুমি দিলে না। দৃঢ়পণ করেছিলাম, অনইসলামী রাষ্ট্রে যেন আমার মৃত্যু না হয়। তাও ভাগ্যে হল না। হে আফগান! তুমি দীর্ঘজীবি হও। তাগুতি শক্তির কোপানল থেকে প্রভু তোমাকে রক্ষা করুন। এ প্রত্যাশা রেখে তোমার আদরের কোল থেকে বিদায় নিচ্ছি। আফগান, আফগান হে প্রিয় আফগান! বিদায়, বিদায়, হে আফগান।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ চলে বিকালের দিকে আমাকে চমন সীমান্তে পৌছে দেয়া হল। সেখান থেকে এক প্রাইভেট কারে চড়ে বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় পৌছে একটি হোটেলে রাত্র যাপনের চিন্তা করলাম। হোটেল মালিক একজন পাঠান। বড় ভাল মানুষ তিনি। আফগান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ইসলামী পোশাক ত্যাগ করিনি। কামিজ সেলোয়ার বড় উড়না এবং আপাদমস্তকে বোরকা।

হোটেলে প্রবেশ করতে দেখেই মালিক নিজে আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং বেলুচ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "মোহতারামা! আপনারা সাথে কি কোন পুরুষ লোক আছে, না আপনি একা?" উত্তরে আমি বললাম, জনাব! আমি ভিন দেশী মেয়ে, বাড়ী যুক্তরাজ্য। আমি একজন বৃটিশ সাংবাদিক। বর্তমান পরিচয় আমি একজন মুসলিমা। আপনারই বোন। আমার সাথে কোন পুরুষ লোক নেই।

তিনি বললেন, "আমাদের এখানে কোন মহিলা থাকতে পারে না। সে ব্যবস্থা নেই। তবে যেহেতু আপনার থাকার অন্য কোন ব্যবস্থা নেই, সেহেতু আপনার থাকার ব্যবস্থা করা আমাদের জন্য কর্তব্য।" এই বলে তিনি আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন এবং তার অতি আদরের কন্যা কানিজাকে ডেকে বললেন, "মা! এ যে আমাদের মেহমান, তোমার সাথে রেখো এবং খেদমতের যেন ক্রুটি না হয়। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

কানিজা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তার রুমে। সে আমাকে বলল, "আপা! বোরকাটি খুলে বসুন ঠাণ্ডা লাগবে। রুমে কোন পুরুষ লোক আসবে না।" আমি বোরকাটা খুলে আলনায় ঝুলিয়ে একটি চেয়ার টেনে ফ্যানের নিচে বসলাম। কানিজা তাদের রীতি অনুযায়ী শবরত, চা-বিস্কুট, রুটি ও কাবাব নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সে জিহ্বায় কামড় দিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আমার হঠাৎ পরিবর্তন দেখে বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে খুবই বিস্মিত হয়ে গেল। এমন চেহারার মানুষ জীবনে দেখেনি ও। সে ডাইনিং টেবিলে খাবারগুলো রেখে দিয়ে দৌড়িয়ে গিয়ে ওঘর থেকে তার ছোট বোন মারিয়া ও তার মধ্যবয়সী মাকে নিয়ে এল। সবাই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি বেলুচ ভাষায় আমার পরিচয় ও এদেশে আসার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে ধরে তুললাম। নওমুসলিমা হিসেব এ সংবাদটিও গোপন রাখিনি। মারিয়া বয়সে ১০/১২ বৎসর হতে পারে। সে খুবই চঞ্চল ও বড় রসিক। সে আমার ফিরিংগী মার্কা চুলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিল। মা দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন।

আমি ওদেরকে নিয়ে নাস্তা করে গোসল করতে চাইলাম। কানিজা সাবান ও তোয়ালে নিয়ে হাম্মান খানায় নিয়ে গেল। আমি গোসল করে পুনরায় কানিজার কক্ষে ফিরে এলাম। এবার কানিজার সাথে কয়েক ঘণ্টা আলাপ আলোচনা করে দু'জন এক সাথে রাত কাটালাম। ভোরে গাত্রোত্থান করে ফজরের নামায পড়লাম। সকাল ১০টায় আহারাদি সেরে করাচী যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম।

গৃহকর্তা ও তার কন্যারা আরো কয়েক দিন থাকার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করলেন। আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। অগত্যা তিনি আমার জন্য একটি প্রাইভেটকার এনে দিলেন। আমি রাত্রে ছিলাম ও খানা-দানা করছি বলে কিছু দিতে চাইলে গৃহকর্তা চোখ দু'টি কপালে তুলে বললেন, "মা! মাফ করবে? আমরা মেহমানদের থেকে কোন অর্থ বা বখশিস গ্রহণ করি না। বরং মেহমানকে আমরা হাদিয়া দেই। তাঁর কথায় আমি অনেক লজ্জিত হলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, হায়! মুসলমানরা কত অমায়িক ও ভদ্র। কত যে ভাল মানুষ ওরা তা ভাবতেও অবাক লাগে। আর পশ্চিমা দেশগুলো এত ধনী ও উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ওদের মধ্যে মানবতা, ভদ্রতা ও শালীনতার লেশমাত্র নেই। বিদেশী কোন ব্যক্তিকে অমন করে হেরেমে নিয়ে এত আদর যত্ন করে খাওয়াবে তো দূরের কথা, যদি বেলকনিতেও থাকে তবু তার থেকে বাড়া আদায় করবে।

কোয়েটা থেকে প্রাইভেটকারে চড়ে চলে আসলাম বৃটিশ দূতাবাসে। গেইটে নেমে গাড়ী ওয়ালাকে ভাড়া দিতে চাইলে ড্রাইভার মুচকি হেসে বলল, "ভাড়া তো আমাকে কেরায়া করার সময়ই দিয়ে দিয়েছে।" আমি এতে আরো আশ্চর্য হলাম। অগত্যা তাকে ৫০০ টাকার একটি নোট বের করে বখ্‌শিশ দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। বরং বললেন, "আমরা মেহমান দ্বারা কোন কাজ করাই না। খেদমতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। তারপর আবার ক্ষমা চেয়ে নেই। এতটুকু বলে ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।"

আপাদ-মস্তক বোরকাবৃত দেখে গেইট ম্যান আমাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিচ্ছে না। আমি আমার যাবতীয় পরিচয় পত্র ও প্রমাণাদি বের করে দিলে দারোয়ান কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না। পাসপোর্টে আমার যে ছবি লাগানো ছিল, তা হাফ প্যান্ট ও হাতাকাটা সেন্ট্রু গেঞ্জি গায়ে ছিল। সে ছবি আর বর্তমানের অবস্থা দেখলে আমার মাঝেই প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি আমি ইয়োভনি রিডলী। জবাব পাই না। অগত্যা বোরখা খুলে দাড়ালেই দারোয়ান বুঝতে পারল আমি তাদের খুব কাছের লোক।

আমি দূতাবাসে ঢুকে দেখি সেখানে আমার বেশ ক'জন বন্ধু বান্ধব। রাষ্ট্রদূতের যে পি,এস, সে আমার সাথেই প্রায় ৫/৬ বৎসর লেখাপড়া করেছে। নাম ব্রিংফাই। সত্য কথা বলতে কি সে ছিল আমার বয়ফ্রেন্ড। তাছাড়া অন্যেরা কোন না কোন দিক দিয়ে আমার পরিচিত। ওরা আমার বর্তমান অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আমাকে ঘিরে সবাই বসে গেলেন। চললো কথোপকথন। ওরা আমাকে ইসলাম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি প্রায় এক ঘণ্টা ইসলামের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করি। ইসলাম যে সত্যধর্ম তার নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিকগুলো ওদের সামনে তুলে ধরি। ওরা আমাকে একের পর এক এলো পাথারী প্রশ্ন করে ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন। আমিও অনর্গলভাবে তাদের যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করছি।

মেরী নাম্নী এক মহিলা খ্রিস্টীয় ধর্মকোণ থেকে আমাকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, "আল্লাহ্‌র বেটা ঈসা (আঃ) তো তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন না। তুমি আল্লাহ্‌র বেটার ধর্মের অনুসারী হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম কবুল করেছ।"

আমি খুব শান্ত মেজাজে বললাম, "আপা! আপনারা কথায় কথায় শেরেকী গুনাহ করেন। ঈসা (আঃ) কি করে আল্লাহ্‌র বেটা হয়? ইসলাম বলে, "আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোন পিতামাতার মাধ্যমে আসেননি। আর তার কোন স্ত্রী-সন্তান নেই। তিনি এসব থেকে চির পবিত্র। আমার কথা শুনে মেরী রাগে গদগদ করছিলেন। এবার আমিও একটু রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বোন! বলত, সন্তান জন্ম দেয়া ভাল গুণ না খারাপ? যদি ভাল গুণ হয়ে থাকে, তবে তিনি এক সন্তানের জনক হলেন কেন? খোদা হিসাবে তো অগণিত সন্তান জন্ম দেয়ার কথা ছিল। আর যদি সন্তান জন্ম দেয়া খারাপ গুণ হয়ে থাকে, তবে একটা জন্ম দিলেও তো খারাপ। খারাপ ব্যক্তি আবার খোদা হয় কিভাবে?

আমি আরো বললাম, একজন মানুষ তার ৬০/৭০ বৎসর বয়সে ৭/৮ জন সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। আর তোমাদের খোদার অগণিত বয়স হওয়ার পরও মাত্র একজন সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এর বেশি জন্ম দিতে পারেন নি। তাহলে কি তোমাদের খোদা গোপন রোগে আক্রান্ত?

এবার এরা মাথা নত করে কি যেন ভাবছেন। একটু পরে হঠাৎ ৩ জন মহিলা উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। সকলেই ডাগর দু'টি আঁখি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তিনদিন দূতাবাসে অবস্থান করে বৃটিশ এয়ার লাইন্সে চড়ে স্বদেশের পথে রওয়ানা হই।

অজ্ঞাত কারণে বিমানটি কয়েকটি সিট খালি অবস্থায় আকাশে উড়তে লাগল। আমি বিমান বালাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলাম। ফাঁকে ফাঁকে আফগানিস্তানের ঘটনাবলি ও মোল্লা ওমরের রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনা করি। ওরা তাদের কাজ সেরে আমার পার্শ্বের খালি সিটগুলো দখল করে নেয়। এক পর্যায়ে বিমান বালাদের মধ্য থেকে দু'জন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়। বিমানটি বিকাল ৪টা ৫ মিনিটে যাত্রীদের নিয়ে নিরাপদে বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

বিমানটি অবতরণর সাথে সাথে দরজা খুলে যায়। যাত্রীরা নিজ নিজ লাগেজ পত্র ও সন্তানাদি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিল। বিমানবালারা দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করে মুখ ভরা হাসি হেসে গুড থ্যাংক ইউ, আহ্লান সাহলান, মারহাবা খোশ আমদেদ ধন্যবান বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে লাগল।

এয়ার লাইন্স এর বাসটি সিঁড়ির নিকট দাঁড়িয়ে যাত্রীদের অপেক্ষা করছে। প্রায় অর্ধেক যাত্রী নামার পর আমার পালা। আমিও আমার ব্রিফকেস্‌টি হাতে নিয়ে নীচে নেমে আসি। চেয়ে দেখি বিমানটিকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো পুলিশ। সকলের স্কন্ধদেশে ঝুলছে বড় বড় অস্ত্র আর কটিদেশে ঝুলন্ত পিস্তল। কোমরে বুলেট বেল্ট। দেখেই মনে হয় ওরা যেন কোন রণক্ষেত্রে যাচ্ছেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে এত সতর্কাবস্থায় দেখে আমার সন্দেহ হল এরা নিরাপত্তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনি। নিশ্চয় কোন কুমতলবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অপেক্ষমাণ বাসটির দরজার নিকট যেতে না যেইেত বাঁশী বেজে উঠল। সাথে সাথে কয়েকজন পুলিশ ক্ষিপ্রগতিতে আমার নিকট এসে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে আমাকে এরেস্ট করল এবং হাতে পরিয়ে দিল হাত কড়া। ভ্যানে তুলে নিয়ে গেলেন বিমান বন্দর থানায়। কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় খবরে (বি,বি,সি, লন্ডন) আমার গ্রেপ্তারী সংবাদ পরিবেশন হল। সন্ধ্যার পর পরই থানা আঙ্গিনায় নেমে এল জনতার ঢল। সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, লেখক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও আরো কত লোকজন। মনে হল ওরা যেন চিড়িয়াখানায় লৌহ পিঞ্জিরে আবদ্ধ বাঘিনীকে দেখছে।

আমি আফগানিস্তানে অবস্থান করাকালীন অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণের পর তড়িৎ গতিতে কে বা কারা সংবাদটা ইন্টারনেটে দিয়ে দেয়। ফলে সারা বিশ্বে পড়ে যায় হুলস্থুল। বিশ্বজুড়ে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে আমার ছবিসহ সংবাদ ছাপা হয়। সাংবাদিক কলমের অগ্রভাগ থেকে বেরিয় আসে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রনে অনেক বক্তব্য। আফগানিস্তানের সংবাদ নেয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যা ও ভোর বিহানে সাংবাদিকরা সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য ভীড় জমাত। কিন্তু তালেবানদের সহযোগিতায় এসব বেহুদা কাজে সময় নষ্ট থেকে বেঁচে যাই। তারপরও দু'একজনকে সাক্ষাতকার দিতে হয়েছে।

সেদিন থেকেই বৃটিশ সরকার আমার উপর ক্ষুব্ধ। এরই জের হিসাবে আজ আমাকে গ্রেফতার করে থানায় আনা হচ্ছে। আমি একজন সাংবাদিক হিসাবে অনেকেই পূর্ব থেকেই চিনত। অনেকের সাথে ছিল মাখামাখি ও জানাজানি। তারপরও আজ আমাকে

দেখার জন্য এত ভীড় আর এত আয়োজন। ফটো সাংবাদিকরা ফটো নেয়ার জন্য ক্যামেরা হাতে, একে অপরের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে ফটো নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাকে ওরা পাবে কই? আমি তো আর আগের ইয়োভনি রিডলি নই যে, উদোম গায়ে দর্শকদের দেখা দেব আর দর্শকরা মজা লুটবে।

আমি আজ মুসলিম। ইসলাম আমার ধর্ম। পবিত্র কুরআন-হাদীস আমার দিক-দর্শন। পর্দা আমার উপর ফরজ। তালেবানদের থেকে আমি পর্দা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছি। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। তিল পরিমাণ স্থান বোরকার বাইরে নেই। আফগানিদের বোরকা ইয়া বড়, জগত জুড়া। তাই সকল সাংবাদিকরা ফটো নিতে ব্যর্থ হল। আমি মুহূর্তের জন্যও বোরকার নেকাব উত্তোলন করিনি। ফটো নেয়ার জন্য যারা হুড়াহুড়ি করেছে, ওরা একটি ফটোও নিতে পারেনি।

আমি থানার বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললাম, হে আমার হিতৈষী দেশবাসী! আমি অনেক জেনেশুনে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছি। মহিলাদের প্রতি ইসলাম পর্দা করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) করে দিয়েছে। তাই আর কোনদিন আমাকে বেপর্দা দেখবেন না। অশ্লীল পোশাক পরিহার করে ইসলামী পোশাক গ্রহণ করেছি। এতে আপনারা দুঃখ নেবেন না।

প্রিয় দেশবাসী! আমি জানি, আপনারা আজ আমাকে নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে দেখতে এসেছেন। আপনাদের অন্তর পারাবারে বইছে লক্ষ কোটি প্রশ্নের স্রোত। জনে জনে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ আমি পাব না। অতএব, আজ আমি অগোছালো এ এলোমেলো কিছু কথা বলব। এরই মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবেন।

প্রথমেই আমি বলতে চাই ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ

আমি আমার জীবনের সিংহভাগ সময় ইহুদী-নাসাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছি। এক বস্তা সার্টিফিকেট বা সনদ পত্র অর্জন করেছি। গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়েন্দাগিরীর দায়িত্ব পালন করেছি। ইসলামের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শিখাকে নির্বাপিত করার জন্য ওরা যে গোপন মাদ্রাসা সৃষ্টি করেছে সেখানেও বেশ কয়টি বৎসর অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু সব মিলিয়ে গুণ করে দেখেছি, আমি কিছুই শিখিনি। জীবনটা বৃথা ক্ষেপণ করেছি। মিথ্যা অলিক, কাল্পনিক ও বানোয়াট শিক্ষার পিছনে সময় নষ্ট করেছি।

প্রিয় দেশবাসী! আজ আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। কাল হয় জনসমপেক্ষ আমাকে টুকরো টুকরো করা হবে। এটা তাদের জন্য অসম্ভব কিছুই নয়। যে কয় ঘণ্টা হাতে আছে, সেই কয় ঘণ্টা গেয়ে যাব সত্যের গান। উন্মোচন করে যাব মিথ্যার মুখোশ। কেউ আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ্।

আমি এ পর্যন্ত যতটুকু লেখাপড়া করেছি, তার মধ্যে আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, কোন একটি জাতিকে ধ্বংং করার সব ধরনের প্রচেষ্টা, অন্যকে ঘায়েল করে নিজে মোড়ল সাজার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষা দিতে পারেনি। মানুষ যেহেতু ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়, তাই মানুষের চিন্তা-চেতনাতেও ভুলভ্রান্তি হওয়া অতি স্বাভাবিক। সে সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা লেখা-পড়া করেন, তারা যুগ যুগ ধরে ভুলের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যেমন বলা যেতে পারে-কোন একজন এসে নিজেকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিয়ে, তার খোড়া যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে বললেন, "মানুষ বানরের

আধুনিক রূপ। অর্থাৎ, মানুষ এক কালে বানর ছিল। গাছে গাছে লাফা-লাফির কারণে লেজ খসে পড়েছে। তারপর দিন দিন গবেষণার ফলে সভ্যতার দিকে ফিরে এসেছে। কাপড় পরতে শিখেছে, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ দিয়ে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। শিকার করতে শিখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত গাজাখোরী যুক্তি দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মতান্তরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী বা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। উক্ত মিথ্যা থিউরী সারা দুনিয়ার মানুষকে পাঠ করিয়ে ছাড়ছে। প্রিয় দেশবাসী! আমি পৃথিবীর বহুদেশের চিড়িয়া খানায় বহু প্রজাতির বানর দেখেছি। এরা যুগ যুগ ধরে মানুষের সংশ্রবে থাকছে ও মানুষের খাদ্য ভক্ষণ করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত শুনিনি যে, অমুক চিড়িয়া খানার বানরগুলো মানুষ হয়ে গেছে। আর অমুক অমুক বানর বি, এ পাশ করেছে।

অন্য একজন এসে বললেন, পৃথিবী নয়, সূর্য ঘোরে। আর বায়ুমণ্ডল স্থিতিশীল। তিনিও তার এলেম যা ছিল তা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। এ উক্তিটাকেও দুনিয়ার মানুষ লুফে নিচ্ছিল। এভাবে এক যুগ যেতে না যেতেই অন্য আর একজন এসে তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলে দিলেন যে পৃথিবী নয় সূর্য ঘুরে এবং বায়ুমণ্ডল স্থিতিশী ল। তারপর অন্য এক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, বায়ুমণ্ডল গতিশীল "সবগুলা গ্রহই তার কক্ষপথে চলে। অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল সবই গতিশীল। ঠিক তেমনিভাবে আরো কতশত উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। এতে বুঝা যায়, আজকের সত্য হবে আগামীকালের মিথ্যা।

প্রিয় দেশবাসী! আমি জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের ঐশীবাণীকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। একমাত্র ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত ধর্ম। বাকী সব মিথ্যা ও অলিক এবং কাল্পনিক। তালেবানদের দেশে ঘোরাফেরা করে, তালেবানদের আদর্শ দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। মিথ্যার কালো আঁধার থেকে আলোর পথে ফিরে এসেছি। ইসলামই আমার অভিপ্রায় মিটাতে পারে। ইসলামেই খুঁজে পেয়েছি শাশ্বত কল্যাণ। ইসলাম সত্যিই শান্তির ধর্ম আর তার পরতে পরতে রয়েছে শান্তি আর শান্তি। তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক মাত্র ইসলামই দিতে পারে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্তান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমাধান। ইসলামই দিতে পারে জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা। ইসলামই জাতিকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারে। যা আমি বিগত দিনে আফগানিস্তানে দেখেছি। ইসলমাই অবহেলিত নারী জাতিকে দিয়েছে রাজ-রাণীর মর্যাদা। দিয়েছে তাদের অধিকার ও স্বাধীকার। যা অন্য কোন ধর্মে বা মানবরচিত বিধানে দিতে পারেনি।

তাছাড়া আর যা অবলোকন করেছি, তা হল সারা দুনিয়ার মানুষ আজ গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে দিশেহারা। এসব তন্ত্র-মন্ত্র দুনিয়াবাসীকে শান্তি দিতে পারেনি। মানুষ আজ হতাশাগ্রস্থ। এখন মানুষ সবকিছু ভুলে গিয়ে তালেবানশাসনের দিকে ঝুঁকে পরছে। এখন সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ তালেবানী শাসন দেখতে চায়।

বর্তমানে ইহুদী-নাসারারা তালেবানদের চরিত্রে কালিমা লেপন করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তাদেরকে কট্টর মৌলবাদী, ইসলামী জঙ্গী গ্রুপ, ইসলামী সন্ত্রাসী দল ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে কলুষিত করা হচ্ছে। অথচ বর্তমান

বিশ্বে তারাই একমাত্র আদর্শ ও সভ্যতার বাহক। এরাই সফল রাষ্ট্রনায়ক। ইহুদী-নাসারারা যে মানবাধিকার গলাটিপে হত্যা করেছে, সে মানবাধিকার একমাত্র তালেবানরাই জীবিত করেছে।

যে দেশটি পৃথিবীর পরাশক্তি সুপার পাওয়ার রাশিয়াকে পরাজিত করে তাদের স্বাধীকার রক্ষা করেছে। যে দেশটি প্রায় দু'যুগ ধরে বোমার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, যে দেশের হাজার হাজার নারী বিধবা হয়েছে, যে দেশের হাজার হাজার শিশু এতিম হয়েছে, যে দেশের অন্তত দশ শতাংশ মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, যেখানে ঔষধ, চিকিৎসাহীনতার কারণে হাসপাতালগুলো থেকে প্রতিনিয়ত কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে, যেখানে ঔষধ, খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে মানুষ ধুকে ধুকে মরছে। সে দেশের উপর ইহুদী-নাসারারা বর্তমানে তাদের লাল চক্ষু ঘুরাচ্ছে।

মানবাধিকার ধ্বজাধারী জাতিসংঘের কর্মীরা আজ মুখ থুবড়ে বসে আছে। নাম মাত্র সাহায্য দিয়ে তারা বিশ্বজুড়ে হাঁক-ডাক ছাড়ছে। মুসলিম দেশগুলোর পুতুল শাসক বা ইহুদী-নাসারাদের গোলামেরাও তা দেখছে না। বিশ্ব মানবতার দাবী তো ছিল এ যুদ্ধ কবলিত দেশটিকে অভাব-অনটনের গ্রাস থেকে বাঁচানো। তা তো হচ্ছে না। আজ সত্য কথা বলতে কি, বৃটিশ সরকার আমাকে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিল একটি বড় ধরনের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য।

আমি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে প্রাথমিক পর্যায়ে তালেবানদের বিপক্ষে কিছু কাজ করেছি। তারপর যখন সবদেশ জুড়ে বিচরণ করতে লাগলাম এবং তালেবানদেরকে ভালভাবে জানার সুযোগহ হয়েছে, তখনই আমার অন্তরের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। আমি ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে যাই। তারপরই স্বজ্ঞানে, স্বচিন্তায় অমূল্য ধন ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করি।

আমি দেখেছি তালেবানদেরকে, তারা বন্দীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছে। আমি লুগার প্রদেশের এক বন্দী শিবিরে গিয়ে বন্দীদের জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের সাথে তালেবানরা কি ধরনের আচরণ করে থাকে? উত্তরে একজন বিদেশী বন্দী বলল, "আমরা স্বদেশ থেকে দূরে এতটুকুই কষ্ট, তাছাড়া অন্য কোন কষ্ট আমাদের নেই। তালেবান আমাদের জন্য নিয়মিত চা-নাস্তা, বিস্কুট, চানাচুর, পাওরুটি পাঠাচ্ছে। তিনবেলা গোস্ত-রুটি ও খিচুরী দেয়া হচ্ছে। আমাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে আমাদের বডি চেক করা হচ্ছে কোন রোগ আছে কিনা?

অপর একজন বন্দী বলল, আমাদের আরো একটি কষ্ট আছে তা বলা যায় না। আমি ওকে আবার প্রশ্ন করলে লোকটি হাসতে হাসতে বলল, "আপা! আগে তো আমরা সব সময় টিভি দেখতাম। বর্তমানে তালেবানরা আমাদেরকে টিভি খেতে দেয় না।" অপর একজন বন্দী বলল, "না আপা! টিভির পরিবর্তে আমাদের খেলার অনুমতি দিয়েছে, এমন কি খেলার উপকরণও দিয়েছে। বন্দীদের কথা শুনে আমি ভাবনার অতল সাগরে হারিয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, হায়! এরা যদি আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন ও ইসরাঈলের হাতে বন্দী থাকত, তবে কতইনা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হত। ইহুদী-নাসরারা বন্দীদের শাস্তি দেয়ার জন্য কত ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে, তা লিখে শেষ করার মত নয়। এর মধ্যে কয়েকটি শাস্তির কথা উল্লেখ করব। যেমন ঃ (১) সাপের সেলে নিক্ষেপ করা; (২) কুকুরের সেলে নিক্ষেপ করা; (৩) সপ্তাকে সপ্তাহ অনাহারে

রাখা; (৪) সপ্তাকে সপ্তাহ ঘুমহীন রাখা; (৫) লোহার মই দিয়ে চাপা দেয়া; (৬) কাঁটাযুক্ত খাঁচায় আটকে রাখা; (৭) কারেন্টের তাপ দেয়া; (৮) নখের ভিতর সূঁই ঢাকানো; (৯) ভিজা কাপড়রে চোখ মুখ বেঁধে পানি ছিটিয়ে দেয়া; (১০) গরম ডিম পিছনের রাস্তায় ঢুকিয়ে দেয়া; (১১) গরম পাইপে ঢুকিয়ে রাখা; (১২) আলো-বাতাসবিহীন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা; (১৩) বিদ্যুৎচালিত চেয়ারে বসিয়ে ঘুরানো। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। এসব শাস্তি ভোগ করে যদি কেউ ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকে, তবে তার দ্বারা বাকী জীবনে কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। এসব শাস্তি শুধু মুসলমানদের উপরই প্রয়োগ করা হয়।

ইয়োভনি রিডলি আরো বলেন, "হে আমার প্রিয় দেশবাসী! ইহুদী-নাসারাগণই বর্তমানে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। এরাই জোট গঠন করে নিরীহত মুসলিম দেশগুলোর উপর সন্ত্রাসী আগ্রাসন চালাচ্ছে। এদের এক তরফা এক গুয়েমী মনোভাব দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করছে। যেমন এদের দাবি হল, তারাই দুনিয়াতে মোড়লগিরী করবে আর অন্যেরা তাদের গোলাম হিসাবে বসবাস করবে। এরা ক'জনই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী থাকবে। অন্যরা সে শক্তি অর্জন করতে চাইলে যেভাবেই হোক দমন করবেই করবে। অর্থাৎ, এদেরকে ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেউ অস্ত্র বানাতে পারবে না, নিজ দেশের হেফাজতে জন্য অস্ত্র মওজুদ রাখতে পারবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায়ও তাদের এজাজত লাগবে। এ ধরনের এক তরফা একগুয়েমী মনোভাব থেকে এরা একচুল পরিমাণ এদিক-ওদিক হটবে না।

হে দুনিয়াবাসী! তোমরা শুনে রেখো। হে দুনিয়ার ইহুদী, নাসারা আর পৌত্তলিকেরা! তোমরা যেনে রেখো। তোমাদের জুলুম-নির্যাতনের সীমা অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। তালেবানদের মাধ্যমেই তোমাদের দম্ভ ও অহংকার চূর্ণ করবেন আল্লাহ্ তা'আলা। দুনিয়ার মজলুমরা এক হচ্ছে। জিহাদী মনোভাব নিয়ে আগামী প্রজন্ম তোমাদের সামনে আসছে। কারুন, নমরুদ, ফেরাউন, আবু জেহেল, আবু লাহাবদের মত তোমাদের পরিণতি দুনিয়াবাসী অবলোকন করবে। তোমাদের জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কথা বলছে। আসলে অন্তর থেকে ওরা তোমাদের ভালবাসে না। তোমাদের নামের উপর এরা থুথু নিক্ষেপ করে। ছোট ছোট বাচ্চাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, বল তো বর্তমানে সন্ত্রাসী কারা! উত্তরে তারা এক বাক্যে বলে দেয়, আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটিশ, ইসরাইল, ইন্ডিয়া ইত্যাদি।

হে দুনিয়ার সুপার পাওয়ারেরা! তোমরা জেনে রেখো, সারা দুনিয়া এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। তালেবানদের কার্যক্রম সারা বিশ্বে চালু হয়েছে। তারা তোমাদের ধ্বংস করার জন্য আত্মঘাতি হামলার পথ বেছে নিয়েছে। আমেরিকার ঘরে ঘরে এমন কি খ্রিস্টানের ঘরে ঘরে এখন মুজাহিদ তৈরি হচ্ছে। তাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করার মত কোন শক্তি আপাতত আমার নজরে ধরা পড়ছে না। আমি ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি।

আমার বক্তব্য ভিডিও করা হচ্ছে। সাংবাদিকরা সর্টহ্যান্ডের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করছেন। রাত প্রায় ১০ টা ছাড়িয়ে গেছে। থানার কর্মকর্তাগণ সমস্ত লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। কক্ষটি এক দরজা বিশিষ্ট, জানালার কোন বালাই নেই। তাতে প্রবেশের সাথে সাথে মনে হল, তারা আমাকে জাহান্নামের কোন কুঠুরিতে বলপূর্বক ঢুকিয়ে দিয়েছে। পুলিশ অফিসার সবাইকে বের করে দিয়ে বললেন,

"রিডলি! তোমার জন্য এ রুমটি সরকারিভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে তুমি বাসর ঘরের আনন্দটুকু অনুভব করতে পারবে।"

অফিসারের কথা শুনে আমার চঞ্চল রোধির ধারা প্রবর বেগে সঞ্চাল হতে লাগল। এক পর্যায়ে আমি অগ্নিশর্মা হয়ে বললাম, যে খোদার দুশমন, বৃটিশের গোলাম। তোর মত কুকুর কি হবে বাসর ঘরের মেহমান? তুই কার সাথে কি বকছিস্? তুই হলি বৃটিশের গোলাম। আর আমি বৃটিশের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে আল্লাহ্র গোলামী এখতিয়ার করেছি। তোরা তোদের প্রভু টনি ব্লেয়ারের নির্দেশক্রমে যা করতে চাচ্ছিস সবই কর, এতে আমি বাঁধা দেব না। আর বাঁধা দিলে লাভই বা কি? তোদের কাছে কথা বলা আর অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমার আল্লাহ্ যদি আমার রব হয়ে থাকেন, আর তিনি যদি আমাকে হেফাজত করেন, তবে তোদের মত পুলিশরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পুলিশ অফিসার আমার কথায় রাগে কটকট করতে করতে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। এক হাজার পাওয়ারের একটি বাতি মাথার উপর জ্বলছিল। বাতিটির সুইচ ছিল কক্ষের বাইরে। হারামি পুলিশ সুইজ অফ কের চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রুমটি প্রজ্জ্বলিত চুল্লির ন্যায় গরমে তেতে উঠল। এত গরম হাওয়ার কারণ হিসেবে ধরে নিলাম, কক্ষটির চারদিকে রয়েছে হিটার। হিটারের সুইচ অন করার সাথে সাথে ঘরটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে গেল। এতে বুঝলাম, এটাই আমার জন্য ধার্যকৃত রিমান্ড, যা বৃটিশ সরকার পূর্ব থেকেই তৈরি করে রেখেছে।

প্রচণ্ড গরম সইতে না পেরে আমি ছটফট করছিলাম। রুমটি এতই ছোট ছিল যে তাতে ঊর্ধ্বে দু'থেকে তিনজন মানুষ গাদাগাদি হয়ে শোয়া যাবে। আমি প্রাথমিক অবস্থায় গরম সইতে না পেরে বোরকা ও জামা কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলেছিলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় হাত দু'টি ঊর্ধ্বে প্রসারণপূর্বক মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করছিলাম-

হে আমার মাওলা! হে রাহমানুর রাহীম! আমি জীবনের সিংহভাগ সময় তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলাম। সে জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আমি তোমার ক্ষমার দুয়ারে হাজির, অতএব আমায় ক্ষমাকর। প্রভু হে! তালেবানদের উসিলায় এবং তোমার খাস অনুগ্রহে তুমি আমার আঁধারাচ্ছন্ন হৃদয়ে হেদায়াতের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছ। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমাকে তুমি হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে ঈমানী পরীক্ষা হয়ে থাকে, তবে তোমার অনুগ্রহে আমাকে পাশ করার তাওফিক দান কর। সব ধরনের দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন যেন সইতে পারি, সে ক্ষমতা দান কর। আমি বিশ্বাস করি, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই দুঃখ দেয়ার বা দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়ার। তুমি ইচ্ছা করলে সবকিছুই করতে পার।

ওগো আমার মাওলা! মক্তবের শিশু থেকে যদি এম, এ, ক্লাশের পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে এটা তার উপর জুলুম হবে। আর তুমি তো জুলুম পছন্দ কর না। ঈমানের দিক থেকে আমি শিশু। অতএব, আমার থেকে তুমি শিশু শ্রেণীর পরীক্ষা নাও এবং পাশ করিয়ে দাও। আমাকে তুমি সাহাবা ওয়ালা ঈমানদার করে সাহাবাওয়ালা পরীক্ষা নাও। প্রভু হে! দুনিয়ার রিমান্ড থেকে কবরের শাস্তি লক্ষ কোটি গুণে বেশি। জেলখানার শাস্তি থেকে জাহান্নামের শাস্তিও বহুগুণে বেশি। অতএব, দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা কবর ও জাহান্নামের আযাব ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! আমার অন্তর রাজ্য ছিল গায়রুল্লাহর অরণ্য ভূমি, যেখানে

কুফর নামক ব্যাঘ্র, শিরক্ নামক ভল্লুক বিদআত নামক সর্প অবাধে বিরচণ করত। যেখানে ছোট বড় অসংখ্য প্রাণীর চারণ ভূমি ছিল। উক্ত হৃদয় অরণ্যে আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। সমস্ত গায়রুল্লাহ্ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্ ছাড়া সে অন্তরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অতএব, তুমি আমার জন্য হয়ে যাও। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই, তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চাই।

হে আমার মাওলা! সুখে, দুঃখে, বিপদে, আপদে, শয়নে-স্বপনে তুমি যদি সাথে থাক, সাথী হও, তাহলে আমার কোন চিন্তা নেই, ভয় নেই। আর যদি তোমাকে হারিয়ে জান্নাতেও বসবাস করি, তবু তাতে শান্তি পাব না। নিজ অনুগ্রহে যখন তুমি আমাকে কাছে টেনেই এনেছ এখন আর তোমার থেকে জুদা হতে চাই না।

ঃ জান্নাত অ দোযখ ছে ইয়া রব কিয়া কারোঁ
আরজু হে মায় তুজে দেখা কারোঁ ॥

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্! জান্নাত জাহান্নাম দিয়ে আমি কি করব? আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করব।

ঃ হুর ওয়া গেলমান যেতনে নিয়ামত হায়ে তু
ছব ছে বেহতর নিয়ামতে দিদারে তু ॥

অর্থাৎ ঃ বেহেস্তের হুর-গেলমান, বাগ-বাগিচা, নির্ঝরিণী ও বালাখানা ছাড়াও যত সব নিয়ামত আছে, ওসব থেকে তোমার নৈকট্য ও তোমার দিদারই সর্বোত্তম নিয়ামত। তুমি আমার পার্শ্বে থাক। তোমার অবলা দাসীকে তাড়িয়ে দিও না।

আমি বললাম, প্রভু হে! আমার পুরানো ধর্ম বিশ্বাস হিসাবে প্রভু যিশুকে ত্যাগ করে তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন যদি তুমি আমার থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে চাও, নিতে পার। কিন্তু ফেল যেন না করি। আমাকে আবার যিশুর নিকট ফিরিয়ে দিও না।

প্রার্থনার এক পর্যায়ে আমি অনাবিল শান্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছিল এ অন্ধকার নির্জন ও সংকীর্ণ কুটিরে আল্লাহ্ আমার পার্শ্বে বসে আছেন। আল্লাহ্কে নিয়ে যেন আমি প্রেমালাপে মত্ত। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেল। গরমের মাত্রা অনেক গুণে কমে গেছে। মনের উত্তপ্ত ধরণীতে বৃষ্টি বর্ষণ হল, সবুজ শ্যামল ধরণী নতুন রূপ ধারণ করল। ফলে-ফুলে শাখা-প্রশাখা সুশোভিত হল। বসন্তের কোকিল আবার দেখা দিল। মনে হচ্ছিল একক্ষটি যেন বেহেস্তের কোন এক খালয়াতগাহ্।

বাইরের কোন আওয়াজ বা আলো-বাতাস প্রবেশের কোন পথ ছিল না কক্ষটিতে। তবু যেন মনে হচ্ছিল দক্ষিণা সমীরণে আমার বিদগ্ধ শরীর শীতল করে দিল। আমার অন্তরে প্রবল বিশ্বাস জন্মেছিল আল্লাহ্র প্রতি যে, তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। তিনি আমার পার্শ্বে থাকবেন। তারা যত ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন করুক না কেন কোনমতেই আমার দৃঢ় ও অটল বিশ্বাসে ফাটল সৃষ্টি করতে পারবে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঈমান যেমন ছিল, আল্লাহ্ পরীক্ষাও নিয়েছেন তেমন কঠিন। পাশও তিনিই (পরীক্ষক) করিয়েছেন।

ঃ আঁকে লুতফে খেশেরা এযহার কারদ্,
বা খলিলঅশা নারেরা গুলজার কারদ!!

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্‌র দয়া, অনুগ্রহ ও ঈমানদারদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগিচা বানিয়ে। আল্লাহ্‌র গুণ গরিমা ও কুদরত নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে রজনীতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। আমার ধারণা অনুযায়ী ভোর হওয়ার কথা। অন্ধকারে ঘড়ি দেখা যায়না বিধায় সময় নির্ণয় করতে পারছিলাম না। এরই মধ্যে দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখি দানবের আকৃতির যুবক দরজা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বোরকা পরে নিলাম।

আগন্তুক একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে মিস্ রিডলি! কেমন আছিস?" আমি উত্তরে বললাম, আমার আল্লাহ্ আমাকে খুব ভাল রেখেছেন।

পুলিশ কর্মকর্তা ঃ আল্লাহ্ ভাল রেখেছেন মানে কি যিশু?

রিডলি ঃ যিশু আবার আল্লাহ্ হল কবে? পত্রিকায় এসেছে?

কর্মকর্তা ঃ এখনো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেমক হারাম! সরকারি অর্থে লালিত-পাতিল হয়ে উসামা বিন লাদেনের টাকা পেয়ে এখন ধর্ম-কর্ম ও দেশ জাতি সবই ভুলে গেলে। এর প্রায়শ্চিত্ত তোকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। রিডলি ঃ আমি মুসলিম, আমার দিলে নেই কোন ভয়, নেই কোন সংশয়। আমি চির অমর, চির অক্ষয়। তোমাদের যিশু আমার খোদা নন, তিনি খোদার বেটাও নন। তিনি ছিলেন প্রেরিতগণের একজন। তিনি আমাদের মতই একজন সৃষ্টি ছিলেন। তিনি স্রষ্টা নন। তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। শহীদ হওয়ার জন্য আমি সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত।

কর্মকর্তা ঃ রিডলি! আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এসেছি। আমাকে ভুল বুঝ না। বল বোন সত্য কথা বল, তুমি যে একজন পাদ্রীর মেয়ে, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য এবং সাংবাদিকতায়ও তোমার জুড়ি মেলে না। ধর্ম বিশ্বাসে তুমি ছিলে অনন্যা। এখন কি করে হয়ে গেলে তা বুঝিয়ে বলবে বোন?

রিডলি ঃ অত দীর্ঘ আলাপ করার সময় আমার নেই। যতক্ষণ তোমাদের সাথে বক্ বক্ করব, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র নামের যিকির করলে ফায়দা হবে। তবে এতটুকু জেনে রেখ, আমি কারো প্ররোচনায় ইসলাম গ্রহণ করিনি। কয়েকটি ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছি, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ইসলাম যে সত্য ধর্ম এর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। তাই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাছাড়া গত রাতের আলোচনা ভিডিও হয়েছে, তা দেখে নিবেন।

কর্মকর্তা ঃ বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছি, আপনি নাকি আমাদের সমস্ত গোপন পরিকল্পনা তালেবানদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া আমাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ও গোপন আস্তানা ও বিশেষ বিশেষ স্থাপনার ম্যাপ দিয়েছেন আল্ কায়দা সদস্যদের, তা কি সত্য?

রিডলি ঃ যতটুকু শুনেছেন, সবটুকু সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যা নয়। আপনারা শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করছেন বা পরিকল্পনা নিচ্ছেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেছি। আপনারা যেমন দুনিয়াতে বাঁচতে চান, তেমন তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে। আপনারা তাদের উপর (মুসলমান) অন্যায়ভাবে জুলুম-অত্যাচার করবেন, অহেতুক অবরোধ আরোপ করবেন আর তারা শুধু সয়েই যাবে তা কি করে হয়? তাদেরও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার আছে।

আপনাদের বর্বরতা, আনুষিকতা, আর পশু চরিত্রের উপর ধিক্কার, শতবার ধিক্কার। আপনাদের বর্বরতার কারণেই আমি আপনাদের যিশুর ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এতে আমার যা হয়, মাথা পেতে মেনে নেব। তবে এটাও সত্য যে, মুসলমান হওয়ার অপরাধে আপনারা যা তা নির্যাতন করবেন, তা অত সহজে মেনে নেব না। দুনিয়াতে হতে পারি আমরা অসহায়, অর্থ সম্পদ না থাকতে পারে। এটম, হাইড্রোজেন, নাপাম ও কার্পেটিং বোমা না থাকতে পারে, তাই বলে আপনাদেরকেও প্রভু হিসাবে মেনে নেব না। মাথা নত করব না। মাথা নত করতে হয়, আল্লাহ্‌র সামনে করব। আর এটাও জেনে রাখুন, আমার জান আর ইজ্জতের উপর যদি আপনারা আঘাত করেন, তবে আমার ভাই তালেবান ও আল্ কায়দার সদস্যরা চুপটি করে বসে থাকবে না। একদিন না একদিন বোনের উপর নির্যাতনকারীদের প্রতিশোধ নিবেই নিবে। মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদী-নাসারাদের স্থাপনার উপর আঘাত হানবেই হানবে। ইনশাল্লাহ্। এক একজন তালেবান ও আল-কায়দা এক একটি এটম।

কর্মকর্তা ঃ সিস্টার! আপনি ভুল বুঝতেছেন। মুসলমান হওয়ার জন্য আপনি প্রশাসনের নিকট অভিযুক্ত নন। আপনি একটি জাতির গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন, শাস্তি আপনাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

রিডলি ঃ জনাব! আপনি কি বলতে চান? আমি খ্রিস্টধর্মে থাকাকালীন কোন গোপনীয়তা প্রকাশ করিনি। অতীতে মুসলানদের বিরুদ্ধে আমাকে দ্বারা কি করাচ্ছেন, তা প্রকাশ করিনি আর করবও না। ইসলাম গ্রহণের পর আপনাদেরকে বন্ধু ভাবতে পারি না বরং শত্রু ভাবি। তাই আমার জাতিকে আপনাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার জন্য সামান্য কিছু বলেছি। এটা আমি অন্যায় করিনি। আপনারা প্রহার করবেন, আমার একটু উহঃ শব্দ করতে পারব না বা নড়তে পারব না। আপনারা আমাদের মস্তকে গুলি ছুড়বেন, আমরা মাথা হেলাতে পারব না, আপনারা বোম্বিং করে আমাদের বসতবাড়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, খাদ্যগুদাম, তেলের ডিপো ধ্বংস করবেন আর আমরা কান্না-কাটিও করতে পারব না। আপনাদের জুলুম-অত্যাচার আর নির্যাতন সইতে না পেরে, নিজের ভিটে-মাটি ত্যাগ করে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে গেলে অন্যায় হবে। কেউ যদি মজলুমের পক্ষে একটু দরদ নিয়ে কথা বলে, তাহলে সে হয়ে যায় সন্ত্রাসী আর মৌলবাদী। তা কি করে কতদিন বরদাস্ত করব। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনাদের এসব আচরণ দেখেই আমি সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছি। এতে নাক গলানোর অধিকার আপনাদের নেই।

কর্মকর্তা ঃ সিস্টার! আপনার কথাগুলো যদিও শুনতে তিক্ত লাগে, তবু তা সত্য, এটাই বাস্তব। আপনার দ্বীন সত্য, আপনার আল্লাহ্ যে আপনাকে সাহায্য করেছেন, তাও সত্য। কারণ, যে সেলে আপনাকে রাখা হয়েছে, এসেল থেকে কোন দিন বন্দীরা সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে না। এ কক্ষটি এতই নিষ্ঠুর যে কয়েদিকে হয়ত লাশ বানিয়ে দেয়, না হয় পাগল। আপনি এখনো বহাল তবিয়তে আছেন এটাই বিরাট অলৌকিক কাণ্ড। তিনি আরো বলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ও আপনার তেজোদীপ্ত ভাষণ লন্ডনের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। গতরাত ১১টার আগেই ৩৩ জন মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন আমার অন্তরেও আপনি সত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন। প্রকাশ্যে মুসলিম আপাতত ঘোষণা দিতে পারছি না। তবে দু'দিন আগে হোক পরে হোক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমাকে আমি মুসলিম ঘোষণা দেব।

দুপুর ১২টা। আলাপ-আলোচনার মধ্যে সময় কেটে গেছে। নাস্তা-পানি কিছুই খাওয়া হয়নি। পুলিশ কর্মকর্তা এক কনস্টেবলকে নাস্তা আনার জন্য ডেকে পাঠালেন। কনস্টেবল একটু পরে শূকরের গোস্ত ও রুটি নিয়ে হাজির হলেন। আমরা দু''জন রুটি খেতে লাগলাম। শূকরের গোস্ত বুঝতে পেরে শুধু চায়ে ভিজিয়ে রুটি খেলাম। আমার অবস্থা দেখে পুলিশ কর্মকর্তাও গোস্ত ফেরথ দিলেন।

বেলা একটার দিকে পুলিশের ভ্যানে তুলে আমাকে কোর্টে চালান করা হল। আমাকে দাঁড় করানো হর আসামীর কাঠগড়ায়। আমাকে দেখার জন্য হাজার হাজার জনতার ঢল নামল আদালত পাড়ায়। আমার মুসলিম ভাই বোনেরা আমার মুক্তির দাবীতে আওয়াজ উঠাল। এর মধ্যে প্রায় শতাধিক নওমুসলিম মহিলারাও ছিল। যারা মাত্র দু'দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে বিচারালয়ের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হল। সহস্র কণ্ঠে শ্লোগান প্রতিধ্বনিত হল-রিডলির কিছু হলে জ্বলবে আগুন বিচারালয়ে।

বিচারপতি রিগারল্ড আমার ব্যাপারে কি রায় দিবেন, তা নিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন। জনাকীর্ণ আগালতে আমার বিরুদ্ধে কোন রায় দিলে পরিস্থিতি টেকেল দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিচারপতি রিগারল্ড দিশেহারা হয়ে ৫ জন বিচারপতির নিয়ে জুরীতে বসলেন। এদের মধ্যে একজন বললেন, আমরা যদি সাজা ডাকি তাহলে লন্ডনের সবকিছু অচল করে দেবে। এর জনপ্রিয়তা ও সমর্থকদের দল দিনদিন ভারী হতে থাকবে। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে মাত্র দু'দিনের শতাধিক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আরো যে ধর্মান্তরিত হবে না তা কেউ বলতে পারবে না। তার পক্ষে শুধু মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে তা নয়। এর মধ্যে হাজার হাজার খ্রিস্টানও রয়েছে।" তিনি আরো বলেন-"রিডলির ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করা হোক। তা যদি যথায় তথায় বাজাতে থাকে, তবে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যাবে। সেটাকে ঠেকানোও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তাকে তার বাসায় নজরবন্দী করে রাখা হোক। সে কোন সভা-সমিতিতে যেতে পারবে না, কোন বক্তৃতা দিতে পারবে না। তার সাথে কেউ দেখা করতে পারবে না। কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য নজরবন্দীর হুকুম জারি করা হোক।" উক্ত প্রস্তাবে অন্যান্য বিচারপতিগণও একমত হলেন। অতঃপর কঠোর নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে আমাকে আমার বাসভবনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ৫ জন পুলিশ পাহারাদার হিসাবে আমার বাসায় মোতায়েন করা হয়। আমার বাসার টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। কোন সাংবাদিক, জনসাধারণ ও আত্মীয়-স্বজন আমার বাসভবনে আসতে দেয়া হয় না। এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর, অমানবিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল।

আমি জন্ম সূত্রে একজন উঁচু পর্যায়ের পাদ্রী পরিবারের মেয়ে। আমার পিতা মিস্টার ডনপল যিশুখৃস্টের আশির্বাদ ও প্রেরিতগণের একজন হিসাবে সারাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশে-বিদেশে অনেকগুলো খ্রিস্টান মিশনারী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। আমাদের বাসায় সব সময় ধার্মিক লোকদের ভীড় লেগেই থাকে। খ্রিস্ট ধর্মচর্চায় যারা আজীবন কুমারী হয়ে থাকবে এবং মেরীর সাথে বেহেস্তে যাবে এমন সব মেয়েরা প্রায় ডজন খানেক সব সময়ই আমাদের বাসভবনের অদূরে গির্জায় বৎসরের পর বৎসর গড়া-গড়ি করে। এদেরকে কোন্ ভূতে পেয়েছে, তা নিজেরাও বুঝতে পারে না।

গীর্জার পার্শ্বস্থির কামরাগুলো প্রায় তাদেরই দখলে। এদের চরিত্র সম্পর্কে আমি ভালভাবেই জানি। ধর্মজাযক বা পাদ্রীদের সাথে তাদের কি সম্পর্ক, তাও আমার জানা। ওসব নিয়ে আলোচনা করা সমিচীন মনে করি না। আমার পিতা-মাতা রীতিমত আমাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। অনেকভাবে বুঝাতে চাইলেন। আমি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে তাঁদের মোকাবেলা করতে লাগলাম। চলছে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব। আমার সাক্ষাতকার নিতে প্রতিদিনই সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্টরা আসতেন। কিন্তু সাক্ষাত করতে পারছে না। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আঙ্গিনা থেকেই বিদায় নিতে হত। চাছাড়া অনেক পাদ্রী ও ধর্ম জাযকদেরকেও দেখা করতে দেয়নি এই ভয়ে যে ওরা আমার কথা শুনে হয়ত ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।

দীর্ঘ ৬টি মাস আমাকে বন্দীশালায় মানবেতর জীবন কাটাতে হয়েছে। যখন দেখল, তাদের বুঝানো সামঝানো, জুলুম-নির্যাতন, ভয়-ভীতির পরও আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন হল না, তখন আমার নিষ্ঠুর পিতা মানসিক রোগী আখ্যায়িত করে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেন এবং ডাক্তারকেও চুপি চুপি একথা বলে দিলেন, "তাকে যেন ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রেইন শর্ট করে দেয়া হয়। সে যদি সুস্থ্য থাকে, তবে খ্রিস্টজগতের জন্য এক হুমকি হয়ে থাকবে। যে কোন মূল্যে তাকে পাগল করে দিতে পারলে পিতার ইজ্জত রক্ষা পাবে। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হবে যে, রিডলি অতীতে যা কিছু বলেছে বা করেছে সবই বিকারগ্রস্ত অবস্থায় বলেছে। পাগলের কথা ধরতব্য নয়।

আমাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে পিতাজী চলে এলেন। ডাক্তার আমাকে খুব যত্ন সহকারে একটি নিরিবিলি কক্ষে থাকতে দিলেন। সেখানে অন্য কোন ডাক্তার বা নার্সদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ডাক্তার আমাকে স্বস্নেহে অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি ঠাণ্ডা মাথায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলাম। ডাক্তার সাহেব এক পর্যাযে তার ডায়েরী আর কলম দিয়ে বললেন, "তোমার ঠিকানা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি সুন্দর করে লিখ।" আমি বললাম, স্যার এ জন্য একটু সময় লাগবে। আমি তো পাগল মানুষ। সব সময় অনেক কিছু মনে থাকে না। পাগলের পাগলা মন। পাগলা ঘোড়া দাবড়িয়ে দূর অজানায় হারিয়ে যায়।" ডাক্তার এতসব প্রশ্ন করা, নাম ঠিকানা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি লিখানোর উদ্দেশ্য শুধু একটাই। আমি কতটুকু পাগল তা পরীক্ষা করা। তাছাড়া আমি একজন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তা সুন্দরী মেয়ে। আমি কি যৌবনে উম্মাদনায় প্রেম সাগরের ঢেউয়ে ভাসছি কি না তা পরখ করা।"

ডাক্তার সাহেব মুচকি হেসে বললেন, "পাগল তো কোনদিন নিজেকে পাগল বলে স্বীকার করে না, আর তুমি তোমাকে পাগল বলছ! আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে চার ঘণ্টা সময় দেয়া হল।" আমি আরজ করলাম, স্যার! সময় তো আপনার বাবার নয়, আর একটু বেশি সময় দিলে টাকা পয়সাও খরচ হবে না। আর একটু সময় বাড়িয়ে দেন না স্যার।" ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন, "যাও আগামীকাল সকাল ৭টায় ডায়রী নেব এর মধ্যে যা লিখতে পার লিখ। আমি ডায়েরী খোলার সাথে সাথে নজর পড়ল ঠিকানার উপর। এতে লিখা রয়েছে–

ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল্ হামেদী।

মদীনা মানোয়ারা, সৌদী আরব।

ডাক্তার একজন মুসলমান, সৌদীর নাগরিক ও মদীনার অধিকারী। তা জেনে অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। অনেকে বই-পুস্তকে ও লোকমুখে মদীনার মানুষের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। তাছাড়া আমিও যে কয়বার আরব দেশগুলোতে সফর করেছি, সে কয়বারই

মদীনার মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত ও কর্তাবার্তা হয়েছে। মদীনা ভার্সিটিতেও একাধিকবার গিয়েছি। এতে আমি যা দেখলাম, সৌদীর অন্য সব এলাকা থেকে মদীনার আবহাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা অনেক উন্নত। মদীনার মানুষের চাল-চলনও ভালো। এক কথায় মদীনার মানুষের তুলনা হয় না। এত ভাল মানুষ ওরা। আর এটা মনে হয় এজন্যই হয়েছে যে, এখানে দ্বীনের নবী, সায়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যিন (সাঃ) চির নিদ্রায় শায়িত। মদীনার মানুষ যে ভাল, নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত ও শরীক তা এভাবে প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কুরাইশরা নবীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। অনেক জুলুম-নির্যাতন আর উৎপীড়ন করেছে। এমন কি নিজের জন্মভূমিতে থাকতে দেয়নি ওরা। নবীর সে দুর্দিনে ও মসিবতের সময় একমাত্র মদীনাবাসীরাই আশ্রয় দিয়েছে নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে মক্কা বিজয়ের পরও নবী মদীনা ত্যাগ করেননি। মদীনা ছেড়ে যাননি। ইস্ঃ কত ভাল মানুষ ওরা, কত সৌভাগ্যশালী মদীনাবাসীরা! আজো তিনি মদীনার কোলে ঘুমিয়ে আছেন, আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। নবীর আগমনে মদীনার কীট-পতঙ্গরাও গর্ববোধ করেছিল। ধন্য মদীনা! ধন্য মদীনার মানুষ! তিনি যে সৌদী নাগরিক তা চেহারায়ই ফুটে উঠে। লন্ডনীদের মত তিলাপড়া লাল চামড়া, ফিংগল বর্ণের চোখ, আর পাটের মত ফিরিংগি মার্কা চুল নয় এদের। দেখলেই মনে হয় এ পবিত্র ভূমির মানুষদেরে আল্লাহ্ অনেক মহাব্বত করে নিজ হাতে তৈরি করেছেন।

মদীনার পরিচয় পেয়ে ডাক্তারের প্রতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ি। মদীনার মহাব্বতে আমার দিল কানায় কানায় ভরে গেল। আমার অন্তরের প্রেম-প্রীতি আর সবগুলো ভালবাসা ডাক্তার সাহেব নিয়ে গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল আল্লাহ্ আমাকে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে দুনিয়ার আশ্রয় স্থলে এনে দিয়েছেন। আবার মনে এটাও জাগ্রত হয় যে, আমি যদি বিয়ের প্রস্তাব দেই তবে হয়ত তা প্রত্যাখ্যান করবেন। মদীনার মানুষ আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ। ওরা আযনবী (অনারবী) দের বিয়ে করেন না।

আবার মনে মনে ভাবলাম যে, ইসলামে আরবী-অনারবী, কালো-ধূলোর মাঝে তো কোন ভেদাভেদ নেই। এসব তো বর্বর যুগের কথা। আফ্রিকান গোলাম-বন্দিদেরও আমাদের নবী মহব্বত করেছেন। তিনি যদি সত্যি একজন নিষ্ঠাবান মুমিন হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমার দুঃখ-কষ্ট বুঝবেন। আমাকে আশ্রয় দেবেন। আর যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তার বাসায় আজীবন ঝি-এর করব, তবু আমি আর স্বজাতির কাছে ফিরে যাব না।

কখনো আশার ডানা মেলে বিহঙ্গের ন্যায় আশার দীগন্তে উড়তে থাকি। আবার কখনো নৈরাশ্যের ঝড়ো হাওয়া এসে আমার ডানা দু'টো ভেঙ্গে দেয়। আমি পলক বিহীন বিহঙ্গের ন্যায় উর্ধাকাশ থেকে ভূমি তলে লুটিয়ে পড়ি। আমার হৃদয় পারাবারে আশা-নিরাশার ঢেউ খেলতে লাগল। সূর্য রক্তিম আভা ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। হাসপাতালের ফটকগুলো একটা ছাড়া সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু জরুরি বিভাগ খোলা আছে। ডাক্তার ও নার্সরা চলে যাচ্ছেন নির্জন নিজ বাসায়। আর রাতের ডিউটি যাদের, তারা ইতিমধ্যেই কাজে যোগদান করেছেন।

লন্ডনের দিন-রাতগুলো একই ধরনের। বুঝা খুবই মুশকিল। সার্বক্ষণিক লোকও গাড়ী চলাচল করছে। হাট-বাজার, বেচা-কেনা চলছে। তবে নাইট ক্লাবগুলো একটু

ব্যতিক্রম। ক্লাবগুলো সন্ধ্যার পর পরই সরগরম হয়ে উঠে। চলে নাচ-গান, তাস-দাবা, মদ জুয়ার আড্ডা। তাছাড়া ব্লু ফিল্ম তো চলে অবাধে। সেখানে ভাই-বোন পিতা-মাতার কোন ভেদাভেদ নেই। পরিচিত অপরিচিত নেই। সবাই সমান। যে যাকে চায় সে তাকে পায়।

* সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল। একজন বয়সী নার্স এসে আমাকে খাবার দিয়ে গেল। তাছাড়া অনেক ফল ফ্রুট রেখে চলে গেল, "ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল্-হামেদী আপনার খাবারের জিম্মাদার আমাকে বানিয়ে গেছেন। তাই এগুলো নিয়ে এসেছি। আপনি খানাপিনা, সেরে বিশ্রাম নিন। আমি ৩নং রোমে আছি। রাতের যে কোন সময় প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন।" আমি আপনাদের খেদমতে নিয়োজিত একজন সেবিকা।"

নার্সের গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তাকে দেখামাত্র আমার শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। অবশেষে রাগ হজম করে, খাবার খেয়ে নিলাম। রাত ৮টা। এখনো কিছু লিখা হয়নি। কিছু না লিখলে নয়ই। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে লিখা চাইলেন। তখন অবশ্যই কিছু না কিছু দেখাতে হবে। তানা হয় তিনি রাগ করবেন। আমি ডায়রি উল্টিয়ে প্রথমেই আরবী অক্ষরে "বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" লিখলাম। তারপর হামদ ও সানা লিখে কি লিখব। তা নিয়ে ভাবছি। একটু চিন্তা করে আমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনাবলির মধ্যে ৫টি অধ্যায়ে ভাগ করি। ১ম ইহুদী নাসারাদের মুসলিম নিধনের খসড়া। ২য়, তালেবানদের রাষ্ট্র পরিচালনা নিপুণতা ও দক্ষতা। ৩য় আমী কেন মুসলমান হলাম। ৪র্থ, ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে পিতা-মাতা ও সরকারের নির্যাতনের ফিরিস্তি। ৫ম, ডাক্তার হাসানের চাহনী।

৫টি অধ্যায়ের মধ্য থেকে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত অধ্যায় বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে পূর্বে কিঞ্চিত আলোচনা করেছি। এখন সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ৫ম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। (৪টি অধ্যায় ডাক্তারের ডায়রীতে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখা হয়েছে) লিপির শুরুতেই আমি একজন নবী প্রেমিকের চার লাইন কবিতা দিয়ে শুরু করি।

ঃ মারহাবা আয় বুলবুলে বাগে কুহ্ন।
আযগুলে বয়ান বহুবা মাসখুন ॥
মারহাবা আয় কাছেছে তইয়্যারে মা,
মি দেহি হারদম খবর আয ইয়ারে মা ॥

অর্থাৎ ঃ হে প্রাচীন পুষ্পউদ্যানের বুলবুলি তোমাকে ধন্যবান। পুষ্পেরা তোমার সাথে কি ধরনের প্রেমালাপ করেছে তা আমাকে শুনিয়ে দাও।

হে প্রেমাস্পদের পত্রবাহক বিহঙ্গ! তোমাকে মোবারকবাদ! তুমি আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে কি খবর নিয়ে এসেছ, তা শুনিয়ে আমার বিরহী আত্মাকে সান্ত্বনা দান কর।

ঃ এশকে আঁশুলাস্ত কু চুঁ বর খরুখ্ত।
হারচে জুজ মাশুকে বাকি জুমলা ছুখত॥

অর্থাৎ ঃ প্রেমানলে প্রেমিকে সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। প্রেমাস্পদ ছাড়া সব কিছুকেই জ্বালিয়ে দেয়। গুনাহ্ পর্যন্ত।

অতএব, হে নবীর দেশের প্রেমিক পুরুষ। তুমি তো রাসূলের (সাঃ)-এর দেশ থেকে এদেশে এসেছ। তুমি মদীনার গান শুনিয়ে, রাসূলের নাত শুনিয়ে আমার বিগলিত অন্তরকে সান্ত্বনা দাও। ওগো মদীনার কুঞ্জবনের বুলবুলি! তুমি তো মদীনার শ্যামল খর্জুর

বিথীকায় বিচরণকারী। মদীনার বাগ-বাগিচার সুপক্ক খর্জুর ভক্ষণ করে লালিত-পালিত হয়েছ। ওহে মদীনার পুষ্পকাননের গায়ক পাখী! তুমি তো প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভিত পরিবেশে জীবনে বহু সময় অতিবাহিত করেছ। সুমিষ্টি মধু পান করে মন-মাতানো সুরে গান গেয়েছ। ওগো মদীনার পান্থশালার নবাগত মেহমান! তুমি তো মদীনার অলিতে-গলিতে পথে-প্রান্তরে ও চারণভূমিতে বিচরণ করেছ। আর সে ধুলোবালি তোমার পদযুগলে লেগে ধন্য হয়েছে। ওরে ও মদীনার গায়ের দুলাল! তুমি তোম মদীনার পর্বতমালা গা বেয়ে পথ চলেছ, আর তৃষ্ণার্থ হয়ে নির্ঝরিণীর সুশীতল বারি পান করে মহা সৌভাগ্যশালী হয়েছ। তুমি তো সে মদীনার রাখাল ছেলে, যেথায় নবীজী ঘুমিয়ে আছেন। ওহে পথ ভুলো কোন সে রত্ন কুড়াতে এলে এ পাপীষ্ঠের দেশে? তুমি তো আমার রাসূলের দেশের সন্তান! তোমার দাম আর তোমার কদর অনেক বেশি। তোমার গায়ে তো রওজায়ে আতহারের স্নিগ্ধ হাওয়া লেগেছে। তোমার দু'টি চোখ কতইনা সৌভাগ্যশালী, যে চোখে জীবনে বহুবার রওজায়ে আতহার দর্শন করেছে। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা অনেক নবী প্রেমিকদের অবলোকন করেছে। তোমার আখিযুগলে সহস্রবার চুমু খাচ্ছি। আরো বেশি! তোমার পদযুগলে জানাই লাখো সালাম, লাখো সালাম।

হে নবীর দেশের পরশমণি! আমি তোমার এক হতভাগিনী, অনাথিনী, দুঃখিনী নওমুসলিম বোন! আমার নির্যাতনের সামান্য কাহিনী তোমাকে একটু আগে অবগত করলাম। আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়াতে আমার আর কোন আশ্রয়দাতা নেই। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা ভাই-বোন ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। যিশুখ্রিস্টকে ত্যাগ করে নবী মোহাম্মদে আরাবী (সাঃ)-এর আঁচল ধরেছি। এক আল্লাহ্কে আমার হৃদয় মন্দিরে স্থান দিয়েছি। এখন তোমরাই আমার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজন। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থিনী। অতএব আমাকে আশ্রয় দান কর। তোমার দুয়ারে আমি আশ্রয় ভিখারিণী! অতএব আমাকে তোমার হৃদয়ে একটু জায়গা দাও!

হে আরব দুলাল! তোমাদের নাকি আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশি। তোমরা নাকি আযনবীদেরকে মানুষ হিসাবে গণ্য কর না। এটা যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয়ে থাকে, তবে আমার কোন কথা নেই। আর যদি এটা বর্বর যুগের কোন প্রথা হয়ে থাকে, তবে তা পরিহার করে নবীর সুন্নতের অনুসারী হও।

ওহে মদীনাওয়ারা! আমাকে যদি তোমার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ না কর, তবে তোমার বাসার একজন চাকরানী হিসাবেই কবুল কর। তোমার খেদমত করে, দ্বীনের উপর কায়েম থেকে যেন নবীর দেশে চিরনিদ্রায় শায়িত হতে পারি সে সুযোগটুকু করে দাও।

হে প্রিয়তম হাসান! আমি তোমার কাছে ভাল নাও লাগতে পারি, কিন্তু তুমি আমার ভালবাসা! তুমি আমার আলোর আশা।

মায়নেতুম্পর আশেক হোকার জিন্দেগী বরবাদ কি, তু হামারে হু ইয়া না হু, মায় তুমহারে হুগাই।

অর্থাৎ ঃ আমি তোমার উপর আশেক হয়ে গেছি। তুমি আমার জন্য হও চাই না হও, আমি তোমার জন্য হয়ে গেছি।

প্রিয়তম! দুঃখের রজনী প্রভাত হয়ে গেছে। প্রভাত সমীরণ রবির আগমনী বার্তা নিয়ে দিক-দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। শিশির ভেজা বৃক্ষশাখে বিহঙ্গেরা মনমাতানো কলকাকলিতে

মাতিয়ে তুলছে। কিন্তু দুঃখিনীর দুঃখের কথা লেখা হল না। অনেক কথা না লেখাই রয়ে গেল।

প্রিয়তম! যতদিন দূর আকাশে তারারা মিটমিট আলো দিবে, পাখীরা গান গাইবে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করবে, পাহাড়গুলো থেকে ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে, বাতাস বইবে, গাছেরা ছায়া দান করবে, মেঘমালারা বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ততদিন প্রেম সাগরের ঢেউ শান্ত হবে না।

প্রিয়তম! আমার দিলের গোপন কথাগুলো গোপনই রয়ে গেল। প্রেমের দুয়ার তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। প্রবেশাধিকার দিয়েছি। বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে, বিনা বাধায় প্রবেশ করে গোপনকথাগুলো জেনে নাও। তবে একটি কথা শেষভারের মত বলতে চাই, মজনু কুকুরের পায়ে চুমু খেয়েছিল এজন্য যে, কুকুরের পায়ে তার প্রেমাস্পদের পায়ের ধুলা লেগে ছিল। আর আমি তোমাকে ভালবাসি এজন্য যে, তোমার পায়েও আমার মাহবুবের পদধূলি লেগেছে। আমার প্রেমাস্পদের শহরেই তোমার বাড়ী। তুমি সে শহরের বাসিন্দা, যে শহরে আমার মাহবুব মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সময় ফুরিয়ে গেছে, আর লেখা হল না।

ইতি
তোমার ইয়োভনি রিডলি
লন্ডন।

আমি ডায়রিটা শিয়রে কাছে রেখে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নামাযের অভিনয় করলাম। যদিও সূরা কেরাত, মাসআলা-মাসায়েল শেখার সুযোগ এখনো পাইনি। তবু রাহমানুর রাহীমের কুদরতী পদযুগলে মস্তক ছুয়ে প্রার্থনা করলাম। এটাই আমার জীবনের প্রথম নামায সূরা-কেরাত বিহীন নামায।

সত্যকথা বলতে কি! আমি জীবনের বহু সময় গীর্জায় কাটিয়েছি, উপাসনা করেছি। কিন্তু নিরাকার প্রভুর উপাসনা বা অর্চনার মাঝে যে স্বস্তি, যে মজা, যে তৃপ্তি পেয়েছি, যা জীবনে কোনদিন উপভোগ করা তো দূরে কথা, তা কল্পনাও করিনি। তখন সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারলাম, কোন সত্ত্বার আহবানে, কোন প্রেমের জাগরণে মুসলমানগণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাযে তন্ময় হয়ে থাকে। আহঃ কি মজা! কি স্বস্তি!

নামায সমাপন করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করতে করতে সকাল ৮টা বেজে গেল। চেয়ে দেখি, ভোরের নাস্তা টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কে বা কারা কখন এসব দিয়ে গেল, তা টেরই পাইনি।

নাস্তা খাওয়া শেষ হতে না হতেই ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল্ হামেদী সাহেব ওয়ার্ডে এসে গেলেন। রোগীদের এক নজর দেখে সরাসরি আমার রুমে এসে কেদারাটি টেনে আসন গেড়ে বসলেন। আমি সালাম দিয়ে কিছু ফলফ্রুট এনে সামনে দিয়ে আরজ করলাম, এগুলো খেয়ে নিন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "এগুলো তোমার জন্য দেয়া হয়েছে।" আমি বললাম, আমি খেয়েছি। এগুলো আপনার জন্য রেখেছি। ডাক্তার সাহেব আবার বললেন, "এটা আবার কেমন পাগল! সবইতো বুঝে। জাতে মাতাল, তালে ঠিক।

ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে হাসি ব্রেক ফেল করে বেরিয়ে এল। আমার হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে কক্ষটি গুলজার করে দিল। এবারও ডাক্তার হাসলেন। তিনি নাস্তা খেয়ে

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে প্রথম দিকে সামান্য কিছু পড়লেন। তারপর শেষের ঠিকানা দেখে বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-

ডাক্তার ঃ আপনি কি বিশ্ব নন্দিত গোয়েন্দা, ইয়োভনি রিডলি? আপনি কি সাংবাদিকতার কারণে বৃটিশ গভর্নমেন্টের নভেল পুরস্কার প্রাপ্ত রিডলি? আপনি কি পত্র-পত্রিকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই ব্যক্তি, যাকে তালেবান সরকার গোয়েন্দা মনে করে আটক করেছিল? আপনি কি এ যুগের কিংবদন্তির সে মহানায়ক, যাকে নিয়ে পৃথিবীতে এত হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে?

রিডলি ঃ আসলে আমি এতকিছু নই। তবে যা বলছেন, আমিই সে হতভাগিনী ইয়োভনি রিডলি। আমার মুসলিম নাম রুকাইয়্যা।

ডাক্তার ঃ পত্র-পত্রিকায় আপনার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক সংবাদ ছাপা হয়েছে। আমি নিয়মিত তা পড়েছি এবং তপ্ত রুধির ধারায় দাঁড়ি সিক্ত করেছি। আজ আপনাকে স্বচক্ষে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

রিডলি ঃ আমিও আজ মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, আমি আজ আপনার রোগী হতে পেরেছি। চিরদিন যদি রোগী হয়ে আপনার চিকিৎসাধীন থাকতে পারতাম। আহঃ কত মজা হত।

ডাক্তার ঃ আপনার পিতা কি সত্যি আপনাকে বিকারগ্রস্থ মনে করে এখানে চিকিৎসার জন্য এনেছেন, না অন্য কিছুর জন্যে? এতে আপনার ধারণা কি?

রিডলি ঃ আমার পিতা মিস্টার ডনপল একজন বড় মাপের পাদ্রী। আমি মুসলমান হওয়াতে বিশ্বব্যাপী যে সাড়া পড়েছে, এতে মিস্টারের জনপ্রিয়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। নানা জনের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। শত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মিস্টারের গ্লানি ঢাকার জন্য ইদানিং বলাবলি করতে শুনেছি যে, যার তার কাছে বলে বেড়াচ্ছেন আমার চাঁদের মত পরমা সুন্দরী মেয়ে পাগল হয়ে গেছে। ইস, কত ধার্মিক ছিল সে। আজ পাগল হয়ে কত আজে বাজে কথা বলে! এবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবে এবং দেশব্যাপী খ্রিস্টনাদের বলে দিবে রিডলির চিকিৎসা করেও কোন উন্নতি বা পরিবর্তন হয়নি। আমার উক্তি শুনে তিনি মনে মনে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর আরজ করলাম, হুজুর! আমার লিখাগুলোতে দয়া করে একটু চোখ বুলান। এতে আরো কিছু পাবেন।

ডাক্তার ঃ দেখলাম তো কয়েক পৃষ্ঠা।

রিডলি ঃ না স্যার! সবটুকু পড়তে হবে গভীর মনোযোগের সাথে। তা না হয় চিকিৎসা করবেন কি করে?

এবার ডাক্তার পড়তে লাগলেন। ডাক্তারের অন্তর দলিত মথিত করে একটু পরপরই বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। ৫ম অধ্যায়ে গিয়ে দু'নয়ন বয়ে যাচ্ছে অশ্রুর বন্যায়। পকেট থেকে রুমাল বের করে বার বারই মুছতে লাগলেন অক্ষি পল্লব। আমি আমার আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম বেলকুনিতে। আরো নিরিবিলি পড়ার সুযোগ করে দিলাম।

স্মরণীয় অধ্যায়গুলো পাঠ করে নীরব নিথর হয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। নির্বাক আসনে বসে বসে কি যেন ভাবছেন। আমি আবার রুমে ঢুকে নিজ আসন দখল করে বসলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, "তোমার কাকুতি-মিনতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে বাকি নেই। কোন কথাই গোপন করনি। এখন আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিতে পারি।

যদি তা পালন কর, তবে হয়ত তোমার অভিপ্রায়ের জন্য অনেকটা সহায়ক হবে। আমি বললাম, যে কোন তকলিফ মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। বলুন কি করতে হবে? ডাক্তার বললেন, আমি তোমাকে পাগল হিসেবে সার্টিফাই করে দেব। তোমার পিতাকে বলে দেব আপনার মেয়ে আর ভাল হবে না। তাকে বাড়ী নিয়ে যান। তারপর এটাও বলব, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে তার বাকশক্তি রহিত করে দিতে পারি। এতে তোমার পিতা অনায়াসে রাজি হবে। তোমাকে কৃত্রিম ঔষধ সেবন করানোর পর ১ দেড়মাস কারো কাছে কিছু বলবে না। এর মধ্যে সকলেই যেন তোমাকে পাগল বা বোবা ভাবতে শুরু করে। দেড়মাস পর আবার তুমি হাসপাতালে আসবে, তখন সামনে কি করা যায়, পরামর্শ দেব। এতে আমি রাজী হলাম।

বিকাল ৪টায় আমার পিতা মিস্টার ডনপল আমার খবর নিতে হাসপাতালে এলেন। ডাক্তারের ডিউটি শেষে বিদায়ের পালা। মিস্টারকে দেখে ডাক্তার সাহেব অফিসে বসলেন।

ডনপল ঃ রোগীর অবস্থা কি?

ডাক্তার ঃ রোগীর অবস্থা জানার আগে বলুন, এর আগে এমন অবস্থা আরো দেখেছেন কি না? বা আপনার বংশে এ ধরনের কেউ পাগল ছিল কি-না?

ডনপল ঃ এর আগে কোনদিন তাকে এমন দেখিনি। সে ধর্মপরায়ণ একজন মহিয়সী মেয়ে ছিল। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে সুনামের সাথে কাজ করেছে সে। তারপর বস্তুনিষ্ঠা সাংবাদিকতায় কাজ করেছে। সাংবাদিকতার সুবাদে সে আফগানিস্তান গিয়েছিল। সেখান থেকে পাগল হয়ে দেশে ফিরেছে। এখন যেসব কথাবার্তা বলে সবই ধর্মদ্রোহী। খ্রিস্টজগতে আমার যে খ্যাতি ছিল, সবই সে বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

ডাক্তার ঃ আপনার সুনাম ও সুখ্যাতি বিনষ্ট হওয়ার কি আছে? পাগলের কোন কথার কি কোন ধর্তব্য আছে? কেন আপনার ভক্তরা একটি পাগলী মেয়ের কথায় আপনার উপর খারাপ ধারণা পোষণ করবে? আপনার মেয়ের খুবই সিরিয়াস অবস্থা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা করার সবই করেছি। যে কয়দিন দুনিয়াতে থাকবে, পাগলামীই করে যাবে। আপনি হয়ত ভাবছেন মেয়েটি ধর্মদ্রোহী, আসলে তা নয়। ব্রেইন খারাপের কারণেই এসব করে থাকে। তবে আপনার অনুমতি পেলে একটি ইনজেকশন পুশ করতে পারি। এতে কথা-বার্তা গালা-গালি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কখনো কথা বলতে পারবে না।

মিস্টার ডনপল আচ্ছা, তাকে একটু দেখতে পারি?

ঃ হাঁ, পারবেন না কেন? চলুন। উভয়ে রিডলির রুমের প্রায় কাছাকাছি গেলে শুনতে পেলেন গুনগুন করে আল্লাহ্‌র নামের যিকির করছে। মিস্টার ডনপল যিকিরের আওয়াজ শুনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল, ডাক্তার সাহেব! এ মেয়েকে আর আমি ঘরে তুলছি না। ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে মেরে ফেলুন। পাগল হয়ে সে অন্য কোন নাম যপ্‌ করতে পারে না? এ নাম কেন? আমার জাতিকুল সব বিনষ্ট করেছে। একে মেরে ফেলুন, একে ঘরে উঠালে প্রভু যিশুর অভিশাপ লাগবে। একে মেরে ফেললে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত হবে।

ডাক্তার ঃ একে ইনজেকশনের মাধ্যমে মূক করে দেই, নিয়ে যান।

মিস্টার ডনপল ঃ না, অযথা ঝামেলা পোহায়ে লাভ নেই। একে মূক বানিয়ে পাগলাগারদে রেখে দিন।

ডাক্তার ঃ পাগলা গারদে তিন মাসের অধিক রাখার নিয়ম নেই। তিন মিস অতিবাহিত হলে অভিভাবকের ডেকে দিয়ে দেই।

মিস্টার ডনপল ঃ তিনমাস অতিবাহিত হলে আমাকে ডাকার দরকার নেই। ওকে রাস্তায় বের করে দিবেন। যথায় তথায় ঘুরে বেড়াক গে। এর ধার আমি ধারব না। এই বলে মিস্টার ডনপল রিডলিকে অভিশাপ দিতে দিতে হাসপাতাল ত্যাগ করলেন।

হাসপাতালের নির্জন কুটিরে কেটে গেল আরো তিন দিন। এর মধ্যে ডাক্তার সাহেব বললেন, রিডলি! তুমি আমার বোন, তোমার ইজ্জতের হেফাজত করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। তুমি এখানে অবস্থান করতে থাক, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর যে তোমাকে আদর সোহাগ দিয়ে রাখতে পারবে এবং তোমার ইজ্জতের হেফাজত করতে পারবে এমন এক ব্যক্তি তালাশ করে তার হাতে তোমাকে সঁপে দেব।

ডাক্তারের কথাগুলো আমার অন্তরে বিষমাখা শেলের ন্যায় আঘাত হেনে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। আমার আঁখিযুগলের অশ্রুগুলো পদ্মা-মেঘনা, যমুনার স্রোতের মত বইতে লাগল। ওড়না, কামিজ, সেলোয়ার প্লাবিত হল। মস্তক ভারী হয়ে গেল, উত্তোলন করতে পারছি না। বক্ষদেশ ফেটে চৌচির হতে লাগল। কিন্তু মদীনা ওয়ালার ভালবাসা থেকে হৃদয়কে এক সেন্টিমিটার সরিয়ে আনতে পারছি না। চোখ দু'টিতে নেমে এল আমানিশার অন্ধকার। হাত পা অবশ হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম।

ডাক্তার আমার অবস্থা বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "রিডলি! তুমি বিচলিত হয়ো না। তোমার ভালবাসা যে আমার অন্তরে নেই তা নয়। আমি তোমাকে আমার দিলের আড়াল করতে পারছি না। শয়নে-স্বপনে তোমার সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত চেহারাখানা লুকোচুরি খেলতে থাকে। তোমাকে ভাবতে গিয়ে গভীর রাতে কতবার যে হারিয়ে যাই নিরুদ্দেশে তার খবর তুমি রাখ না। তোমার তুলতুলে নরম হাতের লিখাগুলো ক্ষণে ক্ষণে ডায়রী উল্টিয়ে অবলোকন করে অশান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করি। অবুঝ মনকে বুঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভয় হয় তুমি একজন পরমা সুন্দরী ও উচ্চ বংশীয়া পাদ্রীর মেয়ে। তোমাকে কি আমি যথাযথ মর্যাদা দিতে পারব? তাছাড়া সামাজিকতারও একটি ব্যাপার আছে। তা না হয় মন চায় তোমার মত সুশ্রী, বুদ্ধিমতি, শিক্ষিতা এবং কলুষমুক্ত মেয়েকে নিয়ে সুখের সংসার রচনা করি। ইসলাম গ্রহণ করার পরে তার অতীত জীবনের কৃত অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। অতএব তুমি এখন মাসুম। তোমার মত মেয়েকে আপন করে নেয়া বা কাছে পাওয়া কতই না সৌভাগ্যের কথা। তারপরও ভয় পাছে লোকে কিছু বলে। ডাক্তার সাহেব যে আমার প্রতি অনুরাগী, তাঁর ভিতরে যে লুকায়িত প্রেম উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তা তার কথায় বুঝতে পেরে আমার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠল। নৈরাশ্যের দিগন্তে এক ফালি রূপালী চাঁদ উদিত হল। হৃদয়ে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিল। খুশির আতিশর্যে চোখের বারিবিন্দুগুলো মুক্তোর দানার মত টপ্ চট্ করে ঝরছিল। মনে হচ্ছিল যেন মেঘলা দিনে রবির ঝলক। আমার চোখে ভাসছিল সোনার মদীনার সবুজ-শ্যামল, খর্জুর বিথিকা। ভাসছিল যে পথ দিয়ে প্রিয় নবী হাঁটা-চলা করছেন। যে চারণভূমিতে তিনি মেষ চড়িয়েছেন। আমার চোখে কেবলই ভাসছিল, গিরী, পর্বত, নির্ঝরিণী আর ফল্গুধারা। দেখছিলাম বদর, ওহুদ, হুনাইন ও ইয়ারমূকের রক্ত রাঙ্গা প্রান্তর। যেখানে আমার নবীজী কাফের বেঈমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখছিলাম জান্নাতুল বাকীর বক্ষে শায়িত আমার প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর রওজা মোবারক। আমি বললাম, প্রিয়তম! মদীনা আমার ভালবাসা। আমাকে আপনার বাঁদী হিসাবে গ্রহণ করে মদীনায় থাকতে দিন। আমার পেয়ারা নবীজী সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

ডাক্তার ঃ যাও রিডলি, আমি তোমাকে কথা দিলাম। স্ত্রী হিসাবে তোমাকে আমি বরণ করে নেব।"

ডাক্তার চলে গেলেন আপন কাজে। আমি বসে বসে গাইছিলাম-

ঃ তেরে আগিয়ার কু দিলছে হটা কার-

তেরে দরছে লাগা মুজকু খোদা ইয়া!

অর্থাৎ ঃ আমার অন্তর থেকে সমস্ত গায়রুল্লা অপসারণ করে তোমার প্রতি আমার অন্তরকে লাগিয়ে দাও।

ঃ না আমরিকি না লন্দন ছে হু উলফত

হামে মস্তে মদীনা কার খোদাইয়া।

অর্থাৎ ঃ আমেরিকা আর লন্ডনের প্রতি যেন ভালবাসা না থাকে। মদীনার ভালবাসা দিয়ে আমার অন্তর ভরে দাও।

ঃ বুজুর্গীয় কি নেহি মুজকু জরুরত,

হামে মস্তে মদীনা কার খোদাইয়া।

অর্থাৎ ঃ বুজুর্গীর দরকার আমার নেই।

আমাকে মদীনার পাগল বানিয়ে দাও।

এসব বিলাপ গাঁথা পাঠ করে দিলকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি এক সিস্টার পত্রিকা নিয়ে আমার ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক'দিন হল পত্রিকা দেখার কথা মনে ছিল না। তাই আমার পত্রিকা পড়ার ইচ্ছা জাগল। আমি ডেকে বললাম, আপা! পত্রিকাটা একটু দেখা যাবে কি? তিনি আমার দিকে চেহারা ঘুরিয়ে বাঁকা চোখের একটি চাহনী নিক্ষেপ করে বললেন, "পাগল মানুষ আবার পত্রিকা পড়ে নাকি? নাও দেখে অফিসে পৌঁছে দিও।

আমি পত্রিকাটি হাতে নিয়ে আন্তর্জাতিক খবরের হেড লাইনগুলো দেখছিলাম। বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা জানছিলাম। হঠাৎ একটি কলামে চোখ পড়তে দেখলাম বৃটিশ সরকার আমার ১৫ লক্ষ ডলার (ব্যাংকে গচ্ছিত) বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে সরকারি তহবিলে নিয়ে নিয়েছে। আমি ধৈর্যের সাথে উচ্চারণ করলাম, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" আমার জীবনের অর্জিত সম্পদ যা আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে অর্থাৎ, চাকুরী করে অর্জন করেছিলাম। আজ এ অর্থকড়িও বৃটিশ সরকারের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি।

প্রাথমিক অবস্থায় অন্তরে একটি ধাক্কা লেগেছিল ঠিক! পরক্ষণেই একটি কথা হৃদয়ে উদয় হয়ে অনাবিল শান্তিতে ভরে গেল হৃদয়ের কানায় কানায়। তা হল, যদিও অর্থগুলো আমার চাকুরীর বেতন হিসাবে হস্তগত হয়েছিল আসলে এগুলো আমার জন্য বিলকুল হালাল নয়। কারণ, তালেবানদের সংসর্গে আমার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছিলাম। ইসলামের বিপক্ষে কাজ করে অর্থ সঞ্চয় করা কিছুতেই হালাল হতে পারে না। হারাম উপার্জন হারামী নিয়ে গেছে। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। এটা আমার জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। তাই পুলকিত মনে আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করলাম।

এখন আমি রিক্ত, এখন আমি নিঃস্ব। এর আগে মনটা ছুটে যেত একাউন্টের দিকে। এখন আমার মনটা ছুটে যায় এক আল্লাহ্‌র দিকে। আগে কিছুটা ভরসা ছিল অর্থের উপর।

এখন আমার ভরসা স্থল একমাত্র আল্লাহ্। আহঃ কত যে মজার ব্যাপার তা কোন ভাষায় প্রকাশ করব? সে ভাষা আমার হৃদয়ে অনুপস্থিত।

ডিউটি সেরে ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন তার নৈশকালীন চেম্বারে। ফিরবেন পরদিন ৮ টায়। এর আগে আর তার সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ নেই। রাত আনুমানিক ৮ টা। রাতের খানা এখনো খাওয়া হয়নি। ভেবে ছিলাম হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ নামাযের অভিনয় করে, খানা খেয়ে বিশ্রামে যাব। তা আর ভাগ্যে হল না। ৬ জন পুলিশ এসে আমাকে জোরপূর্বক ওয়ার্ড থেকে বের করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল। নেয়ার পথে জালেম পুলিশরা আমার চোখ দু'টি মজবুত করে বেঁধে ফেলে। দুনিয়ার কিছু দেখা আমার আর ভাগ্যে হল না।

তিন ঘণ্টা পর অর্থাৎ, রাত ১১টায় আমাকে গাড়ী থেকে নামানো হল। মনে হল এটা হয়ত পাতালপুরীর কোন সুরঙ্গ পথ। স্থানটি যদিও চিনছিলাম না, তবু পরিচিত পরিচিত বলে মনে হল। মনে হয় এমন একটি স্থানে অফিসিয়াল কাজ নিয়ে একাধিকবার এসেছি। কেন আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হল তার কারণ কিছুই জানতে পারিনি। এতটুকু বুঝলাম, আমার ঈমানী পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। ইন্টার ভিউ এখনো বাকি আছে। তাদের মতি-গতি দেখে চিন্তা করলাম, এখনো আমি তাদের কাছে মুখ খুলিনি। আর ওরাও কোন প্রশ্ন করেনি। এমতাবস্থায় আমাকে আমি তাদের কাছে মানসিক রোগী হিসাবে প্রকাশ করব। তা হলে একদিন না একদিন হতে পারে আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল হামেদীর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে। তখন প্রেমাস্পদের সাথে আবার সাক্ষাৎ হতে পারে। আমি তাই করলাম।

পাতালপুরীর অজানা আস্তানায় ঢুকিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হল। আমি পাগল ও মূকের ভান ধরে কখনো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আবার কখনো অন্যপন্থায় পাগলামী করতে লাগলাম। মানবরূপী পশুরা নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। আমি অবশেষে কান্নার পথ বেছে নিলাম। কান্নাটাই ছিল মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হৃদয়ের কাকুতি। প্রহারে প্রহারে আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। তার পরও আমার যবান থেকে একটি শব্দও বের করতে পারেনি ওরা। অবশেষে একে অপরকে বলতে লাগল, "আসলে মেয়েটি পাগল, তা না হলে মিথ্যা হলেও কিছু বলত।" অন্য একজন বলল, "ওর আব্বার কাছে শুনেছি ডাক্তার নাকি তাকে ইনজেকশনের মাধ্যমে যবান বন্ধ করে দিয়েছে।" অপর একজন বলল, "পাগলকে মেরে লাভ কি? ওর দ্বারা আমাদের কি ক্ষতি হবে? প্রভু যিশুর বদনাম করেছিল বলেই এখন পাগল আর বোবা হয়ে গেছে।

এসব বলাবলির পরও ওরা আমাকে একটি লোহার খাঁচার ভিতর ভরে দিল। খাঁচাটি এতই সংকীর্ণ ছিল যে, সোজা হয়ে বসতে পারতাম না। পা দুটো সোজা করা যেত না। চারিদিকে ছিল সূঁচের মত শলাকা। একটু নড়া চড়া করতেই ফুঁটো করে দেয়। শলাকাগুলো ছিল বিষাক্ত। সামান্য একটু খোঁচা লাগলেই মরণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যেত। পাষণ্ডরা আমাকে খাঁচায় পুরে ঘরে তালা ঝুলিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আলো বাতাসহীন পাতালপুরীর জাহান্নামের সংকীর্ণ কুটিরে ঈমানী পরীক্ষার শীট দেয়া হল আমার।

এ কঠিন পরীক্ষায় পাশ করা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। কুঁজো হয়ে বসে থাকা যে এত কষ্ট এর আগে কোনদিন তা ভাবতেও পারিনি। এ চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার

জন্য হল সুপার মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য প্রার্থী হলাম। তাঁর পবিত্র নামের যিকিরকে আমার মুক্তির আমিনা বানিয়ে নিলাম। আফগানিস্তানে অবস্থানকালীন সময়ে দেখেছি, তালিবানরা চলতে ফিরতে হস্তে স্থাপন মালার দানাগুলো একটি একটি টানছে। মুখে বিড়বিড় করে কি যেন জপ্ করছে। আমি প্রশ্ন করলে একজন অল্প বয়স্ক তালেবান বললেন, আমরা আল্লাহ্র পবিত্র নামের তাস্‌বীহ্ পাঠ করছি। এতে রয়েছে দিলের প্রশান্তি। এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা, অশ্লীল, বেহুদা কথাবার্তা, গীবত শেখায়েত থেকে বাঁচা যায় এবং আল্লাহ্ বড় খুশী হন।

তাই আমিও আল্লাহ্, আল্লাহ্ যিকির করছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঈমানের পরীক্ষার হল ছিল নমরুদ নির্মিত অগ্নিকুণ্ড। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর হল ছিল সমুদ্রের তলদেশের মাছের উদরে। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর হল ছিল বৃক্ষের অভ্যন্তরে। মহানবীর পরীক্ষার হল ছিল অহুদ, বদর, খন্দক, হুনাইন ও আরও অনেক খানে। এক কথায় সারাটি জীবনই ছিল পরীক্ষার হল। আমার জীবনে ঈমানের পরীক্ষা আসবে না তা হতেই পারে না। ঈমানের পরীক্ষা আসবে। এতে পাশও হতে হবে। পরীক্ষা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসবে। তাই আমিও আল্লাহ্কে নিয়েই থাকব। এক পলক সময় আল্লাহ্ ছাড়া থাকতে চাই না। এজন্যই বেশি বেশি আল্লাহ্কে স্মরণ করতে লাগলাম।

আলো-বাতাস মুক্ত সংকীর্ণ কুঠরীতে স্থির অবস্থায় থাকা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। অনিদ্রা, অনাহারে জীবন যায় যায় অবস্থা। পানির পিপাসায় সব শুকিয়ে আসছে। প্রাণবায়ু বের হওয়ার রাস্তা খুঁজছে। বার বার মনের আঙ্গিনায় উঁকি দিচ্ছিল অতীতের দিনগুলোর কথা। জীবনে কত আরাম-আয়েশ ভোগ করেছি। কত নাজ-নেয়ামত ভক্ষণ করেছি। জীবনে কত শত গ্যালন পানি পান করেছি এগুলোর শোকর তো কোনদিন আদায় করিনি। এক আঁজলা পানির বিনিময়ে তামাম জাঁহান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মাধ্যমে দলিল করে দিতে প্রস্তুত। একগ্লাস পানির বিনিময়ে বাকী জীবন তার দাসত্ব করতে তৈয়ার। তাহলে অতীত নেয়ামতের তো শোকর আদায় করলাম না। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে কি জবাব দেব?" এসব কিছু চিন্তা করে যিকিরের ফাঁকে ফাঁকে ইসতিগফার, শোকর ও নবীর উপর সালাম পাঠাতে লাগলাম।

* * *

ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল হামেদী পরদিন ভোরে হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারলেন, কর্মরত অফিসারকে রিডলির ওয়ারেন্ট দেখিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযোগ আনা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহীতার বাদী স্বয়ং বৃটিশ সরকার। আর ধর্মদ্রোহীতার বাদী তার পিতা মিস্টার ডনপল।

ডাক্তার সাহেব রিডলির আকস্মিক গ্রেপ্তারে খুবই চিন্তিত ও মর্মাহত হলেন। একজন ইসলাম অনুরাগী ও নবীপ্রেমিক মেয়েকে এভাবে নির্যাতন আর উৎপীড়ন করা কিভাবে পাষণ্ডদের পক্ষে সম্ভব হল, তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে রিডলির মুক্তির জন্য চিন্তা করতে গিয়ে ভাবলেন, প্রথমে তাকে খুঁজে বের করতে হবে, সে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, তা জানতে হবে। তারপর মুক্তির রাস্তা বের করতে হবে। তাই তিনি বিভিন্ন থানায়, জেলখানায় খোঁজ নিতে লাগলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কোন তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি। অবশেষে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত দিয়ে

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা দেখতে লাগলেন। বিভিন্ন দেশের সংবাদ শুনতে লাগলেন, সন্দেহমূলক স্থানে তালাশ করেও কোন হদিস মেলেনি।

ভোরে কর্মরত জল্লাদ বাহিনীর জুয়ানরা ৭টার দিকে পাতাল পুরীর নির্যাতন কক্ষে দিয়ে দেখে কয়েদী রিডলি কুঁজো অবস্থায় বসে আছে। দু'এক জায়গায় সামান্য রক্ত লেগে আছে। তাছাড়া শরীরের অন্য কেথাও একটু আঁচড়ের চিহ্নটুকু নেই। এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। যে সেল থেকে কোন দিন জ্যান্ত মানুষ বের হয়নি। যে সেল থেকে এ পর্যন্ত কত শত মানুষ লাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। একজন কর্মকর্তা আমাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। অনেক ভয়-ভীতি দেখাল। এতেও মুখ খুলিনি। অতঃপর আমাকে পিঞ্জিরা থেকে বের করে উপর্যুপরি লাথি, কিল, ঘুষি ও থাপ্পড় দিতে লাগল। তারপরও কান্না ছাড়া আমার থেকে অন্য কিছু পেল না।

সকাল ৯টায় আমার চোখ ও হাত পা বেঁধে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেল। আনুমানিক দু'ঘণ্টা গাড়ী চলার পর কোথায় জানি গাড়ী থামাল। দু'জনে আমার দু'বাহু ঝাপটে ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে অন্য এক স্থানে নেয়া হল এবং চোখের বাঁধন খুলে দিল। দীর্ঘক্ষণ চোখ বাঁধা থাকার কারণে ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। কতক্ষণ পর দেখলাম, এটাও একটা নির্যাতনের কক্ষ।

আমার শরীর কাঁপছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। শরীর ফুলে গিয়েছিল। ক্ষুধা ও পিপাসায় প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। জিব চুষে তাদেরকে দেখানোর পরও একফোটা পানি আমাকে পান করতে দেয়া হয়নি। মানুষ ক্ষুধার্ত কুকুর-বিড়ালকেও দু'এক টুকরা রুটি দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব পাষণ্ড লোকেরা এক টুকরো রুটিও আমার দিকে নিক্ষেপ করেনি।

আমার সার্বিক রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে জানানো হল। এস,পি আরো দু'জন এ,এস,পিকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন। এস,পি ছিলেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। মুসলমানদের প্রতি ছিল বেশ সহানুভূতিশীল। খ্রিস্টান হলেও তার মধ্যে ছিল মনুষ্যত্ব। তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি দয়া, অনুগ্রহ, বিচক্ষণতা ও মায়া-মমতা। তিনি আমার জিন্দানখানায় প্রবেশ করে বিস্ফারিত লোচনে আমাকে দেখলেন। মনে হয় প্রথম দর্শনেই আমার সার্বিক অবস্থা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে ভুল করেননি। তিনি যেমন গোপনে আমার অভিব্যক্তি জেনে নিয়েছেন। এভাবে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করার পর অন্যসব লোকজনকে কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে তিনি স্বস্নেহে আমাকে কাছে ডাকলেন। গায়েব থেকে কে যেন আমাকে ডেকে বলছে, "হে রিডলি! তোমার জীবনের সুবহে সাদেক প্রকাশ পেয়েছে। একটু পরেই ভোরের রবী রক্তিম থালার মত তোমার কাছে প্রকাশ পাবে। তোমার দুখের আমানিশার অবসান ঘটেছে। তুমি যার কাছে স্বকাতরে প্রার্থনা করেছিলে, তিনিই তোমার দুশমনকে হিতৈষী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। তুমি মুখ খুলে কথা বল।" আমি এস,পির ডাকে সাড়া দিয়ে খুব কষ্ট করে কয়েক কদম এগিয়ে এলাম। এবার তিনি স্নেহমিশ্রিত সুরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

রিডলি! মনে হচ্ছে তুমি পিপাসায় খুব কাতর। এই বলে তিনি একজন অফিসারকে ডেকে কিছু খাবার ও পানীয় আনতে নির্দেশ দিলেন। অফিসার অল্পক্ষণের মধ্যেই খানা এনে হাজির করলেন। আমি হাত-মুখ ধুয়ে উদর পূর্ণ করে আহার করলাম এবং আল্লাহ্‌র

দরবারে শোকর আদায় করলাম। অতঃপর এস,পি সাহেব পিতৃসুলভ স্নেহে খুবই মিষ্টিসুরে বললেন, "রিডলি! আমি তোমার লৌকিকতা, কৃত্রিমতা ধরতে পেরেছি। তুমি আমাকে তোমার মুক্তিদাতা হিসাবে মনে করতে পার। আশা করি এর ব্যতিক্রম হবে না। বল হৃদয় খুলে বল, নির্ভয়ে বল, এত নির্যাতন সয়ে কি করে বেঁচে রইলে? আর আমার থেকে কোন্ ধরনের সাহায্য কামনা কর?"

আমি অত্যন্ত বিনয় সহকারে আল্লাহ্র প্রশংসা, তাঁর নুসরত ও মদদ, আল্লাহ্র নামে যিকিরের মর্তবা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করলাম। আমার অভিনয়ের কারণও বর্ণনা করলাম। অতঃপর তার থেকে মুক্তির আশা কামনা করলাম। তিনি আমার কথাগুলো খুব মনোযোগের সাথে শুনছিলেন।

এস,পি, সাহেব একজন দারোগাকে ডাক্তার আনার জন্য হুকুম দিলে দারোগা হাসপাতালের বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। এবার সকল লোক বের করে দিয়ে ডাক্তারকে বললেন, "আপনি এ রোগী দেখে পাগলের রিপোর্ট তৈরি করুন। তারপর সরকারী এ্যাম্বুলেন্সে তাকে মেন্টাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। ডাক্তার সাহেব সিরিয়াস পাগল সাব্যস্ত করে বিরাট এক রিপোর্ট তৈরি করলেন। এস,পি, সাহেব যা লেখার তা মনমত লিখে ডাক্তারের রিপোর্টের সাথে পিনআপ করে আমার হাতে দিলেন। আর বেশ কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "তোমার প্রয়োজনে এগুলো খরচ করো।"

ডাক্তার সাহেব হাসপাতাল গেরেজে ফোন করে এ্যাম্বুলেন্স তলব করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে এ্যাম্বুলেন্স এসে আমার কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াল। ডাক্তার চলে গেলেন হাসপাতালে। এস,পি সাহেব আমার চোখ বেঁধে গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন এবং ড্রাইভারকে বললেন, ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যেন আমার চোখ খুলে দেন।

গাড়ী পাগলা ঘোড়ার মত সাইরেন বাজিয়ে কত মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, হাট-বাজার ছাড়িয়ে কয়েক ঘণ্টায় এসে লন্ডন শহরে প্রবেশ করল। লন্ডন আমার সুপরিচিত শহর। অলিগলি চেনার বাকি নেই আমার। শহরের হাওয়া আমার গায়ে লাগার কারণে যেন আমার অবসন্ন দেহ সুস্থ-সবল হয়ে উঠল। আসলে এটা শহরের আবহাওয়ার বরকতে নয়, এ শহরের বিশার হাসপাতালেই থাকেন আমার প্রিয়জন। তারই স্পর্শে শহর গর্বিত। তারই অবস্থানে শহরের মর্যাদা আমার কাছে অনেক বেশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার হারানো সম্পদটি হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব। তারই দর্শনে আমার অবশিষ্ট রোগের উপশম হবে। এক কথায় প্রিয়জনের দিদারের অভিলাষে আমার দিল আনন্দে দোল খাচ্ছিল। এ্যাম্বুলেন্সটি অল্পক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালের প্রধান ফটক পেরিয়ে ইমারজেন্সি ভবনের নিকট এসে দাঁড়াল। গাড়ীর সিগন্যালের সাথে সাথে কর্মরত কর্মকর্তাগণ ছুটে এসে আমাকে গাড়ী থেকে ইমারজেন্সি বিভাগের ৫ নং ওয়ার্ডের ৩ নং বেডে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তারগণ কাগজ-পত্র খুলে দেখেন। একজন বললেন, এ ব্যাপারটা স্যারকে অবশ্যই অবগত করাতে হবে। অন্য একজন বললেন, স্যার ছুটিতে আছেন। একজন ডাক্তার বললেন, বাসায় ফোন করে একটু আলাপ করে দেখি। এই বলে ফোনে আমার ব্যাপারে আলাপ করলেন। আমি একজনকে 'স্যার কে?' প্রশ্ন করলে বললেন, এ হাসপাতালের মহাপরিচালক ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল হামিদী। নাম শুনে আমার দিল আনন্দে নেচে উঠল। পুলকে ভরে গেল।

ডাক্তারগণ আমাকে একটি কেবিনে নিয়ে গেলেন ৩ নং শীট থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অভিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি হাস্যোজ্জ্বল আননে আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। আমি আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে ও ভাবাবেগে কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আজ ক'দিন হয় তোমার চিন্তায় আমার পেটে দানাপানি ঢুকেনি। অনেক শহর বন্দর খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ঘরে বসে গেছি। দিন-রাত দোয়া করার পথ বেছে নিয়েছি। আজ তোমার ও আমার দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন। আর কোন চিন্তা করো না। এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি আমার রাজরাণী। আমার হেরেম ও তোমার প্রিয় মদীনায় প্রবেশ করবো।"

অতঃপর তিনি আমার ক্ষত-বিক্ষত শরীর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ধরনের শাস্তি আমাকে দিয়েছে, বৃটিশ হায়েনারা। আমাকে ২য় বার গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের অমানুষিক অত্যাচারের দাস্তান এক এক করে শোনালাম। আমার কথা শুনে কোমলমনা ডাক্তার সাহেবের তপ্ত অশ্রুতে চোখের সুর্মা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হচ্ছিল। হৃদয়ের গভীর থেকে দলিত মথিত হয়ে বেরিয়ে আসল একের পর এক দীর্ঘশ্বাস। তিনি উন্নত মানের ঔষধ এনে দিলেন। ২ জন নার্সকে শুধু আমার জন্য নিযুক্ত করে দিলেন সার্বক্ষণিক সেবা করার জন্য।

তারা ক্ষতস্থানগুলো ওয়াশ করে নিয়মিত ঔষধ লাগাতে লাগল। খাবার ঔষধগুলো সঠিক সময়ে খাওয়াতে লাগল। একদিকে সেবাযত্ন অপরদিকে ঔষধ। এভাবে চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। আমি এবার অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলাম। নিয়মিত খানা পিনা, ঘুম-গোসল করার কারণে ও আল্লাহ্র রহমতে অল্পদিনে পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। এর মধ্যে দু'জন নার্স আমার গতিবিধি ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারল, আমি একজন মুসলিম রমণী।

একজন নার্সের দিলে কৌতূহল জাগল আমার সাথে আলাপ করে পূর্ণ পরিচয় জানতে। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, "আপা! আপনার ব্যাপারে কিছু জানতে চাই, বলবেন কি? আমি বললাম অবশ্যই, কি জানতে চাও বল।

সিস্টার ঃ আপা! আপনার নাম কি? কেন আপনাকে এরেস্ট করেছিল, আর কেনই বা ছেড়ে দিচ্ছে সরকার?

রিডলি ঃ আমার নাম ইয়োভনি রিডলি। আমি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বৃটিশ সরকার ও পিতা কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছি। আমার ঈমানের কারণে আল্লাহ্ পাক আমাকে নির্যাতন, নিপীড়ন ও অমানুষিক অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। শোকর মহান রাব্বুল আলামীনের। অতঃপর প্রায় ১ ঘণ্টাব্যাপী আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ইসলাম গ্রহণ করার কারণ ও তালেবানদের পরিচয় তুলে ধরলাম। আমার কথা শুনে দু'জন সিস্টারই দ্বীন কবুল করলেন। কালেমায় পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তা উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। আমি তাদেরকে ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহিত ও তাকিদ দিলাম।

এদিকে ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল হামিদী আমার মুক্তির পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি আমার জন্য উচ্চতর আদালতে ইসলাম গ্রহণ, নাম পরিবর্তন ও বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে দরখাস্ত করলেন।

উচ্চতর আদালতে আমাকে তলব করা হল। আমি বিচারপতির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বিনাদ্বিধায় বিনা সংকোচে বলে দিলাম। বিজ্ঞ আদালত আমার বক্তব্য শুনে আমার পক্ষে

রায় প্রদান করেন। খ্রিস্টান পিতা মিস্টার ডনপল এর রাখা নাম (ইয়োভনি রিডলি) পরিহার করে রোকাইয়্যা নাম ধারণ করলাম। অর্থাৎ এফিডেফিটের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ, নাম পরিবর্তন ও ডাক্তার হাসান বিন ওয়ারেছ আল হামেদীর সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। বিচারক জনাকীর্ণ আদালতে এ চাঞ্চল্যকর রায় প্রদান করেন। এবার ডাক্তারের বাম পার্শ্বের আসন দখল করে আমি আদালত প্রাঙ্গন ত্যাগ করি। অতঃপর দু'দিন পরে আমার ভিসা ও পাসপোর্টের ব্যবস্থার করে চিরদিনের জন্য কুফরী স্থান বৃটিশ ত্যাগ করে সৌদী বিমানে চড়ে আকাশে ডানা মেললাম।

পরদিনই বিশ্বের পত্র-পত্রিকাগুলো আমার ব্যাপারে লেখা-লেখি আরম্ভ করল। সত্য-মিথ্যার সমাহারে অনেক বই পুস্তক ছাপা হলো। ইসলামের পক্ষে-বিপক্ষে কতজনে কত পুস্তিকা প্রকাশ করল তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমরা মদীনার কুঞ্জবনের বুলবুলি বনে গেলাম। মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে প্রিয় নবীর কদম মোবারকের কাছে স্থান করে দিলেন। প্রতিদিনই রওজা জিয়ারত করার সুযোগ হয়। মদীনার মসজিদের আযান শুনে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। স্বামীর দ্বিতল ভবনের ছাদে দাঁড়ালেই সবুজ গম্বুজ নয়ন কেড়ে নেয়। মদীনাতে গিয়ে ডাক্তারের আরো এক পরিচয় পেলাম। তিনি হলেন উসামা বিন লাদেনের সহকর্মী ও আল-কায়দার একজন সম্মানিত সদস্য। জিহাদের খাতিরেই তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন।

খুন রাঙা প্রান্তর (প্রেম সাগরের ঢেউ) সমাপ্ত

প্রার্থনা

ওগো বিশ্ব ভুবনের মালিক, মহা পরাক্রমশালী, মহান রাব্বুল আলামীন! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। প্রশংসা ও এবাদত পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আপনিই। আপনাকে ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আপনিই একক সত্ত্বা। আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, আর হতেও পারবে না। আপনি চিরদিন থেকে আছেন আর চিরদিন থাকবেন। কখন থেকে আছেন আর কোন পর্যন্ত থাকবেন, তার কোন সীমা নেই। আপনি অসীম।

হে আল্লাহ্! আমি আপনার একজন না লায়েক গোলাম। কিন্তু আমি আপনার গোলামীর ধারে কাছেও নেই। জীবন ভরা করে আসছি নফসের গোলামী। তাই আপনার অবাধ্য গোলামের তালিকায় পড়েছি। আপনি গাফ্‌ফার, সাত্তার, রাহমান, রাহীম ও কারীম। অতএব আপনার আলিশান দরবারে নগণ্য ভিখারী হিসাবে দরবারে হাজির। দয়া করে আমার সমস্ত পাপরাশী মিটিয়ে দিয়ে আপনার আদরের কোলে তুলে নিন। হে আমার দয়াল মাওলা!

আপনার কাছে আমার দাবীগুলোর মধ্যে প্রধান দাবী হলো, আপনার রাস্তায় কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে যেন টুকরো টুকরো হতে পারি সে তওফীক দাও।

হে আল্লাহ্! আমাকে এমনভাবে শহীদ করো, যেন শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি। আমার শরীরের একটি টুকরাও যেন সাথীরা না পায়। আমার লাশ বহন করা, কবর খনন ইত্যাদি কাজে যেন কারো কষ্ট করতে না হয়। এমনভাবে শহীদ করো।

হে আল্লাহ্! খুন কারা আস্তিন নিয়ে রক্তেভেজা শরীর নিয়ে যেন তোমার দরবারে হাজির হতে পারি, তোমার প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পারি, সে তাওফীক দান করো। আমার আদরের সন্তানগুলোকেও তোমার দ্বীনের পথে কুরবান করতে পারে সে তাওফীক দান করো।

হে আমার মাওলা!

অনেক ব্যথা-বেদনা আর মর্ম জ্বালা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি বহুকাল সে বেদনা কিসের তা তুমি জানো। কেন চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে কেন দিল ছট্ ফট্ করছে, তাও তোমার জানার বাইরে নয়। অতএব আমার দিল ঠাণ্ডা কর।

ওগো পরওয়ারদেগার! খুনরাঙ্গা ইসলাম আজ বাতেল শক্তির কাছে পরাজিত। মুসলমান আজ চির নিদ্রায় শায়িত। শাসক ও বীরের জাতি আজ তোমার দেয়া জিহাদের পথ ভুলে গিয়ে গোলামীর কয়েদখানায় বন্দী। নবীর বাতলানো জিহাদী কার্যক্রম থেকে বহু দূরে। শহীদী মৃত্যুর পথ ভুলে গিয়ে জানোয়ারের মৃত্যু বেছে নিয়েছে। অতএব শাহাতাদের তীব্র বাসনা পয়দা করে দাও আমাদের হৃদয়ে।

হে আল্লাহ্! আফগান থেকে ফিরে আসা পবিত্র বন্ধু বান্ধবের যবান থেকে শুনে, বিভিন্ন বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে, বাস্তবতাকে কল্পনার পোশাক পরিচয় পাঠক-সমাজে পেশ করলাম। কাল্পনিক ঘটনা প্রবাহের বাঁকে বাঁকে সত্যের প্রলেপ দিয়ে প্রেম সাগরের ঢেউ সমাপ্ত করলাম। এর মধ্যে যা সুন্দর ও সত্য পাঠক পাঠিকা তা গ্রহণ করার তাওফিক দান কর। আর যা কাল্পনিক ও অসুন্দর তা পরিহার করার ক্ষমতা দান কর।

হে আল্লাহ্! প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার অন্তরে দ্বীনের ভালবাসা তোমার ও তোমার হাবীবের প্রেম দান কর। দ্বীনের জন্য জিহাদের মত কঠিন ও ফরয এবাদতকে আদায় করার তাওফিক দাও। যে সমস্ত প্রেমিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেম খেলায় (জিহাদ) মত, তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দান কর। একমাত্র তুমি ছাড়া সাহায্যকারী কেউ নেই। হে আল্লাহ্! আফগানিস্তান ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আরাকান সহ নির্যাতিত ও নিপীড়ন দেশগুলো মুজাহিদদের হাতে দিয়ে দাও। সেখানে ইসলামী নিশান উড়াবে ওরা। আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, বৃটেন, ইসরাইল সহ সবগুলো কুফুরী রাষ্ট্র মুজাহিদদের হাতে ধ্বংস করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা জারী কর। ইসলাম আবার দুনিয়াতে বিজয়ী হিসাবে দেখিয়ে মোমেনের কলিজা ঠাণ্ডা কর। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

খুনরাঙা প্রান্তর উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর উপাদানগুলো বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও লোকমুখে শ্রুত। আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৃটিশ সাংবাদিক ইয়েভনি রিডলীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্য। বাকী অংশটুকু মিথ্যার মোড়ে মোড়ে সত্যের প্রদীপ জ্বেলে পাঠককে নিয়ে গেছে বহু দূর।

লেখকের অন্যান্য বই

☆ আঁধার রাতের বন্দিনী প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড